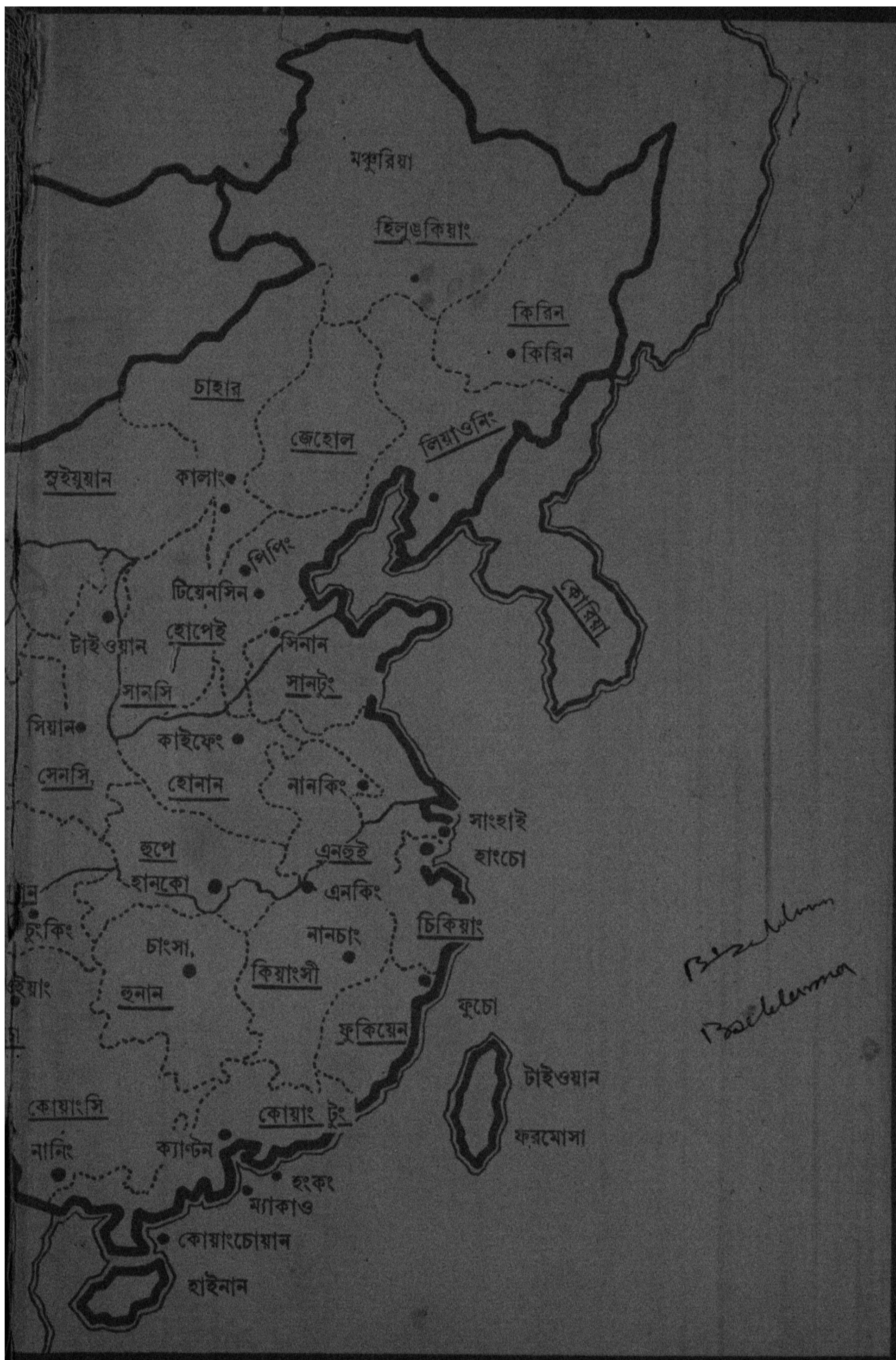
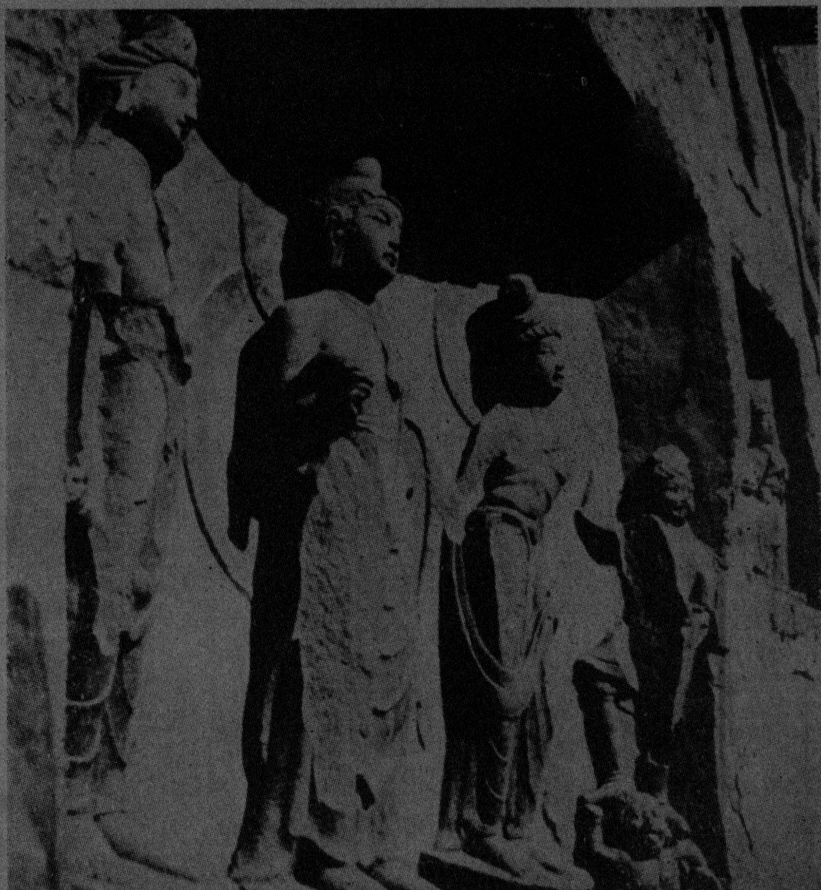


মঙ্কুরিয়া
হিলুঙকিয়াং
কিরিন
কিরিন
চাহার
জেহোল
লিয়াওনিং
সুইয়ুয়ান
কালাং
পিপিং
টিয়েনসিন
টাইওয়ান
হোপেই
সিনান
সানসি
সানটুং
কোরিয়া
সিয়ান
কাইফেং
সেনসি,
হোনান
নানকিং
সাংহাই
হাংচো
হুপে
এনহুই
হানকো
এনকিং
চুংকিং
চিকিয়াং
নানচাং
চাংসা,
কিয়াংসী
হুনান
ফুচো
ফুকিয়েন
টাইওয়ান
ফরমোসা
কোয়াংসি
কোয়াং টুং
নানিং
ক্যান্টন
হংকং
ম্যাকাও
কোয়াংচোয়ান
হাইনান



পিংলিং মন্দিরে বুদ্ধদেবের প্রস্তরমূর্তি

(ট্যাং যুগ)



পার্বত্য দৃশ্য—জলপ্রপাতের পাশে সুধীদ্বয়
শিল্পী উ তাও-জু (ট্যাং যুগ)



সিংহ-পৃষ্ঠে ওয়েন সু (মঞ্জুশ্রী)
ওয়ান ফো-সিয়া মন্দিরে প্রাচীর-চিত্র
(ট্যাং যুগ)



বোধিসত্ত্বের মস্তক—রেশমের উপর
বর্ণচিত্র (৮ম বা ৯ম খৃস্টাব্দ)
তুরফানে (মধ্য এশিয়া) প্রাপ্ত—
বার্লিন মিউজিয়াম

মহাচীনের ইতিকথা

শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ১২

প্লেট ৮



পতঙ্গ ও পদ্ম—কাগজে আঁকা চিত্র
শিল্পী চিয়েন সুয়ান (ইউয়ান যুগ)

প্রকাশক : শ্রীসুপ্রিয় সরকার
এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রচ্ছদশিল্পী : শ্রীমণীন্দ্র মিত্র

ভারত সরকারের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যের দরুন এই পুস্তকের সুলভ মূল্য সম্ভব হইয়াছে।

জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭

.দাম : সাত টাকা

মুদ্রক : শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্ প্রাইভেট লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা ১৩

প্লেট ১০



নৌকায় ঘুমন্ত ধীবর
শিল্পী তা'ই ওয়েন-চিন
(মিং যুগ)

বর্ষ পঞ্চাশোর্দ্ধ কালের জীবন-সঙ্গিনী,

আমার সহধর্মিণী

শ্রীমতী প্রিয়বালা দেবীর

করকমলে—



শীতের বনানী—রেশমের উপর অঙ্কিত—শিল্পী লি চে'ং
(সুং যুগ)—বোস্টন মিউজিয়াম

প্লেট—৬



হ্রদের তীর—শিল্পী সিয়া কুয়েই

(সুং যুগ)

মুখবন্ধ

ইংরেজদের আমলে এ দেশে ইতিহাস-শিক্ষার বিষয় ছিল অতীত কালের গ্রীক নগর-রাষ্ট্র ও রোমান সাম্রাজ্যের কাহিনী, আর ওই দুটি দেশের সংস্কৃতি কিরূপে সারা ইউরোপকে প্রভাবিত করেছিল তার বিবরণ। সেই সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া হত এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকায় ইউরোপীয় জাতিসমূহের রোমাঞ্চকর অভিযান, বেপরোয়া আধিপত্য, বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য-সংপ্রতিষ্ঠার কথা এবং আধুনিক চোখ-ঝলসানো যন্ত্র-যুগের আবির্ভাব প্রসঙ্গ। কালোপযোগী শিক্ষা সন্দেহ নেই, কেননা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থনীতি প্রভৃতির বিবর্তন সম্বন্ধে যথেষ্ট মৌলিক তথ্য ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা সঞ্চিত রয়েছে ইউরোপের জ্ঞান-গর্ভ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়। কিন্তু এশিয়া? ইতিহাস-জগতে সমগ্র এশিয়া তখন ছিল অনাদৃত, অপাংক্তেয় বললেও চলে, যদিও ভারতবর্ষের ইতিহাস-কাহিনী পড়াকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি, এবং মিশর, ব্যাবিলন ও মিডিসের লুপ্ত সভ্যতার ঝিকিমিকি মাঝে মাঝে দেখা দিত। বস্তুত শ্যাম, ক্যাম্বোডিয়া, জাভার কথা দূরে থাক, আমাদের সব চেয়ে বৃহৎ প্রতিবেশী দেশ চীন, সেই বিরাট দেশের অতিপ্রাচীন কালের সভ্যতা ও সংস্কৃতি, ধারা-পারম্পর্যে অক্ষুণ্ণ, অতুল মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠ, এমন একটি সুমহান সংস্কৃতির পরিচয়টুকুও আমরা পাই নি। আমরা দেখেছি শুধু চীনা নারীদের ছোট্ট বাঁধা পায়ে অদ্ভুত গুটি-গুটি হাঁটা, আর চীনা পুরুষদের কামানো মাথায় লম্বা বাঁধা বেণী। দেখেছি, তারা জুতো তৈরি করে, মিস্ত্রীর কাজ করে আর চণ্ডু খেয়ে ঝিমোয়। ইন্দোচীন, মালয়, সমগ্র দূরপ্রাচ্যে তারা গেছে চাষের কাজ, জন-মজুরি, কেউ বা ব্যবসা করতে। ১৮৫০ সাল থেকে তিন দশক, অর্থাৎ যে পর্যন্ত না আমেরিকায় তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, সে পর্যন্ত সেখানে তারা গিয়ে ক্যালিফর্নিয়ার স্বর্ণখনির খননকার্য ও অন্য স্থানে কুলি-গিরি করেছে। মুচি-মিস্ত্রীর কাজ, কুলি-গিরি, আফিং সেবন, তাদের এসব বৃত্তি ও অভ্যাসের প্রতি দৃষ্টি রেখেই আমরা চীন দেশের কৃষ্টির মূল্যায়ন করেছি। কিন্তু এই মিথ্যা ধারণার বুদ্বুদটি ফেটে গেল, ১৯১১ সালে হঠাৎ যেদিন দেখি তারা বেণী কেটে ফেলেছে, মাঞ্চু সম্রাট সিংহাসন ত্যাগ করেছেন, সেদিন আজও মনে পড়ে যখন চীন দেশে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ইউরোপে 'পীত



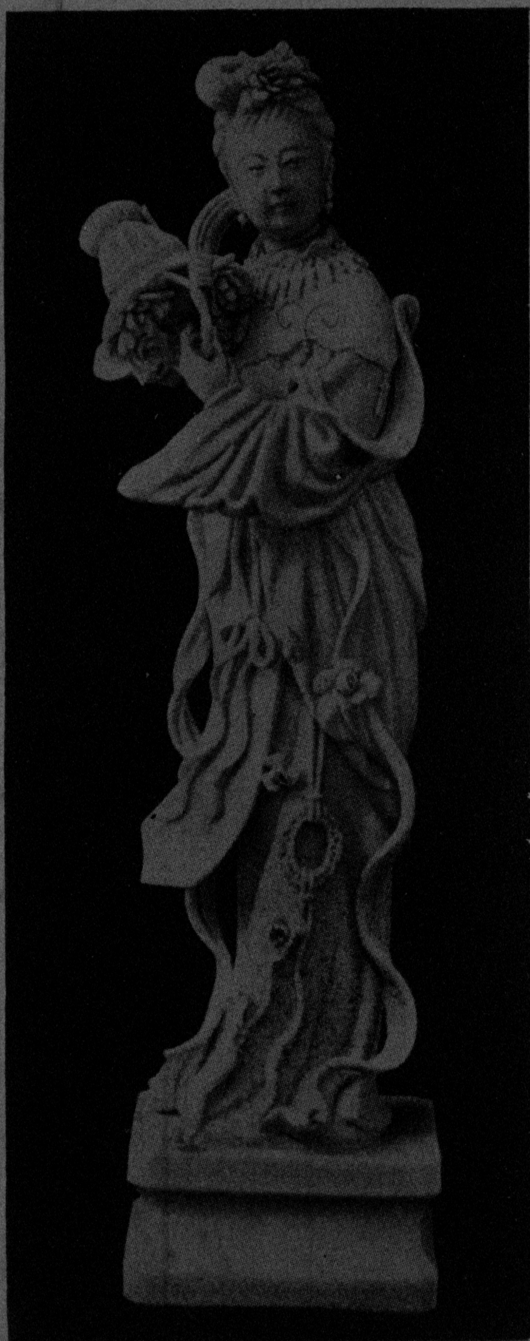
সম্রাট চি'য়েন লুং-এর রথযাত্রা পিতৃপুরুষের সমাধি দর্শনে

(চি'ং যুগ)

বিভীষিকা'র ('yellow peril') সূত্রপাত হল তখনই, আভাসে-ইঙ্গিতে কথাটি ব্যক্ত করেছিলেন জার্মান কাইজার দ্বিতীয় উইলহেল্‌ম্—তার পূর্বে চীনবাসী ও তার সভ্যতা ইউরোপের কাছে ছিল যুগপৎ বিস্ময় ও উপহাসের সামগ্রী, বিস্ময় এইজন্য যে যুগের পর যুগ ধরে ভিতরে-বাইরে উপর্যুপরি আঘাত খেয়েও এই প্রাচীন জাতিটা বেঁচে আছে কিরূপে! তারপর ঘটল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, এবং সে যুদ্ধ অবসানের বিশ বছর পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। ইতিমধ্যে রাশিয়ায় কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠিত হল, এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ভারত যেমন পরাধীনতা-পাশ ছিন্ন করল, তেমনি এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলিও একে একে স্বাধীন হয়ে পড়ল। চীনের বুকের ওপর বিদেশী শক্তিপুঞ্জের দাপট আর এখন নেই, চীনে কম্যুনিস্ট শাসন প্রবর্তিত হয়েছে, সামরিক বলে পরাক্রান্ত হয়ে উঠেছে চীন। এশিয়া যখন ছিল সুপ্ত পদদলিত, বিভিন্ন জাতিসমূহের তখন পরস্পর মেলামেশা যোগ-জিজ্ঞাসার সুযোগ ছিল না, আগ্রহেরও ছিল একান্ত অভাব, সৌভাগ্যক্রমে আজ সে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। এশিয়া এখন জাগ্রত, এই শুভদিনে এই মহাদেশে নানান জাতির মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হবে তখনই যখন আমরা ইতিহাসের যুগব্যাপী ঘটনাস্রোতে অবগাহন করব, সহানুভূতি-সঞ্জাত যত্ন নিয়ে একে অন্যের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য।

তৃতীয় খৃস্ট পূর্বাব্দের চিন বংশ থেকে দেশের নাম 'চীন' হয়েছে, এমনি একটি মতবাদ প্রচলিত আছে, কিন্তু এই সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত কি না সে সম্বন্ধে সংশয়ও প্রকাশ করা হয়েছে। চীনারা তাদের দেশের নাম দিয়েছিল—'সি-পা-সেং', অর্থাৎ 'আঠারো প্রদেশ', মাঞ্চু-যুগে দেশের প্রদেশ-সংখ্যা অনুসারে এই নাম। চীনের আর একটি নাম ছিল 'চুয়া চুয়ে', অর্থাৎ 'মধ্যম রাজ্য' ('The Middle Kingdom')। বিশাল এই চীন দেশ, বহিরঞ্চল ও তিব্বত নিয়ে রীতিমত একটি লেভিয়াথান, আয়তন প্রায় ইউরোপের সমান, অর্থাৎ ৪৩ লক্ষ বর্গ মাইল। মূল চীনা ভূমি সি-পা-সেং-এর আয়তন কিন্তু পনর লক্ষ বর্গ মাইল—উত্তর সীমায় মোঙ্গলিয়া, পশ্চিমে তুর্কীস্তান ও তিব্বত, দক্ষিণে ব্রহ্ম, ইন্দোচীন ও চীন সাগর, পূর্বে মাঞ্চুরিয়া, পীত সমুদ্র ও চীন সাগর। তিব্বতের পূর্ব প্রান্ত থেকে কুয়েন-লুন পর্বতমালা দক্ষিণ দিকে জেচুয়ান ও ইউনান প্রদেশে এসে নেমেছে, তা ছাড়া চীন দেশে আছে আরও কয়েকটি সুদীর্ঘ পাহাড়ের

প্লেট ১২



দেবকন্যার পুষ্পবর্ষণ

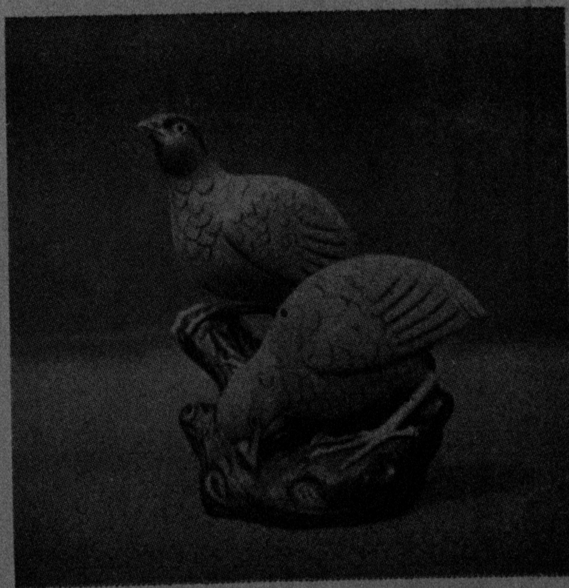
(তেহ্‌হুয়ার পর্সিলেন শিল্প)

শ্রেণী আর সু-উচ্চ পাহাড়ের চূড়া, যেমন লুং-সান, বিচথোফেন (স্থানীয় নাম তিয়েন সান)। বড় দেশে বড় পাহাড় যেমন নদীও তেমনি বড় বড়। উত্তরে হোয়াং হো বা পীত নদী, চীনা সভ্যতার জন্মভূমি এই নদী-উপত্যকা থেকেই সে সভ্যতা সারা দেশে ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। মধ্যদেশে ইয়াংসি কিয়াং এবং তার শাখা হ্যান নদী। ইয়াংসি এশিয়ার সব চেয়ে দীর্ঘ নদী, ২৯০০ মাইল বয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে, অনেক দূর পর্যন্ত এই নদীর ওপর দিয়ে স্টিমার চলে।

এই শতাব্দের প্রথম ভাগে চীনের জনসংখ্যা চল্লিশ কোটি বলে অনুমান করা হয়েছিল, সেই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে এখন নাকি ষাট কোটি ধর-ধর কি বা পেরিয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন চীনারা বহুকাল থেকেই মাঞ্চুরিয়া, মোঙ্গলিয়া, তুর্কীস্তান, ইন্দোচীন, এমন কি মালয়ে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। চীনারা মোঙ্গলিয়ান জাতি, কিন্তু খাঁটি নয়, মিশ্র। মোঙ্গলদের সঙ্গে চীনা আকৃতির বিশেষ প্রভেদ দেখা যায়। তাতার, তিব্বতী, বর্মী, সান, মাঞ্চু এসব জাতির সঙ্গে কিছু-কিছু মিশ্রণে চীনাদের বিশিষ্ট আকৃতি গঠিত হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে তাদের চেহারা বিভিন্ন রকমের। কথ্য ভাষার রূপ স্থানবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু আকৃতির ও কথ্যভাষার পার্থক্য থাকলেও প্রশাসন-ক্ষেত্রে এক প্রকার পণ্ডিতী ভাষা ও প্রতিষ্ঠান (mandari-nate) সূত্রে চীন ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল সুদূর অতীতে, এক মহাজাতি, এক মহারাষ্ট্র গঠনে সমর্থ হয়েছিল চীন সেই আদিযুগে, আর সে এমন মহাজাতি ও মহারাষ্ট্র যার তুলনা নেই ইউরোপে, নেই ভারতবর্ষে। প্রাচীন কালে ব্যাবিলন, আসিরিয়া, মিডিস, গ্রীস, রোম সকলেই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিল বটে, কিন্তু সাম্রাজ্য-মধ্যে সব জাতির মানুষকে নিয়ে একটি মাত্র 'মহাজাতি' গড়ে তোলা ছিল তাদের জাতীয় স্বার্থ, জাতীয় ঐতিহ্যের পরিপন্থী, তাই তারা কখনো মহাজাতি গঠনের পথে অগ্রসর হয় নি। পক্ষান্তরে চীনের ভাগ্যবিধাতার বিধান অন্যরূপ। মহাজাতি-গঠনের প্রেরণা জেগেছিল চীনে খৃস্ট পূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের চৌ-যুগে, কিন্তু সে দেশ ছিল তখন ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্যের সমষ্টি, মহাভারতের মতই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত। খৃস্ট পূর্ব তৃতীয় শতকে সেখানে আবির্ভাব হয়েছিল একজন জরাসন্ধের, যিনি এক একে সকল নৃপতিকে অপসারিত করে তাদের রাজ্যসমষ্টি নিয়ে গড়ে তুললেন



বৃক্ষশাখায় পাখীর চিত্র—শিল্পী অনামী (সুং যুগ)



বিহঙ্গ-যুগল—সিহ্‌ওয়ান পর্সিলেন

একটি মহারাষ্ট্র।' তখনই মহাজাতি-গঠনের পথ প্রস্তুত হল, তার আগে নয়। মহারাষ্ট্র-গঠন পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই তিনি 'মহাপ্রাচীর' নির্মাণ করেছিলেন, কিন্তু কি মহারাষ্ট্র গঠন, কি মহাপ্রাচীর নির্মাণ, এ দুটির জন্য দেশকে দিতে হয়েছিল মহামূল্য। কনফুসীয় শাস্ত্রগ্রন্থ, কনফুসীয় ঐতিহ্য, প্রাচীন কালের পুণ্য-স্মৃতি সবই উন্মূলিত হয়েছিল, তখন কম্বু-কণ্ঠে নবীন মন্ত্রের এই উদাত্ত বাণী শোনা গিয়েছিল ঃ

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।

এমনি করে ঘা দিয়েই চীনের 'প্রথম সম্রাট' সি হুয়াং তি পরস্পর-বিবদমান, দুর্নীতিপরায়ণ প্রাচীন রাষ্ট্রগুলিকে ভেঙে দিয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ এক মহাজাতির উদ্ভবের পথ মুক্ত করে দিয়েছিলেন। অবশ্য পরবর্তী কালের হ্যান-বংশীরা 'প্রাচীন বিদ্যা'কে পুনরুদ্ধার করেছিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে 'প্রাচীন বিদ্যা'র বিষবৃক্ষকে ছেদন করে চীনের জরাসন্ধ মহাজাতি-গঠন ও জাতীয় সংহতির ভিত্তি পত্তন করেছিলেন, সেই কনফুসীয় প্রাচীন বিদ্যাকেই পুনরুজ্জীবিত করে, জল সেচনে তাকে বর্ধিত করে তারই ছায়াতলে বসে হ্যান-রা পূর্বসূরীগণের চিরদিনের স্বপ্ন মহাচীনকে ভাষা ও সংস্কৃতির ঐক্যবন্ধনে একটি সামগ্রিক রূপদান করতে পেরেছিলেন! কনফুসীয় নীতিশাস্ত্রের ধ্বংসস্তূপের ওপরই মহাচীনের কাঠামো তৈরি হয়েছিল, সেই কাঠামোর মধ্যে একটি বিরাট সৌধ সগর্বে মাথা তুলেছিল কনফুসীয় শাস্ত্রগ্রন্থগুলিকেই আশ্রয় করে, আর এমন পাকাপোক্ত সেই ইমারত যে মাঝে-মাঝে মেরামত দরকার হলেও একেবারে ভেঙে পড়ে নি তা কোনদিন।

মহাজাতি গঠিত হল, কিন্তু তার বুকের ওপর পাষাণের মত চেপে বসেছিল সেই 'প্রাচীন বিদ্যা'। কনফুসীয় নীতিধর্ম গোটা জাতিকে রেখেছিল আচার-বিচার দিয়ে আষ্টেপিষ্টে বেঁধে, সে নীতিধর্ম ছিল একটি অচলায়তন, কোন কালে যার তিলমাত্র নড়চড় হয় নি। কনফুসীয় নীতির মেরুদণ্ড 'পঞ্চ সম্বন্ধ', তার মধ্যে রাজা, রাজভক্তি ও রাজা-প্রজা সম্বন্ধ একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে। এমন যে রাজনৈতিক দর্শন, তার

প্লেট ৮

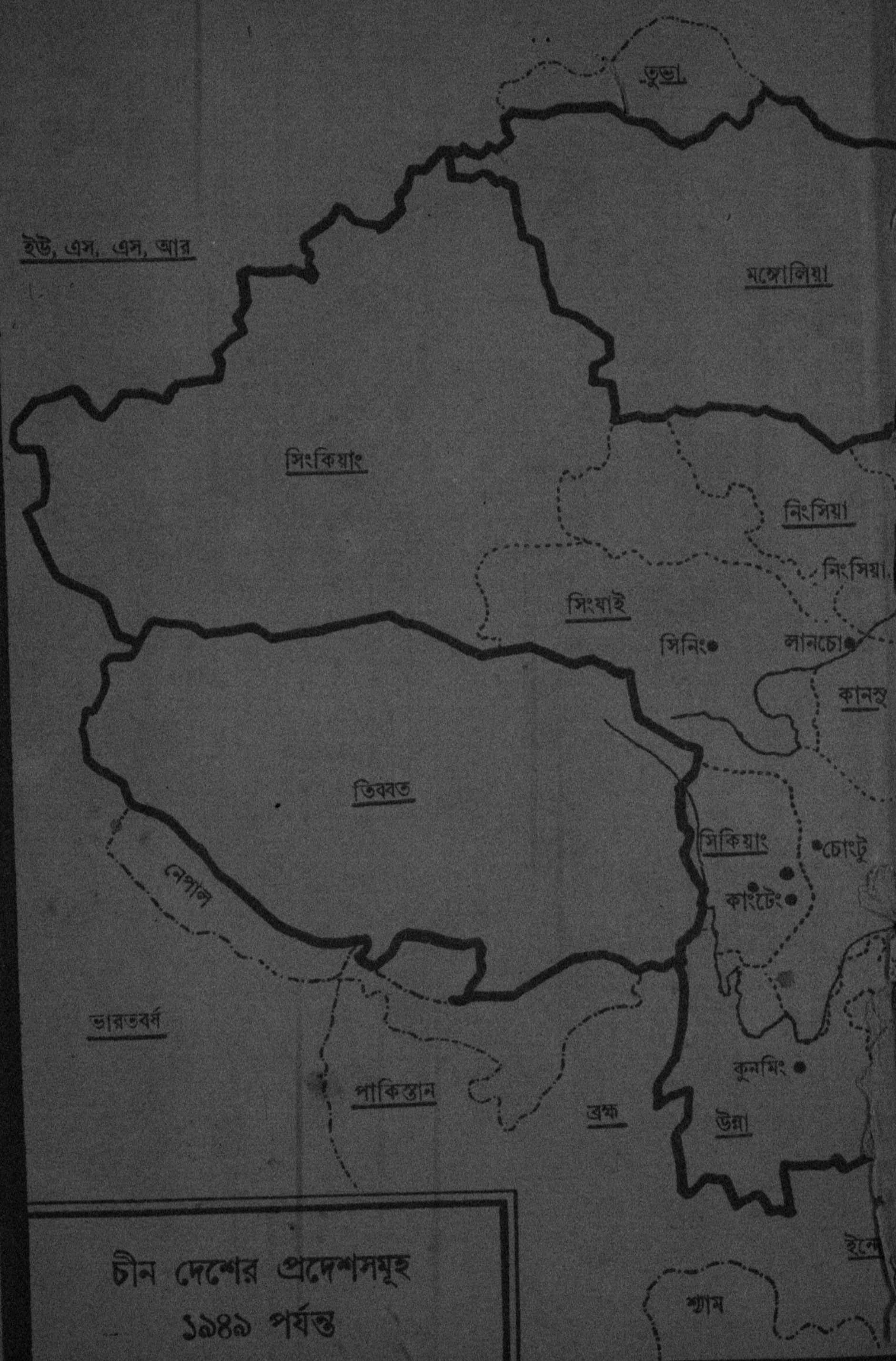


মধ্য এশিয়ায় দিগ্বিজয়ী জেঙ্গিস খাঁর অশ্বারোহী বাহিনী
(সম্ভবত ১৭৫০ খৃস্টাব্দে খোদিত)

মধ্যে বিপ্লবের স্থান না থাকারই কথা, কিন্তু চীনের সুদীর্ঘ ইতিহাস ঘন ঘন রাষ্ট্রবিপ্লবে কণ্টকিত দেখা যায়, তার কারণ সেই দর্শনে আছে একটি অদ্ভুত রকমের বিধান। বিধানটি এই: সম্রাট 'স্বর্গপুত্র', স্বর্গের অর্থাৎ ঈশ্বরের পরোয়ানা (mandate of Heaven)-বলেই তিনি প্রজা শাসন করেন, কিন্তু সেই পরোয়ানা প্রত্যাহৃত হয় যখনই দুর্ভিক্ষে কুশাসনে উৎপীড়নে প্রজা জর্জরিত। আর পরোয়ানা যখন প্রত্যাহৃত হল তখন বিপ্লবে বাধা কি? ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্তও দেখা যায় যে বিপ্লবকালে যুদ্ধের সময় নিশীথে শিবিরমধ্যে নিদ্রিত সেনাপতিকে জাগিয়ে তুলে তাকে রাজ-পরিচ্ছদে ভূষিত করে তার ঘোর আপত্তি সত্ত্বেও সৈন্যরা তাকে সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে 'স্বর্গের পরোয়ানা' তারই ওপর জারি করেছে।

এমনি করে প্রতিটি বিপ্লবের পর একটি রাজবংশের পতন, আর একটি রাজবংশের অভ্যুত্থান, মাঝে মাঝে মাৎস্যন্যায় এবং সমরনেতাদের আবির্ভাব, এক কথায় এই হল চীনের যুগ-যুগান্তের সনাতন ইতিহাস-কাহিনী। অবশ্য এই আপদকালীন বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে প্রত্যন্তের বিদেশী জাতি-উপজাতিরা যে গোটা চীন দেশ বা চীনের অংশবিশেষের ওপর কোন কোন সময়ে তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে নি, তা নয়। চীনে বিপ্লবের ঐতিহাসিক পুনরাবৃত্তির পানে নজর রেখেই অনেক প্রাচীন চীনা লেখক বলে গিয়েছেন, "সাম্রাজ্য ঐক্যবদ্ধ হলে ভাঙবার পথে এগিয়ে যায়, আর সাম্রাজ্য যখন বিভক্ত তখন খণ্ডগুলি আবার ঐক্যের কামনা করে।"

কিন্তু 'ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি'—History repeats itself—এই মূল নীতিটিকে আক্ষরিক বিচারে মেনে নেওয়া চলে যতক্ষণ ইতিহাসের ছকে সাজানো গুটিগুলিকে নিজ নিজ স্থানটিতে কায়েম করে বসিয়ে রাখা হয়, অর্থাৎ কিনা যতক্ষণ পর্যন্ত সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোন নূতন সৃজন-শক্তির উন্মেষ না ঘটে। আসলে এই পুনরাবৃত্তি ব্যাপারটা বিধাতার বা প্রকৃতির এমন কিছু একটা শাশ্বত বিধান নয় যার দাস হয়ে মানুষ থাকবে চিরদিন, উদ্ভাবনী-শক্তির নব-বিকাশ সত্ত্বেও যার প্রতিকার করা চলবে না। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক আরনল্ড্ টয়েনবি বলেছেন, "The repetitive element in history reveals itself as an instrument for freedom of crea-

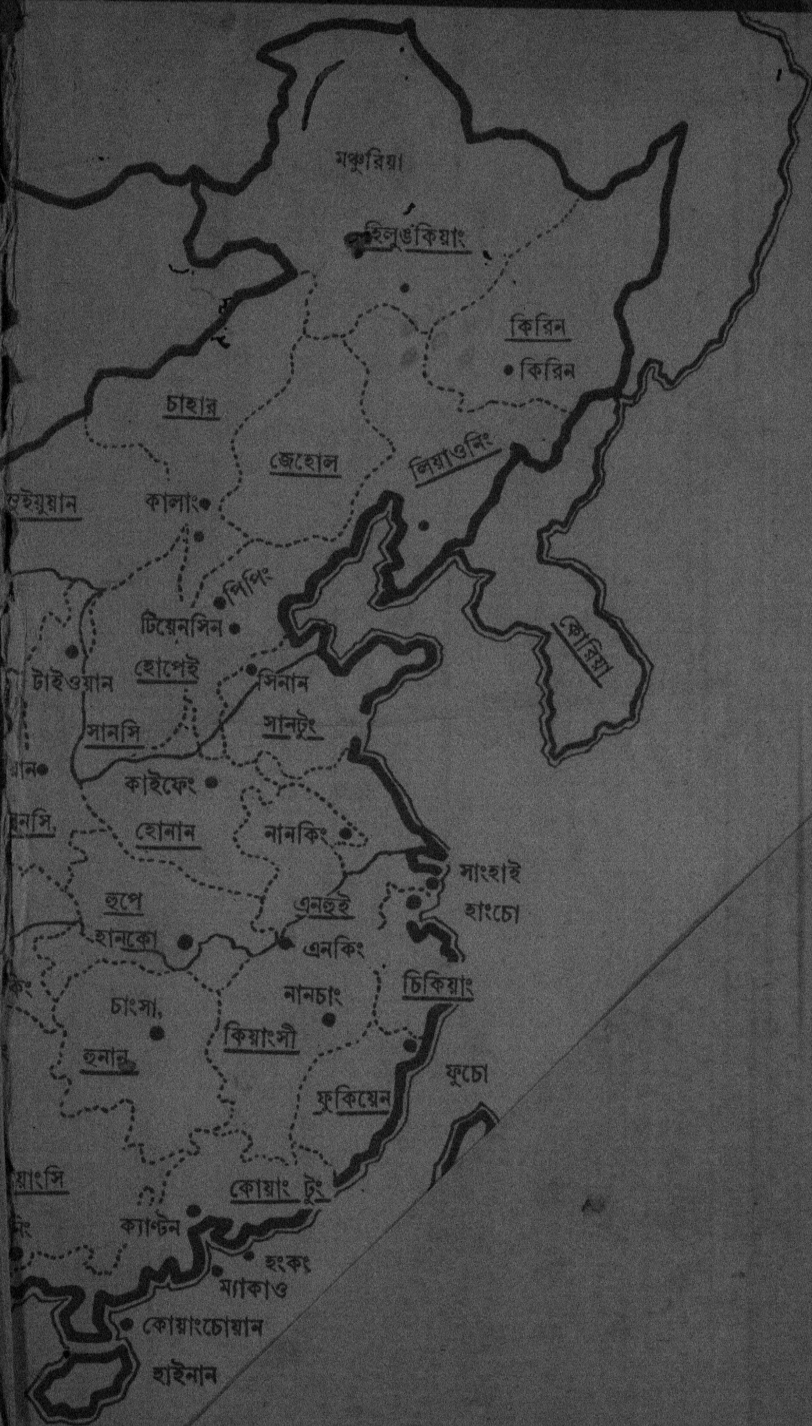


চীন দেশের প্রদেশসমূহ
১৯৪৯ পর্যন্ত

tive action, and not as an indication that God and man are the slaves of fate." অর্থাৎ ইতিহাসে পুনরাবৃত্তির বৃত্তান্তগুলি পূর্বনির্দিষ্ট কোন বিধিলিপির ইঙ্গিত করে না, স্বাধীন চিন্তার দ্বারা নূতন পথের সন্ধান করে সেই পথে কর্মশক্তি পরিচালনার প্রবৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করবার যন্ত্ররূপেই সেসব ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের আবির্ভাব।

ইতিহাসের পরম ভক্ত চীন, সেই চীনের কাছে ইতিহাসের এই গূঢ় তত্ত্বটি যে একেবারে অজানা ছিল তা নয়। এ কথার সমর্থনে সম্রাট ট্যাং তা'ই স্বং-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন, "দর্পণ সামনে ধরে তুমি তোমার মাথার টুপি ঠিকমত পরতে পার। তেমনি প্রাচীন ইতিহাসকে দর্পণরূপে ব্যবহার করতে শিখলে মানুষ সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের বার্তা পূর্বাহ্ণে জানতে পারে।" ইতিহাস-শিক্ষা থেকে এমন ভূয়োদর্শন, এমন প্রভূত জ্ঞান অর্জন সত্ত্বেও চীন দেশে যে কেন বারবার বিপ্লবের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে, শুধু রাজবংশের উত্থান-পতন নয়, বিদেশীর পদ-লাঞ্ছনা পর্যন্ত চীনকে নির্বিকারচিত্তে বক্ষে বহন করতে হয়েছে, তার কারণ বোঝা কঠিন নয়। কারণ হল সেই কনফুসীয় 'প্রাচীন-বিদ্যা'র ঘূর্ণাবর্ত, যে আবর্ত বিগত দু-হাজার বছর ধরে শুধু আপন গণ্ডী-মধ্যেই পাক খেয়ে মরেছে, নিজের বাইরে গোটা বিশ্ব-জগৎ পড়ে রয়েছে, তার সঙ্গে সংগত মিলিয়ে চলা তো দূরের কথা, তার পানে একটিবার ফিরেও তাকায় নি। সেই কনফুসীয় পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক পরিচালিত চিরাগত শাসন-ব্যবস্থা, তার সংস্কার বা পরিবর্তনের বিন্দুমাত্র প্রয়োজনও অনুভব করে নি চীন। সুদীর্ঘ কালের ইতিহাসে দু-একজন দূরদর্শী শাসক শাসন-সংস্কারের চেষ্টা যে করেন নি তা নয়। এমনি সংস্কার করেছিলেন হ্যান যুগের ওয়াং মেং আর স্বং যুগের ওয়াং আন-সি, কিন্তু তাঁদের উদ্যম প্রশংসার্হ হলেও ফলবতী তো হয়ই নি, বরঞ্চ ফল হয়েছিল অশুভ, পণ্ডিতমণ্ডলী ও উচ্চ-শ্রেণী তাদের স্বার্থহানির দরুন চারদিকে বিদ্রোহের বহ্নি প্রজ্বলিত করে তুলেছিল।

শ্রেণীবিশেষের এই স্বার্থই হয়েছিল চীনের কাল-স্বরূপ, সম্রাটের স্বার্থ, জমিদার ও অভিজাতবর্গের স্বার্থ, পণ্ডিতমণ্ডলী ও রাজকর্মচারীদের স্বার্থ। কনফুসীয় নীতিদর্শনের প্রাচীন বটবৃক্ষে এই স্বার্থসমষ্টির ব্রহ্মদৈত্য আরামে বাসা বেঁধেছিল, সেখান থেকে তারা ঝুপ্‌ঝাপ্‌ লাফিয়ে পড়ত দরিদ্র প্রজা


মঞ্চুরিয়া
কিরিন
কিরিন
চাহার
জেহোল
লিয়াওনিং
কালাং
পিপিং
টিয়েনসিন
হোপেই
টাইওয়ান
সিনান
কোরিয়া
সানসি
সানটুং
কাইফেং
হোনান
নানকিং
সাংহাই
হাংচো
হুপে
এনহুই
হানকো
এনকিং
চিকিয়াং
নানচাং
চাংসা
কিয়াংসী
হুনান
ফুচো
ফুকিয়েন
কোয়াং টুং
ক্যান্টন
হংকং
ম্যাকাও
কোয়াংচোয়ান
হাইনান

ও জনসাধারণের স্কন্ধের ওপর। ভার অসহ্য হলে কচিৎ তারা বিদ্রোহ করত, বিপ্লব ছুটিয়ে দিত, কিন্তু সমাজ-সংস্থা ছিল শাশ্বত সনাতন, সেই সংস্থা ও তার নীতিদর্শনই রেখেছিল চীনা জাতিকে 'অমর' করে।

সত্যই জরাগ্রস্ত চীন ছিল একটি 'অমর জাতি' ('immortal nation'), মামির মতই অমর কিন্তু স্পন্দনহীন। এই জড়দেহের মধ্যেও অফুরন্ত প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল পাশ্চাত্ত্যের সঙ্গে সংযোগ ও সংঘর্ষের ফলে। তখনই দেখা দিল বিপ্লব। এমন বিপ্লব তো চীনে কতবার ঘটেছে, কিন্তু এ এক সম্পূর্ণ নূতন ধরনের বিপ্লব। সমরনেতাদের পুনরাবির্ভাব হল, নূতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা-উদ্যোগও যে না হয়েছিল তা নয়। এবার কিন্তু দেখা গেল, রাজতন্ত্র যা ছিল কনফুসীয় নীতিধর্মের মেরুদণ্ডবিশেষ, সেই মেরুদণ্ডটি ভেঙে গিয়ে রাজতন্ত্র জন্মের মত বিদায় নিয়েছে। শনৈঃ শনৈঃ প্রাচীন চীনের মৃত্যু হয়েছিল, চৈনিক সমাজের কনফুসীয় কাঠামোটি পড়ল ভেঙে, নব-জাগ্রত চীন 'প্রাচীন বিদ্যা'র সমাধি দান করল, যেমন দিয়েছিলেন একদিন চীনের 'প্রথম সম্রাট' সি হুয়াং তি। নূতন চীন প্রাচীন-পন্থীদের দাবিয়ে রেখেছিল এমনি করে যে চিয়াং কাই-সেক প্রবর্তিত 'নব জীবন আন্দোলন'ও জাতিকে তার পুরনো পচা খোলসের মধ্যে আর ফিরিয়ে আনতে পারে নি।

এবারকার বিপ্লবান্তে ইতিহাসের 'পুনরাগমনায় চ' পালাটি যে সাঙ্গ হয়ে গেল তার কারণ চীনের জাতীয় জীবনে একটি নূতন সৃজন-শক্তির প্রকাশ, যা বিপ্লবকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করতে পেরেছে, অবিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ-সংস্থার আমূল পরিবর্তনের জন্য। পরিবর্তনের উদ্দেশ্য জনকল্যাণ, এই মহাব্রত নিয়েই চীনে কম্যুনিস্ট সরকার কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে। কম্যুনিজমের পদ্ধতি, কম্যুনিজমের উপায়গুলি যেমনই হোক, এ সব সম্বন্ধে ঘোর মতদ্বৈধ, এমন কি প্রচণ্ড আপত্তি থাকাও বিচিত্র নয়, কিন্তু এ কথা কারু অস্বীকার করবার জো নেই যে কম্যুনিস্টদের বৈপ্লবিক সমাজ-সংস্কার দ্বারাই অল্পকালের মধ্যে চীন ক্লৈব্য, হৃদয়-দৌর্বল্য ঝেড়ে ফেলে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করতে পেরেছে। চীন আর এখন পিছনে পড়ে নেই, বিশ্বের অগ্রসরমাণ জাতি-সমূহের সঙ্গে সমানে কদম বাড়িয়ে চলেছে—বক্ষে তার অফুরন্ত আশা, বাহুতে তার অপরিসীম শক্তি।

* * *

গ্রন্থের অবতরণিকা এখানেই শেষ করে একটু ব্যক্তিগত কৈফিয়ত পাঠকের কাছে নিবেদন করব, মহাচীনের এই ইতিবৃত্তটি লিখবার মত দুঃসাহসের জন্য। দুঃসাহস বলি এইজন্য যে, দেশ যেমন বিশাল, কালের বিস্তৃতিরও তেমন সীমা-পরিসীমা নেই, এমন একটি বিরাট আয়তনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার মত যোগ্যতা আছে কি না সে-কথা বিবেচনা না করেই হয়তো বা এ কাজে হাত দিয়ে বসেছি। তা ছাড়াও গোদের ওপর বিস্ফোটকের মত আর একটি অসুবিধা, আমি চীনা ভাষা, চীনা লিখন কিছুই জানি না। 'বৈকুণ্ঠের খাতা'র সংগীতপ্রিয় বৈকুণ্ঠ চীনা জুতোওয়ালার হিসাবের খাতাখানাই চীনা সংগীতগ্রন্থ মনে করে সযত্নে তুলে রেখেছিলেন। সেই বৈকুণ্ঠেরই মত চীন দেশ, চীনা সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে যার সাক্ষাৎ-পরিচয় নেই, তার পক্ষে সে দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস লেখার উদ্যমে কোমর বেঁধে নামা একটি দুঃসাহসিক কাষ বলতে হয় বৈকি। কিন্তু এখানে আমার কৈফিয়ত এই যে চীন সম্বন্ধে ইংরেজিতে অসংখ্য বই রয়েছে, ভারি সুন্দর-সুন্দর বই, সেগুলিকে ভেলা করে একজন আনাড়িও উত্তাল চীন-সাগরে স্বচ্ছন্দে পাড়ি জমাতে পারে। অবশ্য ভুল-ভ্রান্তি যে এমন ক্ষেত্রে হতে বাধ্য তা অস্বীকার করছি না, এবং সেজন্য আমি বিনা দ্বিধায় পূর্বাহ্ণে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

আর এক কথা—আজকের বাংলা সাহিত্য সৃজন-মুখর, তার পুষ্পিত বর্ণ-সজ্জার রূপ-মঞ্চে এই গ্রন্থখানা রস-সৃষ্টির দাবী নিয়ে অবতীর্ণ হয় নি। আর নিছক ইতিবৃত্তে সাহিত্য যে রস-মধুর হয়ে উঠবে, এমনই বা কোন কথা? এই ইতিহাস-রচনায় আমি 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা'র অনুসরণ করেছি, মহামতি কনফুসিয়াস প্রদর্শিত সেই পথ। তিনি বলেছিলেন, "আমি শুধু পরিবেশনই করেছি, সৃষ্টি করি নি।"

চীন-সাগরে পাড়ি জমানো গেল, গ্রন্থও লেখা হল, কিন্তু এই বৃহৎ গ্রন্থ মুদ্রণের ব্যাপারে আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করবে কে, সে হল আর একটি কঠিন সমস্যা। শেষ পর্যন্ত সমস্ত শ্রমই হয়তো বা পণ্ড হত, বই ছাপানো হয়ে উঠত না, আর ছাপানো না হলে পাণ্ডুলিপির গতি কি হত তা সহজেই অনুমান করা যায়। অন্ত্যেষ্টির অশুভ পরিণাম থেকে গ্রন্থখানিকে উদ্ধার করেছে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনামত বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি ও

উন্নয়নকল্পে ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যাপ্ত অর্থানুকূল্য, সেজন্য আমি উভয় সরকারকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি।

এই গ্রন্থের নির্ঘণ্ট তৈরি করেছেন শ্রীকৃষ্ণধন দে আর মুদ্রণ-বিষয়ে সাহায্য করেছেন শ্রীবিরাম মুখোপাধ্যায়। দু'জনই তাঁরা কবি, বইখানার অঙ্গপূরণ ও ভুলত্রুটি সংশোধন করে সৌষ্ঠব বর্ধন করতে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন, সেজন্য তাঁরা আমার ধন্যবাদার্হ। সুসাহিত্যিক শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার মহাশয় গ্রন্থের প্রকাশন ব্যাপারে নানামত সাহায্য করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করেছেন।

শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

বিষয়-সূচী

চিত্র-সূচী



তুন-হুযাং গুহায় গোতম বুদ্ধের বর্ণ-চিত্র

(লিপি° সবা

প্রথম পর্ব

চীনা সংস্কৃতির আদিকথা

১. ভূগোল, প্রত্নতত্ত্ব ও লিখন

মানচিত্রে মহাচীনকে দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত দেখা যায়, একটি খণ্ড মূল চীন দেশ, অপরটি চীনের বহিরাঞ্চল। মূল চীন দেশের আয়তন পনর লক্ষ বর্গ মাইল, অর্থাৎ সমগ্র ইউরোপের দুই-পঞ্চমাংশ, অধিবাসীদের অধিকাংশই চীনা। প্রধানত দুটি বৃহৎ নদী উপত্যকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এই দেশ। নদী দুটির নাম হুয়াং বা পীত ও ইয়াংসি, উৎপত্তি-স্থান মধ্য এশিয়ার পর্বতমালা, যেখান থেকে ভারত, ব্রহ্ম, শ্যাম ও ইন্দোচীনের বড় বড় নদী নেমে এসেছে। হুয়াং নদীর ঘোলা জল প্রচুর ক্লেদ কর্দম স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, মসৃণ এঁটেল কর্দম (leoss), হলদে রং বলে নদীর নাম 'পীত নদী'। এই নদীর উভয় তীরে মাটির পুরু স্তর কালে কালে জমে প্রাকৃতিক বাঁধ তৈরি করেছে, আবার মানবহস্তের মাটির বাঁধও গড়ে উঠেছে সেই সঙ্গে, ফলে নদীর পাশের সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ড চারদিকের সমতল-ভূমির ওপর মাথা তুলে অনেকখানি উঁচু হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই উঁচু মাটির বাঁধগুলি ভেঙে বর্ষণ-স্ফীত নদীর জল কখনো বা দিগন্ত প্লাবিত করে দিয়েছে, সেই প্লাবনে ঘরবাড়ি ভেসে গেছে, কৃষিভূমি নষ্ট হয়েছে। এমনি করে দৈন্য-দুর্দশার বন্যা ছড়িয়েছে 'দুঃখের নদী' হুয়াং। অপর নদী ইয়াংসিতেও বন্যা আছে সত্য, কিন্তু এই নদীর প্রায় সবটাই নৌ-চালনার যোগ্য, এমন কি অনেক দূর পর্যন্ত অর্ণবপোতও যাতায়াত করে। নদীর শাখা-উপশাখা অনেক, পূর্বাঞ্চলে পলিমাটির জমিকে জলসেক করে অসামান্য উর্বরতা দান করেছে। অগণিত মানুষের পোষণ ভার গ্রহণে সক্ষম, তাই পৃথিবীর সর্বাধিক জন-বসতিপূর্ণ এই অঞ্চল। ইয়াংসি উপত্যকার ঊর্ধ্বাংশে জেচুয়ান প্রদেশের জনাকীর্ণ উর্বর 'লোহিত আধার ভূমি' ("Red Basin"), সেখান থেকে গিরি-কন্দর ভেদ করে নদী নেমে এসে হ্যানকো ও ন্যানকিং-এর পাশ দিয়ে সাংহাইর কাছে সাগরে গিয়ে পড়েছে।

হুয়াং ও ইয়াংসি এই দুই নদীর মধ্যবর্তী স্থানে একটি পর্বতমালা বিরাজ-

মান, ইয়াংসি নদীর দক্ষিণেও পাহাড়ের শ্রেণী। আরও দক্ষিণে সি কিয়াং বা পশ্চিম নদী, এই নদীর অববাহিকায় চীনের একটি প্রধান বন্দর ক্যান্টন অবস্থিত। দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল পর্বত-সংকুল।

চীন দেশের বহিরাঞ্চলে মাঞ্চুরিয়া, মোঙ্গলিয়া, সিংকিয়াং বা চীনা তুর্কীস্থান ও তিব্বত, এই দেশগুলি ছিল চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। বহির্মোঙ্গলিয়া এখন মহাচীনের বাইরে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য। মাঞ্চুরিয়া, অন্তর্মোঙ্গলিয়া, সিংকিয়াং ও তিব্বত এখনও চীন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। বহিরাঞ্চল সমেত সমগ্র চীন রাষ্ট্রকেই আমরা মহাচীন বলেছি, আর সেই মহাচীনের ইতিহাস-কাহিনী আমাদের বর্ণনার বিষয়। একসময়ে কোরিয়া, আনাম ও বর্মাও ছিল চীনের করদ রাজ্য, কিন্তু তা হলেও এই দেশগুলি কখনো চীনা রাষ্ট্র বা মহাচীনের অন্তর্ভুক্ত হয় নি।

মাঞ্চুরিয়া চীন দেশের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত, মাঞ্চু নামে একটি মোঙ্গলিয়ান উপজাতির বাসভূমি, যে মাঞ্চু জাতি চীন জয় করে বৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল। প্রাকৃতিক সম্পদে মাঞ্চুরিয়া সমৃদ্ধ, বনজ সম্পদ, কয়লা ও ধাতুর অভাব নেই, ভূমি অত্যন্ত উর্বর। এই দেশটি ছিল বসতি-বিরল। বিংশ শতাব্দে অসংখ্য চীনার আগমনের দরুন তারাই এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ। গোবি মরুভূমির উত্তরে মোঙ্গলিয়া, দুর্ধর্ষ মোঙ্গল জাতির অভ্যুত্থান হয়েছিল এই দেশে, ত্রয়োদশ শতাব্দে, যারা এখান থেকে এশিয়ার নানা স্থানে এমন কি রাশিয়ারও দক্ষিণাঞ্চলে বিজয়াভিযানে বহির্গত হয়েছিল। মরুভূমির দেশ, ঊনবিংশ শতাব্দেও অধিবাসীরা ছিল অর্ধ-যাযাবর মোঙ্গল, পশু-পালন ছিল জীবিকা। সিংকিয়াং বা চীনা তুর্কীস্থান তিয়েন সান পর্বতের দক্ষিণে, এই অঞ্চলকে চীন রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করেছিল মাঞ্চুরা অষ্টাদশ শতাব্দে। এই অন্তর্ভুক্তি প্রথম নয়, পূর্বেও চীন সামরিক অভিযান পাঠিয়ে সিংকিয়াং জয় করেছিল। সিংকিয়াং-এর অধিকাংশই মরুভূমি, তারিম নদীর উপত্যকা-ভূমিতে মানুষের বাস। এই নদী পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে 'লব নর' নামে একটি জলাভূমির লবণ হ্রদে গিয়ে পড়েছে। সমুদ্রপথ মুক্ত হবার পূর্বে পশ্চিম দেশ থেকে স্থলপথে চীনে যাতায়াতের 'করিডর' ছিল সিংকিয়াং-এর তারিম নদীর এই উপত্যকা। কত যাত্রী, পরিব্রাজক, ব্যবসায়ী দলের আনাগোনা চলেছে, কত জাতির সংমিশ্রণ ঘটেছে অন্তহীন পরিক্রমার

মাঝ-পথে এই সংকীর্ণ বিরাম-ক্ষেত্রে, আমরা তা কল্পনা করতে পারি। পরিশেষে তিব্বত, এই দেশটি পৃথিবীর শীর্ষদেশের মালভূমি, তিন-চতুর্থাংশ দশ হাজার ফুটেরও বেশি উঁচু। দক্ষিণে হিমালয়ের অভ্রংলিহ্ পর্বতশ্রেণী, সেই প্রস্তর-প্রাচীর ভেদ করে বয়ে গেছে ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা, সিন্ধু, শতদ্রুর ধারা। পশ্চিমে পামির ও কারাকোরাম পর্বত।

এই তো মোটামুটি মহাচীনের ভৌগোলিক বিবরণ। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দে চীনে নানা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু ভূগোলের ওপর কালের আঁচড় পড়েছে সামান্যই, আর সেই ভূগোলের প্রকৃতিই ইতিহাসের উষাক্ষণ থেকে এখানকার অধিবাসীদের জীবনকে প্রভাবিত করেছে, অবশ্য আংশিকরূপে, সমগ্রভাবে নয়। মানব-সভ্যতার উন্মেষ ও বিবৃদ্ধিকে বিশেষ সাহায্য করেছে ভূগোল-প্রকৃতির দাক্ষিণ্য, যেমন হুয়াং-এর এঁটেল মাটির মসৃণ উর্বরতা, তেমনি ইয়াংসি নদী ও তার শাখা-উপশাখার বারি সিঞ্চনে শ্যামল ভূমির অফুরন্ত শস্যসম্পদ। সভ্যতার জন্ম নদী উপত্যকায়, শৈশবও হয়তো কেটেছে সেখানে, কিন্তু সেই জন্ম ও শৈশবাবস্থার কথা কালের 'স্থূল হস্তাবলেপন' একেবারেই মুছে দিয়ে গেছে, সেই স্মৃতির পুনরুদ্ধারের ভরসা এখন প্রত্নতত্ত্বের আবিষ্কার ও গবেষণা। অতীতের ঘনান্ধকারে প্রবেশ করবার অবতরণিকা প্রত্নতত্ত্ব, সেখানকার তমসাচ্ছন্ন গহ্বর থেকে নানা তথ্য, প্রাচীন সামাজিক জীবনের নানা উপকরণ স্ফুট দিবালোকে এনে তুলে ধরে প্রত্নতত্ত্বের সন্ধান। প্রত্নতত্ত্ব নীল, ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিস ও সিন্ধু সংস্কৃতির অপূর্ব রূপ চমৎকারভাবে পরিব্যক্ত করেছে, কিন্তু এই তিন উপত্যকায় বহুমূল্য আবিষ্কারের তুলনায় এ যাবৎ চীন দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক অবদান অকিঞ্চিৎকর। খনন-কার্য শুধু মাঞ্চুরিয়া ও হোনান প্রদেশেই করা হয়েছে, এই সংকীর্ণ সীমার বাইরে প্রত্নতত্ত্বের সন্ধান এখনো বিস্তার লাভ করে নি। খোঁড়াখুঁড়ির ফলে প্রস্তরযুগীয় সংস্কৃতির কিছু-কিছু উপকরণ আবিষ্কৃত হয়েছে। হুয়াং বা পীত নদী অঞ্চলে প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল জগতের এই চতুর্থ নদী উপত্যকা সংস্কৃতির, কিন্তু উদ্ভব হয়েছিল সম্ভবত চীনের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের তারিম উপত্যকায়। কুয়েন লুঙ পর্বত অতিক্রম করে অধিত্যকা ধরে পীত নদীর তীরে ছড়িয়ে পড়েছিল এই সংস্কৃতি। তারিম উপত্যকা থেকে নব আগন্তুকের দল এসে আদিবাসীদের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল, তারই ফলে হয়তো

বা পীত নদী সভ্যতার আবির্ভাব। আর একটি সম্ভাবনার কথা এখানে বাদ দেওয়া চলে না। এমন ব্যাপারও কিছু অসম্ভব নয় যে, স্থানীয় কোন আদিবাসীগোষ্ঠী অপূর্ব মেধাশক্তির বলে অপরাপর জাতির চেয়ে উন্নততর সাংস্কৃতিক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল, এবং তারাই হয়েছিল এই সভ্যতার পুরোধা। সে যাই হোক, প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণের অভাবে এ সম্বন্ধে কোন কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

হোনান ও মাঞ্চুরিয়ার খনন-কার্যে দেখা যায় উত্তর চীনে যে-জাতীয় মানুষ এখন বসবাস করছে, প্রস্তরযুগেও সে স্থান অনেকটা তাদেরই আকৃতিবিশিষ্ট মনুষ্যজাতির আবাসভূমি ছিল। তারা ছিল গ্রামবাসী, শূকর প্রভৃতি পশু গৃহপালিত করেছিল। প্রস্তরনির্মিত লম্বা চতুষ্কোণ ছুরি, তীরের ফলক, কুঠার ও নানাবিধ অস্থি-প্রহরণ ব্যবহার করত। বয়ন ও মৃৎপাত্র নির্মাণ-পদ্ধতিও তাদের অজানা ছিল না। সুমের দেশে (মেসোপটেমিয়ায়) সাংস্কৃতিক অভ্যুদয়ের প্রাক্কালে নির্মিত কতগুলি প্রস্তরমূর্তির তেরছা চোখ লক্ষ্য করে অনুমান করা হয়েছে যে চীনা ও সুমেরীয়রা ছিল একই মোঙ্গলীয় জাতির মানুষ, কিন্তু ঐতিহাসিক কিং তাঁর 'সুমের ও আককাডের ইতিহাস' গ্রন্থে সুমের ও চীনের মধ্যে এইজাতীয় সংযোগের ইঙ্গিত গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি।* চীনা সভ্যতার সঙ্গে সুমেরীয় সভ্যতার নানাবিধ সাদৃশ্যের বিষয় উল্লেখ করে কোন কোন মনীষী এরূপ কথাও বলেছেন যে, চীনা সভ্যতার উৎপত্তি-স্থান সুমের দেশ। কতগুলি চিত্রিত মৃৎপাত্রের আকার ও নমুনা মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার এবং পূর্ব ইউরোপের নব-প্রস্তরযুগীয় মৃৎ-শিল্পের মত। তাই থেকে মনে হয়, ওসব দেশের সঙ্গেও সাংস্কৃতিক সংযোগ থাকা বিচিত্র নয়। তবে এ কথাও স্মরণ রাখা দরকার

* "The obliquely set eyes of the figures in the earlier (Sumerian) reliefs, due mainly to an ignorance of perspective characteristic of all primitive art, first suggested the theory that the Sumerians were of Mongol type ; and the further development of this view, according to which a Chinese origin is to be sought both for Sumerian roots and for the cuneiform character, are too improbable to need further refutation." (*History of Sumer and Akkad* by L. W. King—p. 54)

যে, নব-প্রস্তরযুগের অভ্যুত্থান হয়েছিল পৃথিবীর অনেক স্থলেই, আর ইউফ্রেটিস ও তারিম নদী উপত্যকাদ্বয়ের মধ্যে রয়েছে দুর্লঙ্ঘ্য পর্বতশ্রেণী ও দুস্তর মরুভূমি, যার জন্য বাইরে থেকে এখানে বিস্তৃতভাবে জনসমাগমের (migration) পক্ষে সমূহ বাধা ছিল। চীনা পুরাণ-ইতিহাসের কথা বিশ্বাস করলে দেখা যায়, নানান ভৌগোলিক বাধা অতিক্রম করে হুয়াং তি'র রাজত্বকালে (খৃঃ পূঃ ২৬৯৭-২৫৯৫) উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে নব আগন্তুকদের আগমন এবং সেই সঙ্গে আদিবাসীদের সঙ্গে তাদের যুদ্ধও ঘটেছিল। সে যাই হোক, আগন্তুকের দল মূলত ছিল মোঙ্গলীয় জাতি, এবং চীন দেশে কালক্রমে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তাও মোঙ্গলীয় সভ্যতা। সম্ভবত উত্তর দিক থেকে নব-আগত জাতিসমূহ দক্ষিণ দেশীয় একটি নূতন সংস্কৃতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেই সংস্কৃতির সঙ্গে হাত মিলিয়ে দিয়েছিল। চীনের বিগত চার হাজার বছরের ইতিহাসে সেখানকার আদিম মোঙ্গলীয় জাতির সঙ্গে তিব্বতী, তাতার, জাপানী, সান প্রভৃতি নানা উপজাতির সংমিশ্রণ ঘটেছিল, যার ফলে চীনা মুখাকৃতি তার বর্তমান আদল গ্রহণ করেছে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তেমনি খৃঃ পূঃ ২০০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে চীনের ইতিহাসে যে সভ্যতার আবির্ভাব দেখা যায়, তার জন্ম হয়েছিল উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের দুইটি বিভিন্ন সংস্কৃতির দীর্ঘকালব্যাপী সংঘাত, সংমিশ্রণ ও পরস্পর আদানপ্রদানের ফলে। হয়তো বা দক্ষিণ দেশীয় সংস্কৃতিই প্রাচীনতর ও অধিকতর উন্নত, এবং উত্তর দেশের ওপর সেই সংস্কৃতির প্রভাব সেমেটিক সংস্কৃতির ওপর সুমেরীয় সভ্যতার অথবা আর্য-ভারতের ওপর সিন্ধু সভ্যতার প্রভাবেরই অনুরূপ।

চীন দেশে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের অভাব কিছু-কিছু পূরণ করেছে অতি-প্রাচীন কালের ঐতিহ্য যা শুধু জনশ্রুতি নয়, সুপ্রাচীন যুগ থেকেই লিখিত আকারে বিদ্যমান। চীনা লেখা পুরোপুরি 'হায়রোগ্লাইফিক' (hieroglyphic) বা চিত্রলেখা। কিন্তু এই হায়রোগ্লাইফিকই পীত-উপত্যকার সর্ব-প্রাচীন লেখন নয়। এখানে আদিকালের লেখা ছিল, রজ্জুতে গ্রন্থি দিয়ে লিখন—পেরু দেশে যাকে বলা হত 'কুইপু' (Quipus)। চীন দেশের একটি কিংবদন্তী রজ্জুতে গ্রন্থি বা গেরো দিয়ে লেখার বিষয় উল্লেখ করে। পেরুতে দেখা গেছে নানান রঙের কাপড় গেরো দিয়ে রাখা হত, আর সেই বিভিন্ন

বর্ণের কাপড়গুলির ক্রমপর্যায় ও গ্রন্থির সংখ্যা পরীক্ষা করে হিসাবের অঙ্ক অথবা অন্য কোন অর্থ উদ্ধার করার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। সম্ভবত চীন দেশেও ছিল তেমনি কোন ব্যবস্থা। তারপর পশুপক্ষীর পদচিহ্ন আর কচ্ছপের পৃষ্ঠের ওপর দাগগুলি লক্ষ্য করেই চিত্রলেখার সূত্রপাত হয়েছিল এরূপ কিংবদন্তী আছে। প্রাচীন মিশরে দেখা যায়, হায়রোগ্লাইফিক বা চিত্র-লেখা ধ্বনিব্যঞ্জক (phonetic) হয়ে উঠেছিল এবং সেই সঙ্গে আক্ষরিক রূপ (alphabetic form) ধারণ করেছিল—তারপর সেখানে 'হাইরেটিক' ও 'ডিমোটিক' নামে আরও দুটি পদ্ধতির আবির্ভাব হয়েছিল। চীন দেশে কিন্তু লিখনের বিবর্তন ঘটেছিল একটি স্বতন্ত্র ধারায়। এখানে 'পিকটোগ্রাম' (pictogram) বা চিত্ররূপের পরিণতি হয়েছিল 'আইডিওগ্রাম' (ideo-gram) বা ভাবরূপে আর সেই ভাবরূপই 'ফনোগ্রাম' (phonogram) বা বিভিন্ন অর্থবাচক শব্দরূপে পরিবর্তিত হয়েছিল। ছবি এঁকে বিষয়বস্তুকে বুঝিয়ে দেওয়ার পদ্ধতি নানান জাতির মধ্যে দীর্ঘকাল ধরেই প্রচলিত। আমেরিকার ইণ্ডিয়ানরা পাহাড়ের গায়ে চিত্রলেখন অঙ্কিত করেছে, তার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। লেক সুপিরিয়ারের তীরে একটি ছবি দেখা যায়, সেটি পাঁচখানি নৌকার অভিযান। প্রত্যেকটিতে যাত্রী ছিল কয়জন তা দেখানো হয়েছে কতগুলি দাগ কেটে। একটি পক্ষী দেখা যায়, সে ঐ দলের নেতা, পক্ষীর (kingfisher) নামেই হয়তো তার নাম। একটি খিলানের নিচে তিনটি গোলকের চিত্র—খিলানটি আকাশ, তার নিচে গোলক তিনটি সূর্য, অর্থাৎ তিন দিন। তারপর তীরে রয়েছে একটি কচ্ছপ, জল থেকে তীরে ওঠার চিহ্ন। এই ছবি দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না যে জনৈক নেতা পাঁচটি নৌকায় যাত্রী নিয়ে অভিযানে বেরিয়েছিলেন এবং তিন দিন পর নিরাপদে তীরে উঠেছিলেন। এই চিত্রলেখনই হায়রোগ্লাইফিকের প্রথম ধাপ। লেখাটিকে 'পিকটোগ্রাফ' বলা হয়। এরকম পিকটোগ্রাফ যে আধুনিক কালে দেখা যায় না, তা নয়। রেলের টাইম টেবলে যে স্টেশনের নামের সঙ্গে ছুরি-কাঁটার ছবি রয়েছে, বুঝতে হয় সেখানেই ভোজনাগার আছে। ছবিটি এখানে সংকেত বা চিহ্ন, বোঝায় হোটেলকে।

পিকটোগ্রাফের পরের ধাপ আইডিওগ্রাফ। কতগুলি ভাব এমনি জটিল যে তা সহজে ছবি এঁকে বোঝানো কঠিন। তখন সেই ভাবটিকে ছবি

এঁকে বোঝাতে হলে আগে থেকে নির্দেশ দেওয়া দরকার কোন ছবির অর্থ কি বুঝতে হবে। ছবিতে যে জিনিস আঁকা হয়েছে সেই জিনিস না বুঝিয়ে ছবি বোঝায় কোন পূর্বনির্দিষ্ট ভাবকে—যেমন সিংহের সম্মুখভাগ আঁকলে বুঝতে হবে প্রভুত্ব, বোলতা রাজবংশের আর ব্যাঙাচি সংখ্যার ব্যঞ্জনা। কোন বিশেষ ভাব প্রকাশ করতে হলে পূর্বপরিকল্পনামত একটি ছবির সঙ্গে আর একটি ছবি জুড়ে দেবার বিধান আছে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক এখানে। চীনা হায়রোগ্লাইফিকে মুখবিবর যে ছাঁদে আঁকা হয় তা গোল নয়, চতুষ্কোণ—দেখলে মনেই হয় না ওটি কোন মুখের ছবি। কিন্তু সেটি মুখেরই পিকটোগ্রাফ, মুখকেই বোঝায়। মুখ-নিঃসৃত বাক্য বোঝাতে হলে, মুখের ছবির সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে বাষ্পের চিহ্ন, আর বক্তৃতা বোঝাতে হলে মুখ ও বাষ্পের চিহ্নের সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে একটি জিহ্বার ছবি। লেখাটি এখন আর পিকটোগ্রাফ নেই, আইডিওগ্রাফে পরিণত হয়েছে। ছবি বা ছবিসমূহের সমাবেশ যখন কোন পূর্বনির্দিষ্ট ভাবকে বুঝিয়ে দেয়, তখন সেটিকে বলা হয় আইডিওগ্রাফ। হায়রোগ্লাইফিকের শেষ পর্যায় ফনোগ্রাম। একই শব্দ অনেক সময় বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে—যেমন চীনা শব্দ ফ্যাং বলতে বোঝায় নৌকা, স্থান, বয়ন, সুগন্ধ ইত্যাদি। তখন নৌকার ছবি এঁকে নৌকাটি বোঝানো গেলেও অন্য অর্থগুলি তো আর একমাত্র নৌকার চিত্রটি অঙ্কিত করে বোঝানো চলে না। এমন অবস্থায় চীনারা ব্যবস্থা করেছে এইরূপ : কোন একটি ছবি ফ্যাং শব্দটি বোঝায় এবং তার সঙ্গে কোন নির্দেশক (determinative) চিহ্ন জুড়ে দেওয়া হয়, যা থেকে বিশেষ বস্তুটি বোঝায়। যেমন নৌকার ছবির সঙ্গে পৃথিবীর ছবি যুক্ত করে দিলে অর্থ, স্থান। নৌকার সঙ্গে রেশম চিত্রিত করলে অর্থ, বয়ন। নৌকার সঙ্গে বাক্যের চিহ্ন আঁকলে অর্থ, জিজ্ঞাসা—ইত্যাদি। মোটামুটি এই হল চিত্রলেখন বা হায়রোগ্লাইফিক, যার প্রথম আবির্ভাব মিশর দেশে ঘটলেও পূর্ণ পরিণতির রূপ ধারণ করেছিল চীন দেশে।

সুমের দেশে লিখনের বাহন ছিল কাদামাটির চাকতি, তেমনি প্রাচীন কালে চীন দেশে গ্রন্থ লেখা হত কাষ্ঠফলক বা চেরা বাঁশের ওপর, বাঁশের কলম রঙে ডুবিয়ে অক্ষরগুলি চিহ্নিত করা হত। এই ধরনের গ্রন্থ রাশি

রাশি বাঁশ ও কাঠের স্তূপে পর্বতাকার হয়ে উঠত, এবং সেগুলির নিরাপদ রক্ষণ হত একটি বিড়ম্বনা বিশেষ। কিন্তু এই পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটল যখন খৃস্ট পূর্ব তৃতীয় শতকে উষ্ট্রলোমের ব্রাশের আবির্ভাবের সঙ্গে লেখা শুরু হল রেশমের কাপড়ের ওপর। তারপর খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দে কাগজ প্রস্তুত আরম্ভ হল। লিখনের রূপ আমূল বদলে গেল, প্রাচীন লিপি (Ancient script) লুপ্ত হল, সে স্থলে নূতন লিপি (Modern script) দেখা দিল। রেশম ও কাগজের ওপর তুলির রং বুলিয়ে অক্ষরচিহ্নের অঙ্কন লিখন-পদ্ধতির একটি যুগান্তকর পরিবর্তন। লিখন-শিল্পের (calligraphy) বিকাশ সম্ভব হয়েছিল যখন তুলির স্পর্শে সূক্ষ্ম ও স্থূল রেখাগুলির বিন্যাস চিত্রাঙ্কনের অনবদ্য সৌষ্ঠব ফুটিয়ে তুলেছিল অক্ষরের রূপায়ণে, আর তখনই লিখন ও চিত্র একই শিল্প-তরুর দুটি পুষ্পিত শাখার মত সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতায় অপরূপ হয়ে উঠেছিল।

২. 'সু-কিং' বা 'ইতিহাস গ্রন্থ'*

চীন দেশে যেমন ইতিহাসের সমাদর অতি অল্প দেশেই তেমন দেখা গেছে। যাবতীয় উল্লেখযোগ্য তারিখ ও ঘটনার বিবরণ ও মহাপুরুষদের উক্তি চীনা ঐতিহাসিক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিপিবদ্ধ করেছেন। ৫০০ খৃস্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত প্রাক-কনফুসীয় যুগের সকল ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত সু-কিং বা 'ইতিহাস গ্রন্থ' নামে একখানা পুঁথিতে লেখা রয়েছে। প্রাচীন কাহিনীর সংকলন এই গ্রন্থ, কনফুসিয়াসের রচনা বলেই খ্যাত। গ্রন্থখানি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, পুনরুদ্ধার করেন কনফুসিয়াসের একজন বংশধর দ্বিতীয় খৃস্ট পূর্বাব্দে। অলৌকিক

* এই গ্রন্থটি 'পুরানো অক্ষরে' (Ancient script) লেখা। পুরানো অক্ষরে লিখিত বইগুলি নিয়ে অনেক বাগ্-বিতণ্ডা হয়েছে, নূতন আক্ষরিকেরা পুরানো অক্ষরে লেখা গ্রন্থগুলিকে জাল বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন। 'সু-কিং' গ্রন্থের ওপরও আক্রমণ কম হয় নি। এখানা কনফুসিয়াসের লেখা বই নয়, এই কথা বলেছেন সপ্তদশ শতাব্দে ইয়েন জো-চু এবং হুই তুই। পরিশেষে ১৮৯৮ সালে সুবিখ্যাত পণ্ডিত ক্যাং ইউ-ওয়েই বইখানিকে কনফুসিয়াসেরই একটি জাল রচনা বলে ঘোষণা করলেন। সে যাই হোক, গ্রন্থটির মৌলিক গুরুত্ব যথেষ্ট, অনেক প্রাচীন গ্রন্থেও এই গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি পাওয়া যায়।

পৌরাণিক বৃত্তান্তও কিছু-কিছু স্থান পেয়েছে এই রচনায়; তার ওপর যখন দেখা যায় যে গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য 'প্রাচীন স্বর্ণযুগে'র প্রশস্তি কীর্তন তখন এটির ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এসব ত্রুটি সত্ত্বেও ইতিহাস হিসাবে বইখানা যে অতুলনীয় তা অনস্বীকার্য। আর একখানা প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থ জুমা-চিয়েন প্রণীত 'সি চি'। চীনা সংস্কৃতির উৎপত্তি-কাল থেকে ১০০ খৃস্ট পূর্বাব্দ পর্যন্ত শাসকদের বংশ-পঞ্জী, শাসনের ফলাফল, মুদ্রা, ভূমিস্বত্ব, গার্হস্থ্য জীবন, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ে অনেক তথ্যই পাওয়া যায় এই গ্রন্থে। এ কথা সত্য যে ইতিহাস গ্রন্থে সম্রাটদের গুণ বর্ণনায় বেশ একটু অতিশয়োক্তি আছে। বর্ণনাগুলি পাঠ করে আমাদের এরূপ ভাবও মনে জাগে, জন-জীবনের সর্বপ্রকার ভালমন্দ অবস্থার মধ্যে রাজশক্তির সর্বময় কর্তৃত্বই যেন প্রতিফলিত রয়েছে, যেন রাজার আদেশ পালন প্রজার প্রধান কর্তব্য, আর সেই কর্তব্য-পথে অবিচলিতভাবে অগ্রসর হবার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার ভেতর গণতান্ত্রিক চিন্তা বা স্বতঃস্ফূর্ত কর্মের অবসর নেই বললেই হয়। কিন্তু আধুনিক বিশ্লেষণমূলক বিচারবুদ্ধি দিয়ে সুপ্রাচীন কাহিনীগুলি, চাই কি সর্বকালের চৈনিক ইতিহাস ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে যাচাই করলে দেখা যায় যে, চীন দেশে প্রজার ওপর রাজার অধিকার যতখানি তার চেয়ে ঢের বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল রাজশক্তির ওপর গণশক্তি। রাজন্যবর্গের ক্রিয়াকর্মের ওপর নজর না দিয়ে, সে স্থলে এখন সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে চীনা ইতিহাসের নব-ভাষ্য রচনার প্রয়োজন অনেকে অনুভব করেছেন। বিশেষ মনে রাখা দরকার যে কনফুসীয় নীতি-ধর্মের সঙ্গে সু-কিং গ্রন্থের সম্পর্ক খুবই নিকট—যেমন হিন্দুধর্মের সঙ্গে উপনিষদ—আর সেই জন্যই 'ইতিহাস গ্রন্থ' শুধু একটি ইতিহাস মাত্রই নয়। এই গ্রন্থটিতে অনেক গভীর নীতি-তত্ত্ব, প্রজ্ঞার কথাও আছে, যার উৎস-মুখ থেকে কালক্রমে কনফুসীয় চিন্তাধারা প্রবাহিত হয়েছিল।

পুরাণ-কাহিনী

প্রথম চৈনিক সম্রাটের রাজত্বকাল খৃঃ পূঃ ২৮৫২ অব্দে শুরু হয়েছিল। কিন্তু তারও পূর্বে সম্রাটদের রাজত্বের সূচনা বা মুখবন্ধ স্বরূপ সৃষ্টিতত্ত্বের

একটি পুরাণ-কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনায় সৃষ্টিকাল সম্বন্ধে অনেক আজগুবি ধারণার কথা বলা হয়েছে—যেমন, "(বিশ্ব) সৃষ্টি থেকে আরম্ভ করে কনফুসিয়াসের আমলের 'লিন'-দখল (capture of lin) পর্যন্ত মোট দুই কোটি বাইশ লক্ষ সাতাশ হাজার বৎসর অতিবাহিত হয়েছিল।" এই প্রসঙ্গে মায়ার্স (Myers) বলেছেন, "কল্পনাবিলাসী প্রাচীন লেখকেরা প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে যেসব বর্ণনা দিয়েছেন তার ওপর চীনা লেখকরাও বিশেষ আস্থা স্থাপন করেন নি।" সে যেমন হোক, ইতিহাসের অগণিত বংশ-বিবরণীর মধ্যে চীনার কর্মমুখী চিত্তও পরিশেষে সৃষ্টির প্রদোষক্ষণে সৃষ্টিকর্তা পান-কু'র (P'an-ku) দ্বারেই গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল।

আমাদের শাস্ত্রে যেমন বৈবস্বত মনু, চীনা সৃষ্টিতত্ত্বে মনুর স্থান পান-কু অধিকার করেছিলেন। বিশ্ব-প্রকৃতির আদিম বিশৃঙ্খলার মধ্যে তিনিই স্বয়ম্ভু সৃষ্টিকর্তা, যিনি ১৮০০০ বছর ধরে আকাশ ও পৃথিবীকে নির্মাণ করেছেন। এই চীনা সৃষ্টি-দেবতার সঙ্গে পারসীক 'যিম' (Yima) এবং ব্যাবিলোনীয় 'তিয়ামৎ' (Tiamat) প্রভৃতির তুলনা করেছেন কোন কোন সুধী ব্যক্তি। অনন্ত শূন্যের গর্ভে পান-কু'র জন্মবৃত্তান্ত মানুষের অপরিজ্ঞাত। আদিম প্রকৃতির বিশৃঙ্খল শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন তিনি। ওয়েলস্ উইলিয়মস্ তাঁর *The Middle Kingdom* নামক গ্রন্থে পান-কু কর্তৃক পৃথিবী সৃষ্টির যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন তারই সংক্ষিপ্ত মর্মানুবাদ দেওয়া হল এখানে: অনন্ত শূন্যে বিরাট পাথরের স্তূপ ভেসে বেড়ায়। ছেনি বাটুল হস্তে পান-কু সেই প্রস্তরখণ্ডগুলিকে নিপুণ ভাস্করের মতই খোদাই করে রূপ দান করেছেন। তাঁর শিল্প-সৃষ্টির ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমণ্ডলী। দক্ষিণ পার্শ্বে তাঁরই কর্মসহচর ড্রাগন, ফিনিক্স্, কচ্ছপ প্রভৃতি দণ্ডায়মান। তারাই জীবজন্তুর আদিপুরুষ, মানবজাতির আদিপুরুষ যেমন পান-কু স্বয়ং। তাঁরই মত এদেরও জন্ম রহস্যাবৃত। আকাশ ও পৃথিবী যেমন রূপায়িত হতে লাগল, পান-কুও সেই সঙ্গে প্রতি দিন দৈর্ঘ্যে ছয় ফুট করে বৃদ্ধিলাভ করছিলেন। পরিশেষে তাঁর যখন মৃত্যু হল তখন তাঁর মস্তক পর্বতমালায়, নিশ্বাস-প্রশ্বাস বায়ু ও মেঘে, কণ্ঠস্বর বজ্রে পরিণত হল। তাঁর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, ধমনী, মাংস, অস্থিমজ্জা, শ্মশ্রু, কেশ, চর্ম, দন্ত প্রভৃতি নানা প্রাকৃতিক বস্তুর রূপ ধারণ করল,—যেমন চারটি দিগন্তের খুঁটি (poles), স্রোতস্বিনী নদী,

ভূপৃষ্ঠ, ভূমি, নক্ষত্র, উদ্ভিদ, বৃক্ষ, ধাতু, পাহাড় ও মূল্যবান পাথর। তাঁর স্বেদবিন্দুগুলি বৃষ্টিধারারূপে ঝরে পড়ল, আর যেসব কীট ছিল তাঁর দেহে লগ্ন হয়ে, তারাই মানব-জাতিতে রূপান্তরিত হয়েছিল।

সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে 'মিথ' রচিত হয়েছিল মিশর ও ব্যাবিলোনিয়ায় যেমন, চীন দেশেও তেমনই, উপরোক্ত উদাহরণ থেকে তা স্পষ্টই বোঝা যায়। এইসব 'মিথ'-এর মধ্যে সাদৃশ্য আছে, আবার প্রভেদও দেখা যায় যথেষ্ট। যে কারণে 'মিথ'-এর সৃষ্টি হয়েছিল তার বিস্তারিত আলোচনা না করে শুধু এই কথা বলাই বোধ করি যথেষ্ট যে বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে জাতির অবস্থান হেতু সামাজিক ও মানসিক অবস্থার প্রভেদগুলিই 'মিথ'কে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য দান করেছে। এখানকার একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, নানারূপ বিপর্যয় সত্ত্বেও চীনা সভ্যতার ধারা যেমন কখনও ভঙ্গ হয় নি, তেমনি 'মিথ'-এর যুগ থেকে ইতিহাসের ক্ষেত্রে অবতরণ এমন স্বচ্ছন্দগতিতে ঘটেছে যে, কল্পনা ও বাস্তব এই দুই জগতের মধ্যকার ব্যবধানটিতে ধারাবাহিকতা বা পারম্পর্য অক্ষুণ্ণই রয়ে গেছে। এই অবতরণিকার এক একটি ধাপ স্বরূপ পান-কু'র উত্তরবর্তী কালকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। খণ্ডিত তিনটি যুগের শাসনকর্তা যথাক্রমে তিন শ্রেণীর রাজন্যবৃন্দ—অর্থাৎ সর্বপ্রথম রাজত্ব করেছিলেন 'তিয়েন হুয়াং' বা 'স্বর্গ-সম্রাটগণ' (Heaven Emperors); তারপর 'তি হুয়াং' বা 'পৃথ্বী-সম্রাটগণ' (Earth Emperors); সর্বশেষে 'জেন-হুয়াং' বা 'মানব-সম্রাটগণ' (Man Emperors)। প্রত্যেকটি খণ্ডযুগ ১৮০০০ বছর ব্যাপী। স্বর্গ-সম্রাটেরা ছিলেন ভীষণাকৃতি, সর্পের মত তাঁদের দেহ (a monstrous brood with serpent bodies)। পৃথ্বী-সম্রাটেরা ছিলেন কালকৃৎ, রাত্রি-দিনের বিভাগ তাঁরাই করেছিলেন—কালিদাসের ভাষায়, 'যো দ্বৌ কালৌ বিধত্তে'। তাঁদেরও দেহ ছিল বিকট—ড্রাগন, অশ্ব, সর্প ও মানুষের খণ্ডিত অবয়বগুলিকে একত্র সংযুক্ত করে তাঁদের শরীর গঠিত হয়েছে। পান, আহার, নিদ্রা প্রভৃতি শরীর-রক্ষা ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল তাঁদেরই রাজত্বকালে। তৃতীয় পর্যায়ের 'মানব-সম্রাট'দের মুখ ছিল মানুষের, আর দেহটি ড্রাগনের। ভূমণ্ডলকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে তাঁদের এক একটি ভ্রাতা এক একটি দেশের অধিপতি হয়েছিলেন। এই 'মিথ'টির ঐতিহাসিক কোন মূল্য নেই সত্য, কিন্তু চীনা কল্পনা সেই

অতি-প্রাচীন কালেও বিবর্তনের যে চিত্রটি এঁকে দিয়েছিলেন, তাই থেকে চিন্তা-জগতে গতিপ্রবণ মানসিকতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই চিত্রে অন্তত সত্যযুগের স্বর্ণ-পৃথিবীকে কলিযুগের অন্ধকূপে নিমজ্জিত হতে দেখা যায় না।

উপরোক্ত তিনটি কাল-বিভাগকে বলা হয় তিনটি মহা-যুগ (The Three August Periods)। তারপর আরও দশটি যুগের কল্পনা করা হয়েছে সাংস্কৃতিক বিবর্তনের পারম্পর্যকে ফুটিয়ে তুলবার জন্য। মানুষের অগ্রগতির পরিচয় এই বিবরণগুলির মধ্যে যথেষ্ট পাওয়া যায়। জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য যেসব নব-নব আবিষ্কার করা হয়েছিল তারও বর্ণনা রয়েছে। মানুষ বৃক্ষাবাস ও ভূগর্ভস্থ বিবর ছেড়ে গৃহনির্মাণ আরম্ভ করেছিল। গৃহ-নির্মাণের কারিগরি শিক্ষা তাদের দিয়েছিলেন য়ু চাও। নামটির অর্থ 'নীড়-বাসী'—য়ু চাও তাঁর নাম-মাহাত্ম্যের ঊর্ধ্বেই উঠেছিলেন, মানুষকে বৃক্ষনীড় পরিত্যাগ করতে শিক্ষা দিয়ে। গুহাবাসী মানবের আদিম অবস্থার মধ্যে এখনও দেখা যায় বহু মানুষকে পীত নদী উপত্যকার পর্বতগুহায় বসবাস করতে। অন্য একজন প্রসিদ্ধ আবিষ্কারক সুই জেন। নামটির অর্থ, 'অগ্নি উৎপাদক'। তিনি কাষ্ঠ ঘর্ষণ করে অগ্নি উৎপাদন করেছিলেন। গ্রীকদের পুরাণ-কথায় বর্ণিত হয়েছে, প্রমিথিউস (Prometheus) কিরূপে স্বর্গ থেকে অগ্নি এনেছিলেন পৃথিবীতে। সেই অগ্নিকে অনেকে জ্ঞানের আলো বলেই কল্পনা করে থাকেন। সুই জেন-এর নাম দেওয়া হয়েছে 'চীনা প্রমিথিউস'। প্রকৃতপক্ষে প্রমিথিউসের মত দেবরোষে পড়েন নি তিনি, দেবতারা তাঁকে আবদ্ধও করেন নি। গ্রীক পুরাণতত্ত্বের বিচিত্র কল্পনা চীনা কাহিনীটিতে দেখা যায় না, বরঞ্চ সে স্থানে আধুনিক নৃতাত্ত্বিকের রূপ-রসহীন বাস্তব বর্ণনারই সাক্ষাৎ মেলে। এবং সেজন্য অগ্নি-উৎপাদক অরণি-কাষ্ঠের আবিষ্কারক সুই জেনকে চীনা বিজ্ঞানের আদিগুরু বলে ধরে নিয়ে তাঁর তুলনা ফ্যারাডে বা মার্কনির সঙ্গে করাই সংগত। তার পর রন্ধনবিদ্যার আবির্ভাব। বলা হয়েছে, নৃত্যবিদ্যার চর্চা আরম্ভ হয়েছিল দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে, আমোদপ্রমোদের জন্য নয়। অবশ্য নৃত্যবিদ্যার এইরূপ ভাষ্য করা হয়েছে কনফুসীয় নীতিবাদের মুখরক্ষার জন্য, সে কথা বোঝা কঠিন নয়। সর্বশেষে দেখতে পাই আমরা একটি বিশেষ প্রথার প্রবর্তনের উল্লেখ, সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্ধারণের প্রথা, "স্বর্গীয় বিধানের সঙ্গে যে প্রথার বিশেষ

সংগতি রক্ষা করা হয়েছে" ("The virtue of handing over the throne to a successor, which stands in relation with the principles of Heaven.")। সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্ধারণের এই নীতি সব ক্ষেত্রে বংশানুক্রমে রাজপদ লাভের সমর্থন করে নি।

"পঞ্চশাসক"

পাহাড় থেকে রেলগাড়ি যেমন নানান পাকচক্রে ঘুরতে-ঘুরতে সমতল-ভূমিতে গড়িয়ে নেমে আসে, ঠিক তেমনিভাবেই 'ইতিহাস গ্রন্থ' কাল্পনিক 'মিথ'গুলির তুঙ্গ কুহেলী-লোক পরিত্যাগ করে ধীরে-ধীরে বাস্তব ক্ষেত্রে পাঠককে নিয়ে হাজির করেছে। 'মিথ'-এর কাল্পনিক যুগের শেষে আমরা 'পঞ্চশাসক'-এর বিবরণ পাই। মিশরের মেনেস ও প্রথম বংশীয় রাজন্যবর্গের মতই এই পাঁচটি শাসককে নিয়ে চীনা ইতিহাসের সূত্রপাত বা গোড়াপত্তন হয়েছে। কিন্তু ইতিহাসের সমতল ক্ষেত্রেও কল্পনার ছোট ছোট ঢিবি দেখা যায় না, এমন নয়। প্রথম শাসক ছিলেন ফু সি, রাজত্বকাল খৃঃ পূঃ ২৮৫২-২৭৩৮। বর্ণনায় দেখা যায়, তাঁর জন্ম অলৌকিক, দেহের নিম্নভাগ ড্রাগনের আঁশ-ভরা চর্মে আচ্ছাদিত। তাঁর মন্ত্রী ছিলেন ছয়জন ড্রাগন। এরূপ অনৈসর্গিক বিবরণ সত্ত্বেও তাঁর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাগুলির বর্ণনায় কোনরূপ কল্পনার খেলা দেখা যায় না। তিনি ছয়টি বোর্ড বা মন্ত্রণা-বিভাগ (cabinet departments) সৃষ্টি করেছিলেন। চীন দেশে এমনিধারা বোর্ডের শাসন সেদিন পর্যন্তও চলে এসেছে। চিত্র-লিখন, পঞ্জিকা এবং পঁয়ত্রিশটি তন্ত্রীযুক্ত বীণার আবিষ্কর্তা এই প্রথম শাসক ফু সি। তাঁরই সময়ে পেরু দেশের মত নানান রঙের কাপড়ে গ্রন্থি দিয়ে সংখ্যা গণনা (Quipus) ছেড়ে চিত্রলেখা বা হায়রোগ্লাইফিক আরম্ভ হয়েছিল। অশ্ব, কুকুর, বৃষ, মেষ, শূকর ও মুরগি, এই ছয়টি জীবকে গৃহপালিত করেছিলেন তিনি। বিবাহের রীতিনীতি বেঁধে দিয়ে মানবসমাজে ফু সি সর্বপ্রথম বিবাহপ্রথার প্রবর্তন করেন। মাছ-ধরা জালের তৈরি হয়েছিল তাঁরই রাজত্বকালে। চীনাদের জীবনে ভবিতব্য গণনা (divination) একটি প্রধান স্থান অধিকার করেছিল। তিনটি পূর্ণ ও ভগ্ন লাইনের সংযোগ বা 'ট্রাইগ্রাম' (Trigram) ধরে অদৃষ্ট গণনার নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন তিনি। চীনাদের এই 'কু-য়া' (Kua) বা

রহস্যাত্মক ট্রাইগ্রাম ছিল সংখ্যায় ৮টি (Eight Trigrams), প্রত্যেকটি কোন না কোন প্রাকৃতিক বস্তু নির্দেশ করত। যেমন তিনটি পূর্ণ লাইন ☰ স্বর্গকে, তিনটি ভগ্ন লাইন ☷ পৃথিবীকে। সেই আটটি ট্রাইগ্রাম বা পূর্ণ ও ভগ্ন লাইনের চিহ্ন এবং তাদের নির্দিষ্ট বস্তুগুলি এই :

স্বর্গ ☰ ; পৃথিবী ☷ ; বজ্র ☳ ;
পর্বত ☶ ; অগ্নি ☲ ; জল ☵ ;
বাষ্প ☱ ; বায়ু ☴

এই আটটি ট্রাইগ্রামই পরবর্তী কালে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে চীনা সামুদ্রিক বিদ্যার একটি পেঁচালো পদ্ধতির রূপ ধারণ করেছিল। ছয়টি লাইন সমন্বিত 'চৌষট্টি হেক্সাগ্রামের' (Sixty Four Hexagram) সেই গণনা-পদ্ধতিটি 'আই কিং' (I ching or 'Book of Changes') গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

ফু সি-র সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব শ্যাং তি বা পরম পুরুষ (Supreme Being)-এর কল্পনা ও পূজার প্রবর্তন।

মৃত্যুকালে ফু সি রাজপদের উত্তরাধিকারীরূপে সেন-লুং-কে মনোনয়ন করেছিলেন। এই শাসকের রাজত্বকাল খৃঃ পূঃ ২৭৩৭-২৭০৫। তাঁর জন্ম-বৃত্তান্ত অলৌকিক। চিত্রে দেখা যায়, তাঁর দেহ মনুষ্যের, মস্তক বৃষের। সেন-লুং নামটির অর্থ, 'স্বর্গীয় কৃষক'। এই নাম থেকেই বোঝা যায় যে তিনি কৃষিকার্য প্রবর্তন করেছিলেন। কাঠের লাঙল তৈরি করেছিলেন তিনি। চিকিৎসাবিদ্যার আবির্ভাব হয় তাঁরই সময়ে। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন উদ্ভিদের ভেষজ গুণ। তাঁর রাজত্বকালে সামগ্রীর বিনিময়-ব্যবসা আরম্ভ হয়েছিল।

তৃতীয় শাসক হুয়াং তি-র শাসনকাল খৃঃ পূঃ ২৭০৪-২৫৯৫। তিনি মিশরের ফারাও দ্বিতীয় পেপির সমসাময়িক, পেপির মতই তিনি দীর্ঘ শতাব্দকাল ধরে রাজ্য শাসন করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে পূর্ব দিকে সানটাং প্রদেশে ও দক্ষিণ দিকে ইয়াংসি নদীর উপত্যকায় রাজ্য বিস্তার দেখা যায়। বাহু-বলে তিনি উত্তর অঞ্চলের হূনদের দলন করেছিলেন। সামরিক শক্তি দ্বারা আদিবাসীদের পরাভূত করাই তাঁর একমাত্র কীর্তি নয়। 'জাতির জনক'

বলতে আমরা যা বুঝি তিনি ছিলেন তাই। হুয়াং তি শব্দের অর্থ, 'পীত সম্রাট', আজও চীনারা পীত সম্রাটের বংশধর বলে দাবি করে। ইতিহাসের আদিপর্ব এই সম্রাটের আমল থেকে ধরা হয়ে থাকে। অনেক ব্যবহারিক দ্রব্যের আবিষ্কারের কৃতিত্ব তাঁরই, যেমন টুপি, পোশাক, ঢেঁকি (mortar and pestle), তীরধনু, মুদ্রা, শবাধার ইত্যাদি। তিনি বর্ম ও চক্রযানের আবিষ্কর্তা। 'ইতিহাস গ্রন্থে' চুম্বক বা magnetic needleএর প্রথম উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরই রাজত্বকালের বিবরণে। তাঁর পত্নী লিউ-জু, যাঁর নাম দেওয়া হয়েছে সি লিং-এর কর্ত্রী ("Lady of Si-ling")—তিনিই প্রথমে গুটিপোকার আবাদ করে রেশম প্রস্তুত এবং রেশমী কাপড় বয়ন করেছিলেন।

সু-কিং গ্রন্থের প্রণেতা তাঁর 'আদর্শ সম্রাটদের' জীবন-কথা ও বক্তৃতার বিবরণ আরম্ভ করেন চতুর্থ সম্রাট ইয়াওর যুগ থেকে। ইয়াও (খৃঃ পূঃ ২৩৫৭-২২৫৬) ছিলেন স্বভাবত ভদ্র, ভক্তিমান ও চিন্তাশীল। সুযোগ্য দক্ষ ব্যক্তিকে সম্মান করতেন তিনি। "তাঁর শাসন-গুণে প্রজাবৃন্দের রুচি ও বুদ্ধি, মার্জিত হয়ে উঠেছিল। তিনি বহুসংখ্যক রাজ্যকে সংযুক্ত করে ঐক্যসূত্রে বদ্ধ করেন। কৃষ্ণকেশ ব্যক্তিদের (আদিবাসীদের) অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছিল। ফলে, সারা রাজ্যে দেখা দিয়েছিল মিলন ও ঐক্য (concord)।" রাজ্যের অভাব-অভিযোগ রাজার গোচরীভূত করবার অবারিত সুযোগ ছিল প্রজাদের। প্রাসাদের বহির্ভাগে একটি ট্যাবলেট্ বা চাকতি রক্ষিত ছিল, তার ওপর শাসন সম্বন্ধে সমালোচনা বা উপদেশ যে কোন ব্যক্তি লিপিবদ্ধ করতে পারত। সেখানে ছিল একটি ঢাক, অভিযোগকারী সেই ঢাক পিটিয়ে রাজার দৃষ্টি আকর্ষণ করত। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ—সম্রাট ইয়াওর উত্তরাধিকারী নির্বাচন। সে বিষয়ে 'ইতিহাস গ্রন্থে' বর্ণনা রয়েছে এইরূপ :

"তি (অর্থাৎ রাজা) বললেন, 'কে সন্ধান দেবে এমন একজন যোগ্য ব্যক্তির যাকে আমি (রাজপদে) উন্নীত করতে পারি ?' (মন্ত্রী) ফ্যাং চি বললেন, 'যুবরাজ চু বিলক্ষণ বুদ্ধিমান।' তি বললেন, 'হায়! সে কপট ও কলহপ্রিয়। কোন কর্ম হবে তাকে দিয়ে ?'

"তি বললেন, 'রাষ্ট্রের গুরুতর অবস্থার সম্মুখীন হতে পারে কে দেবে এমন ব্যক্তির সন্ধান ?' হুয়ান তাও বললেন, 'কেন, পূর্তমন্ত্রী তো কার্যে

যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছেন।' তি বললেন, 'হায়! তিনি কথায় ওস্তাদ, কাজে বিপরীত।...চেয়ে দেখ, প্লাবনের জল আকাশকে স্পর্শ করতে উদ্যত।'

"তি বললেন, 'হে চার পর্বতের প্রধান, (President of the Four Mountains) দেশকে প্লাবিত করে বন্যার জল ধ্বংস ছড়িয়ে দিয়েছে।.. কোন যোগ্য ব্যক্তি কি নেই যে এর প্রতিবিধান করতে পারে?' তখন সভাস্থ সকলে বললে, 'কেন, কুন্-ই তো রয়েছেন?' তি বললেন, 'হায়! সে অবাধ্য, অন্যের ক্ষতি করে।' চার পর্বতের প্রধান বললেন, 'সত্য, কিন্তু—একবার তাকে চেষ্টা করে দেখলে হয় না?' তখন কুন-কেই নিযুক্ত করলেন রাজা। বললেন, 'যাও, মন-প্রাণ দিয়ে কাজ কর (Be reverent)।' নয় বছর ধরে কাজ করলেন কুন, কিন্তু বন্যাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারলেন না।

"তি বললেন, 'হে চার পর্বতের প্রধান, সত্তর বছর ধরে রাজত্ব করছি আমি। তুমি পার আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে। রাজ্যভার তোমাকে অর্পণ করে আমি অবসর গ্রহণ করতে চাই।' প্রধান বললেন, 'রাজ্য-শাসনের গুণ আমার নেই। আমি আপনার পদ কলঙ্কিত করব।' তি বললেন, 'কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সন্ধান দাও, অথবা কোন (চরিত্রবান) দরিদ্র নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তির।' তখন সকলে বললে, 'নিম্নশ্রেণীর মধ্যে একজন অবিবাহিত ব্যক্তি আছে। সে ইউ-নিবাসী স্থন।' তি বললেন, 'হাঁ, তার কথা শুনেছি। কি বলতে চাও তার সম্বন্ধে?' প্রধান বললেন, 'সে একজন অন্ধের পুত্র, তার পিতা অনাচারী, বিমাতা কপটাচারিণী, বৈমাত্র ভ্রাতা সিয়াং উদ্ধত। এসব সত্ত্বেও স্থনের পিতৃভক্তি এতই প্রবল যে, তার মিলনধর্মী গুণসমূহ গোটা পরিবারকে দুষ্প্রবৃত্তির কবল থেকে উদ্ধার করে সেখানে স্বরাটের প্রতিষ্ঠা করেছে।' তি বললেন, 'ভাল, তাকেই পরীক্ষা করে দেখব। তাকে আমার দুই কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে তাদের প্রতি তার ব্যবহার লক্ষ্য করব।' তখন তিনি তার কন্যাদ্বয়কে ইউ পরিবারের বধূরূপে উত্তরাঞ্চলে প্রেরণ করলেন। বললেন, 'শ্রদ্ধাবতী হও।' "*

---

* আঠারো শো বছর পর মহামতি কনফুসিয়াস তাঁর সমকালীন অপেক্ষাকৃত আধুনিক চীনের অধোগতির নিন্দা করে সম্রাট ইয়াও প্রবর্তিত স্বর্ণযুগ প্রসঙ্গে এই নীতিবাক্যটি উচ্চারণ করেছিলেন যে সেই প্রাজ্ঞ ধীমান মহানুভব সম্রাটের দর্শনেই প্রজারা প্রভূত পুণ্য অর্জন করত। অবশ্য তাঁর এই উক্তি অতিশয়োক্তিবর্জিত বলে মনে করবার কারণ নেই।

স্থন-কে তি-এর পদে অভিষিক্ত করে ইয়াও অবসর গ্রহণ করলেন। স্থনের রাজত্বকাল খৃঃ পূঃ ২২৫৮-২২০৬। প্রথমেই তিনি ধর্মানুষ্ঠানের প্রথা-মত ঈশ্বরের আরাধনা করেন, তারপর করলেন ছয়জন পরলোকগত শ্রদ্ধেয় পিতৃপুরুষের ভক্তি-তর্পণ আর পর্বত, নদী ও আধিদৈবিক শক্তিপুঞ্জের পূজা। রাজকার্য পর্যবেক্ষণের জন্য সফরে বেরুলেন তিনি, শাসনব্যবস্থার নানাবিধ পরিবর্তনও করলেন, যার জন্য তাঁকে একজন 'বড় সমাজ-সংস্কারক' বলা হয়ে থাকে। তিনি পঞ্জিকার গণনা পদ্ধতির পরিবর্তন, ওজন ও পরিমাপ নিয়ন্ত্রণ এবং বেত্রের দৈর্ঘ্য ও স্থূলতা হ্রাস করে লঘু শাস্তির বিধান প্রবর্তন করেছিলেন। পূর্তকার্য পণ্ড হবার শাস্তিস্বরূপ পূর্তমন্ত্রীকে নির্বাসিত ও ইঞ্জিনিয়র কুন-কে আমরণ কারারুদ্ধ করেছিলেন তিনি। কুন-এর ছিল একটি সুযোগ্য পুত্র, তার নাম ইউ। চীন দেশের চিরকালের দুঃখ-দারিদ্র্যের হেতু ("China's sorrow") পীত নদীর জলপ্লাবনকে নিয়ন্ত্রিত করবার ভার বন্দী কুন-এর পুত্র ইউকে অর্পণ করলেন রাজা। ইউ ছিলেন একজন কৃতী ইঞ্জিনিয়র। নয় বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমে জল নিষ্কাশন ও বাঁধ প্রস্তুত করে পীত নদীকে তার প্রবাহ মধ্যে ফিরিয়ে এনেছিলেন।

"তি বললেন, 'হে ইউ, তুমি ধন্য। প্লাবনের জলরাশি আমার মনে ঘোর আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। কৃতিত্বের সঙ্গে তুমি তোমার কার্য সুসম্পন্ন করে অন্য অপেক্ষা তোমার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছ। দেশসেবায় আত্ম-নিয়োগ, পরিবার পোষণে আত্মম্ভরিতাশূন্য মিতব্যয়, এইসব গুণই তোমার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক। দক্ষতায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী তথাপি নিরহংকার, কৃতিত্বে অতুলনীয় তথাপি দম্ভশূন্য তুমি।' এরূপ গুণী মানুষকেই স্থন তাঁর উত্তরাধিকারীরূপে রাজপদে অধিষ্ঠিত হবার উপযুক্ত মনে করলেন।

"তি বললেন, 'ইউ, শাসকের পদে আমি অধিষ্ঠিত রয়েছি তেত্রিশ বছর। আমার বয়স নব্বই থেকে এক শো বছরের মধ্যে। কর্মভার আমাকে পীড়িত করছে। আলস্য ত্যাগ করে গণ-নেতৃত্ব তুমিই গ্রহণ কর।'

"ইউ বললেন, 'রাজপদ অধিকার করবার মত গুণ বা যোগ্যতা আমার নেই। জনগণ আমার ওপর নির্ভর করতে পারবে না।'

"(রাজার সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াবার জন্য) ইউ বললেন, 'প্রত্যেকটি

গুণী মন্ত্রীর ভাগ্যের লক্ষণগুলি বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখুন। সর্বাপেক্ষা সুলক্ষণযুক্ত ব্যক্তিকেই নির্বাচন করা বিধেয়।'

"তি বললেন, 'ভাগ্য গণনার নিয়ম যথাযথভাবেই পালন করা হয়েছে। নির্বাচনের প্রথম প্রয়োজন, কোন সুযোগ্য ব্যক্তি সম্বন্ধে মন স্থির করা, তারপর কচ্ছপের চাড়ির সঙ্গে সেই ব্যক্তির ভাগ্য-লক্ষণগুলিকে মিলিয়ে দেখতে হয়। তোমার বিষয়ে আমি তো পূর্বেই মন স্থির করেছি, মন্ত্রী ও জনগণের সঙ্গে আলোচনাও করেছি। তারা সকলেই আমার সঙ্গে একমত। অধিদেবতাগণ (spirits) অনুমতি দান করেছেন, এবং কচ্ছপের চাড়ি আর ভাগ্যের লক্ষণসমূহেরও মিলন পরিলক্ষিত হয়েছে। গণনা শুভ হলে ভাগ্যনির্ণয় প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি অসংগত।'

"ইউ মাথা নত করলেন, কিন্তু রাজপদ গ্রহণে সম্মত হলেন না। তখন তি বললেন, 'দায়িত্ব গ্রহণে অসম্মতি অবিধেয়। তুমি ভিন্ন আর কেউ নেই যে আমার পদ গ্রহণ করতে পারে।' "

সিয়া বংশ

এমনিভাবে সুন-এর মত তাঁর পরবর্তী রাজা ইউ-ও নির্বাচিত হয়েই সিংহাসনে অধিরোহণ করেছিলেন (খৃঃ পূঃ ২২০৫)। তাঁর রাজ্যাভিষেকেব সঙ্গে 'পঞ্চশাসক' যুগের অবসান ঘটল। 'সিয়া' নামক নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ইউ, তাঁর রাজত্ব চীনের আদিকালের ইতিহাসে একটি বিশেষ গৌরবময় অধ্যায়। তাঁর নিরন্তর পরিশ্রমের কাহিনী চীনা প্রবাদে পরিণত হয়েছে: "অতুলনীয় কীর্তি ইউর! তাঁর মহিমান্বিত শক্তি দূরপ্রসারী! ইউ না থাকলে (অর্থাৎ তিনি যদি জলপ্লাবনকে নিয়ন্ত্রিত না করতেন তা হলে) আমরা মৎস্যকুলে পরিণত হতাম।" প্লাবনের ধ্বংস থেকে দেশকে রক্ষা করেছিলেন তিনি নয়টি নদীর মুখ পরিষ্কার করে দিয়ে জলপ্রবাহকে সমুদ্রে বাহিত করে।' রাজ্যকে তিনি নয়টি ভাগে বিভক্ত করেছিলেন। ধাতু সংগ্রহ করে নয়টি বৃহৎ কটাহে ঢাল দিয়ে এক একটি ধাতুপূর্ণ কটাহ রাজ্যের এক একটি বিভাগের জাতীয় সম্পদ রূপে নির্দিষ্ট করতেন। এই নৃপতির রাজ্য পশ্চিম প্রান্তের 'চলন্ত বালু' ("moving sands") সমাচ্ছন্ন গোবি মরুভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। অমিত শক্তির প্রভাবে তিনি দক্ষিণ

দিকের 'মিয়াও' নামক আদিম বর্বর জাতিকে বশীভূত করেছিলেন। বিজেতা কর্তৃক বিজিতের দোষ-বর্ণনা সকল সভ্য জাতির ইতিহাসেই দেখা যায়। চীনের 'ইতিহাস গ্রন্থে'ও এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে নি।

"জনসভায় বক্তৃতা করলেন ইউ, 'সমবেত জনমণ্ডলী, আমার আদেশ শ্রবণ কর। মিয়াও জাতির প্রধান, সে মূর্খ, অজ্ঞ, দাম্ভিক। সে সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, সে অধর্মাচারী।...জনগণ তাকে প্রত্যাখ্যান করে, তারা কেউ তাকে রক্ষা করবে না। স্বর্গ তার ওপর প্রভূত অকল্যাণ বর্ষণ করতে সমুদ্যত। এস বীর যোদ্ধৃবৃন্দ, তার অপরাধের সমুচিত শাস্তি দিতে অগ্রসর হও, আমি তোমাদের সঙ্গে যোগদান করছি।"

দিগ্বিজয়ীর মুখে এই যে বক্তৃতা শোনা গেল, হাজার হাজার বছর পর আজও আমরা সেই সুরটিরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই না কি ?

প্রবাদ আছে, মদ্যপ্রস্তুত প্রণালীর আবিষ্কার হয়েছিল ইউর রাজত্বকালে। প্রস্তুতকর্তা আই-তি (I Ti) খানিকটা ঝাঁঝালো আরক নিয়ে সম্রাটকন্যার সমীপে উপস্থিত হলেন। রাজকুমারী সেই আরক এনে দিলেন তাঁর পিতাকে। সম্রাট ইউ সেই তরল পদার্থের একটুখানি মুখে দিয়ে স্বাদ গ্রহণ করলেন। বাকিটুকু মাটিতে ফেলে দিলেন। তারপর এই ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, "এমন দিন আসবে যখন এই দ্রব্যের প্রভাবে কোন রাজা তাঁর রাজ্য হারিয়ে বসবেন।" রাজ্যে মদ্যপ্রস্তুত নিষিদ্ধ করলেন তিনি, প্রস্তুতকারীকে করলেন নির্বাসিত। কিন্তু তার নিষেধাজ্ঞা উত্তরকালে আর বলবৎ রইল না, তখন অবাধে মদ্যপ্রস্তুত চলতে লাগল।

সাংঘাতিক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন সম্রাট। দেশে মদ্যপানের প্রচলন, বিশেষত বংশের শেষ সম্রাট চিয়ে ও তার পত্নীর অতিরিক্ত পানাসক্তিই রাজ্যনাশের কারণ হয়েছিল। এই রাজ-দম্পতীর নির্মমতা ও নৃশংসতা রোমের সম্রাট নেরো-রই সমতুল্য। রোম যখন পুড়ে ছাই হয়, নেরো তখন পরমানন্দে বীণা বাজিয়ে যান। সম্রাট চিয়ে আর তাঁর পত্নী কি করেছিলেন শুনুন: একটি প্রকাণ্ড লেক বা হ্রদ খনন করে সেটিকে তাঁরা মদ্য দিয়ে পরিপূর্ণ করলেন। তারপর ঢাকের বাদ্য সহকারে এক সঙ্গে তিন হাজার প্রজাকে সেই হ্রদে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য করলেন। মত্তাবস্থায় তাদের

পাশবিক সুরাকেলী দর্শন করা ছিল রাজ-দম্পতীর পরম কৌতুক! সেই মদ্যপূর্ণ হ্রদে নিমজ্জিত হয়ে কত লোক যে প্রাণ হারাত, সেদিকে তাঁরা দৃক্‌পাতও করতেন না। ভূগর্ভে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়েছিল রাজার একান্ন বছর রাজত্বকালে, সেখানে রাজা ও পারিষদের দল জনান্তরালে ব্যভিচারের চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছতেন। এইসব রাজকীয় ব্যভিচারের পরিণাম যথাকালে বিপ্লবরূপে দেখা দিয়েছিল। প্রজাবৃন্দের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ যখন জাগ্রত হয়ে উঠেছে, তখন তাদের সমুখে এসে দাঁড়ালেন একজন বীরপুরুষ। তাঁর নাম চেং ট্যাং, নিতান্ত দায়ে পড়েই বিপ্লব সৃষ্টি করতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। অচিরেই বিপ্লব সাফল্যমণ্ডিত হল, সিয়া-রাজকে পরাস্ত করে ফিরে এসে জনসাধারণের কাছে তিনি একটি বিরাট ঘোষণা (Announcement of T'ang) করলেন :

"রাজা বললেন, 'হে নানা স্থানের সমাগত জনমণ্ডলী, আমার এই সুস্পষ্ট ঘোষণা শ্রবণ কর। জগদীশ্বর নিম্নতম শ্রেণীর মানুষকেও নৈতিক বিবেকবুদ্ধি দিয়েছেন, সে যেন ন্যায়সংগতভাবে উচিত কাজ করতে পারে সেই জন্য। ন্যায়নিষ্ঠ প্রজাবৃন্দের শান্তিপূর্ণ কাজগুলি কোনমতে বাধাপ্রাপ্ত না হয়, তার ব্যবস্থা করা রাজার কর্তব্য। সিয়া-রাজ এই রাজধর্ম পালন করেন নি, নানান দেশের প্রজাবৃন্দের ওপর অত্যাচার করেছেন।...যে সাধু স্বর্গ তার ভাল করেন, মন্দের উচ্ছেদও করেন তিনি। কুকর্মের ফলস্বরূপ সিয়া বংশের সর্বনাশ ঘটেছে। ক্ষুদ্র ব্যক্তি আমি, আমার ওপর এসেছে 'স্বর্গের পরোয়ানা'—সাধ্য কি আমার যে আমি অপরাধীকে ক্ষমা করি।...প্রদেশ ও গোষ্ঠীসমূহের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা ও শান্তি রক্ষার ভার একমাত্র আমার ওপর। উপরের ও নিচের শক্তিপুঞ্জের (the powers above and below) মনস্তুষ্টি করতে পারব কিনা জানি না। আমি শঙ্কিত, কম্পমান, মনে হয় যেন কোন অন্ধ গহ্বরের মুখে এসে দাঁড়িয়েছি।"

স্পষ্ট দেখা যায়, বিদ্রোহ সফল হলেও ট্যাং-এর শান্তিপ্রিয় চিত্ত সংশয়মুক্ত হয় নি। লোকে তাঁর কুকীর্তির কথা স্মরণ করে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে, এই আশঙ্কা তাঁর মনে জেগেছিল। রাজ্যের মুখ্য ব্যক্তি, মন্ত্রী ও জনমণ্ডলীর সনির্বন্ধ অনুরোধেই তিনি সিংহাসনে আরোহণ করতে সম্মত হয়েছিলেন। অত্যাচারী রাজা চিয়ে নির্বাসিত হলেন।

স্যাং বংশ

রাজপদে অধিষ্ঠিত হয়ে চেং ট্যাং করলেন স্যাং বা ইন্ বংশের প্রতিষ্ঠা (খৃঃ পূঃ ১৭৬৬)। এই বংশের রাজত্বকাল খৃঃ পূঃ ১৭৬৬-১১২২। প্রথম ও শেষ ভাগে এই বংশের রাজ্যকালী. অবস্থা সিয়া বংশীয়দের কালেরই অনুরূপ। ট্যাং ছিলেন অতি সজ্জন ব্যক্তি, তাঁর কোমল দয়ার্দ্র চিত্ত শিকারলব্ধ পশুপক্ষীর প্রতিও মমতা বোধ করত। প্রজাদের সংকার্যগুলির যোগ্য মর্যাদা দিতেন তিনি, নিজের অপরাধকে ক্ষমা করতেন না। তিনি বলেছেন, "জগদীশ্বরের অভিপ্রায়ের সঙ্গে কৃতকর্মগুলিকে মিলিয়ে পরীক্ষা করব। দোষ যদি তোমাদের হয়, সে দোষ একমাত্র আমার ওপরই অর্পিত হোক। আর দোষ যদি আমার হয়, সে দোষ যেন তোমাদের স্পর্শও না করে।" তিনি একটি অমর কীর্তির ঐতিহ্য রেখে গেছেন, যা উত্তরকালের চীনাদের কাছে 'আদর্শ নৃপতি'র উন্নত মঞ্চে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সাত বৎসর উপর্যুপরি অনাবৃষ্টির ফলে দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। সম্রাটের মহৎ চরিত্র এই দৈব দুর্বিপাকের মধ্যে বিকশিত হবার পরম সুযোগ লাভ করেছিল। তিনি যে সত্যকার একজন দরদী 'জন-প্রতিনিধি' ('representative man') তাই প্রতিপন্ন করবার জন্য শোকের চিহ্নস্বরূপ শুভ্র বস্ত্র পরিধান করলেন, এবং শ্বেত রথে আরোহণ করে পর্বতের পাদদেশে কুঞ্জবনে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে নিজের ত্রুটিবিচ্যুতি বর্ণনার পর জনগণের হিতার্থে দেবতার কাছে আত্মবলিদানের সংকল্প করলেন। কিন্তু তাঁর সংকল্প কার্যে পরিণত করবার পূর্বেই ঘটল একটি অভাবনীয় ঘটনা। যেমনি দেব-আরাধনা শেষ হল অমনি দেবতা যেন প্রসন্ন হয়েই প্রচুর বারিবর্ষণ শুরু করলেন! দেশ আবার সমৃদ্ধ হয়ে উঠল।

স্যাং বংশের চরম পরিণতি—অর্থাৎ অধঃপতন—পূর্ববর্তী সিয়া বংশের মতই হয়েছিল। চৌ-সিন স্যাং বংশের শেষ নৃপতি (খৃঃ পূঃ ১১৫৪-১১২৩)। সম্রাট চিয়ে-র মতই দুর্নীতিপরায়ণ ও নৃশংস প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি। এই রাজার বিষয়ে 'ইতিহাস গ্রন্থে' বলা হয়েছে: "স্যাং বংশীয় রাজা চৌ স্বর্গকে করেন অশ্রদ্ধা আর প্রজাদের ওপর করেন অত্যাচার। মদ্যপায়ী লম্পট তিনি, অপরাধের শাস্তি শুধু অপরাধীকেই প্রদান করেন না, অপরাধীর

আত্মীয়স্বজনের ওপরও তাঁর শাস্তি প্রসারিত হয়। কর্মচারী নিয়োগ করেন তিনি গুণ অনুসারে নয়, বংশানুক্রমে পদাধিকার নীতিকে অনুসরণ করে (on heriditary principle)।...তিনি সাধু সজ্জন ব্যক্তিকে পুড়িয়ে মেরেছেন, গর্ভবতীর গর্ভ বিদারণ করেছেন।" কথিত আছে, তিনি বলেছিলেন, "শুনেছি, মানুষের হৃদপিণ্ডে সাতটি খোপ আছে। পি-কান-এর বুক চিরে দেখতে চাই আমি, কথাটা সত্য কিনা।" এই সকল নৃশংস কাণ্ডের অনুষ্ঠানে উৎসাহিত করতেন তাঁকে তাঁর ক্রূর-প্রকৃতির পত্নী তা চি। তিনি নাকি নানাবিধ নির্যাতনের যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন, যেমন তাপ-যন্ত্র (heater), তাম্র-স্তম্ভ (copper pillar)। তাম্র-স্তম্ভটিকে উত্তমরূপে তৈলসিক্ত করে একটি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের ওপর আড়াআড়িভাবে রাখা হত, আর সেই মারাত্মক সেতুর ওপর দিয়ে পায়ে হেঁটে যেতে দুর্ভাগা ব্যক্তিদের বাধ্য করা হত, রাজার কৌতুক উদ্দীপন বা খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য। কথিত আছে, রাজা তাঁর বৃদ্ধ পিতৃব্যকে এই ভীষণ অগ্নিপরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে বাধ্য করেছিলেন, এবং এই নির্মম নিষ্ঠুরতার ফল পিতৃব্যের পক্ষে যেমন সাংঘাতিক হয়েছিল, তাঁর নিজের পক্ষেও তেমনি মর্মান্তিক হয়ে উঠেছিল।

চৌ-সিন-এর অত্যাচার থেকে তাঁর মন্ত্রী ও উপদেষ্টাগণও অব্যাহতি পান নি। চৌ-দেশের 'ওয়েন-ওয়া' নামক একজন মুখ্য ব্যক্তি ছিলেন রাজার উপদেষ্টা, তাঁকে তিনি কারারুদ্ধ করে রেখেছিলেন সুদীর্ঘ সাত বছরকাল। তারপর বন্দীর বন্ধুরা রাজাকে একটি নর্তকী উপঢৌকন দিয়ে তাকে খালাস করলেন। কিছু কালের জন্য রাজার মতিগতির পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল বটে, কিন্তু তাঁর সুশাসন অধিক কাল স্থায়ী হয় নি, এবং অত্যাচার-অবিচার আবার দেখা দিয়েছিল। তখন বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করলেন ওয়েন-ওয়াংএর পুত্র ফা, যিনি বিখ্যাত চৌ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা উ-ওয়াং নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। সম্রাটের বিপুল বাহিনীর তুলনায় বিদ্রোহী সৈন্যের সংখ্যা ছিল অল্প। এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করে ফা যে কথাটি বলেছিলেন তা এইরূপ: "কথায় বলে যেখানে উভয় পক্ষের শক্তি সমান সেখানে পক্ষ ও প্রতিপক্ষের গুণের তুলনা করে দেখতে হয়। আর যখন তাদের গুণও সমান তখন পক্ষদ্বয়ের সত্যনিষ্ঠা পরখ করতে হয়। চৌ-সিনের আছে লক্ষ লক্ষ সৈন্য, কিন্তু তাদের মনও লক্ষ লক্ষ। আর আমার সৈন্যসংখ্যা তিন হাজার হলেও তারা সকলেই

এক-আত্মা।" বিদ্রোহীদের সংখ্যার দৌর্বল্য পূরণ করেছিলেন ফা সৈন্যদের চিত্তে উৎসাহ ও একাগ্রতার ভাব জাগিয়ে তুলে। এই উৎসাহ-দানের সঙ্গে চিন্তাশীল মনের ধীর বিচক্ষণতা কেমন চমৎকারভাবে মিশ্রিত ছিল, তা তাঁর এই বক্তৃতা থেকে বেশ বোঝা যায়—"আজকের সংগ্রামে ছয় সাত পদ মাত্র অগ্রসর হয়ে থামবে, তারপর সৈন্যদের সমর-সজ্জায় সজ্জিত করবে। হে বীরগণ, শক্তি প্রয়োগ কর। চার পাঁচ ছয় বা সাতটি আঘাত করে থাম, তারপর আবার সৈন্যদের সমর-সজ্জায় সজ্জিত কর। বীরগণ, শক্তি প্রয়োগ কর। ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র পশুর মুখভাব ধারণ কর।"

সম্রাট চৌ-সিন জীবনে কোন কৃতিত্ব দেখান নি, কিন্তু নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে শেষবারের মত তাঁর শৌর্য প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল। বীরোচিত সংগ্রাম করেছিলেন তিনি, তা সত্ত্বেও রাজসৈন্যরা মেং-এর জলাভূমির তীরবর্তী স্থানে একটি যুদ্ধে (battle of the "ford of Meng") ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করেছিল। তখন চৌ-সিন মণিমুক্তাখচিত পরিচ্ছদ পরিধান করে বিলাস-কুঞ্জ ভবনের মর্মরস্তম্ভের চূড়ায় আরোহণ করলেন, এবং রাজপ্রাসাদে অগ্নিসংযোগ করে সেই জলন্ত আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণত্যাগ করলেন। তাঁর এই আত্মাহুতি আসিরিয়ার সুবিখ্যাত সম্রাট আসুরবানিপালের অন্তিম দশার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রবাদ আছে, তিনিও নাকি প্রাসাদের অগ্নিদাহের মধ্যে আত্মবিসর্জন দিয়েছিলেন। সম্রাট চৌ-সিনের পত্নী তা চি'কে ধরে এনে তাঁর শিরচ্ছেদ করা হল। এই নারীর মোহিনী শক্তি বিষয়ে কথিত হয়েছে যে, তাঁর অনুপম রূপলাবণ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে কোন ঘাতকই তাঁকে বধ করতে সম্মত হয় নি। তখন উপায়ান্তর না দেখে উ-ওয়াং-এর একজন বৃদ্ধ মন্ত্রী চোখে কাপড় বেঁধে যে-কাজ ঘাতক পারে নি, খড়্গহস্তে সেই কঠোর কার্যটি সম্পন্ন করে জাতির ওপর নির্যাতনের প্রতিশোধ নিয়েছিলেন।

স্যাং বংশ ধ্বংস করে উ-ওয়াং যে চৌ বংশ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সেই বংশের রাজত্বকালে চীন দেশ পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হয়ে মহাচীনে পরিণত হয়েছিল। অবশ্য পীত নদীর উপত্যকা থেকে দক্ষিণে ইয়াংসি তীরবর্তী দেশসমূহের আদিবাসীদের উপর আধিপত্য পূর্ব থেকেই চলে আসছিল। চৌ বংশীয়দের আমলে শুধু যে ভৌগোলিক

সম্প্রসারণ হয়েছিল তা নয়, তাও-ধর্ম (Taoism) ও কনফুসীয় নীতির (Confucianism) প্রবর্তক লাওৎসি (Lao-tze) ও কুযাং-ফু-জি (Confucius) নামক দুই মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল এই বংশেরই সুদীর্ঘ রাজ্যকালেব মধ্যে। রাজধর্ম, গণধর্ম, নীতিধর্ম, চীনা সংস্কৃতির যাবতীয মূল উপাদানগুলি নিহিত রযেছে তাও-দর্শন ও কনফুসীয নীতির মধ্যে, তাই মহাচীনের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সূচনা চৌ বংশের সময থেকেই হযেছিল বলতে হবে। বিবর্তনের পথে চৈনিক সংস্কৃতি কিরূপে তাও ও কনফুসীয় ধর্মের সূত্র ধরে অমিতাভ বুদ্ধেব শরণ গ্রহণ করেছিল, আর সেই সঙ্গে সংস্কৃতির বিস্তাবিত বিবরণগুলি পববর্তী কালের মহাচীন প্রসঙ্গ আলোচনায স্বতন্ত্রভাবে বিবৃত করা হবে।

স্যাং বংশের বিলুপ্তির সঙ্গে কোরিযায রাজ্য প্রতিষ্ঠার একটি কাহিনী জড়িত রযেছে। কাহিনীটি এই : কি-সি নামে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচাবী স্যাং বংশের পতনের পর চৌ বংশীয বাজার অধীনে কর্ম করা অপেক্ষা নির্বাসনকেই শ্রেযরূপে বরণ করেছিলেন। পাঁচ সহস্র সৈন্য নিযে কি-সি পূর্বাচল অভিমুখে যাত্রা কবে কোবিযায উপনীত হলেন। এই দেশটিব নাম দিলেন তিনি 'চোজেন' অর্থাৎ 'প্রভাত প্রশান্তির দেশ' ("Land of the Morning calm")। খৃঃ পূঃ ১১০০ অব্দে কি-সিব কোবিযা প্রবেশকাল থেকেই সেখানকার ইতিহাসেব সূত্রপাত। রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে কোবিযায চীন দেশ থেকে আমদানি-করা কারু ও কারিগবি শিল্প, গৃহনির্মাণ, কৃষি ও রেশমপ্রস্তুত প্রভৃতি বিদ্যার প্রচলন হযেছিল। কি-সিব বংশধরেরা চোজেনে ৯০০ বছর রাজত্ব করেছিলেন।

৩ খৃঃ পূঃ ১১২২ পর্যন্ত সংস্কৃতির হিসাবনিকাশ

'ইতিহাস গ্রন্থে'র বিবরণ থেকে জানা যায় যে, সিযা বংশীয়দেব আমলে কৃষি, পশু পালন ও প্রজনন, বস্ত্র বযন, মৃৎপাত্র নির্মাণ প্রভৃতি আদিম কারিগরি শিল্প, শিকার ও মাছ ধবা ছিল লোকের প্রধান উপজীবিকা। এই বৃত্তিগুলি সবই নব-প্রস্তরযুগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। পীত নদী উপত্যকায় নব-প্রস্তরযুগের অবসান হয়েছিল কখন, আর ধাতুর ব্যবহাবই বা আরম্ভ

হয়েছিল কোন সময়, তা এখন পর্যন্ত জানা যায় নি। স্যাং বংশীয় নৃপতিগণের রাজত্বকালে ব্রঞ্জ-শিল্প যে খুবই উন্নত পর্যায়ে উঠেছিল, তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় দশম শতাব্দীর পুরাকাল বিষয়ক একখানি চীনা গ্রন্থের চিত্রমালায়। স্যাং-যুগের ব্রঞ্জ-পাত্রগুলির সুন্দর চিত্র অঙ্কিত রয়েছে, পাথরের ওপর কারু-শিল্পেরও নিদর্শন র'য়েছে। কোন সময় মানুষ এখানে লৌহের ব্যবহার শিক্ষা করেছিল, সে তথ্যও অপরিজ্ঞাত। আমরা শুধু এই জানি যে, আসিরিয়া ও মিশরে যখন লৌহ দেখা দিয়েছিল—সম্ভবত খৃঃ পূঃ ৭০০ অব্দে দ্বিতীয় সারগনের আমলে, অথবা তৎপূর্বে হিটাইটদের সঙ্গে সংযোগের ফলে—তার পাঁচ শতাব্দীরও অধিক কাল পরে লৌহনির্মিত অস্ত্র প্রথম ব্যবহৃত হয়েছে চীন দেশে। সম্ভবত এখানে উত্তর দিক থেকে হুনরাই লৌহের আমদানি করেছিল।

সমাজ সংগঠন সিয়া বংশীয়দের আমলে যেমন হয়েছিল সেই কাঠামোর পরিবর্তন স্যাং রাজাদের কালে, এমন কি তার পরেও বিশেষ কিছু হয় নি। প্রথম রাজবংশ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই আমরা এখানে পিতৃ-স্বত্ব প্রথায় (Patriarchal system) পারিবারিক বিধান প্রচলিত দেখতে পাই। সমাজ-সংস্থায় পরিবারই সর্বনিম্ন একক সংখ্যা (unit)। গোষ্ঠীপতিরা (tribal chiefs) নিজ দেশে স্ব স্ব খণ্ড-জাতির নেতা, আর খণ্ড-জাতি-সমূহের উপর অধিষ্ঠিত রয়েছেন সম্রাট স্বয়ং। সামন্তরাজ্যে সামন্তদের সঙ্গে রাজার সম্বন্ধ যেমন, খণ্ড-জাতির নেতাদের সঙ্গে সম্রাটের সম্পর্কও ছিল অনেকটা তেমনি। 'সু-কিং' গ্রন্থে সুন-এর কানুন (Canon of Shun) পাঠ করে জানা যায় যে, "তিনি (সম্রাট সুন) ভূখণ্ডকে ১২টি প্রদেশে বিভক্ত করেছিলেন, এবং সেখানকার ১২টি পর্বতশৃঙ্গে বেদীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।" প্রকৃতপক্ষে পীত নদী উপত্যকার চতুর্দিকে রাজ্য যেমন বিস্তার লাভ করল, গোষ্ঠীকুল বা খণ্ড-জাতিসমূহের ওপর রাজার আধিপত্যও কায়েম হতে লাগল সেই অনুপাতে, এবং সেই সঙ্গে দেখা দিল সামন্ত-রাজ্যের সূত্রপাত, যে সামন্তরাজ্য পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল চৌ বংশীয়দের রাজত্বকালে। স্যাং বংশীয়দের রাজ্যের উত্তর ভাগে বর্তমান তাইইয়ান ও পিকিং অঞ্চল, পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণে ইয়াংসি নদীর পরপার ও পশ্চিমে সেনসি প্রদেশের প্রান্ত। এই সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডকে নানান ভাগে

বিভক্ত করে এক একজন গোষ্ঠী-প্রধানের ওপর ভার দেওয়া হয়েছিল, যাঁরা সামন্ত-প্রথামত দেশ শাসন করতেন। 'সু-কিং' গ্রন্থে সম্রাট সুন-এর সফর, পাঁচ বছরে একবার প্রদেশগুলির শাসনকার্য পর্যবেক্ষণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, অভাব-অভিযোগ পেশ করবার জন্য সামন্তগণের রাজদরবারে উপস্থিত হবার বিবরণও রয়েছে। সম্রাট মন্ত্রী নিয়োগ করতেন রাজ্যের নানান বিভাগ শাসনের জন্য—যেমন কৃষিমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রী, অপরাধমন্ত্রী, বন বিভাগের পরিদর্শক। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বিস্তৃত সাম্রাজ্যের ওপর সম্রাটের আধিপত্য নামমাত্র থাকাই সম্ভব। দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ছিলেন গোষ্ঠীর প্রধান, তাঁর শাসন ছিল 'পিতার শাসন' (patriarchal)। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, রাজপদ কোন বংশের অধিকার বলে গণ্য হয় নি। রাজা কোন সুযোগ্য ব্যক্তির সন্ধান করে মন্ত্রী, জনগণ ও দেবতার অনুমতি নিয়ে তাকে রাজপদে অভিষিক্ত করতেন। চীনা রাষ্ট্রনীতির এই অভিনব বিধানমত নৃপতি-নির্বাচন যে গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছিল, তারপর কত যুগ কত শতাব্দী কেটে গেছে, নির্বাচিত ব্যক্তিকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করবার দৃষ্টান্ত আর দেখা যায় না বটে, সেই আদর্শের লক্ষ্য গণমতের আনুগত্যকে কিন্তু কোন কালেই চীনা সম্রাটেরা অস্বীকার করতে পারেন নি, এবং চীনের সুদীর্ঘ ইতিহাসে যে সম্রাটের সেই আদর্শকে অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞা করবার দুর্মতি ঘটেছে, বিক্ষুব্ধ জনমত বিপ্লবের দহন জ্বালিয়ে সেই রাজবংশকে অচিরেই আহুতি দান করেছে। সম্রাট সুন-এর বিচক্ষণ মন্ত্রী কাও-ইয়াও বলেছিলেন, "স্বর্গ জনগণের কর্ণ ও চক্ষু দিয়ে দর্শন ও শ্রবণ করেন। কোন কার্যে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন স্বর্গ জনগণের মারফত। স্বর্গ ও মর্তের মধ্যে এমনি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান।" প্রায় দুই হাজার বছর পরে চীনের প্রসিদ্ধ দার্শনিক মেনসিয়াস (Mencius—খৃঃ পূঃ ৩৭২-২৮৯) সেই সুপ্রাচীন গণতান্ত্রিক বিধানের অনুসরণ করে অবস্থাবিশেষে জনগণের বিপ্লব সৃষ্টির অধিকারকে স্বীকার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "রাষ্ট্রে জনসাধারণের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি, গুরুত্বের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে রাষ্ট্রসমূহের দেবগণ (Spirits of the States)। আর শাসকের গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা অল্প।" সু-কিং গ্রন্থে শাসক সম্পর্কে সম্রাট সুন-এর একটি আদর্শের কথা পদ্যে বলা হয়েছে এইরূপ ঃ

অঙ্গগুলি কাজ করে যখন হর্ষ ভরে
উন্নত গর্বিত তখন শির ;
সকল কর্তব্য হয় সুসম্পন্ন।
মাথা যখন স্থির-বুদ্ধি
অঙ্গ কর্মপটু
কর্মের নির্বাহ হয় সুষ্ঠু, চমৎকার।

দেহ ও মন, দৈহিক পটুত্ব ও মানসিক বিচারশক্তির ওপর সমান গুরুত্ব আরোপ করা চীনা ব্যবহারিক বুদ্ধির পরিচয় দেয়। সেই ব্যবহারিক বুদ্ধিরই আর একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত, শাসন-কর্মচারীদের নিয়োগ ও বহাল রাখার ব্যাপারে গুণের বিচার ও পরীক্ষা। সম্রাট স্থন "প্রতি তিন বছর অন্তর গুণের পরীক্ষা (examination of merit) করতেন, এবং তিনটি পরীক্ষার পর যে ব্যক্তি কর্মে অপটু তার পদের অবনতি ঘটত, আর যে ব্যক্তি সুদক্ষ তার পদোন্নতি হত।"

'আদর্শ সম্রাট'দের আমলে এবং সিয়া ও স্যাং বংশীয়দের রাজত্বকালে আমরা যে শুধু চীনা গণতন্ত্রের ইঙ্গিতই পেয়ে থাকি তা নয়, কনফুসীয় নীতিধর্মের পূর্বাভাসও পাওয়া যায় সেখানে, যে নীতিধর্ম ব্যক্তি, পরিবার, রাষ্ট্র ও সম্রাটকে সামাজিক নিয়মের অনুশাসনে এক সঙ্গে জড়িয়ে বেঁধে দিয়েছিল। স্মরণ থাকতে পারে, স্থনের নির্বাচন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তাঁর পিতা ছিলেন অন্ধ ও অনাচারী, মাতা কপটাচারিণী, ভ্রাতা দাম্ভিক—কিন্তু এরূপ কদাচারী পরিবারবর্গকেও তিনি পিতৃভক্তি ও কর্তব্যনিষ্ঠার দ্বারা সৎপথে চালিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই নীতিকথার মধ্যেই নিহিত রয়েছে কনফুসীয় আদর্শের মূল। প্রকৃতপক্ষে প্রখ্যাত মন্ত্রী কাও-ইয়াও সম্রাট ইউ-কে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, সেই হিতকথার উপরই কনফুসীয় নীতিধর্ম প্রতিষ্ঠিত। তাঁর নীতিকথার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল: কাও-ইয়াও বললেন, "সর্বসমেত মানুষের চরিত্রে নয়টি সদ্‌গুণ দেখা যায়। যখন বলি, অমুকের একটি সদ্‌গুণ আছে, তার অর্থ এই যে, সে এইরূপ কাজ করে থাকে।" ইউ জিজ্ঞাসা করলেন, "সেই নয়টি সদ্‌গুণ কি কি ?" কাও-ইয়াও বললেন, "মর্যাদার সহিত আপ্যায়ন; দৃঢ়তার সঙ্গে মিশ্রিত নম্রতা; সম্মান রক্ষার সহিত স্পষ্ট ভাষণ; প্রশাসন ব্যাপারে সশ্রদ্ধ বিচক্ষণতার (reverent caution)

সহিত কর্মপটুত্ব; সাহসের সঙ্গে মিশ্রিত বিনয়, নম্রতার সঙ্গে মিশ্রিত অকৃত্রিম আচরণ, বিচক্ষণ দৃষ্টির সঙ্গে মিশ্রিত অমায়িক অসতর্ক ভাব, আন্তরিকতার সঙ্গে মিশ্রিত সাহস, সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে মিশ্রিত শৌর্য। মানুষ কার্য করে স্বর্গের প্রীতির জন্যে। স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে মানুষের সামাজিক সম্বন্ধ ও বিবিধ কর্তব্য। আমাদের পাঁচটি কর্তব্যের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, মর্যাদাপূর্ণ আচরণের পাঁচটি উপায় আমাদের সম্মুখে মুক্ত করা হয়েছে। সামাজিক মর্যাদা ও নানাবিধ অনুষ্ঠান স্বর্গের বিধানমত সুনির্দিষ্ট, সেই বিধানকেই মানুষ কাজে পরিণত করে। প্রজাবৃন্দের নৈতিক চরিত্র সুষ্ঠু (harmonious) ভাবে গঠিত হয় তখনই, রাজা ও মন্ত্রীগণ যখন স্বর্গীয় বিধানগুলিকে সম্মান ও ভক্তি করেন।" উপদেশ দান শেষ করে মন্ত্রী বললেন, "আমার কথাগুলি যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত (in accordance with reason), এবং সেই হিসাবে কাজ করা ব্যবহারিক হিসাবে সহজ ও সংগত।"

জনসমাজ ও রাজ্যের সমৃদ্ধি ঘটে রাজা যখন নীতিধর্মের অনুসরণ করেন। রাজা স্বর্গ কর্তৃক নিযুক্ত হলেও তাঁর রাজত্ব যে চিরস্থায়ী হবে এমন কোন কথা নেই। রাজার সিংহাসনকে রক্ষা করে রাজার ধর্ম— স্বর্গ নয়। এই কথা বলেছিলেন ই-ইন যখন তাঁর কর্মভার স্যাং বংশীয় রাজাকে প্রত্যর্পণ করে অবসর গ্রহণ করেছিলেন তিনি: "সিয়া বংশীয় রাজা পূর্বপুরুষের অনুষ্ঠিত ধর্মাচরণকে বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করতে পারেন নি, পিতৃগণের আত্মাকে (spirits) করেছিলেন অশ্রদ্ধা, আর প্রজাবৃন্দকে পীড়ন করেছিলেন। মহৎ স্বর্গ (Great Heaven) তাই তাঁকে রক্ষা করেন নি। স্যাং বংশীয় রাজা স্বীয় ধর্মাচরণের জন্যই স্বর্গের আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন। স্বর্গ তাঁকে কোন পক্ষপাতিত্ব দেখান নি, শুধু পবিত্র ধর্মকেই (pure virtue) পুরস্কৃত করেছিলেন। স্যাং প্রজাদের কাছে যান নি (তাদের আনুগত্য লাভের জন্য)—প্রজারাই সাগ্রহে পবিত্র ধর্মের (পক্ষপুটচ্ছায়ে) আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। রাজার ধর্মানুষ্ঠান যেখানে পবিত্র, সেখানে কর্মফল শুভ হয়। যেখানে ধর্ম দোলায়মান ও অনিশ্চিত, কর্ম সেখানে পণ্ডশ্রম মাত্র। ইষ্ট ও অনিষ্ট অন্যায়ভাবে মানুষের কাছে উপস্থিত হয় না। স্বর্গ দুঃখ-গ্লানি অথবা সুখ প্রদান করেন মানুষকে তার স্বীয়

আচরণের ফল রূপে।" 'ইতিহাস গ্রন্থে' স্যাং বংশীয়দের বর্ণনায় (Book of Shang) আর এক জায়গায় বলা হয়েছে: "যে দুর্গতি স্বর্গ চাপিয়ে দেন মানুষের ওপর, সেই দৈন্যের হাত থেকে মানুষ (সৎ আচরণের দ্বারা) অব্যাহতি পেতে পারে। কিন্তু যে দুর্দশা মানুষ ভোগ করে তার নিজের কর্মের দরুন সেই গ্লানি থেকে উদ্ধার অসম্ভব।"

নীতি-প্রসঙ্গে এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে—কি এই নীতিধর্ম? নীতির কি কোন একটি অপরিবর্তনীয় স্থায়ী আদর্শ রূপ বা 'মডেল' তৈরি করা সম্ভব? বৃদ্ধ মন্ত্রী ই-ইন বলেন, "নীতিধর্মের কোন অপরিবর্তনীয় আদর্শ নেই। শ্রেয়ের প্রতি পরম শ্রদ্ধাই নীতিকে একটি আদর্শ রূপ দান করে ('There is no invariable model of virtue ; a supreme regard to what is good gives the model of it')। যে বস্তু পরম শ্রেয় বলে পরিগণিত তার কোন অপরিবর্তনীয় গুণ নেই। শ্রেয় সম্বন্ধে সর্বজনীন চেতনার সঙ্গে সংগতি রক্ষা করলেই শ্রেয়ের সাক্ষাৎ মেলে ('It is found where there is conformity to uniform consciousness in regard to what is good')।" মনে হয়, ইংরেজ দার্শনিক বেনথাম (Bentham) যেন চীনা নীতিবাদের এই সূক্ষ্ম সংজ্ঞাকেই স্থূলভাবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর মতে, অধিকসংখ্যক মানবের হিতসাধনের উপযোগী বস্তুর নামই শ্রেয় (greatest good of the greatest number)। সেই সুদূর অতীতে চীন দেশে নীতিধর্মের এমন সূক্ষ্ম তত্ত্ববিচার সত্যই বিস্ময়কর।

সুপ্রাচীন কালেই চীন দেশে আমরা জ্যোতির্বিজ্ঞানের সূচনা দেখতে পাই। 'ইতিহাস গ্রন্থে' ইয়াও-র কানুনে (Canon of Yao) সম্রাট তাঁর ভ্রাতাদের জ্যোতির্গণনা বিষয়ে যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন তার বিশদ বর্ণনা আছে। তিনি আদেশ করেছিলেন তাদের, আকাশের বিস্তীর্ণ পটভূমি পরীক্ষা করে সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রসমূহের গতি এবং রাশিচক্রের আবর্তনের কাল নির্ধারণ করতে—আর তাই থেকে বিভিন্ন ঋতুর কাল নিরূপিত করে জনসাধারণের কাছে প্রচার করতে। তিনি বলেছিলেন, "দিনমানের দৈর্ঘ্য যখন মাঝামাঝি গোছের আর নক্ষত্র যখন 'নিয়াও' (Niao) রাশিতে বিরাজমান, তখনই তুমি মধ্য-বসন্তকাল নির্ধারিত করতে সমর্থ। চাষীরা তখন মাঠে কাজ করে, পশুপক্ষী প্রজননে ও মৈথুনে রত থাকে।… দিনমান যখন দীর্ঘতম,

নক্ষত্র যখন 'হুয়ো' (Huo) রাশিতে বিরাজমান, তুমি তখন মধ্য-গ্রীষ্মকাল নির্ধারণ করতে সমর্থ। লোকজন কর্মভারমুক্ত, পশুপক্ষীর গাত্রচর্মের অবস্থাও ভাল।……দিনমান যখন ক্ষুদ্রতম, নক্ষত্র যখন 'মাও' (Mao) রাশিতে বিরাজমান তখন তুমি মধ্য-শীতকাল নির্ধারিত করতে সমর্থ। জনগণ থাকে গৃহমধ্যে আবদ্ধ। পশুপক্ষীর চর্ম তখন পুরু লোম ও পালকে ভরে ওঠে।…… তিন শো ছেষট্টি দিনে বর্ষ গণনা করবে এবং বর্ষপঞ্জীর মধ্যবর্তী মাসসমূহ (inter-calary months) দ্বারা চারটি ঋতু ও পূর্ণ বৎসর নির্ধারিত করবে।"

মিশর ও ব্যাবিলোনিয়ার মত চীন দেশে জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা ধর্মের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ছিল, তবে এখানে যে জ্যোতিবিদ্যার ব্যবহারিক প্রয়োগ বিষয়ে অধিক জোর দেওয়া হয়েছে, উপরে উদ্ধৃত অংশ সেই কথাই প্রমাণ করে। রাজা বর্ষপঞ্জী প্রস্তুত করতেন শাসন-সৌকর্যের জন্য যেমন, ধর্মের জন্যও তেমনি। জ্যোতির্বিজ্ঞানের চর্চা করা হত বর্ষপঞ্জী প্রস্তুত করবার জন্য। আর বর্ষপঞ্জীর প্রয়োজন, দেবতারা যাতে নিয়মিত সময়ে অর্ঘ্য লাভ করে স্বকার্য সাধনে উৎসাহিত হন। ফলিত জ্যোতিষ বা সামুদ্রিক বিদ্যাও (Astrology) বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেছিল। 'ইতিহাস গ্রন্থে' বলা হয়েছে, "সম্রাট স্থন রাজপদ গ্রহণ করবার অব্যবহিত পরেই আড়াআড়িভাবে অবস্থিত পাথরের চোঙাযুক্ত মুক্তাখচিত একটি ঘুরন্ত গোলক পরীক্ষা করলেন, আর সেই সঙ্গে 'সপ্তনিয়ন্তার গতি' পদ্ধতিক্রমে সুসম্বদ্ধ করলেন (He examined the pearl-adorned turning sphere with its transverse tube of jade and reduced to a harmonious system the movements of the Seven Directors)। তারপর তিনি ঈশ্বরের উদ্দেশে বিধিমত বলিদান করলেন, শ্রদ্ধা সহকারে শুদ্ধ চিত্তে 'ছয়টি শ্রদ্ধেয় আত্মা'র (Six Honoured Ones) তর্পণ করলেন। পর্বত ও নদীর উপযুক্ত পূজা করলেন এবং অসংখ্য প্রাকৃতিক শক্তির ও পিতৃপুরুষগণের আত্মার উদ্দেশে অর্ঘ্য নিবেদন করলেন।" আরও বলা হয়েছে যে সম্রাট সফর থেকে ফিরে 'কৃষিগুরু আদিপুরুষের মন্দিরে' একটি বৃষ বলি দিয়েছিলেন।

এমনি সব বিবরণ থেকে অতি-প্রাচীন কালের প্রাক-কনফুসীয় যুগের ধর্ম সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করা কঠিন নয়। জাতির আদিম ধর্মকে পরবর্তী

প্রাগৈতিহাসিক কালের বিশ্বাস অনেকখানি বদলে দিয়েছিল সত্য, কিন্তু সেরূপ পরিবর্তন সত্ত্বেও নিশ্চিতভাবেই বলা চলে যে, সেই আদিকালে চীনা ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তির ওপর। সম্ভবত সংস্কৃতির সূত্রপাত থেকে প্রকৃতির উপাসনা, স্থূল প্রকৃতি ও তার অন্তর্নিহিত দৈবশক্তি উভয়েরই পূজার বিধান প্রচলিত ছিল। স্থূল প্রকৃতির নাম 'ইন' (Yin)। সূক্ষ্ম বা অন্তর্নিহিত শক্তির নাম 'ইয়াং' (Yang)। ইয়াং গতিশীল কর্মশক্তির প্রতীক, আর ইন বিশ্বের স্থাবর জড় বা স্থিতিশীল অবস্থাকেই প্রতিফলিত করে। ইয়াং ও ইন এই দুই গুণের সংমিশ্রণে বিশ্বের যাবতীয় স্থূল ও সূক্ষ্ম বস্তুর সমুদ্ভব, এই দার্শনিক তত্ত্বটি হয়তো বা পরবর্তী কালের, কিন্তু মূল শক্তিদ্বয় ইয়াং ও ইন-এর কল্পনা আদিম যুগের বলেই মনে হয়। ইয়াং স্বর্গের অর্থাৎ সক্রিয় জীবন-জ্যোতির প্রতীক, পুরুষের গুণধর্ম-বিশিষ্ট (male principle), এবং পূর্ববর্ণিত 'ট্রাইগ্রামের তিনটি পূর্ণ লাইনে চিহ্নিত'— যেমন — । ইন স্ত্রীধর্মবিশিষ্ট (female principle) নিষ্ক্রিয়তা, অন্ধকার ও মৃত্যুর প্রতীক, 'ট্রাইগ্রামের তিনটি ভগ্ন লাইনে চিহ্নিত'। এমনি দুর্বোধ্য আকারে এইসব গুণের সঙ্গে ফলিত জ্যোতিষকেও (divination) যুক্ত করা হয়েছে। অবশ্য ফলিত জ্যোতিষের রূপ পূর্ণ ও ভগ্ন লাইন ছাড়া আরও অনেক প্রকার ছিল, যেমন কচ্ছপের চাড়ির চিহ্ন পরীক্ষা। প্রকৃতি-বাদের সঙ্গে জড়িত এমনি আর একটি কু-সংস্কার 'ফেং স্থই'—অর্থ 'বায়ু-জল', অথবা 'জিওম্যান্সি' (Geomancy) বা 'ভূ-লক্ষণ' নামে একটা ভুয়া চীনা বিজ্ঞান। পক্ষান্তরে অধ্যাত্ম-সত্তাবাদ (spiritism) দেখা দিয়েছে চীন দেশে 'পিতৃ-তর্পণ' রূপে। মৃতের আত্মা ভয় ও শ্রদ্ধা-ভক্তির পাত্র। কোন আত্মার মধ্যে কতখানি ইয়াং বা ইন গুণ নিহিত রয়েছে, সেই গুণের পরিমাণ থেকেই সেই আত্মা মানুষের হিতকারী বা অনিষ্টকারী হয়ে ওঠে। পিতৃ-পুরুষের আত্মাই বিশেষ ভক্তিভাজন। সর্বকালে চীনা ধর্মে পিতৃ-তর্পণ ও পিতৃপুরুষের উদ্দেশে বলিদানই ছিল প্রধান ধর্মীয় অনুষ্ঠান। বংশধরগণের কল্যাণার্থ স্বর্গত আত্মার সাহায্য ভিক্ষা এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। মানুষের আত্মা দ্বিবিধ, 'পো' বা নিকৃষ্ট জান্তব আত্মা আর 'হান' বা শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক আত্মা। জান্তব আত্মা পো-র উৎপত্তি মাতৃগর্ভে ভ্রূণের জন্মের সঙ্গে, আর মানুষের পৃথিবীতে জন্মগ্রহণকালে তার আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠ আত্মা বা 'হান'-এর

উদ্ভব। মৃত্যুর পর এই দুই আত্মার গতি বিভিন্ন। 'পো' সমাধি-গর্ভে মৃতের দেহের সঙ্গে অবস্থান করে, মৃতের উদ্দেশে বংশধরদের বলি গ্রহণ করে। নিয়মিত অর্ঘ্যাদি দানে বাধা ঘটলে সেই আত্মা হয় 'কুয়েই' বা বুভুক্ষু প্রেতাত্মা, মানব-শত্রু রূপে পৃথিবীর অকল্যাণ করে। সমাধি-গর্ভে পো-র অবস্থিতি সাময়িক মাত্র, মৃতের দেহটি যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় পো তখন পাতালপুরীর ছায়া-জীবন যাপন করে। মৃত ব্যক্তির হান বা শ্রেষ্ঠ আত্মা স্যাং তি-র স্বর্গীয় প্রাসাদে উপনীত হয় এবং সেখানে সেই পরম-পিতার (Great Ancestor) প্রজারূপে বসবাস করে। যাত্রাপথে আত্মার বিঘ্নের অন্ত নেই। নানান অশুভ শক্তি আছে, আর স্বর্গীয় প্রাসাদদ্বারে আছে রক্ষকরূপে একটি নেকড়ে বাঘ (Heavenly Wolf)। বুদ্ধি ও কৌশল বলে এইসব আপদবিপদ, বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে হলে শ্রেষ্ঠ আত্মাকে বংশধরদের অর্ঘ্য নৈবেদ্য গ্রহণ দ্বারা শরীরে শক্তি সংগ্রহ করতে হয়। স্বর্গে গিয়েও হান-এর অর্ঘ্য বলির প্রয়োজন শেষ হয় না, কেননা বুভুক্ষু পো-র মত খাদ্যের অভাবে সে-ও প্রেতরূপে অনন্ত দৈন্য ভোগ করে। প্রকৃতপক্ষে চীন দেশে আদিম কাল থেকে দানবপূজা (Demonocracy) যুগ যুগ ধরে চলে এসেছে, চিরদিন তাবিজ মাদুলি ধারণ করেছে মানুষ ভূত, প্রেত, দুষ্ট মানবের কবল থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্য।

স্যাং তি পরম পিতা, পরম পুরুষ, পরমেশ্বর (Supreme Being)। অর্ঘ্য বলি দিয়ে এই পরমেশ্বরের পূজার অধিকার একমাত্র রাজার। অন্যান্য ব্যক্তিরা করত পিতৃপুরুষের পূজা। পরলোকবাসী শ্রেষ্ঠ আত্মা তৃপ্ত হলে আকাশ থেকে বারিবর্ষণ হয়, শস্য জন্মে। মিশরে অসিরিস-পূজার উদ্ভব হয়েছিল কৃষিকার্যে দেবতার অনুগ্রহ লাভের জন্য—চীনাদের পিতৃ-তর্পণ প্রথার উৎপত্তির কারণও হয়তো তাই। ব্রঞ্জ বা অস্থির ওপর লিপি-লিখন পরীক্ষা করে 'সিনোলজিস্ট' বা চীন-তত্ত্ববিদেরা যে অদ্ভুত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন প্রঃ কার্লগ্রেন (Karlgren)। তিনি বলেন, পিতৃপুরুষ অর্থ-ব্যঞ্জক চীনা চিত্রাক্ষরটি প্রকৃতপক্ষে একটি লিঙ্গ বা পুরুষাঙ্গের ছবি। অন্য প্রমাণ থেকেও জানা যায়, আদিম জাতিরা উর্বরা-শক্তির (cult of fertility) পূজা করত যে উদ্দেশ্যে, চীনাদের পিতৃপূজার

উদ্দেশ্যও তেমনি ফসল-সৃষ্টি, আর লিঙ্গ-পূজা (phallism) থেকেই সেই পিতৃ-তর্পণের উদ্ভব হয়েছিল।

প্রাচীন কালে ও সামন্তযুগে পিতৃপূজা অভিজাত-গোষ্ঠীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কৃষকবর্গের গোষ্ঠী, কুলশীল কিছুই ছিল না, পিতৃ-তর্পণের অধিকার ছিল না। ভূমির মালিক ছিল অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তি, দাসরূপে কৃষিজীবীরা তাদের জমি চাষ করত। প্রতিটি গ্রামে ছিল পঁচিশ ঘর কৃষকের বাস, এবং পল্লী-দেবতা 'সে'-র পূজা ছিল তাদের একমাত্র ধর্ম-কর্ম। অভিজাত গৃহে বিবাহে জাঁকজমক ঘটার অভাব ছিল না, পাত্রী শ্বশুরঘরে পিতৃপুরুষের মন্দিরে পূজার অধিকার লাভ করত। কিন্তু চাষাদের ছিল একটিমাত্র বসন্তকালের পর্ব যাকে মদনোৎসব বলা চলে। সেই উৎসবে যুবক-যুবতীর অবাধ মিলন ঘটত, রতিক্রিয়া চলত এবং তার ফলে কোন যুবতীর গর্ভ-সঞ্চার হলে শরৎকালে তার বিবাহের উদ্যোগ নৈষ্ঠিকভাবে করা হত। অভিজাতবর্গ ছিলেন একাধারে পূজারী ও শাসক সম্প্রদায়, বলি নৈবেদ্য অর্পণ করতেন তাঁরা শুধু নিজের মঙ্গলার্থে নয়, বিশ্বমানবের সুখ-শান্তির জন্য। চীন দেশে কোনদিন পুরোহিত বলে কোন সম্প্রদায় গড়ে ওঠে নি তার একটি কারণ বোধ করি এই যে, বিশ্বহিতার্থ পূজার ভার কোন সম্প্রদায়বিশেষের ওপর ন্যস্ত করা হয় নি, সে কাজ অভিজাত বংশীয়েরা নিজেরাই সম্পন্ন করতেন।

এক শ্রেণীর গণক ছিল যারা কচ্ছপের তপ্ত চাড়ির ফাটল-চিহ্ন পরীক্ষা করে ভাগ্য গণনা করত। কালক্রমে এই গণকগোষ্ঠী অভিজাত-কুলের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল, কিন্তু আর এক শ্রেণীর ঐন্দ্রজালিক সম্প্রদায় ছিল, তাদের নাম 'উ'। যাদুকর যাদুকরী দু-ই ছিল দলে, আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী বলে দাবি করত তারা। গান ও ঢাক-ঢোলের সঙ্গে নৃত্য করতে করতে যাদুকর যখন মূর্ছিত হয়ে পড়ত, ভক্তরা তখন তার মুখ-নিঃসৃত কথাগুলিকে দৈববাণী বলেই গ্রহণ করত। পরবর্তী কালে কনফুসিয়াসের নীতিধর্ম প্রসারের সঙ্গে উ-সম্প্রদায়ের নৃত্যগীত ঢাকঢোল-বাদ্য সদাচারবিরুদ্ধ বলে মনে করতেন অভিজাতবর্গ, এবং সেই থেকে এই সম্প্রদায়ের জনপ্রিয়তা নিম্নশ্রেণীর চাষাভুষাদের মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। চৌ-যুগের আলোচনায় আমরা দেখতে পাব, তাও-দর্শনের গভীর তত্ত্বের

পরিণতিস্বরূপ যে ধর্মের প্রবর্তন করেছিল তাও-পন্থীরা সেই তাও-ধর্ম কিরূপে এই যাদুকর সম্প্রদায়ের প্রভাবে প্রেতপূজার লীলাক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল।

নদী ও নিঝরিণীর প্রাণ-দেবতারা দেব-মঞ্চের একটি মর্যাদাপূর্ণ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করত। প্লাবন চীনের একটি প্রাচীন কালের অনাসৃষ্টি ব্যাপার, সেই ধ্বংস থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে নদী-দেবতার পূজা করা হত। নদী-দেবতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন হো-পো, অর্থাৎ 'পীত নদীর অধীশ্বর' ('the count of the Yellow River'), যে নদীর উপত্যকা ভূমিতে চীনা সভ্যতার জন্ম। এখানে যাদুকর উ-সম্প্রদায়ের একটি বিখ্যাত মন্দিরে দেবতার প্রীত্যর্থে নরবলি দেওয়া হত। একটি সুন্দরী যুবতীকে নির্বাচিত করতেন মন্দিরের পূজারিনী, দেবতার শয্যাসঙ্গিনী রূপে (bride of the count), তারপর তাকে বিচিত্র বসনভূষণ পরিয়ে বাসক-শয়নে শায়িত করে নদীবক্ষে বিসর্জন দিতেন। এই বিসর্জন নরবলির একটিমাত্র দৃষ্টান্ত নয়। রাজা, সামন্ত, এমন কি কোন অভিজাত বংশীয় ব্যক্তির মৃত্যু হলে পরিচর্যার জন্য তার স্ত্রীগণ ও কতিপয় সহচরকেও জীবন্ত সমাধি দেওয়া হত। ইতিহাসে বর্ণিত আছে, চি প্রদেশের ডিউক বা সামন্তরাজ হুয়ান (খৃঃ পূঃ ৬৮৫-৬৪৩)-এর মৃত্যুর পর পুত্রগণের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে বিবাদ বাধে এবং সেজন্য অযত্ন-বশত তাঁর মৃতদেহ কয়েক মাস অপ্রোথিত অবস্থায় পড়ে থাকবার পর যখন তাঁকে সমাধি দেওয়া হল তখন বহুসংখ্যক নারীকে সহমরণে যেতে হয়েছিল। চৌ-যুগের পর এই নৃশংস প্রথাটির অনুষ্ঠান ব্যাপক না হলেও সপ্তদশ খৃস্টাব্দের পূর্বে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয় নি।

চীন দেশে প্রত্নতত্ত্বের আবিষ্কার মিশর ও পশ্চিম এশিয়ার তুলনায় অপ্রচুর, তার কারণ পুরাকালের স্থায়ী অবশেষ তেমন বেশি নেই যার উদ্ধার সম্ভবপর। সেখানে স্ফিন্‌ক্সের মত প্রস্তরমূর্তি নেই, উর, নিনেভে, মাহেঞ্জোদারোর মত খনন-ক্ষেত্রও নেই। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের অভাব সত্ত্বেও স্যাং ও পরবর্তী চৌ যুগের অনেক তথ্যই আমরা জানতে পেরেছি। এই তথ্যগুলি জানা যায় সেকালের ব্রঞ্জের পাত্র, প্রতীক পাথর, হস্তিদন্তের কারুশিল্প থেকে। পিতৃপুরুষের পূজার সামগ্রী ছিল এইসব সূক্ষ্ম নিপুণ কারুখচিত শিল্প-বস্তু, যার অপরূপ বৈচিত্র্য আধুনিক রূপদর্শীকেও মুগ্ধ করে। এই কারুকার্যগুলিকেই চিত্রিত বা উৎকীর্ণ করা হয়েছে সে যুগের

মৃৎপাত্র ও নানাবিধ অস্থি-প্রস্তর ও ব্রঞ্জনির্মিত নিত্যব্যবহার্য জিনিসের ওপর। জ্যামিতিক অঙ্কন-সজ্জা, ত্রিভুজ বা চতুর্ভুজ রেখা-চিহ্নে পশুর ছবি কিংবা প্রতীক-চিহ্ন গতি-ছন্দে জীবন্ত হয়ে উঠেছে যেন। কিন্তু জ্যামিতিক রেখাঙ্কন নিতান্ত আনুষ্ঠানিকভাবেই শিল্পীকে আড়ষ্ট করে বেঁধে রেখেছিল, আর সেই বন্ধন থেকে মুক্তি পেল সে চৌ-যুগের অবসানের পর চি'ন সাম্রাজ্যকালে, সম্ভবত পশ্চিম মরুদেশের যাযাবর জাতির সঙ্গে সংযোগের ফলে।

হোনানের খনন-কার্যে কতগুলি কচ্ছপের চাড়ি, মেষের খুর, হরিণের শিং ও অন্যান্য অস্থিখণ্ড উদ্ধার করা হয়েছে, সেগুলি 'ভবিষ্যদ্বাণীর অস্থি-লিপি' (Oracle bones)। সেগুলির ওপর স্যাং যুগের লিখনে জ্যোতির্গণনার ফল এবং সেই প্রসঙ্গে স্যাং নৃপতিগণের নাম লেখা রয়েছে। প্রাচীনতম চিত্র-লিখনগুলি ১৪০০-১২০০ খৃঃ পূর্বাব্দের। লিখন 'আর্কেয়িক' বা পুরানো ধাঁচের হলেও শৈশবাবস্থা অতিক্রম করেছে, যেহেতু লিখন তখন পিকটোগ্রাফ বা চিত্ররূপ ছেড়ে আইডিওগ্রাফ বা ভাবরূপের পর্যায়ে উঠেছে এবং তারই মাধ্যমে ভাব-মূলক চিন্তা (abstract ideas) ব্যক্ত করতে সমর্থ হয়েছে। অক্ষরগুলি বাঁশ, কাষ্ঠ বা অস্থিখণ্ডের ওপর উৎকীর্ণ।

সাহিত্য-চর্চার প্রথম পরিচয় পাই আমরা স্যাং যুগে। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দে কনফুসিয়াস প্রাচীন কবিতা সংগ্রহ করে "পদ্যগ্রন্থ" রচনা করেছিলেন। এই বইখানায় খৃঃ পূঃ দ্বাদশ শতাব্দে লেখা কয়েকটি কবিতা আছে, সেগুলির ইংরেজি অনুবাদ করেছেন হেলেন ওয়াড্‌ডেল। সে-কালের চীনা পদ্য রচনার নমুনাস্বরূপ দুটি কবিতা নিম্নে দেওয়া গেল :

শষ্পে শষ্পে জমেছে শিশির,
দিনান্তের রাঙা রবি
ডুবে গেছে দিগন্তের বাঁকে।
ঢালো সুরা,
দাও ভরে পাথর-পেয়ালা
নিশীথিনী ওই বুঝি
ছল-ভরা ইশারায় ডাকে।

শিশির বিছানো রবে রাতে,
তৃণদলে লতায় পাতায়
কাল নাই—শিশির শুকাবে—
নিশীথিনী, কই সে কোথায় ?

সম্ভবত জগতের কাব্য-কুঞ্জে এই কবিতাটি সর্বপ্রথম মদিরামত্ত পিকগান। ওমর খৈয়ামের অপূর্ব স্বরমূর্ছনায় যেন এই কবিতার ঝংকার শুনতে পাই।

লতিয়ে উঠেছে মাধবীর লতা মাথার 'পরে,
ফুলগুলি সব রঙ-বেরঙের বাহার ধরে,
আমার মন যে কেমন করে !

শুকনো ঘাসে মর্মর ওঠে
ভাবি—এ বুঝি কার পদধ্বনি ;
পতঙ্গের ঝিল্লিরব শুনি !

নূতন চাঁদের ঝিকিমিকি—উঠি গিরিশিরে,
দেখি, দখিন পথে চলেছে সে ধীরে,
হৃদয় আমার নামায় বোঝাটিরে !

কল্প-কল্পান্তের অন্তরাল থেকে উৎকণ্ঠিতা অভিসারিকার মর্মবাণী শোনা যায় যেন—যে বাণী ফুকরে বেরিয়েছে সকল দেশের, সকল কালের প্রেমিকার মুখে !

সংগীতবিদ্যার চর্চা চীনা সভ্যতার আদিকাল থেকেই দেখা যায়। সম্রাট স্থন সংগীতজ্ঞ কুয়েই-এর ওপর রাজকুমারদের সংগীত শিক্ষার ভার অর্পণ করেছিলেন, "যেন শিক্ষার গুণে সরল ব্যবহার হয় বিনয়নম্র, ভদ্র আচার হয় মর্যাদাশীল, পরাক্রান্ত ব্যক্তি হয় অমায়িক। পদ্য গভীর চিন্তাকে ব্যক্ত করে, আর গান সেই অভিব্যক্তিকে কণ্ঠস্বরে রূপায়িত করে। কণ্ঠস্বরে স্বর-যোজনা করা হয়। সংগীত-যন্ত্রের (standard tubes) ধ্বনি-সংযোগে নানান স্বরের মিলন সাধিত হয়। ফলে অষ্ট প্রকার সংগীত-যন্ত্রের স্বর এমনি

করে বাঁধা সম্ভব যে কোন একটি যন্ত্র অপর কোন যন্ত্রকে বাধা দান করবে না।" ইতিহাস গ্রন্থে সংগীত-চর্চার এই বিবরণ থেকে বোঝা যায় যে সংগীত তখন খুবই উন্নত পর্যায়ে উঠেছিল। কুয়েই বলেছিলেন, "আমি পাথুরে বাদ্যযন্ত্রে (sounding stone) মৃদু আঘাত করি, আর পশুরা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে নৃত্য আরম্ভ করে।"

পূর্তকার্যে ইঞ্জিনিয়রগণের দক্ষতা বিষয়ে পূর্বে বলা হয়েছে। চীনা সভ্যতার জন্ম ও সংবৃদ্ধি ঘটেছে এঁটেল মাটির দেশে। এ সময়কার চীনাদের 'পঙ্কের সন্তান' ('children of the clay') বলা যেতে পারে। পীত নদী উপত্যকার কানসু, সেনসি ও হোনান প্রদেশ জুড়ে অনেক ফুট গভীর এই কর্দম-মাটি। সব দেশে যেমন ভৌগোলিক পরিবেশ জাতীয় চরিত্রকে গঠিত করে, চীনেও তেমনই মানুষের জীবনযাত্রা ও সমাজ-সংস্থার ওপর এই কর্দম-মাটির নরম অথচ চিটচিটে প্রভাব গিয়ে পড়েছিল। উর্বরা ভূমিতে পূর্তকার্য সম্ভব হয়েছিল বলেই পারিবারিক সংহতি চীনা জীবনের একটি বৈশিষ্ট্যরূপে দেখা দিয়েছিল। বৃহৎ পরিবার প্রতিপালনের উপযোগী যথেষ্ট জমি ছিল সেখানে। বস্তুত সেই দিগন্তবিস্তৃত বিশাল ভূখণ্ড ছিল বসতি-বিরল, সকলের পক্ষেই উর্বর কৃষিক্ষেত্র ছিল সহজলভ্য। এখানে যুদ্ধ বা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয় নি। বলপূর্বক কারু জমি জবরদখল করা অপেক্ষা অনধিকৃত পতিত ভূমি চয়নে বিড়ম্বনার সম্ভাবনা অল্প। তাই ব্যাবিলোনিয়ায় যেমন পরস্ব-গৃধ্নু ভ্রাম্যমাণ জাতির উপদ্রব ঘন ঘন ঘটে এসেছিল, তেমন কোন সংকট এখানকার উপত্যকার স্থিতিবান লোকদের সামনে দীর্ঘকাল ধরে উপস্থিত হয় নি। পরবর্তী কালে মাঝে মাঝে মরুবাসী হূনদের আক্রমণ দেখা দিয়েছিল—কিন্তু সে এক স্বতন্ত্র ইতিহাস।

দ্বিতীয় পর্ব

চৌ বংশ (খৃষ্ট পূর্ব ১১২২-২৪৯)

১. মহারাষ্ট্র গঠন ও সামন্ততন্ত্র

শ্যাং বংশের পরম অত্যাচারী রাজা চৌ-সিনকে যুদ্ধে পরাস্ত করে ওয়েন-ওয়াং-এর পুত্র ফা কিরূপে চৌ রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে। উ ওয়াং বা 'যোদ্ধা রাজা' ('The Warrior King') এই পদবীর দ্বারা ভূষিত করা হয়েছিল ফা-কে যখন তিনি সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি সেই চৌ বংশীয় রাজাদের শাসন দীর্ঘ নয় শতাব্দ ধরে চলেছিল। এত দীর্ঘকালের রাজত্ব চীনের অন্য কোন রাজবংশের ভাগ্যে ঘটে ওঠে নি। প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের মঞ্চে চীনের প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল চৌ বংশীয়দের রাজ্যকাল থেকেই। অবশ্য আমরা দেখেছি যে চীনা রাজধর্ম, নীতিধর্ম ও গণধর্মের ভিত্তিমূল ইতিপূর্বেই সংস্থাপিত হয়েছিল, সাহিত্য-ক্ষেত্রেও রূপের বিকাশ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পূর্বকার এইসব সাংস্কৃতিক উপাদান ও ঐতিহ্যকে নূতন রূপায়ণে মহীয়ান করে তুলেছিলেন যেসব মহাপুরুষ তাঁদের অভ্যুত্থান ঘটেছিল এই যুগেই এবং সেই হিসাবে চৌ-যুগকে চীনা সংস্কৃতির স্বর্ণ-যুগ বলে অভিহিত করা চলে। তাও-ধর্মের প্রবর্তক লাওৎসি (Laotze) আর আচার, নিষ্ঠা ও নীতিতত্ত্বের সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক কনফুসিয়াস (Confucius)—এই দুই মহাপুরুষ এই যুগের ইতিহাসকে যে অক্ষয় রত্নরাজি দিয়ে ভূষিত করেছিলেন তার গৌরবোজ্জ্বল মহিমা আজও ম্লান হয়ে যায় নি। এই মনীষীদ্বয়ের পন্থা অনুসরণ করে আরও কয়েকজন দার্শনিক, সুধী ও সাধু-সন্তের আবির্ভাব হয়েছিল এই যুগে, তাঁদের বিষয় যথাকালে বর্ণিত হবে।

রাজনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে চৌ বংশের প্রধান কৃতিত্ব—রাজ্যের সম্প্রসারণ দ্বারা চীনের একীকরণ বা মহারাষ্ট্র গঠন। এই সম্প্রসারণের স্বাভাবিক ফলস্বরূপ কেন্দ্রশক্তির দৌর্বল্য দেখা দিয়েছিল এবং সেই সঙ্গে এক প্রকার সামন্ততন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল। সম্রাট উ-ওয়াং তাঁর সমর-বিজয়ী নেতাদের পুরস্কৃত করেছিলেন পঞ্চশ্রেণীর আভিজাত্যের আসন দান

করে। এই পাঁচটি উপাধি ছিল ডিউক, মার্কুইস, আর্ল, ভাইকাউন্ট ও ব্যারনেরই শামিল। প্রত্যেক শ্রেণীর ব্যক্তিগণের জন্য সসম্মান জীবনধারণের উপযুক্ত পরিমাণ ভূমি নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। ফলে প্রত্যেক ডিউক বা মার্কুইস ১০০ বর্গ লি (১ লি = ⅓ মাইল), প্রত্যেক আর্ল ৭০ বর্গ লি এবং প্রত্যেক ভাইকাউন্ট বা ব্যারন ৫০ বর্গ লি ভূমি লাভ করেছিলেন। শাসককুলের মধ্যে এইরূপে ভূমি বণ্টনের সঙ্গে সারা দেশটিকে অসংখ্য জেলায় ও জেলার সমাহারে বিভক্ত করা হয়েছিল। পাঁচটি জেলার ওপর একজন 'চ্যাং' (head বা মুখ্য), দশটি জেলার ওপর একজন 'সুয়াই' (marshal বা নায়ক), ত্রিশটি জেলার ওপর একজন 'চেং' (chief বা প্রধান) এবং দু শ' দশটি জেলার ওপর একজন 'পো' (superior বা সর্বাধিনায়ক) নিযুক্ত করা হয়েছিল। এমনি করে ৭৭৩টি খণ্ডরাজ্য গঠিত হয়েছিল, আর সেই খণ্ডরাষ্ট্রগুলির ওপর কেন্দ্রশক্তির প্রভাব ছিল ক্ষীণ ও পরোক্ষ।* কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ব্যবস্থাটিকে ঠিক সামন্ততন্ত্র বলা চলে না যেহেতু প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রগুলি ছিল অর্ধ-স্বাধীন, কেন্দ্রশক্তির মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে একটি শ্লথ সংযোগে (confederation) আবদ্ধ। এই খণ্ডরাষ্ট্রগুলির সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পেয়েছিল। কনফুসিয়াসের কালে সংখ্যা মাত্র বাহান্নটিতে পর্যবসিত হয়েছিল। খৃঃ পূঃ ২৪৯ অব্দে চি'ন বংশীয়দের রাজত্বকালে এই খণ্ডরাষ্ট্রগুলি একটিমাত্র পরাক্রান্ত রাষ্ট্রশক্তির মধ্যে বিলীন হয়েছিল। সুদীর্ঘ চৌ-যুগে আর যেসব রাজনৈতিক ব্যাপার ঘটেছিল তার মধ্যে এই দুটি বৃত্তান্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য : প্রথমত, উত্তরাঞ্চলের তাতার ও হূনদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ ও দক্ষিণাপথের আদিবাসীদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান—দ্বিতীয়ত, কনফুসিয়াসের আবির্ভাবের পর ভক্ত শিষ্যবৃন্দ, দার্শনিক ও শাসকবর্গের উৎসাহপূর্ণ প্রচারকার্য ও আগ্রহান্বিত সমর্থনের ফলে কনফুসীয় নীতি-পদ্ধতির সুপ্রতিষ্ঠা—যে নীতি-পদ্ধতি চীন দেশে সার্ধ দ্বি-সহস্র শতাব্দী ধরে চলে এসেছে।

* খৃঃ পূঃ অষ্টম থেকে চতুর্থ শতাব্দ পর্যন্ত চৌ-যুগের রাজ্যের অবস্থা আলোচনা প্রসঙ্গে মিঃ লিয়াং-চি-চাও তাঁর *China and the League of Nations* গ্রন্থে বলেছেন, "There were in the Hwang-ho and Yang-Tse valleys no less than five or six thousand small states with about a dozen states dominating over them."

'যোদ্ধা-রাজা' উ-ওয়াং মহাবীর হলেও যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন না। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই যুদ্ধ-অশ্ব ও বৃষসমূহ কৃষকদের দান করেছিলেন তিনি কৃষিকার্যের জন্যে। এই বি-অস্ত্রীকরণের মূলে তাঁর শান্তিকামনা সুপরিস্ফুট। কিন্তু তা সত্ত্বেও সর্বপ্রকার যুদ্ধোদ্যমের এমনি বিরোধী ছিল কনফুসীয় নীতিধর্ম যে এই রাজা সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য করেছেন মনীষী কনফুসিয়াস: "সম্রাট উ-র বিজয়-দুন্দুভির নিনাদ শ্রুতিমধুর হলেও সর্বতোভাবে উত্তম ছিল না (The music with which Emperor Wu celebrated victories though perfectly beautiful was not perfectly good)।" সম্রাট উ ছিলেন সাহিত্যানুরাগী ও কবি—কবিতা রচনা করে সাধারণ্যে প্রচার করেছিলেন। স্যাং-বংশীয় চৌ সিনের বিরুদ্ধে তাঁর একটি অভিযোগ ছিল এই যে, "গুণানুসারে কর্মচারী নিয়োগ করেন নি এই নৃপতি, বংশমর্যাদার পদ্ধতি ধরেই নির্বাচন করতেন"। এই উক্তিটিতে সম্রাটের গণতান্ত্রিক ন্যায়নিষ্ঠা প্রতিপন্ন হয়। রাজ্যে নানাবিধ সংস্কারকার্যের অনুষ্ঠান করেছিলেন তিনি—যেমন বর্ষপঞ্জীর সংস্কার, শিক্ষায়তনের প্রতিষ্ঠা, আর্তদের জন্য আশ্রম নির্মাণ। সিয়ান-ফু নগরে তিনি রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন।

চৌ-কুং

জনবরেণ্য নৃপতি ছিলেন উ-ওয়াং—কিন্তু তাঁর রাজত্বের গৌরব-সূর্যরূপে জ্যোতি বিকীর্ণ করতেন তাঁরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা চৌ-কুং বা চৌ'র ডিউক (Duke of Chou)। চৌ-কুং-এর প্রকৃত নাম তান। ইনি ছিলেন রাজার সুযোগ্য মন্ত্রী—রাজা তাঁকে সানটাং প্রদেশে লু রাজ্যটি দান করেছিলেন যেখানে পরবর্তী কালে কনফুসিয়াসের জন্ম হয়েছিল। চীনবাসীরা যে মহামনীষী-ত্রয় ("The Great Sages")-এর গৌরবমণ্ডিত আসন সম্রাটগণের ঊর্ধ্বে চিরকাল নির্ধারিত করে এসেছে চৌ-কুং সেই তিনজনের অন্যতম—আর দুই-জন ছিলেন বিগতকালের সম্রাট ইউ এবং ভাবীকালের দার্শনিক কনফুসিয়াস। প্লাবন রোধ করেছিলেন সম্রাট ইউ এবং রাজ্যে শৃঙ্খলা স্থাপন করেছিলেন, আর চৌ-কুং পশ্চিম ও উত্তরাঞ্চলের বর্বর জাতিগণকে বশীভূত করতে সমর্থ হয়েছিলেন, হিংস্র পশুদের বিতাড়িত করে প্রজকুলকে নিরুপদ্রব করেছিলেন।

'তিন লাইন' বা 'ট্রাইগ্রাম' থেকে 'ছয় লাইন' বা 'হেক্সাগ্রামে'র উদ্ভবের কথা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। তাদের পিতা ওয়েন-ওয়াং হেক্সাগ্রাম পরিকল্পনাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন, আর চৌ-কিং ওরফে তান পিতৃনির্দিষ্ট পথের অনুসরণ করে 'ই কিং' বা 'পরিবর্তন গ্রন্থে'র উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করলেন। হেক্সাগ্রামের লাইনসমূহের ব্যাখ্যা সমগ্রভাবে করেছিলেন তাঁর পিতা, আর তিনি প্রস্তুত করলেন প্রত্যেকটি লাইনের ভাষ্য। সে যুগের প্রশাসন ব্যাপারে নূতন বিধানপদ্ধতির প্রবর্তনের কৃতিত্ব তাঁরই—প্রমাণ, চৌ-কুং প্রণীত চৌ লি নামে শাসন বিষয়ক একখানি গ্রন্থ। চীন সাম্রাজ্যে যে প্রশাসন ব্যবস্থা বহু সহস্র বৎসর ধরে চলে এসেছে সেই ব্যবস্থার কাঠামো তিনিই প্রস্তুত করেছিলেন। প্রশংসাপত্র দানে স্বভাবত কৃপণ মনীষী কনফুসিয়াস তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন: চৌ-কুং উদারচেতা, মহানুভব, ভদ্র ও সৎ (broad-minded, generous, gentle and good) ছিলেন। এই অক্লান্ত পরিশ্রমী পুরুষ স্নানের সময়ও রাজকার্য থেকে বিরত হতেন না, অবগাহনকালে দর্শনার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। তাঁর সম্বন্ধে কয়েকটি কথিকা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ রয়েছে: একদা সম্রাট তাঁর কোন কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে উপাধিদানে পুরস্কৃত করলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁকে দিলেন অপরাধীজনোচিত রাজদণ্ড। দণ্ড ও পুরস্কার এক সঙ্গে একই ব্যক্তিকে দেবার অসংগতি দেখিয়ে চৌ-কুং সম্রাটকে ভর্ৎসনা করলেন। সম্রাট লজ্জিত হয়ে বললেন, "আমি পরিহাস করেছিলাম মাত্র।" চৌ-কুং বললেন, "রাজা কখনো পরিহাস করেন না। তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়, অনুষ্ঠানাদির মধ্যে মূর্তি পরিগ্রহ করে, সংগীতে গীত হয়।" আর একটি কাহিনী পুত্র হুমায়ূনের রোগ-মুক্তিকল্পে ভারত-সম্রাট বাবরের প্রার্থনার বিষয় স্মরণ করিয়ে দেয়। সম্রাট উ-ওয়াং কঠিন রোগে মরণাপন্ন, চৌ-কিং তখন পিতৃ-তর্পণের উদ্দেশে রচিত বেদীর পদমূলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে প্রার্থনা করলেন, পিতৃকুল যেন সম্রাটকে নিরাময় করেন কনিষ্ঠ ভ্রাতার দেহে তাঁর রোগ আরোপিত করে।*

---

* এই প্রসঙ্গে 'ইতিহাস গ্রন্থে'র বিবরণ উদ্ধৃত করা যেতে পারে: পিতৃপুরুষের তিনটি রাজা তাই, চি ও ওয়েনকে উদ্দেশ করে চৌ-কিং প্রার্থনা করলেন, "তোমাদের মহামহিম বংশধর অমুক (অর্থাৎ রাজা উ) দুরারোগ্য ভীষণ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। স্বর্গের এই মহৎ পুত্রের রক্ষার ভার যদি তোমাদের উপর অর্পিত হয়ে থাকে তবে আমার প্রার্থনা তানকে (অর্থাৎ আমাকে) গ্রহণ কর তোমরা

উ-ওয়াং আরোগ্য লাভ করলেন, এবং তাঁর রোগমুক্তির কৃতিত্ব অর্জন করে চৌ-কুং-এর মর্যাদা ও সমাদর বহুগুণে বর্ধিত হল।

উ-ওয়াং-এর মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্র চেং ওয়াং-কে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল। এ সময়েও একটি বিষয়ে চৌ-কুং তাঁর মহৎ অন্তঃকরণের পরিচয় দিয়েছিলেন। কোন কোন অঞ্চলে সন্দেহ করা হয়েছিল যে নাবালকের অছি রূপে সব ক্ষমতা তিনি নিজেই আত্মসাৎ করবেন। জনগণের মন থেকে এই সন্দেহ দূর করবার জন্য স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ করলেন তিনি। কিন্তু লোকেরা তাদের ভুল বুঝতে পেরে সাধ্য-সাধনার দ্বারা তাঁকে আবার ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিল। চীনা ইতিহাসে চুম্বক বা magnetic needle-এর প্রথম উল্লেখ দেখা যায় রাজা হুয়াং তি-র আমলে, সে কথা সু-কিং বা ইতিহাস গ্রন্থের আলোচনায় বলা হয়েছে। তেমনি কোন যন্ত্র চৌ-কুং আবিষ্কার করেছিলেন, হয়তো বা সেই 'চুম্বকের সূচ' যার নির্দেশ ধরে চীনা রাজদূতগণ টন্‌কিং থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারতেন।

চৌ-কুং ছিলেন একজন কবি। নূতন রাজার বিরুদ্ধে তাঁর দুই ভাই যখন বিদ্রোহ শুরু করল, তিনি তখন বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে তিন বৎসর যুদ্ধ করেছিলেন। সেই সময় (খৃঃ পূঃ ১১১৩) তিনি একটি পদ্য রচনা করেছিলেন, সেই কবিতায় তাঁর কবি-প্রতিভার প্রমাণ পাওয়া যায়। কবিতাটির নাম "পেচক" (The Owl)। পেচা রূপে কল্পনা করা হয়েছিল বিদ্রোহীদের। কবিতাটি ইংরাজিতে তরজমা করেছেন জেমস লেগ (James Legge)। শুনুন তারই একটুখানি বাংলা নমুনা :

ভাঙিস নে রে নীড়টি আমার
ওরে পেঁচা শোন কথা,
স্নেহ দিয়ে আগলে রাখা
আমার যত্ন আদর মাখা

সম্রাটের পরিবর্তে। আমি ছিলাম পিতার পরম অনুগত, প্রভূত মানসিক গুণগ্রাম ও শক্তির অধিকারী আমি, আত্মিক কুলের পরিচর্যার উপযুক্ত ভৃত্য। পক্ষান্তরে তোমাদের মহামহিম বংশধর সম্রাটের গুণ ও শক্তি আমার চেয়ে ন্যূন, আত্মিক কুলের পরিচর্যার উপযোগী নন তিনি…।" একটি মহৎ ব্রতের সাধনকল্পে আত্ম-শ্লাঘা কিরূপে আত্মোৎসর্গে উন্নীত হয়েছে এখানে তাই বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়।

ছানাগুলো হানা দিয়ে
তুই দিয়েছিস মর্মে ব্যথা,
দয়া কর তুই ওরে পেঁচা
মোর মিনতি শোন কথা।
... ...
পক্ষ আমার ছিন্নভিন্ন
পুচ্ছ আমার জীর্ণশীর্ণ
বাত্যা সঞ্চালিত
ঘন-বর্ষণ-সিঞ্চিত
নীড়টি আমার উড়ে বুঝি ওই যায় রে—
আর্ত বাঁশী ফুকরে কাঁদে—হায় রে!

চৌ-কুং-এর ত্যাগের আদর্শ নিঃস্বার্থ কর্মনিষ্ঠার পথ ধরে চৌ বংশীয় নৃপতিগণ সকলেই যে অগ্রসর হয়েছিলেন এমন নয়। এই বংশের পঁয়ত্রিশ জন নৃপতির মধ্যে ত্রিশজনই ছিলেন ইন্দ্রিয়পরায়ণ কামাসক্ত ব্যক্তি, নারী ও খোজাকুল পরিবৃত হয়ে জীবনযাপন করতেন। এই অপদার্থ নৃপতিবৃন্দের শাসন যে এত দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল, খণ্ডরাষ্ট্রগুলির সামন্তবর্গের রাজভক্তি তার কারণ নয়। সামন্তরা পরস্পরকে ঈর্ষা করতেন, পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ অবিরাম চলেছিল, সেইজন্যেই তাঁরা বিশেষ কোন সামন্তের একাধিপত্য অপেক্ষা একজন দুর্বল নৃপতির শাসনকেই শ্রেয় মনে করতেন। সামন্তদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ ছিল একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। তখনকার মাৎস্যন্যায়ের যুগে সবল রাষ্ট্র দুর্বল রাষ্ট্রগুলিকে গ্রাস করত। এই অন্তহীন সংগ্রামই খণ্ডরাষ্ট্রগুলির সংখ্যা হ্রাসের কারণ।

চৌ বংশীয় যে কয়জন নৃপতির রাজত্বকালে জাতীয় জীবনের কোন-না-কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল, সেইসব রাজার বিষয় সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যাক:

চাও ওয়াং

চাও ওয়াং (খৃঃ পূঃ ১০৫২-১০০২) ছিলেন একজন অত্যাচারী রাজা। যুদ্ধ বা শিকারকালে প্রজাদের কৃষিক্ষেত্রের শস্য দলিত মথিত করে তাদের

প্রভূত ক্ষতিসাধন করতেন তিনি। সেজন্য ব্যাপকভাবে যে গণ-বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল তাই থেকে এই সত্য বিলক্ষণ প্রমাণিত হয়েছে যে স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সে যুগেও রাজার স্বেচ্ছাচার প্রজারা সব সময় নীরবে সহ্য করত না। রাজার অত্যাচারের প্রতিশোধ প্রজারা কিরূপে নিয়েছিল কাহিনীতে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এইরূপ: তারা একটি খেয়া নৌকা নির্মাণ করেছিল রাজার নদী পার হবার জন্যে, সেই নৌকার তলদেশের কয়েকটি তক্তা আঠা দিয়ে জোড়া হল এমনভাবে যেন ঢেউ-এর আঘাতে সেগুলি খসে গিয়ে নৌকাটি জলমগ্ন হয়ে যায়। ব্যাপার ঘটেছিল ঠিক তাই। সে যাত্রায় রাজা জলে চুবানি খেয়ে বেঁচে গেলেন বটে, কিন্তু পরে অনুরূপ একটি ব্যাপারে মৃত্যু থেকে নিষ্কৃতি পান নি।

মু-ওয়াং

মু-ওয়াং (খৃঃ পূঃ ১০০২-৯৪৭) দশম খৃস্ট পূর্বাব্দের একজন কীর্তিমান নৃপতি। তাঁর সম্বন্ধে ইতিহাসে কয়েকটি সুন্দর ভ্রমণ-কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে। রথচক্রের বা অশ্ব-খুরের চিহ্ন যেখানেই দেখা গেছে সেই পথেই চলেছে তাঁর রথ। দুর্গম মরু-কান্তার ও বরফের দেশ পর্যটন করেছিলেন তিনি, 'চলন্ত বালুকার দেশ', 'পুঞ্জীকৃত পালকের দেশ' (অর্থাৎ তুহিনাবৃত দেশ) অতিক্রম করে উপনীত হয়েছিলেন এমন একটি স্থানে যেখানে 'পক্ষীকুল জীর্ণ পালক পরিত্যাগ করে'। কাহিনীর এই বিবরণ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় তিনি পারস্যে ও ভারতবর্ষে আগমন করেছিলেন। আমরা দেখতে পাব, পরবর্তী কালে লাওৎসি তাও-তত্ত্ব নামে যে দর্শন প্রচার করেছিলেন তার সঙ্গে ভারতীয় উপনিষদ বর্ণিত ব্রহ্মবাদের নিবিড় সাদৃশ্য সত্যই বিস্ময়কর। আর সেই তাও-ধর্মের (Taoism) মূল-তত্ত্বের সাক্ষাৎ মেলে মু-ওয়াং-এর 'পশ্চিমের রাজরানী' ('The Royal Lady of the West') সন্দর্শনের বিবরণে। বস্তুত ভারতের সঙ্গে চীনের সংযোগ সর্বপ্রথম ঘটেছিল এই রাজার মাধ্যমে এবং তাই থেকেই তাও-দর্শনের সমুদ্ভব, এরূপ মনে করবার যথেষ্ট কারণ আছে। পশ্চিমের এই রহস্যময়ী রানীকে ঘিরে বর্ণ-সমুজ্জ্বল উপকথার জাল বোনা হয়েছে—সেই রানীর বাস নাকি রত্ন-হ্রদ (Lake of Gems)-এর উপকূলে অমৃত-তরুরাজি (tree of immortality) পরিবেষ্টিত একটি রাজ-

প্রাসাদে, সেখানে প্রেমের বার্তা নিয়ে পাখীরা নিরন্তর উড়ে বেড়ায় নীলাভ বৃক্ষের শাখা থেকে শাখান্তরে। বর্ণনার এই কবিত্বকেও অতিক্রম করেছে কতিপয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতের অনুসন্ধিৎসু চিত্তের গবেষণা যখন তাঁরা সুনিশ্চিত-ভাবে স্থির করতে চেয়েছেন—কে এই 'পশ্চিমের রানী' ? কেউ বলেন, রানীর উপকথা রূপক-ছলে একটি গোষ্ঠীর বিবরণ মাত্র, আব কেউ বা এই রাজ্ঞীকে আরব দেশীয় সেবার রানী (Queen of Sheba) বলেই সাব্যস্ত করেছেন। ইসরায়েল-রাজ সলোমনের সঙ্গে এই সেবার বানীর সাক্ষাতের কাহিনী বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে। সে যাই হোক, মু-ওয়াং-এর পশ্চিম ভ্রমণ কাল্পনিক না হবারই সম্ভাবনা, এবং তা সত্য বলেই হয়তো বা চীনের ওপর উত্তর ও পশ্চিম দেশীয় বর্বরগণের ঘন ঘন অভিযান ঘটে এসেছিল সেই প্রাচীন যুগ থেকে। রাজা মু-ওয়াং-এর একটি উল্লেখযোগ্য কার্য—মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে পাঁচ প্রকার গুরুদণ্ড ও অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা। কিন্তু এই সংস্কারের জন্য প্রশস্তি লাভ করেন নি রাজা, কেননা চিরাগত প্রথার বিলুপ্তি ছিল চীনাদের চক্ষে একটি অমার্জনীয় অপরাধ।

লি ওয়াং

লি ওয়াং-এর বাজত্বকাল খৃঃ পূঃ ৮৭৮-৮৪২। এই নৃপতি তাঁর কুখ্যাতির জন্য প্রসিদ্ধ। তাঁর একজন বিজ্ঞ বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিলেন, তিনি 'সাও-এর ডিউক' (Duke of Shao)। রাজার কার্যের নিন্দা করত প্রজারা, সে সম্বন্ধে রাজাকে সদুপদেশ দিতে গিয়ে রাজার সঙ্গে বিরোধ বাধল মন্ত্রীর। রাজা একজন ঐন্দ্রজালিক নিয়োগ করে নিন্দুকদের নাম সংগ্রহ করলেন এবং তাদের বন্দী করে এনে প্রাণবধ করলেন। তখন রাজার কাজের নিন্দা ও সমালোচনা বন্ধ হল। ব্যঙ্গ করে রাজা বললেন মন্ত্রীকে, "কেমন, দেখলে তো ? কোথা গেল তোমার গল্পবাজ নিন্দুকেরা ?" প্রশ্নের উত্তরে সাও-এর ডিউক যে কথাগুলি বলেছিলেন তার সারবত্তা সর্বজনীন ও সর্বকালীন। তিনি বললেন, "জনমতকে আপনি প্রাচীর দিয়ে আবদ্ধ করেছেন মাত্র, ফলে জনগণের চিন্তা ও ভাবনা এখন থেকে আপনার অজানাই থাকবে। প্রজার মুখ বন্ধ করা আর নদীব জলস্রোত রোধ করা, এই দুই কার্য একই রকম বিপজ্জনক, জলের স্বাভাবিক ধারা তখন প্লাবনে

পরিণত হয়। প্লাবন থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্য জলস্রোত নদীগর্ভে সঞ্চালনের ব্যবস্থাই সমীচীন। প্রজার বেলায়ও তেমনি প্রযোজন বাক্যের স্বাধীনতা।" অনেক দেশের অনেক রাজা ও রাষ্ট্র ব্যক্তিস্বাধীনতা বিষযক এই অমূল্য সত্যটি গ্রহণ করেন নি, সেজন্য তাঁদের বিপদগ্রস্ত হতে হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল নয। দুর্ভাগ্যক্রমে রাজা লি-ও তাঁর মন্ত্রীর উপদেশ শোনেন নি। ফলে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল এবং সেই বিদ্রোহ এমন ভযংকর রূপ ধারণ করল যে রাজাকে তখন পালিযে গিযে প্রাণ বাঁচাতে হযেছিল। এদিকে রাজবংশকে রক্ষা করবার জন্য স্বার্থত্যাগের অতুলনীয দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করলেন মন্ত্রী সাও। ক্রোধান্ধ জনতা যখন সিংহাসনের ভাবী অধিকারী যুবরাজকে বধ করবার জন্য ছুটল, তিনি তখন রাজপুত্রকে গোপনে রেখে উন্মত্ত আততায়ীর হাতে আপন পুত্রকে সমর্পণ করলেন।

সুযান ওয়াং

পলাতক অবস্থায় রাজা লি'র মৃত্যু হল ৮২৭ খৃস্ট পূর্বাব্দে। তখন লি-র পুত্র সুযান ওযাং সিংহাসনে আরোহণ করলেন। চীন দেশের একটি চিরাচরিত অনুষ্ঠান নৃপতিগণ কর্তৃক হল-কর্ষণ। চৌ বংশীযদের আমলে 'এক হাজার একর ভূমিতে আনুষ্ঠানিকভাবে হাল চাষ করতেন রাজা। সামন্তগণের সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও সুযান এই প্রথামত ভূমি কর্ষণ করতে অসম্মত হলেন। রাজার এই আচরণে প্রজাগণ ক্ষুব্ধ আর সৈন্যদল উদ্যমশূন্য হযে পড়েছিল। ফলে ৭৮৯ খৃস্ট পূর্বাব্দে টাঙ্গুটান খণ্ডজাতিগণের বিরুদ্ধে যে অভিযান চলেছিল সেই সংগ্রামে তাঁর সৈন্যবাহিনী পর্যুদস্ত হয়েছিল। তা ছাড়া এই রাজার রাজত্বকালে একটি ভীষণ মন্বন্তর ঘটেছিল। সেই আকালের বর্ণনা 'কাব্যগ্রন্থে'র (Book of Odes) একটি পদ্য-রচনায পাওয়া যায়। সেই কবিতাটিতে রাজা সুযানের মর্মন্তুদ ক্রন্দন কিরূপ আর্ত-স্বরে ফুকরে উঠেছে দেখুন:

নীলাকাশে রোদে ছাযাপথ ভাস্বর উজ্জ্বল—
হা হুতাশ করে রাজা, বলে, "হায, এ কি হল ?

কোন অপরাধে বাম দেবতা স্বর্গের ?
বলিদান অর্ঘ্য ডালি ভাণ্ডার রাজ্যের
দেবতা উদ্দেশে সব করেছি উজাড়।
মন্বন্তর হানে মৃত্যু ধ্বংস বারংবার।
দেবতা বধির—অনাবৃষ্টির দানব
দিকে দিকে জ্বেলে দিল বহ্নির উৎসব।
দগ্ধ গিরি, শুষ্ক নদী—ভীত ত্রস্ত মন
দাবানলে পুড়ে ক্ষার, বিষণ্ণ জীবন।
তুমি দাও অনুমতি, হে মোর ঈশ্বর
লোকালয় ছেড়ে যাই চোখের অন্তর।”

রাজার এই আত্মগ্লানি রাজ্যের দুর্দশা ঘুচাতে পারে নি। দুর্দশার আভ্যন্তরীণ কারণ যেমন মন্বন্তর, তেমনি বাইরে থেকে এল কালান্তক হুন দলের ঘন ঘন আক্রমণ। এই দ্বিবিধ সমস্যার চাপে পড়ে রাজা স্যুয়ান চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলেন। তাঁর মৃত্যুর বর্ণনায় চীনা ইতিহাস একটি ভুতুড়ে কাণ্ডের অবতারণা করেছে। বলা হয়েছে, রাজা কর্তৃক নিহত কোন অভিজাত বংশীয়ের প্রেতাত্মা লাল পোশাক ও টুপি পরিধান করে আবির্ভূত হলেন এবং রক্তবর্ণ ধনুকে রক্তবর্ণ শর যোজনা করে তাঁর হৃদয় বিদ্ধ করলেন।

ইউ ওয়াং

লি-র উত্তরাধিকারী ছিলেন রাজা ইউ ওয়াং। তাঁর রাজত্বকাল খৃঃ পূঃ ৭৮১-৭৭১। এই অনতিদীর্ঘ রাজত্বকালে যেসব ঘটনা ঘটেছিল সেগুলি রাজার কৃতিত্বের পরিচয় দেয় নি, বরঞ্চ তাঁর মেরুদণ্ডহীন লম্পট প্রকৃতির স্ত্রৈণ স্বভাবকে ফুটিয়ে তুলে ইতিহাসের চক্ষে তাঁকে উপহাসাস্পদ করেছিল। পাও-জু নামে একটি পরমাসুন্দরী নারী ছিল তাঁর উপপত্নী। দেব-গৃহীতা কন্যার গর্ভে এই রমণীর জন্মের প্রবাদ আছে, তাঁর জন্ম-বৃত্তান্ত রূপকথার মতই শোনায়। ওই নারীর মনস্তুষ্টির জন্য মহিষীকে বর্জন করলেন রাজা, যুবরাজকে নির্বাসিত করলেন। কিন্তু পাও-জু এত সহজে তৃপ্ত হবার পাত্রী ছিলেন না। তাঁর উর্বর মস্তিষ্কে নানারূপ খেয়াল দেখা দিত, তখন যত

উদ্ভটই হোক তাঁর সেই মনের সাধ পূর্ণ না করে আর কোন উপায় থাকত না রাজার। তখনকার রীতি ছিল এই যে হূনদের হানার সময় জনসাধারণকে হুঁশিয়ার করে দেবার জন্যে প্রত্যন্তের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে দামামা বেজে উঠত আর দিকে দিকে বহ্নি প্রজ্বলিত করা হত। পাও-জুর সাধ গেল, মিছামিছি আগুন জ্বালিয়ে আর দামামা বাজিয়ে মজা করবে। আগুন জ্বালা হল, দামামা বাজল, লোকজনের ছুটোছুটি দেখে পাও-জু মজা পেল বটে, কিন্তু পরিশেষে যেদিন সত্যিকার বাঘ দেখা দিল, হূনদের আক্রমণ যখন শুরু হল, তখন ঢাকের বাদ্য ও প্রজ্বলিত বহ্নি-সংকেত সত্ত্বেও সৈন্য-সামন্তের আবিভাব হল না। ফলে আততায়ীরা সহজেই নগর অধিকার এবং রাজাকে বন্দী করে হত্যা করল। পাও-জুকে তারা স্বদেশে ধরে নিয়ে গেল। সেখানে সে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেছিল। রাজা ইউ ওযাং-এর আমলের আর একটি স্মরণীয ব্যাপার—৭৭৬ খৃষ্ট পূর্বাব্দের ২৯শে আগস্টের সূর্যগ্রহণ। ঐ দিনটিকেই চীনা ইতিহাসে গ্রহণের প্রাচীনতম উল্লেখ বলে ধরা হয।

পিং ওযাং

ইউ-র উত্তরাধিকারী পিং ওযাং (খৃঃ পূঃ ৭৭০-৭২০)। তাঁর রাজত্বকালে দেশে ছিল শান্তি বিরাজমান, সেজন্য তাঁকে "শান্তির রাজা" ('The Peace King') বলে অভিহিত করা হযেছে। চৌ বংশের গৌরব-সূয তখন মধ্যাহ্ন অতিক্রম করে অপরাহ্ণের দিকে ঢলে পড়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই রাজ-বংশ আরও পাঁচ শতাব্দী আপন অস্তিত্ব কাযক্লেশে বজায় রাখতে সমর্থ হযেছিল। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে ভীষণ অরাজকতা দেখা দিয়েছিল, সেই সঙ্গে হত্যাকাণ্ডেরও অবধি ছিল না। বর্বরগণ কর্তৃক ক্রমাগত আক্রমণের ফলে রাজধানী লো ইয়াং নগরে স্থানান্তরিত হয়েছিল, এবং ঐ সময় থেকে রাজবংশ 'পূর্ব রাজবংশ' নামে খ্যাত হযেছিল। কেন্দ্রশক্তি তখন দুর্বল, সামন্ত-রাষ্ট্রগুলির ওপর কেন্দ্রের আধিপত্য ক্রমেই শিথিল হযে আসতে লাগল। বস্তুত সম্রাট পিং-এর মৃত্যুকালে রাজকোষ এমনি শূন্য হযে পড়েছিল যে সম্রাটের মৃতদেহকে সমাধি দেবার ব্যয নির্বাহের জন্য লু-র সামন্তরাজের কাছে অর্থভিক্ষা করতে হয়েছিল। ঘৃণাভরে সামন্তরাজ সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান করলেন। চৌ বংশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র-সমাহারটির (confederacy)

অধোগমন যে তখনই শুরু হয়ে গিয়েছিল, এই ব্যাপার থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায়।

‘যুধ্যমান রাষ্ট্রসমূহের যুগ’

তারপর ৪৭৯ খৃস্ট পূর্বাব্দ থেকে শুরু হল ‘যুধ্যমান রাষ্ট্রসমূহের যুগ’। এই সময়ে সামন্ত-রাজ্যগুলির মধ্যে অবিশ্রান্ত যুদ্ধবিগ্রহ চলেছিল, এবং সেজন্য দেশের সর্বত্র আপদকালের বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল। সমগ্র দেশ সাতটি বৃহৎ স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়েছিল: পূর্বে চি, দক্ষিণে চু, উত্তর-পশ্চিমে চি’ন, উত্তর-পূর্বে ইয়েন এবং উত্তরে হ্যান, ওয়েই ও চাও। এই পরস্পর যুধ্যমান রাষ্ট্রসমূহের আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থার চরম দুর্গতির কথা একটি আখ্যায়িকায় সুপরিস্ফুট। একদা দার্শনিক কনফুসিয়াস শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে ভ্রমণে বহির্গত হয়েছেন, দেশের দূরপ্রান্তে উপস্থিত হয়ে দেখেন একটি স্ত্রীলোক আকুলভাবে ক্রন্দন করছে। প্রভু কুং তাকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বললে, “আমার শ্বশুর, স্বামী ও পুত্রকে বাঘে খেয়েছে।” “কোথায়?” “এখানেই”, সে বললে। কনফুসিয়াস প্রশ্ন করলেন, “এমন ব্যাঘ্র-সংকুল স্থানে কেন বসবাস কর, বাছা? অন্যত্র যাও না কেন?” জবাবে সে বললে, “অন্য স্থানে রাজার পীড়নে প্রজারা জর্জরিত। এখানে কিন্তু রাজকীয় শাসনে কোন অত্যাচার নেই।” এই কথা শুনে শিষ্যদের পানে ফিরে স্মিতমুখে বললেন কনফুসিয়াস, “বুঝলে তো? অত্যাচারী সরকার মানুষ-খেকো শার্দুলের চেয়েও ভয়ংকর।”

চতুর্থ খৃস্ট পূর্বাব্দের মধ্যভাগ থেকেই পশ্চিম প্রত্যন্তের চি’ন নামক একটি সামন্ত-রাষ্ট্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে ক্রমশ গ্রাস করে পরাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে চি’ন রাষ্ট্রের ক্ষুধা বৃদ্ধির কথা শেষে একটি প্রবাদ-বাক্যে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল: ভূমি দান করে চি’নগণের তুষ্টি সাধনের প্রয়াস আর অগ্নিতে ইন্ধন যোগানো একই কথা। সাম্রাজ্যের এই দুর্যোগের দিনে সু-চিন (খৃঃ পূঃ ৩৩৩) নামে এক ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছিল যিনি অবশিষ্ট রাষ্ট্রপুঞ্জের সংহতি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে দুর্বার চি’ন ডিউকের (Duke of Ch’in) অগ্রগতির পথ বন্ধ করতে কৃতসংকল্প হয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর এই উদ্যম ফলপ্রসূ হয় নি। সু-চিনের মৃত্যুর পর কেন্দ্রশক্তি ভেঙে

পড়বার উপক্রম হয়েছিল। সেই সময়কার একটি যুদ্ধজয়ের বিবরণ বড়ই কৌতুকপ্রদ। কথিত আছে, কতগুলি বৃষের শৃঙ্গে তরবারি বেঁধে লাঙ্গুলে তৈলসিক্ত খড় জড়িয়ে অগ্নি-সংযোগ করা হলে উন্মত্ত বৃষগণ শত্রুব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করে এমনি আতঙ্কের সৃষ্টি করল যে আততায়ীগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করেছিল। এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, বাইবেল-বর্ণিত স্যামসন উপাখ্যানের সঙ্গে ঘটনাটির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। স্যামসনও একপাল শৃগালের লাঙ্গুলে আগুন ধরিয়ে ফিলিস্টাইন বাহিনীর মধ্যে ছেড়ে দিয়ে লঙ্কাকাণ্ডের সৃষ্টি করেছিলেন।

চৌ বংশের শেষ নৃপতি নান-ওয়াং (খৃঃ পূঃ ৩১৪-২৫৬)। দীর্ঘ ষাট বৎসর রাজত্বকালে নানা উদ্যম সত্ত্বেও অনিবার্য পতনের হাত থেকে রাজ্যকে রক্ষা করতে পারেন নি তিনি। চি'ন-রাজের বিজয়-বাহিনী ক্রমেই অগ্রসর হয়ে আসছিল, এবং কেন্দ্রশক্তি ক্ষুণ্ণ হবার সঙ্গে সাম্রাজ্যে মর্যাদা, প্রতিপত্তি সবই সেই নব আগন্তুকের করতলগত হয়ে পড়েছিল। নান-ওয়াং-এর মৃত্যুর পর দেখা দিল অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা, তার অব্যবহিত পরেই চি'ন-ডিউক কর্তৃক চি'ন বংশীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (খৃঃ পূঃ ২৫৫)। চি'ন বংশের রাজত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি, কিন্তু ইতিহাসে এই সময়টির ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

২. চৌ-যুগের সমাজ ও শাসন

চীনা ইতিহাসের আদিপর্বে আমরা দেখেছি রাজপদ বংশানুক্রমে অধিকার করা হয় নি, পরন্তু রাজ্যের মুখ্য ব্যক্তিগণের মতে যিনি সর্বগুণসম্পন্ন, অনেক ক্ষেত্রে রাজা তাঁকেই উত্তরাধিকারী নির্বাচন করেছেন। চৌ বংশ প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে এই গণতান্ত্রিক প্রথাটির বিলোপ ঘটেছিল এবং সেই সঙ্গে সিংহাসনের ওপর রাজবংশীয়দের দাবি কায়েম হয়ে গিয়েছিল। অন্যান্য সমাজব্যবস্থা কিন্তু সবই ছিল অপরিবর্তিত। শুধু তাই নয়, পিতৃকেন্দ্রিক পরিবার, গ্রাম্য সমাজ-সংস্থা ও শাসনের কাঠামোকে সনাতন বিধি-বিধান, নীতি-নিয়মের নিগড়ে স্থায়ীভাবে শৃঙ্খলিত করা হয়েছিল এই আমলের কনফুসীয় অনুশাসন দ্বারা। বস্তুত চীনা ইতিহাসের সূত্রপাত থেকে সমাজের

যে নৈতিক সৌধ-রূপ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে তার মূল ভিত্তিকে রাজা-প্রজার সম্বন্ধ, ব্যক্তির চরিত্র ও পারিবারিক জীবনের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন ষষ্ঠ খৃস্ট পূর্বাব্দের স্বনামধন্য মহামতি কনফুসিয়াস। আর সেই ভিত্তিমূল গাঁথা হয়েছিল এমনি দৃঢ়ভাবে যে সুদীর্ঘ আড়াই হাজার বছর ধরে সমাজের সুপ্রাচীন সৌধটি ছিল অম্লান গৌরবে দণ্ডায়মান, যে পর্যন্ত না তার উন্নত শির ১৯১১ খৃস্টাব্দের চীনা মহাবিপ্লবের ঝড়-ঝাপটায় ধুলায় অবলুণ্ঠিত হয়ে পড়েছিল।

চীনা সমাজের গোড়ায় রয়েছে পরিবার, আর সেই পরিবারের কর্তা পিতা। এই এঁটেল মাটির দেশে কৃষিকাযের সুষ্ঠু অনুষ্ঠানের জন্য পারিবারিক সংহতির প্রয়োজন ছিল, কর্তৃত্বের প্রতিষ্ঠাও তেমনি প্রয়োজনীয়। সুবিস্তীর্ণ উর্বর ভূমি, কৃষিকার্য সকলের জন্যই উন্মুক্ত, এখানে বলপ্রয়োগ করে জমি জবরদখলের দরকার ছিল না, সুতরাং যুদ্ধবিগ্রহ ঘটত কদাচিৎ। শক্তিচর্চা ও সামরিক উদ্যোগের অভাব চীনা ইতিহাসের বিশেষত্ব বলতে হয়। এখানে না ছিল ব্যাবিলনের হামুবাবি, মিশরের রামেসিস, আসিরিয়ার সেননাচেবিবের মত দিগ্বিজয়ী মহাবীর, না ছিল ভারতের রাম, লক্ষ্মণ, কর্ণার্জুন, ভীষ্ম, দ্রোণের মত ধনুর্ধর মহারথী। চীনের পৌরাণিক যুগে যেসব নৃপতি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন তাঁরা 'পুরন্দর'* বা দুর্গ-ধ্বংসকারী ছিলেন না, যুদ্ধে শতমারী বা সহস্রমারী রূপেও প্রশংসা অর্জন করেন নি। 'পঞ্চশাসকে'র প্রথম শাসক ফু সি প্রখ্যাত হয়েছিলেন নানাবিধ বিধিনিয়ম প্রবর্তন ও আবিষ্কারের জন্য—যেমন চিত্র-লিখন, পঞ্জিকার গণনা, বীণা-যন্ত্রের আবিষ্কার প্রভৃতি। সেন-লুং ছিলেন 'স্বর্গীয় কৃষক', চিকিৎসা-বিদ্যার আদিগুরু। তৃতীয় শাসক হুয়াং তি চক্ররথের প্রবর্তক, তা ছাড়া রেশম উৎপাদন পদ্ধতি ও অর্থনীতির উন্নতি সাধন করেছিলেন তিনি। ইউ ছিলেন একজন বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার। অন্য কোন দেশেই নৃপতিবৃন্দের খ্যাতি বাহু-বলকে বাদ দিয়ে শুধু আবিষ্কার, জন-কল্যাণ ও কর্মদক্ষতার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় নি, যেমন হয়েছে চীন দেশে। বস্তুত এখানকার সামাজিক স্তর-পর্যায়ের গঠন একটি নূতন ধরনের আশ্চর্য ব্যাপার। সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থান

* ইন্দ্রের নাম পুরন্দর। ঋগ্বেদে ইন্দ্রকে 'বজ্রহস্ত' 'বজ্রবাহু' বলা হয়েছে।

করেন বিদ্বৎসমাজ, সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, পাশ্চাত্য দেশের 'বুরোক্রেসি' শিক্ষক ও ধর্মযাজক সম্প্রদায়ের সঙ্গে তুলনীয়। কনফুসিয়াসের কালে ধনুর্বিদ্যা ও অশ্বারোহণ-বিদ্যা চীনা বিদ্বৎসমাজের অধীতব্য বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আব চারটি বিদ্যা শিক্ষা করে লু-ই বা 'ষড়-বিদ্যা'য় (Six Accomplishments) পারদর্শী হবার ব্যবস্থা ছিল। সেই চারটি বিদ্যা—আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কর্ম (rites), সংগীত, ইতিহাস ও অঙ্ক। সমাজের দ্বিতীয় স্থান অধিকার করত কৃষিজীবী, উদ্যানরক্ষক, পশুপালক ও কাঠুরিয়া। কারিগরদের স্থান তৃতীয় আর চতুর্থ স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে গৃহিণীকুল ও ভৃত্যদের জন্য। সর্বনিম্ন স্থানে রয়েছে বাহুবল দ্বারা জীবিকা উপার্জনকারী ব্যক্তিরা। গ্রীস ও রোমের যোদ্ধবৃন্দ, ভারতের ক্ষত্রকুল ও জাপানের সামুরায়দের পদমর্যাদা বিবেচনা করলে বাহুশক্তির মূল্য কত উচ্চে নির্ধারিত হয়েছিল সেইসব দেশে তা সহজেই বোঝা যায়। পক্ষান্তরে চীন দেশে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে বিরোধ ও শক্তিপ্রয়োগকে বর্জন করবাব অহিংস প্রবৃত্তি পূর্বাপর সমভাবে সজাগ, এবং সেজন্য দেবগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেছেন রণ-দেবতা নয়—বিদ্যা, কৃষি ও ঐশ্বর্যের দেবতা।

সমাজের শীর্ষদেশে একটি মহিমামণ্ডিত মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত ছিল রাজা ও রাজপরিবার। এইরূপ বিশিষ্ট মর্যাদা দানের পদ্ধতির জন্য রাজপরিবারকে 'সুং ফা' বা 'মহামহিম পরিবার' (Great Family) এবং এই পদ্ধতিকে 'সুং ফা পদ্ধতি' (Tsung Fa System) আখ্যা দেওয়া হয়েছে। সাম্রাজ্য, রাষ্ট্র বা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম সু এবং সমাজের সর্বোচ্চ সম্মান ছিল তাঁরই প্রাপ্য। জ্যেষ্ঠ পুত্র হতেন উত্তরাধিকারী, পরিবার মধ্যে পরম দায়িত্বপূর্ণ কাজ, গৃহের কল্যাণবিধানের ভার তাঁরই ওপর ন্যস্ত ছিল। সেজন্য তাঁকে বলা হত 'তা সুং' বা 'সুং', অর্থাৎ 'পরম সম্মানিত' ('The Great Honourable One')। রাজ-পরিবারের কোনরূপ স্বার্থহানি ঘটলে তার পূর্ণ দায়িত্ব তা-সুংকেই বহন করতে হত। আত্মীয়স্বজনের পরিরক্ষণ ও অভাব-মোচনকল্পে সকল প্রকার ব্যবস্থা করবার দায় তাঁরই, বিনিময়ে অনুগত, আশ্রিত পরিবারবর্গের কাছে বিশেষ সম্মান লাভের অধিকারী ছিলেন তিনি। রাজ-দরবারে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কনিষ্ঠ ভ্রাতারাও এই 'পরম সম্মানিতে'র গৃহে প্রবেশকালে রথ, অশ্ব, পদাতিকগণকে বহির্দ্বারে পরিত্যাগ করে আসতেন

বশ্যতা ও আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য। এইসব প্রাচীন প্রথার সঙ্গে অনুরূপ সামাজিক ও পারিবারিক আচার-অনুষ্ঠান, রাজার সঙ্গে প্রজার, পিতার সঙ্গে পুত্রের এমনি নানাবিধ নৈতিক সম্বন্ধের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করে কনফুসিয়াস তাঁর প্রখ্যাত নীতিধর্মকে গড়ে তুলেছিলেন।

কয়েক ঘর পরিবার একত্র বস'.স করত একটি গ্রামে এবং সেই গ্রামের নামকরণ হত প্রতিষ্ঠাতার নাম অনুসারে। এই পবিবারসমূহের মধ্যে রক্তের সম্বন্ধ কিছু বিদ্যমান থাকলেও সকলেই পরস্পরেব সঙ্গে আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ ছিল না, কিন্তু এক সঙ্গে সমাজ-জীবন যাপন করত বলে তারা সব একই 'কুল' (Clan)-ভুক্ত হয়েছিল। কুলপতি নির্বাচন করত গ্রামিকগণ নিজেরাই। গ্রামে পৃথ্বী দেবতাব (Earth-God) মন্দিরও নির্মাণ করত তারা। পল্লীর এই পরিবেশের মধ্যে যে সমাজ-শাসন-ব্যবস্থা রূপায়িত হয়ে উঠেছিল, পল্লী-সমাজে সেই স্বায়ত্তশাসন সম্প্রতিকাল পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

যথাকালে কর্মবিভাগ দেখা দিয়েছিল চীনা সমাজে এবং সেই বৃত্তিগুলি ছিল পরিবার মধ্যে আবদ্ধ, অনেকটা ভারতীয় বর্ণধর্মেব মতই। এদিকে নগব-নির্মাণ শুরু হযে গিয়েছিল এবং তাবই আনুষঙ্গিক স্বরূপ শিল্পী ও শিল্পদ্রব্য উৎপাদনকারী কারিগরী সমাজ, ব্যবসায়ী ও বণিক সমাজ গড়ে উঠতে লাগল। বৃত্তি অনুযায়ী সংঘ (guild) গঠিত হল। গ্রাম্য কুলপতিকে নির্বাচন করত শ্রমিকগণ, তেমনি নগবেব সমাজ-শাসন-ভার ন্যস্ত ছিল নির্বাচিত সংঘপতিগণের ওপর। কাবিগরী শিল্প ছিল নয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রশাসন ব্যাপাবে রাজা সুন-এর আমলেও কারিগবী প্রভাব দেখা যায়, যদিও কারিগরদেব শ্রেণীবিভাগ ও সংঘ গঠনের কার্য সম্পন্ন করা হয়েছিল চৌ বংশীয়দের রাজত্বকালে। আধুনিক যুগের ব্যবসায়ী ও কারিগরী সংঘগুলির নাম 'হং' (hong)। ব্যবসায়-বাণিজ্য ও নানাবিধ কারিগরী শিল্পের যেসব হং অধুনাকাল পর্যন্ত দেখা যেত কিংবা এখনো দেখা যায় সেগুলি গঠিত হয়েছিল ষষ্ঠ খৃস্ট পূর্বাব্দের কনফুসীয় মহাপুরষদের যুগে এবং সেই থেকে সেগুলির আকৃতির ও প্রকৃতির কোন পরিবর্তন ঘটে নি।

চৌ-যুগে যে ভূমিব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তার নাম 'চিং তিয়েন পদ্ধতি' (Ching Tien System)। এই পদ্ধতি অনুসারে প্রত্যেক বর্গ লি (Li) পরিমাণ জমি ৯ ভাগে বিভক্ত করা হত, ১ বর্গ লি ৯০০ মু-র (Mous) সমান।

এই ৯০০ মু-র মধ্যে ৮০০ মু আটটি পরিবারকে বণ্টন করা হত ভরণপোষণের জন্য। বাকি ১০০ মু সরকারী সম্পত্তিরূপে রাখা হত। সরকারী জমি পার্শ্ববর্তী কৃষকেরা চাষ করত, মজুরিস্বরূপ তারা উৎপন্ন শস্যের অংশ লাভ করত। বাকি শস্য সরকারী গোলাঘরে মজুত রেখে তাই থেকে রাজ্য পরিচালনার ব্যয় নির্বাহ হত। কম্যুনিস্ট পদ্ধতির সঙ্গে এই ভূমিব্যবস্থার সাদৃশ্য একটি বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়। রাষ্ট্রই ছিল দেশের একমাত্র ভূস্বামী।

চৌ-যুগের আর একটি শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা—ম্যাণ্ডারিন বা পণ্ডিত-প্রতিষ্ঠান (Mandarinate)। রাজা 'স্বর্গপুত্র' (Son of Heaven)। রাজার এবং গ্রাম্য কুলপতি বা নগর-শাসক সংঘপতিগণের মধ্যবর্তী একটি স্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছিল ম্যাণ্ডারিনদের জন্য। ম্যাণ্ডারিন চীনা নাম নয়, সেখানে এই সম্প্রদায়কে 'কোয়ান-চিয়ে' (Kwan-Chieh) নামে অভিহিত করা হয়। বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত পণ্ডিতরাই ম্যাণ্ডারিন। আধুনিক কাল পর্যন্ত এই শ্রেণীর সুধীবৃন্দ মন্ত্রণা থেকে শুরু করে শাসন-সংক্রান্ত সর্ববিধ কর্মের পরিচালনা করে এসেছেন। বংশক্রমের দিকে দৃষ্টিপাত না করে সুযোগ্য ব্যক্তির ওপর রাজকর্ম ন্যস্ত করা চীনাদের একটি সনাতন রীতি। আমরা দেখেছি, দুর্নীতিপরায়ণ রাজা চৌ-সিনের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ ছিল এই যে রাজকর্মচারী নিযুক্ত করেছেন তিনি যোগ্যতার মাপকাঠি দিয়ে বিচার করে নয়, বংশানুক্রমে পদাধিকার-নীতি অনুসারে। একটি সুপ্রাচীন আদর্শের প্রকৃষ্ট পরিণতিরূপেই সমগ্র রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগের শাসকপদে সুশিক্ষিত পণ্ডিত বা ম্যাণ্ডারিনগণকে নিযুক্ত করবার প্রথা প্রবর্তিত হয়েছিল চৌ বংশীয়দের রাজত্বকাল থেকে। প্রথমত, রাজ-দরবারে আমন্ত্রণ করা হত কয়েকজন আদর্শ-চরিত্রের কুল-তিলকগণকে রাজকার্য পরিচালনা করবার উদ্দেশ্যে। পরে জনসংখ্যার অনুপাতে এইরূপে নির্বাচিত সুধীগণের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছিল। শাসন-সৌকর্যের জন্য গ্রাম-সমাহার বা 'সিয়েন' (hsien) গঠিত হয়েছিল, এবং সেই সিয়েনের ওপর অধিষ্ঠিত ছিলেন একজন ম্যাণ্ডারিন-শাসক যাঁর প্রধান কার্য ছিল রাজস্ব সংগ্রহ। রাজস্ব আদায় ব্যাপারে কৌশল ও অনুরোধ-উপরোধই ছিল প্রধান অবলম্বন, বলপ্রয়োগ করবার কোন বিধান ছিল না। ম্যাণ্ডারিন নির্বাচন করা হত শিক্ষিত ও চরিত্রবান ব্যক্তিগণের মধ্য থেকে। কনফুসীয় নীতির বিধান অনুসারে

কালক্রমে শিক্ষা ও আচরণ একটি সনাতন আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে পর্যবসিত হয়েছিল, যার মধ্যে কোনরূপ নূতনত্ব বা অবস্থানুযায়ী পরিবর্তনের স্থান ছিল না। পরবর্তী কালে স্থই বংশীয়দের আমলে (৫৮৯-৬১৮ খৃস্টাব্দ) আধুনিক সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার অনুরূপ এক প্রকার প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা প্রবর্তিত হয়েছিল। পরীক্ষার উদ্দেশ্য—কনফুসীয় নীতিধর্মের আদর্শ অনুসারে রাজা-প্রজার সম্বন্ধ, সামাজিক ও পারিবারিক সদাচার এবং চিরাচরিত ধর্মানুষ্ঠান বিষয়ে কি পরিমাণ জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে পরীক্ষার্থীরা, এই পরীক্ষার দ্বারা সেইসব বিষয়ে তাদের গুণের বিচার ও রাজকার্য সম্পাদনে উপযোগিতা নিরূপণ করা। পরীক্ষা প্রবর্তনের ফলে গ্রাম্য কুলসমূহের প্রতিনিধিরূপে ম্যাণ্ডারিন নির্বাচন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বটে, কিন্তু নির্বাচনে গণতান্ত্রিক বিধানের অপলাপ ঘটে নি—কেননা, সর্বশ্রেণীর ব্যক্তিগণের কাছেই নীতিধর্ম শিক্ষার পথ উন্মুক্ত ছিল, আর পরীক্ষামূলক নির্বাচনও কোন শ্রেণীবিশেষের একচেটিয়া অধিকারে পরিণত হয় নি। নির্বাচনের এইরূপ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি সত্ত্বেও ম্যাণ্ডারিন প্রতিষ্ঠান সমাজের একটি বিশেষ সম্মানিত আভিজাত্য-গর্বিত স্থান অধিকার করেছিল। ম্যাণ্ডারিনদের জীবন-যাপনের মান ছিল সর্বসাধারণের উর্ধ্বে। গ্রামে কুলপতি ও শহরে সংঘ-পতিগণের শাসন পরিচালনা করতেন ম্যাণ্ডারিন সম্প্রদায়, এবং সেই হিসাবে তাঁরা আধুনিক কর্মচারী সম্প্রদায় বা 'বুরোক্রেসি' (bureaucracy)-র সঙ্গে তুলনীয়। ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে প্রত্যেক পরিবারের লক্ষ্য ছিল ম্যাণ্ডারিন-রূপে একটি পুত্রকে কোন সরকারিপদে প্রতিষ্ঠিত করা।

ম্যাণ্ডারিনদের হাতে দেশের শাসন-ব্যবস্থা সমর্পণ করে নিশ্চিন্তে অবস্থান করতেন না নৃপতিরা, প্রশাসনের সমস্ত দায়িত্ব নিজেরাই বহন করতেন। এই কর্তব্য সম্পাদন করতেন তাঁরা প্রতি পঞ্চম বর্ষে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ এবং ভূমি কর্ষণ, বীজ সরবরাহ ও বপন, ফসল উৎপাদন প্রভৃতি কৃষি-সংক্রান্ত কার্য পরিদর্শন করে। 'ইতিহাস গ্রন্থে' চৌ-যুগের সম্রাটগণের পরিদর্শন-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ রয়েছে। বসন্তকালের দ্বিতীয় শুক্লপক্ষে সম্রাট পরিদর্শন-ভ্রমণে পূর্বাঞ্চলের পবিত্র পাহাড়ে (Eastern Sacred Mountain) যেতেন এবং সেখানে অর্ঘ্য নৈবেদ্য দানের পর পঞ্চম শুক্লপক্ষে গ্রীষ্মকালে দক্ষিণাঞ্চলের পবিত্র পাহাড় অভিমুখে যাত্রা করতেন। অষ্টম শুক্লপক্ষে শরৎকালে পশ্চিমের পবিত্র

পাহাড়ে এসে উপনীত হতেন। এইরূপে যেখানেই পদার্পণ করতেন তিনি, সেখানেই পার্বত্য দেবতাত্মাকে অর্ঘ্য নিবেদন করে সামন্তগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন এবং নানান বিষয়ে আলোচনা করতেন। বর্ষীযান ও বর্ষীয়সীদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন চীনের একটি প্রাচীন ঐতিহ্য, নৃপতিরা সেই ঐতিহ্যের সম্মান করে নীতিধর্ম বিষযে প্রজাদের শিক্ষা দিতেন। কোন স্থানে শতায়ু বৃদ্ধ জীবিত থাকলে সম্রাট স্বয়ং তার গৃহে উপস্থিত হযে বিনীতভাবে তাকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রশাসন ব্যাপারে তার উপদেশ যাজ্ঞা করতেন। পরিদর্শনকালে বণিকের পণ্যদ্রব্য সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা নানান তথ্য সংগ্রহ কবতেন তিনি, এবং স্থানীয় গণ-সংগীতকে উৎসাহিত করতেন রাজ-দরবারের গাযকগণকে গণ-সংগীতের সুরে গানের সুর-যোজনার আদেশ দিয়ে।

চৌ বংশের প্রতিষ্ঠাকালেই 'চৌ লি' নামে একটি গ্রন্থ রচিত হযেছিল। গ্রন্থকার—মনীষী চৌ-কুং। নীতিধর্মের আধার হিসাবে এই গ্রন্থের মূল্য বাইবেলের সমান বলেই অনেকের অভিমত। অবশ্য গ্রন্থটি সত্যই চৌ কুং এর, না পরবর্তী কালের অন্য কোন লেখকের রচনা সে বিষযে সন্দেহের অবকাশ আছে। তথাপি এ-কথা সুনিশ্চিতভাবেই বলা যায, যেরূপ শাসনব্যবস্থা লিপিবদ্ধ রযেছে এই গ্রন্থে, চৌ বংশীযদের রাজত্বের সূচনা থেকেই চলে এসেছে সেইরূপ বিধান-পদ্ধতিমত রাজ্যশাসন। সমগ্র প্রশাসনক্ষেত্র ছযটি ম্যাণ্ডারিন অর্থাৎ পণ্ডিত পরিচালিত বিভাগ বা বোর্ডে ("Six Boards') বিভক্ত ছিল। সেই ছযটি ম্যাণ্ডারিন বা বোর্ড এইরূপ :

(১) 'স্বর্গ বিভাগ' (Mandarin of Heaven)—প্রশাসনসমূহের তত্ত্বাবধান, সম্রাটের পরিচ্ছদ, খাদ্য ও কার্যকলাপ নিযন্ত্রণকল্পে বিধিনিষেধ প্রণযন এই বিভাগের কর্ম।

(২) 'পৃথিবী বিভাগ' (Mandarin of Earth)—জন-কল্যাণ এই বিভাগের প্রধান কর্ম। অবিবাহিত যুবক-যুবতীর বিবাহের ব্যবস্থা করা আর একটি প্রীতিকর কর্তব্য। সামাজিক প্রথামত বিবাহের বযস নির্ধারিত ছিল বরের পক্ষে ত্রিশ বছর আর কনের পক্ষে বিশ বছরের অনূর্ধ্ব কাল।

(৩) 'বসন্ত বিভাগ' (Mandarin of Spring)—ধর্মানুষ্ঠানের ভার ছিল এই বিভাগের ওপর। নানান ঋতুর নানান পূজা-পার্বণ, লক্ষণাদি নির্ণয় ও জ্যোতির্মণ্ডল পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা বোর্ডের কর্তব্য কর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

(৪) 'গ্রীষ্ম বিভাগ' (Mandarin of Summer)—প্রতিরক্ষা বা যুদ্ধ বোর্ড এটি। কার্য—সৈন্য সংগ্রহ, সাজ-সজ্জা ও যুদ্ধোপকরণের সংস্থান।

(৫) 'শরৎ বিভাগ' (Mandarin of Autumn)—ন্যায়বিচার ও দণ্ডের বিধান এই বোর্ডের কার্য।

(৬) 'শীত বিভাগ' (Mandarin of Winter)—এই বিভাগ কর্তৃক রাস্তা ও সেতুনির্মাণ প্রভৃতি সংযোগরক্ষার কার্য সম্পাদিত হত।

প্রশাসন-ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিভাগগুলির নাম ও কার্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে অনায়াসে আমরা চীনা সংস্কৃতির একটি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাই। স্বর্গ, পৃথিবী, ঋতু প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তু ও অবস্থার সঙ্গে মানুষের সামাজিক জীবন ওতপ্রোতভাবেই জড়িত। সংগ্রামের সঙ্গে গ্রীষ্মের রুদ্র মূর্তি তুলনীয়। জীবন-বসন্তে সরস নবীনতার কিশলয় সমুদ্‌গম ধর্মানুষ্ঠান দ্বারাই সম্ভব হয়, আর যে মনোবৃত্তি প্রকাশ পায় ন্যায়নিষ্ঠ সুবিচারের মধ্যে, মনের সেই উদার ভাবটি শরৎ-প্রসন্ন আকাশের অনুরূপ। প্রকৃতির সঙ্গে সমসূত্রে বাঁধা মানব-জীবনকে প্রাকৃতিক বিধান মেনে নিয়ে চলতে হয়। স্বভাবধর্মই মানবধর্ম এই ছিল চৈনিক মহাপুরুষগণের মহাশিক্ষা। এই মহাশিক্ষা দ্বারা চীনা সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছিলেন চৌ-যুগের যেসব মহাপুরুষ তাঁদের বিষয় আমরা পরে আলোচনা করব।

চীনা সভ্যতার আদিপর্বেই আমরা তাম্র ও ব্রঞ্জের ব্যবহার দেখতে পাই। লৌহ এসেছিল সম্ভবত মেসোপটেমিয়া থেকে চৌ বংশীয়দের রাজত্ব-কালে। যুদ্ধবিগ্রহে শক্তির অপচয় না করে আদিকাল থেকেই উদ্ভাবনী-বৃত্তির পরিচয় দিয়ে এসেছে চীনারা আশ্চর্যরূপে। লিখন-পদ্ধতি, জ্যোতির্বিদ্যা, পঞ্জিকা, চুম্বক, গণিত, ওজন ও পরিমাপ নির্ধারণ, সংগীত-বিদ্যা, বাদ্যযন্ত্র ও কৃষির উপকরণ প্রস্তুত, ভেষজ, রেশম উৎপাদন, রেখাঙ্কন, চিত্রাঙ্কন, খোদাই কার্য, রন্ধনভাণ্ড ও মৃৎপাত্র নির্মাণ, হিসাবনিকাশ, ইঞ্জিনিয়ারিং, ধর্মানুষ্ঠান, প্রবন্ধ ও পদ্য রচনা—এইসব বিষয়ে নানাবিধ উদ্ভাবনে চৌ-যুগের অসাধারণ কৃতিত্ব দেখা যায়। পরবর্তী কালে পর্সিলেন, বারুদ, মুদ্রণ আর তাপের জন্য গ্যাসের উদ্ভাবন হয়েছিল। চীনাদের সৌন্দর্য-বোধ ছিল অসামান্য, আর ভোগের প্রবৃত্তিকেও সার্থক করে তুলতে জানত তারা। পদ্য-রচনা ও রন্ধন-বিদ্যায় তারা ছিল সমান পারদর্শী, কালক্রমে কারুশিল্প ও

চিত্রাঙ্কনেও অদ্ভুত দক্ষতা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিল। এইসব গুণের অঙ্কুর উদ্ভিন্ন হয়েছিল চৌ-যুগে, আর রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রেও তেমনি এই যুগেই মূল্য নিয়ন্ত্রণ, নগর-নির্মাণ পরিকল্পনা, পূর্তকার্য প্রভৃতি বিধান অনুষ্ঠান রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের (State Socialism) পূর্বাভাস সূচনা করেছিল।

৩. চৌ-যুগের পদ্য ও গদ্য রচনা

নদীর তটে ঢেউ ছুটেছে,
পানকৌড়ি ডাক দিয়েছে,
আমার মাথায় ঝুঁটির বাঁধন—
তুমি বসলে পাশে এসে।

রেশম ফেরি করে বেড়াও,
তরুণ তুমি আড়চোখে চাও,
বেলা-শেষের পথ ধরে যাও
সুদূর সি'ন দেশে।

ব্যাং ডাকে যে আকাশ ভরে,
ঘাস ভিজেছে সাঁঝের ঘোরে,
কত কথা হাসাহাসি—
শুনি আজ সে বাঁশী।

ভেবেছিনু তোমার বধূ আমি,
দিয়েছিলে কথা—
পথের সাথী খেয়া হলাম পার—
মনে পেলাম ব্যথা!

পড়েছিল প্রথম তোমার শীতল দৃষ্টিখানি
আমার 'পরে কবে নাহি জানি।
তিনটি বছর গেল যে ওই—
যৌবন মোর কই!

৭১৮ খৃস্ট পূর্বাব্দে লিখিত এই কবিতা। স্যাং যুগের শেষভাগের পদ্য রচনায় যে প্রতিভার পরিচয় আমরা ইতিপূর্বে পেয়েছি, তারই অক্ষুণ্ণ ধারা চলে এসেছে, কল্পনা তেমনি রঙীন, গতির ছন্দ তেমনি সাবলীল। স্যাং যুগের মত এ যুগেও পল্লী-গীতিকার অভাব নেই, কিন্তু পল্লী-গীতি ছাড়াও রাজ্যশাসন ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে রচিত অনেক কবিতা কনফুসিয়াস সংকলিত 'কাব্যের গ্রন্থে' ("Odes") স্থান পেয়েছে। এইসব কবিতা ছিল উত্তর দেশীয়, কিন্তু দক্ষিণ দেশেও তখন চু ইউয়ান নামে জনৈক কবি 'লি সাও' বা 'দুঃখবরণ' ("Encountering Sorrow") শীর্ষক একটি সুদীর্ঘ গীতিকাব্য রচনা করেছিলেন, সেই কাব্যটি চীনা সাহিত্যের একটি রত্নবিশেষ। এই কাব্যে কবি-কল্পনা উধাও হয়ে ধেয়েছে ঝড়বৃষ্টির মাঝে বিদ্যুতের ফাঁকে ফাঁকে, ড্রাগন ফিনিক্স্ চালিত রথে চড়ে। কবি আকাশবিহারে চললেন চন্দ্রের অভিমুখে, শেষে উপনীত হলেন গিয়ে স্বর্গদ্বারে। কিন্তু স্বর্গ তাঁর প্রতি বিমুখ, যেমন বিরূপ ছিলেন দেশের রাজা, ত্রিদিবের দৌবারিক তাঁকে স্বর্গে প্রবেশ করতে দিল না। কবি ছিলেন 'যুধ্যমান যুগে'র খণ্ডিত দেশে চু রাজ্যের একজন অভিজাত বংশীয় রাজনীতিক, রাজরোষে পড়ে নির্যাতিত হয়েছিলেন। রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁর জীবন যতখানি ব্যর্থ হয়েছিল ঠিক সেই পরিমাণেই তাঁর কবি-প্রতিভা অতুলনীয় যশের কীর্তিধ্বজা তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছিল। বস্তুত চু ইউয়ান (খৃঃ পূঃ ৩৪৩-২৯০) চীন দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিগণের অন্যতম। ভাব ও কল্পনার বৈশিষ্ট্য তাঁর রচনাগুলিকে এমন একটি দুর্লভ মর্যাদা দান করেছিল যার দীপ্তি কোনদিন ম্লান হবার নয়। রাজ-দরবার কর্তৃক নয় বৎসর নির্বাসন-দণ্ড ভোগের সময় তিনি 'পরম আহ্বান' ("The Great Summons") নামে একটি পদ্য রচনা করেছিলেন। দারুণ মর্মবেদনায় তাঁর প্রাণ কণ্ঠাগত, দেহ-পিঞ্জর ছেড়ে তাঁর আত্মা যখন বেরিয়ে যাবার উপক্রম করছিল সেই সময়ে একটি কবিতা লিখে হৃদয়ের গভীর আকূতি ব্যক্ত করেছিলেন তিনি। নমুনাস্বরূপ কবিতার কয়েক পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হল :

শূন্য ধরণীরে কোল দেয় বসন্ত নবীন,
রবিরশ্মি করে ঝলমল,
মলয়হিল্লোলে কাঁপে
ফুটন্ত ফুলের কুঁড়ি নব কিশলয়।

আত্মা মোর, তুমি দূরে সরে থেকো নাকো,
অন্ধ শীতার্ত গুহায় গোপনে থেকো না।

আত্মা মোর ফিরে এস অলস শান্তির নীড়ে,
চিং চু দেশে।
নিরালায় খুশী মনে করে যাও কাজ,
দুঃখ যাও ভুলে।

ওই দেখ গোলা ভরা সোনার ফসল,
সুসিদ্ধ জোয়ার ভুট্টা,
পক্ষীমাংস রাঁধে সুপকার—
পারাবত পীত কৃষ্ণ সারস কুক্কুট।
নিমন্ত্রিত অতিথিরা বুভুক্ষু নয়নে
চেয়ে থাকে বাষ্পাকুল উষ্ণ খাদ্য পানে।
আত্মা মোর ফিরে এস, প্রিয় খাদ্য খাও। ...

চতুর্বিধ উগ্র তপ্ত সুরা—গলা নাহি জলে,
সুগন্ধি শীতল সুধা, উ-দেশের দিব্য রসায়ন,
দাস বিদূষক সেব্য এ পানীয় নয়।
আত্মা মোর ফিরে এস, পান করে যাতনা জুড়াও।

ওই দেখ বিম্বাধরা সুদর্শনা রমণীর মায়া-ভরা চোখ,
নম্রা কম্রা গুণান্বিতা খেলার সঙ্গিনী,
কোমল পেলব তন্বী,
ঘন কৃষ্ণ ভ্রূ-ধনুর হাসিমুখে কটাক্ষ বর্ষণ,
গণ্ড কুঙ্কুমরঞ্জিত,
সোহাগ-বঙ্কিম ভঙ্গি পীবর বক্ষের।
আত্মা মোর ফিরে এস—
নারীর মধুর স্পর্শে গ্লানি যাক মুছে, ক্রোধ শান্ত হোক।

শুধু এপিকিউরিয়ানিজম বা ভোগবিলাস নয়, কবিতায় আরও বলা হয়েছে, রাজভক্ত পুত্র-পৌত্রের রাজকার্যে সমৃদ্ধি লাভের কথা, আর্ত দরিদ্রের সেবার কথা, রাজ্যে রাজার সুশাসনের কথা। এখানে জীবন-দর্শনের চীনা আদর্শকে আমরা পরিপূর্ণভাবেই দেখতে পাই, ভারতের ধর্ম ও পরমার্থতত্ত্বের বিপরীত এই চীনা আদর্শ মানবতা, সমাজ-বন্ধন ও জীবনানন্দের উপভোগকে মূল-মন্ত্ররূপে গ্রহণ করেছিল। বস্তুত চৌ-যুগেব বৈদগ্ধ্য এই জীবনদর্শন ও নীতিধর্মকে এমন একটি বাস্তব আদর্শেব ওপব প্রতিষ্ঠিত করেছিল, যার মূল্য চীনাদের কাছে অবাস্তব কুহেলী সৃষ্টির চেয়ে ঢের বেশি, যে আদর্শকে প্রত্যাখ্যান কবে চীনের জাতীয় মানস-কল্পনা কোনদিন দুর্নিরীক্ষ্য স্বপ্নলোকের সন্ধানে ডানা মেলে উড়বার চেষ্টা করে নি।

চৌ-যুগের গদ্য রচনার শ্রেষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায় নানান দার্শনিক ও রাজনৈতিক প্রবন্ধ-নিবন্ধে। লাওৎসি, কনফুসিয়াস প্রভৃতি ভুবনবিখ্যাত দার্শনিকদেব আবির্ভাব হযেছিল এই যুগেই, তাঁদের রচিত গ্রন্থ, শিষ্যবৃন্দ ও নৃপতিগণের সঙ্গে তাঁদের আলাপ-আলোচনা সংলাপ, এসবই জগতেব দর্শন-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। দর্শনের আলোচনা আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে বিশদভাবে করব। রাজনীতি ও দর্শনের তত্ত্বকথা ছাড়াও এ যুগে ছোট গল্প রচনার প্রয়াস দেখা যায়, যদিও সে লেখা রাজনীতির গন্ধবর্জিত নয়। এই রচনাগুলিকে ভিত্তি করেই যুগে যুগে সাহিত্য সৃষ্টিমুখর হযে উঠেছিল, রম্য কাহিনীর আবির্ভাব হয়েছিল। এখানে আমরা অষ্টম খৃস্ট পূর্বাব্দের একটি কাহিনী সংক্ষেপে বলে চৌ-যুগের কথা-সাহিত্য প্রসঙ্গ শেষ কবব :

চি ও চু এ দুটি সামন্তরাজ্যেব মধ্যে ছিল ঈর্ষা, রেষারেষি, মন কষাকষি। চি রাজ্যে ছিল একজন প্রাজ্ঞ রাজনীতিক, তাঁর নাম ইয়েন ইং। চি-রাজ ইয়েন ইং-কে দৌত্যকার্যে পাঠালেন চু-রাজেব কাছে। চু-রাজ জানতেন, ইয়েন ইং স্বদেশে একজন পরম সম্মানিত ব্যক্তি, এবং সে কথা জানতেন বলেই তিনি তাঁকে অপমানিত করে প্রতিদ্বন্দ্বী দেশের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ কববার সংকল্প করলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সুবৃহৎ প্রাসাদ-তোরণের কাছে একটি অনুচ্চ ফটক তৈরি করলেন অতিথির প্রবেশের জন্য। ইয়েন ইং সেখানে এসে দেখলেন যে ফটকটি উচ্চতায় এত খাটো যে ন্যুব্জ না হয়ে প্রবেশ করা যায় না। সে পথে যেতে তিনি রাজি হলেন না। বললেন, "আরে, এ তো কুকুর-

রাজ্যে প্রবেশের পথ। আমি সানন্দে এ পথে যেতাম যদি রাজ্যটি শ্ব-রাজ্য হত। কিন্তু এ তো আর শ্ব-রাজ্য নয়, মহাপরাক্রান্ত চু-বাজ্য।" এই বলে তিনি বৃহৎ তোরণ দিয়ে হন্‌হন্ করে প্রাসাদে প্রবেশ করলেন।

চু-রাজ মচকালেন কিন্তু ভেঙে পড়লেন না। ইয়েং ইন তাঁর সামনে আসা মাত্র ঘৃণাভরে প্রশ্ন করলেন, "আপনিই কি চি-রাজ্যে রাজনৈতিক দৌত্যকার্যের একমাত্র যোগ্য মানুষ ?" ইয়াং ইন হেসে বললেন, "মহারাজ, যে যেমন রাজা তাঁর কাছে আমাদের রাষ্ট্র তেমনি মানুষটিকে দূতরূপে পাঠিয়ে থাকেন। সুদক্ষ বিচক্ষণ রাজার কাছে সুদক্ষ বিচক্ষণ দূত প্রেরিত হয়, আর নির্বোধ ব্যক্তিকে পাঠানো হয় নির্বোধ রাজার কাছে। রাজদূতরা যে যেখানে যান সে দেশের গুরুত্ব লঘুত্ব প্রকাশ পেয়ে থাকে রাজদূতদের গুণের ওজনে।" এই মর্মান্তিক জবাব শুনে হতবুদ্ধি চু-রাজের মুখে আর কথা সরল না।

৪. "শত দর্শন শিক্ষায়তন"

জগতের ইতিহাসে ষষ্ঠ ও পঞ্চম খৃস্ট পূর্বাব্দের একটি বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে পৃথিবীর নানান স্থানে তখন নানা দর্শন ও নীতিধর্মের উন্মেষের সঙ্গে কয়েকজন বিশিষ্ট মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল। এই যুগের হিব্রুদের নির্বাসন ও নির্বাসনোত্তর কালে হিব্রু ধর্ম-চিন্তার শ্রেষ্ঠ পরিণতি 'সাম' (Psalm), 'প্রোভার্ব', 'জব' প্রভৃতি বাইবেলের অমূল্য রত্নরাজি রচিত হয়েছিল। গ্রীসে দার্শনিক পাইথাগোরাসের আবির্ভাব এই যুগেই, এবং তার অব্যবহিত পরেই প্লেটো তাঁর অপূর্ব দর্শন-তত্ত্ব প্রচার করেন। ইরানের জরথুষ্ট্র, ভারতের বুদ্ধদেব ও মহাবীর এবং চীনের লাওৎসি ও কনফুসিয়াস সকলেই প্রায় সমকালীন। ইতিহাসের ছকের বিভিন্ন স্থানে এইসব মহাপুরুষের যুগপৎ আবির্ভাব পাশার শুভঙ্কর দানের মত নিতান্তই আকস্মিক বলা চলে না। ধর্ম বা রাজনীতির অন্ধ স্বার্থের সংঘাতে ঘৃণা-বিদ্বেষপূর্ণ ধরণীর প্রায় সর্বত্রই মানুষ তখন দুর্দশার চরম সীমায় গিয়ে পৌছেছিল, তাই সব ক্ষেত্রেই নূতন জীবনদর্শনের প্রয়োজন হয়েছিল জাতির সমুদ্ধারের জন্য।*

---

* অস্তিত্ববাদী (Existentialist) দার্শনিক কার্ল জাসপারস্ ৮০০-৩০০ খৃঃ পূঃ পাঁচ শ' বছর ব্যাপী দর্শন-জগতের এই মহাবৈপ্লবিক যুগের নাম দিয়েছেন 'Axial Age'। ভারতে বেদোক্ত

চীন দেশে নবম খৃস্ট পূর্বাব্দের পর থেকে সামন্তগণের রাজদ্রোহী কার্য-কলাপ শুরু হয়ে গিয়েছিল। সম্রাটের প্রতি বিদ্রূপ বর্ষণ করে কবিতা লিখতেন সামন্তরা, ব্যঙ্গ-কবিতা রচনার জন্য কবিদের নিযুক্ত করতেন। 'যুধ্যমান রাষ্ট্রসমূহের যুগে' কয়েক শতক জুড়ে ক্রমবর্ধমান অন্তর্দ্বন্দ্বের অরাজকতা কৃষ্ণ ঘনঘটার মত দেশময় ছড়িয়ে পড়েছিল, ফলে শস্যহানি, প্লাবন, অব্যবস্থা ও দৈন্য দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সেই তিমিরান্ধকার অবিমিশ্র মন্দ রূপেই আবির্ভূত হয় নি। দুর্দশাগ্রস্ত জীবনের কঠোরতা মনকে কল্পনাপ্রবণ করে তোলে, তখনই মানুষ দর্শন-তত্ত্বের মূল-নীতির সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়। চৌ-যুগের অন্তর্বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অসংখ্য দর্শন-চক্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সম্ভবত এই নিয়মেই, সেগুলির সমষ্টিগত নাম 'শত দর্শন শিক্ষায়তন' ('The Hundred Schools of Philosophy')। এখানে বলা প্রয়োজন আমাদের ষড়-দর্শনের মত 'শত দর্শন' বাক্যটি কোন নির্দিষ্ট সংখ্যার দ্যোতক নয়, বহুসংখ্যক দর্শন এই অর্থে ব্যবহৃত। গুরু ও তাঁর শিষ্যরা মিলে একটি চক্র গঠন করতেন, তাঁদের আলাপ-আলোচনা যথাকালে লিপিবদ্ধ হয়ে গ্রন্থের আকার ধারণ করত। এমনিভাবে এই আপদকালীন দুরবস্থার মধ্যেই চীনের 'তাও-দর্শন' (Taoism) ও কনফুসীয় নীতিধর্মের বিকাশ ঘটেছিল। তাও-দার্শনিক মহাস্থবির লাওৎসি ও তাঁর সুযোগ্য ভাষ্যকার চুয়াংৎসির সাক্ষাৎ আমরা পাই এই যুগেই। নীতিধর্মের প্রবর্তক বিশ্ববিশ্রুত কনফুসিয়াস ও তাঁর মেধাবী শিষ্য মেনসিয়াসের আবির্ভাব চৌ-যুগের অন্তিমকে সন্ধ্যারুণরাগে রঞ্জিত করেছিল, আর সেই বিচিত্র বর্ণচ্ছটা সুদীর্ঘ কাল ধরে অক্ষুণ্ণ গৌরবে জ্বলজ্বল করেছে মহাচীনের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের জয়টিকা রূপে। এই সময় আর একজন মনীষী ধর্মগুরু দেখা দিয়েছিলেন, তাঁর নাম মোৎ-সি বা মো-তি। অসংখ্য দার্শনিকের অফুরন্ত দর্শন-তত্ত্ব, সকল দর্শনের আলোচনা,

---

নৈষ্টিক যজ্ঞানুষ্ঠানগুলির ভাষ্য ও পরিপূরক রূপে প্রধান উপনিষদসমূহের আবির্ভাব হয়েছিল এই সময়ের মধ্যেই। দার্শনিক পণ্ডিতপ্রবর ডঃ রাধাকৃষ্ণ বলেন, "These Upanisads belong to what Karl Jaspers calls the Axial Era of the world, when man for the first time simultaneously and independently in Greece, China and India questioned the traditional pattern of life." (*The Principal Upanisads* by S. Radhakrishnan, p. 22)

এমন কি উল্লেখও এখানে সম্ভব নয়। এখানে আমরা আলোচনা করব শুধু এই কয়জন প্রাজ্ঞ মহাপুরুষের বিষয়: (১) লাওৎসি, (২) চুযাংৎসি, (৩) কনফুসিয়াস, (৪) মেনসিয়াস, (৫) স্থন-জু, (৬) মোৎ-জি বা মো-তি, (৭) টেং সি, (৮) ইয়াং চু, (৯) হান-ফেই।

লাওৎসি ও তাও-তত্ত্ব

এই মনীষী তাও-দর্শনেব প্রবর্তক রূপে খ্যাত, আসলে যদিও লাওৎসি নামে কোন ব্যক্তি রক্তমাংসের দেহ নিয়ে আদৌ জীবনধারণ করেছিলেন কিনা সে বিষযে নিঃসংশয়ে কোন কথা বলবাব উপায নেই। প্রাচীন কালেব চীনা ঐতিহাসিক জুমা-চিয়েন জনশ্রুতিকেই গ্রহণ করে বলেছেন, লাওৎসি ছিলেন রাজকীয গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ (cuiator)—রাজনীতিকদের কুটচক্রে বিরক্ত হযে দেশত্যাগের সংকল্প করেছিলেন। তখন তাঁর এক অনুগত ব্যক্তি নিবেদন করল, "প্রভু, আপনি কর্ম থেকে বিদায গ্রহণ করেছেন। আমার জন্যে একটি গ্রন্থ লিখে যান।" তাও-দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন লাওৎসি তারই অনুবোধে। গ্রন্থটির নাম তাও-তে-কিং—অর্থ, 'ধর্মপথ' (The Way of Vırtuc)। দুই খণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থ পাঁচ হাজার শব্দের সমষ্টি। এক খণ্ডের নাম 'তাও-গ্রন্থ' (Book of Tao), অপরটি 'তি-গ্রন্থ' (Boók of Tı)। গ্রন্থ রচনার পর কোথায় তিনি অন্তর্ধান করলেন আর কখনই বা তাঁব মৃত্যু হযেছিল, এসব বৃত্তান্তের কোন প্রামাণিক তথ্য আমাদের জানা নেই। কিন্তু কিংবদন্তী সর্বজ্ঞ, এমন কোন বিষয নেই যা কিংবদন্তীর দৃষ্টিদীপের রঞ্জনরশ্মিকে এড়িযে যেতে পাবে, তাই কিংবদন্তী-সূত্রে অবগত হয়ে চীনা ঐতিহাসিক নৈষ্ঠিকভাবে লিখে গেছেন, লাওৎসি সাতাশী বছর (খৃঃ পূঃ ৬০৭-৫১৭) বেঁচে ছিলেন এবং এই মহাপুরুষের জীবনকালেই কনফুসিয়াসের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। কনফুসিয়াসের বযস তখন চৌত্রিশ বৎসর। বিশ বছর-কাল তাও-দর্শন অধ্যয়ন করেছিলেন তিনি, কিন্তু প্রচুর অধ্যবসায় সত্ত্বেও সেই দর্শনের মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম হন নি। তাই সংশয় নিরাকরণের জন্য একদা লাওৎসি সন্দর্শনে এসে মহাস্থবিরকে তিনি কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন। লাওৎসি এই উত্তর দিলেন: "আমি শুনেছি সমৃদ্ধ ব্যবসায়ী সাবধানে নিজের

প্রভূত ঐশ্বর্য গোপন রাখে, বাইবে এমন ভাব দেখায় যেন সে রিক্ত দরিদ্র। তেমনি কৃতিত্বের অতুলনীয় ঐশ্বয থাকা সত্বেও মহৎ ব্যক্তির ব্যবহার সরল উদার, আচবণ আড়ম্বরশূন্য। তুমিও পরিহার কর তোমার গর্ব, অশেষ উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বাহ্যাডম্বব, দুষ্প্রাপ্য লক্ষ্য বস্তু। কেননা চারিত্রিক উৎকর্ষের পবিপন্থী এরূপ মনোবৃত্তি। োমাব প্রতি এই আমাব উপদেশ।" বৃদ্ধ মনীষীর এই উপদেশবাণী কৃত্রিম শালীনতার উপাসক কনফুসিযাসেব মন থেকে সংশয দূর কবতে আদৌ পেরেছিল কিনা সন্দেহ। শিষ্যদের কাছে ফিরে এসে তিনি বললেন, "পক্ষীকুল—আমি জানি তাবা আকাশে উড়ে বেড়ায, মৎস্যকুল—আমি জানি তারা জলে ছুটোছুটি করে সাঁতার কাটে, বন্য জন্তু—আমি জানি তাবা ভয চকিত হযে দৌড়ে পালায। ধাবমান বন্য জন্তুকে ধবা চলে ব্যাধের জাল বিস্তাব করে, সন্তরণশীল মাছকে গাঁথা যায ছিপের বঁড়শি দিযে, আব উড়ন্ত পাখীকে শরবিদ্ধ করতে পারা যায। কিন্তু ড্রাগন কিরূপে বায়ু ও মেঘেব উর্ধ্বে আরোহণ কবে আমি তা জানি না। আজ আমি লাওৎসিকে দেখেছি। তিনি সেই ড্রাগনেবই মত।"

অযথার্থ কথা বলেন নি কনফুসিযাস। তাও-তত্ত্ব ব্যোম বিহারী, ছিপে ধরা প'ড় না, তাকে শরবিদ্ধও করা যায না। 'তাও' শব্দের অর্থ 'পথ' ("the way")। এই পথ সন্ধান দেয স্বভাবধর্মের, ঋত সত্যের। স্বভাব-ধর্ম প্রকৃতিকে নিযন্ত্রণ করে। গিরি, নদী, মেঘপুঞ্জ, নক্ষত্ররাজি, সারা দৃশ্যমান প্রকৃতি স্বভাবধর্মেব বশবর্তী, স্বভাব-মার্গেব অভিযাত্রী। স্বভাব-ধর্ম নিরপেক্ষ ও নৈর্ব্যক্তিক, তাই প্রাকৃতিক বিধানেব সঙ্গে সংগতি রেখে চলে শান্তিকামী প্রাজ্ঞ মানবের কর্মযোগ, তাব জীবন-বীণার সুর বাঁধতে হয সেই বিধানের সঙ্গে সংগত করে। শাশ্বত বিধানমত যে তাও বিশ্ব-প্রকৃতিব পথ নির্দেশ কবে সেই তাও ই মানুষকে দেখায ঋত সত্যের পথ। বস্তুত জগৎ বিধৃত ঋত অর্থাৎ সত্যধর্মের দ্বাবা—ঋতস্য তন্তুঃ বিততঃ পবিত্রঃ (ঋক ৭-৩৩-৭)। বিশ্ব-প্রকৃতির ছন্দের সঙ্গে জীবনেব ছন্দ একই সূত্রে গ্রথিত—প্রবাল ইন্দ্রনীলের দ্যুতিময়ী মালার মত—দুই ছন্দ একই ছন্দ, দুই তাও একই তাও। জীবনরহস্যেব দর্শন সম্ভব তখনই যখন স্বভাব-প্রকৃতি ও ঋত সত্য দুই ক্ষেত্রেই তাও-ব একত্ব উপলব্ধি জন্মে। লাওৎসি

বলেন, "রহস্যের আধার (অব্যক্ত) আর রহস্যের প্রকাশ (ব্যক্ত)—মূলত দুই একই। অব্যক্ত ধরে বিভিন্ন নাম যখন হয় তার অভিব্যক্তি। অব্যক্ত ও ব্যক্ত একযোগে 'বিশ্ব-রহস্য' (Cosmic Mystery) নামে অভিহিত। সর্ব জীবনের গূঢ় তত্ত্বদ্বারে উপনীত হয় সেইজন, যে গভীর থেকে গভীরতর রহস্যে প্রবেশ করতে সক্ষম" (তাও-গ্রন্থ ১)।

তাও-তত্ত্বের এই কথাগুলি সরাসরি আমাদের সম্মুখে ব্রহ্মবাদের পরমার্থ-তত্ত্বকেই তুলে ধরে। ব্রহ্মের মতই তাওকে ভাষায় বর্ণনা করা যায় না—তাও নামহীন। পূর্ণত্বই তাওয়ের একমাত্র পরিচয—পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং।

যে তাও বর্ণনা কর সে তাও পূর্ণ নয।
যে নামে তার পরিচয় দাও সে নাম পূর্ণ নয।
স্বর্গ-ধরণীর জন্ম যে সত্তা থেকে তার নেই নাম।
আর যত বস্তুর জননী তার আছে নাম। (তাও-গ্রন্থ ১)

তাও এক—একমেবাদ্বিতীয়ম্—"নিত্য, সর্বগত, অন্তহীন, অসীম, সর্ব বস্তুর উৎসমূল।"

রশ্মি তার স্তিমিত,
চিত্ত তার অনুদ্বেল,
প্রশান্ত যেন স্ফটিক-স্বচ্ছ জল।
জানি না সে কার সন্তান—
যে সত্তা ছিল ঈশ্বরের পূর্বে তারই সে প্রতিমূর্তি। (তাও-গ্রন্থ ৪)

তিনিই উপনিষদের পরব্রহ্ম, তাও দর্শনে এই ব্রহ্মের আদি-প্রকৃতি স্পষ্ট করে বলা হয়েছে ঃ

> স্বর্গ-পৃথিবীর জন্মের পূর্বে শৃঙ্খলা যখন নাই, সৎ ছিল নিঃসঙ্গ, নির্বাক, একক, অচঞ্চল, ধ্রুব, (কিন্তু) চিরঘূর্ণ্যমান সৃষ্টি-সম্ভাবনা-রূপে। নাম তার জানি না, তাও বলে ডাকি। নাম যদি দিতে হয় তবে তাকে বলি 'মহৎ'। (তাও-গ্রন্থ ২৪)

এখানে বলা প্রয়োজন, উপনিষদের আত্মতত্ত্বে 'মহৎ' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, কিন্তু মহৎ সেখানে—বিশেষত কঠোপনিষদে—'মহান্ আত্মা'

বা সৃষ্টিকর্তাকেই ব্যঞ্জনা করে, যার পরে আছে অব্যক্ত, 'মহতো পরমব্যক্তম্'। তাও-গ্রন্থে তাওকে মহা-তাও বলা হয়েছে :

মহা-তাও সর্বস্থানে প্রবাহিত,
(প্লাবনের মত) এদিক ওদিক বয়ে যায় তার ধারা।
তাও থেকে সর্ব জীব প্রা'. লাভ করে। (তাও-গ্রন্থ ৩৪)

তাও অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, ব্রহ্মের সঙ্গে তাওয়ের কোন প্রভেদ নেই, এই কথাটি বেশ ফুটে উঠেছে তাও-গ্রন্থের নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনায় :

দৃষ্টি পড়ে, তবু যে রূপ যায় না চোখে দেখা, সে অরূপ।
শ্রবণে আসে, তবু যে শব্দ যায় না কানে শোনা, সে অশব্দ।
ধরা পড়ে, তবু নেই যার ধরা-ছোঁয়া, সে অস্পর্শ।
সন্ধানীর সকল সন্ধান এড়িয়ে চলে অরূপ অশব্দ অস্পর্শ—
তিনের মিলন 'এক অদ্বিতীয়ে'র মধ্যে।
সেখানে নেই উদয়, আছে আলো,
নেই অস্ত, আছে আঁধার কাজল-কালো,
বাধাবন্ধহীন মুক্তধারা যার নেই বর্ণনা—
যে আঁধার মিলিয়ে যায় আবার নিশুত শূন্যতায়।
তাই তারে বলে অরূপের রূপ, শূন্যতার প্রতিচ্ছবি।
তাই তারে বলে বাক্-মনের অগোচর।
মুখোমুখি বসে আছি, দেখি নি তার মুখ,
পিছে পিছে চলি, তবু তার পিঠ দেখি নি। (তাও-গ্রন্থ ১৪)

তাও-দর্শন ভারতীয় ব্রহ্মবাদের প্রতিরূপ, কিন্তু তা সত্ত্বেও চিন্তার গঠনে ও বাচন-ভঙ্গীতে চীনা বৈশিষ্ট্য প্রতি ছত্রে প্রকাশমান। কতকগুলি চির-বিরুদ্ধ ভাবব্যঞ্জনার অদ্ভুত কৌশল 'তাও তে-কিং'য়ে যেমন দেখা যায়, এমনটি জগতের আর কোন গ্রন্থে আছে কিনা সন্দেহ। উদাহরণস্বরূপ আমরা এখানে মূল গ্রন্থের বিশেষ কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করে মর্ম গ্রহণ করতে চেষ্টা করব। তাও-গ্রন্থে বলা হয়েছে :

জীবনের রহস্য সন্ধান সম্ভব—
চিত্ত যখন নিত্য অনাসক্ত রাগ-বিবর্জিত।

আর—জীবনের বর্ণ-বৈচিত্র্য দর্শন সম্ভব
চিত্ত যখন রাগে অনুরাগে নিত্য উচ্ছ্বসিত। (তাও-গ্রন্থ ১)

যেমন এই দু-মুখো সত্তাকে দেখা যায় দুটি বিপরীত দৃষ্টিকোণ থেকে, তেমনি প্রজ্ঞা ও মূঢ়তা, শক্তি ও দৌর্বল্য, কর্ম ও অকর্ম, সাফল্য ও ব্যর্থতা—সবই আপেক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সঞ্জাত, তাও-তত্ত্বের এই হল সারমর্ম। সেজন্য তাও-দর্শনে বলা হয়েছে—মূঢ়তা প্রজ্ঞার ছদ্মরূপ, অকর্ম কর্মের ছদ্মরূপ আর দৌর্বল্য শক্তিরই ছদ্মরূপ। প্রকৃতপক্ষে তাও-দর্শন একটি ছদ্মরূপের দর্শন। সুন্দর বা অসুন্দর, শ্রেয় বা মন্দ, সত্তা বা নিঃসত্তা—এইসব বিপরীত গুণধর্মের কোনরূপ স্বাধীন সত্তা নেই, কেননা তারা পরস্পর-নির্ভরশীল।

সুন্দরকে সুন্দর রূপে জানে যদি বিশ্বজন
জাগে কুৎসিতের পরিচয়।
শ্রেয়কে শ্রেয় রূপে যখন জানে বিশ্বজন
তখন জাগে মন্দের পরিচয়।
তাই—
সত্তা ও নিঃসত্তা—পরস্পর-নির্ভরশীল সংবৃদ্ধির মাঝে।
দুরূহ ও সহজ—পরস্পর-নির্ভরশীল কার্যের সম্পূর্ণতায়।
উপর ও নীচ—পরস্পর-নির্ভরশীল অবস্থিতি রূপে।
সুর ও স্বর—পরস্পর-নির্ভরশীল মূর্ছনা-ঝংকারে।
সমুখ ও পিছন—পরস্পর নির্ভরশীল সাহচর্যে। (তাও-গ্রন্থ ২)

আপেক্ষিকতাবাদের আর একটি চমৎকার রূপ তাও গ্রন্থের অ-সৎ-এর অর্থাৎ 'শূন্যের সার্থকতা' শীর্ষক কবিতাটিতে সুন্দর ফুটে উঠেছে ঃ

ত্রিশটি শলা যখন এসে মেলে চাকার নাভিমূলে,
শলার স্বাতন্ত্র্য লোপ পায়, শলা যখন আর শলা নয়,
তখন প্রকাশ পায় শলার ব্যবহারিক সার্থকতা।
মাটির ভাণ্ড গড়ো,
ফাঁকা গর্ভেই ভাণ্ডের ব্যবহারিক সার্থকতা।

ঘবের দেয়ালে দরজা জানালা কাটো,
সেই ফাঁকায রযেছে গৃহেব সার্থকতা।
তাই, 'আছে' 'নাই' অবস্থা ছুটির প্রযোজন,
আমবা ভোগ কবি যা 'আছে'
আব 'নাই' আমাদেব জী৲ন সার্থক কবে তোলে। (তাও-গ্রন্থ ১১)

তাও-তত্ত্বের কর্মের আদর্শ নিষ্ক্রিয কর্ম বা নৈষ্কর্ম্য। নিষ্ক্রিয় কর্মী সেই ব্যক্তি যিনি ভগবদ্গীতাব ভাষায কর্মে অকর্ম আব অকর্মে কর্ম দর্শন করেন:

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদ্ অকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্ন কর্মকৃৎ॥ (গীতা ৪।১৮)

তাও কোন কর্ম কবেন না, সকল কর্ম তাঁব মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয। তাও কাযাহীন ছাযাপথ, নৈষ্কর্ম্যেব দ্বাবা যে ব্যক্তি তাও-পথের যাত্রী হয, তাও হন তাব সাথী, তাওযের মধ্যে সে বিলীন হযে যায। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কর্ম বিনা সংসাবধর্ম পালন কবে, বাক্য বিনা তত্ত্বকথা প্রচার করে। সংসারের প্রতি তার দৃষ্টি থাকে—জনকল্যাণেব জন্য, আত্মম্ভবিতাব জন্য নয। এইরূপে আত্মাভিমানবর্জন, পবার্থপবতাই তাও-তত্ত্বেব নৈষ্কর্ম্য। কর্মযোগে নৈষ্কর্ম্যেব একটি বর্ণনা:

প্রাজ্ঞ মনীষীর প্রশস্তি কীর্তন ক'বো না,
লোকে তবে দ্বন্দ্ব-কটকৌশলেব আশ্রয নেবে না।
দুর্লভ দ্রব্যেব জন্য মহামূল্য দিও না,
লোকে তবে পরস্ব হবণ কববে না।
বাসনার বস্তু চোখেব আড়ালে বেখে দিও,
লোকেব লুব্ধ চিত্ত তবে ক্ষুব্ধ হবে না।
তাই প্রশাসন ব্যাপারে সুধীজন
জনগণেব চিত্ত রাখে শূন্য (= বিনযগুণে পবিপূর্ণ),
উদর রাখে পূর্ণ,
উচ্চাকাঙ্ক্ষা দূর কবে,
শরীর দৃঢ় কবে,

শুদ্ধ হয যেন লোকের চিন্তা ও কামনা।
কুচক্রী আর তখন তাদের প্রভাবিত করে না।
এমনি নিষ্ক্রিয কর্ম দ্বারা শান্তি-সুখে বসবাস সম্ভব। (তাও-গ্রন্থ ৩)

উপনিষদে আছে, তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ—ত্যাগেব দ্বাবা ভোগ কব। সেই ত্যাগেব আদর্শই তাও দর্শনেব শ্রেষ্ঠ নৈষ্কর্ম্য-যোগ।

বিশ্ব চিরন্তন—
জীবন সে নিজের জন্য যাপন কবে না,
তাই বিশ্ব চিবন্তন।
সাধুজন সবার পিছনে দাঁডায,
তাই সে অগ্রণী।
সে বেঁচে থাকে আপনাব জন্য নয (বিশ্বজনের জন্য),
তাই না তাব আত্মা পূর্ণত্ব লাভ করে। (তাও গ্রন্থ ৭)

তাওকে আশ্রয করে কর্ম কবলে আদিতত্ত্বেব সন্ধান মেলে, সেই কথাই বলা হযেছে এই শ্লোকটিতে :

শাশ্বত পুবাণ তাও—
নিত্যকর্ম অনুষ্ঠানেব জন্য যে-জন তার আশ্রয নেয
সে জানে—আদিম উদ্ভব (সৃষ্টি) সম্ভব হযেছে শুধু তাও-ধারা থেকে।
(তাও-গ্রন্থ ১৪)

কনফুসিয়াস জ্ঞানের বোঝার পরিমাপে জ্ঞানী ব্যক্তিকে ওজন করেন নি। জ্ঞানীর সংজ্ঞা দিয়েছেন তিনি এইরূপ : সেই ব্যক্তি জ্ঞানী, যে জানে কি সে জানে, আবার এও জানে কি সে জানে না। কিন্তু তিনি বলেছেন চৈনিক জীবনাদর্শের জ্ঞানেব কথা, যে জ্ঞান লাভ কবা যায নীতিশাস্ত্র অধ্যযন ও অনুশীলন দ্বাবা। পক্ষান্তরে তাও-তত্ত্বে জ্ঞানেব প্রকৃত রূপ রহস্যাত্মক, সেই জ্ঞানের পূর্ণত্বলাভ সম্ভব কর্ম দ্বাবা নয়, নৈষ্কর্ম্য দ্বাবা।

ঘরের বাইরে পদক্ষেপ না করে
বিশ্বের সংবাদ জানা যায়।

জানালার বাইরে দৃষ্টিপাত না করে
স্বর্গের তাওকে দেখা যায়।
জ্ঞানের পিছে যত ছুটতে থাক
জ্ঞানের মাত্রা তত পায় হ্রাস।
তাই, জ্ঞানী এদিক ওদিক না ঘুরে
জ্ঞান অর্জন করে।
জ্ঞানী বোঝে চোখে না দেখে,
জ্ঞানী সিদ্ধি লাভ করে কর্ম না করে। (তাও-গ্রন্থ ৪৭)

কর্মে সিদ্ধিলাভে বিপদ আছে। তাই এই হুঁশিয়ারি:

ধনুর গুণটি ধরে যদি কষে টানো
এক জায়গায় তুমি থামতে চাইবে।
তলোয়ারে যদি অতিমাত্র শান দাও
ধার তার বেশী সময় টিকবে না।
সোনা হীরা দিয়ে যদি ঘর পূর্ণ কর,
সম্পদ নিরাপদে রাখা চলবে না।
ঐশ্বর্য-সম্মান-গর্বে অন্তর যদি ভরে তোল,
তবে আর পতনের হাত থেকে উদ্ধার নেই।
কাজ শেষ হলে নীরবে প্রস্থান করা—
এই তো স্বর্গের বিধান। (তাও-গ্রন্থ ৯)

তাও-পন্থীর নির্বিকার, নির্দ্বন্দ্ব, শান্ত, সমাহিত চিত্তে জীবনের সুসমঞ্জস মূর্ছনার সুরে বেজে ওঠে প্রেম ও করুণা। ঘৃণার প্রতিদান দাও দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করে। প্রেম পরম ঐশ্বর্য, প্রেমহীন ব্যক্তিকে মৃত বলা হয়েছে। প্রেম আক্রমণে চিরজয়ী, প্রতিরোধে দুর্ভেদ্য। স্বর্গ যাকে ধ্বংস করতে চান না, প্রেমের সজ্জায় তাকে ভূষিত করেন। মৈত্রী ও করুণা প্রেমের সহচরী, ত্রয়ীর জয়যাত্রা অহিংসার পথে। মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম অহিংসা, শত্রু-মিত্রে সমদৃষ্টি। যুদ্ধ ও যোদ্ধার নিন্দা তাও-গ্রন্থে যেরূপ করা হয়েছে, আজকের হিংসা-দ্বেষ-ভরা পৃথিবীর ত্রাণের জন্য সে কথা স্মরণ করবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাও-পন্থী বলেন, বাহুবলে দিগ্বিজয় তাওয়ের পথ নয়। সংগ্রামের

আঘাত প্রতিঘাতরূপে ফিরে আসে সর্বজনের ওপর। যেখানে সৈন্যের শিবির বসে সেই স্থান কাঁটা-আগাছায ভরে ওঠে, সৈন্যের সংগ্রহ মন্বন্তরকে ডেকে আনে। গর্ব করবার জিনিস নয় যুদ্ধজয। হত্যার উল্লাসে মত্ত হযে যার চিত্ত গর্বে ভরে ওঠে, বিশ্বশাসনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা তার চরিতার্থ হবার নয। ব্যাপক হত্যা দুঃখকেই বরণ করে, বিজয-উৎসবে অন্ত্যেষ্টির ক্রন্দন-সুর বেজে ওঠে। সৈন্যদের সম্বন্ধে বলা হযেছে, তারা শুধু মন্দের অস্ত্র, মানবঘৃণিত, তাও-ধর্মীবিবর্জিত।

শাসনতন্ত্রে তাও-তত্ত্ব নৈষ্কর্ম্যের আদর্শ বর্জন করে নি। হস্তক্ষেপ বিনা দেশ-শাসন তাও-দর্শনের একটি প্রধান অনুশাসন। সমাজে নিষেধ-বাধা যত গড়ে তোলা যায, প্রজারা নিঃস্ব রিক্ত তত বেশী হয। অস্ত্র যত শাণিত কর, বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয তত বেশী। আইনের সংখ্যা যত বাড়ে দেশ তত চোর-ডাকাতে ভরে ওঠে। তাই প্রশাসন ব্যাপারে রাজার হস্তক্ষেপ যত কম হয ততই ভাল। উদাহরণস্বরূপ শাসকশ্রেণীকে চার ভাগে বিভক্ত করা হযেছে: সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক তিনি যাঁর অস্তিত্বটুকু মাত্র লোকে জানে। তাঁর নীচের আসন সুশাসকের, যিনি প্রজার শ্রদ্ধা প্রীতি অর্জন করেছেন। যাঁর ভযে প্রজা কম্পমান তাঁর স্থান নিম্নে, আর সর্বনিম্ন স্থান সেই শাসকের, সকলে যাঁর নিন্দা সর্বক্ষণ করে থাকে। সুযোগ্য শাসক এমন নির্লিপ্তভাবে কর্ম করেন যে, কার্য-শেষে লোকে বলে—এসব কাজ আমাদেরই চেষ্টা-উদ্যমের ফলে। প্রজার ক্ষুধার জন্য, দুর্দশার জন্য দাযী শাসক, তার অপরিমিত শোষণ, ফলে প্রজা হযে ওঠে অশান্ত দুর্দান্ত। 'যে শাসক প্রজার জীবিকার ওপর হাত দেয না, পক্ষান্তরে তার জীবনের মান বৃদ্ধির জন্য আত্মনিযোগ করে, সেই প্রাজ্ঞ।' জাঁকজমকপ্রিয, স্বার্থপর, অর্থগৃধ্নু রাজপুরুষদের তীব্র ভাষায নিন্দা করেছেন লাওৎসি:

দেখ, রাজপুরুষদের কেমন ফিটফাট সাজ-পোশাক,
এদিকে কিন্তু অকর্ষিত মাঠ ফেটে কাঠ হল,
শস্য গোলা সারা হযে গেল।
চারু কাজ-করা জোব্বা পরে, কোমরে তলোযার ঝুলিয়ে,
পানভোজনে পরম আয়েসে কাল যাপন করে
এই কর্মচারী দল।

এই পথটি জগৎকে নিয়ে যায় দস্যুতার বিরাট গহ্বরে।
তাও তখন তার সত্য রূপ ছেড়ে বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে।

(তাও-গ্রন্থ ৫৩)

শাস্তি প্রাণদণ্ড বিষয়ে নির্দেশগুলিও বিচিত্র। কে কাব প্রাণ নেবে? কে জানবে, কার প্রতি স্বর্গ বিরূপ? বিশ্বসংসারে দেখা যায়, ঘাতকের খড়্গ পবিশেষে ঘাতকেব ঘাড়েই নেমে আসে। ঘাতকের কাজ যেন আনাড়ীর ছুতোরের যন্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া। এইসব তীক্ষ্ণধাব অস্ত্র হস্তকে করে ক্ষতবিক্ষত, রুধিরাক্ত।

বৈজ্ঞানিক পবিভাষা মত তাও-তত্ত্বের সমাজ ও বাষ্ট্রদর্শনকে 'দার্শনিক অরাজকতা' (Anarchism) বলে অভিহিত কবা চলে, যে অরাজকতার পুবোধা ছিলেন টলস্টয়, ক্রোপটকিন প্রমুখ মনীষীগণ। যান্ত্রিকতার কবলমুক্ত সহজ সবল জীবনাদর্শ প্রচাব কবেছিলেন মহাত্মা গান্ধী, সেই আদর্শেব অনুরূপ 'কল্পবাজ্যে কল্পবাসের' একটি মনোরম চিত্র তাও-গ্রন্থে অঙ্কিত বয়েছে: দেশ ছোট, লোকজন বেশী নেই, চাহিদার চেয়ে মালেব যোগান সেখানে শতগুণ, খাওয়া-পরার নেই কোন অভাব। নৌকা গাড়ি কেউ চড়ে না, বর্ম চর্ম ধাবণেব কোন উপলক্ষ ঘটে না। লোকে সুখাদ্য উপভোগ কবে, বসন-সজ্জায় তৃপ্তি বোধ কবে, আপন ঘবে তুষ্ট মনে বসবাস কবে, নিজরীতি বজায় রেখে চলে। (তাও-গ্রন্থ ৮০)

পরমার্থ-তত্ত্ব, সমাজ ও রাষ্ট্রদর্শন, শাসন-তন্ত্র, মানুষেব এই সব উন্নত চিন্তা ও কর্মক্ষেত্রে তাওযেব প্রভাব বিস্তাব করতে হলে ধ্যান-যোগেব আশ্রয় গ্রহণ কবতে হয়। ধ্যান-যোগ রহস্যাত্মক, নিষ্কর্মেব শ্রেষ্ঠ পবিণতি, তাও-পন্থীর অপবিহার্য সাধন-মার্গ। চিত্তবৃত্তি-নিবোধেব কথা তাও-গ্রন্থে বিশেষ-ভাবে বলা হয়েছে:

যে জানে সে মৌন থাকে,
যে জানে না সে কথা বলে।
রন্ধ্র বন্ধ কপাট রুদ্ধ কর, তীক্ষ্ণ ধার কর ভোঁতা।
জট খোলো, কমাও আলো,
বিক্ষুব্ধ চিত্তবৃত্তি কর নিরুদ্ধ।
তখন জাগবে উপলব্ধি—নিগূঢ় একত্ব। (তাও-গ্রন্থ ৫৬)

ধ্যান-যোগে যার জন্মে উপলব্ধি, নিন্দা-স্তুতির অতীত সে, প্রেম ঘৃণা তাকে স্পর্শ করে না, লাভ ক্ষতি তার নাগাল পায় না, মান অপমান তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে, তাই সে জগতের সম্মান লাভ করে। তাও-তত্ত্বে যিনি জ্ঞানবান তিনিই সেই স্থিতপ্রজ্ঞ গুণাতীত পুরুষ যাঁর বিষয়ে গীতা বলেছেন :

তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরঃ তুল্যঃ নিন্দাত্মসংস্তুতি। (গীতা ১৪।২৪)
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যঃ মিত্রাবিপক্ষয়োঃ। (গীতা ১৪।২৫)

প্রাণায়াম প্রভৃতি যোগের বহিরঙ্গ সাধনার বিষয় তাও-পন্থীদের অপরিজ্ঞাত ছিল না। 'তাও তে-কিং' বা তাও-ধর্মগ্রন্থে এই বহিরঙ্গ যোগ-সাধনার সঙ্গে ইয়াং ও ইন গুণদ্বয়ের বিশেষ সম্বন্ধের উল্লেখ আছে। গুণ দুটির কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে—ইয়াং পুরুষের ধর্মবিশিষ্ট সক্রিয় জীবন ও জ্যোতির প্রতীক, আর ইন স্ত্রী-গুণবিশিষ্ট স্থূল প্রকৃতি, এবং পুরুষ ও প্রকৃতির বিপরীত গুণ ধর্মের সংযোগে স্বর্গ, পৃথিবী এবং জীবনশক্তির উদ্ভব। মানুষের সৃষ্টিও এই গুণ দুটির সংযোগের ফল, সেই জন্য মানুষ তার অধ্যাত্মশক্তির প্রভাব দেহের ওপর বিস্তার করে আকাশ ও পৃথিবীর মতই অক্ষয় অমরত্ব লাভ করতে পারে। প্রতি মাসে কয়েকটি দিন ক্ষণ আছে, বিশেষত ঊষা ও অমাবস্যা কালে ইন গুণের হ্রাস ঘটে আর ইয়াং গুণের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। এইরূপ শুভ দিন-ক্ষণ দেখে সুং যুগের (৯৬০-১১২৬ খৃস্টাব্দ) তাও-ধর্মীরা অমৃতত্ব লাভের জন্য প্রাণায়ামাদি যোগাভ্যাস করতেন।

পূর্বে বলা হয়েছে, তাও-দর্শন উপনিষদোক্ত ব্রহ্মবাদের প্রতিরূপের মত, উভয়ের মধ্যে এই গভীর সাদৃশ্য সম্ভবত একটি আকস্মিক ব্যাপার নয়। স্মরণ থাকতে পারে, সম্রাট মু ওয়াং (খৃঃ পূঃ ১০০১-৯৪৭) সারথি সমভি-ব্যাহারে রথে আরোহণ করে পশ্চিম অঞ্চলে দেশভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। 'চলন্ত বালুর দেশ' (মরুভূমি), 'পুঞ্জীকৃত পালকের দেশ' (তুহিনাবৃত ভূমি) অতিক্রম করে উপনীত হয়েছিলেন তিনি এমন একটি সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে যেখানে 'পক্ষীকুল জীর্ণ পালক মোচন করে'। চীনের পশ্চিমাঞ্চলের মরুদেশ ও চিরতুষারাচ্ছন্ন পর্বতরাজির অপর প্রান্তে ভারতবর্ষ ও পারস্য। ভ্রমণ-কাহিনীতে এই দুই দেশ বা দুটির কোন একটির উল্লেখ করা হয়েছে এরূপ অনুমান অসংগত নয়। ভারতে তখন বৈদিক যুগ, উপনিষদের ব্রহ্মবাদ

প্রতিষ্ঠার পথে যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছে। চীন দেশে তাও-তত্ত্বের সর্বপ্রথম ইঙ্গিত পাওয়া যায় সম্রাট মু ওয়াং-এর এই ভ্রমণ-বৃত্তান্তের মধ্যে, এই কথা বিবেচনা করলে তাও-তত্ত্ব ভারতবর্ষের অবদান বলে ধরে নেওয়া সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত।

কিন্তু সভ্যতার সূত্রপাত থেকে চীন দেশে যে সমাজ-চিন্তা চলে এসেছিল সেই চিন্তাধারার সঙ্গে তাও দর্শনের তত্ত্বগুলির আদৌ কোন সংগতি নেই। চীনারা ব্যবহারিক বুদ্ধিসম্পন্ন জাতি, তাদের দর্শন প্রধানত জীবনদর্শন, পরমার্থ-দর্শন নয়। কনফুসিয়াস ছিলেন সেই জীবনদর্শনের মুখপাত্র। তাও-দর্শনের সম্পূর্ণ বিপরীত কনফুসীয় সমাজ-নীতির কর্মযোগকেই চীনারা জাতীয় ধর্মের মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। তাই কনফুসীয় নীতি ও সমাজ-বিধান হয়েছিল দীর্ঘকাল স্থায়ী, আর তাও-দর্শন কতগুলি আনুষ্ঠানিক ধর্মাচরণে পর্যবসিত হয়েছিল যার বেশির ভাগই কুসংস্কার ও বাহ্য ঠাট। চি'ন বংশীয় কোন সম্রাট তাও-তত্ত্বের ব্যাখ্যা করতেন সভাসদবর্গের কাছে এবং তখন কেউ মুখব্যাদান করে হাই তুললে তাকে তিনি ঘাতকের হস্তে সমর্পণ করতেন। হ্যান-সম্রাটগণের আমলে শক্তি অর্জন, বিশেষত 'স্পর্শমণি' ও 'সঞ্জীবনী সুধা' আবিষ্কারের পন্থারূপেই তাও-এর সাধনা করা হত। তাও-ধর্মের প্রথম পুরোহিত বা ধর্মগুরু ('পোপ') ছিলেন চ্যাং তাও লিং (৩৪-১৫৬ খৃস্টাব্দ)। ধর্মের বাহ্য অনুষ্ঠান ও কুসংস্কারের চাপে তত্ত্বটির যে কতদূর অধোগতি হয়েছিল তার একটি চিত্র পাই আমরা প্রথম ধর্মগুরু সম্বন্ধে এই বর্ণনায়ঃ "তিনি শক্তি অর্জন করেছিলেন যার দ্বারা নক্ষত্রলোকে বিচরণ করতে পারতেন, পর্বত ও সমুদ্রকে পৃথক করতে পারতেন, বায়ু ও বজ্রকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারতেন।" বস্তুত ভূতপ্রেত-বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত আদিম ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে তৎকালীন তাও-তত্ত্ব সর্বতোভাবে মিশ্রিত হয়ে পড়েছিল। তারপর যখন বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব হল তাও-ধর্মকে দেখা গেল তখন যযাতি-পুত্র পুরুর ভূমিকায়—অর্থাৎ তাও-দর্শনের মহত্তম তত্ত্বগুলিকে বৌদ্ধধর্মের হাতে তুলে দিয়ে বৌদ্ধ মহাযানের যাবতীয় কদাচার সে আপন স্কন্ধে গ্রহণ করল। ৫৫২ খৃস্টাব্দে বোধিধর্ম নামে জনৈক ভারতীয় বৌদ্ধ মহাস্থবির চীনে এসে একটি নূতন মার্গের নির্দেশ দেন—চীনা বৌদ্ধধর্মের সেই মার্গের নাম 'চ্যাং' (ধ্যান)-মার্গ। এই ধ্যানকেই জাপানীরা বলে 'জেন' মার্গ। তাও-দর্শনে যে ধ্যানের উল্লেখ রয়েছে সেই ধ্যান-যোগ

মরুনদীর মত নিজেকে নিঃশেষে হারিয়ে ফেলেছিল চ্যাং-পন্থী বৌদ্ধধর্মের মাঝে। ফলে তাও-ধর্ম একটি ভূত-প্রেত-তাড়ানো আনুষ্ঠানিক ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। পূর্বোক্ত তাও-দর্শন ও ধ্যান-যোগ থেকে এই ভূত-তাড়ানো ধর্মাচারকে পৃথক করে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা সেই আদিকালের দর্শন-তত্ত্বের নাম দিয়েছেন 'লাও-ধর্ম' (Laoism), দার্শনিক লাওৎসির নাম অনুসারে—আর সেই ধর্মেরই পরবর্তী অপভ্রংশের নামকরণ করা হয়েছে, তাও-ধর্ম (Taoism)।

চুয়াংৎসি

লাওৎসির আবির্ভাবের দু'শো বছর পর তাও-তত্ত্বের বিস্তারিত ভাষ্য রচনা করেছিলেন চুযাংৎসি। লাওৎসি ও কনফুসিয়াস সমসাময়িক, তেমনি উভয়ের শিষ্য ও ভাষ্যকার চুযাংৎসি ও মেনসিয়াসও একই সময়ের মানুষ—কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে শিষ্যদ্বয় নিজ নিজ রচনায় একে অন্যের নাম পর্যন্ত করেন নি। যিশুখৃস্টের বাণীকে রূপ দান করেছিলেন তাঁর শিষ্য সেণ্ট পল, তেমনি লাওৎসি-প্রবর্তিত তাও-দর্শনকে শাখাপল্লবিত করে বিশাল মহীরুহে পরিণত করেছিলেন চুযাংৎসি। বৌদ্ধধর্ম চীনে প্রবেশ করবার পূর্বে একমাত্র চুযাংৎসির দর্শনই ছিল মূলতত্ত্ব বিষয়ক।

চৌ-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি চু ইউয়ান, আর সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ গদ্য-লেখক রূপে চুযাংৎসি সুপরিচিত। অপূর্ব রচনা-শৈলী ও ভাবের অপরিসীম গভীরতা লেখককে সাহিত্য-মঞ্চের রত্ন-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বস্তুত সর্বজন-পূজিত কনফুসীয় নীতিধর্মের ওপর তীব্র কশাঘাত সত্ত্বেও চুযাংৎসির রচনাবলী সাহিত্যরসের অফুরন্ত উৎসরূপেই চিরদিন সমাদৃত হয়ে এসেছে।

চুযাংৎসি সুং প্রদেশে খি-ইউয়ান নগরে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে কি একটা সামান্য কাজে নিযুক্ত ছিলেন তিনি, কিন্তু তাঁর প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সারা দেশে এমনি ছড়িয়ে পড়েছিল যে দুবার তাঁকে উচ্চ রাজপদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হয়েছিল, আর দুবারই তিনি সেই রাজকীয় সম্মান হেলাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে একটি কথিকায় বলা হয়েছে: একদা তিনি যখন পো নদীতে মাছ ধরছিলেন, সেই সময় চু-রাজের দুজন উচ্চ কর্মচারী এসে তাঁকে বলেন, "আমাদের প্রভু আপনার ওপর শাসনভার ন্যস্ত

করতে অভিপ্রায় করেছেন।" চুয়াংৎসি মুখ না ফিরিয়ে বললেন, "আমি শুনেছি রাজার আছে একটি কচ্ছপের চাড়ি, তিন হাজার বছর পূর্বেই সেই চাড়ির ভিতরকার প্রাণীটির মৃত্যু হয়েছে—কিন্তু রাজা সেই চাড়িটিকে তাঁর মন্দিরে এক টুকরো বস্ত্র দিয়ে সযত্নে ঢেকে রেখে দিয়েছেন। আপনারা বলতে পারেন কি কোনটি ভালো—কচ্ছপের মৃত্যুর পর তার চাড়িটির এরূপ সমাদর, না জীবিত মৎস্যের পঙ্ক মধ্যে পুচ্ছ নেড়ে ইতস্তত বিচরণ করা?" কর্মচারীদ্বয় বললেন, "জলে সঞ্চরণশীল জীবিত মৎস্যই ভাল।" তখন চুয়াংৎসি বললেন, "আপনারা দয়া করে বিদায় হন। আমাকে এই কাদা-মাটির মধ্যে মনের আনন্দে পুচ্ছ নেড়ে বিচরণ করতে দিন।"

চুয়াংৎসির এই উক্তিটিকে দায়িত্ববোধহীন আলস্য-সঞ্জাত মানসিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি অনুরাগ বলে মনে করলে একান্তই ভুল করা হবে। বস্তুত কথাটির তাৎপর্য নিহিত রয়েছে মহাস্থবির লাওৎসির দর্শন-তত্ত্ব যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তারই মধ্যে—অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন, প্রশাসন-যন্ত্র ও শিক্ষা মানবের অশেষ অনর্থের কারণ হয়েছে, জন-সমাজে কৃত্রিম শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। সভ্যতার মুখোশ পরিত্যাগ করে 'প্রকৃতি-জীবনে প্রত্যাবর্তন'—আধুনিক কালে যে নীতির সমর্থক রুসো, টলস্টয় ও গান্ধী—তাও-দর্শনের সেই মূল তত্ত্বই ছিল চুয়াংৎসির প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। একটি আখ্যায়িকায় তথ্যটির মর্মোদ্ঘাটন সুন্দরভাবে করা হয়েছে: একদা একটি সামুদ্রিক পক্ষী লু রাজ্যের প্রান্তদেশে এসে অবতরণ করল। সেই রাজ্যের সামন্ত-রাজ পাখীটিকে নিজের রথে তুলে নিয়ে শোভাযাত্রায় বেরুলেন, তারপর মন্দিরে প্রচুর ভোজের ব্যবস্থা করলেন। সাও এর গীতবাদ্যের আয়োজন করা হল পক্ষীর আনন্দের জন্য এবং তার মঙ্গলার্থ বৃষ বলি দেওয়া হল। পাখীটিকে দেখা গেল কিন্তু বিষম ক্লিষ্ট, বিমর্ষ। মাংস সে ছুঁল না, এক ফোঁটা মদও পান করল না, তিন দিন পর অনশনে মারা গেল। এই ব্যাপারটি বর্ণনা করে চুয়াংৎসি বলেছিলেন, "লু-র সামন্ত-রাজ পক্ষীকে দিয়েছিলেন পাখীর খাদ্য নয়, রাজভোগ—তিনি যে রাজভোগ নিজে খান তাই।" এই নীতি-বাক্যের সারমর্ম: সমাজের কল্যাণের জন্য যেসব কাজ করেন রাজনীতিক, শিক্ষাব্রতী ও বৈজ্ঞানিক, সেই কাজের ফল দেখা যায় পক্ষীটির হিতাকাঙ্ক্ষী সামন্ত-রাজের অতিরিক্ত যত্নের মতই অমঙ্গলকর।

বস্তুত গুরু লাওৎসির মতই শিষ্য চুয়াংৎসিও ছিলেন সকল প্রকার প্রশাসনের বিরোধী। রাজা ও রাজ্যপালদের প্রতি ঘোর বিতৃষ্ণার ভাব প্রকাশ করেছেন তিনি তাদের গুণগুলিকে তস্করবৃত্তির সঙ্গে তুলনা করে। সত্যকার কোন দার্শনিকের ওপর যদি রাজ্যের শাসনভার স্থাপিত হয়, তবে তার কর্তব্য নৈষ্কর্ম্যের অনুষ্ঠান—অর্থাৎ নিজে কোন কাজ না করে জনগণকে ইচ্ছামত স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান। এইরূপ স্বাধীনতাই ছিল নাকি চীনের "সত্যযুগে" ("The Golden Age")। তখন রাজা ছিল না, প্রশাসনও ছিল না। ইয়াও ও স্থন—যাঁরা চীন দেশে চির-সমাদৃত কনফুসীয় নীতিধর্মী আদর্শ নৃপতি রূপে—এই দুই সম্রাট প্রশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করে মানবজাতির স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ ও স্বভাবসিদ্ধ শ্রেয়কে ধ্বংস করেছেন। চুয়াংৎসি বলেন, "সেই শুদ্ধ পবিত্র প্রকৃতি-ধর্মের সত্যযুগে পশুপক্ষীর সঙ্গে মানুষ থাকত একত্র, সকল জীবের মর্যাদা ছিল সমান, তারা সকলে যেন এক পরিবারভুক্ত। এমন অবস্থায় মানুষের মধ্যে উচ্চনীচের প্রভেদ থাকবে কেন?"

কৃত্রিম সভ্যতা বর্জন প্রসঙ্গে বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত যন্ত্রাদির প্রতি আন্তরিক অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়েছে একটি কাহিনীতেঃ সে-কুং নামে জনৈক কনফুসিয়াস-শিষ্য একদা দেখলেন একজন বৃদ্ধ মালীকে নালা খনন করতে, কূপ থেকে জল উদ্যানে প্রবাহিত করবার জন্য। অতি কষ্টে সে বারবার কূপ থেকে জল তুলে বহন করছিল। সে-কুং বললেন, "ওহে বাপু, মিছামিছি এত পরিশ্রম করছ কেন বল তো? একটি যন্ত্র নির্মাণ করলে সব ঝঞ্ঝাট মিটে যায়, অল্প পরিশ্রমে এই জমির চেয়ে আয়তনে শতগুণ বৃহৎ ভূমিতে অনায়াসে জল-সেক করতে পার।" মালী জিজ্ঞেস করল, "যন্ত্র? সে আবার কি?" সে-কুং যন্ত্র-নির্মাণের কৌশল সবিস্তারে বুঝিয়ে বললেন। মালী তখন হেসে বললে, "আমার গুরু বলেন, যারা চক্র-কৌশল অবলম্বন করে তারা হয় চক্রী—আর যারা ব্যবহারে চক্রী, অন্তরেও চক্রী তারা। চক্রী মানুষ শুদ্ধাচারী ন্যায়পরায়ণ কখনো হতে পারে না। যারা অশুদ্ধ ও দুর্নীতিপরায়ণ তারা কখনো তাও-র উপযুক্ত বাহন নয়।" সে-কুং তখন বুঝতে পারলেন, শুধু সাফল্যলাভ এই লোকটির জীবনের আদর্শ নয়। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষের মাঝে বাস করে না সে. জীবন-স্রোতে

ভেসে চলেছে, কোথা গিয়ে উঠবে তা সে জানে না, তাই সে পূর্ণ। সাফল্য, ব্যবহার-বুদ্ধি, কর্মকৌশলকে অর্জন বা আয়ত্ত করতে হলে মানুষের হৃদয়কে দিতে হয় বিসর্জন। এই ব্যক্তি নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোথাও যায় না, বিবেকের বিরুদ্ধে কোন কাজ করে না। নিন্দাস্তুতির ঊর্ধ্বে সে—সে স্বরাট!

লাওৎসি প্রসঙ্গ আলোচনায় রহস্যাত্মক তাও-প্রকৃতির যে বর্ণনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে, সেই বিষয়টিই শাখা-উপশাখায় লতা-পল্লবিত করেছেন চুয়াংৎসি। এই মনীষীর রচনার তেত্রিশটি পরিচ্ছেদ উদ্ধার করা হয়েছিল, সেগুলি দর্শনতত্ত্ব, কথা ও কাহিনী আর হিতোপদেশের অপূর্ব মন্থন। কনফুসীয় নীতির তীব্র নিন্দা করা হয়েছে কয়েকটি পরিচ্ছেদে, এসব নিন্দাবাক্যের কতক অংশ প্রক্ষিপ্ত বলেই মনে করেন চীনা লেখকেরা। সে যেমন হোক, কনফুসিয়াস-প্রবর্তিত নীতির কৃত্রিম শালীনতার সঙ্গে, বাহ্যিক আচার-নিষ্ঠার সঙ্গে, রাজধর্ম প্রজাধর্মের সঙ্গে তাও-তত্ত্বের অন্তঃপ্রকৃতির বিরোধ মারাত্মক রকমের, চুয়াংৎসির রচনায় চু-চিয়াও ও চ্যাং-উৎসি সংলাপে সেই ভাবটি কিরূপ ফুটে উঠেছে দেখুন:

চু-চিয়াও—শুনেছি কনফুসিয়াস বলেন, তত্ত্বজ্ঞানী মহাপুরুষ নামধেয় ব্যক্তি পার্থিব ব্যাপারে যিনি উদাসীন, লাভের সন্ধান করেন না, ক্ষতিকেও পরিহার করেন না, মানুষের হাতের কোন দানই যার অভীপ্সিত নয়, যিনি নৈষ্ঠিক আচার-নিয়ম পালন করেন না, যিনি কথা বলেন বাক্য উচ্চারণ না করে আর বাক্য উচ্চারণ করেন কথা না বলে, লোকের চক্ষে তিনি নাকি পার্থিব জগতের ঊর্ধ্বে বিচরণ করেন। কনফুসিয়াস বলেন, এসব নিরর্থক কথা, নিতান্তই আজগুবি।

চ্যাং-উৎসি—এসব তত্ত্ব সম্রাটেরও দুরধিগম্য, কনফুসিয়াস জানবে কেমন করে? মহাপুরুষ যিনি তাঁর আসন সূর্যচন্দ্রের পার্শ্বে, বিশ্বজগৎকে তিনি মুষ্টি-মধ্যে ধারণ করেন। বিশ্ববস্তুকে পৃথকভাবে দেখে বিভ্রম সৃষ্টি করেন না, সকলের সমন্বয় করেন অবিভক্ত সমগ্রের মাঝে। শ্রেণী ও মর্যাদা মূঢ়জনের চর্চার বিষয়, মহাপুরুষের উপেক্ষণীয়। কালের সাময়িক উচ্চনীচ বিভেদ-স্তরগুলি কালাতীত একত্বের বিশুদ্ধ ছাঁচে ঢালাই হয়ে সবই একাকার হয়ে যায়। বিশ্বজগতেও তেমনি ক্ষুদ্র বস্তুগুলির পৃথক সত্তা মুছে যায়। ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ জীবনের প্রতি আসক্তি যে একটা মোহ নয় তা জানব

কেমন করে? কেমন করেই বা বলি, মৃত্যু-ভয় পথ-হারানো শিশুর মনের আতঙ্ক নয়? রানী লি-চি-র যখন বিবাহ হয়েছিল তখন তিনি কেঁদে আকুল হয়ে বক্ষের বসন সিক্ত করেছিলেন। কিন্তু যখন রানী হয়ে এলেন রাজার প্রাসাদে, কোমল শয্যায় আরামে শয়ন করলেন, আর আহার করলেন নানান মুখরোচক খাদ্য তখন তিনি বিবাহকালে ক্রন্দনের জন্য অনুতাপ করেছিলেন। কেমন করে জানব আমরা, জীবনকে এককালে শক্ত করে আঁকড়ে ধরেছিল বলে মৃতের আত্মাকেও পরে তেমনিভাবে অনুতাপ করতে হবে না? যখন জাগবে মহাজাগরণ তখন জানব আমরা, গোটা জীবনই একটা স্বপ্ন। নির্বোধ ব্যক্তিরা জীবনকে স্বপ্নিল মায়া রূপে কল্পনা না করে ভেদজ্ঞানকেই সত্যের আকারে দেখে থাকে—মনে করে ইনি রাজা, উনি পশুপালক। হায় রে সংকীর্ণ মন। কনফুসিয়াস ও তুমি, উভয়েই তোমরা মায়া—আর যে আমি এই কথা বলছি, সেই আমিও মায়া। এইটেই একটা মহা-প্রহেলিকা!

স্বপ্নময় জীবনের স্বপ্নই একমাত্র উপাদান। এই মায়াবাদের একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন চুয়াংৎসি। তিনি বলেছেন: "একদা স্বপ্ন দেখলাম আমি যেন একটি প্রজাপতি, এধারে ওধারে উড়ে বেড়াচ্ছি। আমি তখন নিজেকে প্রজাপতি বলেই মনে করেছি—আমি যে চুয়াংৎসি তা মনে করতে পারি নি। জেগে যেমন উঠলাম অমনি নিজেকে জানতে পারলাম। এখন আমি বুঝতে পারছি না—আমি কি সত্যই ছিলাম একটি মানুষ, স্বপ্ন দেখেছি আমি প্রজাপতি, না আমি সত্যিকার প্রজাপতি, এখন স্বপ্ন দেখছি আমি একজন মানুষ।"

চীনাদের ব্যবহারিক জীবনদর্শনের বিরুদ্ধাচারী চুয়াংৎসির এইসব রচনা কিরূপে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিল তার অন্তর্নিহিত রহস্যটির মর্মোদ্ঘাটন মানব-প্রকৃতি বিশ্লেষণেরই নামান্তর। প্রসিদ্ধ চীনা লেখক লিন ইউ টাং বলেছেন, "When a Chinese succeeds he is always a Confucianist, and when he fails he is always a Taoist." কথাটা খুবই খাঁটি। জীবন হারজিতের খেলা, জিতের ভাগ্য মুষ্টিমেয় ব্যক্তির। তাই তাও-দর্শনকে ছেড়ে চীনা জাতি কনফুসীয় লোকনীতির বাহ্য সদাচারকে জীবনের অবলম্বনরূপে গ্রহণ

করলেও তাও-তত্ত্বের সূক্ষ্ম, গভীর নৈরাশ্যবাদ জাতীয় কল্পনাকে কোন দিন পরিত্যাগ করে নি। শুধু বাহ্য লোকাচার ও নীতিধর্ম নিয়ে মানুষের জীবন রূপ-রসে ভরে তোলা সম্ভব নয়, তার অন্তরাত্মা সামাজিক বন্ধনের ঊর্ধ্বে মুক্তির কল্পলোকে ডানা মেলে উড়ে বেড়াতে চায়। এই স্বপ্নরাজ্যে চীনের কবি-মানস প্রায়ই ধেয়ে গেছে ভবঘুরে জীবনযাপন করতে, আর সেখানে মিলেছে তাও-দার্শনিক চুয়াংৎসির দর্শন, তখন সে তাকে নিজের মতই ভবঘুরে ধর্মভাই বলে চিনতে পেরেছে।

কনফুসিয়াস

কবি সত্যেন দত্ত 'কনফুসিয়াসের সন্ন্যাস-গ্রহণ' শীর্ষক পদ্য রচনায় লিখেছেন :

মসৃণ দেহ উচ্চ পৃষ্ঠ উদ্ধত বলীয়ান
বৃষ চলিয়াছে ভয়ে তার কাছে
কেহ নহে আগুয়ান।
সে করিল এক ধেনুর কামনা
অমনি শৃঙ্গাঘাত।
আমি লইলাম ভিক্ষাপাত্র—
সংসারে প্রণিপাত।

আত্মসম্মান-বোধের কীর্তিস্তম্ভ, নিষ্ঠাবান, সংসার ও সমাজ-সেবী কনফুসিয়াসের ভিক্ষা-ব্রত গ্রহণ স্বপ্নাতীত সন্দেহ নেই, কিন্তু সে যেমন হোক, এ কথা স্বীকার করতেই হয়, কবির প্রাণবন্ত কল্পনা ককুদ্মান বৃষটির তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার বর্ণনায় এই যে অতুলনীয় রসের সৃষ্টি করেছে তারই মধ্যে মনীষী কনফুসিয়াসের দেহাকৃতির একটি সত্যকার ছবি ফুটে উঠেছে। চীন লেখকেরা কনফুসিয়াসের চেহারার বর্ণনা দিয়েছেন এইরূপ : 'ড্রাগনের স্কন্ধ, বৃষের ওষ্ঠ, সমুদ্রের মত মুখবিবরবিশিষ্ট মানুষ।' চিত্রশিল্পীরা তাঁর প্রতিকৃতি অঙ্কিত করেছেন, যদিও তাঁকে চোখে দেখবার সৌভাগ্য তাঁদের ঘটে নি। চিত্রগুলিতে তাঁর মুখের রেখায় অসহ্য গাম্ভীর্য এমনই ভাবে ফুটে বেরিয়েছে যে কুৎসিত কদাকার পুরুষটিকে দেখা যায় বিকটদর্শন। কথিকায় বলা হয়েছে, ভ্রমণকালে একদা এই মহাপুরুষ শিষ্যদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। শিষ্যরা সন্ধানে

বেরিয়েছে, এমন সময় এক পথিক এসে সংবাদ দিল, 'ছন্নছাড়া চেহারা হন্যে কুকুরের মত' একটা লোককে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে। মহাপ্রভুর রূপের এমন অদ্ভুত বর্ণনায় শিষ্যদল অবশ্য হকচকিয়ে উঠেছিল, কিন্তু চেহারায় কোমলতা না থাকলেও কনফুসিয়াস রস-বর্জিত ছিলেন না। কথাটা কানে উঠতেই তিনি সকৌতুকে বলে উঠলেন, 'বাঃ! অতি চমৎকার বর্ণনা তো!'

কনফুসিয়াস ল্যাটিন নাম, চীনা নাম 'কুয়াং ফু জি', অর্থ 'মহাপ্রভু কুং'। আসল নাম কুং চিউ, কিন্তু শিষ্যরা মহাপ্রভুকে কুয়াং ফু জি বলেই সম্বোধন করত। ৫৫১ খৃস্ট পূর্বাব্দে তৎকালীন লু (বর্তমান সানটাং) রাজ্যের চু ফু নগরে কনফুসিয়াস জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভ্রান্ত বংশে তাঁর জন্ম, স্যাং রাজ-বংশের অবতংস তিনি, বংশের খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল প্রচুর। তাঁর পিতা সু লিয়াং ছিলেন একজন প্রভূত শক্তিসম্পন্ন সাহসী বীরপুরুষ। সত্তর বছর বয়সে তিনি যখন নয়টি কন্যার জনক তখন বিবাহ করেন এক নারীকে, তারই গর্ভে কনফুসিয়াসের জন্ম। সব দেশের মহাপুরুষদের বেলায় যেমন ঘটে থাকে এ ক্ষেত্রেও হল তেমনই, কনফুসিয়াসের জন্মবৃত্তান্তে বিস্তর অলৌকিক সৃষ্টি-কল্পনা জড়িয়ে পড়ল। যেমন, নিভৃত পর্বতকন্দরে তাঁর জন্ম, প্রসূতিকে রক্ষা করেছিল ড্রাগনেরা, আর মন্থর বায়ুকে সুরভিত করেছিল অপ্সরাগণ। শৈশবে পিতৃবিয়োগের পর সাত বছর বয়স পর্যন্ত মাতা তাঁকে লালনপালন করেন। এই অল্প বয়সেই তাঁর গাম্ভীর্য ও নিয়মনিষ্ঠা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কথিত আছে, 'পুণ্যশ্লোক সম্রাট'দের (sage emperors) ভূমিকায় অভিনয়, শালীনতার নিয়মানুষ্ঠান, পূজার আয়োজন ও ব্রত পালন, বাল্যকালে এইসব বিষয় নিয়ে তিনি সঙ্গীদের সঙ্গে খেলা করতেন। স্কুলের পাঠ অভ্যাসের পর নিয়মিত কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা মাতার ভরণপোষণ করতেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ধনুর্বিদ্যা ও সংগীতবিদ্যা আয়ত্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। উনিশ বছর বয়সে তিনি বিবাহ করেন, কিন্তু তিন বছর পর বিবাহবিচ্ছেদ করে সরস্বতীর সঙ্গে লক্ষ্মীর দ্বন্দ্বের মত দর্শনের সঙ্গে বিবাহিত জীবনের চিরন্তন বিরোধই যেন সপ্রমাণ করলেন। আর তিনি দারপরিগ্রহ করেন নি। তাঁর একমাত্র পুত্রের এগার হাজার বংশধর অদ্যাপি বিদ্যমান। কিছুদিন পূর্বেও এই বংশের একজন ন্যানকিং গবর্নমেণ্টের অর্থ-সচিবের পদ অলংকৃত করেছেন।

বিবাহের পূর্বে কনফুসিয়াস শস্য-গোলা পরিদর্শকের সরকারী পদে নিযুক্ত ছিলেন। বাইশ বছব বযসে সেই পদ ছেড়ে শিক্ষাব্রত গ্রহণ করলেন। শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত করলেন নিজের গৃহে, শিক্ষার দ্বার মুক্ত ছিল সকলের জন্য। চিরকালেব প্রথামত গুরু-দক্ষিণা দেওয়া হত সামান্য কয়েক টুকরো শুঁটকি মাংস। জনসাধারণের ধারণা ছিল এই যে, তিনি একজন কঠোর গম্ভীব প্রকৃতিব ভদ্রলোক, প্রশংসা-কাতর এবং পরিশ্রমী, যিনি মূঢ়তা ও আলস্য কখনও বরদাস্ত করেন না। কিন্তু শিষ্যদের শ্রদ্ধানম্র চোখে 'প্রভুর প্রকৃতি আডম্বরশূন্য, মৃদু, সৌজন্যপূর্ণ' বলেই দেখা দিয়েছে। আহারাদি ব্যাপারে কিংবা পোশাক-পরিচ্ছদে যত্ন নিতে তিনি বিশেষভাবে নিষেধ কবতেন। বলতেন, 'যে সত্যসন্ধানী শিক্ষার্থী মলিন বসন পরিধান করতে কিংবা মন্দ খাদ্য আহার করতে লজ্জা বোধ করে তাব সঙ্গে বাক্যালাপ অবিধেয।' শিক্ষা দান বিষযে আর একটি কথা বলেছেন তিনি, 'সত্যের সন্ধানে যার আগ্রহ নেই, সত্যের কপাট তার কাছে আমি মুক্ত করব না। কোন সমস্যাব একটা দিক বুঝিযে দেওয়া মাত্র যে অন্য তিনটি দিক অনুমান করে নিতে পাবে না, এমন মেধাহীন ছাত্রকে আমি শিক্ষা দিতে নাবাজ।'

কনফুসিযাসেব শিক্ষায়তনে শিক্ষাব তিনটি প্রধান বিষয় ছিল ইতিহাস, পদ্য ও ব্যবহারিক সৌজন্য বা শালীনতাব নিয়মাবলী। কনফুসিয়াস বলেন, 'মানুষের চরিত্র গঠন করে পদ্য, শালীনতা ও নৈষ্ঠিক অনুষ্ঠান চরিত্রকে দৃঢ় কবে, আর সেই চরিত্র সর্বাঙ্গসুন্দর হযে ওঠে সংগীতের ঝংকার-মূর্ছনায়।' ছাত্রের প্রতি এই ছিল তাঁব অমূল্য উপদেশঃ "তোমাব ঘুম ভাঙবে পদ্যের ছন্দে, তোমার চবিত্র শিকড গাডবে নীতিধর্মে (লি), তোমার শিক্ষার শেষ হবে সংগীতে।" ইতিহাসেব গবেষণা ছিল তাঁব পরম সাধনা, পুণ্যশ্লোক বাজা ইযাও ও সুনেব গুণকীর্তনে তিনি ছিলেন পঞ্চমুখ, তাঁব শিক্ষাপদ্ধতি ছিল সক্রেটিস কিংবা ভাবতীয় ঋষিগণেব মত শিষ্যদের সঙ্গে সংলাপচ্ছলে বাণী প্রচার। শিষ্যের সংখ্যা প্রথমে ছিল অল্প, খ্যাতির প্রসারের সঙ্গে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেযে তিন সহস্র হয়েছিল। তাঁর বাহ্য ব্যবহার ছিল রুক্ষ-কঠিন, কিন্তু অন্তর যে কত কোমল তাব পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি প্রিয় শিষ্য হুই-ব মৃত্যুসংবাদ শুনে দরবিগলিত ধারায় অশ্রুবর্ষণ করে। মর্মবেদনায় কাতর হয়ে বলেছিলেন তিনি, 'শিক্ষার প্রতি হুই-র ছিল যেমন অনুরাগ,

এমনটি আমি আর কারু মধ্যে দেখি নি। দুর্ভাগ্যক্রমে সে অল্পায়ু, তার মৃত্যু ঘটেছে। তার মত শিষ্য আমার আর একটিও নেই।' আলস্য তিনি সহ্য করতে পারতেন না, এবং প্রয়োজন হলে ছাত্রের পিঠে দু-এক ঘা বেতও কষিয়ে দিতেন। তিনি বলতেন, 'সেই ব্যক্তি একটি আপদবিশেষ বাল্যে ও কৈশোরে যে বিনয়ী ছিল না আর উত্তরপুরুষকে দিয়ে যাবার মত কোন কর্ম করে নি।' ন্যায়-দর্শনের তত্ত্ব-বিচার তাঁর শিক্ষার বিষয় ছিল না। তিনি শুধু শিক্ষার্থীর যুক্তির ভ্রমপ্রমাদ দেখিয়ে বিচার-বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণধার করতেন মাত্র। পরনিন্দা বর্জন আর তর্ক দ্বারা যুক্তি খণ্ডনের বৃথা চেষ্টা পরিত্যাগ—এই ছিল দার্শনিকদের প্রতি তাঁর অমূল্য উপদেশ।

ইতিহাসের ভিত্তির ওপর সমাজ-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য নীতিধর্ম গড়ে তুলেছিলেন কনফুসিয়াস, এক কথায় সেই নীতিধর্মের নাম 'লি' (Li)। শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত: পূজা-পার্বণ, সদাচার, আদর্শ সমাজের বিধি-ব্যবস্থা, ধর্মবুদ্ধি সব কিছু বোঝায়। এই 'লি'-ধর্মের প্রধান অঙ্গ সৌজন্য বা শালীনতার নিয়মকানুন, সামাজিক ব্যবহারে সৌষ্ঠবই ছিল তাঁর শিক্ষার প্রধান বিষয়। নৈষ্ঠিক আচার-নিয়ম চীন দেশে অতি প্রাচীন কাল থেকেই চলে এসেছিল, কনফুসিয়াস শুধু সেই পুরনো তত্ত্বগুলি মার্জিত করে পুনঃপ্রবর্তিত করেছিলেন। তিনি কোন নূতন তত্ত্ব প্রচারের দাবি করেন নি, বলেছেন, 'আমি (নূতন তত্ত্ব) সৃষ্টি করি নি, (প্রাচীন জ্ঞানকে) প্রসারিত করেছি মাত্র (I transmit and do not create)।' চীনাদের সমাজ-চিন্তায় পাঁচটি সম্বন্ধের স্থান অত্যন্ত উচ্চে, এই সেই 'পঞ্চ সম্বন্ধ': (১) রাজা-প্রজা সম্বন্ধ, (২) পিতা-পুত্র সম্বন্ধ, (৩) স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ, (৪) অগ্রজ-অনুজ সম্বন্ধ, (৫) বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর সম্বন্ধ। এই 'সম্বন্ধ-পঞ্চকে'র আদর্শকে সংযম ও সদাচারের নৈতিক বিধান দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন কনফুসিয়াস। আমাদের এই আধুনিক জগতের পরিবর্তিত অবস্থায় 'পঞ্চ সম্বন্ধে'র আদর্শকে পূর্বের মত নির্বিচারে স্বীকার করে নেবার পক্ষে হয়তো বা অনেক বাধা-অন্তরায় আছে, কিন্তু সে কথা ছেড়ে দিলেও এই আদর্শের প্রতিষ্ঠাই কনফুসিয়াসের একমাত্র কৃতিত্ব নয়। আমরা তাঁর শিক্ষার মধ্যে অনেক সারগর্ভ ভাবধারার নৈতিক গুণধর্মের সাক্ষাৎ পাই, যেমন 'চুং' (বিশ্বস্ত চিত্তবৃত্তি, অর্থাৎ নিজের কাছে ও পরের কাছে বিশ্বাসের পাত্র হওয়া),

'সু' (পরার্থপরতা), 'জেন' (মানবিকতা-বোধ), 'ই' (সত্যনিষ্ঠা), 'লি' (শালীনতা), 'চি' (প্রজ্ঞা), 'সিন' (আন্তরিকতা)। এইসব মৌলিক গুণের অনুশীলন দ্বারা নৈতিক চরিত্র গঠনের পথ-নির্দেশই ছিল কনফুসীয় নীতিধর্মের মহাশিক্ষা—যে শিক্ষা শ্রেণীনির্বিশেষে সকল চীনবাসীর চিত্ত অধিকার করে শিক্ষাগুরুকে সার্থক অমরতা দান করেছিল।

এই অমর শিক্ষাগুরুকেও প্রকৃতি তার পরিহাসের পাত্র করে তুলতে ত্রুটি করেন নি, আর সেই ব্যঙ্গই বোধ করি ফুটে বেরিয়েছে চীনা সাহিত্যের প্রসিদ্ধ অনুবাদক ও সমালোচক হার্বার্ট গাইলসের বর্ণনায়। কনফুসিয়াসের রুক্ষকর্কশ আচরণ প্রসঙ্গে তিনি তাঁকে একজন বেত্রধারী ইংরেজ স্কুল-মাস্টারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এরূপ বর্ণনা শুনলে কনফুসিয়াস নিশ্চয়ই দুঃখিত হতেন না, কারণ নিজের চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর মনে কোন বিভ্রম ছিল না। এক বন্ধুকে বলেছিলেন তিনি, 'কোন বিষয়ে উৎসাহ জাগলে আমি আহার ভুলে যাই, সুখ বোধ করলে দুঃখ-গ্লানি ভুলে যাই, বার্ধক্য ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে আমি তা জানতেও পারি না।·· পনর বছর বয়সে আমার বিদ্যানুরাগ জন্মে। ত্রিশ বছরে চরিত্র গঠিত হয়। চল্লিশ বছরে সকল ভ্রান্তি দূর হয়। পঞ্চাশ বছরে 'স্বর্গের ইচ্ছা' জানতে পারি। ষাট বছরে কোনরূপ বাহ্য অবস্থা আমার প্রশান্ত চিত্তকে বিচলিত করতে পারে নি। সত্তর বছর বয়সে কোন নৈতিক বিধান লঙ্ঘন না করে আমার চিন্তা যথেচ্ছ বিচরণ করতে পারে।' জীবনের সাধ কি—এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'বৃদ্ধ ব্যক্তিরা শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করে, বন্ধুবর্গ সৌহার্দ্যপূর্ণ হয় এবং যুবকেরা বর্ষীয়ানদের শ্রদ্ধা করে, এই আমার জীবনের সাধ।'

কনফুসিয়াসের বচনগুলিতে আত্মপ্রশস্তির অভাব নেই। তিনি বলেন, 'যে গ্রামে দশটি পরিবার বসবাস করে, সেখানে হয়তো এমন একজন ব্যক্তি দেখা যায় যে আমারই মত নিষ্ঠাবান ও সম্মানিত, কিন্তু সেও আমার মত বিদ্যানুরাগী নয়।' কিন্তু এই আত্মপ্রশস্তি একটা অসংযত লঘু ভাষণ নয়। তিনি বলেন, 'বিদ্যাচর্চায় আমি যদি বা অন্যান্য ব্যক্তির সমান, কিন্তু প্রকৃত মহৎ চরিত্রের মানুষের লক্ষণ এই যে তিনি যেসব উপদেশ দান করেন, কার্যক্ষেত্রে তাঁর নিজের ব্যবহার তদনুরূপ। আমি এখনও সেই পর্যায়ে উঠতে পারি নি।' তিনি আরও বলেন, 'প্রকৃতপক্ষে আমি

প্রাজ্ঞ হয়ে ভূমিষ্ঠ হই নি। আমি শুধু প্রাচীন বিদ্যা ভালবাসি, আর সেই বিদ্যা আয়ত্ত করতে প্রাণপণ পরিশ্রম করি।' বিনয় বেশ সহজভাবেই তাঁর এই কথাগুলিতে ফুটে উঠেছে। শিষ্যরা বলতেন, 'মহাপ্রভু চারটি দোষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কোন সিদ্ধান্তই তিনি খেয়াল-খুশিমত আগেভাগে স্থির করে রাখতেন না, আর তিনি ছিলেন স্বেচ্ছাচার-একগুঁয়েমি-আত্মাভিমান-বর্জিত।' যশ ও মর্যাদা আকাঙ্ক্ষা করতেন বটে, কিন্তু সেজন্য এমন কোন কর্ম করতেন না যাতে তাঁর সম্ভ্রমের হানি ঘটতে পারে। তিনি বলতেন, 'মানুষের বলা উচিত এই কথা, আমার কোন মর্যাদা নেই বলে উদ্বিগ্ন নই, আমি চিন্তা করি কিরূপে মর্যাদালাভের উপযুক্ত হতে পারব। আমি খ্যাতিমান নই বলে উদ্বিগ্ন নই, আমার চিন্তা কিরূপে খ্যাতিলাভের যোগ্য হতে পারব।'

কনফুসিয়াসের সশিষ্য ভ্রমণকালে সুধী ও শাসকবৃন্দের সঙ্গে তাঁর নানাবিধ সংলাপের বিবরণ আছে। লাওৎসির সঙ্গে তাঁর আলাপ-আলোচনার কথা পূর্বে বলা হয়েছে, এখানে পুনরুক্তির প্রয়োজন নেই। সি-র ডিউকের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে প্রশাসন বিষয়ক একটি প্রশ্নের জবাবে কনফুসিয়াস বলেছিলেন, 'উত্তম প্রশাসন সম্ভব যখন রাজা হন রাজা আর মন্ত্রী হন মন্ত্রী, যখন পিতা হন পিতা আর পুত্র হন পুত্র।' কথাটির তাৎপর্য এই যে, সমাজে সকলেই যখন নিজ নিজ কর্তব্য পালন করেন, সুষ্ঠু প্রশাসন তখনই সম্ভব হয়ে ওঠে। এই কথায় প্রসন্ন হয়ে ডিউক তাঁকে একটি নগরের রাজস্ব দান করতে চাইলেন, কিন্তু সে দান তিনি গ্রহণ করলেন না। এমন কি কাজ করেছেন তিনি যার জন্য এই পুরস্কার? ডিউক আবার যেমন অনুরোধ করতে যাবেন, মন্ত্রী অমনই তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, 'এইসব পণ্ডিত ব্যক্তি কাণ্ডজ্ঞানহীন, উদ্ধত। কুং প্রভুর ওঠা-বসার কেতাকানুন শিখতেই কয়েক পুরুষ কেটে যায়।' সেখান থেকে এসে পনর বছর ছাত্রদের শিক্ষাদান করেছিলেন কনফুসিয়াস, তারপর সরকারী কার্য গ্রহণ করবার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে লু রাজ্যে আসেন।

কিছুকালের জন্য কনফুসিয়াস স্বদেশের মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সে সময়ে কয়েকটি শাসন-সংস্কার প্রবর্তন করেন তিনি, আড়ম্বরপূর্ণ ব্যয়-বহুল জীবনযাপন অপরাধ বলে গণ্য করা হত। কথিত আছে, তাঁর

শাসনাধীনে লোক-চরিত্র এমন উন্নত হয়েছিল যে পথে যদি কোন অলংকারও পড়ে থাকত কেউ তা স্পর্শ করত না, অথবা মালিকের সন্ধান করে প্রাপক সেটি তাকে প্রত্যর্পণ করত। লোকেরা সব সাধু-সজ্জন, নারীরা সব সতী-সাধ্বী হয়ে উঠেছিল। চারিত্রিক উৎকর্ষ ঘটেছিল নাগরিকদের, কিন্তু রাজার ছিল নীতির প্রতি অশ্রদ্ধা। পরিশেষে একদিন নীতিধর্মকে প্রকাশ্যে দলিত করে কোন প্রতিবেশী দেশ থেকে আগত একদল গীতবাদ্য-কুশলা গণিকাকে তিনি সংবর্ধনা করলেন। কনফুসিয়াস তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ করলেন। বললেন, 'সদাচারকে পিছনে ঠেলে কুৎসিত কদাচার ফলাও করে দেখান হয়েছে।' তিনি স্থির করলেন, নীতিধর্মের নূতন ক্ষেত্র প্রস্তুত করা অথবা শিক্ষাদান ব্রতের মধ্যে আপন কর্মকে সীমাবদ্ধ করে রাখাই এখন তাঁর কর্তব্য। দেশ ত্যাগ করে তের বছর তিনি শিষ্যবৃন্দ সহ নানা স্থান ভ্রমণ করলেন, কোথাযও পেলেন সমাদর, কোথায়ও অনাদর। বিপদ ও দৈন্যের সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাঁকে, দু-বার দুর্বৃত্তরা আক্রমণ করেছিল, একবার অনশনে কাল কেটেছিল। দুর্গতির অন্ত নেই, তবু তিনি ওয়েই-র সামন্তরাজের কর্ম গ্রহণের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, কারণ সেই রাজা ছিলেন দুর্নীতিপরায়ণ। পরিব্রাজক অথচ সন্ন্যাসী নয়, তাঁর এই কিম্ভূতকিমাকার অবস্থাটির প্রতি কটাক্ষ করে একজন সংসারত্যাগী পুরুষ তাঁকে বলেছিলেন, 'এ কথা সত্য, দুর্নীতি ও অব্যবস্থা রাজ্যময় ছড়িয়ে রয়েছে বন্যার মত। কিন্তু এমন লোক কি আছে কেউ যে এই দুরবস্থার কবল থেকে দেশকে উদ্ধার করতে পারে? ভবঘুরের অনর্থক জীবনযাপনের চেয়ে সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করাই ভাল নয় কি?' কনফুসিয়াস কিন্তু হাল ছেড়ে দেবার পাত্র ছিলেন না, তাঁর মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল ছিল যে পর্যটনকালে এমন কোন রাজ্যে এসে উপনীত হবেন যেখানে শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে জন-কল্যাণের অনুষ্ঠান সম্ভব। পলাতক মনোবৃত্তির দরুন যারা কৈবল্যের আশ্রয় গ্রহণ করে, সেইসব সংসার-বিরাগীদের সঙ্গে নিজের তুলনা করে একদা তিনি বলেছিলেন, 'আমি তাদের থেকে পৃথক। আমি সাময়িক অবস্থা বিবেচনা করে মন স্থির করি, এবং সেই অনুসারে কর্ম করি।'

উনষাট বছর বয়সে নূতন রাজার কাছ থেকে তিনি প্রচুর উপঢৌকন সহ

স্বদেশে প্রত্যাগমনের নিমন্ত্রণ পেলেন। এইবার তাঁর যাযাবর-জীবন সাঙ্গ হল। দেশে ফিরে জীবনের অবশিষ্ট কয়েক বছর সক্রিয় রাজনীতির সংস্পর্শে না এসেও তিনি শাসন বিষয়ে নানান উপদেশ দান করেছিলেন, আর সেই সূত্রে অশেষ সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন। এই সময়ে তিনি প্রাচীন গ্রন্থ সংকলন ও ইতিহাস রচনার কাজে মন দিয়েছিলেন। অবসর বিনোদন করতেন তিনি কবিতা পাঠ ও দর্শন আলোচনা করে। তাঁর সমগ্র সাধনা ও দর্শন-চিন্তার প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রজ্ঞার সঙ্গে স্বভাববৃত্তিগুলির সমন্বয়। তিনি যে নীতিবাদ প্রচার করেছিলেন আর 'হিরণ্য মধ্য-পন্থা'র (The Golden Mean) নির্দেশ দিয়েছিলেন, সেসব ওই সমন্বয়-প্রচেষ্টারই সাক্ষ্য দিয়ে থাকে।

বাহাত্তর বছব বয়সে কনফুসিযাসের মৃত্যু হয। মৃত্যুকালে তিনি প্রিয শিষ্য জি কুংকে বলেছিলেন, 'প্রাজ্ঞ ধীমান নৃপতি আদৌ দেখা যায না। সাম্রাজ্যে এমন একজনও নেই যে আমাকে তাব প্রভু রূপে বরণ কবে নেবে। আমার এখন মরবার সময এসেছে।' মৃত্যুব পর শোকার্ত শিষ্যগণ তাঁর সমাধি দান করেছিলেন বিলক্ষণ অনুষ্ঠান সহকাবে, এবং সেই সমাধিক্ষেত্রে তাঁরা তিন বৎসর-কাল বাস করে স্বর্গত গুরুদেবের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে একদিন প্রভাতে কনফুসিযাসকে এই করুণ সংগীতটি গাইতে শোনা গিয়েছিল :

কালে পাহাড়ের চূড়া ধসে পড়ে,
কড়িকাঠ ভেঙে খান খান হয,
পর্ণহীন মহাক্রম শুকিযে যায,
হায রে। সুধীজনের অন্তিমও তেমনি

কনফুসিয়াসেব সংকলন-গ্রন্থ ঃ নীতিবাদ

আদি কারণ বা মূল সত্যের সন্ধান, যে তত্ত্বজিজ্ঞাসার পীঠস্থান ভারতবর্ষ ও গ্রীস, বৌদ্ধধর্ম আগমনের পূর্বে চীন দেশে সেই মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে সব কিছু আলোচনা তাও-দর্শনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কনফুসীয় দর্শন পরমার্থচিন্তা বা মূল তত্ত্বের (metaphysics) গবেষণা নয়, জীবনদর্শন মাত্র। চীনাদের

ব্যবহারিক আদর্শের আশ্রয় নিয়ে সুষ্ঠু জীবনযাপনের পথ নির্দেশ করেছিলেন কনফুসিয়াস, সংসার-যাত্রায় পথ চলার নিয়মই এই জীবনদর্শন। আমরা যে পঞ্চ সম্বন্ধের কথা পূর্বে বলেছি, সেই রাজা-প্রজা, পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী প্রভৃতি সম্বন্ধই রাষ্ট্র ও সমাজের ভিত্তিস্বরূপ, এই ভিত্তিমূল দৃঢ় করবার জন্য প্রয়োজন নীতির অনুশাসন দ্বারা সম্বন্ধ-পঞ্চকের নিয়ন্ত্রণ। কনফুসীয় নীতিবাদে বলা হয়েছে রাজার ন্যায়নিষ্ঠা, মমতা ও সহানুভূতির কথা, প্রজাব রাজভক্তি ও আনুগত্যের কথা, পিতার কর্তৃত্বাধিকার ও পুত্রের পিতৃভক্তি ও আদেশ পালনেব কথা। তা ছাড়া 'লি' নামে যে গুণধর্মেব উল্লেথ করা হয়েছে, সেই 'লি' নীতিবাদের একটি প্রধান অঙ্গ। সদাচাব, বিনয়, শ্রদ্ধা প্রভৃতি চারিত্রিক গুণাবলীকে কনফুসিয়াস 'লি' নামে অভিহিত করেছেন।

প্রাচীন ঐতিহ্যকে কনফুসিয়াস তাঁর নীতিবাদেব মূলমন্ত্র কবেছিলেন। সতর শ' বছর পূর্বেকার রাজা ইয়াও ও সুন-এর স্বর্ণযুগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন তিনি, সেই যুগের স্মৃতি তাঁকে প্রাচীন সমাজ-নীতি বা 'লি'-ধর্মের প্রবর্তন কবতে অনুপ্রাণিত করেছিল। উত্তরাধিকারী নির্বাচনকালে রাজা ইয়াও তাঁর কলহপরায়ণ অস্থিবমতি পুত্রকে প্রত্যাখ্যান করে নিম্নশ্রেণীর একজন অন্ধ ব্যক্তির নীতিপবায়ণ সুযোগ্য পুত্র সুন-কে সন্ধান কবে এনে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। এই ছিল সে যুগ, যখন বাজা-প্রজা, উচ্চ-নীচ সকলেরই আচবণ ছিল শ্রেষ্ঠ জীবনাদর্শের বাঁধা-ধরা নিয়মের অধীন, তখন মাৎসন্যায় ছিল না, অনাচার ছিল না। বাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার, জীবনের সকল ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা-অশান্তির অবসান অবশ্যম্ভাবী, যদি প্রাচীন আচার-পদ্ধতি ও চিন্তাধারাকে আবাব ফিরিয়ে আনা যায়, এই বিশ্বাসের বলে কনফুসিয়াস প্রাচীন বিদ্যার (classics) উদ্ধাবকার্যে আত্মনিয়োগ কবেছিলেন। ইতিহাস মন্থন করে তিনি 'গ্রন্থ পঞ্চক' (Five Chings) সংকলন করেছিলেন, সেই সংকলন-গ্রন্থগুলিব নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল :

(১) লি চি বা অনুষ্ঠানপঞ্জী (Record of Rites) : এই গ্রন্থে আছে লি-ধর্মের ব্যাখ্যা, শালীনতা সৌজন্য সদাচারের নিয়মাবলী। বর্ণনার উদ্দেশ্য, চরিত্রগঠন ও চারিত্রিক মাধুর্যের বিকাশ, নৈতিক মানেব উন্নয়ন। লোকায়ত জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন সামাজিক ভোজন বা ধনুর্বিদ্যা প্রদর্শনী সভায়

কিরূপ আচরণ সংগত ও সুশোভন, আর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াকর্ম পিতৃতর্পণের পদ্ধতি, এইসব বিষয়ে নানান বিধান গ্রন্থটির মধ্যে স্থান পেযেছে।

(২) ই-কিং বা পরিবর্তন-গ্রন্থ (Book of Changes) : একটি অতি প্রাচীন গ্রন্থ। শুধু ভাষ্য ও পবিশিষ্ট রচনা করেছিলেন কনফুসিয়াস। চীনের বিবিধ শাস্ত্র, বিশেষতঃ ফলিত জ্যোতিষ, 'পা-কুযো' বা পূর্ণ ও ভগ্ন লাইনের 'ট্রাইগ্রাম' ও 'হেক্সাগ্রামে'র রহস্য বর্ণনায পরিপূর্ণ। পূর্ণ ও ভগ্ন লাইনের রহস্যাত্মক ট্রাইগ্রামের সংখ্যা ছিল ৮টি, পরে ৬৪ হেক্সাগ্রামের কল্পনা করা হয়েছিল। প্রত্যেকটি ট্রাইগ্রাম বা হেক্সাগ্রাম ছিল কোন না কোন প্রাকৃতিক বস্তুর প্রতীকচিহ্ন, যেমন স্বর্গের চিহ্ন তিনটি পূর্ণ লাইন , পর্বতেব চিহ্ন একটি পূর্ণ ও দুটি ভগ্ন লাইন ইত্যাদি। প্রাচীন শাস্ত্রে 'কুয়ো'র এই বিববণ ছাড়াও ইযাং ও ইন নামে দুটি গুণেব উল্লেখ আছে। ইন স্থূল প্রকৃতি, স্ত্রীধর্মী গুণ। ইযাং সূক্ষ্ম বা অন্তর্নিহিত শক্তি, পুংধর্মী গুণ। ইযাং গতিশীল কর্মশক্তির মূল, আব ইন বিশ্বের স্থাবর, জড বা স্থিতিশীল অবস্থাকেই প্রতিফলিত কবে। ইযাং ও ইনেব সংমিশ্রণে কিরূপে ইতিহাস বিজ্ঞান সমেত জগতের যাবতীয বস্তুব সমুদ্ভব হযেছে, আর ওই গুণ দুটি কিরূপে পা কুযোব সঙ্গে রহস্যসম্বন্ধে জড়িত, অর্থাৎ গুণদ্বয় কিরূপে পূর্ণ ও ভগ্ন লাইনের ট্রাইগ্রাম-হেক্সাগ্রামের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে, এইসব দুর্বোধ্য দুষ্পাচ্য কষ্ট-কল্পনার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন কনফুসিযাস তার ই-কিং বা পবিবর্তন-গ্রন্থে। স্বভাবতঃ তিনি সকল প্রকাব অতিপ্রাকৃত বা রহস্যাত্মক বিষযের আলোচনা থেকে বিরত থাকতেন, কিন্তু এই গ্রন্থের ভাষ্য বচনায সেই নিযমের ব্যতিক্রম ঘটেছে। কিংবদন্তী এই যে, তত্ত্বটিব আদি স্রষ্টিকর্তা পৌরাণিক রাজা ফু সি।

(৩) সি কিং বা কাব্যগ্রন্থ (Book of Odes) : মানুষের জীবন ও নীতি বিষয়ে নানান প্রাচীন কবিতার সঞ্চযন।

(৪) চুন-চিউ বা বাসন্তী ও শারদীয় বিবরণ (Spring and Autumn Annals) : এখানা লু রাজ্যের ইতিহাস। কনফুসিযাসের মাতৃভূমি লু ছিল একটি সামন্ত-রাজ্য। সাম্রাজ্যের পরিণত রূপ চৌ-যুগে ফুটে ওঠে নি, সেজন্য কনফুসিয়াসের সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তা সামন্ত-রাজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল।

(৫) স্থ কিং বা ইতিহাস-গ্রন্থ (Book of History): চীনের আদিকালের আখ্যায়িকা ও ইতিবৃত্ত। পুণ্যশ্লোক রাজা ইয়াও ও স্থনের রাজত্বকালের বিবরণ আমরা এই গ্রন্থেই পেয়েছি। কনফুসিয়াসের রচনাবলী ভস্মীভূত করেছিলেন তৃতীয় খৃস্ট পূর্বাব্দের চি'নবংশী সম্রাট সি হুয়াং তি, সেই সঙ্গে 'স্থ কিং' গ্রন্থটিও ধ্বংস পেয়েছিল। হ্যান বংশীয়দের শাসনকালে কনফুসিয়াসের গ্রন্থসমূহ যখন পুনরুদ্ধার করা হল, তখন তাঁর ইতিহাস গ্রন্থের কাহিনী অবলম্বন করে দ্বিতীয় খৃস্ট পূর্বাব্দের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক জুমা চিয়েন তাঁর অপূর্ব ইতিকথা 'সি চি' প্রণয়ন করেন। ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষ মনোবৃত্তি নিয়ে 'স্থ কিং' রচনা করেন নি কনফুসিয়াস. তাঁর উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন সমাজ ও রাজন্যবর্গের আদর্শ জনগণের সামনে ধরে শিক্ষা দ্বারা যুবকদের চারিত্রিক উন্নতিসাধন। সেজন্য তিনি যে শুধু প্রাচীন ইতিহাস থেকে নির্বাচিত বিষয়বস্তু লিপিবদ্ধ করেছিলেন তা নয়, অনেক কাহিনী ও রাজাদের মুখনিঃসৃত উপদেশবাণী তার স্বকপোলকল্পিত, স্থতরাং ইতিহাসের চোখে অপ্রকৃত।

এই কিং গ্রন্থপঞ্চক ছাড়া আরও চারটি স্থ বা গ্রন্থ মোট নয়টি গ্রন্থের সমষ্টি এখন কনফুসীয় নীতিশাস্ত্র নামে পরিচিত। 'প্রাজ্ঞ বচন' বা 'অ্যানালেকট' (Analect) তার একটি, গুরুদেবের মৃত্যুর পর শিষ্যগণ তাঁর কথামৃত স্মরণ করে এই গ্রন্থ রচনা করেন। অন্য তিনটি স্থ: (১) টা-স্থয়ে বা মহাবিদ্যা (The Great Learning); (২) চুং ইয়াং বা মধ্যপন্থা (Doctrine of the Mean); (৩) মেনসিয়াসের গ্রন্থ (Book of Mencius)। সক্রেটিসের ভাষ্যকার যেমন ছিলেন প্লেটো, মেনসিয়াসও তেমনই কনফুসিয়াসের ভাষ্যকার, তাঁর সম্বন্ধে আমরা পরে আলোচনা করব। কনফুসীয় 'লি' বা নীতিধর্মের সারমর্ম বর্ণিত হয়েছে এই নয়টি গ্রন্থে, সেজন্য দুই সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল গ্রন্থগুলি চীনা সমাজে পরম সমাদর লাভ করে এসেছে। কিন্তু সেকালে এই নীতিবাদের বিরুদ্ধ সমালোচনা যে হয় নি তা নয়। প্রাচীন ঐতিহ্য ও পৌরাণিক রাজাদের অন্ধ নির্বিচার প্রশস্তির জন্য কনফুসিয়াস প্রসিদ্ধ তাও-দার্শনিক চুয়াংৎসির বিশেষ নিন্দাভাজন হয়েছিলেন।

কনফুসিয়াসের প্রাজ্ঞ-বচন বা কথামৃতের অনুবাদ করেছেন জেমস লেগ

(James Legge), ওই অনুবাদ-গ্রন্থের নাম *Analect.* বচনগুলির মধ্যে কনফুসীয় নীতিসার নিহিত থাকলেও সেখানে না আছে ন্যায়েব কূট তর্ক, না আছে যুক্তির জাল বয়ন। জটিলতা-বিবর্জিত পরিচ্ছন্ন সাধুচিন্তা এবং সুস্পষ্ট বাচনভঙ্গীই কথামৃতের দার্শনিক বিশেষত্ব। সমসাময়িক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য ব্যক্তিজীবনের আদর্শ নিয়ে তিনি কোন দুর্বোধ্য তত্ত্বকথার অবতারণা করেন নি, তিনি শুধু দিয়েছেন সহজ সবল কর্তব্যপথের নির্দেশ। জ্ঞানের বোঝার মাপে জ্ঞানী ব্যক্তিকে ওজন করেন নি, কেমন করে একজন সাধাবণ ব্যক্তিও জ্ঞানী হতে পারে, সেই তথ্য প্রকাশ করেছেন। জ্ঞানীর সংজ্ঞা দিযেছেন তিনি এইরূপ: 'সেই ব্যক্তিই জ্ঞানী যে জানে কি সে জানে, আবার এ-ও জানে কি সে জানে না।' কোন মহাত্মা বা পরমপুরুষ দর্শনেব জন্য কনফুসিয়াসের আগ্রহ নেই, একজন প্রকৃত ভদ্রলোক দেখলেই তিনি সন্তুষ্ট। এক শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে কনফুসিয়াস বলেন, 'সদাচারী ব্যক্তির পক্ষে গ্রামসুদ্ধ লোকের প্রশংসাভাজন হওয়া সমীচীন নয়, আবার গ্রামসুদ্ধ লোকের বিবাগভাজন হওযাও অসংগত। যখন গ্রামের সৎপ্রকৃতির লোকেরা তাব প্রশংসা আর অসৎ প্রকৃতির ব্যক্তিরা তার নিন্দা করে তখনই সদাচাবকে তার উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হয়।'

প্রকৃত পণ্ডিত কে, এই প্রশ্নের উত্তরে কনফুসিয়াস কোন দর্শন-তত্ত্বে পারদর্শী দিক্‌পালসদৃশ ব্যক্তির কথা বলেন নি। তিনি বলেন, 'ব্যক্তিগত আচরণে যাঁর আছে আত্মসম্মান-বোধ এবং পররাজ্যে যিনি মর্যাদা রক্ষা করে যোগ্যতার সহিত দৌত্যকার্য সম্পন্ন করতে পারেন তিনিই প্রকৃত পণ্ডিত।' প্রশ্ন হল, তার পরের স্থানটি কার? কনফুসিযাস বললেন, 'যিনি পরিবারের সুসন্তান, বিনয় ও সম্ভ্রম প্রদর্শনের জন্য গ্রামে যাঁর খ্যাতি আছে।' তার পরের স্থান? 'আচরণে ও বাক্যে আছে যাঁর সংযম, আর যে কখন কথার অপলাপ করে না।' শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে আব ইতরই বা কে? এই প্রসঙ্গে কনফুসিয়াস বলেন, 'শ্রেষ্ঠ মানব ঋত-সত্যের (right) সন্ধান জানে, আর নিকৃষ্ট ব্যক্তি জানে বাজারে বিকায় কোন্ জিনিসটি। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তার আত্মাকে ভালবাসে আর নিকৃষ্ট ব্যক্তি ভালবাসে তার বিত্ত। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নিজেকে দোষ দেয়, নিকৃষ্ট ব্যক্তি সকল দোষ চাপায় পরের

ওপর।' শ্রেষ্ঠ মানবের আদর্শ গুণ সক্রেটিসের মতে জ্ঞান, নিট্‌শের (Nietzsche) মতে সাহস, কিন্তু যিশুখৃস্ট প্রেম বা সদিচ্ছাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ আসন দান করেছেন। এই তিনটি গুণেরই সমান অধিকারী কনফুসীয় শ্রেষ্ঠ মানব, অর্থাৎ তাঁর মধ্যে ঘটেছে জ্ঞান, সাহস ও সদিচ্ছার সমন্বয়। শ্রেষ্ঠ মানব শুধু বুদ্ধিমান নন, জ্ঞানী বা পণ্ডিতও নন, তিনি চরিত্রবান। চরিত্রের মূল বাক্, মন ও কর্মে সততা। 'শ্রেষ্ঠ মানব কথা বলবার পূর্বে কাজ করেন, এবং কাজ যেমন করেন কথা বলেন সেই কাজের অনুরূপ।' শ্রেষ্ঠত্বকে ধনুর্বিদ্যার সঙ্গে তুলনা করেছেন কনফুসিয়াস। তীর যখন লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় বিচক্ষণ তীরন্দাজ তখন ভ্রম-ত্রুটির সন্ধান করে নিজের মধ্যে, ইতর ব্যক্তির মত অন্যের উপর দোষারোপ করে না। শুধু বাক্যে ও কর্মে সংগতি নয়, সংযমও শ্রেষ্ঠত্বের একটি বিশেষ লক্ষণ। সংযত আচরণ সম্ভব হয় মানুষ যখন 'মধ্য-পন্থা' (the path of the mean) নির্দিষ্ট বিধানগুলি মেনে চলে। অসংযত প্রবৃত্তির তাড়নায় কর্মে প্রবৃত্ত হলে কর্ম হয় তখন সেই উদ্দাম প্রবৃত্তির মতই উচ্ছৃঙ্খল, কর্মের উচ্ছৃঙ্খল পরিণতি নিবারণের জন্যই মধ্য-পন্থা নিরূপিত সংযমের ব্যবস্থা। কনফুসিয়াস বলেন, 'শ্রেষ্ঠ মানব এমনভাবে চলেন যে তাঁর চলার পথটি হয়ে ওঠে সর্বকালের একটি সর্বজনীন পথ (universal path), তাঁর সুষম লৌকিক ব্যবহারকে সর্বকালের একটি সর্বজনীন বিধি (universal law) রূপে দেখা যায়, এবং বাক্যালাপ করেন তিনি এমন সংযতভাবে যে তাঁর কথাগুলি হয় সর্বকালের সর্বজনীন আদর্শ বচন (universal norm)।' যিশুখৃস্টের জন্মের পাঁচ শ' বছর পূর্বে কনফুসিয়াসের বচনে সুবিখ্যাত একটি খৃস্টীয় নীতির রকমফের দেখা যায়। ধর্মাচরণ কি ওই প্রশ্নের উত্তরে কনফুসিয়াস বলেন, 'অন্যের নিকট থেকে যেরূপ ব্যবহার তুমি নিজে ইচ্ছা কর না, সেরূপ ব্যবহার অন্য কারু সঙ্গে ক'রো না।' এখানে লক্ষ্যের বিষয় এই যে প্রবচনটি নেতিবাচক, অর্থাৎ কিরূপ আচরণ নিষিদ্ধ সেই কথাই বলা হয়েছে। অন্যের অশিষ্ট রূঢ়তা বা অনিষ্টের প্রতিদানস্বরূপ শিষ্ট কোমল আচরণ, এক গালে চড় খেয়ে অন্য গাল পেতে দেওয়ার মত উদার ব্যবস্থা যা খৃস্টীয় নীতিধর্মের সারমর্ম, তেমন কোন ক্ষমাসুন্দর মহত্ত্বের আদর্শকে গ্রহণ করেন নি কনফুসিয়াস। মন্দের পরিবর্তে ভাল, এই আদর্শবাদ প্রচার করেছিলেন

লাওৎসি, তাঁর এই আদর্শ সম্বন্ধে জনৈক শিষ্যের প্রশ্নের উত্তরে কনফুসিয়াস বলেছিলেন, 'অশিষ্ট মন্দ আচরণকে যদি দয়া দিয়ে পুরস্কৃত করতে হয় তবে দয়াকে পুরস্কৃত করবে তুমি কি দিয়ে? দয়াকেই দয়া দিয়ে পুরস্কৃত করা বিধেয়, অনিষ্টের প্রতিদান ন্যায়বিচার।'

সত্যকে মানুষের উর্ধ্বে এক মহান জ্যোতির্মণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত করে কনফুসিয়াস কোন বিভ্রান্তির ধূম্রজাল সৃষ্টি করেন নি। সত্য মানুষের সহচর, কথাপ্রসঙ্গে কনফুসিয়াস বলেন, 'মানুষই সত্যকে মহান করে তোলে, সত্য মানুষকে মহান করে না। যে তথাকথিত সত্য মনুষ্য-স্বভাবকে বর্জন করে প্রকৃতপক্ষে তা সত্যই নয়।' মানবচরিত্রের মান নির্ধারণ করে মানুষ, মানুষই মানুষের পরিমাপ। সত্যসন্ধ মানব সত্যকার মনুষ্যত্বের আদর্শ বিধানগুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে জীবনযাপন করেন কোন লাভের প্রত্যাশায় নয়, আর সেই আদর্শ-বিরোধী কার্য ঘৃণা করেন কোন দণ্ডের ভয়ে নয়। নৈতিক আদর্শ অনুসারে নিখুঁত কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়, কেননা মানুষ দুর্বল এবং ভ্রম-প্রমাদ মানুষের স্বভাবসিদ্ধ। সত্যসন্ধ মানব তিনিই, যাঁর চরিত্র আদর্শ লোকের কাছাকাছি পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। অন্যের আচরণ বিচার করতে হয় ঋত-সত্যের নিরালম্ব মানদণ্ড (absolute standard of righteousness) দিয়ে নয়, প্রমাদযুক্ত অথচ সাধু আচরণের যে দৃষ্টান্ত সে নিজে দেখিয়েছে, সেই পরিমাপেই অন্যের কার্য বিচার্য। শ্রেষ্ঠ মানব পরনিন্দা থেকে বিরত থাকে, তার কারণ এই যে সে অনুভব করে তার নিজের কাজ নির্ভুল অনিন্দনীয় বা সর্বাঙ্গসুন্দর নয়, আর যে নিজে ভ্রমশূন্য নয় সে অপরের নিন্দা করবে কোন মুখে? নিন্দা বর্জন যেমন একটি বিধান তেমনই আবার অকারণ কারও প্রশস্তি-কীর্তনও অবিধেয়, মধ্য-পন্থার এই নিয়ম। মধ্য-পন্থার সদাচারী অভিযাত্রী গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, সংযতবাক্ অকপট ঈর্ষাদ্বেষহীন, কিন্তু সে কামনা-বর্জিত নয়। তার কামনা উচ্চপদ বা প্রসিদ্ধি লাভ নয়, গুণী ব্যক্তির গুণগ্রাম অর্জন এবং আত্মসন্ধান দ্বারা চরিত্রগত দোষ নির্ণয় করে সেগুলির পরিহারই তার কামনা। শ্রেষ্ঠ মানবের আচরণে যেসব বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছে, সেগুলি 'সুবর্ণ বিধি' নামে পরিচিত। এই প্রসঙ্গে আলোচনায় কনফুসিয়াস শ্রেষ্ঠ মানবের নয়টি লক্ষণের বর্ণনা করেন: 'চক্ষের ব্যবহার করেন তিনি (শ্রেষ্ঠ মানব) সুস্পষ্ট দৃষ্টিপাতের জন্য। মুখমণ্ডলে

উদার মহানুভবতা প্রকাশ করতে আগ্রহশীল তিনি। আচরণে বিনয়ী ও বাক্যে সত্যনিষ্ঠ। তাঁর কাজ-কর্মে বিচক্ষণ সতর্কতা সুপরিস্ফুট। যে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ আছে, সেই বিষয়টি সম্বন্ধে তিনি অন্যের মতামত নির্ধারণে যত্নবান। তিনি যখন ক্রুদ্ধ হন, তখন ক্রোধ তাঁকে কোন্ বিপর্যয়ের মধ্যে টেনে নিয়ে চলেছে, সে বিষয়ে অগ্র-পশ্চাৎ বিশেষ করে ভেবে দেখেন। লাভজনক কার্যে সাধুতার কথা চিন্তা করেন।'

গ্রীক দার্শনিক আরিস্টটল তাঁর নীতি-দর্শনে 'মহামতি মানব' (Megalo Psychos or Great-Minded Man)-এর বর্ণনা করেছেন, তার সঙ্গে কনফুসীয় 'শ্রেষ্ঠ মানবে'র বিশেষ সাদৃশ্য আছে মনে হয়। তা ছাড়া আরিস্টটল যে 'সুবর্ণ মধ্য-পন্থা'র বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন, তারই পুরোধারূপে দেখা যায় কনফুসিয়াসের 'মধ্য পন্থা বিধান' (Doctrine of the Mean)। এই বিধান সম্বন্ধে কনফুসিয়াসের পৌত্র জু সু একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, সেই গ্রন্থে কনফুসীয় প্রবচনের সঙ্গে অনেক টীকাটিপ্পনী জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। এখানে আমরা কনফুসিয়াসের বাণী বলে কথিত এই কথাগুলি শুনতে পাই: 'হর্ষ-প্রীতি-দুঃখ-ক্রোধের উচ্ছ্বসিত আবেগ যখন হৃদয়ে অনুভব করা যায় না, মন তখন সাম্যের অবস্থা (state of equilibrium) প্রাপ্ত হয়। আর আবেগ উচ্ছ্বাস যখন প্রকৃতই অভিব্যক্ত হয়, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলভাবে নয়, প্রত্যেকটি আবেগ-স্পন্দন যখন ঠিক সময়টিতে আত্মপ্রকাশ করে, চিত্তে তখন সুষম অবস্থার (state of harmony) আবির্ভাব হয়। সাম্যাবস্থা বিশ্বপ্রকৃতির ভিত্তিমূল, আর তার সর্বজনীন পথের নির্দেশ দেয় সুষম অবস্থা। সাম্য ও সুষম অবস্থা লাভের ফলে স্বর্গ ও পৃথিবী স্বস্থানে বিরাজ করে, বিশ্বের যাবতীয় বস্তু পুষ্টিলাভ করে।'

চিত্তবৃত্তির সাম্য ও সুষম অবস্থার সন্ধান মধ্য-পন্থা অভিযাত্রীর প্রধান কার্য, কিন্তু এই কার্যে শিক্ষালাভের উপযোগী ব্যক্তির সংখ্যা অধিক নয়। কনফুসিয়াস বলেন, 'সুবর্ণ মধ্য-পন্থা সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় গুণাবলী অল্প লোকের মধ্যে দেখা যায়। তাই শিক্ষাদানের জন্য আমাকে কাজ করতে হয় দুই শ্রেণীর লোকের সঙ্গে, এক শ্রেণীর মানুষ তীক্ষ্ণবুদ্ধি কিন্তু হঠকারী, অপর শ্রেণীর মানুষ স্থূলবুদ্ধি কিন্তু সতর্কস্বভাব। তীক্ষ্ণবুদ্ধি হঠকারী মানুষ চঞ্চলমতি, সর্বদাই প্রস্তুত এগিয়ে চলবার জন্য, আর স্থূলবুদ্ধি সতর্ক

মানুষ একটি স্থাণুবিশেষ, সব সময়ে পিছনে পড়ে থাকাই তার স্বভাব।' এই দুই প্রকৃতির মানুষের মধ্যে কে উৎকৃষ্ট, এই প্রশ্নের উত্তরে কনফুসিয়াস বলেন, 'শুধু বিদ্যার্জনই যথেষ্ট নয়, পণ্ডিত হবেন ভদ্র-পণ্ডিত। আচরণের সৌষ্ঠব অপেক্ষা যার গুণের ওজন বেশি, তাকে অমার্জিত বলেই মনে হয়, আবার গুণধর্ম অপেক্ষা যার বাহ্য চটক বেশি তাকে মনে হয় চটুল প্রকৃতির হালকা মানুষ বলে। যে ব্যক্তির মধ্যে গুণীর গুণ আর মার্জিত রুচির সৌষ্ঠব সমভাবে মিশ্রিত তিনিই প্রকৃত ভদ্রলোক।' চীনা সমাজে তখন 'চুন জু' বা ভদ্রলোক এবং 'সিয়াও-জেন' বা ছোটলোক, এই দুই শ্রেণীর ব্যক্তি ছিল, অভিজাতবর্গ ছিলেন ভদ্রলোক আর সাধারণ ব্যক্তিরা ছিল ছোটলোক। চুন জু-দের পরম শ্রদ্ধা করতেন কনফুসিয়াস, আর সিয়াও-জেনদের জন্য ছিল তাঁর অপরিসীম ঘৃণা। তিনি বলতেন, 'চুন জু-দের মন ধর্মভাবে পূর্ণ থাকে আর সিয়াও-জেনরা শুধু লাভের কথা ভাবে।' অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিদের মত স্ত্রীজাতিকেও তিনি অশ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। তিনি বলেছেন, 'নারী ও অশিক্ষিতের সঙ্গে অতি সন্তর্পণে ব্যবহার করতে হয়। বেশি মাখামাখি করলে তারা মাথায় চড়ে বসবে, আবার যদি তাদের পাশ কাটিয়ে যাও তা হলেও রাগ করবে।' সম্রাট, সামন্তবর্গ, ভদ্রলোক, কৃষক ও শ্রমিকেরা সকলেই স্ব স্ব কর্মে রত থাকবে, একে অন্যের স্থান অধিকার করবে না, অন্যথায় সামাজিক বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা। কনফুসিয়াসের এই নির্দেশটির মধ্যে বর্ণাশ্রম কল্পনার অঙ্কুর খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে চীন দেশে জাতিভেদ প্রথা কোনকালেই দানা বেঁধে ওঠে নি। চুন-জু ও শাসক সম্প্রদায়ের লক্ষ্য 'জেন' বা প্রেম-ধর্ম, কনফুসীয় দর্শন ভদ্রলোককে এই শিক্ষা দিয়ে থাকে। ভদ্র ব্যক্তির নীতিবাদ অর্থে কনফুসীয় দর্শনকে 'জু' (Ju) দর্শন বলা হয়।

'মহাবিদ্যা' ('The Great Learning') গ্রন্থটি অ্যানালেক্টের মতই মহাপ্রভুর আর একটি প্রবচন-সংগ্রহ। কনফুসিয়াসের পৌত্র জু-সু-কে এই গ্রন্থেরও রচয়িতা বলা হয়, কিন্তু এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা একমত নন। গ্রন্থে ন্যায়শাস্ত্রের যুক্তির বাঁধন দেখে পরবর্তী কালের রচনা বলেই অনেকের অনুমান। কনফুসিয়াস বিশ্বাস করতেন, সে যুগের তাবৎ বিশৃঙ্খলার মূলে রয়েছে নৈতিক বিপর্যয়, প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি জনগণের অশ্রদ্ধা, ভাল-মন্দের

বিচারে অক্ষমতা। এই অবস্থাব প্রতিকার করতে হলে প্রয়োজন জ্ঞানের সন্ধান-প্রবৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করা, পারিবারিক জীবনের নিয়ন্ত্রণ দ্বারা চবিত্র গঠন। মহাবিদ্যা প্রভাবে মানুষ কিরূপে মহৎ গুণ অর্জন করে পরম শ্রেয়ের অধিকারী হতে পারে, সেই বিষয়টি বোঝাবার জন্য কনফুসিয়াস ধাপে ধাপে যুক্তির অবতারণা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'প্রাচীন কালে প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা যখন মহৎ গুণের বিশ্বময প্রসার কামনা করতেন, তাঁরা তখন নিজেদের রাষ্ট্রের সুষ্ঠু প্রশাসন-কার্যে মন দিতেন। রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষা হত তাঁদের প্রথম উদ্যোগ। পাবিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষাকল্পে তাঁরা আত্মচর্চা করতেন। আত্মচর্চাকল্পে তাঁরা চিত্তশুদ্ধি কবতেন। চিত্তশুদ্ধিকল্পে তাঁবা চিন্তায সততা অভ্যাস কবতেন। চিন্তায সততা অভ্যাসকল্পে তারা জ্ঞানেব পরিধি প্রসারিত করতেন বস্তু সন্ধান দ্বারা।' এই কার্যক্রমেব ক্রিযা ঘুরে গিয়ে আবার রাষ্ট্রের সুশাসনে পর্যবসিত হয এইরূপে: বস্তুসন্ধান থেকে জন্মে পূর্ণতর জ্ঞান, সেই জ্ঞান থেকে চিন্তার সততা, সেই সততা থেকে চিত্তশুদ্ধি, সেই শুদ্ধি থেকে আত্মচর্চা, সেই চর্চা থেকে পারিবারিক নিযন্ত্রণ, সেই নিয়ন্ত্রণ থেকে রাষ্ট্রের সুশাসন। রাষ্ট্রসমূহ সুশাসিত হলে সারা জগতে শান্তি বিরাজ করে।

নীতিধর্মের সঙ্গে রাজনীতির সংমিশ্রণ জু বা কনফুসীয় দর্শনের পরম সার্থকতা। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র, তিন রকমের তিনটি সমষ্টিজীবন, কিন্তু সবগুলিই এক সূত্রে বাঁধা, একটি অন্যটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কনফুসিযাস বলেন, 'বিজ্ঞতার সূত্রপাত আপন গৃহে। সুশৃঙ্খল পরিবার-মধ্যে নিযমানুগ ব্যক্তির ওপর সমাজ প্রতিষ্ঠিত।' সন্তান পিতা-মাতার ও স্ত্রী যদি স্বামীর অনুগত না হয় তবে সমাজের অধঃপতন অনিবার্য। এই আনুগত্যই পরম ধর্ম, কিন্তু নৈতিক বিধানের নির্দেশ পালন আনুগত্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর। নীতি সম্বন্ধে পুত্র পিতাকে বিনীতভাবে উপদেশ দেবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও পিতা যদি নীতিবিরুদ্ধ কর্ম করতে উদ্যত হয় তবে পুত্র তাকে অধিকতর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে পিতার কর্মেব প্রতিবাদ করবে। রাষ্ট্র-ক্ষেত্রে রাজা ও মন্ত্রীর সম্বন্ধের বেলায়ও ওই নিযম প্রযোজ্য। দুর্নীতিপরায়ণ স্বৈরাচারী রাজা যদি মন্ত্রীর সুপরামর্শ গ্রহণ না করে তবে মন্ত্রী পদত্যাগ করবে। বলা বাহুল্য, কনফুসিয়াস একজন উগ্র রকমের রক্ষণপন্থী, প্রাচীন

ঐতিহ্যের উপাসক, বিপ্লবকে তিনি সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করতেন। কিন্তু তাঁর স্পষ্ট অভিমত ছিল এই যে, রাষ্ট্রশক্তির মূলাধার প্রজাসাধারণ, তাই শাসকের ওপর প্রজার আস্থা না থাকলে রাজ্যের পতন নিশ্চিত বলেই ধরা যেতে পারে। কনফুসিয়াসের এই মত অবলম্বন করে তাঁর শিষ্য মেনসিয়াস প্রচার করেছিলেন যে, বিপ্লব প্রজাদের একটি দেব-লব্ধ পবিত্র অধিকার।

কনফুসিয়াস বলেন, 'যদি প্রশাসন ব্যবস্থা দ্বারা জনগণকে পরিচালিত এবং শাস্তির ভীতি প্রদর্শন দ্বারা তাদের নিয়ন্ত্রিত করা হয় তা হলে তারা কারাগারের বাইরে থাকবার চেষ্টা করবে বটে কিন্তু তাদের কোন সম্মান বা লজ্জা বোধ থাকবে না। আর যদি তাদের ধর্মনিষ্ঠ শিক্ষা দ্বারা 'লি' অর্থাৎ নীতির আদর্শ পথে পরিচালিত কিংবা নিয়ন্ত্রিত করা হয় তবে তারা কখনও আত্মসম্মান বিসর্জন দেবে না।' শাসকের চারিত্রিক সততা থাকলে তবেই সুশাসন সম্ভব, সাধু আচরণেব দৃষ্টান্ত প্রশাসন-সৌকর্যের প্রকৃষ্ট উপায়। কনফুসিয়াস বলেন, 'যে ধর্মনিষ্ঠ রাজা নীতিসম্মত বিধানমত শাসনকার্য পরিচালনা করেন, ধ্রুবতারার মত তিনি অবিচলিতভাবে স্বস্থানে বিরাজ করেন, অন্যান্য নক্ষত্ররাজি তাঁর চতুর্দিকে পরিক্রমণ করে।'

কনফুসীয় দর্শন ধর্মতত্ত্বের আলোচনা থেকে বিরত ছিল বটে, কিন্তু কনফুসিয়াস আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মকে বর্জন করেন নি। প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট দিবসে পর্বতচূড়ায় উঠে রাজা নির্জনে পরমপুরুষ (Supreme Being) স্যাং-তির আরাধনা করবেন, স্যাং পূজার অধিকারী একমাত্র 'স্বর্গপুত্র' অর্থাৎ নৃপতি। সর্বসাধারণের জন্য মন্দিরসমূহে পিতৃপূজার (ancestor-worship) চিরন্তন ব্যবস্থা। কনফুসিযাস ওইসব প্রাচীন ধর্মানুষ্ঠান পুরোপুরি বজায় রাখবার পক্ষপাতী ছিলেন। প্রাচীন কালের মহাপুরুষেরা যেসব ক্রিয়াকর্ম অনুষ্ঠানাদি করে গেছেন, সেগুলি সকলেরই করণীয, তাঁদের প্রদর্শিত পথ ধরে চলা সকলেরই কর্তব্য, মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ। পবমার্থ বিষযে যেমন, তেমনই নীতিবাদ বা রাজনীতির ক্ষেত্রেও তিনি কোন সুসম্বদ্ধ দার্শনিকতার অবতারণা করেন নি। আলাপ-আলোচনায় শিষ্যদের চিন্তাধারাকে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন করবার জন্য তিনি ন্যায়শাস্ত্রের জটিল তর্কজাল বয়ন করেন নি, তিনি দিয়েছেন এই শিক্ষা যে সাধু চিন্তার সরল প্রকাশই যুক্তির পরম সহায়। ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় আগ্রহের একান্ত অভাব দেখে অনেক আধুনিক পণ্ডিত

মনে করেন, কনফুসিয়াস ছিলেন agnostic বা অজ্ঞেয়বাদী। প্রজ্ঞা কি, ফা চে-র এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'মানুষের প্রতি কর্তব্য পালনে আত্মনিয়োগ এবং আধ্যাত্মিক সত্তার প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়েও অধ্যাত্ম-প্রসঙ্গ থেকে দূরে সরে থাকাই প্রজ্ঞা।' কিন্তু এই মতবাদ সত্ত্বেও জগৎ-মধ্যে তিনি একত্ব ও সুষম সমন্বয়েব সন্ধান, জ.ৎ-প্রকৃতির সঙ্গে মানব-প্রকৃতির সমন্বয়ের সন্ধান করেছেন, বলেছেন, 'আমি সর্বাত্মক একত্বের সন্ধান করি।' এই একত্বের সন্ধানী হিসাবে তিনি একজন প্রকৃত দার্শনিক।

পরিশেষে কনফুসীয় নীতিবাদের প্রভাব ও ফলাফলের মূল্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলতে হয। এই মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল এক বিষম সংকটকালে, জাতির নৈতিক অবনতির প্রতিবাদরূপেই কনফুসিয়াস তাঁর শিক্ষা প্রচার করেছিলেন। যে যুগে পিতার প্রতি ছিল অশ্রদ্ধা, এমন কি পিতৃহত্যার দৃষ্টান্তেবও অভাব ছিল না, কনফুসিযাস তখন পিতৃভক্তির আদর্শকে মর্যাদা দান করেছিলেন। যে যুগে রাজার অত্যাচার, প্রজার অনাচার দেশময় অরাজকতার তাণ্ডব সৃষ্টি কবেছিল, যখন রাজা আর প্রজা দরদী নয়, প্রজা আব রাজভক্ত নয, তিনি তখন প্রচার করেছেন রাজধর্ম প্রজাধর্ম। যে যুগে প্রাচীন আচাব-অনুষ্ঠান লোপ পেযেছিল, ব্যভিচার-কদাচারে জাতীয় জীবন কলুষিত হযে উঠেছিল, তিনি তখন অতীত 'স্বর্ণযুগে'র আদর্শে সামাজিক শৃঙ্খলা ও শান্তির প্রতিষ্ঠা কামনা করেছিলেন। তাঁর এই সাধু উদ্যম সাফ ্যমণ্ডিত হযেছিল তাঁর জীবনকালে নয়, মৃত্যুর পর। প্রভুর মৃত্যুর পর তাঁব নীতিবাদের অক্লান্ত প্রচার করেছিল শিষ্যরা দীর্ঘকাল ধরে, দেশের নানান স্থানে শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হযেছিল, সেগুলি সংস্কৃতির পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল। বহু ভাষ্যকারের আবির্ভাব হয়েছিল, সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার ছিলেন মেং কো বা মেনসিয়াস, তাঁর বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করব। কনফুসীয নীতিশাস্ত্রে পারদর্শী পণ্ডিতেরা ছিলেন সমাজপতি, রাষ্ট্রের শাসক, জাতির জীবনকে তাঁরা এমন একটি ছাঁচে-গড়া আকারে পরিপাটি রূপসজ্জায় ভূষিত কবতে পেরেছিলেন যে কত সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন, কত রাজনৈতিক বিপর্যয় সত্ত্বেও চীনা সভ্যতা ও সংস্কৃতির চিরাগত সূত্রধারাটির ছেদ কখনও ঘটে নি। চীনা জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ কবেছিল এই রক্ষণধর্মী নীতি-দর্শন, জাতিকে দিয়েছিল মর্যাদা, ব্যক্তিকে

গাম্ভীর্য, সমাজকে শৃঙ্খলা। জ্ঞানের চর্চা, বিদ্যার প্রতি পরম অনুরাগ চীনের সভ্যতাকে এমন একটি জ্যোতির্ময় গৌরব-মঞ্চে প্রতিষ্ঠিত করেছিল যার সামনে দুর্ধর্ষ বিজেতার মাথাও শ্রদ্ধায় নুয়ে পড়ত, তারা তখন নিজেদের অমার্জিত অভ্যাস, রুচি পরিত্যাগ করে চীনা সংস্কৃতিকে সাদরে বরণ করে নিত।

কিন্তু 'জু' দর্শনের উপরোক্ত গুণ বর্ণনা কনফুসীয় চিন্তার একটি বর্ণোজ্জ্বল সোনালী দিক, তার একটি মসীকৃষ্ণ দিকও যে না আছে তা নয়। অরাজক উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে যে নীতিধর্মের জন্ম, সমাজে ও রাষ্ট্রে শৃঙ্খলা স্থাপন যে নীতির উদ্দেশ্য, সেই অবস্থামত ব্যবস্থাকে একটা ঐতিহাসিক প্রয়োজন রূপে না দেখে শাশ্বত বস্তু বলে গ্রহণ করলে নানান জটিলতার উদ্ভব হয়, এমন কি জাতির প্রগতির পথও সেই সনাতন বিধানের চাপে রুদ্ধ হয়ে যায়। পরিণামে চীনের অদৃষ্টেও সেই অবস্থাই ঘটেছিল। সমাজ ও ব্যক্তিকে আচার-অনুষ্ঠানের কৃত্রিম বাঁধনে বেঁধে দিয়ে এমন একটি নৈতিক যান্ত্রিকতার পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছিল যে তার সংকীর্ণ পরিসর-মধ্যে মানবীয় কোমল বৃত্তিগুলির স্বাভাবিক স্ফুরণের অবসর ছিল না। নারীকে এই নীতি সমাজে তার যোগ্য স্থান দেয় নি, সারাটা কাল ধরে চীন দেশে স্ত্রীজাতি ছিল অবনমিতা। ভদ্রলোকদের কায়িক পরিশ্রম নিষিদ্ধ করে ভদ্র শিক্ষিত সমাজ ও জনসাধারণের মধ্যে একটি দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর গেঁথে তোলা হয়েছিল, এরূপ উচ্চনীচের ব্যবধান সামাজিক কল্যাণের পরিপন্থী। প্রাচীনের প্রতি আসক্তি শুধু নয়, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যাপারে প্রাচীন কর্মপদ্ধতির অন্ধ অনুসরণ নবযুগের পরিবর্তিত অবস্থায় নূতন পথে অভিযানের আগ্রহকে সমূলে বিনষ্ট করেছিল। জাতির চেতনাকে এমন একটি জড়পিণ্ড করে তুলেছিল এই স্থবির নীতি-দর্শন যে চীনের বুকের ওপর বসে পাশ্চাত্ত্য জাতিপুঞ্জ যখন নানান উপদ্রব জুড়ে দিয়েছে, পাশ্চাত্ত্যের সংঘাতে প্রতিবেশী জাপান যখন নূতন জীবন লাভ করেছে, পদে পদে চীন অপদস্থ, সেসব দেখেও চীন তার আদর্শলোকের হস্তিদন্তের প্রাসাদচূড়া ছেড়ে বাস্তবক্ষেত্রে অবতরণ করে নি, নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা দ্বারা প্রাচীন সংস্কার বা চিরকালের অভ্যাসের পরিবর্তন করে নি। বিংশ শতাব্দীর চীনা বিপ্লব, যার চূড়ান্ত পরিণতি কমিউনিস্ট শাসনরূপেই এখন দেখা দিয়েছে, দীর্ঘকালের অবসানে বিপ্লবের স্থূল হস্ত প্রতিক্রিয়ার প্রাচীন

জড়ভরতকে ভূমিসাৎ করে দিয়েছে, তার সেই ভগ্নস্তূপের মধ্যে এখন আর কনফুসিয়াসের ছায়াটিকেও খুঁজে পাবার জো নেই। কিন্তু কি আন্তর্জাতিক ডামাডোল, কি চীনের ধূলি-আবরণ, এইসব বিস্ময়কর নূতন অবস্থার মধ্যেও এ কথাটি ভুলে যাওয়া সংগত হবে না যে, এই মহাপুরুষের মুখনিঃসৃত এমন বাণী আছে প্রচুর, আধুনিক জ্ঞানের আলোকে যার মূল্য অসামান্য, এবং যা শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করলে মানুষের নৈতিক জীবন সমৃদ্ধ হয়ে উঠবার যথেষ্ট সম্ভাবনা।

মেং কো বা মেনসিয়াস

'জু' দর্শনের ধারক ও বাহক ছিলেন মেনসিয়াস, কনফুসিয়াসের মৃত্যুর শতাধিক বছর পরে তাঁর এই শ্রেষ্ঠতম উত্তরসাধকের জন্ম (খৃঃ পূঃ ৩৭২)। মেনসিয়াস ল্যাটিন নাম, চীনা নাম মেং কো বা মেং জু। তিনি লু দেশের অধিবাসী, কনফুসিয়াসও ছিলেন সে দেশেরই লোক। মেং কো-র জীবনের কোন প্রামাণিক ইতিবৃত্ত নেই, তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী থেকেই তাঁর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু জনশ্রুতি-পরম্পরায় তাঁর যে জীবনকাহিনী চলে এসেছে মোটামুটিভাবে সেটিকে গ্রহণ করলে আমরা জানতে পারি, খ্যাতিমান মেং বংশে মেং কো-র জন্ম, কালক্রমে সেই পরিবার নিঃস্ব হয়ে নিচু পর্যায়ে গিয়ে নেমেছিল এবং সেজন্য নিম্নস্তরের লোকজনের মধ্যেই মেং কো বর্ধিত হয়েছিলেন। শৈশবে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়েছিল, শিশুর লালনপালন-রক্ষণাবেক্ষণের সম্পূর্ণ ভার গিয়ে পড়েছিল মাতার ওপর। তিনি ছিলেন অসামান্য গুণান্বিতা, এমন নারীকে ঘিরে নানান রকমের কথিকার সৃষ্টি বিচিত্র নয়। একটি কথিকা এইরূপ: পুত্রের চরিত্রগঠনে মাতার দৃষ্টি ছিল এমনি সজাগ যে তার শৈশবকালের উপযুক্ত পরিবেশের সন্ধানে তিনি নাকি তিন-তিনবার বাসগৃহ পরিবর্তন করেছিলেন। প্রথমে পুত্রকে নিয়ে তিনি থাকতেন একটি সমাধিক্ষেত্রের কাছে, দেখা গেল মেং কো মৃতের সমাধি-অনুষ্ঠান আর শোকার্তদের বিলাপের অনুকরণ করছে। তখন মাতা তাকে সেই বিষণ্ণ পরিমণ্ডল থেকে সরিয়ে এনে একটি বাজারের সন্নিকটে বসবাস করতে লাগলেন। দেখা গেল, পুত্র দোকানীদের অনুকরণে জিনিসপত্রের দরদস্তুর রপ্ত করে ফেলেছে আর সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পণ্য নিয়ে ফেরি করে

বেড়াতে শুরু করেছে। মাতার মনে হল, এরকম পরিবেশ বালকের চিত্ত-বৃত্তি উন্মেষের প্রতিকূল, তাই তিনি সেখান থেকে উঠে গিয়ে একটি পাঠশালার কাছে বাসা নিলেন। এখানে দেখা গেল, বালক প্রাজ্ঞজনোচিত গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যবহার এবং পণ্ডিতদের কেতা-কানুন, যেমন সসম্ভ্রমে অভিবাদন ও আনুষ্ঠানিক-ভাবে এগিয়ে-পেছিয়ে চলা, অভ্যাস করে ফেলেছে। শিশুচিত্তের ওপর পরিবেশের প্রভাব মানুষের ভবিষ্যৎকে কেমনধারা রূপায়িত করে তুলতে পারে, উক্ত উপাখ্যানটি তারই একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বিদ্যালয়ের সান্নিধ্য ও পণ্ডিতবর্গের দৃষ্টান্ত অনুসরণের ফলে মেং কো বাল্যকাল থেকে বিদ্যানুরাগী হয়ে উঠেছিলেন।

মেং কো-র জীবনের আলোচনা প্রসঙ্গে একটি কৌতুকোদ্দীপক কথিকা এখানে বলা যেতে পারে যদিও ঘটনাটি সত্য না হওয়াই সম্ভব। একদা তিনি নাকি অতর্কিতে তাঁর পত্নীর ঘরে প্রবেশ করে তাঁকে অর্ধনগ্ন অবস্থায় দেখতে পান, এবং এই শালীনতাবিরুদ্ধ দৃশ্যটি তাঁর সুরুচির মর্যাদায় ভয়ংকরভাবে আঘাত করে। অপরাধিনী পত্নীকে ত্যাগ করবার নিদারুণ সংকল্প তিনি গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু মাতার প্রত্যুৎপন্ন বুদ্ধির কল্যাণে ব্যাপারটার 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া'য় পরিসমাপ্তি ঘটে। সব কথা শুনে মাতা বললেন, "সদাচারের নিয়ম এই যে ঘরে ঢুকবার আগে গলার আওয়াজে হুঁশিয়ার করে দিতে হয়, এবং পাছে কোন অনাচার চোখে পড়ে সেজন্য মাটির পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে ঘরে ঢুকতে হয়। তুমি তো বাছা এসব কিছুই কর নি। নিজের ত্রুটির জন্য যা ঘটেছে তার দোষ মিছেমিছি বউয়ের ওপর চাপিয়ে তুমি কি তার প্রতি অবিচার করছ না?" এই অকাট্য যুক্তি মেং কো নতশিরে মেনে নিলেন, দাম্পত্য সম্বন্ধও অটুট রয়ে গেল।

শিষ্যদের সঙ্গে সক্রেটিসের সংলাপ লিপিবদ্ধ করেছিলেন প্লেটো, কনফুসিয়াস সম্পর্কে মেনসিয়াসের ভূমিকাও অনেকটা সেই রকমের। কনফুসীয় আদর্শের এমন মৌলিক ব্যাখ্যা আর কেউ করেন নি, সেজন্য জু-দার্শনিকমণ্ডলীর মধ্যে প্রভু কুং-এর পর মেং কো-র মর্যাদাই সবচেয়ে বেশি। এই অতুলনীয় মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন তিনি পরিণত বয়সে, তখন দেশবিদেশের রাজন্যবর্গ উপদেশলাভের জন্য তাঁর সাক্ষাৎ কামনা করতেন, এবং তিনিও কনফুসিয়াসের মত তাঁদের উপদেশদানে বাধিত করতেন। রাজাদের সঙ্গে

তাঁর আলাপ-আলোচনা সব সময়ে তাঁদের প্রীতিকর ছিল, এমন কথা বলা চলে না, কেননা অপ্রিয় সত্য মুখের ওপর শোনাবার সৎসাহসকে তিনি কোন দিন দাবিয়ে রাখেন নি। অপ্রিয় সত্যভাষণের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ-স্বরূপ লিয়াং-এর রাজা হুই-র সঙ্গে তাঁর সংলাপটি উল্লেখযোগ্য ঃ

মেং কো ঃ মানুষকে গদাঘাতে বধ করা আর তলোয়ার দিয়ে তার প্রাণনাশ, এ দুটি হত্যাকাণ্ডের মধ্যে কোন প্রভেদ আছে কি ?

রাজা হুই ঃ না। কোন প্রভেদ নেই।

মেং কো ঃ তলোয়ারের আঘাতে প্রাণবধ আর কু-শাসনে প্রাণে মারা, এ দুটির মধ্যে কোন প্রভেদ আছে কি ?

রাজা হুই ঃ না। কোন প্রভেদ নেই।

মেং কো ঃ আপনার রন্ধনশালায় আছে চর্বিযুক্ত মাংস আর অশ্ব-শালায় আছে চর্বিযুক্ত ঘোড়া। কিন্তু বুভুক্ষু প্রজার দল শুকিয়ে মরছে, তাদের শবদেহ এদিকে ওদিকে পড়ে আছে। এই অবস্থাকে অনায়াসে বলা যেতে পারে পশুর আহারের জন্য মানুষকে হত্যা। রাজাকে বলা হয় প্রজার পিতা, সেই রাজাই যদি পশুকে এমন করে মানুষের রক্ত পান করতে না দিয়ে শাসন চালাতে না পারে তবে তাকে প্রজার পিতা বলে মনে করব কেন ?

কনফুসিয়াসের জীবনদর্শন আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা 'লি'-র উল্লেখ করেছি। 'লি' চীন দেশের চিরাগত আচার-পদ্ধতির অনুষ্ঠানবিধি, এই 'লি' ধর্মের উদ্ভব ও বিবর্তন চীনের সামাজিক ইতিহাসকে আদিকাল থেকে প্রভাবিত করেছে। মেং কো মনে করতেন, 'লি' মানুষের অন্তর্নিহিত মানবিকতা-বোধ (human heartedness) বা 'জেন'-এর বিকাশ মাত্র। মেং কো-র রচনাবলী কনফুসীয় নীতিধর্মের স্তম্ভস্বরূপ, তাঁর গ্রন্থে একটি সংলাপে 'লি' ও 'জেন' তত্ত্ব এইভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে ঃ

দার্শনিক সুন-ইউ-কুন প্রশ্ন করলেন ঃ কোন জিনিস দেওয়ার সময় পুরুষ ও নারী পরস্পরকে স্পর্শ করবে না, শালীনতার এই নিয়মটি মানেন তো ?

মেং কো বললেন ঃ নিশ্চয়ই মানি।

দার্শনিক কুন: ধরুন কোন ব্যক্তির শ্যালিকা জলে ডুবে যাচ্ছে। তখন কি লোকটি তার হাত ধরে তুলবে না?

মেং কো: নিশ্চয়ই তুলবে। মজ্জমানা শ্যালিকাকে সলিলসমাধি থেকে উদ্ধার না করা পাশবিক অমানুষিকতা। পুরুষ ও নারী পরস্পরের হাত ধরবে না, মোটামুটিভাবে এ কথা সত্য। কিন্তু এই সাধারণ নিয়মেরও ব্যতিক্রম আছে। শালী যখন ডুবে মরছে তখন হাত দিয়ে তাকে জল থেকে তুলতে হবে বইকি।

তখন দার্শনিক একটি বেয়াড়া-গোছের প্রশ্ন করে বসলেন: প্রভু, সারা জগৎ আপনার চোখের সামনে তলিয়ে যেতে বসেছে। আপনি তবে এ সময়ে হাত গুটিয়ে বসে আছেন কেন?

মেং কো জবাব দিলেন: ডুবন্ত শালীকে রক্ষা করা যায় হাতের ব্যবহার করে, কিন্তু ডুবন্ত জগৎকে রক্ষা করা যায় 'তাও'র সত্যধর্ম দিয়ে। আপনি কেমন করে আশা করেন যে আমি আমার দুটি বাহু দিয়ে মজ্জমান জগৎকে উদ্ধার করতে পারব?

নৈতিক সদ্‌গুণ ও শুভবুদ্ধিই মানুষের মূল প্রকৃতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির উদ্দেশ্য সেই সাধু-প্রকৃতির বিকাশ ও বিবর্ধন। মেং কো বলেন, "যে ব্যক্তি তার শিশুচিত্তকে বিসর্জন দেয় নি সে-ই মহৎ।" সৎকর্মের প্রবৃত্তি মানুষের স্বভাবসিদ্ধ, এই মতবাদটি তিনি নিম্নোদ্ধৃত বিতর্কে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন:

কাও বললেন: আমাদের প্রকৃতি ঘূর্ণ্যমান জলস্রোতের মত। পুব দিকে ভাঙন ধরলে জল পুব দিকে ছোটে, আর যদি পশ্চিম দিকে ভাঙন ধরে স্রোতও তখন সেই দিকে বয়। জলস্রোতের কাছে পুব পশ্চিম ভেদ নেই, তেমনি মানব-প্রকৃতিও ভাল-মন্দ বাছাই করে না।

জবাবে মেং কো বললেন: জল পুব পশ্চিমের মধ্যে কোন প্রভেদ করে না, সে কথা ঠিক। কিন্তু তা বলে কি উঁচু নিচু ভেদও নেই? জল কি উঁচু দিকে আর নিচু দিকে সমভাবে প্রবাহিত হয়? সৎকর্মের দিকে মানব-প্রকৃতির প্রবণতা আছে, জলের প্রবণতা যেমন নিচু দিকে বয়ে যাওয়া। অবশ্য কৃত্রিম উপায়ে জলকে ঊর্ধ্বে তোলা যায় বটে, যেমন

আঘাত করে বা বাঁধ দিয়ে। তেমনি বাইরের চাপে মানুষের অন্তর্নিহিত শুভবুদ্ধিও বিকৃত হয়ে মন্দ রূপে দেখা দেবে তাতে আশ্চর্য কি ?

এই অন্তর্নিহিত সৎপ্রবৃত্তি ও শুভবুদ্ধিকে মেং কো তুলনা করেছেন মানুষের স্থূল হস্তের স্পর্শে কলষিত হয় নি এমন স্বভাব-স্বচ্ছন্দ অরণ্যানীর সঙ্গে। তিনি বলেন, "চেয়ে দেখ ওই ন্যাড়া পাহাড়টার দিকে। যখন বিটপীমণ্ডিত বনাঞ্চল ওকে ঘিরে রাখত তখন ও ছিল কী সুন্দর! তারপর রাজধানীর সংবৃদ্ধির সঙ্গে ওর গাছগুলিকে কুঠারাঘাতে কেটে ফেলা হল। তখনো কিন্তু ওর শোভাসম্পদ একেবারে শেষ হয়ে যায় নি, কারণ গাছের গুঁড়ি থেকে ছোট ছোট চারা গজাল। কিন্তু ছাগল-ভেড়ার কৃপায় সেগুলিও আর রইল না। এখন ওই পাহাড়টিকে দেখে কেউ কি তার পূর্বকার সমৃদ্ধ অবস্থা কল্পনা করতে পারে ? মানব-প্রকৃতিও ঠিক তেমনি। মানবচিত্ত গোড়াতে কখনো মানবিকতা-বোধ বা সত্যাশ্রয়ের শোভাবিবর্জিত থাকে না। তারপর যখন তার ওপর বাইরে থেকে উপর্যুপরি কুঠারাঘাত চলতে থাকে তখনই তার দশা হয় ন্যাড়া পাহাড়টার মত। তাকে দেখে কেউ তখন মনেও করতে পারে না ওর কোনকালে কোন স্বভাবসিদ্ধ সদ্‌গুণ ছিল। তখন তার সঙ্গে আর পশুপক্ষীর প্রভেদ থাকে না।"

মেং কো বলেন, "সব মানুষের মধ্যে করুণার অনুভূতি, লজ্জাবোধ, শ্রদ্ধা ও সৌজন্য রয়েছে, তেমনি আছে ভাল-মন্দ বিচারবুদ্ধি। মানুষ যখন জলমগ্ন শিশুকে উদ্ধার করতে ছুটে যায় তখন তার প্রেরণা আসে করুণার স্বভাব-জাত অনুভূতি থেকে, লোকের প্রশংসালাভের আশা থেকে নয়। এই সংবেদনই মানুষকে অন্য প্রাণী থেকে পৃথক করে রেখেছে।" তিনি বলেন, "যার মনে করুণা নেই সে মানুষ নয়।"

সাধু প্রকৃতির বিবৃদ্ধি ও ক্ষয় দুই-ই আছে। সাধু-সন্ত মানুষ সাধারণ ব্যক্তি থেকে পৃথক নয়, সকলেই ইয়াও ও সুন এই দুটি স্বনামধন্য রাজর্ষির সমশ্রেণীর মানুষ। আমরা যদি তাঁদের মত মহৎ গুণী না হতে পারি তবে সে আমাদেরই দোষ, অদৃষ্টের নয়। কারণ যে চারটি গুণ মানব-চরিত্রের স্তম্ভস্বরূপ, অর্থাৎ 'জেন' (মানবিকতা-বোধ), 'ই' (সত্যাশ্রয়), 'লি' (শ্রদ্ধা ও সৌজন্য), 'চি' (প্রজ্ঞা), এই গুণ-চতুষ্টয়ের অধিকারী হয় মানুষ তার

জন্ম থেকে, যেমন সে পায় তার চারটি অঙ্গ। কিন্তু মানুষ যদি অনুশীলন দ্বারা তার এই স্বভাবজাত গুণাবলীর সংবৃদ্ধির উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে না পারে, তা হলে উপকরণের অভাবে সেগুলি নষ্ট হয়ে যায়, সে তখন নগ্ন শিশুর নিষ্কলুষ চিত্তবৃত্তি হারিয়ে বসে। মেং কো বলেন, "চিত্তবৃত্তি আছে দু রকমের, মহৎ আর ক্ষুদ্র। যিনি মহৎ চিত্তের সেবা করেন তিনি উত্তম, আর যে ক্ষুদ্র চিত্তের সেবা করে সে অধম।" উৎকৃষ্ট চিত্তবৃত্তির অনুশীলনকে তিনি কৃষিকার্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন। শস্যের ফলন কোথাও ভাল কোথাও মন্দ, তার কারণ প্রাকৃতিক অবস্থা, যেমন ভূমির উর্বরতা। বস্তুত চরিত্র গঠনে মেং কো পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর যতখানি জোর দিয়েছেন এমনটি বোধ করি সে-কালের আর কোন দার্শনিকই দেন নি।

রাষ্ট্রনীতি ও রাজধর্ম বিষয়ে মেং কো অনেক সারগর্ভ কথা বলে গেছেন, সামন্ত-শাসনকালের অরাজক তাণ্ডবের মধ্যে সেগুলি যেন গণতন্ত্রের উদাত্ত বাণীর মতই শোনা যায়। রাজার অত্যাচারে দেশ যখন জর্জরিত, দুর্বলের ওপর শক্তিমানের জুলুম চলছে, তিনি তখন নির্ভীক কণ্ঠে প্রচার করলেন, "জনসাধারণ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী, আর শাসকের স্থান সকলের নিম্নে।" মূল নীতি হিসাবে কনফুসিয়াসের মতবাদের সঙ্গে এ কথার সংগতি দেখা যায় না, তার কারণ সর্বশক্তিমান রাজার আসনটি প্রজাবর্গের নিচে স্থাপন করতে কনফুসিয়াস কখনো রাজি হতেন না, যদিও প্রজানুরঞ্জনকে তিনি প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য বলেই নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং রাজার ওপর প্রজার স্থান এই মতবাদ মেং কো-র নিজস্ব বলতে হয়। কিন্তু এখানেও তিনি নিজের সমর্থনে কনফুসীয় নীতির ব্যাখ্যা করতে ছাড়েন নি। কনফুসিয়াসের ইতিহাস গ্রন্থে 'স্বর্গের পরোয়ানা' ('Mandate of Heaven') বলে একটি বাক্যের উল্লেখ আছে। সেখানে বলা হয়েছে, রাজা স্বর্গপুত্র, 'স্বর্গের পরোয়ানা'-বলে রাজ্য শাসন করেন। এই বর্ণনাকে অবলম্বন করে মেং কো রাজতন্ত্রের যে বিশদ ভাষ্য রচনা করেছেন তা এইরূপ : প্রশাসনের উদ্দেশ্য জনকল্যাণ, রাজাপ্রজার সম্পর্ক পরস্পরসাপেক্ষ। অসৎ রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সম্পূর্ণ সংগত, কেননা কুশাসন ঘটলে স্বর্গ তাঁর পরোয়ানাটি বাজেয়াপ্ত করেন, প্রজা-বিদ্রোহ রাজার প্রতি স্বর্গের দণ্ডবিধান মাত্র। চি-র রাজা সুয়ানের সঙ্গে সংলাপে এই অভিমতটি তিনি পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত

করেছিলেন, স্যাং বংশের শেষ রাজা চৌ সিন-এর মন্ত্রী কর্তৃক হত্যার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে। মেং কো বলেন, "যে ব্যক্তি নৈতিক আদর্শকে পদাঘাত করে সেই দুরাচারকে ঘৃণিত পাষণ্ড বলেই অভিহিত করতে হয়। চৌ নামে এক দুরাচারী পাষণ্ডকে হত্যা করা হয়েছিল শুনেছি। কোন রাজা তার মন্ত্রী কর্তৃক নিহত হয়েছিল এমন কথা শুনি নি।" স্পষ্টই তিনি বলতে চান, কুশাসনের জন্য স্বর্গের পরোয়ানা প্রত্যাহৃত হয়েছিল বলে চৌ আর রাজা ছিলেন না।

মেনসিয়াসকে দুজন প্রতিপত্তিশালী দার্শনিকের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, তাঁদের নাম মো-তি ও ইযাং চু। আমরা তাঁদের দর্শনতত্ত্ব পরে আলোচনা করব। এখানে এটুকু বলা বোধ করি যথেষ্ট যে, ইযাং ও মো-র মতবাদ পরস্পরবিরুদ্ধ হলেও 'জু-দর্শনে'র অসারত্ব প্রতিপাদন করে তার খণ্ডনই ছিল দার্শনিকদ্বয়ের মহাব্রত। জনসাধারণের কাছে তারা, বিশেষত মো-তি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, এবং সেজন্য মেং কো অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে এই আক্ষেপোক্তিটি করেছিলেন: "ইযাং ও মো-র দর্শন-তত্ত্বকে যদি ভূমিসাৎ করে না দেওয়া যায়, আর প্রভু কুং-এর তত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা না হয়, তা হলে কুশিক্ষায় মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে, মানবিকতা-বোধ ও সত্যাশ্রয়ের পথও রুদ্ধ হয়ে যাবে।"

কনফুসীয় নীতিশাস্ত্রের একটি প্রধান অঙ্গ 'মেনসিয়াসের গ্রন্থ' যার মূল্য ও মর্যাদা জু-দর্শনের 'প্রাজ্ঞ-বচন' (Analect), 'মহাবিদ্যা' (The Great Learning) ও 'স্বর্ণ মধ্য-পন্থা' (Doctrine of the Mean) এই তিনটি গ্রন্থের সমান। কিন্তু মেং কো-কে এরূপ মর্যাদা দান সত্ত্বেও সকল জু-দার্শনিকই তাঁর অন্ধ অনুবর্তন করতেন এমন নয়, নিজ গণ্ডির মধ্যে তাঁদের মতভেদ ছিল। মেং কো-র মত সুং জু-ও ছিলেন 'জু'-দার্শনিক, কিন্তু তিনি কনফুসীয় দর্শনের অন্যরূপ ভাষ্য করেছিলেন, আমরা এখন তাঁর সেই ভাষ্যের বিবরণ দেব।

সুন জু

মেনসিয়াসের সমকালীন, তাঁরই শিষ্য ছিলেন দার্শনিক সুং জু, যেমন প্লেটোর শিষ্য আরিস্টটল। গুরুশিষ্য প্লেটো আরিস্টটলের মধ্যে দর্শন বিষয়ে

মতের অনৈক্য সর্বজনবিদিত, তেমনি সুন জু ও মেনসিয়াস প্রচার করেছিলেন দুটি পরস্পরবিরুদ্ধ মতবাদ। শুধু যে মেনসিয়াসের সঙ্গে সুন জু-র মতান্তর ঘটেছিল তা নয়, একটি প্রবন্ধে তাঁর শক্তিমান লেখনী দ্বাদশজন দার্শনিকের ওপর অগ্নিবর্ষণ করেছিল, সেসব ব্যক্তির মধ্যে ছিল তাও-পন্থী, মো-পন্থী ও আইন-সেবী। প্রত্যেক মনীষীর জন্য তাঁর ছিল বাছাই-করা এক-একটি বর্শাফলক, যা দিয়ে তাঁকে তিনি সংক্ষেপে বিদ্ধ করতেন। এমনি সব টিপ্পনী কাটতেন তিনি মো-তি, চুয়াংৎসি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দার্শনিকদের সম্বন্ধে ঃ মো-তি মানুষের সংস্কৃতিকে অবজ্ঞা করেছেন, তিনি ঝুঁকেছেন প্রয়োজনের দিকে, আর চুয়াংৎসি মানুষের দিকে না তাকিয়ে নিসর্গ-প্রকৃতির মোহে আবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। সুন জু বলেন, "যারা আংশিক জ্ঞান লাভ করেছে তারা সত্যপথের একাংশ মাত্র দেখতে পায়, সত্যের সমগ্র রূপ তাদের কাছে ধরা পড়ে না। তাই তো তারা বর্ণনার চাকচিক্যে আংশিক সত্যকে সাজিয়ে-গুজিয়ে বিভ্রান্ত করে যেমন নিজেদের তেমন আর সকলকে।" সকল দার্শনিককে এমনি যথেচ্ছভাবে এলোপাথাড়ি আঘাত করার দরুন তিনি তাঁদের অপ্রিয় হয়ে পড়েছিলেন, সে কথা বলাই বাহুল্য।

লাওৎসির মত সুন বিশ্বাস করতেন, 'স্বর্গ' অর্থাৎ পরমার্থ বিশ্ব-প্রকৃতির অপরিবর্তনীয় নিয়মাবলী (তাও) ছাড়া আর কিছু নয়, এবং সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রের গতি, ঋতুর আবর্তন প্রভৃতি সকল রকম পরিবর্তন সেই প্রাকৃতিক বিধানের অনুবর্তন মাত্র। সুন বলেন, "আমরা পরিবর্তনের ফল জানি, কিন্তু পরিবর্তনের মূলে যে সক্রিয় শক্তি বিরাজ করে তার যথার্থ স্বরূপ আমাদের অজ্ঞাত। বস্তুত স্বর্গের ক্রিয়া-পদ্ধতির সন্ধান কোন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি করেন না।" স্পষ্টই দেখা যায়, সুন ছিলেন অজ্ঞেয়বাদী (agnostic), পরমার্থতত্ত্ব তাঁর ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। তিনি বিশ্বাস করতেন, জীবনের ভাল-মন্দ, সমৃদ্ধি-দুর্দশা সব-কিছুর জন্য মানুষ নিজেই দায়ী, মানুষ যদি সত্যের পথ ধরে জীবনযাপন করে তবে স্বর্গ তাকে দুর্বিপাকের আবর্তে কখনো নিক্ষেপ করেন না, প্লাবন, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি কোন নৈসর্গিক উৎপাত ঘটে না, আকাল, দুর্ভিক্ষও দেখা দেয় না। পক্ষান্তরে মানুষ যদি কর্তব্যনিষ্ঠ না হয়, কিংবা জীবনের প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজে লিপ্ত থাকে তবে স্বর্গও তাকে কোনও সাহায্য করতে পারেন না। প্রার্থনা বা পূজার কোন সার্থকতা নেই। স্বভাবের

নিয়মে যথাকালে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টির জন্য পূজা-প্রার্থনা বৃথা। তিনি ছিলেন সকল রকম কুসংস্কারের বিরোধী, ভাগ্য-গণনায় তাঁর কোন বিশ্বাস ছিল না, মানুষের ভাগ্য নির্ভর করে মানুষের পুরুষকারের ওপর। ভূত-প্রেত, দেবতা-অপদেবতা মানুষের কল্পনার সৃষ্টি। যে ব্যক্তি বাতের ব্যারাম থেকে মুক্তি পাবার জন্য কুসংস্কারবশত ভূত-প্রেতের প্রীত্যর্থে ঢাক-ঢোল পেটায় আর শুয়োর বলি দেয় তাকে ব্যঙ্গ করেছেন তিনি এই বলে যে, মূর্খটা শুযোরও খোয়ায়, ঢাকেরও ক্ষতি হয়, কিন্তু ব্যারাম তার যেমন-কে-তেমন থেকে যায়!

অতিপ্রাকৃত ঘটনায় বিশ্বাস ও বৃথা চিন্তার বিরুদ্ধে সুনের অভিযান চীনাদের চিত্তে ধর্ম-কর্ম সম্বন্ধে এমন একটি বিরূপ ভাব জাগিয়ে তুলেছিল যার ঘোর তারা কোন দিন কাটাতে পারে নি। পিতৃপূজা অবশ্য লুপ্ত হয় নি, তবে সে পূজা চলেছিল সামাজিক অনুষ্ঠানরূপে, পূর্বপুরুষের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য যেমন, ধর্মকর্মের জন্য তেমন নয়। ফল পুরোপুরি ভাল হয নি। পণ্ডিতেরা ধর্ম-কর্মে বিশ্বাস হারালেন বটে, কিন্তু নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত লোকদের ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে আগে থেকে যে কুসংস্কার শিকড গেড়ে বসেছিল তার আর উচ্ছেদ হল না, বরঞ্চ তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পেয়েছিল। অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি ছাড়া ধর্মচিন্তা বুদ্ধিজীবীদের মধ্য থেকে একরকম বিদায়ই নিয়েছিল, আর তা পুনরুজ্জীবিত হয নি কখনো, এবং কয়েক শতক পরে বৌদ্ধধর্মের আগমন ধর্মক্ষেত্রে যে আলোড়ন তুলেছিল তা-ও দীর্ঘস্থায়ী হয নি। বস্তুত চীনা সুধীগণের দৃষ্টি পরমার্থ-চিন্তা থেকে সেই যে সরে এসেছিল, আজ পর্যন্ত নানা অবস্থান্তরের মধ্যেও তার সে ভঙ্গীর কোন পরিবর্তন হয নি।

পূর্বে বলা হয়েছে, মেনসিয়াস ও সুন জু দুটি পরস্পরবিরুদ্ধ মতবাদ প্রচার করেছিলেন। মেনসিয়াস বলেছেন, মানুষের মূল প্রকৃতির মধ্যে সদ্‌গুণ নিহিত রয়েছে, পক্ষান্তরে সুন জু মনে করতেন মানব-প্রকৃতি মূলত মন্দ। পণ্ডিতমহলে এ দুটি মতবাদ নিয়ে দীর্ঘকাল তুমুল তর্কবিতর্ক চলেছিল, পরিণামে কিন্তু খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দে মেং কো-পন্থীরাই জয়যুক্ত হয়েছিল। সুন জু বলেন, "মানুষ মূলত মন্দস্বভাব, তার মধ্যে সদ্‌গুণ যেসব দেখা যায় সেগুলি শিক্ষার প্রভাবে অর্জিত হয়েছে। লাভের লালসা, স্বার্থপরতাই মানুষের আদিম প্রবৃত্তি, ঈর্ষা, ঘৃণা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ।

এই সহজাত প্রবৃত্তির অনুসরণ করলে সমূহ ক্ষতি এমন কি ধ্বংস অনিবার্য... সেইজন্যেই আচার্যগণের শিক্ষা ও আইন প্রণয়ন, 'লি' ধর্মের নির্দেশ ও ন্যায়ের বিধান প্রয়োজন।" তিনি আরও বলেন, "প্রাচীন রাজর্ষিরা ('Sage Kings') মানব-প্রকৃতির কপটতা, উচ্ছৃঙ্খল বিদ্রোহপ্রবণতার বিষয় জেনেই শাসন-ব্যবস্থা প্রণয়ন করেছিলেন। ন্যায় ও 'লি' ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন মানবচরিত্রের সংস্কারের জন্য, দেশের সুশাসন ও সমৃদ্ধির জন্য শাস্তির বিধান করেছিলেন।" এখানে বলা বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক নয় যে দু হাজাব বছর পর ইংরেজ দার্শনিক হব্‌স্‌ সুন জু-র এই মতবাদের হুবহু প্রতিধ্বনি করেছেন।

সে যুগের রাষ্ট্রে দ্বন্দ্ব, বিরোধ, দুর্নীতি, লালসার উচ্ছৃঙ্খল তাণ্ডব-নৃত্য দর্শন করে মানব-প্রকৃতিকে স্বভাবত মন্দ বলে মনে করা এমন কিছু বিস্ময়কর ছিল না। তা ছাড়া সুন জু ছিলেন ল্যানলিঙ্‌-এর একজন ম্যাজিস্ট্রেট, মানবচরিত্রেব কালো দিক এবং শাসন-মাহাত্ম্য নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই তাঁর অন্তরে দুরপনেয় ছাপ অঙ্কিত করে দিয়েছিল। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে সুন জু-র এই মতবাদ সমর্থনের উৎসাহ তাঁকে দর্শনলোকের ঊর্ধ্বে কবির কল্পনালোকে এনে হাজির করেছিল। স্বভাবত মন্দ মানব-প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্যই 'লি'র উদ্ভব, এই তত্ত্বটিকে ব্যক্ত করেছেন তিনি কবির উচ্ছ্বসিত ভাষায়, 'লি'র স্তুতিগান করেছেন তিনি এইরূপ: "লি পূর্ণ-স্বরূপ, সুষম মূর্ছনায় স্বর্গ ও মর্ত্য, জ্যোতির্মহিমায় সূর্য ও চন্দ্র, কাল-পাবম্পর্যে ঋতু চতুষ্টয়, গতি-চাঞ্চল্যে নক্ষত্রমণ্ডলী, ধারাপ্রবাহে নদী ও স্রোতস্বিনী, প্রকাশভঙ্গীতে পছন্দ-অপছন্দ, যথাযথভাবে (অর্থাৎ সজোরে) আনন্দ ও বিরক্তির অনুভূতি, সমাজের নিম্নস্তরে বশ্যতার অভিব্যক্তি, উচ্চস্তরে দীপ্ত বুদ্ধিমত্তার ঝলমলানি, অবিরাম সৃষ্টির মধ্যে সুশৃঙ্খলা, কেননা সৃষ্টির ঐক্যনাশের ক্ষতি অপূরণীয়।"

আমরা এখানে দেখতে পাই, মানুষের আদি প্রকৃতি সম্বন্ধে মেং কো ও সুন জু-র মধ্যে মতদ্বৈধ থাকলেও উভয় দার্শনিকই মানবচরিত্রের পূর্ণত্ব কামনা করেন, এবং 'লি'র বিধান পালনকেই পূর্ণত্বলাভের একমাত্র উপায় বলে মনে করেন। সুন জু-র চিন্তাধারা ছিল রক্ষণশীল, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে এমন নির্বিচারে গ্রহণ করেছিলেন, এমন অন্ধভাবে আঁকড়ে

ধরেছিলেন তিনি যে অনেকেই তাঁকে একজন প্রতিক্রিয়াশীল দার্শনিক বলে মনে করত। কনফুসীয় নীতির দুটি দিকের দুজন দিক্‌পাল ছিলেন মেনসিয়াস ও সুন জু, মেনসিয়াসের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল মানবিকতা-বোধের দিকে আর সুন জু ছিলেন বাহ্য অনুষ্ঠানাদির একনিষ্ঠ ভক্ত। কনফুসিয়াসের একটি শিক্ষার বিষয় ছিল সংগীত যা জীবনকে করে মধুময়। সংগীতের চর্চায় আত্মনিয়োগ করে সুন জু প্রভু কুং-এর বেদাঙ্গের একজন যথার্থ উত্তরসাধকের স্থান অধিকার করেছিলেন।

মো-তি বা মোৎ-জি

চীন দেশে দার্শনিকের আবির্ভাব হয়েছিল বিস্তর, কিন্তু ধর্মগুরু বলতে যা বোঝায় সেই অর্থে প্রকৃত ধর্মগুরু একজন মাত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁর নাম মো-তি। লাওৎসির মতই এই মনীষী দার্শনিকের জীবন-বৃত্তান্ত কুহেলী-সমাচ্ছন্ন, এমন কি তাঁর যথার্থ নাম ও পরিচয় পর্যন্ত আমাদের জানা নেই। 'মো'-শব্দ কোনো বংশের নির্দেশ দেয় না, উল্‌কির দাগ (tattoo) এই অর্থেই শব্দটির ব্যবহার। প্রাচীন কালে চীনে অপরাধীদের অঙ্গে উল্‌কির চিহ্ন অঙ্কিত করা হত। মনে হয় অপরাধের ইঙ্গিত করে অবজ্ঞাভরেই এই ধর্মগুরু ও তাঁর সংসারধর্মবিমুখ শিষ্যদের 'মো' বা 'মো-পন্থী' নামকরণ হয়েছিল। তেমনি 'তি' শব্দের অর্থ পক্ষীবিশেষের পালক, প্রবাদ এই যে গ্রামীণদের অনুকরণে এমনি পালকযুক্ত পরিচ্ছদ পরিধান করতেন বলেই তাঁর নামের সঙ্গে 'তি' শব্দটি জুড়ে দেওয়া হয়েছে, অবশ্য কথাটা ঠিক কিনা বলা কঠিন। তবে এ কথা হয়তো সত্য যে তিনি নীচ কুলে জন্মেছিলেন (সম্ভবত তাঁর জীবনকাল খৃঃ পূঃ ৪৪১-৩৭৬), এবং এই নীচ কুলে জন্মের বৃত্তান্তটি স্মরণ করলে তাঁর দর্শনতত্ত্বের কয়েকটি দুর্বোধ্য অংশ নূতন আলোকে প্রতিভাত হয়। কথিত আছে, তিনি প্রথমে কনফুসীয় নীতিশাস্ত্রে শিক্ষালাভ করেন, কিন্তু জু-দর্শন তাঁকে পরিতৃপ্ত করতে পারে নি, কেননা সে দর্শন উচ্চশ্রেণীবিশেষের দর্শন। তিনি একটি নূতন শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত করেন, এবং সেখানে যে নব দর্শনের আবির্ভাব হয়েছিল তারই নাম 'মো-তত্ত্ব'।

জু-দর্শন ও মো-তত্ত্ব মূলত বিভিন্ন হলেও একটি বিষয়ে উভয়ের মধ্যে মতের

মিল দেখা যায়। পৌরাণিক নৃপতিদের প্রতি শ্রদ্ধা চীনের মজ্জাগত, তাঁদের প্রশস্তি-কীর্তনে কনফুসিয়াস ছিলেন পঞ্চমুখ, বিশেষত সিয়া বংশের প্রতিষ্ঠাতা ইউ-কে তিনি বিশেষভাবে প্রশংসা করেছেন। এই নৃপতি ছিলেন পরহিতব্রতী, প্লাবনের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করেছিলেন, তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি দান করেছেন যেমন কনফুসিয়াস তেমনি মো-তি। ইউ-র স্বার্থ-ত্যাগ, কৃচ্ছ্র-সাধন, কর্মানুরাগ ও কর্তব্যনিষ্ঠার মহান আদর্শকে গ্রহণ করে মো-তত্ত্ব স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে লাওৎসি প্রবর্তিত তাও-দর্শন হতে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে রূপায়িত হয়ে উঠেছিল। আমরা দেখেছি, তাও-তত্ত্ব কেমন মনুষ্যরচিত আইনকানুনকে ঘৃণাভরে উপেক্ষা করতে শিক্ষা দেয়, কিন্তু মো-তত্ত্বের বিশেষত্ব আইনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা। মো-পন্থীর সংযত চিত্ত সামাজিক বিধানগুলিকে যেরূপ শ্রদ্ধার চোখে দেখে থাকে তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় একটি কথিকায়ঃ চি'ন রাষ্ট্রের জনৈক মো-পন্থীর পুত্র হত্যার অপরাধে মৃত্যু-দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল। তখন চি'ন-রাজ সেই ব্যক্তির পিতার মর্যাদা বিবেচনা করে তার প্রাণদান করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পিতা রাজাকে নিরস্ত করলেন এই বলে যে আইনকে উপেক্ষা করে অপরাধীর প্রতি করুণা প্রদর্শন অনুচিত।

তাও-তত্ত্বের মত কনফুসীয় নীতিধর্মকেও মো-তি অভিজাত শ্রেণীর কল্পনা-বিলাস বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বস্তুত মো-তি তাঁর মতবাদকে কৃচ্ছ্র-সাধন ও নিয়মানুবর্তিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত করেই ক্ষান্ত হন নি, তিনি নিজে এবং তাঁর অনুগত ব্যক্তিরা দরিদ্র জনসাধারণের পর্যায়ে নেমে তাদের মতই নিশিদিন কায়িক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকা অর্জন করতেন, আর পরিধান করতেন তাদের মোটা কাপড়, খড় দিয়ে তৈরি স্যাণ্ডেল। কনফুসিয়াসের প্রতি কটূক্তি বর্ষণ করতে কার্পণ্য করেন নি তিনি। 'ভাঁড়', 'ভণ্ড' এরূপ বাছাই-বাছাই বাক্য ব্যবহার করে বলেছেন, কনফুসিয়াস যখন অভুক্ত অবস্থায় কালযাপন করতেন আর তাঁর শিষ্যরা চুরি-ডাকাতি করে তাঁর আহার্য ও পানীয় মদ্য সংগ্রহ করত, তিনি তখন জিজ্ঞাসাও করেন নি কোথা থেকে কেমন করে পানাহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু আহারাদির পর যেমন মিটল তাঁর ক্ষুধা অমনি তিনি নীতিনিষ্ঠ সাধুতার বাহ্যাড়ম্বর শুরু করে দিলেন! কনফুসীয়-পন্থীদের বিদ্রূপ করে বলতেন মো-তি, তারা ঘণ্টাবিশেষ, আঘাত কর তবেই বাজবে নইলে চুপ করে থাকবে।

কনফুসীয় বিধানমত সংগীত ছিল একটি শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, কিন্তু মো-তি সংগীত-চর্চাকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন। তিনি বলেন, "নদী পার হবার জন্য নৌকার প্রয়োজন, স্থলপথে শকটের প্রয়োজন। নৌকা ও শকট নির্মাণের জন্য ব্যয় সার্থক। বাদ্যযন্ত্রের যদি তেমন কোন ব্যবহারিক উপযোগিতা থাকত তা হলে বাদ্যযন্ত্রের নির্মাণের জন্য অর্থ ব্যয় করতে আমার কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু মানুষের আছে ত্রিবিধ তাপ, উদরে নেই অন্ন, পরিধানে নেই বস্ত্র, তার ওপর অবিশ্রাম অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয়। বাদ্যযন্ত্রে ঝংকার দিলে কি অন্নবস্ত্রের সংস্থান হয়?· · আমি বলি গীতবাদ্য একেবারেই নিষ্প্রয়োজন।" বেশ বোঝা যায়, মো-তি গীতবাদ্যকে অভিজাতবর্গের বিলাস বলেই মনে করতেন। গীতবাদ্যের অনুশীলন জনসাধারণের পক্ষে একটি ক্ষতিকর ব্যাধির মতই, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। সেই সঙ্গে তিনি নৃত্য, সূচিকর্ম প্রভৃতি শিল্পের চর্চা থেকে বিরত থাকতে সকলকে উপদেশ দিয়েছেন, কারণ এসবও আভিজাত্যের ব্যসন। কিন্তু মো-তির সবচেয়ে তীক্ষ্ণ শর বর্ষিত হয়েছিল কনফুসীয় বিধানের শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানসমূহের বাহ্যাড়ম্বর লক্ষ্য করে। রাজার মৃত্যু উপলক্ষে তিন বৎসর-কাল শোক প্রদর্শনের নিয়ম পালন এবং পিতৃশ্রাদ্ধাদিতে ব্যয়-বাহুল্যের ঘোর প্রতিবাদ করে তিনি বলেছেন: "সাধারণ মানুষের বেলায়ও দেখা যায় পিতৃশ্রাদ্ধের ব্যয় পরিবারটিকে ভিক্ষুকে পরিণত করে। কিন্তু যখন কোন রাজার মৃত্যু ঘটে তার সঙ্গে প্রোথিত করা হয় সোনা, মুক্তা, বহুমূল্য মণিরত্ন, অশ্ব, রথ, তার দেহটিকে জড়ানো হয় সূক্ষ্ম কাজ-করা মিহি বস্ত্র দিয়ে, সমাধিকক্ষে রাখা হয় নানান তৈজসপত্র, টিপয়, ঢাক, জালা, বাটি, হাতীর দাঁতের ও চামড়ার জিনিস, তলোয়ার, পর্দা, নিশান ইত্যাদি। ফলকথা সমাধি দান করতে রাজার তোশাখানা সম্পূর্ণ নিঃশেষ হয়ে যায়।" মো-তি বলেন, ব্যয়বাহুল্যের জন্য দেশের দৈন্য স্বর্গের অভিশাপ ডেকে এনে জনগণের অশেষ দুর্দশার কারণ হয়ে ওঠে।

মো-তি একজন ধর্মগুরু এইজন্য যে তাঁর দর্শনতত্ত্বে স্বর্গ বা ঈশ্বরকে একটি বিশিষ্ট মঞ্চের ওপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। স্বর্গ সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ, বিশ্বের সর্বত্রই তাঁর দৃষ্টি, মানুষের ভাল-মন্দ সব কাজই তিনি দেখেন এবং কর্মানুসারে তার পুরস্কার বা শাস্তির বিধান করেন। মো-তি বলেন,

"স্বর্গ যা অনুমোদন করেন তা-ই শ্রেয় আর তিনি যা প্রত্যাখ্যান করেন তা-ই মন্দ।" বলা বাহুল্য মো-তির এই ধর্মতত্ত্বে শাস্তি-পুরস্কারের বিধানটি ছিল এমন একটি আবেদন যা সহজেই অজ্ঞ জনসাধারণের মর্ম স্পর্শ করে। তা ছাড়া মো-তি নিজে ছিলেন নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তি, সেজন্য তাঁর বহুঘোষিত তত্ত্বটিকে সাধারণ মানুষ শ্রদ্ধাভরে গ্রহণ করেছিল।

কিন্তু ধর্ম প্রচারই ছিল মো-তির প্রধান উদ্দেশ্য, এ কথা মনে করলে মো-তত্ত্বের অপব্যাখ্যা করা হয়। বস্তুত ধর্মকে তিনি ইহজগতের কাজ-কর্মে মানবিকতা-বোধ জাগিয়ে তুলবার জন্যেই ব্যবহার করেছিলেন। মো-তি ছিলেন একজন কর্মযোগী, জনসেবা ছিল তাঁর মহাব্রত। এই মহাব্রত উদ্‌যাপন সম্ভব হয় সর্বজনীন প্রেমধর্মকে আশ্রয় করে। সামাজিক অনুষ্ঠান, পারিবারিক সদাচার ও রাজা-প্রজার সম্বন্ধকে কেন্দ্র করে যে নীতিধর্ম গড়ে তুলেছিলেন কনফুসিয়াস তার বহু ঊর্ধ্বে সর্বজনীন প্রেমধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন মো-তি। তিনি বলেন, "আত্মবৎ ব্যবহার করবে বন্ধুর সঙ্গে, নিজের পিতার মত শ্রদ্ধা করবে তাদের পিতাকে···ক্ষুধার্ত বন্ধুকে খাদ্য দেবে, শীতার্তকে পরিচ্ছদ। রুগ্ন বন্ধুর সেবা করবে আর মৃত বন্ধুকে করবে প্রোথিত।" মো-তি বিশ্বপ্রেমিক কিন্তু তাঁর সেই প্রেম মাটির পৃথিবীকে ছেড়ে আকাশে বিচরণ করে না। বিশ্বপ্রেমের স্বরূপ কি, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "অন্যের অবস্থাগুলিকে নিজের অবস্থা বলে মনে করা, অন্যের গৃহকে নিজের গৃহ বলে চিন্তা করা এবং অন্যকে নিজের প্রতিরূপ বলে কল্পনা করা। সামন্ত-রাজগণ পরস্পরকে ভালবাসলে আর যুদ্ধ বাধে না, গৃহস্থরা পরস্পরকে ভালবাসলে কেউ কারু অনিষ্ট সাধন করে না।···বিশ্বজন যখন পরস্পরকে ভালবাসবে প্রবল তখন দুর্বলকে নির্যাতন করবে না, সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘুকে দলিত করবে না, ধনী দরিদ্রকে অশ্রদ্ধা করবে না।···বিশ্বপ্রেমের কল্যাণে সকল দুর্দৈব, দ্বন্দ্বকলহ, হিংসাদ্বেষ দূর হবে।" খৃস্টজন্মের চার শ' বছর পূর্বে প্রচারিত মো-তির এই মহাবাণীর মধ্যে খৃষ্টীয় প্রেমধর্মের পূর্বাভাস পাওয়া যায়।

কনফুসিয়াসের ভাষ্যকার মেনসিয়াসের কোন আকর্ষণ থাকবার কথা নয় মো-তির প্রতি, কেননা মো-তত্ত্বের প্রসার কনফুসীয় শিক্ষাদীক্ষাকে বিপন্ন করে তুলেছিল। কিন্তু মেনসিয়াসকেও স্বীকার করতে হয়েছিল যে মো-তি গভীরভাবে চিন্তা ও কঠোর সাধনা করেছেন জগতের কল্যাণের জন্য।

মো-তি আক্রমণাত্মক যুদ্ধেব বিরোধী, যুদ্ধ বাধলে ভূমিকর্ষণ, বীজবপন, ফসল সংগ্রহ এইসব কাজের ক্ষতির কথা, নাগরিকগণেব সমূহ বিপদের কথা বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন তিনি। এই ধর্মগুরুর প্রভাব জনগণেব চিত্তে যথেষ্ট বিস্তার লাভ করেছিল, তার প্রমাণ হুইনান-সি-র এই উক্তিটি: "মো-তির এক শ' আশিজন শিষ্য তাঁর আদেশে অবলীলাক্রমে জলন্ত আগুনে প্রবেশ করতে পারত, তীক্ষ্ণধার ছুরির ওপর দিয়ে হাঁটতে পাবত, এমন কি মৃত্যুকেও বরণ করতে সংকুচিত হত না।" কিন্তু এমন জনপ্রিযতা সত্ত্বেও অতি অল্প সময়ের মধ্যে মো-তত্ত্বের অন্তর্ধান সত্যই একটা বিস্ময়কর ব্যাপাব। মেনসিয়াসেব একনিষ্ঠ প্রচারকার্য বোধ করি তাব একটি কারণ, কিন্তু এমন কথাও বলা যেতে পাবে, নীতিবোধ থাকা সত্ত্বেও চীনারা ধর্মপ্রবণ জাতি কোন কালেই ছিল না, তাই মো-তির ধর্মশিক্ষা জাতীয় চবিত্রে শিকড় গাড়তে পারে নি। সেই সঙ্গে এই গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ব্যাপারটিও মনে রাখা দরকার যে হ্যান-নৃপতিগণ কনফুসীয নীতিধর্মকে রাষ্ট্রধর্মেব আসনে প্রতিষ্ঠিত কবেছিলেন এবং সেজন্যেই সম্ভবত মো-তির শিক্ষার প্রভাব নষ্ট হযে গিযেছিল।

টেং সি

কনফুসিযাসের বযস যখন অল্প তখন টেং সি (খৃঃ পূঃ ৫৩০) নামক জনৈক মনীষী তত্ত্বপ্রচার কাযে রত ছিলেন। ভাল ও মন্দ আপেক্ষিক সত্য মাত্র এই তত্ত্বকথার সমর্থনে অফুরন্ত যুক্তির অবতারণা করেছিলেন তিনি। যুক্তিগুলি পরস্পরবিরুদ্ধ, বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক জেনো (Zeno)-র যুক্তিতর্কের অনুরূপ। একদিন তিনি একটি বিষয় প্রমাণ করতেন, পরদিন উল্টা তর্ক দ্বারা বিপবীত প্রস্তাব সমর্থন করতেন। তাঁব সম্বন্ধে একটি কৌতুকপ্রদ কথিকা আছে: কোন সামন্ত-রাজ্যে একজন ধনী ব্যক্তির জলমগ্ন হযে মৃত্যু ঘটে, তখন মৃতের দেহ নিজের জিম্মায রেখে একজন লোক উত্তরাধিকারীদের কাছে প্রচুর অর্থ দাবি করে মৃতদেহ প্রত্যর্পণের মূল্যস্বরূপ। শোকাভিভূত পরিবারবর্গ টেং সি-র কাছে পরামর্শ নিতে এল। তিনি বললেন, "চুপ করে বসে থাক তোমরা। ও মৃতদেহের জন্য অন্য কোন পরিবার মূল্য দেবে না।" তারপর এল মূল্যের দাবিদাব বিজ্ঞোচিত পরামর্শের জন্য। তখন দাবিদারকে বললেন তিনি, "চুপ করে বসে থাক। ওই মৃতদেহ ওরা তো আর অন্য কোথাও

পাবে না।" কথিকাটি সম্ভবত বিরোধী পক্ষের ব্যঙ্গরচনা। টেং সি ছিলেন চি'ন-এর ডিউকের প্রজা। একটি আদর্শ দণ্ডবিধি প্রণয়ন এবং সেই সঙ্গে প্রশাসনের বিরুদ্ধ সমালোচনা করে তিনি ডিউকের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। প্রধান মন্ত্রী তখন তাঁর প্রচারকার্য বন্ধ করে দিলেন। টেং নাছোড়বান্দা, প্রতি গৃহে নিজে গিযে প্রচারপত্র বিতবণ করতে লাগলেন। পরিশেষে তাঁর শিরশ্ছেদ কবে এই অপরিসীম উদ্যোগ-উৎসাহেব ওপব যবনিকা টেনে দেওযা হয়।

ইয়াং চু

এই দার্শনিকের রচনা এখন সামান্যই অবশিষ্ট আছে, কিন্তু মেনসিযাসেব কালে তাঁর মতবাদেব বিস্তর প্রচলন ছিল। "যুধ্যমান রাষ্ট্র"-যুগে তাঁব আবির্ভাব। সমাজের দুঃখদৈন্য তখন এমনি ভীষণ আকাব ধাবণ কবেছিল যে চবম স্বার্থপরতাকে পবম মানবধর্মে উন্নীত কবতে ইযাং চু এতটুকু সংকোচ বোধ কবেন নি। ভালমন্দ, ধর্মাধর্ম অর্থহীন শব্দ মাত্র। মনুষ্য-সমাজের সঙ্গে, সমাজেব ইষ্টানিষ্টের সঙ্গে সাধু মনীষীব কোন সম্পর্ক নেই। তাও-পন্থীর মত নৈষ্কর্ম্যই তাঁর আদর্শ, কিন্তু বিষয়-বৈরাগ্যে তিনি তাও-পন্থীদেবও অতিক্রম করেছেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে আত্মসুখপরাযণ, সমাজকে রক্ষা বা ধ্বংস কোনটিব জন্যই তিনি তাঁব কড়ে আঙল তুলে ধববেন না। এই তত্ত্বটি কনফুসীয় নীতিধর্মেব সম্পূর্ণ বিপরীত, সেইজন্যেই সম্ভবত চীনা সমাজে ইয়াং চু দর্শনেব স্থান দীর্ঘকাল টিঁকে থাকতে পাবে নি।

হান-ফেই ও 'লেজিস্ট' সম্প্রদায় (ফা চিযা)

দার্শনিক সুন জু-ব ছাত্র ও পদাঙ্ক অনুসবণকারী হান-ফেই যে বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করে যান সেই সম্প্রদাযেব নাম 'লেজিস্ট' (ফা চিয়া) বা আইন-সেবী সম্প্রদায। কোন দর্শনতত্ত্বেরই ভক্ত নয এই সম্প্রদায, বরঞ্চ লেজিস্টদেব দৃঢ় অভিমত এই যে দার্শনিক তর্কবিতর্ক বৃথা ও অনিষ্টকব। সমাজ সংস্কারকল্পে আদর্শ তত্ত্বকথা প্রচার সম্পূর্ণ নিবর্থক, যেহেতু দার্শনিক সুন জু-র মত তাঁদেরও বিশ্বাস ছিল, মানবচরিত্র মূলত ভাল নয, মন্দ। হান-ফেই লিখেছেন, "স্বভাবত ঋজু একটি তীরের জন্য অপেক্ষা করলে তোমাকে হাজার পুরুষ বসে থাকতে হবে। স্বভাবত গোলাকৃতি একখণ্ড কাষ্ঠের জন্য

অপেক্ষা করলে তোমাকে হাজার পুরুষ বসে থাকতে হবে। কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ রথে চড়ে বেড়ায়, তীর ছুঁড়ে শিকার করে। সে কেমন করে হয় তা জান? মানুষ তার যন্ত্রপাতির প্রয়োগে কৃত্রিম উপায়ে জিনিসগুলিকে বিশিষ্ট আকার দান করে।" এমনি সব উপমার যুক্তি দ্বারা লেজিস্টরা প্রমাণ করেন, আইন ও রাজশক্তি দ্বারা সমাজকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখাই শ্রেয়। দণ্ডের ভয়ে মানুষ দুষ্কর্ম থেকে বিরত থাকবে, আর সৎকর্ম করবে পুরস্কারের লোভে, এইরূপে সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষা হবে।

প্রাচীন ঐতিহ্যকে অবজ্ঞা করে অভিজাত বংশীয় হান-ফেই তখনকার দিনে যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। কনফুসীয় বিধানমত প্রাচীন কালের রাজা ইয়াও ও স্থন-এর পূজার তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেছেন, "সিয়া বংশীয়দের আমলে (বিস্মৃতপ্রায় অতীতের রীতি অনুসারে) কেউ যদি বৃক্ষাবাস নির্মাণ করত তবে সে নিশ্চয়ই হাস্যাস্পদ হত। বর্তমান কালে যিনি ইয়াও স্থন উ প্রভৃতি প্রাচীন নৃপতিগণের গুণে অভিভূত হয়ে পড়েন তিনিও তেমনি উপহাসের পাত্র।" এই প্রসঙ্গে গল্পচ্ছলে উপদেশ দিয়েছেন তিনি: স্থু প্রদেশের কোন কৃষক হঠাৎ আবিষ্কার করল, একটি প্রাচীন ক্ষয়িষ্ণু বৃক্ষের তলে একটি মরা শশক পড়ে আছে। সে তখন এই মনে করল যে বৃক্ষটির এমন কোন আশ্চর্য গুণ আছে যার দ্বারা শশককুল আকৃষ্ট হয়, আর তারা তখন ছুটে এসে বৃক্ষকাণ্ডে মাথা কুটে মরে। কৃষক আনন্দে অধীর হয়ে কৃষিকর্ম ছেড়ে সেখানে অপেক্ষা করতে লাগল এই ভরসায় যে এক সময়ে সে আর একটি মাথা-কুটে-মরা খরগোশ কুড়িয়ে পাবে। বলা বাহুল্য, তার সে আশা পূর্ণ হয় নি, শুধু সময় নষ্টই সার হল। উপসংহারে হান ফেই বললেন, "বর্তমান কালে তুমি যদি প্রাচীন পদ্ধতিমত প্রজা শাসন করতে চাও, তা হলে তোমার অবস্থা মৃত শশক লাভের উদ্দেশ্যে প্রাচীন বৃক্ষমূলে অপেক্ষমাণ মূর্খ কৃষকের মতই হবে।" কাহিনীটিতে লেখকের শুধু রচনা-শক্তি নয়, চিন্তার অভিনবত্বও চমৎকার ফুটে উঠেছে। এই উপদেশবাণী স্মরণ রাখবার প্রয়োজন বোধ করি আজও ফুরিয়ে যায় নি।

হান-ফেই-র রাজনৈতিক আদর্শ ছিল প্রচলিত সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ এবং একচ্ছত্র রাজার অধীনে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। দণ্ড-পুরস্কারের কর্তা রাজা আইনমত শাসন করবেন, সেই আইন ধনী বা নির্ধন, পদস্থ বা

অ-পদস্থ সকলের প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য, "দোষের জন্য মন্ত্রীরা দণ্ড থেকে অব্যাহতি পাবেন না, আবাব সাধারণ ব্যক্তিও সৎকর্মের পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হবে না।" আইনের উর্ধ্বে অবস্থান করবেন একটিমাত্র ব্যক্তি, তিনি রাজা স্বয়ং। তিনিই আইনের রচয়িতা, সর্বপ্রকার প্রভুত্বের উৎস-মূল। সর্বাধিনায়ক রাজা সর্বময় কর্তৃত্ববলে সামন্তিক দ্বন্দ্ববিবোধ ও বিশৃঙ্খলার অবসান ঘটাতে পারেন। সামন্ততন্ত্রের উৎসাদনের জন্য প্রয়োজন প্রাচীন প্রতিষ্ঠানসমূহ নীতি আচারানুষ্ঠান ইতিহাস সাহিত্য, এই যে বিষযগুলি ছিল কনফুসিযাসের অত্যন্ত প্রিয, সেসবই হেলাভরে আবর্জনারাশির মধ্যে নিক্ষেপ। পিতৃভক্তি প্রভৃতি পারিবারিক নীতিধর্মের নির্বিচার অন্ধ আচরণের মত পদ্য, সংগীত ও অনুষ্ঠানাদিও বর্জনীয, যেহেতু এসব বিষযের চচা অপেক্ষা কৃষিকার্য ও যুদ্ধবিদ্যাব ব্যবহারিক মূল্য বেশি। 'আইন-সেবী'দের রোষ সবচেযে তীব্রভাবে পডেছিল কনফুসীয পণ্ডিতদেব ওপব। তারা 'কথার ঝুডি' ('glib-tongued'), ফাঁকা কথাব বৃথা প্রতিযোগিতায কালক্ষেপ করে এবং পবেব অর্জিত অর্থে অথবা রাষ্ট্রের দানে জীবনধারণ করে। এইরূপে কনফুসীয পণ্ডিতদের হান ফেই পরগাছা বা 'প্যারাসাইট'-এর পর্যাযভুক্ত করে তাদেব প্রতি পবম বিদ্বেষ জাগিযে তুলেছিল।*

অতিমাত্রায কোন জিনিস ভাল নয। প্রাচীনের প্রতি লেজিস্টদের অতিমাত্র বিদ্বেষেব পরিণাম অত্যন্ত অশুভ হযেছিল। আমরা এখনি দেখতে পাব লেজিস্টগণ কর্তৃক প্রভাবিত হযে চি'ন বংশের প্রথম সম্রাট সি হুয়াং তি কনফুসীয় নীতিশাস্ত্র ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থ নিঃশেষে ধ্বংস কবেছিলেন। কথিত আছে, হান-ফেই সম্রাট সি হুযাং তি-র প্রিযপাত্র হয়ে উঠেছিলেন, এবং সেজন্য ঈর্ষান্বিত হযে তাঁবই প্রাক্তন সহপাঠী রাজমন্ত্রী লি-স্যু তাঁকে গোপনে বিষপ্রয়োগে হত্যা কবেন।

'শত দর্শন শিক্ষাযতনে'র কযেকজন মনীষীর দর্শনতত্ত্ব নিয়ে এই ঈষৎ দীর্ঘ আলোচনার সার্থকতা বোধ করি অনস্বীকার্য, যেহেতু চীনা সংস্কৃতি

* আধুনিক কালে চীনের নব্য সমাজেও একটা জিগির উঠেছে, 'নিপাত যাক কুং এণ্ড কো (Down with K'ung & Co.)। জিগিরটি পুরাকালের হান-ফেই দলের মতবাদেরই একটি ক্ষীণ প্রতিধ্বনি, এই আলোচনা থেকে তা স্পষ্টই বোঝা যায়।

এ যুগের দর্শনের মধ্যে শিকড় গেড়ে এত কাল বর্ধিত হয়েছে। 'শত দর্শনে' নানা চিন্তার উন্মেষ একটি আকস্মিক ব্যাপার নয়, দেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফল। প্রথম অবস্থায় চীনা সামন্ত-রাজ্যগুলি গ্রীসেব নগর-রাষ্ট্রের অনুরূপভাবেই বৃদ্ধি লাভ করেছিল, পরস্পরের মধ্যে সাংস্কৃতিক সংযোগ ছাড়া যোগসূত্র ছিল সামান্যই। দর্শনসমূহ ও দার্শনিক চিন্তাধারার একমাত্র লক্ষ্য ছিল একটি সূত্রের আবিষ্কার যার দ্বারা বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয় সম্ভব হয়। উভয় দেশের দার্শনিকগণ সৃষ্টিতত্ত্ব ও মানবজীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন, কিন্তু ঐসব গবেষণার মূল্য যেমন হোক, গ্রীস বা চীন কোথাও তারা রাষ্ট্রীয় সমস্যার সমাধান করতে পারেন নি। গ্রীস যেমন উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধপ্রিয় জাতি কর্তৃক অধ্যুষিত হয়েছিল, পূর্ব চীনের সুসভ্য রাষ্ট্রগুলিও তেমনি পশ্চিম প্রত্যন্তের দুর্ধর্ষ যোদ্ধা জাতির নির্মম আইনশৃঙ্খলাব চাপে একেবারে পিষে গিয়েছিল।

সমকালীন গ্রীসেব সঙ্গে চীনা ইতিহাসের সাদৃশ্যেব কথা এখানেই শেষ কবতে হয়। তারপরই চোখে পড়ে উভয়ের মধ্যে বিরাট প্রভেদ। সভ্যতার সু-উচ্চ চূড়ায় উঠে অতি অল্প সময়ের মধ্যে গ্রীস সাহিত্য-শিল্প-বিজ্ঞানের চর্চায় সংস্কৃতিকে অশেষ প্রকারে সমৃদ্ধ করে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। পক্ষান্তরে চীনা সভ্যতার বিশেষত্ব এই যে তার মধ্যে নেই হাউই-বাজির চমৎকারিত্ব, তার অগ্রগতি ধীর মন্থর। বহু শতাব্দী ধরে একটির পর একটি রাজবংশের রাজত্বকালে নব নব সৃষ্টির উন্মেষ অপরূপ প্রতিভার পরিচয় দিয়ে চলেছিল। গ্রীক সভ্যতাব যুগে চীনা সৃজনশক্তির পূর্ণ বিকাশ ঘটে নি। দর্শন-যুগেব বহু শতাব্দী পর চীন দেশে কাব্য, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের চরম উৎকর্ষ দেখা দিয়েছিল। গ্রীসের রাজনৈতিক আদর্শ গণতন্ত্র, গ্রীস গণতন্ত্রের পীঠস্থান। আর চীন দেশ রাজতন্ত্রের উপাসক, বাজতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা বিংশ শতাব্দীর পূর্বে কখনো ম্লান হয় নি। চীনে দার্শনিকদেব তর্কের বিষয় ছিল রাজতন্ত্র নয়, রাষ্ট্র-রূপও নয়, তাঁরা তর্ক করতেন রাজধর্ম নিয়ে। রাজার ব্যক্তিগত চরিত্র, কার্যাকার্যের নৈতিক দোষগুণ বিচার করে রাষ্ট্রেব মর্যাদা নির্ধারিত হত। এ কথাটি তাঁদের মনেও জাগে নি কখনো যে রাষ্ট্র-রূপের পরিবর্তন এবং গণতান্ত্রিক দায়িত্বের ব্যবস্থা উদার প্রশাসনের পথ মুক্ত করে দিতে পারে।

তৃতীয় পর্ব

প্রথম সাম্রাজ্য

১ চি'ন বংশ (খৃঃ পূঃ ২৫৫-২০৬)

সি হুয়াং তি ও মহাপ্রাচীর

পশ্চিম প্রত্যন্তের চি'ন নামে সামন্ত-রাজ্যটি এক অর্ধবর্বর জাতির বাসভূমি ছিল। প্রাচীন সভ্যতার বন্ধনে দৃঢ়ভাবে বাঁধা পড়ে নি এই জাতির মানুষ, অতীতের ঐতিহ্য ও রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধাও তাদের তেমন ছিল না, সেজন্য 'আইন-সেবী'দের নূতন আদর্শকে গ্রহণ করবার পক্ষে কোন বাধা, প্রতিবন্ধক তাদের সামনে দেখা দেয় নি। 'ফা'র আদর্শমত চি'ন রাজ্যে অনেকগুলি সংস্কারকার্য করেছিলেন রাজমন্ত্রী স্যাং ইয়াং, যিনি ছিলেন 'স্যাং এর প্রভু' নামে পরিচিত, এবং তারই কর্মদক্ষতার গুণে প্রতিবেশী সামন্ত-রাজ্যগুলির মধ্যে চিন সর্বাপেক্ষা প্রতাপপ্রবল শক্তিমান হয়ে উঠেছিল। প্রাচীন প্রথায় পরিবারে পিতার শাসন রহিত করে জনসমাজে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন তিনি, কৃষি-সংস্কার দ্বারা পতিত জমি উদ্ধার করলেন, এবং সংগ্রাম-প্রবৃত্তির উৎসাহ দিয়ে একটি পরাক্রমশালী বাহিনী গড়ে তুললেন। স্যাং-এর প্রভুর সবশ্রেষ্ঠ কীর্তি, সকল অধিবাসীর প্রতি সমভাবে প্রযোজ্য নূতন আইনসমষ্টির প্রণয়ন। আইন-পালনের প্রতি তাঁর গভীর নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় এই ঘটনাটি থেকে: কোন ত্রুটির জন্য যুবরাজকে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর শিক্ষকের নাসাচ্ছেদ করেছিলেন। অবশ্য যুবরাজ এই অপমান বিস্মৃত হন নি, সিংহাসনে আরোহণ করে স্যাং-এর প্রাণদণ্ড দিলেন বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে। চারটি রথের সঙ্গে বেঁধে বিপরীত দিকে রথ চালিয়ে স্যাং-এর দেহখানা খণ্ড-বিখণ্ড করে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল।

স্যাং-প্রদর্শিত 'টোটেলিটারিয়ানিজম'-এর পথে সঞ্চরমাণ চি'ন শিষ্ট সদাচার বিসর্জন দিয়ে অচিরেই পর-রাজ্য গ্রাস করতে প্রবৃত্ত হল। একটি বিবরণে প্রসিদ্ধ হ্যান ঐতিহাসিক জুমা চিয়েন বলেছেন, রেশমের পোকা যেমন তুঁতপাতাগুলিকে একে একে ভক্ষণ করে তেমনিভাবে এই দুর্ধর্ষ

জাতি প্রতিবেশীদের নগর ও রাজ্য আত্মসাৎ করেছিল। খৃঃ পূঃ ২৫৫ অব্দে চৌ বংশীয় শেষ নৃপতি নান ওয়াং-এর মৃত্যুর পর চি'ন রাজ্যের ডিউক ওয়াং চেং সমগ্র দেশ জুড়ে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁর এই উদ্যম সর্বতোভাবে সফল হয়েছিল। চৌ বংশের বিলুপ্তির দশ বছর পর ২৪৬ খৃস্ট পূর্বাব্দে ভাবী কালের প্রথম চীন সম্রাট সি হুয়াং তি চি'ন রাজ্যের রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন, এবং তার অব্যবহিত পরেই হ্যান চাও চি ওয়েই চু প্রভৃতি সামন্ত-রাষ্ট্রগুলি একটির পর একটি আক্রান্ত হয়ে চি'ন কর্তৃক কবলিত হল। যুদ্ধোদ্যমের সর্বাত্মক সাফল্যের জন্য দিগ্বিজয়ী মহাবীর সি হুয়াং তি-কে 'চীনের নেপোলিয়ান' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

২২১ খৃস্ট পূর্বাব্দে চি'ন-রাজ ওয়াং চেং 'সি হুয়াং তি' অর্থাৎ 'প্রথম সম্রাট' এই পদবী গ্রহণ করেন। ইতিপূর্বে চৌ-রাজগণ নিজেদের কখনো 'হুয়াং তি' বা সম্রাট বলে প্রচার করেন নি, জনসমাজে তারা ছিলেন 'তি' বা রাজা নামে পরিচিত। চীন দেশের ইতিহাসে যে দুটি যুগান্তকর রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটেছে তার প্রথমটি সি হুয়াং তি-র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং সেইজন্যেই এই ঘটনাটি বিশেষ স্মরণীয়। দ্বিতীয় বিপ্লব ঘটেছিল ১৯১১ খৃস্টাব্দে যখন পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্র-চিন্তার সংঘাতের ফলে মাঞ্চু রাজত্বের অবসানের সঙ্গে রাজতন্ত্রের পরিবর্তে সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখানে বলা আবশ্যক যে আর একটি তৃতীয় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আমাদের চোখের সামনে ঘটছে, সেটি কম্যুনিস্ট বিপ্লব। এই শেষোক্ত বিপ্লবটির পরিণতি যে কিরূপ সুদূরপ্রসারী তা হয়তো আমরা অনুমান করতে পারি, কিন্তু তাকে ইতিহাসের মানদণ্ডে তুলে ধরবার সময় এখনো আসে নি। সে কথা যাক, চি'ন বংশের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকে যুগান্তকর বিপ্লব বলা হয়েছে তার কারণ দুটি—প্রথমত, সামন্ত-শাসন নির্মূল করে খণ্ড-রাজ্যগুলির একীকরণ, দ্বিতীয়ত, কনফুসীয় নীতিধর্মের উচ্ছেদ সাধন। ইতিহাসে কথিত আছে যে এই সংস্কারগুলির দ্বারা সি হুয়াং তি চেয়েছিলেন মহাচীন গঠন করে সেই সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাটরূপে স্বীয় বংশধরদের রাজত্ব দশ হাজার পুরুষ ধরে কায়েম রাখতে, কিন্তু দৈববিড়ম্বনা এমনি যে সম্রাটের মৃত্যুর সঙ্গে তাঁর সেই স্বপ্নটিও আকাশকুসুমে পরিণত হয়েছিল। মাত্র পনর বছর রাজত্বের পর ২০৬ খৃস্ট পূর্বাব্দে চি'ন বংশের পতন ঘটে। কিন্তু এই অল্প আয়ুষ্কালের মধ্যে এই বংশের শাসন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে গভীর রেখাপাত করেছে তা

কখনো মুছে যাবার নয়। চি'ন বংশের নাম থেকে চীন দেশের নামকরণ, চি'ন বংশকে চিরস্মরণীয় করবার পক্ষে এই বৃত্তান্তই যথেষ্ট। তা ছাড়াও আর একটি ব্যাপার এই বংশকে ঐতিহাসিক গৌরবে মণ্ডিত করেছে তা এই : খণ্ড-রাজ্যগুলির উচ্ছেদ করে মহাচীনের সংহতির আদর্শ স্থাপন। যুগ-যুগান্তের নানান ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যেও উত্তরকালের চীনা শাসকেরা এই রাষ্ট্রীয় ঐক্যের আদর্শকে কখনো বিসর্জন দেয় নি।

দিগ্বিজয়ী 'প্রথম সম্রাট' সি হুয়াং তি ছিলেন সম্ভ্রান্ত সামন্ত-রাজবংশীয়, নিজেকে পৌরাণিক রাজা হুয়াং তি-র বংশধর বলে দাবি করতেন। প্রাচীন ইতিহাসে তাঁর আকৃতির বর্ণনা এইরূপ : "নাসিকা উন্নত, চক্ষু অনায়ত, বক্ষ বাজপক্ষীর মত, কণ্ঠস্বর শৃগালের মত, প্রকৃতি অকৃতজ্ঞ, ব্যাঘ্রের মত হিংস্র"। বর্ণনায় অতিরিক্ত ঘৃণার ব্যঞ্জনা দেখা যায়। তার কারণ, ইতিহাসে যেসব দোর্দণ্ডপ্রতাপ সর্বধ্বংসকারী মহীপালের উল্লেখ রয়েছে তিনি তাঁদের অন্যতম। তিনি যে শুধু তাঁর সমশ্রেণীর স্বগোত্রীয়দের ধ্বংস করেই ক্ষান্ত হয়েছিলেন তা নয়, চীনের সুপ্রাচীন সমাজ সাহিত্য, রাষ্ট্রব্যবস্থা সব কিছুরই উচ্ছেদ করেছিলেন। এই সর্বাত্মক ধ্বংস নিছক হঠকারিতা বা অবিবেচনা প্রসূত নয়। তাঁর প্রখ্যাত বা কুখ্যাত মন্ত্রী লি-সু ছিলেন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি, দার্শনিক সুন জু র শিষ্য এবং আইন-সেবী হান-ফেই-র সহপাঠী, পাচীন লিখনপদ্ধতির নূতন সবল রূপ দান করেছিলেন, যে রূপকে অবলম্বন করে চীনা লিখন বর্তমান আকার ধারণ করেছে। এই ব্যক্তির প্রধান দুষ্কৃতি এই যে প্রাচীন কালের ও সামন্ত-যুগের যাবতীয় দর্শনশাস্ত্র, বিশেষত কনফুসিয়াসের সংকলন-গ্রন্থরাজি তাঁরই উপদেশমত অগ্নিদগ্ধ করা হয়েছিল। প্রাচীন প্রজ্ঞা, সঞ্চিত অভিজ্ঞতা সবই ভস্মীভূত হয়ে গেল, রক্ষা পেল শুধু পাঁজি-পুঁথি, ফলিত জ্যোতিষ, ভেষজবিদ্যা ও কৃষিবিদ্যা।

সাম্রাজ্য স্থাপনের পর সি হুয়াং তি সামন্ত-রাষ্ট্রগুলির পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিষয় যে চিন্তা করেন নি তা নয়, মন্ত্রিগণের সঙ্গে এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করেছিলেন। বিতর্কে সামন্ততন্ত্রের সমর্থনে জনৈক মন্ত্রী বলেছিলেন, "ইয়েন (হোপাই), চি (সানটাং) প্রভৃতি প্রদেশসমূহ বহু দূরে অবস্থিত। সামন্ত-রাজগণ কর্তৃক শাসিত না হলে প্রজাদের রাজভক্তি ও আনুগত্য রক্ষা করবার উপায় নেই। সুতরাং সম্রাটের পুত্রদের সেসব স্থানের সামন্ত-রাজ

রূপে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন।" সভায় উপস্থিত ছিলেন অন্যতম রাজমন্ত্রী লি-স্থ্। পরম বিপ্লবী তিনি, শিক্ষাদীক্ষা সবই তাঁর 'লেজিস্ট' বা আইন-সেবী সম্প্রদায়ের নিকট। তিনি বললেন, "চৌ বংশীয় রাজা ওয়েন ও উ ভ্রাতা ও পুত্রদের সামন্ত-রাজ্য অর্পণ করেছিলেন। কালক্রমে বংশবৃদ্ধির সঙ্গে উত্তরপুরুষেরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, তখন তাদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেল। পরিশেষে অবস্থা এরূপ দাঁড়াল যে স্বর্গ-পুত্রও তাদের আয়ত্তের মধ্যে আনতে পারেন নি।· ···বর্তমানে সম্রাটের নূতন ব্যবস্থায় সাম্রাজ্যের শাসন সহজ। সামন্ত-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা অবিধেয়।" সামন্ততন্ত্রের সমর্থনে ও বিপক্ষে মন্ত্রিদ্বয়ের যুক্তি শুনে লি-স্থ্-র অভিমত গ্রহণ করলেন সি হুয়াং তি—বললেন, "সামন্তকুল ও অভিজাতবর্গ ছিল বলেই এত দ্বন্দ্ব, বিরোধ, যুদ্ধ, শান্তিভঙ্গ ঘটেছে। পিতৃপুরুষের কৃপায় সাম্রাজ্য এখন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নূতন সামন্ত-রাজ্য গঠন করলে আবার যুদ্ধবিগ্রহ শুরু হবে, শান্তির বিঘ্ন ঘটবে।" এই আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় নানান দিক বিবেচনা করে সি হুয়াং তি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন।

সামন্ততন্ত্রের বিলুপ্তির পর সাম্রাজ্যকে ৪০টি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল এবং প্রতিটি বিভাগে সম্রাট কর্তৃক নির্বাচিত প্রশাসক নিযুক্ত হল। এইরূপে কেন্দ্রের কর্তৃত্বাধীনে সুবিস্তীর্ণ বিশাল সাম্রাজ্যে নূতন শাসনপদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছিল। কিন্তু এই নব সংস্কারকার্যে বিঘ্নের অন্ত ছিল না। বিরুদ্ধ পক্ষ শুধু যে সামন্ত-রাজগণ ও অভিজাতকুলই ছিলেন তা নয়, চুন-জু বা ভদ্র-পণ্ডিতেরাও খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছিল। এইসকল ভদ্র-পণ্ডিত ছিল কনফুসীয় নীতিধর্মে দীক্ষিত, যে নীতিধর্মের সারবস্তু সামন্ততন্ত্রের আদর্শ, 'স্বর্ণযুগে'র ঐতিহ্য, আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা। দেশের সর্বত্র প্রধান শিক্ষায়তনগুলিতে কনফুসীয় নীতিধর্ম প্রচার করা হত, প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থগুলির অধ্যয়ন ভিন্ন অন্য সব বিষয়ই ছিল আলোচনার বহির্ভূত। এই পদ্ধতিমত শিক্ষিত ভদ্র-পণ্ডিত সম্প্রদায় বা চুন-জু-রাই ছিলেন দেশের শাসক, রাজকর্মচারী। নূতন শাসন-সংস্কার পণ্ডিতশ্রেণীর ব্যক্তিগণের আদর্শ-বিরুদ্ধ, এ কথা উপলব্ধি করে তীক্ষ্ণবুদ্ধি রাজমন্ত্রী লি-স্থ্ তাদের বিষদন্ত ভেঙে দিতে কৃতসংকল্প হলেন। তিনি বুঝেছিলেন, সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসই যথেষ্ট নয়, ব্যাধির মূল চিরাগত শিক্ষার ঐতিহ্যের মধ্যে নিহিত, সুতরাং

অতীত স্মৃতি, ঐতিহ্য, ইতিহাসের বিলুপ্তি ঘটাতে না পারলে সমাজ ও রাষ্ট্রের নববিধান বিপন্ন হবার সম্ভাবনা যথেষ্ট। নববিধানের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রাচীন গ্রন্থগুলি দগ্ধ করবার পরামর্শ দিয়ে সম্রাটকে বলেছিলেন লি-স্যু: "প্রাচীন সম্রাটেরা (অর্থাৎ হুয়াং তি ইয়াও স্থন প্রভৃতি) কেউ কারু শাসনপদ্ধতির অনুকরণ করেন নি। প্রাচীন রাজবংশগুলিও (সিয়া স্যাং চৌ) পূর্ববর্তীগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নি। অর্থ এ নয় যে তাঁরা পূর্ববর্তী ব্যবস্থাসমূহের বিরোধী ছিলেন, তবে কালের পরিবর্তনের সঙ্গে ব্যবস্থাগুলির রূপান্তর প্রয়োজন হয়েছিল। ··পূর্বে নৃপতিরা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে রত থাকতেন। এখন সম্রাটের একচ্ছত্র শাসনে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তথাপি পণ্ডিত-ভদ্রব্যক্তিরা (চুন-জু) নববিধানকে গ্রহণ করে নি, তারা প্রাচীন গ্রন্থ অধ্যয়ন করে বর্তমানকে নিন্দা করবার জন্য।·· আলাপ-আলোচনায় তারা প্রাচীন যুগের তত্ত্বগুলির গুণকীর্তন করে, সম্রাটের ঐক্যবদ্ধ নির্দ্বন্দ্ব রাজ্যের সুশৃঙ্খল শাসনের নিন্দায় পঞ্চমুখ। নূতন আইন ও রাজাদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে প্রাচীনের নজির দেখিয়ে। এরূপ অবস্থার প্রতিকার না করলে রাজশক্তি খর্ব হবে, বিরুদ্ধ পক্ষ পরাক্রান্ত হয়ে উঠবে।"

সনাতনীদের বিরুদ্ধে এমন জোরালো যুক্তি সি হুয়াং তি অগ্রাহ্য করতে পারেন নি, প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থগুলি ধ্বংস করবার আদেশ দিলেন। এইরূপে বহু অমূল্য গ্রন্থ ভস্মীভূত হয়েছিল। 'শত দর্শন প্রতিষ্ঠানে'র দর্শনতত্ত্বগুলি নিঃশেষ হয়ে গেল, প্রাচীন ইতিহাসের হল অপূরণীয় ক্ষতি। সে-কালে চীন দেশে গ্রন্থ লেখা হত কাষ্ঠের ফলক বা বাঁশের ওপর রং দিয়ে অক্ষরগুলি চিহ্নিত করে, সুতরাং এক-একটি গ্রন্থ পর্বতাকার ধারণ করত। আদেশ দেওয়া হয়েছিল, ঘোষণার ত্রিশ দিনের মধ্যে যারা গ্রন্থগুলি দগ্ধ না করবে তাদের 'মহাপ্রাচীর' ("The Great Wall") নির্মাণের জন্য প্রেরণ করা হবে। আর যারা নববিধানের নিন্দা করবে তাদের শাস্তি প্রাণদণ্ড। গ্রন্থ ধ্বংসের বিরোধী ৪৬০ ব্যক্তিকে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু এরূপ কঠোর শাস্তিদান সত্ত্বেও অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি জীবন বিপন্ন করে কিছু কিছু প্রাচীন সাহিত্য, বিশেষত কনফুসিয়াসের রচনাবলী গৃহ-প্রাচীরের অভ্যন্তরে অথবা মৃতের সমাধিগর্তে গোপনে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল।

সামন্ততন্ত্রের বিলোপের পর সম্রাট সি হুয়াং তি সাম্রাজ্য বিস্তারের দিকে

দৃষ্টি দিলেন। বর্তমান চেকিয়াং প্রদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে ও ইন্দোচীনে 'ইয়ে' নামক একপ্রকার অর্ধসভ্য আদিম জাতির বাস ছিল, বর্তমান আনামবাসীদের পূর্বপুরুষ তারা। ২২১ খৃস্ট পূর্বাব্দে সি হুয়াং তি পাঁচটি বৃহৎ সৈন্যবাহিনীর অভিযান প্রেরণ করে চেকিয়াং, ফুকিয়েন ও কোয়ানটাং অঞ্চল জয় করেছিলেন, কয়েক বছর পর দক্ষিণে টংকিং অধিকৃত হয়। সকল স্থানেই সম্রাট তাঁর শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন। উত্তর-পশ্চিমে সিয়াং-নু বা হুন জাতি ও পূর্বে কোরিয়ার রাজা তাঁর প্রভুত্ব স্বীকার করেছিলেন।

চীনের মহাপ্রাচীর পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্যের অন্যতম। এই প্রাচীরের নির্মাণকার্য প্রধানত সম্পন্ন করেছিলেন সি হুয়াং তি। নানান স্থানে প্রাচীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ পূর্বকার সামন্ত-নৃপতিরা নির্মাণ করেছিলেন উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের হুনদের আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্য। হুনরা যাযাবর জাতি, তাদের চীনা নাম সিয়াং-নু। সামন্ত-যুগে তারা উত্তর ও পশ্চিম প্রত্যন্তের উর্বরা ভূমি উপদ্রুত করেছে। চৌ বংশের পতনের পর, বিশৃঙ্খল বিপর্যয়ের মধ্যে এই উৎপাত বিলক্ষণ বর্ধিত হয়েছিল। হুনদের আক্রমণ প্রতিহত করবার উপায়স্বরূপ বিভিন্ন খণ্ড-প্রাচীরগুলিকে একত্র সংযুক্ত করে চোদ্দ শ' মাইল দীর্ঘ একটি 'মহাপ্রাচীর' নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিলেন সি হুয়াং তি। কিন্তু এ ছাড়া তার আরও একটি মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর বিবিধ সংস্কারকার্যের বিরুদ্ধাচারী প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতগণকে প্রাচীর নির্মাণার্থ সুদূর প্রত্যন্তদেশে প্রেরণ করে তাদের অনর্থ-সাধনের সংঘবদ্ধ শক্তি নষ্ট করতে। এই বৃহৎ অনুষ্ঠানের উদ্যোগও হয়েছিল বৃহৎ রকমের। তিন লক্ষ সৈন্য নিয়োজিত হয়েছিল এই বিরাট নির্মাণ-কার্যে, যারা ছিল সম্রাটের দিগ্বিজয়ী বাহিনী. নির্বাসনে পাঠিয়ে সম্রাট তাদের পুরস্কৃত করলেন। বহু বৎসর ধরে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রাচীর গড়ে উঠেছিল, শীতের তুষারশীতল বায়ু, নিদাঘের তপ্ত ধূলির আবরণ, কাজের নেই বিরাম, নেই বিরতি—অশ্রুধারায় ধরণী সিক্ত হয়েছে, রক্তের নদী বয়ে গেছে, সেই অশ্রুবিন্দু নিয়ে চীনা কবি গেঁথেছে মুক্তার হার, প্রোষিতভর্তৃকার বিরহ-গীতিকা। হ্যান যুগে রচিত একটি কাব্যে মেং চিয়াং নামে জনৈকা শোকার্তা রমণীর গভীর মর্মবেদনার

কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। মহিলার স্বামী প্রাচীর নির্মাণকার্যে নিযুক্ত ছিলেন, কর্মস্থলে শোচনীয় অবস্থায় তাঁর মৃত্যু ঘটে। তখন মেং চিয়াং গেলেন সেখানে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে আসতে, প্রথামত পিতৃপুরুষের সমাধি-ক্ষেত্রে প্রোথিত করবার জন্যে। অনুসন্ধানে জানতে পারলেন তিনি স্বামীর দেহ পাথর চাপা পড়ে প্রাচীরের সঙ্গে গাঁথা হয়ে গেছে। তিনি শোকে অভিভূতা হয়ে পড়লেন। কবি তাঁর আর্তকণ্ঠে বিলাপের ছন্দ-রূপ দিয়েছেন এইরূপ ঃ

হায় প্রিয়! আজ তুমি ছায়ালোকে একা সঙ্গীহারা
আমি শূন্য পানে চাই—ম্লানিমায় ডুবে গেছে তারা,
হিম-ঢাকা চাঁদ, মেঘপুঞ্জ শীর্ণ বাতাহত
সংসারের ক্ষুদ্র ছবি, ছিন্ন পদ্ম-পাপড়ির মত
ভাঙা ঘর ওই যায় উড়ে!

তারপর কবি সেই সাধ্বী নারীর শোকোচ্ছ্বাস যে অঘটন ঘটিয়েছিল তার বিবরণ দিয়েছেন ঃ

প্রেমিকার সে ক্রন্দন সারা বিশ্ব জুড়ে
আকাশের বুক চিরে আর্ত বেদনায়
উত্তাল তরঙ্গভঙ্গে স্বর্গ পানে ধায়।
করুণাশ্রু ঝরে চোখে দেবতার স্বর্গ পৃথিবীর
গলে মৃত্তিকার স্তূপ, ফেটে পড়ে পাষাণ-প্রাচীর!

মহাপ্রাচীর নির্মাণকে অবলম্বন করে এই বিয়োগান্ত কাব্য চীনা সাহিত্যের একটি রত্নবিশেষ।

মহাপ্রাচীরের প্রকৃত নির্মাণকর্তা ছিলেন সেনাপতি মেং তিয়েন। চীনা সভ্যতার ক্ষেত্রে তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ অবদান লিখন-সৌকর্যের জন্য উষ্ট্রলোমের ব্রাশ বা পেনসিলের ব্যবহার। পূর্বে বাঁশের কলম দিয়ে কাষ্ঠফলক বা চেরা বাঁশের ওপর লেখা হত, তার পরিবর্তে রেশমের ওপর লেখার প্রচলন একটি বৈপ্লবিক পদ্ধতি বলতে হয়। দিগ্বিজয় ব্যাপারে এই সেনাপতি সম্রাটের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। তিনি ছিলেন পরম

রাজভক্ত, আর সেই রাজভক্তিই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়েছিল, কিরূপে তা এখনি বলা হবে।

সিংহাসনে আরোহণের পর থেকেই সি হুয়াং তি নিজেকে রহস্য দিয়ে ঘিরে রাখতেন, জাঁকজমকেরও অন্ত ছিল না—উদ্দেশ্য, জনগণের কাছে আপন মর্যাদা বৃদ্ধি। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তাঁর এই আচরণের ফলে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিল রাজা-প্রজার মধ্যে। রাজা জানতে পারতেন না তাঁর আদেশ-সমূহের ফলাফল, প্রজা জানতে পারত না রাজার গতিবিধি। সাত লক্ষ ব্যক্তির কায়িক পরিশ্রমে এক বিরাট প্রাসাদ তৈরি করা হয়েছিল, তারই অসংখ্য কক্ষের মধ্যে গোপনে অবস্থান করতেন তিনি, দুই রাত্রি কখনো একই কক্ষে যাপন করতেন না। তিনি ছিলেন ভ্রমণপ্রিয়, কিন্তু তাঁর গতিবিধি রাখা হত অত্যন্ত গোপন। দূর দেশে ভ্রমণকালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর পার্শ্বচর রাজমন্ত্রী লি-স্থ ও কয়েকজন খোজা পরিচারক ভিন্ন এই মৃত্যুর কথা কেউ জানতে পারে নি। তখন গ্রীষ্মকাল, গলিত মৃতদেহের দুর্গন্ধ চাপা দেবার জন্য শুঁটকি-মাছ-ভর্তি গাড়ি সম্রাটের ভ্রমণ-শকটের পিছনে চলতে লাগল। সম্রাটের মৃত্যুসংবাদ গোপন রাখবার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল লি-স্থ-র। যুবরাজ ছিলেন সংস্কার ও গ্রন্থ ধ্বংসের বিরোধী, প্রাচীনপন্থীদের সমর্থক। সনাতনীদের ওপর নির্মম নির্যাতনের প্রতিবাদ করতেন তিনি, সেজন্য সম্রাট তাঁকে উত্তরাঞ্চলে মহাপ্রাচীরের নিকট সৈন্যদের শিবিরে বাস করবার আদেশ দিয়েছিলেন। যুবরাজকে রাজ্য থেকে বঞ্চিত করবার অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। সি হুয়াং তি এই মর্মে একটি আদেশ লিপিবদ্ধ করেছিলেন যে, যুবরাজ সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী, সম্রাটের মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসনের অধিকারী হবেন। মন্ত্রী লি-স্থ সেই আদেশপত্র গোপন করে একটি জাল হুকুমনামা প্রস্তুত করলেন। সেই জাল দলিলে এই আদেশ লিখিত হল যে যুবরাজ ও সেনাপতি মেং তিয়েন যেন সেই আদেশপত্র পাঠ মাত্র আত্মহত্যা করেন। পিতৃভক্ত যুবরাজ ও বশংবদ সেনাপতি পরম রাজভক্ত মেং তিয়েন বিনা দ্বিধায় আত্মঘাতী হলেন। এই জঘন্য জালিয়াতি তখন ধরা পড়ে নি। লি-স্থ ও খোজা-প্রধান চাও-কাও সি হুয়াং তি-র দ্বিতীয় পুত্র হু হাই-কে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তিনি "দ্বিতীয় সম্রাট" নামে খ্যাত হলেন।

"দ্বিতীয় সম্রাট"

"দ্বিতীয় সম্রাট" ভূগর্ভে একটি বিরাট হর্ম্য নির্মাণ করে সেখানে পিতার সমাধি দান করলেন। মৃতদেহের সঙ্গে স্বর্গত সম্রাটের কয়েক শত উপপত্নীকে সমাধিমধ্যে সহমরণে পাঠানো হয়েছিল তাঁর সেবার জন্য। ইতিমধ্যে চি'ন-রাজের অভিশাপস্বরূপ রাজপ্রাসাদের ষড়যন্ত্র ভীষণ আকার ধারণ করেছিল। সম্রাটের জনান্তরালে গোপন অবস্থানের ফলে রাজা-প্রজার মধ্যে যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, গৃহভৃত্য খোজারাও তখন রাজার সঙ্গে অন্তরঙ্গতার সুযোগ নিয়ে তাঁর ওপর নিরঙ্কুশ প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করেছিল। নূতন সম্রাট ছিলেন বাইশ বছরের যুবক, রাজকর্মে অনভিজ্ঞ ও অপটু। খোজা-প্রধান চাও-কাওই রাজ্যে সর্বেসর্বা হয়ে উঠল, এবং নিজের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য ষড়যন্ত্রক্রমে মন্ত্রী লি-স্যু-র প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করল। ষড়যন্ত্র কিন্তু বন্ধ হল না, এবার তার উদ্যত খড়্গ সম্রাটের নিজের ঘাড়ে পড়ল। তিনি নিহত হলেন। তাঁর পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিলেন, খোজা-প্রধানকে সবংশে নির্মূল করে। কিন্তু তখন সাম্রাজ্য জুড়ে বিপ্লব মাথা তুলেছিল এবং তার ফলে নূতন সম্রাট নিহত হলেন। তারপর দুই বৎসর যুদ্ধবিগ্রহের পর ২০৬ খৃস্ট পূর্বাব্দে লিউ প্যাং নামক হ্যান সামন্ত-রাজ্যের জনৈক প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তি বিজেতার দাবি নিয়ে সুবিখ্যাত হ্যান-বংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

চি'ন বংশের দোষগুণ বিচার

প্রাচীন কালের বিধানগুলি প্রাকৃতিক নিয়মের মত অপরিবর্তনীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার গতিপ্রকৃতির সঙ্গে সংগতি রক্ষার জন্য সেই বিধিগুলির সংস্কারের প্রয়োজন নেই, এরূপ জড় মনোভাব জাতির অধঃপতনের কারণ, সম্রাট সি হুয়াং তি এ কথা স্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলেন। সংস্কারকার্যে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তিনি সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে, প্রাচীনের জগদ্দল পাথর-চাপ সরিয়ে নূতন চিন্তার উৎসমুখ মুক্ত করাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। কিন্তু তাঁর এই সাধু সংকল্প সিদ্ধ হয় নি তার কারণ, প্রাচীনকে নির্মূল করবার জন্য অত্যন্ত নিষ্ঠুর ধ্বংসাত্মক উপায় অবলম্বন করেছিলেন তিনি,

তাই ব্যাধির চেয়ে প্রতিকারটাই দেশের পক্ষে অধিকতর ক্লেশকর হয়ে উঠেছিল। এই প্রসঙ্গে চিয়া-আই নামে জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তি "চি'ন বংশের কলঙ্ক" শীর্ষক একটি রাজনৈতিক প্রবন্ধ রচনা করেন। চি'ন রাজবংশের সমসাময়িক কালের রচনা, প্রাবন্ধিক যে রক্ষণপন্থী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সামন্ততন্ত্রের বিলুপ্তির নিন্দা করা হয়েছে বটে, কিন্তু দ্বন্দ্ব-কলহে বিপর্যস্ত দেশসমূহ জয় করে সি হুযাং তি সর্বজনীন শান্তি প্রতিষ্ঠার অপূর্ব সুযোগ লাভ করেছিলেন, সে কথা অস্বীকার করা হয় নি। চিয়াং আই-র বক্তব্যের সারমর্ম এই: সাম্রাজ্য স্থাপন কবে চি'ন যখন 'স্বর্গপুত্র' হলেন, তিনি তখন যথার্থই শ্রদ্ধা-ভক্তির পাত্র ছিলেন। প্রজারা বুক-ভবা আশা নিয়ে তাঁব পানে চেয়ে ছিল, তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠিত করবেন এই ছিল তাদেব আশা। কিন্তু চি'ন-রাজ ছিলেন ক্ষুদ্রাশয় লোভী ব্যক্তি। অভিজাতবর্গ ও প্রজাবৃন্দেব তুষ্টি সাধনেব কোন উদ্যোগ করেন নি, ভীষণভাবে নির্যাতন কবে, ভয়ংকর শাস্তি দিয়ে তিনি তাদের জর্জরিত করেছিলেন। দণ্ড-পুরস্কারের বিধান করতেন অন্যায়মত, কর ধার্য করতেন অন্যাযমত, বেগার পরিশ্রমে প্রজাদেব পিষে মেরেছেন। কাতাবে কাতারে নির্যাতিতেরা নির্বাসিত হয়েছে। রাজপুত্র, রাজমন্ত্রী থেকে শুরু করে সামান্য প্রজা পর্যন্ত সকলেই প্রাণভয়ে উদ্বিগ্ন জীবনযাপন কবেছে। এই সময়ে চেন-সে নামে একজন আভিজাত্যহীন সাধারণ গৃহস্থ-সন্তানের অঙ্গুলিহেলনে দেশব্যাপী যে বিপ্লব জেগে উঠেছিল তারই ফলে চি'ন বংশের পতন ঘটেছিল।

২. হ্যান বংশ (খৃঃ পূঃ ২০৬-২২১ খৃস্টাব্দ)

চি'ন বংশের অবসানকালে সমাজে অভিজাত শ্রেণীর চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট ছিল না, ভাগ্যান্বেষীর দল থেকে বিপ্লবী নেতার আবির্ভাব হয়েছিল। হ্যান বংশের প্রতিষ্ঠাতা লিউ প্যাং ছিলেন সেই ভাগ্যান্বেষী শ্রেণীর ব্যক্তি। খোজা-প্রধান চাও-কাও-র হস্তে 'দ্বিতীয় সম্রাট' নিহত হবার পর লিউ প্যাং সসৈন্যে এসে চি'ন রাজধানী সিয়েন ইয়াং নির্বিবোধে অধিকার করলেন। ইতিমধ্যে তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ও ঊর্ধ্বতন নেতা সিয়াং ইউ পূর্ব চীনে

চি'ন বংশের শেষ ভরসা-স্বরূপ একটি বৃহৎ বাহিনীকে পরাস্ত করে সেখানে একটি নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করেছিলেন। পুরাতন সাতটি রাজ্যের পুনঃ-প্রতিষ্ঠা হল, তা ছাড়া নূতন রাজ্যও অনেকগুলি সৃষ্টি করা হয়েছিল বৃহৎ রাজ্যগুলির আয়তন হ্রাস কবে। বর্তমান জেচুয়ান ও দক্ষিণ সেনসি-র প্রাচীন নাম হ্যান—হ্যান নদী ঐ অঞ্চলে প্রবাহিত ছিল বলে রাজ্যেব নাম ছিল হ্যান। এই হ্যান রাজ্যটি ভাবী হ্যান-বংশের প্রতিষ্ঠাতা লিউ প্যাং-কে দেওয়া হযেছিল, বিজেতা সেনাপতিগণের মধ্যে রাজ্য বণ্টনের ফলে। এইরূপে রাজ্য বণ্টনেব পর সর্বাধিনায়ক সিয়াং ইউ 'পা ওয়াং' বা রাজ-রাজেশ্বর পদবী গ্রহণ করলেন।

সিয়াং ইউ-র সামন্ততন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। রাজ্য বণ্টনে সহচর সেনাপতিবর্গ খুশি হয নি। তারা পুরাতন রাজ্যগুলির ওপর হামলা চালিয়ে রাজবংশীয়দের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করল। লিউ প্যাং চি'ন রাজ্যের তিনজন নূতন রাজাকে অপসারিত করে নিজে সেই অঞ্চলের সার্বভৌম নৃপতি হয়ে বসলেন। এইরূপে নবপ্রতিষ্ঠিত সামন্ত-রাজ্যগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হল এবং সেই সঙ্গে শুরু হল অন্তর্বিরোধ, বিপ্লবকালেব মিত্রদের মধ্যে তুমুল সংগ্রাম।

এই সংগ্রামের প্রধান দুই নায়ক ছিলেন লিউ প্যাং ও সিযাং ইউ। উভয়ের রাষ্ট্রীয় আদর্শের মধ্যে মূলগত বিরোধ ছিল—রাজ্যসমূহের একীকরণ লিউ প্যাং-এর আদর্শ আর সিযাং ইউ সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত কবতে দৃঢ়সংকল্প হয়েছিলেন। নায়কদ্বয়েব শিক্ষাদীক্ষা, চারিত্রিক গুণও ছিল বিভিন্ন। সিয়ান ইউ অভিজাত বংশীয় পণ্ডিত-ভদ্রব্যক্তি (চুন-জু), আর লিউ প্যাং একজন ভাগ্যান্বেষী কৃষক বিপ্লবী। লিউ প্যাং-এর ব্যবহার অমার্জিত হলেও তিনি ছিলেন চতুর হুঁশিয়ার মানুষ, মানবচরিত্রে অভিজ্ঞ, বাস্তবজ্ঞান তাঁর ছিল প্রচুর। রাজনীতি-ক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি, যুদ্ধে বীরত্বের নিদর্শন কিন্তু তেমন পাওয়া যায় নি। সিয়াং ইউ ছিলেন সুশিক্ষিত, মার্জিত, কবি-প্রকৃতির মানুষ, দীর্ঘাকৃতি, বলবান। যুদ্ধে অপরাজেয়, কখনো পরাজয় ঘটে নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর সেনাপতিরা ও মিত্রগণ তাঁর পবম শত্রু হয়ে উঠেছিল, তার কারণ তাঁর দাম্ভিক উদ্ধত স্বভাব। পাঁচ বৎসর ক্রমান্বয়ে যুদ্ধ চালাবার পর শত্রু কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে যখন তাঁর পরাজয়

অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল, তিনি তখন যুদ্ধ-শিবিরে পরমাসুন্দরী পত্নী ইউকে প্রেমালিঙ্গনে বেঁধে পানাহারে সারা রাত কাটিয়ে এই বিষাদ-সংগীতটি রচনা করেছিলেন:

গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ করে হেন শক্তি বাহু মোর ধরে,
সারা জগতের পানে আঁখি মোর ফিরে ঘৃণাভরে।
শুভক্ষণ গেছে চলে আর আসিবে না ··
প্রিয় অশ্ব 'চুই' মোর আর ছুটিবে না!
সব গেল ইউ ইউ! কি করিব হায়—
আমি গেলে প্রিয়ে তুমি রহিবে কোথায়?

সেই কাল-রাত্রে রাজা-রানী এমনি অনেক গান গাইলেন। উভয়ের চোখে জল, অনুচরগণও অশ্রু সংবরণ করতে পারে নি। সকালবেলা সিয়াং ইউ অসিহস্তে বীরদর্পে শত্রুব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে পড়লেন এবং বন্দী হবার পূর্বে স্বহস্তে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। চীনের ইতিহাসে, কাব্যে, গানে এই সংগ্রাম-কাহিনীর চরিত্রগুলি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হয়ে আছে।

সম্রাট কাও

২০৬ খৃস্ট পূর্বাব্দে লিউ প্যাং সম্রাট কাও নাম গ্রহণ করে রাজ্যশাসন আরম্ভ করেন। প্রথমে তিনি কনফুসীয় ক্রিয়া-কর্ম, অনুষ্ঠানাদির প্রতি অনুরক্ত ছিলেন না। কথিত আছে, ঘৃণাভরে পণ্ডিতদের মাথার টুপিতে তিনি প্রস্রাব করতেন, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় প্রাচীন বিদ্যা আর সেই বিদ্যার শিক্ষকের প্রতি তাঁর এই মনোভাব দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। অতীতের ঘটনা-পরম্পরার প্রতি দৃষ্টিপাত করে তাঁর মনে এই বিশ্বাস জন্মেছিল যেন চি'ন বংশের পতনের কারণ চিরাগত সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ, আর সেই অভিজাত-কুলের তিরোধানের জন্যই তাঁর মত একজন সামান্য কৃষকের রাজ্যলাভ সম্ভব হয়েছে। কনফুসীয় নীতির আদর্শ সামন্ততন্ত্র। এই নীতিধর্ম প্রসঙ্গে মন্ত্রী লু-চিয়া-র সঙ্গে সম্রাটের আলোচনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে প্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থে। মন্ত্রী ছিলেন কনফুসিয়াস-নীতির পরম অনুরাগী, সম্রাট তাঁকে দম্ভ-ভরে বলেছিলেন, সাম্রাজ্য জয় করেছেন তিনি ঘোড়ার পিঠে চড়ে, সুতরাং

স্থ-কিং প্রভৃতি দগ্ধ গ্রন্থের আবশ্যক তাঁব একেবারেই হবে না রাজ্য শাসন করবার জন্যে। এই স্পর্ধিত উক্তিব উত্তরে মন্ত্রী লু-চিযা বলেছিলেন, অশ্বারূঢ় হযে কথনো শাসন পরিচালনা সম্ভব হয় না, আর চি'ন বংশীযেরা যদি কনফুসিয়াস-নীতির আদর্শে বাজ্য শাসন করতেন তবে তাঁদের পতন ঘটত না। মন্ত্রীর এই উপদেশবাণী সম্রাট কাও-র মর্মস্পর্শ কবেছিল, কেননা চি'ন বংশের কাহিনীর পুনরাবৃত্তির পথ রোধ কবে নিজ বংশের রাজত্বকাল দীর্ঘস্থাযী করবার জন্য তিনি ছিলেন কৃতসংকল্প। কনফুসিয়াসকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শনের জন্য সম্রাট তাঁর সমাধিস্থলে গিযে ভক্তিনতশিরে বেদীমূলে অর্ঘ্য দান করেছিলেন।

কনফুসীয় নীতির আদর্শমত সম্রাট শাসন-সংস্কার কবতে প্রবৃত্ত হলেন। এক শ্রেণীব ভূস্বামীর সৃষ্টি করলেন জমির জাযগীর দান কবে। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবর্গ এবং মন্ত্রিগণ, এঁরাই হলেন ভূস্বামী। নিজ নিজ ভূখণ্ডে তাঁদের শাসন-ব্যবস্থা পরিবীক্ষণ করবাব জন্য বিশেষ কর্মচারী নিযুক্ত করা হল। এইরূপে একপ্রকার নিযন্ত্রিত সামন্ততন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল। আব যে মহৎ কর্মের উদ্যোগ সম্রাটকে ও তাঁর বংশকে ইতিহাসে চিরস্মরণীয কবে রেখেছে, সেটি হল প্রাচীন গ্রন্থাবলীব পুনরুদ্ধাব। পূর্বে বলা হযেছে অনেক পুরানো পুঁথি, বিশেষত কনফুসিযাসের রচনাগুলি গৃহ-প্রাচীরেব অভ্যন্তরে অথবা সমাধিগর্ভে গোপন করে বাখা হযেছিল, সেগুলি এখন উদ্ধার করা হল। অনেক গ্রন্থ অংশত বা সম্পূর্ণ ধ্বংস হযেছিল, বৃদ্ধ প্রাজ্ঞেরা সেইসব গ্রন্থের বিষয-বস্তুর স্মৃতি যথাসম্ভব শিবোমধ্যে ধারণ করে এসেছিল, এখন সেই বিষযগুলিকে লিপিবদ্ধ করা হল। প্রাচীন কালে যে লিখন-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তার পরিবর্তন ঘটেছিল, এখনকাব অক্ষরগুলি ছিল ভিন্ন রকমের। তাই এ যুগের স্মৃতি-থেকে-লেখা গ্রন্থগুলিকে বলা হয 'নূতন হরফের প্রাচীন গ্রন্থাবলী' (New character classics)। তা ছাড়া যেসব প্রাচীন গ্রন্থ উদ্ধার করা হযেছিল, সেগুলির নাম 'প্রাচীন হরফের প্রাচীন গ্রন্থাবলী' (Old character classics)। এইসব গ্রন্থ উদ্ধারের জন্য বহু ধনী ব্যক্তি প্রভূত অর্থ পুরস্কারস্বরূপ দান করেছিলেন। কথিত আছে, একজন রাজা তাঁর প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন কনফুসিয়াসের বাস্তুভিটার ওপর, সেই সময় ভগ্নস্তূপের ভিতর মহাপুরুষের গ্রন্থাগার আবিষ্কৃত হয়েছিল। পুঁথিগুলি

প্রাচীন হরফে লেখা, সুতরাং মূল গ্রন্থ বলেই অনেক পণ্ডিত সিদ্ধান্ত করেছেন।

ইতিপূর্বে আমরা প্রত্যন্তের হূন বা 'সিয়াং নু'দের উপদ্রবের উল্লেখ করেছি। হূনরা তাতারজাতীয়, পশ্চিমের তুর্কী, মোঙ্গল, উইগার, খিরগিজ প্রভৃতি জাতির পূর্বপুরুষ। পূর্ব অঞ্চলের তাতার বা তুঙ্গরা কিন খিতান মাঞ্চু ও কোরিয়গণের পূর্বপুরুষ। হূনদের বাস পশ্চিমের বন্ধুর পর্বতাঞ্চলে আর উত্তর-পূর্বের নিষ্পাদপ সমতটে, সেখানকার ভূমির ঊষরতা, শীতের অসহনীয় তীব্রতা তাদের যাযাবর-বৃত্তির কারণ। খাদ্যের সন্ধানে তারা চিরকাল হানা দিয়ে এসেছে চীনের শস্যশ্যামল উপত্যকা-ভূমির ওপর। বর্বর হূনজাতির এরূপ আক্রমণের উল্লেখ পৌরাণিক কালের ইতিহাসেও দেখা যায়, স্যাং বংশীয়েরা সিয়াং নু-দের 'দানব' নামে অভিহিত করত। হূনরা পশুপালক জাতি, অশ্ব বৃষ মেষ উষ্ট্র প্রভৃতি পশু পালন করত, কৃষিকার্য জানত না, পশুমাংস ভক্ষণ করত, পশুচর্ম পরিধান করত। আচার-বিচার তাদের ছিল অদ্ভুত রকমের। পুরুষেরা ছিল বহুপত্নীক, পিতার মৃত্যুর পর বিমাতাদের বিবাহ করত। সুদক্ষ ঘোড়সওয়ার ও শিকারী ছিল তারা, ধাবমান অশ্বপৃষ্ঠ থেকে বন্য জন্তুকে তীরবিদ্ধ করত। সি হুয়াং তি যে মহা-প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন সেই প্রাচীরও তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে নি। তৃতীয় খৃস্ট পূর্বাব্দে হ্যান বংশীয়দের রাজত্বকালে এই হূনজাতি চীনের প্রত্যন্তদেশ থেকে ক্যাসপিয়ান হ্রদ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল।

খৃঃ পূঃ ১৯৯ অব্দে এই দুর্ধর্ষ জাতি মহাপ্রাচীর অতিক্রম করে সেনসি প্রদেশে প্রবেশ করে। সম্রাটের বাহিনী তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে না পেরে পশ্চাদপসরণ করেছিল। স্বয়ং সম্রাট একটি নগরে অবরুদ্ধ হলেন। নানারূপ ফন্দি-ফিকির করে সে যাত্রায় সম্রাট কাও উদ্ধার পেলেন বটে, কিন্তু পরিশেষে হূনদের সঙ্গে আর একটি যুদ্ধে আহত হয়ে তাঁর জীবনান্ত ঘটে (খৃঃ পূঃ ১৯৫)।

সম্রাজ্ঞী লু হৌ

সম্রাট কাও-র পত্নী লু হৌ বন্ধুর জীবন-পথের জয়যাত্রায় স্বামীর কর্ম-সঙ্গিনী ছিলেন, কিন্তু সম্রাটের জীবনের শেষ কয়েক বছর তাঁকে পরম

অনাদর ভোগ করতে হয়েছিল। এই অবজ্ঞার ফলে তাঁর প্রকৃতি এমনি হিংস্র হয়ে উঠেছিল যে সম্রাটের মৃত্যুর পর সপত্নীর অঙ্গচ্ছেদ করে নির্মমভাবে হত্যা করতে এবং বিষপ্রয়োগে তার পুত্রের প্রাণনাশ করতে তিনি দ্বিধা করলেন না। তারপর নিজের পুত্র হুই-কে রাজসিংহাসনে বসিয়ে তার অছিরূপে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন লু হৌ। সম্রাট হুই ছিলেন অসংযমী, অর্বাচীন, দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ তাঁর ভাগ্যে ঘটে নি। তাঁর মৃত্যুর পর লু হৌ-র কয়েকটি পুত্র তাঁর পরিচালনাধীনে রাজ্য শাসন করেছিল, কিন্তু কোন রাজত্বই দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। অবশেষে যখন লু হৌ-র মৃত্যু হল তখন ভূতপূর্ব সম্রাট হুই-র একটি গণিকার পুত্র সম্রাট ওয়েন নাম গ্রহণ করে সিংহাসনে আরোহণ করেন (খৃঃ পূঃ ১৭৯)।

"সভ্য সম্রাট" ও "উজ্জ্বল সম্রাট"

সম্রাট ওয়েন ও তাঁর পুত্র চিং উভয়েই বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন তাঁদের শান্তিপ্রিয়তা ও সহৃদয়তার জন্য। লাওৎসি-দর্শনের পরম ভক্ত ছিলেন তাঁরা, 'স্বভাব নিয়মের' পক্ষপাতী, রক্তপাতের বিরোধী। সম্রাট ওয়েং অনেক নিষ্ঠুর শাস্তির বিধান বাতিল করে দিয়েছিলেন, যেমন নাসিকা, পদ প্রভৃতি অঙ্গচ্ছেদ। প্রজাদের করভার লাঘব করা হয়েছিল। সম্রাটদ্বয়ের কীর্তি-সমুজ্জ্বল কর্মানুষ্ঠানের জন্য ওয়েন 'সভ্য সম্রাট' ('Civilized Emperor') এবং চিং 'উজ্জ্বল সম্রাট' ('The Radiant Emperor') আখ্যা লাভ করেছিলেন। রাজদরবারে জাঁকজমকের বিরোধী ছিলেন তাঁরা। কথিত আছে, তেইশ বছর রাজত্বকাল-মধ্যে সভ্য সম্রাট ওয়েন একটিও প্রাসাদ নির্মাণ করেন নি, অশ্বরথ অথবা মূল্যবান পরিচ্ছদও ক্রয় করেন নি। একবার একটি পুরনো প্রাসাদের অলিন্দ নির্মাণের ইচ্ছা হয়েছিল তাঁর, কর্মচারীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্যয় কত ?" সে বলল, "এক শ' স্বর্ণমুদ্রা।" সবিস্ময়ে সম্রাট বলে উঠলেন, "এক শ' স্বর্ণমুদ্রা! বল কি ? দশটি মধ্যশ্রেণী পরিবারের সমগ্র সম্পত্তির মূল্য ঐ পরিমাণ অর্থ। পিতৃদত্ত প্রচুর বিত্ত ভোগ করি বলে আমি অন্তরে লজ্জা অনুভব করি। প্রজাদের অর্থ অজস্র ব্যয় করে অলিন্দ নির্মাণ করবার অধিকার আমার কোথায় ?"

'সভ্য সম্রাট' ও 'উজ্জ্বল সম্রাটে'র শান্তিপূর্ণ রাজত্বকালে প্রজাদের সমৃদ্ধি

ও সন্তোষ বৃদ্ধি পেয়েছিল। গোলাঘরসমূহ শস্যপূর্ণ, রাজকোষ অর্থপূর্ণ ছিল। গরীব লোকেরাও ঘোড়া রাখত, এবং কেউ পূর্বকালের রীতি অনুসারে মহিষ ও গরুর পিঠে চড়ে বেড়ালে বিদ্রূপের পাত্র হত। বণিকশ্রেণীর ব্যক্তিরা ধনী ও শক্তিশালী হয়ে লুপ্ত অভিজাতকুলের স্থান অধিকার করেছিল। চীন দেশে ব্রঞ্জ-যুগ মধ্য এশিয়ার দেশগুলি অপেক্ষা অধিকতর দীর্ঘকালস্থায়ী হয়েছিল এবং লৌহের ব্যবহার সদ্য দেখা দিয়েছিল। লৌহকার ও লবণ প্রস্তুতকারীরা তখন রাজার চেয়েও বেশি ধনী হয়ে উঠেছিল।

সম্রাট উ (১৪০-৮৬ খৃস্ট পূর্বাব্দ)

সম্রাট উ-র শাসনকালে হ্যান বংশীয়দের প্রবল পরাক্রম গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে উঠেছিল। পঞ্চাশ বছর তাঁর রাজত্বকাল, এত দীর্ঘ সময় জুড়ে রাজ্য-শাসন বংশের আর কোন সম্রাট করেন নি। উদ্যোগী পুরুষসিংহ তিনি, তাঁর লক্ষ্য ছিল সাম্রাজ্য বিস্তার, অর্থনৈতিক সংগঠন ও সংস্কৃতির প্রসার। প্রত্যন্তের হূন বা সিয়াং নু-দের উৎপাত একটু প্রশমিত হয়েছিল পূর্ববর্তী সম্রাটদের তোষণ-নীতির ফলে। এইসব সম্রাট হূন-প্রধানদের রেশমের পোশাক, খাদ্য ও মদ্য উপঢৌকন পাঠাতেন, এমন কি তাদের হাতে রাজ-কুমারীদের সম্প্রদানও করেছিলেন। এই দুর্বল নীতির পরিবর্তে সম্রাট উ তাদের দেশ জয় করে সেখানে শিবির স্থাপনের উদ্দেশ্যে যুদ্ধসজ্জা আরম্ভ করলেন। ১৩৩ খৃস্ট পূর্বাব্দ থেকে শুরু করে যুদ্ধ দীর্ঘকাল চলেছিল এবং যুদ্ধে সম্রাটের বাহিনী সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করেছিল। কিন্তু প্রত্যন্তের সিয়াং নু-দের বিরুদ্ধেই সম্রাটের বিরাট অভিযান সীমাবদ্ধ ছিল না; উত্তরে মোঙ্গলিয়া, পশ্চিমে তুর্কীস্থান, দক্ষিণে আনাম ও ফুকিয়েন এই সুবিস্তীর্ণ বিশাল ভূখণ্ডের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত সকল রাজ্যই সম্রাটের পদানত হয়েছিল। কোরিয়া-বিজয় সম্রাটের একটি বিশেষভাবে স্মরণীয় অভিযান। চ্যাং যুগের অবসানে কি-সি নামে একজন চীনা ভাগ্যান্বেষী এই দেশে একটি রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। উত্তর-পশ্চিম কোরিয়া অঞ্চলে উচ্চাঙ্গের হ্যান শিল্পের নিদর্শন পাওয়া গেছে, তাই থেকে হ্যানগণ সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল এই ঐতিহাসিক তথ্যটি সমর্থিত হয়েছে।

সম্রাট উ-র একজন প্রখ্যাত সেনাপতি চ্যাং চিয়েন, দূর দেশে তাঁর

ভ্রমণের বিবরণ একরকম রূপকথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তিনি নাকি আকাশের ছায়াপথে, চীনারা যাকে বলে 'রুপোর নদী' সেই দরিয়ায় তরী ভাসিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি পারথিয়া, বাক্ট্রিয়া প্রভৃতি ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যে এসেছিলেন, সম্রাট উ-র সঙ্গে এই অঞ্চলের ইউয়ে-চি জাতির বন্ধুত্বের প্রস্তাব নিয়ে। এই ইউয়ে-চি-রা শক জাতীয়, মধ্য এশিয়ার আদি বাসভূমি থেকে হূনগণ কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে বাক্ট্রিয়া অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল, এবং সেখানে গ্রীকদের স্থলে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছিল। সম্রাট আশা করেছিলেন ইউয়ে-চি-রা তাঁব সঙ্গে হাত মিলিযে তাদেব পরম শত্রু হূনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, কিন্তু তাঁব সে আশা পূর্ণ হল না। ইউয়ে-চি-রা হূনদের সঙ্গে তাদের পূর্ব-শত্রুতা বিস্মৃত হযেছিল, সন্ধিব প্রস্তাব তারা গ্রহণ করল না। চ্যাং চিয়েন তখন দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। চীন দেশ থেকে বাক্ট্রিযা অঞ্চলে যাতাযাতের পথ হূনদের বাসভূমিব ভিতব দিযে। সে অঞ্চলে যাবার সময় হূনগণ কর্তৃক ধৃত হযে তাঁকে দশ বৎসর বন্দী অবস্থায থাকতে হয়, দেশে ফিরবার সময় তিনি আবার আটক পড়েন। তাঁব এই বিপদসংকুল ভ্রমণ কিন্তু এক হিসাবে সার্থক হয়েছিল। পববর্তী কালে যে পথে বৌদ্ধধর্ম চীনে প্রবেশ করে জাতীয ধর্মজীবনে গভীব বেখাপাত কবেছিল, ভারতবর্ষে যাতাযাতেব সেই পথটির সন্ধান চীন পেয়েছিল চ্যাং চিয়েনেব ভ্রমণের ফলে। সে সময়ে কিন্তু ভাবত সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান অপরিণত ছিল বলতে হয়। তিনি সেখানে ভাবতীয় কাপড ও বাঁশেব জিনিস দেখেছিলেন এবং সেগুলিকে চীনের সেচুযান প্রদেশের শিল্পদ্রব্য বলে ভুল করেছিলেন।

পশ্চিম অঞ্চলের দ্বার মুক্ত হল যেমন, চীনের প্রতিষ্ঠাও তেমনি বর্ধিত হতে লাগল। তারিম উপত্যকা সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করল। সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সঙ্গে বুভুক্ষা আরও বেড়ে চলেছিল। পরে যে অঞ্চলকে ফারগনা বলা হত সম্রাট সে দেশে রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করলেন কব দাবি করে। দাবি অগ্রাহ্য কবলেন সেখানকার নৃপতি এবং এই নিয়ে মনোমালিন্যের পর ঘটনাক্রমে চীনা রাজদূতগণ নিহত হলেন। এই হত্যাব প্রতিশোধ নেবার জন্য সম্রাট উ তাঁর সেনাপতি লি কুয়ান-লি-কে সসৈন্যে ফারগনা প্রদেশে পাঠালেন (১০৪ খৃঃ পূঃ)। লি কুয়ান-লি-র প্রথম অভিযান ব্যর্থ হল, কিন্তু দ্বিতীয় আক্রমণ জয়যুক্ত হযেছিল। দুই হাজার মাইল মরুপথ লঙ্ঘন

করে এই দূর দিগন্তের অভিযান হ্যান-যুগীয় সাম্রাজ্যবাদের আত্মশক্তির ওপর গভীর বিশ্বাসের নিদর্শন।

লি কুয়ান-লি-র যুদ্ধজয়ের ফল সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। চীন থেকে নানা স্থানে রাষ্ট্রদূত প্রেরিত হল, পারস্যের পার্থিব নৃপতি মিত্রিদাতিসের সঙ্গে বাণিজ্যিক সন্ধি স্থাপিত হল, এবং সেই সূত্রে পারস্য, মেসোপটেমিয়া, এমন কি রোমান সাম্রাজ্যের নানান বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ চীনাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। পশ্চিম জগতের সঙ্গে এই প্রথম পরিচয়ের সূত্র ধরেই বোধ করি পরবর্তী কালে রোমের সঙ্গে বাণিজ্য শুরু হয়েছিল সাক্ষাৎভাবে অথবা পরোক্ষভাবে বিদেশী বণিকের মারফত। রোম থেকে মসলা, মুক্তা ও মূল্যবান পাথর আমদানির বিনিময়ে চীন পাঠাত রেশম।

সাম্রাজ্যের প্রসারের সঙ্গে নানান দেশ থেকে সংগৃহীত দ্রব্যসম্ভার রাজপ্রাসাদের জাঁকজমক বৃদ্ধি করেছিল বটে, কিন্তু ব্যাপকভাবে যুদ্ধ অভিযান রাজকোষ শূন্য করে দিয়েছিল যার জন্য সম্রাটকে অর্থ সংগ্রহের একটি নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়েছিল। সম্রাটের ছিল একটি শ্বেত হরিণ, দুর্লভ জীব সেটি, রাজ্যে তার জোড়া ছিল না। মন্ত্রীর পরামর্শে সেই হরিণটিকে হত্যা করে তার চামড়া দিয়ে নোট প্রস্তুত করা হল। প্রতিটি নোটের মূল্য চার লক্ষ তাম্রমুদ্রা ধার্য করা হল। রাজন্যবর্গ যখন সম্রাটের দরবারে আসতেন প্রথামত সম্মান প্রদর্শনের জন্য তখন তাঁদের প্রত্যেককে সেই 'শ্বেত হরিণের চর্ম নোট' ক্রয় করতে বাধ্য করা হত। তা ছাড়া, অর্থ বা তৎপরিবর্তে মেষ উপঢৌকনের পুরস্কারস্বরূপ উপাধি দান শুরু হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে হ্যান যুগের ঐতিহাসিক জুমা চিয়েন ব্যঙ্গ করে বলেছেন, "সরকারকে মেষ দানে ল্যাং উপাধি লাভ করা যেত।" এইসব অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করেও যখন সম্রাট যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করতে অসমর্থ হলেন তখন তিনি অভিজাতবর্গকে প্রচলিত প্রথা অনুসারে মুদ্রা প্রস্তুতের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে কৃত্রিম মূল্যের খাদ-মেশানো নূতন মুদ্রা তৈরি আরম্ভ করলেন, কিন্তু তার পরিণাম-ফল শুভ হল না। অসাধু ব্যক্তিরা সেই মুদ্রা জাল করে লাভবান হতে লাগল এবং জালের দরুন মৃত্যুদণ্ডের বিধান থাকা সত্ত্বেও অপরাধ বন্ধ হল না। পরবর্তী পর্যায়ে সরকার লৌহ ও লবণের শিল্প-বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার নিজের হাতে

তুলে নিলেন। লৌহ-কারখানাসমূহ ও লবণ প্রস্তুত সরকারের কর্তৃত্বাধীনে কতিপয নির্বাচিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক পরিচালিত হতে লাগল। কৃষকদের করভার লাঘব করা হয়েছিল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, দোকানদার ও কারিগরদের যাবতীয় ধনসম্পদের ওপর মোটা হারে কর ধার্যের ব্যবস্থা করা হল। এই আইন এমন কঠিনভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল যে ব্যবসায়ীরা ধ্বংসমুখে পতিত হল, সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি লুপ্ত হল, অযথা ব্যয়ের হুল্লোড় পড়ে গেল। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি বন্ধ করবার প্রয়োজন দেখা দিল। মূল্যবৃদ্ধি রোধের যে উপায় অবলম্বন করা হল তার নাম 'পিং চুন', অর্থাৎ 'সমীকবণ'। বিস্তৃত সাম্রাজ্য-মধ্যে যে অঞ্চলে কোন দ্রব্যের প্রাচুর্য দেখা দিয়েছে, রাজকর্মচারীরা সেখানে সেই-সব জিনিস ক্রয় করে মহার্ঘ মূল্যের স্থানসমূহে চালান দিতে লাগল। পরিবহনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয়েছিল মাল চালানের জন্য। এইরূপে ঘাটতি অঞ্চলে দ্রব্য সরবরাহ করে দুর্ভিক্ষের নিরসন করা হয়েছিল। উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চল সংযুক্ত করে কযেকটি বৃহৎ খাল কাটা হযেছিল, সেইসব খাল দিযে নৌকাযোগে বিভিন্ন স্থানে মাল সরববাহ করা হত। এই খালগুলি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সৃষ্টি করেছে যেমন, নানা স্থানের মধ্যে তেমনি রাজনৈতিক সংযোগ রক্ষার সুবিধা করেছে। সেই সঙ্গে জলসেচ ও প্লাবন রোধের ব্যবস্থা দ্বারা উন্নতিও সাধিত হয়েছিল।

সম্রাট উ-র উপরোক্ত প্রণালীমত কববৃদ্ধি প্রচেষ্টার, বিশেষত লৌহ ও লবণ শিল্পের রাষ্ট্রীকরণ পদ্ধতির কঠোর সমালোচনা করেছিলেন তৎ-কালীন পণ্ডিতেরা। এ বিষয়ে পণ্ডিতবর্গের সঙ্গে রাজমন্ত্রীর সুদীর্ঘ আলোচনা, বাগ্-বিতণ্ডার পূর্ণ বিবরণ প্রাচীন ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে। বিরুদ্ধ পক্ষেব আপত্তির কারণ, প্রথমত, রাষ্ট্রীকরণের ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও নিকৃষ্ট জিনিস নির্মাণ অবশ্যম্ভাবী। (এই যুক্তি অনেকটা আধুনিক কালে সমাজতন্ত্র বা সোসিয়ালিজমের বিরুদ্ধে ধনতন্ত্রের অভিযোগের মতই শোনায়!) দ্বিতীয়ত, প্রাচীন স্বর্ণযুগের সনাতন নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ। সম্রাটের মন্ত্রী স্যাং হুং ইযাং এই উভয়বিধ আপত্তি খণ্ডন করেন 'লেজিস্ট' বা আইন-সেবী সম্প্রদায়ের যুক্তির শরণ নিয়ে। তিনি বললেন, "বর্বর সিয়াং নু-গণ বারবার সীমান্ত অতিক্রম করে 'মধ্যম রাজ্য'কে ("Middle Kingdom") উপদ্রুত করেছে,

অধিবাসীদের হত্যা করেছে। তাদের অপরাধের সমুচিত শাস্তি প্রয়োজন।··· আমার স্থির অভিমত এই যে লৌহ ও লবণের রাষ্ট্রীকৃত কারবার তুলে দিলে সরকারের সামরিক পরিকল্পনা ও সীমান্ত সরবরাহের সমূহ ক্ষতি হবে।" বিদ্যাবিশারদগণ তখন কনফুসীয় নীতিধর্মের কথা অবতারণা করলেন এই বলে, রাজা সুবিধা-অসুবিধা, লাভ-ক্ষতির কথা চিন্তা না করে "তাঁর নিজের উদার ও মহানুভব আচরণের দ্বারা প্রজাদের শিক্ষাদান করবেন, তাদের শ্রদ্ধা অর্জন করবেন। তখন প্রজারা হবে তাঁর অনুরক্ত, দূর দেশের লোকেরাও তাঁর কর্তৃত্ব মেনে নেবে।···যে রাজার প্রশাসন মহানুভবতার ওপর প্রতিষ্ঠিত সে অপরাজেয়। তার অর্থব্যয়ের প্রয়োজন কি?" মন্ত্রী স্যাং হু ইয়াং অসহিষ্ণুভাবে বলে উঠেছিলেন, "বিদ্যাবাগীশদের তর্ক আকাশপানে ধায়, নয় চায় পাতালে প্রবেশ করতে। এসব লোকের সঙ্গে আলোচনা নিষ্ফল।"

সম্রাট সি হুয়াং তি যে বিরাগবশত কনফুসীয় শাস্ত্রের সমূল উচ্ছেদ করবার চেষ্টা করেছিলেন তার কারণ পণ্ডিতবর্গের উপরোক্ত বিতণ্ডা থেকে অনেকটা বোঝা যায়। বাস্তব অবস্থার বিচার না করে শাস্ত্রের নামে বদ্ধমূল সংস্কার ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থের অনুকূল যুক্তির অবতারণা পণ্ডিতসমাজের একরকম স্বভাবসিদ্ধ হয়ে পড়েছিল। হ্যান বংশীয়দের সময়ে কনফুসীয় নীতিধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও 'লেজিস্ট' বা 'আইন-সেবী' সম্প্রদায়ের প্রভাব নষ্ট হয় নি, স্বাধীনভাবে যুক্তিতর্কও বন্ধ হয় নি। বস্তুত এই সময়কার নীতিধর্মে কনফুসিয়াস বা মেনসিয়াস অপেক্ষা মোৎসি-তত্ত্বেরই প্রাধান্য বেশি দেখা যায়।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে সম্রাট উ-র রাজত্বকাল সুমা চিয়েন কর্তৃক 'সি চি' নামে প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য খ্যাত। সুমা চিয়েন খৃঃ পূঃ ১৪৫ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। রাজ-জ্যোতিষী সুমা তান-এর পুত্র তিনি, রাজ্যের নানা স্থান ভ্রমণ করেন এবং কিছুকাল সাম্রাজ্যের সদ্য-অন্তর্ভুক্ত জেচুয়ান ও ইউনান প্রদেশে সরকারী পরিদর্শকের কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। কোন কারণে সম্রাটের বিরাগভাজন হয়েছিলেন বলে প্রচলিত শাস্তির বিধানমত তাঁর পুরুষত্ব নষ্ট করা হয়। ইতিহাস-সাহিত্যের চর্চা আরম্ভ করেছিলেন তিনি এই ঘটনার পূর্বে, সেই ইতিহাস রচনার কাজই তাঁর প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠেছিল জীবনের এই মর্মান্তিক দুর্বিপাকের পর। আদিকাল থেকে রাজাদের রাজত্বের

কথা, রাজনৈতিক ঘটনা-প্রবাহ, প্রধান ব্যক্তিদের জীবনী, বর্ষপঞ্জী, অর্থনীতি, সংগীত, ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ড, ফলিত জ্যোতিষ প্রভৃতি সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গ, এইসব বিষয়ের বিশদ বর্ণনা রয়েছে জুমা চিয়েন রচিত 'সি চি' গ্রন্থে। ফলত এই গ্রন্থই পরবর্তী কালের ঐতিহাসিকদের আদর্শ হয়ে উঠেছিল এবং জুমা চিয়েন-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন তাঁরা এক-একখানা সুবৃহৎ 'বংশের ইতিহাস' রচনা করে।

সাম্রাজ্যের ঐক্য স্থাপনের অনুকূল ধর্মানুষ্ঠান-পদ্ধতির প্রবর্তন করেছিলেন সম্রাট উ, এবং সেই সঙ্গে দেবদেবীর কল্পনারও পরিবর্তন হয়েছিল। বিপুল সমারোহ করে তাই-সান পর্বতেব পবিত্র চূড়ায় স্বর্গ-পূজার (ফেং) অনুষ্ঠান করতেন স্বয়ং সম্রাট, ভূতলে পৃথ্বীদেবতার অর্চনা (স্যান) কবা হত। স্বর্গ-রাজ্যেব প্রতিরূপ সাম্রাজ্য, স্বর্গের পূজা সাম্রাজ্যের ঐক্য কল্পনার সহায়তা করে। পৃথ্বীদেবতা (তি) স্থানীয় দেবদেবী ও প্রাকৃতিক শক্তিপুঞ্জের অধীশ্বব, সেজন্য পৃথ্বীর পূজা স্থানীয় ক্ষুদ্র বাজ্যগুলিব ওপর সাম্রাজ্যের আধিপত্য ব্যঞ্জনা করে। এইরূপে যে দেবমঞ্চেব কল্পনা করা হযেছিল সেখানে স্বর্গদেবতাদের ওপর "পঞ্চ সম্রাটে"র স্থান দেওয়া হয়েছিল, তাঁরা চারটি দিঙ্‌মণ্ডল ও কেন্দ্র অধিকার করে থাকতেন, আর সকলের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল মহান একেশ্বর ("The Great One") তাই-আই।

ওয়াং মেং

পূর্বে বলা হয়েছে হ্যান বংশের প্রতিষ্ঠাতা লিউ প্যাং কি জন্যে সামন্ত-তন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তনে বাধ্য হয়েছিলেন। এই নূতন সামন্তকুলের সৃষ্টি হয়েছিল রাজার আত্মীয়স্বজন প্রভৃতির মধ্য থেকে, এবং কঠোর নিয়ন্ত্রণেব ব্যবস্থা সত্ত্বেও এই প্রথার অন্তর্নিহিত দোষগুলি যথাকালে ফুটে উঠেছিল। মহিষীদের প্রভাবে রাজার শ্যালকেরাই অনেক স্থলে প্রধান হযে উঠত। রাজার মৃত্যুব পর নূতন বাজমহিষীর আত্মীয়েরা মৃত রাজার অনুগ্রহপুষ্ট শ্যালকদের হত্যা বা বিতাড়িত করত। এইরূপে আত্মীয় সামন্তগণের অবিশ্রাম অন্তর্দ্বন্দ্ব নূতন প্রথার সূচনা থেকেই রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল শিথিল করে দিয়েছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সম্রাট উ-র মৃত্যুর (৮৭ খৃস্ট পূর্বাব্দ) পর এমন কোন সুযোগ্য নৃপতির আবির্ভাব হল না যিনি রাজদরবারের আভ্যন্তরীণ অনাচার ও ষড়যন্ত্রের

মূলোৎপাটন করতে পারেন। প্রজারা দুর্গতির চরম সীমায গিয়ে পৌঁছেছিল, আর বিপ্লবের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হল তখনই। সম্রাজ্ঞীর আত্মীয় ওয়াং মেং নামক জনৈক ব্যক্তি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত নৃপতিকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করে তাঁর শিশুপুত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং নিজে তার অভিভাবকরূপে রাজ্য শাসন করতে থাকেন। শেষ পযন্ত কিন্তু সিংহাসন অধিকার করবার লোভ সংবরণ কবতে পারেন নি তিনি। ৯ খৃস্ট পূর্বাব্দে ওয়াং মেং নিজেকে সম্রাটরূপে ঘোষণা করে 'সিন বংশে'র প্রতিষ্ঠা করেন।

ওযাং মেং প্রতিষ্ঠিত বংশটি লুপ্ত হযেছিল তাঁব মৃত্যুর সঙ্গেই, কিন্তু এই পবস্বাপহারীব বাজত্বকালে এমন কতগুলি সংস্কারকার্য অনুষ্ঠিত হযেছিল যার চমৎকারিত্ব ইতিহাসের পৃষ্ঠায বিশেষ চিহ্ন অঙ্কিত করে রেখেছে। কতগুলি অনাচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজাদের অভিযোগ শতাব্দীকাল ধরে মাঝে মাঝে শোনা যেত, কিন্তু তাব কোন প্রতিবিধান হয নি। রাজ্যের অধিকাংশ জমি ছিল ভূম্যধিকারীদেব খাস সম্পত্তি, হতভাগ্য প্রজাদের জমি ভোগের জন্য উঁচু হারে খাজনা দিতে হত। ক্রীতদাসদের ওপর অমানুষিক ব্যবহার করা হত, প্রভুদেব হাতে ছিল তাদের জীবনমরণ। ওযাং মেং নিজে ছিলেন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি, পণ্ডিতমণ্ডলী কর্তৃক পরিবৃত হযে থাকতে ভালবাসতেন। পণ্ডিতদেব মধ্যে যারা আদর্শবাদী, সম্ভবত তাদের আদর্শের ছোযাচ তাঁকে স্পর্শ করেছিল এবং সেজন্যই তিনি যুগান্তকর সংস্কারকার্যে ব্রতী হযেছিলেন। তিনি জমিদারী প্রথা তুলে দিলেন, রাষ্ট্রীকৃত ভূমি প্রজাদের মধ্যে বণ্টন করা হল এবং সেই সঙ্গে বিক্রি দ্বারা জমির হস্তান্তরও নিষিদ্ধ হয়েছিল। ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদ এবং মুদ্রা প্রচলন ব্যবস্থার সংস্কার করা হল। বিভিন্ন মূল্যের মুদ্রা প্রস্তুত আরম্ভ হয়েছিল, পুরনো আমলের কড়িও মুদ্রার মর্যাদা লাভ করল। সম্রাট উ প্রবর্তিত লৌহ, লবণ ও মুদ্রা প্রস্তুতের একচেটে রাষ্ট্রীয় অধিকার পূর্ববৎ বহাল রেখে রাষ্ট্রীকরণের তালিকায কযেকটি নূতন বিষয অন্তর্ভুক্ত হল, যেমন মদ্য ও খনি। অতিরিক্ত মাল ক্রয় করে বিভিন্ন স্থানে সরবরাহের কাজও পূর্ববৎ চলতে লাগল। তা ছাড়া সরকার প্রজার প্রয়োজন অনুসারে বিনা সুদে ঋণ দানের ব্যবস্থা করলেন।

আধুনিক দৃষ্টিতে ওয়াং মেং-এর এই প্রগতিশীল ব্যবস্থাগুলি অনেক

ক্ষেত্রে প্রশংসার্হ, কিন্তু সে-কালের জনসমাজ, বিশেষত জমিদার, ব্যবসায়ী ও সনাতনপন্থী পণ্ডিতগোষ্ঠী অর্থনৈতিক সংস্কারের ঘোর বিরোধী হয়ে উঠেছিল। জমি বিক্রি ও ক্রীতদাস প্রথা রদ সংক্রান্ত আইন প্রত্যাহার করতে হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও চারদিকে বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। প্রজার হিতার্থ কৃষিজীবীর কল্যাণের জন্য অনুষ্ঠিত কাজগুলির অশুভ পরিণাম দেখে অতিমাত্র বিচলিত হয়েছিলেন ওয়াং মেং, কিন্তু কর্মে বিরাম ছিল না তাঁর, আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে প্রতিকারের ব্যবস্থায় মন দিয়েছিলেন। "লাল ভুরু" ("Red Eyebrows") নামে এক সংখ্যাবহুল গোপন ষড়যন্ত্রকারী দল বিলক্ষণ তৎপর হয়ে উঠেছিল, এবং সেই সঙ্গে রাজবংশাবতংস লিউ পরিবার তাঁদের হৃত সিংহাসনের ওপর দাবি নিয়ে ওয়াং মেং-এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। এই বিশৃঙ্খলার সুযোগে প্রত্যন্তের দেশগুলি কক্ষচ্যুত হয়ে খসে পড়ল। পরিশেষে ২৩ খৃস্টাব্দে রাজধানী চাং-আন শহরে বিদ্রোহীদের হস্তে জরাগ্রস্ত ভগ্নচিত্ত ওয়াং মেং নিহত হলেন। তাঁর অর্থনৈতিক নববিধানও সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়ে গেল।

পূর্বাঞ্চলের বা উত্তরকালের হ্যান বংশ : সম্রাট কুয়াং উ

নূতন সম্রাট সিংহাসনে আরোহণ করে 'কুয়াং উ' অর্থাৎ 'উজ্জ্বল ও সাহসী' নাম গ্রহণ করেন, এবং 'পূর্বাঞ্চলের হ্যান বংশ' অথবা 'উত্তরকালের হ্যান বংশ' নামে একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। চাং-আন থেকে পূর্বাঞ্চলে বর্তমান হোনান প্রদেশে লো-ইয়াং নামক শহরে রাজধানী স্থানান্তরিত করা হল। প্রথমেই সম্রাট দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তিস্থাপন কার্যে মন দেন, তারপর বহির্দেশের করদ রাজ্যগুলির ওপর কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হন। 'লাল ভুরু' নামক সন্ত্রাসবাদী দলকে সহজেই দমন করা হয়েছিল। লোহিত নদীর অববাহিকা এবং আনাম পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড পুনর্বিজয় করা হয়েছিল। চি'ন ও হ্যান বংশীয়দের লুপ্ত গৌরব আবার ফিরে এসেছিল।

সম্রাট কুয়াং উ একজন কনফুসীয়পন্থী বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী পুরুষ ছিলেন, রাজসভায় পণ্ডিতকুল-পরিবৃত হয়ে থাকতেন। চীন দেশের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় তিনিই স্থাপন করেছিলেন। স্কুলগুলিতে নৈতিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা

হয়েছিল। তিনি ছিলেন অত্যন্ত আচারনিষ্ঠ, রাজকীয় অনুষ্ঠানাদি কনফুসীয় রীতি অনুসারে সম্পন্ন করতেন।

সম্রাট মিং

কুয়াং উ-র পুত্র সম্রাট মিং-এর রাজত্বকালে (৫৮-৭৬ খৃস্টাব্দ) একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল। সম্রাট স্বপ্ন দেখেছিলেন, একটি 'স্বর্ণ-মূর্তি' প্রাসাদ-অঙ্গনে এসে দাঁড়িয়েছে দক্ষিণ হস্তে দুইটি তীর নিয়ে। বৌদ্ধ-ধর্ম ও বুদ্ধমূর্তি সে-কালে চীনাদের অপরিচিত ছিল না, কারণ ইতিপূর্বে সৈনিকেরা যুদ্ধাভিযানকালে বৌদ্ধ দেশগুলি থেকে অনেক বুদ্ধমূর্তি নিয়ে চীনে ফিরেছিল। রাজার স্বপ্নের এই অর্থ করা হল যে পশ্চিম দেশে একজন মহামানব জন্মগ্রহণ করেছেন। সম্রাট মিং অবিলম্বে রাজদূত প্রেরণ করেন ইন্দো-পারথিয়ান রাজা গনদবফাসের কাছে। সেখান থেকে রাজদূত অনেক তালপত্রে লিখিত পুঁথি, মূর্তি সহ কাশ্যপ মাতঙ্গ ও ধর্মারণ্য নামে দুজন বৌদ্ধ শ্রমণকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এসেছিলেন।

পঁয়ষট্টি বছর পূর্বে পশ্চিমের দেশগুলির সঙ্গে চীন সাম্রাজ্যের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ঘটেছিল, তারিম উপত্যকার হূনগণের উপদ্রবে সেই বাণিজ্য এখন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সম্রাট মিং পশ্চিমাঞ্চলে হূনদের বিরুদ্ধে একটি সামরিক অভিযান প্রেরণ করলেন। অভিযানের উদ্দেশ্য শান্তি স্থাপন এবং পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে চীনের বন্ধুমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত করা। এক অসাধারণ উদ্যোগী পুরুষের একনিষ্ঠ কর্মোদ্যমের ফলে অভিযান সফল হয়েছিল। সেই ব্যক্তির নাম প্যান চাও। পশ্চিমের প্রথম পথ-প্রদর্শক ছিলেন চ্যাং চিয়েন, তাঁর কথা পূর্বে বলা হয়েছে। দু শ' এগারো বছর পূর্বে চ্যাং চিয়েন যে কাজ শুরু করেছিলেন সেই কাজ সম্পূর্ণ করলেন প্যান চাও। ভদ্র-পণ্ডিত পরিবারের সন্তান তিনি, প্রথম যৌবনে কোন সরকারী আপিসে কেরানীর কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ভবিষ্যদ্বাণী রূপে এক জ্যোতির্বিদ তাঁকে বলেছিলেন, "এখন আপনার অবস্থা যত হীনই হোক না কেন, একদিন আপনি সম্রাট-দত্ত উপাধি লাভ করবেন, দূর দেশ শাসন করবেন, দশ হাজার মাইল পর্যন্ত আপনার প্রভাব বিস্তৃত হবে।" জ্যোতির্বিদের কথায় বিশ্বাস করে প্যান চাও কেরানীগিরি ছেড়ে সিয়াং নু-দের বিরুদ্ধে অভিযান-বাহিনীতে যোগ দিলেন,

এবং বল-বীর্য প্রদর্শন দ্বারা শীঘ্রই সৈন্যাধ্যক্ষের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।* সৈন্যাধ্যক্ষ প্যান চাওকে সেন-সেন রাজ্যে প্রেরণ করলেন। সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী সিয়াং নু-দের রাষ্ট্রদূত-মণ্ডলীকে কূটনৈতিক কৌশলে পরাজিত করে প্যান চাও চীনের সঙ্গে সেন-সেন রাজ্যকে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করেন। ত্রিশ বৎসর ব্যাপী অক্লান্ত পরিশ্রমে মরু, পর্বত, বনানী অতিক্রম করে পশ্চিমে রাশিয়া ও দক্ষিণ-পশ্চিমে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত মহাচীনের শক্তিমন্ত্রের প্রচার করেছিলেন তিনি। বিনা যুদ্ধে পঞ্চাশটিরও অধিক রাজ্য চীনসম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেছিল, রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের চীনা রাজধানী লো-ইয়াং নগরে প্রতিভূস্বরূপ পাঠিয়েছিল। বস্তুত স্বদেশকে জগতের কাছে মহিমান্বিত করে তুলবার জন্য প্যান চাও-র অসাধারণ প্রচেষ্টা ও যত্ন সর্বতোভাবে সার্থক হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক Latourette বলেছেন, "His (Pan Chao's) exploits were certainly equal to those of the great Roman generals and were possibly superior to them."

পতন-কাল

সম্রাট মিং-এর মৃত্যুর পর পতনশীল সমাজের পূর্বলক্ষণগুলি আবার দেখা দিয়েছিল, সেই প্রাসাদ-ষড়যন্ত্র আর খোজাকুলের প্রতিপত্তি। হ্যান স্নন-তি-র রাজ্যকালে (১২৬-১৪৪ খৃঃ) খোজাদের প্রতিপত্তি একটি রাজনৈতিক সমস্যা হয়ে উঠেছিল। এইসব রাজভৃত্য কিরূপে সম্রাটের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল, সে কথা প্রণিধান করতে হলে সম্রাটগণের সামাজিক সংস্রব-বর্জিত একান্ত নিভৃত জীবনযাত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হয়। সম্রাটকে প্রাসাদ ও সংলগ্ন উদ্যান-মধ্যে থাকতে হত, প্রাচীরের বাইরে যাবার রীতি ছিল না। মন্ত্রীদের সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ ছিল একটি নৈষ্ঠিক ব্যাপার, আদবকায়দা রক্ষা করে চলাই ছিল প্রধান কর্ম।

* খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দের শেষ ভাগে একজন কুশান নৃপতির সঙ্গে সেনাপতি প্যান চাও-র একটি প্রসিদ্ধ যুদ্ধের উল্লেখ করেছেন চীনা ঐতিহাসিকেরা, কিন্তু কুশান নৃপতির নাম বলা হয় নি। কোন কোন পণ্ডিতের মতে দ্বিতীয় ক্যাডফিসিস (Kadphises II) সেই কুশান-রাজ, উত্তর ভারতের অধীশ্বর কনিষ্ক তাঁরই বংশধর বলে খ্যাত।

প্রহরীবেষ্টিত রাজা যখন ভ্রমণে বের হতেন, রাজপথ থেকে সমস্ত লোকজনকে সরিয়ে দেওয়া হত, কোন লোকের দৃষ্টি যেন রাজার ওপর না পড়ে। এরূপ অবস্থায় রাজ-অন্তঃপুরবাসী খোজা নপুংসকদের রাজার চারিত্রিক দুর্বলতা, খামখেয়াল, অভিরুচি প্রভৃতি ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ্য করবার অবসর হত, এবং সেগুলির সুযোগ গ্রহণ করতেও তারা ছাড়ত না। এক দিকে খোজাদের প্রভাব, অন্য দিকে রাজ-শ্যালকগণও সম্রাটের প্রিয় মহিষীদের কল্যাণে প্রতিপত্তিশালী হয়ে উঠত, তখন উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা একটি সংকটপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি করত। এরূপ কোন সংকটকালে যখন সম্রাজ্ঞীর মৃত্যু হল, সম্রাট হ্যান হুয়ান তি (১৪৬-১৬৭ খৃঃ) তখন একটি প্রাসাদ-বিপ্লবে খোজাদের সাহায্যে শ্যালক-গোষ্ঠীকে নির্মূল করেছিলেন। পরাক্রান্ত শ্যালকেরা সিংহাসন গ্রাস করবে এই ছিল সম্রাটের আশঙ্কা, এখন তাদের অন্তর্ধানের পর সবিস্ময়ে দেখলেন তিনি, নিরঙ্কুশ খোজাকুলের অনিষ্ট সাধনের ক্ষমতা শ্যালক-গোষ্ঠীর তুলনায় অনেক বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। বিত্ত অর্জন ছিল খোজাদের একমাত্র লক্ষ্য, এবং এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য এমন দুষ্কর্ম নেই যা এই নীচকুলজাত ব্যক্তিরা না করতে পারত। অচিরে তারা শাসনযন্ত্র হস্তগত করল, রাজকর্মচারীদের পরিচালনা-ভার গ্রহণ করল, তাদের নিয়োগ ও পদোন্নতি নির্ভর করত এই খোজাদের অর্থদানে পরিতুষ্টি সাধনের ওপর। খোজাদের এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ যে একেবারে হয় নি তা নয়। রাজকর্মচারীর পদে একচেটিয়া অধিকার বিদ্বৎসমাজ সম্রাট উ-র কাল থেকে নির্বিঘ্নে ভোগ করে এসেছিল, খোজাদের স্বৈরাচারে বিদ্বান-মণ্ডলী ক্ষুব্ধ হল। ঐক্যবদ্ধ হয়ে তারা খোজাদের বিরুদ্ধে একটি দল গঠন করল, দলের পিছনে ছিল জনগণের সমর্থন। এই পণ্ডিতসংঘ কতিপয় অত্যাচারী খোজার দণ্ডদানের ব্যবস্থা করেছিল, এবং তাদের কার্য যদি সম্রাট হ্যান লিং তি সমর্থন করতেন তবে হয়তো খোজাদের উৎপীড়ন বন্ধ করা সম্ভব হত। কিন্তু এই নূতন সম্রাট ছিলেন বারো বছরের অর্বাচীন বালক। খোজাদের কবলে এমন অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করলেন তিনি যে তাদের প্ররোচনায় বিনা দ্বিধায় পণ্ডিতসংঘকে দমন করলেন এবং সংঘের অনেক সদস্যকে প্রাণদণ্ডে বা কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। খোজাদের কথায় শিশু সম্রাটের মনে সত্যই এই বিশ্বাস জন্মেছিল যে সম্রাটকে সিংহাসনচ্যুত করবার

জন্য রাজদ্রোহমূলক কার্য করাই ছিল পণ্ডিতসংঘের ব্রত, এবং তাদের সেই ষড়যন্ত্র পণ্ড করে দেবার জন্য তিনি এই বিশ্বাসী পরম অনুগত খোজা সম্প্রদায়ের কাছে প্রকৃতই ঋণী। সম্রাটের দমন-নীতি ও খোজাদের সর্বময় প্রভুত্ব যে অগ্নি প্রজ্বলিত করেছিল হ্যান সাম্রাজ্যের পতন তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

প্রথমে দেখা দিল 'হলদে পাগড়ি' ("Yellow Turban") দলের বিদ্রোহ। ইতিপূর্বে 'লাল ভুরু' দলের কথা বলা হয়েছে, 'লাল ভুরু'র মত 'হলদে পাগড়ি'ও* একটি গুপ্ত সন্ত্রাসবাদী সমিতি। এই সমিতির দলপতি ছিলেন একজন হাতুড়ে বৈদ্য, নাম চ্যাং চুয়ে। মহামারীর সময় কয়েকজন রোগীকে নিরাময় করেছিলেন, সেজন্য জনগণের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছিলেন। 'হলদে পাগড়ি' দল গঠন করে তিনি এখন খোজা-শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করলেন। রাজশক্তিকেও তখন বিপুল সৈন্যসমাবেশ করতে হল বিদ্রোহ দমনের জন্য। এইরূপ সংকটকালে ১৮৯ খৃস্টাব্দে সম্রাট হ্যান লিং তি-র নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যু ঘটে। শাসন-ক্ষেত্রে এমন কি সামরিক ব্যাপারেও খোজাদের হস্তক্ষেপ সৈন্যবাহিনীর পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। সম্রাটের মৃত্যুর পর রাজশক্তি করায়ত্ত করবার জন্য খোজাদের সঙ্গে সৈন্যবাহিনীর সাক্ষাৎ-সংঘর্ষ বাধল। পরিশেষে সৈন্যবাহিনীর জয় হয়েছিল, প্রাসাদ-মধ্যে প্রত্যেকটি খোজা নিহত হল, এবং এই ডামাডোলের মধ্যে নূতন সম্রাট সিয়েন তি একজন নিষ্ঠুর প্রকৃতির সেনাপতির হস্তে পতিত হলেন। এই সেনাপতির নাম তুং চো। তিনি রাজধানী লো-ইয়াং শহরকে অগ্নিদাহে ভস্মীভূত করে নামমাত্র সম্রাটকে সঙ্গে নিয়ে চাং-আন নগরে এসে উপস্থিত হলেন এবং সেখানে সম্রাটের নামে যথেচ্ছ শাসন চালাতে লাগলেন। কিন্তু তাঁর এই শাসন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি। ১৯২ খৃস্টাব্দে বিরুদ্ধ পক্ষের জনৈক আততায়ীর হাতে তিনি নিহত হন।

ক্ষমতালিপ্সু প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে আবার চলল তুমুল সংগ্রাম। এই অরাজক অবস্থায় সাও-সাও নামে একজন কর্মদক্ষ, সুচতুর, ধূর্ত প্রকৃতির

---

* হ্যান যুগ থেকে এরূপ গুপ্ত সমিতির আবির্ভাব প্রায়ই দেখা গিয়েছে। আধুনিক কালের 'বকসার'গণের একটি গুপ্ত সমিতি ছিল, তার নাম 'মধুর মুষ্টি সমিতি' (Society of Harmonious Fist)।

সেনাপতি অর্বাচীন সম্রাটকে মুষ্টিমধ্যে রেখে শাসন পরিচালনা করেন। দক্ষিণাঞ্চলে তখন বিরোধী শক্তির আবির্ভাব হয়েছিল। ২০৮ খৃস্টাব্দে এই অঞ্চলে বিদ্রোহ দমনের অভিযানে ইয়াংসি নদীর নৌ-যুদ্ধে তিনি নিহত হন। সাও-সাও-র মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সাও-পেই পিতার আসন গ্রহণ করেন, এবং কিছুকাল বেনামী শাসনের পর সম্রাটকে কৌশলে রাজপদ পরিত্যাগ করতে সম্মত করান, তারপর তিনি স্বয়ং ওয়েই রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন (খৃঃ ২২১)। ইতিমধ্যে আরও দুটি রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল, ইয়াংসি নদীর দক্ষিণে ও পশ্চিমে সু রাজ্য, আর দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলে উ রাজ্য। এইরূপে হ্যান রাজ্য ভেঙে 'তিনটি রাজ্যে' অর্থাৎ 'ওয়েই, 'সু' এবং 'উ' রাজ্যে বিভক্ত হয়েছিল। 'তিনটি রাজ্যের চীনা নাম 'স্যান কুয়ো'। ২৬৫ খৃস্টাব্দে নব-প্রতিষ্ঠিত সিন বংশ কর্তৃক স্যান-কুয়ো-র একীকরণের পূর্ব পর্যন্ত এই রাজ্য-ত্রয়ের স্বতন্ত্র শাসন এবং সেই সঙ্গে পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ-বিসংবাদ অনবরত চলেছিল।

৩ হ্যান যুগে সংস্কৃতির রূপ

চিন ও হ্যান রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের অভূতপূর্ব রূপান্তর ঘটেছিল। কেন্দ্রশক্তি পরাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল, রোম ব্যতীত চীনের মত প্রবল শক্তিশালী দেশ জগতে তখন ছিল না। একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ফলে বিভিন্ন প্রদেশের উন্মার্গ স্বাতন্ত্র্য-প্রবৃত্তি দমিত হয়েছিল, সমগ্র দেশ জুড়ে একটি মাত্র চীনা সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। সামন্ত-রাষ্ট্রগুলির বিলুপ্তি ঘটেছিল বলে স্থানীয় জাতীয়তা ইউরোপীয় দেশগুলির মত দানা বাঁধতে পারে নি। আজ আমরা মধ্য এশিয়া থেকে প্রশান্ত মহাসাগর, আর সাইবেরিয়া থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত এই বিশাল ভূখণ্ডে মহাচীনের যে সামগ্রিক রূপ দেখতে পাই, সেই মহাচীনের একীকরণ ও সাংস্কৃতিক সমীকরণের কৃতিত্ব চি'ন ও হ্যান বংশের। যে কাজ চি'ন বংশীরা আরম্ভ করেছিলেন, তারই পরিসমাপ্তি ঘটেছিল হ্যান রাজত্ব-কালে। হ্যান বংশীরা সি হুয়াং তি প্রবর্তিত কেন্দ্রের কর্তৃত্বাধীনে প্রশাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তন করেন নি, শুধু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির রদবদল করেছিলেন। চি'ন সম্রাট 'লেজিস্ট' বা আইন-সেবীদের দণ্ডমূলক বিধান

সর্বতোভাবে গ্রহণ করে কনফুসীয় তত্ত্বের সমূল উচ্ছেদ সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন, আর হ্যান সম্রাটগণ সেই লুপ্ত বিদ্যার পুনরুদ্ধার করলেন বটে, কিন্তু অন্য মতবাদগুলিকে দমন করেন নি। হ্যানগণের বিশেষত্ব এই যে তারা কনফুসীয় নীতিধর্মের দ্বারা 'লেজিস্ট' বিধানগুলির কঠোরতা প্রশমিত করে বিশাল সাম্রাজ্যে সর্বাত্মক কল্যাণের ব্যবস্থা করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

মহাচীন গঠিত হল, সাংস্কৃতিক ঐক্যও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু এই বিরাট সাফল্যের যে মূল্য দান করতে হল তাও কিছু অকিঞ্চিৎকর নয়। চৌ-যুগে বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি রূপায়িত হয়ে উঠেছিল, সেই চৌ-যুগীয় সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে বিসর্জন দিয়ে, স্বাধীন স্বতন্ত্র অভিব্যক্তির পথ বন্ধ করে একই ছাঁচে ঢালা একটি সার্বভৌম সংস্কৃতির সৃষ্টি করা হয়েছিল। বিরাট সাফল্যের বিরাট মূল্য স্বাভাবিক। বর্ণবৈচিত্র্যে উজ্জ্বল চৌ-যুগের খণ্ড সংস্কৃতিগুলি স্বাধীনভাবে বর্ধিত হবার সুযোগ পেলে কিছুকালের জন্য হয়তো বা তাদের আতশবাজির চমক লাগানো সম্ভব হত বটে, যেমন দেখা গিয়েছিল ক্যাম্বোডিয়ায় অপরূপ কলা-সৌন্দর্যের বিকাশ। কিন্তু যুগব্যাপী সভ্যতার যে বিরাট সৌধটি চীন দেশে স্থায়ী ভিত্তির ওপর নির্মাণ করা হয়েছিল, ট্যাং ও সুং যুগে যে মহতী সংস্কৃতির আবির্ভাব হয়েছিল শান্তিময় পরিবেশের মধ্যে, এমন কি আজ যে বিপুল সংহতি ও সংগঠন জগৎসভায় চৈনিক সমাজ ও রাষ্ট্রের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য ব্যাকুল, এইসব বিচিত্র ঘটনা অঘটনই থেকে যেত, এবং সে স্থলে আমরা হয়তো কতগুলি লুপ্ত সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার নিয়ে নাড়াচাড়া করেই সন্তুষ্ট থাকতাম।

সিয়াং নু-দের বিরুদ্ধে ক্রমাগত হ্যান অভিযান হূনদের মধ্য এশিয়া থেকে বিতাড়িত করে নানা স্থানে ছড়িয়ে দিয়েছিল। এই বিস্তৃতির চাপে পড়ে ইয়ে-চি নামে একটি খণ্ডজাতি বক্ত্রিয়া থেকে ভারতবর্ষে এসে কুশান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে। ভারতীয় প্রভাবে এই দুর্ধর্ষ জাতির প্রকৃতিগত পরিবর্তন কিরূপ হয়েছিল কুশান-রাজ কনিষ্ক তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। হূনরা দক্ষিণ রাশিয়ায় আশ্রয় নিয়েছিল এবং পরবর্তী কালে ইউরোপে এমন ব্যাপক ধ্বংসলীলার অনুষ্ঠান করেছিল যে তাদের কুকীর্তির কথা ইতিহাস আজও ভুলতে পারে নি। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দের হূন-সর্দার অ্যাটিলার নাম দেওয়া হয়েছে 'ঈশ্বরের

অভিশাপ'। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, হূনদের বিরুদ্ধে পশ্চিমাঞ্চলে অভিযান-কালে দুজন চীনা সেনাপতি চ্যাং চিয়েন ও লি কুযান-লি বিভিন্ন সময়ে সাম্রাজ্যবহির্ভূত দূর দেশসমূহের সঙ্গে কিরূপ সংযোগ স্থাপন করেছিলেন। এই সূত্রে চীনের সঙ্গে রোমান সাম্রাজ্যেরও পরিচয় ঘটে। অবশ্য পরিচয়টা ছিল পরোক্ষ, পরস্পর সাক্ষাৎ-পরিচয় হয় নি। চীনা অভিযাত্রী দল পশ্চিমে ক্যাসপিয়ান সাগরের পূর্ব তীরে এবং দক্ষিণে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত এসেছিল বটে, কিন্তু সমুদ্র পার হয়ে কিংবা পারথিয়ান (পারস্য) সাম্রাজ্য অতিক্রম করে রোম দূরের কথা, রোমান সাম্রাজ্যের প্রান্তদেশেও প্রবেশ করে নি। তথাপি রোম সম্বন্ধে অনেক তথ্য, রোমের সভ্যতা ও সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও রাজনীতি, এমন কি কনসাল নির্বাচনের প্রথাও চীনের অজানা ছিল না। বস্তুত এইসব তথ্য তৎকালীন চীনা ঐতিহাসিক অত্যন্ত নিপুণভাবে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। পক্ষান্তরে চীন সম্বন্ধে রোমের যে কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল এমন প্রমাণ নেই, রোম শুধু চীনকে জানত 'সিরিস' (seres) অর্থাৎ রেশমের দেশ বলে। উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক আদান-প্রদান চলত পারথিয়ার মাধ্যমে, চীনা রেশমের বিনিময়ে রোম স্বর্ণ, মূল্যবান পাথর ইত্যাদি চীনে চালান দিত। চীন-জাত রেশমের চাকচিক্য রোমকে এমনি মোহিত করেছিল যে তার চাহিদা মেটাতে রোমের ভাণ্ডারে স্বর্ণ প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছিল।* রোমের চীনা নাম 'তা চিন' অর্থাৎ 'বৃহৎ চীন'। একটি ঐতিহাসিক বিবরণে প্রকাশ, কয়েকজন গ্রীক বণিক মসলা, মুক্তা, মূল্যবান পাথর, কচ্ছপের চাড়ি প্রভৃতি বাণিজ্য-দ্রব্যসম্ভার নিয়ে চীনের রাজধানীতে এসেছিল এবং সম্রাট-সমীপে নিজেদের রোমান সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রদূত বলে পরিচয় দিয়েছিল। রোমান সম্রাট ছিলেন তখন মার্কাস অরেলিয়াস অ্যানটোনিয়াস, চীনা নাম 'আনটুন' (১৬৬ খৃঃ)। সেই গ্রীক বণিকেরা জলপথে আসার সময় দ্বীপপুঞ্জের বন্দরসমূহে যেসব সওদা-পত্র কিনেছিল সেগুলি চীনে বিক্রি করে প্রচুর লাভবান হয়েছিল। রাষ্ট্রদূত বলে আত্মপরিচয় তাদের মিথ্যা, এবং এই মিথ্যা পরিচয় চীনাদের বিভ্রান্ত

* ঐতিহাসিক Fitzgerald বলেন Indeed it has been suggested that the export of bullion to buy silk was one of the causes of economic distress in the later centuries of the Roman Empire '

করে নি। রোমান সাম্রাজ্য সম্বন্ধে তথ্যাদি তারা বণিক সম্প্রদায়ের মারফতে সংগ্রহ করত। রেশম ছাড়া অন্যান্য বাণিজ্যদ্রব্যের মধ্যে চীন পশ্চিম দেশসমূহকে চর্ম, পশুলোম ও দারচিনি সরবরাহ করত, এবং সেই সব দেশ থেকে চীনে আমদানি হত কাঁচ, মূল্যবান পাথর, কচ্ছপের চাড়ি, পশম ও সুতার কাপড়।

হ্যান যুগে প্রাচীন পুঁথিগুলির পুনরুদ্ধার পূর্ব সংস্কৃতির পুনরাবৃত্তি মাত্র সূচনা করে নি। নূতন অবস্থাগুলির সঙ্গে সংগতি রেখে কনফুসীয় নীতি, তাও-ধর্ম, 'লেজিস্ট'-বিধান, মো-তত্ত্ব, এই সমুদয় তত্ত্ব-দর্শনের সমন্বয়ে এমন একটি মিশ্রণধর্মী সমাজ গড়ে তোলা হয়েছিল, যা শুধু সংস্কৃতির পারম্পর্য রক্ষা করে নি, সাম্রাজ্য গঠনে প্রচুর সাহায্য করেছে এই নব্য সমাজ আর তা স্তম্ভরূপে সেই সাম্রাজ্যকে ধারণ করেছে। সমাজ-সংস্কৃতির এই পুনর্গঠনে সে যুগের ঐতিহাসিকদের অবদান অবিস্মরণীয়। বিস্মৃতির কৃষ্ণ যবনিকা ছিন্ন করে বিগতকালের গৌরব-সমুজ্জ্বল চিত্রপট জনগণের সামনে তাঁরাই মেলে ধরেছিলেন। সেই ঐতিহাসিকদের অগ্রণী ছিলেন 'সি চি' নামে ইতিহাস গ্রন্থ প্রণেতা জুমা-চিয়েন, ইতিপূর্বে যাঁর বিষয় একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে।

১২৪ খৃস্ট পূর্বাব্দে হ্যান রাজধানী চাং-আন শহরে কনফুসীয় বিদ্যার পুনরভ্যুত্থানের একটি প্রকৃষ্ট ফলস্বরূপ চীন দেশের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তারা ছিলেন কনফুসীয় পণ্ডিত-মণ্ডলী, তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল 'প্রাচীন শাসকদের পবিত্র পদ্ধতির প্রসার এবং সাম্রাজ্যের নৈতিক উন্নতি ও বুদ্ধিবৃত্তির সংবৃদ্ধি' ('for the purpose of transmitting the sacred ways of the ancient rulers and achieving the moral and intellectual advancement of the empire')। পঞ্চাশটি মাত্র ছাত্র নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যারম্ভ, প্রথম খৃস্ট পূর্ব শতাব্দের শেষভাগে ছাত্রসংখ্যা বর্ধিত হয়ে তিন হাজার এবং খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দে ত্রিশ হাজারে পৌঁছেছিল। এই বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার আয়োজন কিরূপ একটি বিরাট অনুষ্ঠানের ব্যাপার তা সহজেই বোঝা যায়, বোধ হয় পৃথিবীর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এত অধিক ছাত্রসংখ্যা দেখা যায় নি। শিক্ষার বিষয় ছিল 'প্রাচীন শাস্ত্র পঞ্চক'

("Five Classics")। 'লি চি' বা 'অনুষ্ঠান-পঞ্জী', 'ই কিং' বা 'পরিবর্তন গ্রন্থ', 'সি কিং' বা 'কাব্যগ্রন্থ', 'চুন চিউ' বা 'বাসন্তী ও শারদীয় বিবরণ' এবং 'সু কিং' বা 'ইতিহাস গ্রন্থ'—এই পাঁচটি প্রাচীন বিদ্যার শাস্ত্রগ্রন্থ। প্রাচীন বিদ্যায় পারদর্শী ছাত্রদের দেশ-শাসনকার্যে নিয়োগের জন্য পরীক্ষা-ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়েছিল হ্যান যুগে, সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য শাসনের জন্য তখন অনেক সুদক্ষ, শিক্ষিত, চরিত্রবান কর্মচারীর প্রয়োজন হয়েছিল। এতকাল শাসকেরা ছিলেন অভিজাত বংশীয় ব্যক্তি, এখন সে স্থলে এক শ্রেণীর নূতন শাসকের উদ্ভব হল, তাঁরা পণ্ডিতসমাজের মানুষ বা 'ম্যাণ্ডারিন'। গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত থাকতেন এই ম্যাণ্ডারিনরা। 'সিভিল সার্ভিস' পরীক্ষায় প্রতিযোগিতামূলক পদ্ধতির পরিবর্তন ও ক্রমোন্নতি হয়েছিল সুই ও ট্যাং যুগে, আমরা তা যথাকালে দেখতে পাব।

প্রাচীন বিদ্যার পুনরুদ্ধার ও শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার মত গণিতের উন্নতি-বিধান এ যুগের আর একটি বৈশিষ্ট্য। ইতিপূর্বে আমরা 'সু কিং' গ্রন্থের আলোচনায় দেখেছি, আকাশমণ্ডলে গ্রহনক্ষত্রের অবস্থিতি সম্বন্ধে জ্যোতির্বিদ্যায় চীনাদের জ্ঞান যথেষ্ট অগ্রসর হয়েছিল। গণিতকে জ্যোতির্বিদ্যার ধারক ও বাহক বলা যেতে পারে, সুতরাং মিশর ও ব্যাবিলনের মত চীন দেশেও যে গণিতের গবেষণা অতি প্রাচীন কাল থেকে চলে এসেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু গণিতের প্রাচীনতম গ্রন্থের সাক্ষাৎ পাই আমরা হ্যান যুগে, গ্রন্থটির নাম 'চিউ চ্যাং সুয়ান সু', অর্থাৎ নয় খণ্ডের পাটীগণিত, নয় খণ্ডে বিভক্ত বলে ঐ নাম দেওয়া হয়েছে। এই গ্রন্থ সংকলন করেছিলেন চ্যাং সাং (খৃঃ পূঃ ১৫২)। মূল গ্রন্থের রচয়িতা কে এবং কখন এটি রচিত হয়েছিল সেসব তথ্য কিছুই জানা নেই, তবে চীনা লেখকদের বিশ্বাস, এই গ্রন্থের রচনা-কাল খৃস্ট পূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দ। এই গ্রন্থে ত্রৈরাশিক নিয়ম, বর্গ ও ঘনমূল, লাভক্ষতির অঙ্ক, সমীকরণ প্রভৃতি বিষয়ে অঙ্ক গণনার পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। এ যুগে আর একটি উল্লেখযোগ্য গণিত-গ্রন্থ রচনা করেছিলেন সান-ৎজু খৃষ্টীয় প্রথম শতকে, গ্রন্থের নাম 'সান-ৎজু সুয়ান চিং' বা সান ৎজু'র পাটীগণিত। এই গ্রন্থের গণনা-পদ্ধতি চিউ চ্যাং অপেক্ষা আরও উন্নত পর্যায়ে উঠেছে দেখা যায়, অনির্ণেয় সমীকরণ, সংখ্যা, ওজন, পরিমাপ প্রভৃতি বিষয়ে অঙ্ক কষার প্রণালী নির্ধারণ করা হয়েছে।

চৌ-যুগের সামন্ততন্ত্রের বিলুপ্তির সঙ্গে ধর্মচিন্তায় ও সামাজিক ব্যবস্থায় বিশেষ পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। সামন্ত-রাজ্যে অভিজাতবর্গ ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী, প্রতি পদে রাজার শক্তিকে সীমিত করে রাখবার শক্তি তাদের ছিল। কিন্তু নৃপতিদের কুলমর্যাদা ছিল প্রচুর, তাঁরা ছিলেন দেববংশী, উপাস্য দেবতার সন্তান। সামন্ততন্ত্র ও অভিজাতকুল অন্তর্হিত হল, স্থানীয় দেবদেবীর পূজা ও 'তিয়েন' বা স্বর্গ-কল্পনারও রূপান্তর ঘটল। প্রাচীন কালে স্থানীয় দেবদেবীরা ছিলেন 'স্বর্গে'র সমকক্ষ, এখন দেব-মঞ্চে গণ-দেবতার উর্ধ্বে 'স্বর্গে'র স্থান নির্দিষ্ট হল, সম্রাটের আসন যেমন সর্ব-মানবের উপর সেই আদর্শ মত। 'স্বর্গ'কে 'স্যাং তি' বা 'পরম আদি পুরুষ' ('the Supreme Ancestor') বলে অভিহিত করা হল। বিশ্ব-স্রষ্টা স্বর্গ, সম্রাট 'স্বর্গ-পুত্র', পৃথিবী শাসন করবার অধিকার স্বর্গ সম্রাটকে দিয়েছেন। সম্রাটের ধর্মাচরণের পুরস্কার রাজ্যের সমৃদ্ধি ও শান্তি, সম্রাটের অধর্মাচরণে স্বর্গ রুষ্ট হন। সূর্য গ্রহণ, প্লাবন, অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প, পঙ্গপালের আক্রমণ সবই সম্রাটের কুকর্মের ফল, স্বর্গের দণ্ডবিধান। স্বর্গের চরম দণ্ড সম্রাটকে শাসনের অধিকারচ্যুত করা, সেই দণ্ডের স্বরূপ দেখা যায় যখন ঘটে রাষ্ট্র-বিপ্লব। শাসনের পূর্ণ দায়িত্ব সম্রাটের, তেমনি স্বর্গকে পূজা করবার অধিকার একমাত্র সম্রাট ভিন্ন আর কারু নেই। বলা বাহুল্য, স্বৈরাচারকে সংযত রাখবার পক্ষে এরূপ নৈতিক দায়িত্ব সম্রাটের ওপর আরোপ করা ছাড়া আর কোন প্রকৃষ্ট বিধান সম্ভব ছিল না।

সাম্রাজ্যের সংহতি ও ঐক্য স্থাপনের অনুকূল ধর্মানুষ্ঠান পদ্ধতির প্রবর্তন করেছিলেন সম্রাট উ। তিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর উদ্দেশে দুইটি স্বতন্ত্র পূজা বলিদান-বিধি পালন করতেন। তিয়েন বা স্বর্গের পূজার নাম ছিল 'ফেং'। চীনের সর্বোচ্চ পর্বত তাইসান-এর পবিত্র চূড়ায় একাকী আরোহণ করে স্বর্গের পূজা (ফেং) সম্পন্ন করতেন সম্রাট অত্যন্ত সংগোপনে। স্বর্গ-পূজায় (ফেং) সার্বভৌম সাম্রাজ্যের ঐক্য প্রতিষ্ঠার কল্পনা পরিস্ফুট, আর পৃথিবী-পূজায় (স্যাং) স্থানীয় ভূমি-দেবতা ও ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তুর পৃথক সত্তার ওপরই সমধিক জোর দেওয়া হত। স্থানীয় দেবগণের দিকে অতিরিক্ত ঝোঁক প্রাদেশিক দেশাত্মবোধের উদ্রেক করে, এবং এরূপ সংকীর্ণ অনুভূতি সাম্রাজ্যের ঐক্য কল্পনার পরিপন্থী। সম্ভবত এই বিপদের কথা স্মরণ করেই সম্রাট উ

একটি দেব-মঞ্চের কল্পনা করেছিলেন, এবং সেখানে স্বর্গ-দেবতাদের ঊর্ধ্বে পৌরাণিক 'পঞ্চ সম্রাটে'র আসন নির্দিষ্ট করেছিলেন। এই সম্রাটেরা থাকেন চারটি দিঙ্‌মণ্ডল ও কেন্দ্র অধিকার করে, এবং তাদের সকলের ওপর অধিষ্ঠিত রয়েছেন "মহান একেশ্বর" ("The Great One"), যাঁর চীনা নাম তাই-আই। আধ্যাত্মিক জগতের আদি কল্পনা চিরদিনই এমনি রাষ্ট্রীয় সংস্থার প্রতিরূপভাবেই মানুষের মনে জেগে উঠেছে, আর রাজার দেবত্ব বা স্বর্গীয় অধিকার দাবিও কিছু নূতন নয়। মিশরের ফারাওরাও 'সূর্য-পুত্র' বা অসিরিসের অবতার বলেই অভিহিত হতেন।

বহিরঞ্চলের রাজ্যসমূহের সঙ্গে সংযোগ চীনকে বৌদ্ধধর্মের মূল সূত্রের সঙ্গে পরিচিত করে দিয়েছিল। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতে বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হয়, তারপর কিছুকাল তাঁর প্রতিষ্ঠিত ধর্ম মন্থরগতিতে অগ্রসর হয়েছিল। ভারতে সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে, এবং যখন সম্রাট সি হুয়াং তি কনফুসীয় গ্রন্থাবলীর উচ্ছেদকার্যে উদ্যোগী ছিলেন, সেই সময়ে বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃত প্রচার মধ্য এশিয়া পর্যন্ত পৌঁছেছিল, আর সেই তরঙ্গ হ্যান সাম্রাজ্যের সমতটভূমিতেও যথাকালে এসে আঘাত করেছিল। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে সম্রাট মিং স্বপ্নদর্শন করে ভারতবর্ষে রাজদূত প্রেরণ করেছিলেন, এবং সেই দলের সঙ্গে বৌদ্ধ শ্রমণেরা তালপাতায় লেখা পুঁথি নিয়ে চীন দেশে এসেছিলেন। বৌদ্ধ শ্রমণদের আগমনের অন্তত এক শতাব্দী পূর্বে বৌদ্ধধর্ম চীনে প্রবেশ করেছিল বাণিজ্য-পথ ধরে, পশ্চিমে তারিম উপত্যকা ও দক্ষিণে ইউনানের মধ্য দিয়ে, এরূপ মনে করবার কারণ আছে। ২ খৃস্টাব্দে জনৈক ইয়ে-চি রাজদূতের একজন চীনা রাজকর্মচারীকে বৌদ্ধ সূত্র বিষয়ে উপদেশ দানের কথা একটি বিবরণে দেখা যায়। খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ব্যক্তি ও সন্ন্যাসী দল চীনে বসবাস করতেন। ১৯০ খৃস্টাব্দে বর্তমান আনহুই প্রদেশের একটি নগরে বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণের বিবরণ পাওয়া যায়। খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দে রাজধানী লো-ইয়াং শহরে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বাস ছিল, এ কথাও আমরা জানতে পেরেছি। বৌদ্ধদের মধ্যে একজন ছিলেন পারস্যের রাজপুত্র, তাঁর চীনা নাম আন-মি-কাও। তিনি সিংহাসন পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস-ব্রতী হয়ে চীনে এসেছিলেন।

সম্রাট উ-র 'মহান একেশ্বর' পরিকল্পনা সত্ত্বেও গণধর্ম পুরোহিত-পরিচালিত

বহুদেবতার পূজা-অর্চনায় পর্যবসিত হয়েছিল, যেমন ভূমি-দেবতা শস্য-দেবতার পূজা, পিতৃপুরুষগণের আত্মার পূজা। যুদ্ধ-দেবতা, ইন ইয়াং গুণদ্বয়, সূর্য-চন্দ্র ও ঋতু-চতুষ্টয়ের পূজার বিধানও প্রবর্তিত হয়েছিল। পূজারিগণ ছিলেন সানটাং উপকূলবাসী ঐন্দ্রজালিকেরা, চীনা নাম 'উ' (sorcerers), তাঁরা দৈবজ্ঞশক্তির অধিকারী বলে নিজেদের দাবি করতেন।* বৌদ্ধধর্মের নূতন আগমন এই প্রাচীন অনুষ্ঠানগুলির কোন বাধা উৎপাদন করে নি। চি'ন বংশীয়দের রাজত্বকালে কনফুসীয় নীতিধর্মের ধ্বংসের পর তাও-ধর্মের প্রভাব নানাবিধ কুসংস্কারের জন্মদান করেছিল। সম্রাট সি হুয়াং তি স্বয়ং তাও-পন্থী ঐন্দ্রজালিকদের শরণ নিয়েছিলেন অমরত্ব লাভের জন্য, আত্মার অমরত্ব নয়, দৈহিক অ-মৃত্যু। মৃতসঞ্জীবনী সুধা (Elixir of life) ও স্পর্শমণির সন্ধান দিতে পারে এইসব তাও-পন্থী ঐন্দ্রজালিকেরা, চি'ন সম্রাটদের মনে এরূপ বিশ্বাস ছিল বদ্ধমূল, এবং সেজন্য তাঁরা মন্ত্রতন্ত্র ও দৈব ঔষধ সেবন দ্বারা জীবন, যৌবন ও ধনসম্পদ বৃদ্ধির কামনা করতেন। হ্যান বংশীরাও পূর্ববর্তী চি'ন সম্রাটদের এই স্থূল বিশ্বাসগুলি বর্জন করেন নি, যদিও কনফুসীয় নীতিধর্মের পুনরুদ্ধার ও সময়োপযোগী সংস্কার করেছিলেন তাঁরাই। এ যুগের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়, তাও-ধর্মের প্রথম 'পোপ' চ্যাং তাও লিং-এর আবির্ভাব (৩৪-১৪৬ খৃস্টাব্দ)। এই ধর্মপ্রচারক সম্বন্ধে কিংবদন্তী এই যে তিনি নির্জন পর্বতকন্দরে বাস করতেন, সেখানে রসায়ন-চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন অমরত্বের ঔষধ আবিষ্কার করবার উদ্দেশ্যে। তিনি নাকি অমরত্ব লাভ করে একটি ড্রাগনের পৃষ্ঠে চড়ে স্বর্গে গিয়েছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে এরূপ অনেক অলৌকিক বিবরণ আছে, ইতিপূর্বে তেমনি একটি বিবরণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "তিনি নক্ষত্রলোকে বিচরণ করতে পারতেন,

---

* 'The *Wu* both men and women were in fact mediums persons who had or claimed to have psychic powers When after elaborate dances accompanied by music and drumming, the sorcerer or more often the sorcerers entered into a trance, the divinity, or sometimes the ancestral spirit entered her body and spoke through her mouth...The sorcerers lost popularity with the aristocracy and tended to become the priesthood of the lower classes' (Fitzgerald's *China* p 44)

পর্বত ও সমুদ্রকে পৃথক করতে পারতেন, বায়ু ও বজ্রকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারতেন।" বস্তুত হ্যান সম্রাটদের কাছে অলৌকিক শক্তির দাবিদার ঐন্দ্রজালিকদের সম্মান ছিল এত বেশি যে, সম্রাট উ লুয়ান-টা নামক জনৈক ইতরজাতীয় ঐন্দ্রজালিকের হস্তে প্রচুর যৌতুক সহ কন্যা সম্প্রদান করতে ইতস্তত করেন নি।

কনফুসীয় নীতির পুনরাবির্ভাব হয়েছিল কোন বিশিষ্ট ধর্মরূপে নয়, দর্শন-রূপেই কনফুসীয় নববিধান সরকারী সমর্থন লাভ করেছিল। কনফুসীয় পণ্ডিতেরা গণধর্মের সঙ্গে সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করেছিলেন, ঐন্দ্রজালিকদের মন্ত্র-তন্ত্রকে তাঁরা ঘৃণার চক্ষে দেখতেন। সম্ভবত পণ্ডিতসমাজের এই দাম্ভিক মনোভাবের ফলেই তাও-তত্ত্ব দর্শনের পর্যায় ছেড়ে ধর্মের মঞ্চে আরোহণ করবার সুযোগ পেয়েছিল। যে গণধর্মকে পণ্ডিতেরা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, সেই ধর্মের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাও-তত্ত্ব একটি শক্তিশালী ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছিল। বৌদ্ধ দর্শনের সঙ্গে তাও-তত্ত্বের গভীর সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। উভয় দর্শনই দৃশ্যমান বহির্জগতের মূল্য অস্বীকার করে, উভয়ের দৃষ্টি নিবদ্ধ মানব-প্রকৃতির অন্তর্নিহিত রহস্যের প্রতি। কনফুসীয় নীতির মধ্যে নেই আত্মজিজ্ঞাসা, নেই ধর্মচিন্তা। সেইজন্যেই রাজ্যশাসন ব্যাপারে সমাজে ও পরিবারে কনফুসীয় বিধানগুলির প্রাধান্য থাকলেও, সেই নীতি কখনো ধর্মের দাবি পূরণ করতে পারে নি। জনগণের এমন কি সম্রাটদের ধর্মচেতনায় তাই শ্রেষ্ঠ আসন গ্রহণ করেছিল বৌদ্ধধর্ম ও তাও ধর্ম।

হ্যান যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কনফুসীয় দার্শনিক ছিলেন তুং চুং-স্থ (খৃঃ পূঃ ১৭৯ ?-১০৪ ?)। কনফুসীয় শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন বিষয়ে তিনি ছিলেন পরম উৎসাহী, রাজদরবারে তিনবার আবেদন-নিবেদনের পর তাঁর উদ্যম-প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল। কনফুসীয় নীতির গুণ-ধর্ম, যেমন 'জেন' (মানবতা-বোধ), 'ই' (সত্যনিষ্ঠা), 'লি' (শালীনতা), 'চি' (প্রজ্ঞা) এবং 'সিন' (হৃদ্যতা), তুং চুং-স্থ-র দর্শনে এই গুণপঞ্চক অক্ষুণ্ণ গৌরবে বিরাজমান, রাজনীতি-ক্ষেত্রেও রাজা-প্রজার প্রাচীন সম্বন্ধের ব্যত্যয় ঘটে নি। তিনি যে নূতন তত্ত্বের সন্ধান দিয়েছিলেন, মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের অনুভূতি সেই তত্ত্বের সারমর্ম। সামাজিক ও প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে নিকট-সাদৃশ্যের ইঙ্গিত করে তিনি প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে উচ্চস্তরের

দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মানুষের ভাল মন্দ কর্মের ফল প্রাকৃতিক মঙ্গল-অমঙ্গলরূপে দেখা যায়। মানবীয় দুষ্প্রবৃত্তি দাবানল, প্লাবন, অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প প্রভৃতি নৈসর্গিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে, এবং এইসব বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় প্রশাসনের কর্ণধার সম্রাটকে সতর্ক করবার জন্য। সম্রাট যদি এইসব দুর্লক্ষণ দেখেও আপন দুষ্প্রবৃত্তিকে সংযত না করেন তবে সাম্রাজ্যের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই উক্তিটিতে রাজার স্বৈরাচার নিরোধের একটি সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা দেখা যায়।

সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে পঞ্চভূতের কল্পনা করেছিলেন পণ্ডিত-প্রবর সৌ ইয়েন, চৌ-যুগে ওয়েই রাজ্যের রাজা হুই-র রাজত্বকালে (খৃঃ পূঃ ৩৭০-৩৩৫)। ক্ষিতি, দারু, ধাতু, অগ্নি, অপ—এই পঞ্চভূত, বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে এই পঞ্চভূতের সমষ্টি থেকে। ভূতগ্রামের রহস্যাত্মক আধিদৈবিক শক্তি আছে, এই শক্তিসমূহের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বর্ণের বৈচিত্র্য, পঞ্জিকার কালচক্র এবং বাদ্যযন্ত্রের স্বরগ্রাম। এসবই আবার ইয়াং ও ইন গুণদ্বয়ের, আলো-আঁধার, জন্ম-মৃত্যু, পুং-স্ত্রী বিপরীত প্রকৃতিদ্বয়ের সংমিশ্রণের ফল। স্মরণ থাকতে পারে, তাও-তত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, তাও-দর্শন একটি ছদ্মরূপের দর্শন। সেই তাও-দর্শনকেই আমরা দেখি বিশ্বপ্রকৃতির বিপরীত গুণধর্মের এই সমন্বয়কার্যের মধ্যে, এরূপ অনুমান করা কঠিন নয়।

হ্যান শিল্প

চীনা ঐতিহাসিকদের রচনায় নানা বিষয়ের বিবরণ আছে, কিন্তু শিল্প-সৃষ্টির পরিচয় অল্পই পাওয়া যায়। এই অভাব কথঞ্চিৎ পূরণ করেছে বিংশ শতাব্দীর নানা প্রত্নতাত্ত্বিক অভিযান, যেমন ১৯১৪ সালে স্যর অরেল স্টিনের মধ্য এশিয়ার লৌ লান ও চীনা তুর্কীস্থানের তুন হুয়াং অঞ্চলে, রুশ বিজ্ঞান আকাদামি কর্তৃক মোঙ্গলিয়ার কজলভ অঞ্চলে এবং জাপানীগণ কর্তৃক উত্তর কোরিয়ার লক লং অঞ্চলে অভিযান। এইসব খননকার্যের ফলে হ্যান যুগীয় শিল্পের অনেক নমুনা আবিষ্কৃত হয়েছে ভূগর্ভ বা সমাধি-কক্ষের অভ্যন্তর থেকে। আমরা ঐতিহাসিক জু-মা চিয়েনের বিবরণে চীন দেশ থেকে রোমান সাম্রাজ্যে রেশম রপ্তানির কথা পাঠ করেছি, কিন্তু সাম্রাজ্যের দূর-দূরান্তরে এইসব পৃথক পৃথক প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য হ্যান যুগের রেশম ও অন্যান্য শিল্পের প্রত্যক্ষ নমুনা আমাদের সমক্ষে উপস্থিত করেছে।

চৌ-যুগের কারুখচিত বা চিত্রিত মৃৎপাত্র, বিবিধ অস্থি প্রস্তর ও ব্রঞ্জ-নির্মিত নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য সমাধি-গর্ভ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, কিন্তু সেই সমাধিগুলি ছিল সামন্ত-রাজাদের। পক্ষান্তরে হ্যান যুগের সমাধি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বিত্তশালী ব্যক্তির। প্রস্তর ও ব্রঞ্জ নির্মিত শিল্প অনেকটা পূর্বকালের মত হলেও কারুকার্যের ওপর হ্যান যুগের প্রভাব যে বিশেষভাবেই এসে পড়েছিল, তা আমরা বিলক্ষণ বুঝতে পারি যখন দেখতে পাই, চৌ-যুগের আনুষ্ঠানিক বন্ধন থেকে শিল্পশৈলীকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। হ্যান যুগের ব্রঞ্জশিল্পে যেসব পশুপক্ষী ও মাছের কারুমূর্তি দেখা যায় সেগুলির শৈলীর বিশেষত্ব সহজেই চোখে পড়ে—স্বচ্ছন্দ গতি, চঞ্চল মূর্তি, পূর্বকালের জ্যামিতিক রেখাঙ্কন-পদ্ধতি আর নেই, সেই সঙ্গে আড়ষ্ট ভাবও দূর হয়েছে। জীব-জন্তুর এমনি বেগবান সজীব মূর্তি আসিরীয় শিল্পে দেখা গিয়েছিল কয়েক শতাব্দ পূর্বে। হ্যান যুগে পশ্চিম এশিয়া ও পারস্যের সঙ্গে যোগাযোগের কথা বিবেচনা করলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে চীনা শিল্পের নূতন ধারা ঐসব দেশের শিল্পশৈলীর দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিল। চীন দেশে অশ্বের প্রতিকৃতি দেখা যায় সিয়াং নু-দের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণের পরবর্তী কাল থেকে, এবং সেই সঙ্গে যদি বিবেচনা করা হয় যে হুন জাতির শিল্পের প্রধান বিষয়বস্তু অশ্বমূর্তি তা হলে চীনা শিল্পের ওপর ওই শৈলীর প্রভাব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। বস্তুত পারস্য ও পশ্চিম এশিয়ার শিল্প-প্রভাবের সর্বোত্তম প্রমাণ, সমাধি-কক্ষের প্রাচীরে প্রস্তরফলকের ওপর উৎকীর্ণ ভাস্কর্য। পাথরের ওপর খোদাই-করা নানা মূর্তি ও দৃশ্যপটের আবির্ভাব এখানে সর্বপ্রথম হয়েছিল হ্যান যুগে—গার্হস্থ্য জীবন, ঐতিহাসিক ঘটনা অথবা পৌরাণিক কাহিনীর প্রতিচ্ছবি, যেমন শিকার-দৃশ্য, যুদ্ধবিগ্রহ, চৌ-বংশী রাজা মু-র পশ্চিম ভ্রমণ ইত্যাদি। পৌরাণিক নৃপতিগণকে মাছের মত পুচ্ছধারী মানুষ রূপে খোদিত করা হয়েছে। এই-সব ভাস্কর্যে বাক্ট্রিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের গ্রীক প্রভাব থাকাও বিচিত্র নয়। কিন্তু এ কথা ঠিক যে চীনারা পশ্চিম দেশীয় প্রথামত ভাস্কর্য শুরু করলেও সে দেশের শৈলীর হুবহু অনুকরণ করে নি, নিজেদের শিল্পের ঐতিহ্যকেও বর্জন করে নি। সেজন্য মূর্তিগুলি গান্ধারশিল্পের মত বিজাতীয় আকার ধারণ না করে চীনা আঙ্গিক রূপকে বিশুদ্ধভাবে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে।

লিখন—নূতন ও প্রাচীন

হ্যান যুগের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়, লিখনপদ্ধতির আক্ষরিক পরিবর্তন। স্মরণ থাকতে পারে চি'ন সি হুয়াং তি-র সেনাপতি মেং তিয়েন লিখন-সৌকর্যের জন্য উষ্ট্রলোমের ব্রাশ বা পেনসিল প্রস্তুত করেছিলেন। প্রাচীন কালে বাঁশের কলম দিয়ে কাষ্ঠফলক বা বংশখণ্ডের ওপর লেখা হত, এবং সেইরূপে লিখিত গ্রন্থের আকার পর্বতপ্রমাণ হয়ে উঠত। ব্রাশ দিয়ে এখন রেশমের ওপর লেখা শুরু হয়ে গিয়েছিল। অক্ষরগুলিকে তখন নূতন রূপ দানের প্রয়োজন দেখা দিল। তারপর খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দে যখন কাগজ প্রস্তুত হল তখন রেশমের পরিবর্তে লেখার জন্য কাগজের ব্যবহার আরম্ভ হয়েছিল। হ্যান যুগের সাম্রাজ্য সামন্ততন্ত্রের স্থানীয় ঐতিহ্যের স্থানে যে সার্বভৌম সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিল, তার মূলগত কারণ প্রাচীন বিদ্যার পুনরুদ্ধার, আর নূতন লিখনপদ্ধতির প্রবর্তন। রাজনৈতিক ঐক্যের প্রয়োজনে এই সার্বভৌম সংস্কৃতির উদ্ভব হয়েছিল, কিন্তু শীঘ্রই দেখা গেল, চৈনিক সংস্কৃতির শিকড় সমগ্র জাতির অন্তস্তলে প্রবেশ করেছে এমন গভীর-ভাবে যে পরবর্তী কালে সাম্রাজ্য বারবার ভেঙে পড়েছে, তবু চীন দেশের সাংস্কৃতিক ঐক্য বিনষ্ট হয় নি, ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে উৎকট প্রকোপও আর দেখা যায় নি।

নূতন লিখনপদ্ধতি প্রবর্তনের সঙ্গে নূতন ও প্রাচীন লিখন নিয়ে একটি বাগ্‌-বিতণ্ডার (Ancient and Modern Script Controversy) সূত্র-পাত হয়েছিল। সমাধি-গর্ভে বা গৃহপ্রাচীরের অভ্যন্তরে গোপনে রক্ষিত কনফুসীয় শাস্ত্রগ্রন্থগুলির পুনরুদ্ধারের কথা পূর্বে বলা হয়েছে, সেই সাহিত্য লেখা ছিল পুরানো হরফে, সে অক্ষরের সঙ্গে হ্যান যুগের লোকদের পরিচয় ছিল না। এদিকে একদল পণ্ডিতের আবির্ভাব হয়েছিল যাঁদের দাবি ছিল এই যে কনফুসীয় শাস্ত্র তাঁরা স্মৃতি-মধ্যে পুরুষানুক্রমে রক্ষা করেছেন, এবং সেই স্মরণশক্তিকেই আশ্রয় করে তাঁরা শাস্ত্র লিখেছেন নূতন অক্ষরে। প্রাচীন অক্ষরে লেখা গ্রন্থগুলিকে তাঁরা জাল বলে ঘোষণা করলেন, সম্ভবত অন্যান্য দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিজেদের প্রাধান্য রক্ষার জন্য। বস্তুত কনফুসীয় দর্শনের নূতন কয়েকটি শাখার পর পর অভ্যুত্থান এবং তাদের পরস্পর দ্বন্দ্ব-

বিরোধই পরিশেষে লিখন সম্পর্কিত বাদানুবাদে পরিণত হয়েছিল। সে যেমন হোক, নূতন ও পুরনো অক্ষরে লেখা গ্রন্থগুলি নিয়ে সেদিন যেমন জটিল তর্কের ধূম্রজাল সৃষ্টি করা হয়েছিল, তার জের চলেছিল দীর্ঘকাল, এমন কি আজও প্রশ্নটির সম্পূর্ণ মীমাংসা হয়েছে বলে মনে হয় না। মোদ্দা কথা, নূতন আক্ষরিকগণ কনফুসিয়াসকে জগতের সমুদ্ধর্তা (Saviour) রূপেই কল্পনা করেছিলেন, প্রাচীন শাস্ত্র রচনা করেছিলেন তিনি স্বয়ং, নূতন জগতে পথ-প্রদর্শনের জন্য, এই ছিল তাদের অভিমত। আর প্রাচীন আক্ষরিকদের চক্ষে কনফুসিয়াস ছিলেন পণ্ডিত-ঋষি, প্রাচীন ঐতিহ্যকেই তিনি ভাবীকালের মানুষের হাতে তুলে দিয়ে গেছেন।

চতুর্থ পর্ব

'তিন রাজ্য' ও 'ছয় রাজ-বংশ' ঃ দেশ বিভাগ (২২১-৫৮৯ খৃঃ)

১ স্যান কুয়ো-র রম্য কাহিনী

'স্যান কুয়ো' শব্দের অর্থ 'তিন রাজ্য'। হ্যান সাম্রাজ্য পতনের পর 'ওয়েই', 'উ' ও 'সু' নামে যে তিনটি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই তিন রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ এবং যুদ্ধকালে ব্যক্তিগত বীরত্বের কাহিনী অবলম্বনে একটি মনোহর রোমান্স্ রচিত হয়েছিল। চার শ' বছর ধরে চলেছিল এই সংগ্রামের যুগ। এক হিসাবে যুগটি ইউরোপীয় 'অন্ধকার যুগে'র সঙ্গে তুলনীয়, কারণ উভয় ক্ষেত্রে প্রায় একই সময়ে একটি সার্বভৌম সাম্রাজ্য ভেঙে পড়বার পর দেশ বর্বরগণ কর্তৃক অধ্যুষিত হয়েছিল। পাশ্চাত্ত্য জগতে গথ-ভ্যাণ্ডালেরা রোম আক্রমণ করেছিল, আর হূন, তাতার প্রভৃতি 'পঞ্চ-হু' ("Five Hu's") বা আততায়িগণ কর্তৃক চীন আক্রান্ত হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে আততায়ীর আক্রমণে ইউরোপের সভ্যতা যখন মসীমলিন এক কৃষ্ণ যবনিকার অন্তরালে ঢাকা পড়ে গেল, তখন সেই যুগেরই অনুরূপ অশান্ত বিশৃঙ্খল অবস্থার ভিতর থেকে চীনা সাহিত্য-প্রীতি রম্য রোমান্স্ রচনার উপাদেয় উপাদান সংগ্রহ করতে পেরেছিল। ঘন ঘন বিপর্যয় ও আক্রমণের ফলে ইউরোপীয় সভ্যতার দীপ-নির্বাণের মত চীন দেশে সভ্যতার কোনদিন সর্বাত্মক বিলুপ্তি ঘটে নি। হ্যান যুগীয় সমৃদ্ধ ভাষায় সাহিত্য-সৃষ্টি অবাধে চলেছিল। চীনা সংস্কৃতির গৌরব কিছুমাত্র ম্লান হয় নি, এমন কি আততায়ী তাতারগণ উত্তরাঞ্চল অধিকার করবার পর চীনাদের সংস্রবে এসে নিজেদের ঐতিহ্য, বেশভূষা বর্জন করে চীনা সভ্যতা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করেছিল।

চীনা সাহিত্যে 'স্যান কুয়ো চি ইয়েন আই' বা তিন রাজ্যের ঐতিহাসিক রোমান্সের স্থান খুবই উচ্চে, রচনাকাল পঞ্চদশ শতাব্দের প্রারম্ভে। এই গ্রন্থের বিষয়গুলিকে নিয়ে রচিত অনেক নাটক ও জনপ্রিয় আখ্যায়িকা যুগ-যুগান্ত ধরে জনগণের চিত্তে মধু-ক্ষরণ করে এসেছে। রোমান্স্টির

নাযক চার ব্যক্তি—লিউ পেই, চ্যাং ফেই, কুযান ইউ এই ব্যক্তিত্রয, আর চতুর্থ ব্যক্তি চু কো-লিয়াং। লিউ পেই ছিলেন দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের জেচুযানে স্যু দেশের হ্যান বংশীয নৃপতি আর চু কো-লিযাং ছিলেন তাঁবই মন্ত্রী। লিউ পেই, চ্যাং ফেই ও কুযান ইউ এই তিন বন্ধু একটি পিচ ফলের বাগানে মিলিত হযে শপথ করেন—ইতিহাসে সেই শপথের নাম 'পিচ বাগানের শপথ' ('Peach Garden Oath')—রক্তাক্ষরে লিখে পরস্পরের সঙ্গে তাঁরা ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ হযেছিলেন। রাজমন্ত্রী চু কো-লিযাং ছিলেন তীক্ষ্ণবুদ্ধি বাজনীতিক, কিন্তু বীরত্রযেব কঠোর সংগ্রাম ও রাজমন্ত্রীর কূটনীতি সত্ত্বেও বাজ্য তিনটির মধ্যে স্যু রাজ্যের অস্তিত্ব সর্বাগ্রে লুপ্ত হযেছিল। কুযান ইউ ও চ্যাং ফেই যুদ্ধে নিহত হন। এই যুদ্ধে কুযান ইউ-র বীরত্ব ও আনুগত্য জাতির স্মরণে এমন গভীরভাবে অঙ্কিত হযেছিল যে বহু শতাব্দ পরেও তাঁর শৌর্যবীযের খ্যাতি দেশবাসীর মন থেকে মুছে যায নি। ১৬৯৪ খৃস্টাব্দে কুযান ইউকে বণ দেবতাব আসনে প্রতিষ্ঠিত করা হযেছিল, এবং সেই থেকে যথারীতি তাঁকে দেবতাব পূজা-অর্ঘ্য দান করা হযেছে।

স্মরণ থাকতে পাবে সেনাপতি সাও-সাও-র পুত্র সাও-পেই শেষ হ্যান সম্রাটকে কৌশলে বঞ্চিত করে স্বযং সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন, এবং সাম্রাজ্যের উত্তব ভাগে 'ওযেই' রাজ্য স্থাপন কবেছিলেন। সেই সঙ্গে আবও দু'টি বাজ্য প্রতিষ্ঠিত হযেছিল, দক্ষিণ-পশ্চিমে 'স্যু' বাজ্য ও দক্ষিণে 'উ' রাজ্য। স্যু রাজ্যের রাজা ছিলেন পূর্বোক্ত কাহিনীব হ্যান বংশীয় লিউ পেই। স্যু রাজ্যেব তীক্ষ্ণবুদ্ধি মন্ত্রী চু কো-লিযাং-এর মৃত্যুর পর ওযেই-রাজের সঙ্গে যুদ্ধে লিউ-পেই র পরাজয ঘটে, ফলে স্যু রাজ্য ওয়েই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয। কিন্তু সাও-সাও-র বংশধরেরা দীর্ঘকাল রাজত্ব করতে পাবেন নি। জুমা ইযেন ছিলেন ওযেই রাজ্যেব প্রধান মন্ত্রীব পুত্র, প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক জুমা চিযেনের স্বগোত্রীয়ের বংশধর। সাও-সাও ও তাঁর পুত্র যেমন শেষ হ্যান-বাজাকে মুষ্টিমধ্যে পুরে রেখেছিলেন, ওযেই-এর বাজাও তেমনি তাঁর মন্ত্রী ও মন্ত্রিপুত্রের ক্রীড়নক হযে পডেছিলেন। ২৬৫ খৃস্টাব্দে জুমা ইয়েন নামমাত্র সম্রাট সাও-সাও-বংশধরকে অপসৃত করে সিংহাসন অধিকার করলেন। একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি, সেই বংশের প্রথম

সম্রাটরূপে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশের নাম 'সিন বংশ'। কয়েক বৎসর পর ২৮০ খৃস্টাব্দে তিনি উ রাজ্য অধিকাব করেন। এইরূপে 'তিন রাজ্যে'র বিলুপ্তির সঙ্গে সমগ্র চীন দেশ আবার সংযুক্ত হয়েছিল 'সিন'-বংশী সম্রাটের অধীনে অত্যন্ত অল্পকালের জন্য।

২. সিন বংশ ও পরবর্তী কাল

জুমা ইয়েনের রাজত্বকালে (২৬৫-২৯০ খৃঃ) অখণ্ড সাম্রাজ্য বিদ্যমান ছিল। কথিত আছে, তাঁর রাজসভায় তা চি'ন বা পূর্ব রোম রাজ্য, মধ্য এশিয়া ও অন্যান্য দূর দেশ থেকে রাজদূতেরা সম্রাটকে সংবর্ধনা করতে এসেছিলেন। জুমা ইয়েন সম্রাট উ নাম গ্রহণ করেছিলেন। প্রত্যন্তের হূন জাতিরা হ্যান রাজাদের হাতে বারবার শাস্তিভোগ করেও নিজেদেব স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করতে পেরেছিল। এই হূন জাতিরা ছিল সিযাং মু এবং তাদেরই প্রতিবেশী ও আত্মীয় সিয়েন-পি। সম্রাট উ-র রাজত্বেব শেষভাগে এই হূনগণ উত্তরাঞ্চলে আবার উপদ্রব শুরু করে দিয়েছিল, তাঁর মৃত্যুর পর সেই উপদ্রব উত্তব-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম দিকে ছড়িয়ে পড়ে ব্যাপক অরাজকতার সৃষ্টি করেছিল। জুমা ইয়েনের পুত্রের সংখ্যা ছিল পঁচিশটি। তিনি একটি মারাত্মক ভুল করেছিলেন, সাম্রাজ্যকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত করে প্রতিটি খণ্ডবাজ্যের অধিপতিরূপে এক একটি পুত্রকে প্রতিষ্ঠিত করলেন। তাঁর উত্তরাধিকাবী ছিল একজন দুর্বলচিত্ত অপদার্থ স্ত্রৈণ মানুষ। পারিবারিক কলহ অচিরে দেখা দিল, এবং সেই কলহের ফলে সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ল। বিদেশী আততায়ীবা অন্তর্বিরোধের এই সুবর্ণ-সুযোগ গ্রহণ করতে কিছুমাত্র ত্রুটি করে নি। ৩১৬ খৃস্টাব্দে সম্রাট উ-র পৌত্র সম্রাট মিন আক্রমণকারী হূনদের কাছে কাপুরুষোচিত আত্ম-সমর্পণ করেন। বন্দী সম্রাটকে দাস্যবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়েছিল এবং পরে তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। হূনরা তখন সমগ্র উত্তর চীন অধিকার করে বসল, দক্ষিণ চীন ছিল চীনাদেরই অধীনে। সিন রাজবংশ দক্ষিণ অঞ্চলে পলায়ন করে ন্যানকিং নগরে রাজধানী স্থাপন করেছিল।

এইরূপে দেশ বিভক্ত হয়ে পড়ল দুই ভাগে। দক্ষিণ খণ্ডে ইয়াংসি

উপত্যকায সিন বংশীয় রাজাদের বাজত্ব কোনরূপে প্রাণগতিক নিয়ে টিঁকে ছিল ৪২০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত। ন্যানকিং-এ তাদের রাজধানী ততকাল স্থায়ী-ভাবেই ছিল। উত্তর-খণ্ডের বিজেতা হুন শাসকেরা হ্যান-ব'শের সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ দাবি করে উত্তরাংশে নিজেদের রাজত্ব কায়েম করবার চেষ্টা কবেছিল। হ্যান রাজবংশের সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ দাবি করত তারা এই বলে যে তাদের কোন পূর্বপুরুষ হ্যান রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেছিল। এই শাসকেবা চীনা নাম গ্রহণ করেছিল এবং রাষ্ট্রের নাম দিযেছিল 'পেই হ্যান' বা 'উত্তর হ্যান রাজ্য'। হুন-রাজ লি ইউযান নিজে চীনা সাহিত্যের পরম অনুরাগী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর অনুচরেরা ছিল নিতান্তই বর্বর ধ্বংসকাবীর দল, হত্যাকাণ্ডে সিদ্ধহস্ত। তারা রাজধানী লো-ইয়াং নগব লুণ্ঠিত, ভস্মীভূত করল। হ্যান বংশেব পাঠাগারটিও সেই সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে গিযেছিল। কালক্রমে হুনগণ চীনা স'স্কৃতিকে ক্রমশ গ্রহণ করেছিল, এবং তাদের নেতৃবৃন্দ সম্রাট নামে অভিহিত হবার জন্য উদ্‌গ্রীব হযে উঠেছিল।

এই সময়কার উত্তব ও দক্ষিণ উভয অঞ্চলেরই কাহিনী এমন জটিল ও দুর্বোধ্য যে তার একটি পরিপূর্ণ বিবরণ দেবার প্রচেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। সবত্র রক্তাপ্লুত বিদ্রোহ ও অরাজকতা চলেছিল। উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে হুনদের মত অন্যান্য বর্বর জাতিদেব আক্রমণেব তরঙ্গ উপর্যুপবি এসে পডেছিল, এবং এইসব বর্বব জাতিরাও আবাব পবস্পরেব সঙ্গে লডাই বাধিযে দিযেছিল। ববব জাতিব স'খ্যা ছিল পাঁচটি, ঐতিহাসিকরা তাদের বলেছেন পঞ্চ হু' অর্থাৎ 'পঞ্চ বিদেশী জাতি'।* এই বিদেশী আততাযীরা ছিল তুর্কী, মোঙ্গলীয ও তিব্বতীয় জাতিব মানুষ। জাতিগুলিব মধ্যে অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহের ফলে লক্ষ লক্ষ নরনাবী নিহত হযেছিল, সমগ্র উত্তরাঞ্চল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন বাজ্যে বিভক্ত হযে পডল। এই রাজ্যসমষ্টির নাম দেওযা হযেছে 'ষোডশ রাজ্য'। উত্তরাঞ্চলের মাৎস্যন্যাযেব অবস্থা প্রকৃতপক্ষে দক্ষিণ চানেব বক্ষা-কবচ স্বরূপ হযে উঠেছিল, যেহেতু কোন ববর জাতিই দক্ষিণ দেশ আক্রমণ করবার মত শক্তি-সামর্থ্য

* 'পঞ্চ হুর প্রথম 'হু' বা শক্র জাতি উত্তব-পশ্চিমেব সিযাং নু রা, দ্বিতীয 'হু সিযাং নু-দেব জ্ঞাতি চিয়ে-গণ, তৃতীয় 'হু চিংঘাই, জেচুযান ও তিব্বত অঞ্চলেব চিযাং জাতি, চতুর্থ 'হু' চিয়াং জাতিব শাখা তি জাতি, পঞ্চম হু' পূর্ব সাইবেবিযাবাসী তাতাব জাতীয় তুঙ্গুগণ। তুঙ্গুরা সিয়েন পেই জাতি, তো-পা-গণ এই জাতিবই একটি শাখা।

গড়ে তুলতে পারে নি। এই বর্বর জাতিগুলিকে দুর্ধর্ষ করে তুলেছিল তাদের অশ্বারোহী বাহিনী, কিন্তু ইয়াংসি উপত্যকার নরম মাটি অশ্বারোহী বাহিনীর উপযুক্ত সংগ্রাম-ক্ষেত্র ছিল না। পঞ্চ হু-দের একটি খণ্ডজাতি বেপরোয়াভাবে দক্ষিণ সাম্রাজ্য আক্রমণ করেছিল ৩৮৭ খৃস্টাব্দে। ফেই নদীর তীরে ভীষণ যুদ্ধ বাধল, এবং সেই যুদ্ধে আততায়ী খণ্ডজাতি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হল। এই পরাজয়ের ফলে দক্ষিণ অঞ্চল রক্ষা পেল বটে, কিন্তু উত্তর অঞ্চলে একটি যুগান্তকর ঘটনা ঘটল। ওয়েই বা তো-বা নামে একটি নূতন যাযাবর জাতি দোর্দণ্ড সাহস ও শক্তিবলে খণ্ডজাতিগুলিকে জয় করে চীন দেশের সমগ্র উত্তরাঞ্চলে একাধিপত্য স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছিল। তারা যে বংশ প্রতিষ্ঠিত করেছিল, সেই তো-বা বংশের রাজত্বকাল ৩৮৬-৫৫৭ খৃস্টাব্দ। তো-বা-রা তাতার জাতীয়, শাসন ও সংগঠন ব্যাপারে সিয়াং হু ও সিয়াং পেই প্রভৃতি খণ্ডজাতিগণ অপেক্ষা অধিকতর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল। চীনা সভ্যতা সর্বতোভাবে গ্রহণ করেছিল তারা, চীনাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করতে স্ব-জাতীয়দের উৎসাহিত করত। ৫০০ খৃস্টাব্দে তো-বা সম্রাট তাতার ভাষা, তাতার প্রথা, তাতার পরিচ্ছদ বর্জন করে চীনাদের ভাষা ব্যবহার এবং তাদের বেশ পরিধান করতে আদেশ জারি করলেন। এইরূপে বিজেতা ও বিজিতের মধ্যে সংস্কৃতিগত প্রভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে চীনা বৈদগ্ধ্যের পূর্ব-গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন ওয়েই বা তো-বা রাজবংশ, সভ্যতার পারম্পর্যও রক্ষা করেছিলেন। এই কারণে দীর্ঘকাল ব্যাপী ধ্বংসলীলা সত্ত্বেও হ্যান যুগীয় সাহিত্যের পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়েছিল।

পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েই ওয়েই বা তো-বা বংশের সৌভাগ্যে ফাটল ধরেছিল। ওয়েই রাজ্য দু' ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল, পূর্ব ও পশ্চিম ওয়েই, একটির রাজধানী লো-ইয়াং, অপরটির রাজধানী চাং-আন। তারপর নব নব বংশের পূর্ববৎ উত্থান-পতন, নূতন নূতন রাজার পূর্ববৎ আবির্ভাব-তিরোধান। পরিশেষে ৫৫৭ খৃস্টাব্দে উত্তর চৌ নামে একটি রাজবংশের অধীনে সমগ্র উত্তরাঞ্চল আবার সংযুক্ত হয়েছিল। উত্তর চৌ রাজবংশের রাজত্বকাল দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। চৌ-রাজের শ্বশুর ইয়াং চিয়েন ছিলেন একজন ক্ষমতাশালী রাজকর্মচারী। জামাতা-রাজার মৃত্যুর পর নাবালক দৌহিত্রকে কৌশলে অপসারিত করে তিনি স্বয়ং সিংহাসনে অধিরোহণ করেন (৫৮১ খৃঃ)।

কয়েক বৎসর পরে দক্ষিণখণ্ডের চে'ন রাজ্য অধিকার করেন। এইরূপে সাম্রাজ্য বিস্তার ও পুনর্গঠন করে ইয়াং চিয়েন সুই বংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

এদিকে দক্ষিণাঞ্চলেও দীর্ঘকাল ধরে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘন ঘন চলেছিল। ৪২০ খৃস্টাব্দে সিন বংশের পতনের পর সুং বংশের রাজত্ব শুরু হয। মনে রাখা দরকার এই সুং বংশ পরবর্তী কালের বিখ্যাত সুং বংশ নয, সে বংশের অসামান্য কৃতিত্বের কণামাত্রও এ বংশের নেই। তখন উত্তরাঞ্চলে তো-বা-দের রাজত্ব চলছে, সুং সম্রাট উত্তর দেশ আক্রমণ করলেন, এবং তার প্রতিশোধ নিল তো-বা-রা ছযটি প্রদেশ অধিকার করে। একটি যুদ্ধের বর্ণনায বলা হযেছে, উত্তরাঞ্চলের সৈন্যরা যেখানেই উপস্থিত হযেছে, 'সেখানকার ভূমিকে করেছে ঊষর ধূসর, গ্রাম শহর ধ্বংস করেছে, পৈশাচিক আনন্দে নর নারী শিশু হত্যা করেছে'। সুং বংশে মোট আটজন রাজা, তন্মধ্যে চার জন আততাযীর হাতে নিহত হন। তারপর শুরু হল চি বংশের রাজত্বকাল (৪৭৯-৫০২ খৃস্টাব্দ)। এই বংশের পাঁচজন শাসকের মধ্যে দুইজনকে হত্যা করা হযেছিল। তারপর লিযাং বংশ (৫০২-৫৫৭ খৃঃ)। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা লিযাং উ তি-র শৌর্যবীর্যের খ্যাতি নেই, উত্তরাঞ্চল উদ্ধার করবার জন্য তাঁর যুদ্ধোদ্যম ব্যর্থ হযেছিল। লিযাং উ তি ছিলেন বৌদ্ধ, ধর্মে পরম শ্রদ্ধাবান, আর সেই শ্রদ্ধাই তাঁকে কীর্তিমান পুরুষরূপে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ করে রেখেছে। জীবের প্রতি তিনি ছিলেন এমনই শ্রদ্ধাবান যে কাপড়ের ওপর মানুষ বা পশুর প্রতিকৃতি কারুকার্যে ফুটিযে তোলা তিনি নিষেধ করে দিযেছিলেন, পাছে কাপড় কাটার সঙ্গে সেই প্রতিমূর্তিগুলিকে খণ্ডিত করে জীবনের পবিত্রতাকেই অবজ্ঞা করা হয, সেইজন্য। চরিত্রবান, পণ্ডিত, নিরামিষাশী, সংসার-বিরাগী মানুষ, ১৩০০০ বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, পূজার্থে পশুবধ নিষিদ্ধ করেছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করে মঠে আশ্রয নিতে চেয়েছিলেন একাধিকবার, কিন্তু অনুরক্ত প্রজাদের আকুল মিনতি বারবার তাঁকে রাজ-সংসারে ফিরিযে এনেছিল। কথিত আছে, তাঁর বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি হৌ চিং ষড়যন্ত্র করে সম্রাট উ-কে উত্তরাংশের কোন শত্রু শাসকের রাজ্যে মঠের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হল, দয়ালু রাজা ষড়যন্ত্রকারীকে মার্জনা করলেন। কিন্তু অদৃষ্টের এমনি ক্রূর

পরিহাস, উত্তর-বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে যখন রাজধানীর পতন ঘটল, সম্রাটকে তখন বন্দী করা হয়েছিল বটে, কিন্তু তাঁকে মঠে পাঠানো হয় নি, অত্যন্ত হীন অবস্থায় কারাগারের পাষাণ-প্রাচীরের অন্তরালে মর্মান্তিক যন্ত্রণা ভোগ করে তাঁর জীবনান্ত হয়েছিল।

লিয়াং বংশের পর রাজত্ব করে চে'ন বংশ, 'ছয় বংশে'র শেষ বংশ, অর্থাৎ সাও-পেই প্রতিষ্ঠিত বংশ থেকে গণনা করে ছয়টি খাঁটি চীনা রাজবংশের ষষ্ঠ রাজবংশ এই চে'ন বংশ। এই বংশের রাজত্বকাল মাত্র বত্রিশ বৎসর (৫৫৭-৫৮৯ খৃঃ)। শেষ রাজা ছিলেন লম্পট, দুশ্চরিত্র। এই রাজাকে যুদ্ধে বন্দী করে সুই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ইয়াং চিয়েন সমগ্র দক্ষিণ খণ্ড অধিকার করেন। এইরূপে সুই বংশের শাসনাধীনে উত্তর দক্ষিণ দুই খণ্ডের পুনর্মিলন ঘটেছিল।

৩. ভাঙা-গড়ার আড়ালে সংস্কৃতি: বৌদ্ধধর্মের প্রসার

হ্যান যুগের অবসান থেকে সুদীর্ঘ চার শ' বছর ধরে নানা রাজনৈতিক বিপর্যয় ও যুদ্ধবিগ্রহ চলেছিল বটে, কিন্তু উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের বিদেশী জাতিদের আগমন দেশের মন্দ ভাগ্যই শুধু বহন করে আনে নি, চীনের ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণের পথও মুক্ত করে দিয়েছিল। বহির্দেশের সঙ্গে বাণিজ্য লুপ্ত হয় নি, বরঞ্চ বৃদ্ধিই পেয়েছিল। রাজনৈতিক ভাঙা-গড়া, সামাজিক বিপ্লবের ঘাত-প্রতিঘাত, বিদেশীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সংযোগ, এইরূপ নানান ব্যাপার জাতীয় সংস্কৃতির সংকীর্ণতা নষ্ট করেছিল, এবং তারই ফলে বহির্জগতের দান গ্রহণের আগ্রহ এমন তীব্র হয়ে উঠেছিল যে তেমনটি চীন দেশে পূর্বে কখনো দেখা যায় নি। বর্বরগণের আক্রমণে বিধ্বস্ত উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসীরা দলে দলে দক্ষিণ দেশে চলে এসেছিল। আগন্তুকেরা বেশির ভাগ ধনী ও পণ্ডিত কর্মচারী, তবে সাধারণ ব্যক্তির সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল। এতকাল চীনা সভ্যতা প্রধানত বর্ধিত হয়েছিল পীত নদীর উপত্যকায়, ইয়াংসি নদীর উপত্যকা ছিল এই সভ্যতার দক্ষিণ প্রত্যন্ত দেশ, নদীর পরপারে নানা দক্ষিণ দেশীয় উপজাতির বাস। উত্তরে পীত নদী অঞ্চল থেকে দলে দলে উদ্বাস্তুর আগমন চৈনিক সভ্যতার ভারকেন্দ্র গুরুতর রকমে বিচলিত করেছিল। এতকাল যে সভ্যতা ছিল চীনের

উত্তরাংশে সীমাবদ্ধ, এখন সেই সভ্যতা দক্ষিণ দেশের নূতন পরিমণ্ডলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল, এবং তার ফলে সাংস্কৃতিক বিষয়গুলিরও রূপান্তর ঘটেছিল। এই পরিবর্তন তদানীন্তন সাহিত্য ও শিল্পে বিশেষভাবে প্রতিফলিত দেখা যায়।

অন্ধকার যুগে ইউরোপে রোমান সভ্যতা যেমন ধ্বংস পেয়েছিল সেরূপ কোন অনাসৃষ্টি কাণ্ড উত্তর চীনে ঘটে নি, যদিও রোম ও উত্তর চীন উভয় দেশই সাম্রাজ্যের পতনের পর অনুরূপ অবস্থায় বর্বরগণ কর্তৃক অধিকৃত হয়েছিল। কিন্তু বর্বর-অধ্যুষিত হলেও উত্তর চীনের অতীত স্মৃতি ম্লান হয় নি কখনো, হ্যান যুগের ভাষা ও সাহিত্যকে বাহন করে সাংস্কৃতিক পারম্পর্য অটুট রাখা হয়েছিল। বৈদেশিক বিজেতাগণ এই সুপ্রাচীন গৌরবোজ্জ্বল সংস্কৃতির কাছে মস্তক অবনত করেছিল এবং যথাকালে এই সংস্কৃতিকে গ্রহণও করেছিল। বিদেশীদের সঙ্গে চীনাদের বৈবাহিক সম্বন্ধ দেশী বিদেশী উভয় জাতীয় ব্যক্তিদের মধ্যে ব্যবধান হ্রাস করেছিল। ভারতবর্ষ ও মধ্য এশিয়া থেকে বৌদ্ধ প্রচারক ও ধর্ম-সাহিত্যের আবির্ভাব চীনা সংস্কৃতির স্বাভাবিক পরিণতিকে বাধাদান না করে চীনবাসীর সঙ্গে নানা জাতির সম্বন্ধ হৃদ্যতা-সূত্রে বেঁধে দিয়ে দৃঢ় করে তুলেছিল। উত্তর ও দক্ষিণ উভয় খণ্ডেই বিদ্যার সমাদর ছিল যথেষ্ট, দেশী বিদেশী সকল শাসকই বিদ্বৎমণ্ডলীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পণ্ডিতগণের অধিকাংশই ছিলেন কনফুসীয় নীতিধর্ম-বিশারদ। এই নীতি-বিশারদেরা কোন নূতন সৃজনীশক্তির পরিচয় দেন নি বটে, কিন্তু তাঁদের প্রচারিত নীতিধর্মের বিধানগুলি সমাজ ও রাষ্ট্র শ্রদ্ধা-সহকারে গ্রহণ করত। চি'ন ও হ্যান যুগ থেকে যে আমলাতন্ত্রের প্রশাসন প্রথা চলে এসেছিল উত্তরাঞ্চলের বৈদেশিক শাসকেরা সেই পদ্ধতির কোন মৌলিক পরিবর্তন করেন নি, যদিও সামরিক শক্তি তাঁরা স্বহস্তেই রেখেছিলেন। উভয় অঞ্চলের এই একই ধরনের আমলাতন্ত্র সমগ্র চীন দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক ঐক্য রক্ষা করতে অনেকটা সাহায্য করেছিল।

সাহিত্য ও দর্শন

এ যুগের সাহিত্য ও দর্শনের ক্ষেত্রে যেসব প্রখ্যাত ব্যক্তির নাম আমরা জানতে পেরেছি ওয়াং পি তাঁদের অন্যতম। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দের মানুষ তিনি, কনফুসিয়াস কর্তৃক সংকলিত 'ই কিং' এবং লাওৎসি প্রণীত 'তাও-তে-কিং'

এই গ্রন্থদ্বয়ের ভাষ্য রচনা করেছিলেন। এই ভাষ্যে দার্শনিক তত্ত্ব ও প্রজ্ঞাকে যথার্থ মূল্য দেওয়া হয়েছে। সিন বংশের রাজত্বকালে (২৬৫-৩১৬ খৃঃ) সাতজন বিখ্যাত তাও-দার্শনিক কবি স্বাধীন চিন্তাশক্তির দ্বারা গতানুগতিকতার ঊর্ধ্বে উঠতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই সাতজন মনীষী 'বাঁশবনের সপ্তর্ষি' ('Seven Sages of the Bamboo Grove') নামে লোকসমাজে পরিচিত হন। কনফুসীয় রীতিনীতি ও সমকালীন রাজনৈতিক অব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁরা করেছিলেন বিদ্রোহ। পাণ্ডিত্যাভিমানী কনফুসীয় ঐতিহাসিকেরা তাঁদের সম্বন্ধে যেন একটু তাচ্ছিল্যভরেই বলেছেন, "তারা ভক্তিশ্রদ্ধা করত শূন্য ও নৈষ্কর্ম্যকে, বিধান অনুষ্ঠানের প্রতি তাদের ছিল ঘোর অশ্রদ্ধা। সকলেই তারা পাঁড় মাতাল, সংসারকে ঘৃণা করত।" এই সপ্তর্ষিমণ্ডলের মধ্যে একজন ছিলেন যাঁর নাম লিউ লিং। তিনি বলতেন, "মাতালের কাছে সংসারকে মনে হয় যেন নদী-জলে ভাসমান তৃণখণ্ড।" মৃগ-চালিত ছোট একটি শকটে চড়ে বেড়াতেন তিনি, দু'জন ভৃত্য তাঁর অনুগমন করত। একজন বহন করত প্রকাণ্ড মদ্যভাণ্ড, অপর ব্যক্তির হাতে থাকত একটি কোদাল। ভ্রমণকালে হরদম মদ খেতেন তিনি, আর কোদালবাহী ভৃত্যের প্রতি তাঁর এই আদেশ ছিল যে মত্তাবস্থায় যেমন তাঁর মৃত্যু হবে সে যেন অমনি পথিপার্শ্বে কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ে তাঁকে সেখানে সমাধি দান করে! এই সময়কার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন তাও-চিয়েন। তিনি কামনা করতেন দীর্ঘ জীবন আর ভরপুর এক-পাত্র মদ্য। কর্ম ত্যাগ করেছিলেন তিনি, যেহেতু 'দু' মুঠো অন্নের জন্য কোমরে বাত ধরাতে রাজি নন'। তাঁর রচিত 'পিচ কুঁড়ি ঝরনা রূপক' ('The Peach Blossom Fountain Allegory') কাব্যে বিগত যৌবনের দৃশ্যগুলিকে যবনিকার আড়াল থেকে বের করে আনবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা, সেজন্য অপরিসীম উৎকণ্ঠার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সেকালের কবিদের অবস্থা-বৈচিত্র্যের একটি নিখুঁত চিত্র অঙ্কিত করেছেন কবি তাও-চিয়েন তাঁর একটি কবিতায়, নমুনাস্বরূপ কবিতাটির কয়েক ছত্রের অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হল :

সুধী একজন থাকে পাহাড়ের ধারে—
পরনে মলিন বাস, ছিদ্র চোখে পড়ে।

পেটে ভাত নয় দিন, বাকি মাস কাটে অনাহারে,
জীর্ণ টুপি শিরে পরে দশ বর্ষ ধরে,
কি অদৃষ্ট অভাগার! তবু হাসিমুখ
ভাসে যেন রবিরশ্মি-সমুজ্জ্বল সুখ।

দেশী ও বিদেশী ধর্মের সংঘাত

হ্যান যুগের সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনায় আমরা তাও-ধর্মের প্রথম পুরোহিত বা 'পোপ' চ্যাং তাও লিং-এর কথা বলেছি। তাঁর আবির্ভাবের পূর্ব থেকেই তাও-ধর্ম দর্শন-তত্ত্ব অপেক্ষা মন্ত্রতন্ত্র ইন্দ্রজাল দ্বারা পুনর্যৌবন লাভ ও অ-মৃত্যুর দিকেই বেশি ঝোঁক দিয়েছিল। চি'ন সম্রাটগণ তাও-মন্ত্র ইন্দ্রজালের আশ্রয় নিয়েছিলেন অমরত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষায়। কোন কোন হ্যান সম্রাটও সেই পথের পথিক হয়েছিলেন। স্পর্শমণির সন্ধান, পারদকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করবার রসায়ন আবিষ্কার তাও-পন্থীদের বিশেষ গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছিল। কো হুং নামক জনৈক গ্রন্থকার অমরত্ব লাভের উপায়ের কথা বলেছেন, রসায়নের ব্যবস্থাও দিয়েছেন। রসায়ন সেবনে মানুষ শুধু যে অমরত্ব লাভ করে তা নয়, তার যৌবনও ফিরে আসে। ফল বর্ণনা এইরূপ: "সাদা চুল কাল হয়, ফোকলা দাঁত গজিয়ে ওঠে, শরীরে নূতন বল সঞ্চার হয়। রসায়ন পান করলে কেউ বৃদ্ধ হয় না, বৃদ্ধ মানুষ যুবক হয়ে ওঠে। চিরঞ্জীব হয় সে, মৃত্যু তার কোন দিন হয় না।" তাও-ধর্মের এই ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা উত্তরখণ্ডে ওয়েই বংশের শাসন-কালে (৩৮৬-৫৫৭) বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। কৌ চিয়ে চি নামক একজন সম্ভ্রান্তবংশীয় তাও-সন্ন্যাসীকে সম্রাট তা'ই উ রাজসভায় বিশেষ সম্মান দান করেছিলেন এবং কৌ ও তাঁর শিষ্যদের জন্য রাজধানীর বহির্ভাগে একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। প্রতি বৎসর সম্রাট সেই মন্দির পরিদর্শন করে একখানি মন্ত্রের গ্রন্থ গ্রহণ করতেন। এই পরিদর্শন-কার্য বংশানুক্রমিক একটি প্রথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এদিকে বৌদ্ধধর্মের প্রবেশ ও বিস্তৃতি এই যুগে অব্যাহতভাবেই চলেছিল। ভারত-সম্রাট অশোকের কাল (খৃঃ পূঃ ২৭৩-২৩২) থেকে ব্যাপক প্রচার-কার্যের ফলে বাক্ত্রিয়া ও মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম অসামান্য প্রতিষ্ঠা লাভ

করেছিল। দ্বিতীয় খৃস্ট পূর্বাব্দে বাক্ত্রিয়ার গ্রীক রাজা মিনাণ্ডার বা মিলিন্দা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন, এবং তার কিছু কাল পরেই ইয়ে-চি জাতীয় কুশানরাজ কনিষ্ক বাক্ত্রিয়া জয় করে গ্রীকরাজের মতই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। সমগ্র মধ্য এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম অচিরে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং চীন দেশের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের হূন, তাতার প্রভৃতি 'পঞ্চ হু'-দের যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। ব্রহ্ম, শ্যাম, কাম্বোডিয়া (চম্পা) ও সিংহলে বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব স্থল ও জল উভয় পথেই ঐ ধর্মের দক্ষিণ চীনে প্রবেশ সহজ ও সুসাধ্য করে দিয়েছিল।

চীন দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রথম আবির্ভাবের বিষয় সবিশেষ জানা নেই, তবে এ কথা সুনিশ্চিত যে দ্বিতীয় খৃস্ট পূর্বাব্দে হ্যান বংশী সম্রাট উ-র সুযোগ্য সেনাপতিদ্বয় চ্যাং চিয়েন ও লি কুয়ান-লি-র পশ্চিম অভিযানের ফলেই বৌদ্ধধর্ম এ দেশে আসবার সুযোগ পেয়েছিল। তারপর আমরা দেখেছি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দে হ্যান-বংশী সম্রাট মিং স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ধর্মপ্রচারার্থ ভারতবর্ষ থেকে দু'জন বৌদ্ধ শ্রমণকে নানান মূর্তি ও ধর্মগ্রন্থ সহ চীনে আনয়ন করেন। বৌদ্ধ শ্রমণদ্বয়ের নাম কাশ্যপ মাতঙ্গ ও ধর্মারণ্য। রাজধানীতে একটি মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল তাদের জন্য, মন্দিরটির নাম 'শ্বেতাশ্ব মন্দির' ('White Horse Temple')। শ্বেতবর্ণের অশ্বের পৃষ্ঠে মূর্তি ও ধর্মগ্রন্থাদি বহন করে আনা হয়েছিল, সেইজন্যই মন্দিরের ঐরূপ নামকরণ। আর একজন সম্রাট লিয়াং-বংশী উ তি-র কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, তিনি ছিলেন মনে-প্রাণে একজন যথার্থ বৌদ্ধ, চীনা ভাষায় লিখিত ত্রিপিটকের সংকলন করেছিলেন, জনসভায় স্বয়ং বৌদ্ধ সূত্রগুলির ব্যাখ্যা করতেন। এই সম্রাটের রাজত্বকালে বৌদ্ধ ভিক্ষু বোধিধর্ম চীন দেশে এসে চ্যান (ধ্যান)-যোগ বিষয়ে শিক্ষাদান করেছিলেন। উত্তর ও দক্ষিণ উভয় অঞ্চলেই বৌদ্ধধর্ম জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায়, কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখা আবশ্যক যে জনসমাজে এই বিদেশী ধর্মের সম্যক প্রতিষ্ঠা লাভ করতে দীর্ঘ সময় লেগেছিল। সকল সম্রাটই কিছু বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী ছিলেন না, কনফুসীয় মতাবলম্বী বা তাও-পন্থী সম্রাটেরা কখনো কখনো বৌদ্ধধর্মকে নির্যাতিত করেছেন। নির্যাতন অবশ্য নিষ্ঠুর হত্যার আকার ধারণ করে নি, বড় জোর তাঁরা মন্দির ধ্বংস করতেন, আর এমন একটি কর্ম করা হত যা বৌদ্ধদের

কাছে ছিল প্রকৃতই বিরক্তিকর। মঠের ভিক্ষু-ভিক্ষুনীদের পরস্পর যৌন সম্বন্ধ স্থাপন করতে বাধ্য করে তাদের গার্হস্থ্যজীবনে ফিরিয়ে আনা হত।

বৌদ্ধধর্মের প্রসারের পথে বাধাবিঘ্ন ছিল গুরুতর। কনফুসীয় পণ্ডিত-মণ্ডলী বৌদ্ধধর্মের প্রতি খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছিলেন, তার কারণ শুধু এ নয় যে তাঁরা সংসার-ত্যাগের বিরোধী, প্রতিদ্বন্দ্বীসুলভ বৈরীভাবও একমাত্র কারণ নয়—চীনা সমাজ-আদর্শের, চীনা জীবনদর্শনের পরিপন্থী বিদেশী ধর্মের প্রতি জাতীয়তাবাদীর পরম অশ্রদ্ধাই ছিল ওই বিদ্বেষের একটি প্রধান কারণ। বস্তুত ভারত ও চীনের মধ্যে জীবনাদর্শের প্রভেদ দুর্লঙ্ঘ্য বলেই আপাত-দৃষ্টিতে মনে হয়। ভারতের লক্ষ্য পরমার্থ-তত্ত্বের জ্ঞান ও উপলব্ধি, ভারত বিশ্বাস করে জন্মান্তরবাদ ও কর্মবাদ। পক্ষান্তরে চীনাদের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহারিক, জীবনে সফলতা অর্জন ও সংসার-সুখই তাদের কাম্য, জন্মান্তর-রহস্য বা অধ্যাত্ম তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা তাদের কাছে অনাবশ্যক কৌতূহল ভিন্ন আর কিছু নয়। এরূপ ক্ষেত্রে চীন দেশে বৌদ্ধধর্মের আসর জমানো একটা আশ্চর্য ব্যাপার বলতে হয়। এখানে কোন বিজেতার দল ডঙ্কা বাজিয়ে অসিঝঞ্ঝনায় জনগণকে ধর্মান্তরিত করে নি, বিজেতার প্রসাদ বা অনুগ্রহ লাভের জন্যও জনসাধারণ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে নি। চীনারা অসভ্য বর্বর ছিল না, তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ভারত বা মধ্য এশিয়ার প্রচলিত জীবনযাত্রার মানের তুলনায় একেবারেই নিকৃষ্ট ছিল না। বরঞ্চ একথা বলাই সংগত যে কোন কোন বিষয়ে, যেমন প্রশাসন ব্যাপারে চীন উক্ত দেশগুলি অপেক্ষা বেশি উন্নত ছিল। মহান দেশ, মহান জাতি, মহান সংস্কৃতি—এ ক্ষেত্রে কিরূপে সম্ভব হল একটি বিজাতীয় ধর্মের প্রসার, তার কারণ সন্ধান করতে গেলে তৎকালীন দেশ ও সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। কনফুসীয় নীতিধর্মের বাঁধা-ধরা কেতা-কানুন জনসমাজের বুকে জগদ্দল পাষাণের মত চেপে বসেছিল, সেই কৃত্রিমতার লৌহ-আলিঙ্গন থেকে ক্ষণকালের জন্য মুক্তি পাবার আগ্রহে চিরদিন চীনা মন তাও-তত্ত্বের নিরালম্ব আকাশে ব্যাকুলভাবে বিচরণ করেছে। কিন্তু কালক্রমে তাও-ধর্ম তত্ত্বজিজ্ঞাসার পথ ছেড়ে মন্ত্রতন্ত্র ও অলৌকিকতার কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। কুসংস্কার কনফুসীয় রুচিবিগর্হিত, তত্ত্বজিজ্ঞাসু উন্নতমনা তাও-পন্থীরাও তাও-ধর্মের মন্ত্রতন্ত্রের নববিধানকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতেন। বৌদ্ধধর্ম নূতন আগন্তুক, কনফুসীয় পণ্ডিতগণের

মত তাও-ধর্মীরাও এই নবাগত বিদেশী ধর্মকে সুনজরে দেখেন নি, কিন্তু বিদ্বেষ সত্ত্বেও বৌদ্ধদর্শনের সঙ্গে তাও-তত্ত্বের গভীর সাদৃশ্যের বিষয়টি তাঁরা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, এবং সেইজন্যেই ধর্ম দুটির মধ্যে নিবিড় ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের উদ্যোগ করেছিলেন। ৩০০ খৃস্টাব্দে তাও-ধর্মী কৌ চিয়ে চি একটি সূত্র রচনা করে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছিলেন যে বৌদ্ধধর্ম তাও-ধর্মেরই অঙ্গ-বিশেষ এবং বুদ্ধদেব স্বয়ং লাওৎসি প্রচারিত ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন।* কিন্তু এরূপ মিলন-প্রচেষ্টা সত্ত্বেও উভয় ধর্মের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিশেষত চীনের ঐতিহ্যবর্জিত বিদেশ-জাত বৌদ্ধধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব সহজে দূর হয় নি। ৫৫৫ খৃস্টাব্দে উত্তরখণ্ডের চি' রাজ্যের শাসক বৌদ্ধ ও তাও-ধর্মের মিলনের জন্য উভয় ধর্মাবলম্বীদের একটি তর্ক-সভার উদ্বোধন করেন। বিতর্কে বৌদ্ধ পুরোহিতরা জয়লাভ করেন। তখন সম্রাট তাও-পুরোহিতদের মস্তক মুণ্ডন করে বৌদ্ধ ভিক্ষু হবার আদেশ দিয়েছিলেন।

উপরোক্ত কারণগুলি ছাড়া একটি বিশেষ সামাজিক অবস্থা বৌদ্ধধর্মের প্রসারকে ব্যাপক করে তুলেছিল। সেই অবস্থাটি এই: কনফুসীয় নীতি-ধর্মের একমাত্র অবলম্বন ছিল অভিজাতবর্গ ও পণ্ডিতসমাজ, প্রধানত তাদের স্বার্থের অনুকূল ব্যবস্থাগুলি অক্ষুণ্ণ রেখেই শান্তিরক্ষার প্রয়াস করেছে এই নীতিধর্ম। আর তাও-তত্ত্বও ছিল মুষ্টিমেয় কতিপয় সাধক ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ। জনসাধারণ, বুদ্ধিজীবীর গণ্ডির বাইরে থেকে যারা কায়িক পরিশ্রমে জীবিকা উপার্জন করে তাদের প্রতি দৃষ্টি না ছিল তাও-ধর্মীর, না ছিল কনফুসীয়দের। বৌদ্ধধর্ম কিন্তু শ্রেণীনির্বিশেষে সকলের প্রতি সমদৃষ্টি-সম্পন্ন, সমাজে যত ক্ষুদ্র স্থানই হোক না কেন বৌদ্ধ নির্বাণ বা মুক্তির পথে চলবার আগ্রহ যার আছে, সে পথ তার জন্য সর্বদাই মুক্ত। বৌদ্ধধর্মে দর্শন-তত্ত্বের অভাব নেই, তা ছাড়া আছে জনসেবা, করুণা, মৈত্রী, চীনাদের নৈতিক জীবনে যেসব আদর্শ গুণের আবেদন অমোঘ। গণ-মনকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে মহাযান বৌদ্ধগণের দেবদেবী, গান্ধার থেকে আনীত

* Fitzgerald বলেন, "The Taoist found it wise to compromise with the intruder (Buddhism) to some extent. Kou Chieh Chih described Buddha as one who had found the Tao among the 'Western Barbarians' and became an immortal."

নানান প্রস্তরমূর্তি, পূজা-অর্চনা, গীতবাদ্য, গভীর ধর্মচেতনা। অসংখ্য ধর্ম-প্রচারকের সমাগম হয়েছিল, ধর্ম-সাহিত্যের আকার পর্বতপ্রমাণ হয়ে উঠেছিল। চারদিকে দৈন্যদুঃখ, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, সাধারণ মানুষের জীবন যখন অতিষ্ঠ তখন ভগবান তথাগতের অপূর্ব ত্যাগের কাহিনী, তাঁর শান্তির বাণী সান্ত্বনাব আশ্বাস বহন করে জনগণের চিত্তকে অভিভূত করেছিল, এ বিষয়ে বিস্ময়ের হেতু নেই। এই সময়কাব বিবরণগুলিতে হাজার হাজার বৌদ্ধ মঠ, বহু লক্ষ বৌদ্ধ শ্রমণের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, আর বলা হয়েছে ৩৮১ খৃস্টাব্দে উত্তর-পশ্চিম চীনের বৌদ্ধধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ছিল সমগ্র জনসংখ্যার দশ ভাগেব নয় ভাগ। পরিসংখ্যান সঠিক না হওয়াই সম্ভব, তথাপি এই অনুমান স্বচ্ছন্দে করা চলে যে বৌদ্ধধর্ম অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং জনসমাজে এই ধর্মের প্রভাব ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল।

ফা হিয়েন

বহির্দেশ থেকে বৌদ্ধ প্রচাবকেরা এসেছিলেন সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ নিয়ে, তাঁদের কথা এখনই বলা হবে। এই গ্রন্থগুলি অনুবাদ করতেন ভারতীয় ও চীনা শ্রমণগণ এবং ধর্মপ্রাণ গৃহস্থ ব্যক্তিবা। শাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ ও তীর্থ দর্শনের আগ্রহ চীনাদের চিত্তে কিরূপ জাগরিত হয়ে উঠেছিল, তাব উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—দুর্গম মরু গিরি লঙ্ঘন করে চীনা পরিব্রাজকগণের ভারত পবিদর্শন। সকলেই জানেন, পরিব্রাজক ফা হিয়েন-এব ভ্রমণকাহিনী ভারতবর্ষের ইতিহাসের কণ্ঠে একটি রত্নহারবিশেষ। ফা হিয়েন ছিলেন চাং-আন নগরে বৌদ্ধ মঠের সন্ন্যাসী। ৩৯৯ খৃস্টাব্দে তিনি মধ্য এশিয়ার ভিতর দিয়ে পদব্রজে ভাবতবর্ষে এসেছিলেন। সেই সময়ে বর্তমান চীনা তুর্কীস্থান, আফগানিস্থান প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধধর্মেব বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা দেখেছিলেন তিনি। বুদ্ধদেবেব জন্মস্থান ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম তখনো জীবন্ত ছিল বটে, কিন্তু সেই ধর্মের গৌরব হ্রাসের যেসব পূর্বলক্ষণ দেখা দিয়েছিল, সেগুলি তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। সেখানে বৌদ্ধদের অনেক প্রসিদ্ধ বিহার ও শিক্ষা-কেন্দ্র অবনতিব দিকে ঢলে পড়েছিল। বঙ্গদেশ থেকে সমুদ্রপথে সিংহলে যান ফা হিয়েন এবং সেখান থেকে যবদ্বীপ (জাভা) হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন দীর্ঘ পনর বৎসর পর। তারপর

তিনি দক্ষিণখণ্ডের রাজধানী ন্যানকিং নগরে বসবাস করেন, এবং নানান বিপদ মাথায় করে ভারতবর্ষ থেকে যেসব অমূল্য শাস্ত্রগ্রন্থ সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন, সেই গ্রন্থগুলির অনুবাদ-কার্যে জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করেন।

লিখন ও শিল্প

সাহিত্য সৃষ্টি, ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ, জুমা চিয়েন-এর পদ্ধতির অনুসরণ করে বহু ইতিহাস প্রণয়ন, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা, এমনি সব বিদ্যার চর্চায় ভাষার সম্পদ বিশেষভাবে বর্ধিত হয়েছিল। সেই সঙ্গে নূতন লিখন-পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এই লিখন-প্রণালীর নাম 'পি'য়েন তি' (P'ien t'i) বা 'সমান্তরাল পদ্ধতি' (parallel style)। প্রতিটি বাক্যের অর্থ ও ধ্বনি জোড়ায়-জোড়ায় সাজানো এই পদ্ধতির বিশেষত্ব।

গ্রন্থাগার অনেক স্থাপিত হয়েছিল, যদিও রাজনৈতিক বিপর্যয়ে কোন কোন স্থানে গ্রন্থগুলি যে ধ্বংস পায় নি তা নয়। চীনাদের প্রাচীন গ্রন্থ সংরক্ষণের আগ্রহ ও গ্রন্থাগারের প্রতি অনুরাগ সব সময়েই অক্ষুণ্ণ ছিল।

ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনে নূতন কয়েকটি জিনিসের আবির্ভাব হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ চক্রযুক্ত ঠেলাগাড়ি (wheel barrow) ও জলচালিত কলের নাম করা যেতে পারে। চা-পানের অভ্যাস চীনাদের দক্ষিণ দেশেই প্রথম শুরু হয়, এবং উত্তরাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়বার পূর্বে কয়েক শতাব্দীকাল চায়ের ব্যবহার সেই অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল।

বিদেশ থেকে ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে আর যে জিনিসটি আমদানি করা হয়েছিল, সে জিনিস ভাস্করের প্রস্তরশিল্প। ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে তখন একটি বিশেষ ধরনের ভাস্কর্যের সৃষ্টি চলেছিল, সেই ভাস্কর্যের নাম 'গান্ধারশিল্প'। বুদ্ধদেবের প্রস্তরমূর্তি গান্ধার অঞ্চলের শিল্পীরাই প্রথম নির্মাণ করেছিল। এই শিল্পের শৈলী গ্রীক আদর্শে প্রভাবিত, মূর্তির রূপ-কল্পনায় ভারতীয় ভাবাবেশ অপেক্ষা দেহসৌষ্ঠবের খুঁটিনাটি অধিকতর পরিস্ফুট। ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের সঙ্গে মধ্য এশিয়ার ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যসম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল, সেই সূত্রে গান্ধারশিল্প মধ্য এশিয়ায় এবং সেখান থেকে তারিম উপত্যকার ভিতর দিয়ে

চীন দেশে প্রবেশ করেছিল। এ সময়কার চৈনিক ভাস্কর্যে গান্ধারশিল্পের ছাপ স্পষ্টই দেখা যায়, দৃষ্টান্তরূপে তুন-হুয়াং (কানসু), ইয়ানক্যাং (সানসি), পিনলিং (কানসু), লুং মেং প্রভৃতি গিরিগুহায় মূর্তিগুলির সাবলীল আঙ্গিকের কথা বলা যেতে পারে। তুন হুযাং-এ ৪৬৯টি গিরিগুহা খনন করে প্রত্যেকটিতে একটি বিগ্রহেব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, বিগ্রহগুলি ছিল বুদ্ধমূর্তি। গুহাসমূহে দু' হাজারেরও অধিকসংখ্যক প্রস্তরমূর্তি ও চিত্রাঙ্কন রয়েছে। শিল্পকায চতুর্থ খৃস্টাব্দের উত্তর ওয়েই থেকে শুরু করে ধারাবাহিকভাবে সুই ট্যাং সুং ও ইউয়ান যুগ পর্যন্ত চলেছিল, সেসব মূর্তি ও চিত্রাবলী এখনো বিদ্যমান। এদিকে ইয়াংসি উপত্যকায় ভারতীয় সংস্কৃতির অন্য একটি ধারা জলপথে প্রবেশ করেছিল দক্ষিণ ভারত থেকে। দাক্ষিণাত্যের অজন্তা গুহায় যে সময়ে প্রাচীরচিত্রাঙ্কন (fresco) চলেছিল, চীন দেশেও তখন চতুর্থ ও পঞ্চম খৃস্টাব্দেব সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী কু-কাই চি-র আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁব শিল্পে অনেক বৌদ্ধ কাহিনী চিত্রিত হয়েছে, প্রাকৃতিক দৃশ্য, গৃহস্থ জীবন ও প্রতিকৃতিও তিনি অঙ্কিত করেছেন।

৪. বৌদ্ধধর্মের চীনা রূপ

বুদ্ধদেব দেহত্যাগ করেন ৪৮৩ খৃস্‌ পূর্বাব্দে। তাঁব তিরোধানেব পর রাজগৃহে সংঘ-সম্মেলন, শিষ্যগণ কর্তৃক ত্রিপিটকের* আবৃত্তি, প্রগতিশীল মহাসাংঘিকগণের সঙ্গে স্থবিরগণের বিরোধ এবং সেই বিরোধেরই পরিণাম-স্বরূপ কালক্রমে হীনযান ও মহাযান প্রতিষ্ঠানদ্বয়েব আবির্ভাব, এইসব কাহিনী নিতান্ত সংগতভাবেই ভারত ইতিহাসের বর্ণনীয় বিষয়। কিন্তু চীন দেশে বৌদ্ধধর্মের নূতন রূপায়ণেব অর্থ উপলব্ধি করতে হলে শাখা দুটির বিশেষত মহাযান-তত্ত্বের বিবর্তনের একটি সুস্পষ্ট ধারণা করা প্রয়োজন। চীন দেশে হীনযান ও মহাযান উভয় শাখাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শ্যাম, ব্রহ্ম ও

---

* ত্রিপিটক শব্দের অর্থ তিনটি পিটক অর্থাৎ ঝুড়ি। পিটকত্রয়েব নাম—বিনয় পিটক, সুত্ত পিটক, অভিধম্ম পিটক। 'বিনয় পিটক' আবৃত্তি করেন উপালি, পিটকের বিষয়বস্তু সংঘে নিয়মানুবর্তিতার নিয়মাবলী। 'সুত্ত পিটক' আবৃত্তি করেন আনন্দ, পিটকের বিষয়বস্তু ধর্মকথা। 'অভিধম্ম পিটক' আবৃত্তি করেন কাশ্যপ, পিটকের বিষয়বস্তু দার্শনিক তত্ত্বসমূহের সমুচ্চয ও ভাষ্য।

সিংহলে হীনযানের প্রচলন ছিল, মহাযান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে। দক্ষিণ ও পশ্চিম উভয় দিক থেকেই জলপথে ও স্থলপথে দুটি শাখাই প্রবেশ করেছিল চীন দেশে, কিন্তু হীনযান স্থায়ী হয় নি, আর মহাযান লাভ করেছিল দীর্ঘ জীবন ও বিপুল প্রতিষ্ঠা।

'হীনযান' শব্দ অশ্রদ্ধা-ব্যঞ্জক। নামটি মহাযান-প্রদত্ত। এই নামের পরিবর্তে 'থেরবাদ' অর্থাৎ স্থবিরবাদ ব্যবহৃত হয়। থেরবাদীগণের অভিমত এই যে হীনযানই আদি ও অকৃত্রিম বৌদ্ধধর্ম, আর মহাযান সেই বিশুদ্ধ ধর্মের অপভ্রংশ। তাঁরা বলেন, হীনযান বা থেরবাদ বুদ্ধদেবের সহজ অনাবিল বাণী প্রচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সংসার অনিত্য, জীবন দুঃখময়। যিনি অর্হৎ, জীবন্মুক্ত যিনি, মৃত্যুর পর সংসারে আর তাঁর পুনরাবর্তন ঘটে না, তিনি নির্বাণ লাভ করেন। কামনা, বাসনা, আসক্তি ও কর্ম পুনর্জন্মের কারণ, সুতরাং কামনা, বাসনা, আসক্তি বর্জন এবং নৈষ্কর্ম্যই নির্বাণ প্রাপ্তির উপায়। এই পরম বোধির দ্বারা সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন। বুদ্ধ মহাপুরুষ, ঈশ্বর নন। বুদ্ধপূজা কিংবা তাঁর উদ্দেশে অর্ঘ্য-নৈবেদ্য প্রদানের কোন ব্যবস্থা হীনযান করে নি। বুদ্ধদেব অর্হৎ, জীবনমুক্ত পুরুষ, নির্বাণের অধিকারী। অর্হতের আদর্শমত বোধিলাভ করে যে কোন মানবসন্তান সংসার-চক্রের আবর্তন থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি, ধম্মং শরণং গচ্ছামি', এই ত্রিবিধ শরণের নির্দেশ স্থবিরগণ দিয়েছেন বটে, কিন্তু আত্মনির্ভরশীলতাই বোধিলাভের প্রকৃষ্ট উপায়। বুদ্ধদেব বলেছেন, "আত্ম দীপো ভব", অর্থাৎ নিজের অন্তরে রয়েছে দীপ, মুক্তির বীজ, সেই দীপ নিজেই প্রদীপ্ত কর। এই প্রসঙ্গে সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক প্রভৃতি অষ্টবিধ মার্গের কথা বলা হয়েছে, সেই অষ্টমার্গ অধিগত করলে অর্হতত্ব বা বোধিলাভ সম্ভব হয়।

পূর্বে বলা হয়েছে মহাযানের বিকাশ ঘটেছিল ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে। সেখানকার গ্রীক প্রভাবে বৌদ্ধ নৈরাত্ম্যবাদের প্রকোপ হ্রাস পেয়েছিল বলেই হোক, কিংবা ভারতীয় পরমার্থ চিন্তা ও দেবদেবী কল্পনার ঐতিহ্য প্রচলিত বৌদ্ধধর্মকে আচ্ছন্ন করেছিল বলেই হোক, মহাযান সেই মৌলিক ধর্মের আকৃতির পরিবর্তন করে সম্পূর্ণ একটি নূতন ধর্মরূপেই দেখা দিয়েছিল। পারমার্থিক দর্শনচর্চার প্রশ্রয় বুদ্ধদেব দেন নি, চিরাচরিত

লোকধর্মের প্রতিও তাঁর ছিল অশ্রদ্ধা, এসব কথা মহাযান স্বীকার করে নি। বুদ্ধদেব নানা গুহ্য তত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছিলেন, সেই গুহ্য তত্ত্ব মহাযানের মধ্যে নিহিত রয়েছে, প্রকৃতপক্ষে মহাযান এই দাবিই করে থাকে। মহাযান গুহ্য তত্ত্ব-দর্শনের অবতারণা করল, আদর্শ স্থাপন করল অর্হতের নয়, বোধিসত্ত্বের।* অর্হতের নিজ মুক্তির কামনা স্বার্থপরতা মাত্র, বোধিসত্ত্ব ধরার ক্লেদ কর্দমে পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করেন জগতের দুর্গতদের নৈতিক সমুদ্ধারের জন্য। যে পর্যন্ত সমগ্র মানবজাতির মুক্তি না ঘটে সে পর্যন্ত বিরাম নেই বোধিসত্ত্বের। 'মহা-করুণা' ও 'মহা-প্রজ্ঞা'ই বোধিসত্ত্বের মূলগত প্রকৃতি। জন্ম-মৃত্যুর অধীন হলেও বোধিসত্ত্ব জীবনমুক্ত, পাপ ও আসক্তি তাঁকে স্পর্শ করে না। পঙ্কে জন্ম হলেও পঙ্কজের মতই তিনি অকলঙ্ক ও নির্মল। বোধিসত্ত্ব তাঁর কল্যাণ-ব্রতের কর্মফল দুর্গতজনকে সমর্পণ করেন, বিনিময়ে সেই দুর্গতের কৃত-কর্মের বোঝা নিজের স্কন্ধে বহন করেন। এই 'পরিবর্ত' কল্পনায় যিশু খৃস্ট কর্তৃক মানবের পাপভারের প্রতীক ক্রস বহনের পূর্বাভাস আছে।

বৌদ্ধধর্মের প্রথম অবস্থায় অর্হতের আদর্শ অর্থাৎ নির্বাণ ও আত্ম-নির্ভরতার ওপরই সমধিক জোর দেওয়া হয়েছিল, সেখানে ঈশ্বরচিন্তার কোন স্থান ছিল না। কিন্তু জীবনে আছে শোক-তাপ-পরাজয়ের গ্লানি এবং সেই কারণে চিত্তের শান্তির জন্য সাধারণ মানুষ ভাগ্য-বিধাতা পরমেশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণের প্রয়োজন অনুভব করে। জন-কল্যাণের জন্য বোধিসত্ত্বের জন্মে জন্মে পুনরাবর্তন, বোধিসত্ত্বের এই উচ্চ আদর্শ দার্শনিক মনের তুষ্টি সাধন করলেও দুর্বলের আশ্রয়স্বরূপ ঈশ্বরের স্থান অধিকার করতে পারে না। তাই 'ধর্মকায়' বা 'অমিতাভ' বুদ্ধের কল্পনা করে মহাযান ঈশ্বরের শূন্য আসন পূর্ণ করেছিল। অমিতাভ বুদ্ধের অবতার ছিলেন সিদ্ধার্থ গৌতম যিনি ধরাধামে বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন। 'সুখবতী ব্যূহ' ও 'সদ্ধর্ম পুণ্ডরিক' এই দুটি মহাযান গ্রন্থে স্বর্গে সুখভোগ ও মৈত্রী বুদ্ধের কল্পনা করা হয়েছিল।

স্মরণ থাকতে পারে হ্যান সম্রাট মিং তি কাশ্যপ মাতঙ্গ ও ধর্মারণ্য নামে শ্রমণদ্বয়কে ভারতবর্ষ থেকে চীনে এনেছিলেন। এই দুই শ্রমণই

---

* 'বোধিসত্ত্ব' শব্দের অর্থ, 'বোধি' বা প্রজ্ঞা যার সত্তা বা মূল-প্রকৃতি।

সর্বপ্রথম বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ চীনভাষায় অনুবাদ করেন। অনুবাদকগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন কুমারজীব (৩৪৪-৪১৩ খৃস্টাব্দ)। তিনি ছিলেন একজন মধ্য এশিয়াবাসী ভারতীয়, কাশ্মীরে শিক্ষা লাভ করেছিলেন। চীনে তাঁকে বন্দী অবস্থায় আনা হয়। চাং-আন নগরে তিনি একটি বিরাট সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন, এবং চুরানব্বইটি সংস্কৃতে লিখিত বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থের চীনা অনুবাদ করেন, তন্মধ্যে 'সুখবতী ব্যূহ' গ্রন্থটির অনুবাদ প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থের চীনা নাম 'ও-মি-তো কিং' অর্থাৎ অমিত-গ্রন্থ। এখানে বলা আবশ্যক, চীনের নিজস্ব কনফুসীয় নীতিধর্ম ও তাও-ধর্ম এই দুটি ধর্মের সঙ্গে মিলিতভাবে বৌদ্ধধর্ম জাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের তৃতীয় পাদরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল, তার মূলে রয়েছে কুমারজীব ও অন্যান্য ভারতীয় ভিক্ষুগণের বিপুল উদ্যম, অপরিসীম অধ্যবসায় ও ঐকান্তিক সাধনা।

'সুখবতী' অপূর্ব নন্দনকানন, সুখবতীর চীনা নাম সি তিয়েন বা পশ্চিম স্বর্গ। এই স্বর্গ বা 'বিশুদ্ধ ভূমি'তে ("Pure Land") অমিতাভের জন্ম। তিনি মানুষ নন, দেবতা, তাঁর উদ্ভব মানুষী যোনি থেকে নয়, তিনি 'পদ্ম-সম্ভব'। গৌতম বুদ্ধ নির্দেশিত উপলব্ধি নয়, অমিতাভের নাম-জপই পরিত্রাণের একমাত্র উপায়। অমিতাভের জপ-মন্ত্রের গুণে মৃত্যুর পর মানুষ নরকযন্ত্রণা থেকে উদ্ধার পায়, অক্ষয় স্বর্গে তার বসবাস হয়। দেবমঞ্চের অন্যান্য দেবতার মধ্যে আছেন অবলোকিতেশ্বর, ক্ষিতিগর্ভ, যম, মঞ্জুশ্রী ও মৈত্রেয়ী। বোধিসত্ত্ব 'অবলোকিতেশ্বরের চীনা কল্পনা করুণার দেবীরূপে কুয়ান-ইন। এই দেবী মহাকারুণিক বোধিসত্ত্ব, ধরার ক্রন্দনে ব্যথিত হয়ে বুদ্ধত্বের দ্বারদেশ থেকে ফিরে এসেছেন মানুষের দুর্গতি নাশের জন্য, এবং যে পর্যন্ত প্রত্যেক মানব আধ্যাত্মিকতায় তাঁর নিজের পর্যায়ে উন্নীত না হয় সে পর্যন্ত তিনি বুদ্ধত্বকে পরিহার করবার সংকল্প করেছেন। কুয়ান-ইন-এর মত ক্ষিতিগর্ভ বা তি সাং-ও একজন দেবতা যিনি বুদ্ধত্ব ছেড়ে নরকবাসী মনুষ্যের যন্ত্রণা দূর করবার জন্য আত্মোৎসর্গ করেছেন। এ ছাড়া আছেন যম-দেবতা ইয়েন ওয়েং যিনি নরকের অধিপতি। মঞ্জুশ্রী বা ওয়েন সু এবং পু সিয়েন, এঁরা দু'জনই বোধিসত্ত্ব, মানুষের হিতার্থে বুদ্ধত্ব বর্জন করেছেন, এঁদের বাস ওয়েই ও তা'ই সান পর্বতের চূড়াদেশে। আর একজন দেবতা আছেন, তিনি মৈত্রেয়ী, চীনা নাম 'মি-লো-ফো'। তিনিই

ভাবীকালের শেষ বুদ্ধ, শেষ বোধিসত্ত্ব রূপে ধরণীতে অবতীর্ণ হবেন এবং গৌতমের মতই মনুষ্যজীবনে বোধি লাভ করবেন।

'অমিতাভ তত্ত্ব' ও 'বিশুদ্ধ ভূমি'র আদর্শবাদ চীনাদের কাছে হীনযানের আত্মদর্শন অপেক্ষা অধিকতর চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছিল, তার কারণ এই যে অমিতাভের নাম-জপ দ্বারা মৃত্যুর পর স্বর্গলাভ সকল সংসারীর পক্ষেই সম্ভব, সেজন্য অর্হৎদের মত বৈরাগ্য বা যোগসাধনার প্রয়োজন হয় না। এই তত্ত্ব শুধু ভক্তিকেই শিরোধার্য করেছে, চিন্তা, অধ্যয়ন ও বিধি-বিধানের প্রয়োজন স্বীকার করে নি। অমিতাভ-তত্ত্বে 'বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘের শরণ' প্রধান বিষয় নয়, গৌণ বিষয় মাত্র। এই তত্ত্বের পাশাপাশি একটি জ্ঞানমার্গের সাধনা চীন দেশে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। সেই সাধনাটির নাম 'ধ্যান' যোগ, ধ্যানের চীনা নাম "চ্যা'ন"। জাপানীরা "চ্যা'ন" (Cha'n)-এর নাম দিয়েছে 'জেন' (Zen)। এই পন্থার উদ্ভাবন করেছেন বোধিধর্ম নামে একজন ভারতীয় ভিক্ষু। বোধিধর্মের চীনা নাম 'তা মো'। একটি বিবরণে তাকে পারসীক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু অনেক ঐতিহাসিকের মতে তিনি ছিলেন দক্ষিণ ভারতের কাঞ্চি দেশের রাজা, রাজদণ্ড ছেড়ে ভিক্ষুর ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করেছিলেন। ভারত থেকে সমুদ্রপথে যাত্রা করে তিন বছর পর তিনি দক্ষিণ চীনে উপনীত হন। ৫১৬-৫৩৪ খৃস্টাব্দের মধ্যবর্তী কালে তিনি লো-ইয়াং নগরে বসবাস করতেন। কথিত আছে, বৌদ্ধধর্মে নিষ্ঠার গর্ব করে সম্রাট লিয়াং উ তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আমি অসংখ্য মন্দির ও মঠ নির্মাণ করেছি, অসংখ্য বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থের প্রতিলিপি প্রস্তুত করেছি—আমার এসব কাযের ফলশ্রুতি কি?" ধ্যানযোগী বললেন, "কিছু নয় সম্রাট।" সম্রাট আবার প্রশ্ন করলেন, "বৌদ্ধধর্মের মূল তত্ত্ব কি?" তিনি বললেন, "শূন্যতা।" শূন্যতার এই মূল ভিত্তির ওপর বোধিধর্ম-পরিকল্পিত চ্যা'ন যোগ প্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধত্বের বীজ মানুষের অন্তর্নিহিত, বোধি বা তত্ত্বজ্ঞান জন্মে ধ্যান দ্বারা, যখন জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় একত্ব লাভ করে। ধ্যানযোগে বোধিলাভ হলে মানুষকে আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করতে হয় না, ইহলোকেই সে বুদ্ধের জীবন্মুক্ত দশা প্রাপ্ত হয়। এই ধ্যান বা 'জেন'-যোগকে জাপানী মনীষী দারুমা কবিতায় চারটি ছত্রে ব্যাখ্যা করেছেন:

শাস্ত্রগণ্ডীর বাইরে দাও ঝাঁপ,
শাস্ত্রবাক্যে শাস্ত্রমন্ত্রে ক'রো নাকো মাপ,
চিত্ত প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হানো,
আপনার প্রকৃতিরে জানো।

চ্যা'ন যোগের আত্মসন্ধান বৌদ্ধধর্ম সমুদ্ভূত হলেও তাও-দর্শনের সঙ্গে এই তত্ত্বের সাদৃশ্য অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়। লাওৎসির তাও-তে-কিং গ্রন্থে এইরূপ যোগসাধনার স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে, চুয়াংৎসিও এই ধরনের অনেক কথা বলে গেছেন। এই কারণে ধ্যান বা চ্যা'ন চীনাদের কাছে পরধর্ম বলে আদৌ মনে হয় নি। বরঞ্চ এই বিশেষ মার্গটিকে স্বচ্ছন্দ চিত্তে গ্রহণ করে তারা এই সত্যই প্রমাণ করেছে যে দেশী রঙে বিদেশী ধর্মকে রাঙিয়ে দিয়ে তাকে স্বধর্মে রূপান্তরিত করবার অসাধারণ শক্তি ছিল চীনা চরিত্রে, এবং এই ঔদার্য-গুণের জন্যই তাদের দেশে বৌদ্ধধর্মের নানা শাখার প্রসার ঘটতে বিশেষ বাধা জন্মে নি।

বৌদ্ধধর্মের একটি চীনা শাখা 'তিয়েন তাই', জাপানী নাম 'তেণ্ডাই' (Tendai)। তিয়েন তাই একটি প্রসিদ্ধ মঠের নাম, চেকিয়াং প্রদেশে অবস্থিত মঠ। চি কা'ই নামে সেই মঠের একজন চীনা ভিক্ষু এই ধর্মশাখার প্রতিষ্ঠাতা। চ্যা'ন যোগের শিক্ষক ছিলেন তিনি, কিন্তু তাঁর এই বিশ্বাস জন্মেছিল যে ঐ সাধনযোগে কয়েকটি ভ্রম-প্রমাদ আছে। শুধু ধ্যানই মুক্তির পক্ষে যথেষ্ট নয়, ধ্যানের সঙ্গে প্রয়োজন যম নিয়ম স্বাধ্যায় অন্তর্দৃষ্টি। তিনি অধ্যয়নের পর্যায় ভাগ করে অধিকারী-ভেদে বিষয়ের গুরুত্ব নির্ণয় করেছিলেন। সত্তাকে ব্যক্তির চিত্তে বিরাজমানরূপে কল্পনা করেছে ধ্যান-যোগ, কিন্তু সত্তা শুধু অন্তরবাসী নয়, তার বাস্তব অস্তিত্ব বহির্জগতেও বিদ্যমান। 'তিয়েন তাই' শাখার এই তত্ত্বগুলি এমন সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করে সাধারণের কাছে উপস্থিত করা হয়েছিল যে কনফুসীয় 'মধ্য-পন্থা'র পণ্ডিতরা পর্যন্ত বৌদ্ধধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবান হয়ে উঠেছিলেন।

এই প্রসঙ্গ শেষ করবার পূর্বে হীনযান সম্বন্ধে একটি কথা বলা প্রয়োজন। ৫৬৩ খৃস্টাব্দে পরমার্থ নামে জনৈক ভারতীয় ভিক্ষু হীনযানের যে বিশেষ শাখার প্রবর্তন করেছিলেন, একমাত্র সেই শাখাই চীন দেশে দশম খৃস্টাব্দ

পর্যন্ত টিঁকে ছিল। ভারতে এই শাখা 'সর্বাস্তিবাদ' নামে পরিচিত, চীন দেশে শাখাটির নাম চিউ সে সুং। এই শাখার গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ তত্ত্বসমূহ সুধীগণ কর্তৃক সমাদৃত হলেও জনসাধারণের কাছে সেগুলি কোনদিন প্রিয় হয়ে ওঠে নি।

পঞ্চম পর্ব

সাম্রাজ্যের পুনরভ্যুত্থান ও সমৃদ্ধির স্বর্ণযুগ

১ সুই বংশ (৫৮১-৬১৮ খৃঃ)

চার শ' বছর ধরে বহুভাগে খণ্ডিত চীনেব স্বার্থান্বেষী শাসকবৃন্দের মধ্যে নিরন্তব সংগ্রাম জনগণের সুখশান্তি বিনষ্ট করেছিল, দেশকে নিঃস্ব কবে দিয়েছিল। দেশের এই চরম দুর্গতির দিনে সমৃদ্ধর্তা রূপে আবিভূত হয়েছিলেন উত্তব চৌ রাজ্যেব প্রধান মন্ত্রী ইয়াং চিয়েন। তিনি সুই বংশেব প্রতিষ্ঠাতা, তাঁরই দৌহিত্র উত্তব চৌ বংশের নাবালক নৃপতিকে অপসারিত করে স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করেছিলেন (৫৮১ খৃঃ) এবং কয়েক বৎসরেব মধ্যে দক্ষিণখণ্ডের চে'ন বংশেব শেষ রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত কবে সমগ্র চীনের একচ্ছত্র সম্রাট হয়েছিলেন। এইরূপে উত্তর ও দক্ষিণ চীনেব পুনর্মিলন ঘটেছিল (৫৮৯ খৃঃ)।

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, প্রতিষ্ঠাবান হ্যান বংশেব অভ্যুদযেব পথ বেঁধে দিয়েছিল চি'ন বংশ, যদিও এই বংশটিব রাজত্বকাল ছিল অনতিদীর্ঘ। ইযাং চিয়েন প্রতিষ্ঠিত সুই বংশও তেমনি মাত্র ছত্রিশ বছব রাজত্ব করেছিল, তারপরই অভ্যুত্থান ঘটল মহান কীর্তি-সমুজ্জ্বল ট্যাং বংশের। চি'ন বংশের গঠনকায ও স্বাধীন চিন্তা জাতিকে যে সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার দান কবে গিয়েছিল, সুই নৃপতিদেব তেমন কোন কৃতিত্বের পরিচয পাওয়া যায না বটে, কিন্তু তাঁবা সংগতভাবেই জনকল্যাণ-কার্যের দাবি করতে পারেন, এবং সে দাবি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয।

কাও-সু বা ওয়েং তি

ইয়াং চিয়েন সম্রাট কাও-সু বা ওয়েং তি নামে পরিচিত হয়েছিলেন। সুশাসকরূপে তাঁব খ্যাতি ছিল যথেষ্ট। কর হ্রাস, আইন প্রণয়ন, শাসন সংস্কার এইসব হিতকর কর্মানুষ্ঠান তাঁব কৃতিত্বের পরিচয দেয। শাসন-ব্যবস্থার পুনর্গঠন করেছিলেন তিনি দেশের বিভিন্ন বিভাগের ভার কর্মচারীদের ওপর ন্যস্ত করে। পীত নদী ও ইযাংসির মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে কতগুলি খাল

কেটে উত্তর ও দক্ষিণ খণ্ডের সংযোগের ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে বর্তমান টংকিং ও আনামের কিয়দংশ সামরিক অভিযান দ্বারা পুনরধিকৃত হয়েছিল। তাঁর শক্তিশালী পররাষ্ট্রনীতি সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে তুর্কী খণ্ডজাতিগুলির সংহতি নষ্ট করে পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল। জাপানীরা তার রাজদরবারে দূত প্রেরণ করেছিল।

৬০৪ খৃস্টাব্দে সম্রাট কাও স্থ-র মৃত্যু হয়। সম্ভবত যুবরাজের আদেশে তাঁকে গুপ্তহত্যা করা হয়েছিল।

ইয়াং তি

যুবরাজ হুয়াং কুয়াং সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাঁর রাজত্বকাল ৬১৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত। তিনি ইয়াং তি নামে ইতিহাসে পরিচিত। ইয়াং তি ছিলেন একটি প্রহেলিকাবিশেষ। প্রাচীন চীনা ঐতিহাসিকেরা তাঁর অনেক দোষ-ত্রুটি দুর্বলতার উল্লেখ করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর অপরিসীম উৎসাহ, তীব্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সৃজনমুখর কল্পনা বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তাঁর পিতার পরিকল্পনামত পীত নদী ও ইয়াংসি এই দুটি নদীকে সংযুক্ত করে এক হাজার মাইল দীর্ঘ একটি খাল এবং অসংখ্য শাখা খনন করেছিলেন তিনি এবং এই কাজে সি হুয়াং তি-র অনুকরণে ত্রিশ লক্ষ ব্যক্তির বাধ্যতামূলক শ্রম নিয়োজিত হয়েছিল। দেশের ঐক্য গঠনে এই খালসমূহ যথেষ্ট সাহায্য করেছিল, এবং সেজন্য সংযোগ-ব্যবস্থা হিসাবে এগুলির উপযোগিতা অনস্বীকার্য। খালের ধারে ধারে তিনি প্রমোদভবন নির্মাণ করেছিলেন, উত্তর প্রত্যন্তের প্রতিরক্ষার জন্য দুটি প্রাচীরও গেঁথে তোলা হয়েছিল। সম্রাট ইয়াং তি ছিলেন অধ্যয়নপ্রিয়, বিলাসী, অমিতব্যয়ী মানুষ, অতি বৃহৎ নির্মাণকার্য ছিল তাঁর একটি খেয়াল। দ্বীপপুঞ্জের ছায়াস্নিগ্ধ হ্রদে নৌ-বিহার, কুসুমিত উপবনে যৌবনবতী সুদর্শনা নারীর সংসর্গ, এমনি সব ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ দ্বারা উন্মার্গ প্রবৃত্তিকে তিনি চরিতার্থ করতেন। কিন্তু এই চারিত্রিক বিচ্যুতি সত্ত্বেও রাজকার্যে তাঁর গভীর নিষ্ঠা প্রশংসনীয়। একটি কথিকায় বলা হয়েছে: রাজপ্রাসাদে সম্রাট বিশ্রাম করছিলেন, পার্শ্বে রাজমহিষী আসীনা, গায়িকা সুললিত কণ্ঠে গান গায়, সামনের দেয়ালে

কুয়ান-লিং অঞ্চলের মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি দেখা যায়। মোহিনী নারীর রূপ-সৌন্দর্য, মধুর কণ্ঠের স্বর-মূর্ছনা, সেই প্রাচীরচিত্রের আবছা যাদু-মায়া, সব মিলে সম্রাটকে কেমন উন্মনা করে তুলেছিল। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তিনি গায়িকার পানে চাইলেন, তারপর নির্বাক হয়ে ছবিটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। বিস্ময়-ভরা কণ্ঠে সম্রাজ্ঞী জিজ্ঞাসা করলেন, "সম্রাটকে মোহাবিষ্ট করেছে কোন সে বস্তু ?" সম্রাট বললেন, "ঐ ছবিখানা। কলা-সৌষ্ঠব তেমন কিছু নয়। কিন্তু ওর বিষয়বস্তু আমার বিগত দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।" তারপর সম্রাজ্ঞীর পানে ঝুঁকে পড়ে চিত্রে অঙ্কিত গিরিনির্ঝর, কৃষকের কুটির দেখিয়ে বললেন, "আমি যখন যুবরাজ, কুয়ান-লিং-এর শাসক ছিলাম যখন, আমি তখন এই সুন্দর দৃশ্যাবলী উপভোগ করবার সময় পেতাম। এখন আমার সর্বক্ষণ রাজকার্য, এতটুকু সময় নেই যে প্রকৃতির শোভা সম্ভোগ করব।" পরদিন তিনি ঘোষণা করলেন, সম্রাট কুয়ান লিং পরিদর্শনে বেরুবেন রাজকর্মচারীগণের কার্য পর্যবেক্ষণের জন্য।

সাম্রাজ্যে প্রশাসন-ব্যবস্থার সংস্কার করেছিলেন ইয়াং তি। দেশকে কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করে রাজকর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন বিভাগীয় শাসনের জন্য। ভ্রাম্যমাণ পরিদর্শক নিযুক্ত করা হয়েছিল। পরিদর্শকেরা প্রশাসন-কার্য পরিদর্শন করে স্থানীয় শাসনের দোষগুণ, অর্থনৈতিক অবস্থা, শাসক ও প্রজামণ্ডলীর মধ্যে সম্বন্ধ ইত্যাদি নানা বিষয়ের বর্ণনা কেন্দ্রের কাছে দাখিল করত। শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে করা হয়েছিল, রাজকর্মচারী নিয়োগ করা হত শিক্ষিত সমাজ থেকে। কর্মচারী নিয়োগের জন্য যে পরীক্ষার ব্যবস্থা পূর্বকাল থেকে প্রচলিত ছিল, সম্রাট ইয়াং তি সেই সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার সংস্কার করলেন 'চিন সি' নামক একটি উপাধি সৃষ্টি করে। তিনি যে পরীক্ষা-পদ্ধতি ও উপাধির প্রবর্তন করেছিলেন সেই প্রণালীতে পরীক্ষা ও উপাধি দান বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত চলে এসেছে। রাষ্ট্র ও সমাজ-শাসন বিষয়ে সুই বংশ প্রবর্তিত শিক্ষা জাতির মর্মে প্রবেশ করে কিরূপ স্থায়ী আসন পেতে বসেছিল, তা বেশ বোঝা যায় এই শিক্ষার এক হাজার বছরেরও ঊর্ধ্বকালের ধারাবাহিকতা থেকে।

আর একটি বিষয়ে পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন ইয়াং তি, সেটি সামরিক অভিযান। এই অভিযানগুলি সুবিবেচনা-প্রসূত ছিল না, কোন

কোন ক্ষেত্রে বেপরোয়াভাবে চালানো হয়েছিল। দক্ষিণে চাম (ইন্দোচীন) দেশে সৈন্য প্রেরণ করা হয়েছিল, সেখানে সাফল্যলাভ ঘটলেও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে কোরিয়ায় হয়েছিল বিষম ভাগ্যবিপর্যয়। ৩০৫০০০ সৈন্যের মধ্যে মাত্র ২৫০০ জন দেশে ফিরে এসেছিল। কোরিয়ার বিরুদ্ধে আরও দুটি অভিযানের পর সে দেশ নামমাত্র বশ্যতা স্বীকার করেছিল বটে, কিন্তু এই বিপুল শক্তিক্ষয়ের পরিণাম নেপোলিয়নের রুশ অভিযানের মতই সাংঘাতিক হয়েছিল, সম্রাটের নিজের পক্ষে যেমন সাম্রাজ্যের পক্ষেও তেমনি। লোকের চক্ষে সম্রাটের গুরুতর সম্মানহানি ঘটল, দুর্দশার চরম হয়েছিল সম্রাট স্বয়ং যখন একটি দুর্গে তুর্কীগণ কর্তৃক অবরুদ্ধ হলেন। সে যাত্রায় লি সি মিন নামে একজন তরুণ যোদ্ধা অসাধারণ কৌশলে তাকে অবরোধ থেকে উদ্ধার করলেন। এই তরুণ যোদ্ধা সেনাপতি লি ইউয়ানের পুত্র, তার বিষয় এখনি বিস্তারিতভাবে বলা হবে। তুর্কীদের কবল থেকে মুক্ত হলেও সম্রাটের বিপদের অন্ত ছিল না। বিদ্রোহের পর বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেল। সম্রাট যখন দেখলেন এই প্রজ্বলিত বহ্নি নির্বাপিত হবার নয়, তিনি তখন আমোদপ্রমোদে গা ভাসিয়ে দিলেন। এই সময়ে একদল বিদ্রোহী প্রাসাদে প্রবেশ করে তাঁকে হত্যা করে (৬১৮ খৃঃ)। তারপর অল্পকালের মধ্যে দু'জন সম্রাট হয়েছিল। একজন আততায়ীর হস্তে নিহত হলেন, আর একজন স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করলেন (৬১৯ খৃঃ)। তিনিই ছিলেন সুই বংশের শেষ সম্রাট।

২. ট্যাং বংশ (৬১৮-৯০৮ খৃঃ)

সুই-বংশীদের পতন যখন আসন্ন, দেশব্যাপী বিপ্লবের মধ্যে সেই সময়ে সম্রাটের সেনাপতি লি ইউয়ানের অভ্যুদয় হয়েছিল। সাত বৎসর-কাল ধরে নানান জটিল ও বিপদসংকুল অবস্থার ঘোর প্যাঁচ অতিক্রম করে পরিশেষে তিনি সিংহাসন অধিকার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। পুত্র লি সি-মিন-এর অসীম শৌর্যবীর্য ও তীক্ষ্ণবুদ্ধির জন্যই তাঁর এই অসামান্য সাফল্য সম্ভব হয়েছিল। এই সপ্তদশবর্ষীয় তরুণ যোদ্ধা একদিন সুই-সম্রাটকে তুর্কীদের কবল থেকে কৌশলে উদ্ধার করেছিলেন, তিনিই এখন দ্বিধাগ্রস্ত দুর্বলচিত্ত

পিতার পাশে দাঁড়িয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে সংগ্রামে তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করলেন। সেই হিসাবে ট্যাং বংশের যথার্থ প্রতিষ্ঠাতা লি সি মিন, যদিও বংশের প্রথম সম্রাটরূপে সিংহাসনে বসেছিলেন তাঁর পিতা লি ইউয়ান, যিনি ইতিহাসে কাও স্থ নামে পরিচিত (৬১৮-৬২৭ খৃস্টাব্দ)। লি ইউয়ান ছিলেন উত্তরাঞ্চলের অভিজাতবংশীয় ব্যক্তি, তাও-তত্ত্বের প্রবর্তক লাওৎসির বংশধর বলে দাবি করতেন। তাঁর মাতা ছিলেন তুর্কী-জাতীয়া নারী। তিনি রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন চাং-আন (বর্তমান সিযান) নগরে। পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সৈন্যবাহিনীর অভিযান প্রেরণের পক্ষে এই অঞ্চলের গুরুত্ব ছিল যথেষ্ট। কাও স্থ-র রাজত্বের অল্প কয়েকটি বৎসর প্রতিদ্বন্দ্বীদের দমন এবং সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করতে অতিবাহিত হয়েছিল। তিনি ছিলেন তাও-ধর্মী, যুদ্ধবিগ্রহের চেয়ে তাও-ধর্মের আকর্ষণ যখন অধিকতর প্রবল হয়ে উঠল, তিনি তখন তাঁর সুযোগ্য পুত্র লি সি-মিন-এর হস্তে রাজ্যভার তুলে দিয়ে অবসর গ্রহণ করলেন (৬২৭ খৃঃ)।

তা'ই স্থং

লি সি-মিন ট্যাং বংশের প্রসিদ্ধ সম্রাট তা'ই স্থং (৬২৭-৬৪৯ খৃঃ)। চীন দেশের সুদীর্ঘ ইতিহাসে তা'ই স্থং-এর মত সুদক্ষ প্রতিভাবান সম্রাটের আবির্ভাব হয়েছে অল্পই। এমন মেধাবী, কর্তব্যপরায়ণ মানুষকেও শত্রু-ভাবাপন্ন দুই ভাইকে হত্যা করে সিংহাসনের পথ নিরঙ্কুশ করতে হয়েছিল। নৃশংসতার এই কলঙ্ক সত্ত্বেও তাঁর চরিত্রে উদারতা, মিতাচার, স্নেহ, দয়া-দাক্ষিণ্য, ন্যায়নিষ্ঠা প্রভৃতি মানবতার শ্রেষ্ঠ গুণধর্মের কোন অভাব ছিল না। একদা কারাগার পরিদর্শনকালে তিনি দেখলেন ২৯০ জন দণ্ডিত ব্যক্তি মৃত্যুর অপেক্ষায় কালযাপন করছে। তিনি তখনি তাদের কৃষিকর্ম করবার জন্য মাঠে পাঠিয়ে দিলেন, শুধু এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন তাদের কাছ থেকে যে মাঠের কাজ শেষ হলে তারা আবার কারাগারে প্রত্যাবর্তন করবে। প্রত্যেকেই তারা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিল, এবং সেজন্য প্রীত হয়ে তাদের তিনি মুক্তিদান করলেন। সেই অবধি এই নিয়ম হল, কোন ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড মঞ্জুর করবার পূর্বে সম্রাট তিন দিন উপবাসী থেকে চিন্তা করে দেখবেন যেন

অন্ধ আবেগে ভ্রমবশত কোন নির্দোষ ব্যক্তি দণ্ডিত না হয়। মন্ত্রীগণ যখন সম্রাটকে দস্যুতা নিবারণের জন্য কঠোর আইন প্রবর্তন করতে উপদেশ দিলেন, তিনি তখন বললেন, "কঠোর শাস্তির চেয়ে দস্যুতা নিবারণের আরও ভাল উপায় রাষ্ট্রের ব্যয় হ্রাস, করভার লাঘব, সাধু কর্মচারী নিয়োগ, ফল-কথা প্রজাদের খাওয়া-পরার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা।"

তা'ই সুং-এর ব্যক্তিগত জীবন ছিল বিলাসবর্জিত, অনাড়ম্বর সংসার-যাত্রার আদর্শ জাতির সমুখে ধরেছিলেন তিনি। সিংহাসন লাভের অব্যবহিত পরেই তিনি প্রাসাদের তিন সহস্র নারীকে মুক্তি দিয়ে নিজ নিজ ঘরে ফেরত পাঠিয়েছিলেন। তাঁর সুন্দরী পত্নী চ্যাং সুন ছিলেন স্বামীর যথার্থ সহধর্মিণী, স্বামীর সংকার্যে উৎসাহদান ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। মৃত্যুকালে এই মহীয়সী নারী বলেছিলেন, "আমার শবাধারে কোন অলংকার রেখো না। আমার মাথাটি রেখো একখণ্ড কাঠের ওপর। বাজে লোকের কথা শুনে কোন সমাধিসৌধ নির্মাণ ক'রো না। তা হলেই আমি সুখে মরতে পারব।"

ট্যাং তা'ই সুং শাসন সংস্কার করেছিলেন বটে, কিন্তু ব্যবস্থার কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন করেন নি। যে শাসন-ব্যবস্থা সুই রাজগণ উত্তরাধিকার-সূত্রে পেয়েছিলেন হ্যান ও চি'ন বংশ থেকে, সুই আমলের সেইসব বিধি-পদ্ধতির তিনি পরিবর্তন করেছিলেন সামান্যই। কর্মচারী নিয়োগের জন্য সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা ছিল পূর্ববৎ; সাধারণত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উত্তীর্ণ ছাত্রদেরই যোগ্যতা অনুসারে নিযুক্ত করা হত, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ডিগ্রীধারী ছাড়া অন্য কোন সুযোগ্য ব্যক্তিকে কাজে বহাল করবার পক্ষে বাধা ছিল না। পরীক্ষা-ব্যবস্থার একটি ফল হয়েছিল এই যে অভিজাতবংশীয় পরিবারের শক্তি নষ্ট হয়েছিল, যদিও তাদের মর্যাদা লুপ্ত হয় নি। প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রেরা নিম্ন পদগুলিতে নিযুক্ত হত, কঠিনতর পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করে ঊর্ধ্বতন পদসমূহে ধাপে-ধাপে উন্নীত হত। এই নূতন সিভিল সার্ভিসের শিক্ষায়তন ছিল রাজধানী চাং-আন নগরে। তা'ই সুং-এর সময়ে এই কলেজে ছাত্র সংখ্যা ছিল ৮০০০, তন্মধ্যে ৩২৬০ জন ছাত্রাবাসে বাস করত। শিক্ষা শুধু কনফুসীয় নীতি-শাস্ত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, কনফুসীয় সাহিত্যের মধ্যেও নয়। শিক্ষণীয় বিষয়গুলির মধ্যে ছিল ইতিহাস, আইন, অঙ্ক, পদ্য, লিখন-শিল্প (calligraphy) এবং তাও-তত্ত্ব।

সাম্রাজ্যকে দশটি 'তাও' বা প্রদেশে বিভক্ত করা হয়েছিল, এবং সেই প্রদেশগুলি 'চৌ' বা জেলায় ভাগ করা হয়েছিল। 'চৌ'গুলি 'সিয়েন' বা মহকুমায় বিভক্ত হয়েছিল। জেলার সংখ্যা ছিল ৩৫৪। কেন্দ্র থেকে কর্মচারী নিযুক্ত করে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা হত এবং তাদের পরিদর্শকরূপে এক একজন কমিশনার নিযুক্ত করতেন সম্রাট, তারা ছিল সম্রাটের খাস কর্মচারী। অনাবৃষ্টি, প্লাবন, বিদ্রোহ প্রভৃতি আপদের সময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ভার ছিল এই কর্মচারীদের ওপর। তা'ই সুং-এর শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে Fitzgerald বলেন, "The government itself was organised in a pattern which, familiar enough in modern times, was perhaps at that time the most advanced type of central administration ever attempted."

তা'ই সুং ছিলেন একজন সুদক্ষ যোদ্ধা, তরুণ অবস্থা থেকেই তাঁকে আততায়ীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। এমন ব্যক্তির পক্ষে দিগ্বিজয়ী অভিযান স্বাভাবিক। হ্যান বংশের পর কোন সম্রাট তার মত মধ্য এশিয়ার সুদূর অঞ্চল পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করতে পারেন নি। তাঁর এই অসামান্য সাফল্যের কারণ নিজের কর্তৃত্বাধীনে চীনা বাহিনীর পুনর্গঠন এবং যুদ্ধোপকরণের উন্নতি দ্বারা শক্তিবৃদ্ধি। 'ছয় রাজবংশে'র যুগে মধ্য এশিয়ার সিয়াং হু-দের বংশধর ও অন্যান্য খণ্ডজাতিগণের পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহের যখন অবসান ঘটল, ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সকলেই তারা তখন মিলিত হয়ে তু-চুয়ে বা তুর্কীদের অধীনে একটি রাষ্ট্র-সমাহার স্থাপন করেছিল। এই রাষ্ট্র-সমাহারের আয়তন ছিল অত্যন্ত বিস্তৃত, পূর্বে মোঙ্গলিয়া ও পশ্চিমে তুর্কীস্থান। এরূপ সুবিশাল রাষ্ট্রে উপজাতিগণের ঐক্যের বন্ধন হয়েছিল যেন 'বজ্র আঁটন ফসকা গেরো', অল্পকাল মধ্যেই অন্তর্বিরোধ দেখা দিল। সুই-রাজগণ এই-সব তুর্কী খণ্ডজাতির সংহতি নষ্ট করবার জন্য ভেদনীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন, পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের গৃহবিবাদে পূর্বদেশীয় উপজাতির উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে পশ্চিমাঞ্চলের তুর্কীদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেছিলেন। ট্যাং বংশের প্রথমাবস্থায় সেই নীতিই অনুসৃত হয়েছিল। কিন্তু পূর্বাঞ্চলের তুর্কীরা বহুকাল ধরে চীনা প্রত্যন্তের ওপর যে উপদ্রব মুহুর্মুহু চালিয়ে এসেছিল, সেইসব আক্রমণাত্মক কাণ্ডগুলি এখন রীতিমত সামরিক অভিযানের আকার

ধারণ করেছিল। ৬২৭ খৃস্টাব্দে একটি সুবৃহৎ তুর্কী বাহিনী চীন দেশে প্রবেশ করে রাজধানী চাং-আনের উপকণ্ঠে নদীতীরে শিবির স্থাপন করল। সম্রাট তা'ই সুং রক্তপাত বর্জনের একটি উপায় স্থির করলেন। ছয়জন মাত্র দেহরক্ষী সঙ্গে নিয়ে তিনি স্বয়ং তুর্কী শিবিরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। দুই রাজার সাক্ষাৎ হল একটি সেতুর ওপর। তুর্কী-রাজের বিরুদ্ধে অকারণে শান্তিভঙ্গের অভিযোগ করলেন তা'ই সুং। কথিত আছে, তাঁর নির্ভীক আচরণ ও বাক্‌চাতুর্য তুর্কী-রাজকে এমনি মুগ্ধ করেছিল যে তিনি অশ্ব থেকে অবতরণ করে বিনীতভাবে সম্রাটকে অভিবাদন করলেন। এইরূপে সম্রাট তা'ই সুং-এর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের গুণে একটি রক্তাক্ত যুদ্ধ-সম্ভাবনা শান্তিপূর্ণ সৌহার্দ্যে পরিণত হয়েছিল।

কিন্তু মধ্য এশিয়া অঞ্চলে তুর্কী শাসনের বিরুদ্ধে উইঘার নামে মোঙ্গলীয় খণ্ডজাতির বিদ্রোহ শুরু হয়ে গিয়েছিল, এবং সেই সঙ্গে যখন শস্য ও পশু-নাশের ফলে ব্যাপকভাবে দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যু দেখা দিল, তুর্কী রাজ্যের পতন ঘটল তখনই। মধ্য এশিয়ার এই বিশৃঙ্খল অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করতে বিলম্ব করেন নি তা'ই সুং। ৬২৯ খৃস্টাব্দে তিনি 'লৌহ-পর্বত' (বর্তমান মোঙ্গলিয়া) অঞ্চলে এক লক্ষ সৈন্য প্রেরণ করে তুর্কী সৈন্যদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করেন। এইরূপে পূর্ব-তুর্কীদের রাজ্য অধিকৃত হল। কিছুকাল পরে পশ্চিম-তুর্কীগণকেও যুদ্ধে পরাস্ত করে তিনি তাদের রাজ্য দখল করেছিলেন।* উইঘার-দের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপিত হল। পূর্ব মোঙ্গলিয়া ও দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার খিতান খণ্ডজাতি বশ্যতা স্বীকার করল। তারিম উপত্যকার কয়েকটি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী জাতি চীনের আধিপত্য মেনে নিয়েছিল, এমন কি কাশগর, ইয়ারকন্দ্‌, সমরকন্দ্‌ ও বোখারা চীনা বাহিনীর পদানত হয়েছিল। তা'ই সুং এর মৃত্যুকালে পশ্চিমে রুশ তুর্কীস্থান ও দক্ষিণে আফগানিস্থান সমেত সমগ্র ভূখণ্ডে সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। ফলে পশ্চিম এশিয়া ও ভারতবর্ষের সঙ্গে চীনের সংযোগ রক্ষার সুবিধা

* খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি সময়ে তু চুয়ে বা তুর্কীরা পূর্ব ও পশ্চিম দুই অঞ্চলের দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। 'পূর্বাঞ্চলের তুর্কী'দের বাসস্থান ছিল উত্তর দিকে মোঙ্গলিয়া থেকে উরাল পর্বত পর্যন্ত, আর আলতাই পর্বত থেকে সির দরিয়া পর্যন্ত ভূখণ্ডে যেসব তুর্কী বসবাস করত তাদের বলা হত 'পশ্চিমাঞ্চলের তুর্কী'।

ঘটেছিল। তা'ই সুং ভারতে দূত প্রেরণ করেছিলেন, বিখ্যাত পরিব্রাজক হুয়ান-ৎসাং ভারত পরিদর্শন করেছিলেন তাঁরই রাজত্বকালে। তখন ইসলামের অভ্যুদয়ের প্রথম সংবাদ চীন দেশে এসে পৌঁছেছিল। ৬৩৮ খৃস্টাব্দে পারস্যের শেষ সাসানিড্ রাজা যেসদিগার্দ (Yesdegerd) চীন সম্রাটের কাছে মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করে দূত পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তা'ই সুং এই প্রস্তাবমত দূরদেশে তাঁর সমরক্লান্ত সেনাবাহিনী যুদ্ধার্থে প্রেরণ করতে সম্মত হন নি। ৬৪২ খৃস্টাব্দে নেহাবেন্দের যুদ্ধে পারস্য পরাজিত হবার পর মধ্য এশিয়ায় মুসলিম ধর্ম প্রচারের পথ মুক্ত হয়ে গিয়েছিল।

এদিকে তুরফান নামে একটি তিব্বতীয় জাতি সংঘবদ্ধ হয়ে সাম্রাজ্যের প্রত্যন্তদেশ আক্রমণ করেছিল। তা'ই সুং তাদের যুদ্ধে পরাস্ত করলেন বটে, কিন্তু পরাজিত শত্রুর সঙ্গে অশোভন ব্যবহার না করে চরিত্রের মহত্ত্ব দেখালেন তুরফান-রাজপুত্রের সঙ্গে এক চীনা রাজকন্যার বিবাহ দিয়ে। সেই রাজকন্যার উদ্যোগে তুরফানদের মধ্যে চীনা সামাজিক প্রথা ও বৌদ্ধ-ধর্মের প্রচলন হয়েছিল।

চীনের বহির্ভাগে বর্বর দেশসমূহের শাসন স্ব স্ব প্রথামত খণ্ডজাতির প্রমুখগণই পরিচালনা করতেন। এইসব শাসকেরা তাঁদের পুত্রদের চৈনিক প্রথায় শিক্ষালাভের জন্য চাং-আনে রাজকীয় বিদ্যালয়ে পাঠাতেন। এইরূপে শিক্ষার মাধ্যমে বর্বর জাতিগণের পক্ষে চীনা জীবনাদর্শ গ্রহণ সহজ হয়ে উঠেছিল।

সম্রাট তা'ই সুং-এর সামরিক অভিযানগুলি সর্বত্রই সফল হয়েছিল, ব্যর্থ হয়েছিল শুধু কোরিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। সুই বংশী ইয়াং তি-র কোরিয়া আক্রমণের ব্যর্থতা বংশের পতনের কারণ হয়েছিল। চরিত্রগুণ ও সুশাসন দ্বারা তা'ই সুং প্রজাদের মনোরঞ্জন করেছিলেন এমনভাবে যে সেই কোরিয়ায় পূর্বের মত আর একটি পরাভবের ব্যাপার তাদের চিত্তকে এতটুকু বিক্ষুব্ধ করতে পারে নি। সম্রাটের অসামান্য রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর নিম্নোদ্ধৃত প্রাজ্ঞ বচনে : তিনি বলেছেন, "দর্পণ সামনে ধরে তুমি মাথার টুপিটি ঠিকমত পরতে পার। তেমনি প্রাচীন ইতিহাসকে দর্পণরূপে ব্যবহার করতে শিখলে মানুষ সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের বার্তা

পূর্বাহ্নে জানতে পাবে।” একদা ওয়েই নদী-বক্ষে নৌ-ভ্রমণকালে পুত্রদের সম্বোধন করে বলেছিলেন তিনিঃ “বৎসগণ, এই যে আমাদের ময়ূরপঙ্খি ঢেউ এর মাথায় মাথায় ভেসে চলেছে, মুহূর্তমধ্যে নৌকোটিকে ওই ঢেউগুলি অতল জলে ডুবিয়ে দিতে পারে। তেমনি নিশ্চিতভাবেই জেনে রেখো, সাম্রাজ্যের প্রজারা এইসব ঢেউ-এরই মত, আব সম্রাট এই ভাসমান ময়ূরপঙ্খি।”

কাও সুং

কাও সুং তাঁব পিতা তা'ই সুং-এর চেয়েও দীর্ঘতব কাল জুড়ে রাজত্ব কবেছিলেন (৬৪৯-৬৮৩ খৃঃ)। কিছুকাল তিনি পিতার অধিকৃত মধ্য এশিয়া চীনেব আয়ত্তাধীনে বাখতে সমর্থ হয়েছিলেন, এমন কি উইঘার জাতিব সাহায্যে পশ্চিম তুর্কীদের নির্মূল কবে সাম্রাজ্যের পরিধি আফগানিস্থানের অকসাস্ (আমু) নদীর পবপাবে ভাবতবর্ষেব সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত কবেছিলেন। তাসকেন্দ্, সমরকন্দ্, বোখাবা ও ফবগানা এই সাম্রাজ্যেব অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এই সময়ে ইসলামেব ধর্ম-প্রেরণায় আবব জাতিব অভ্যুত্থান মধ্য এশিয়া ও পারস্যকে বিকম্পিত কবে তুলেছিল। পারস্যের সাসানিড রাজবংশ ইতিপূর্বে পূর্ব রোমক সাম্রাজ্য ও উত্তরাঞ্চলেব প্রতিবেশী তুর্কী জাতির সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহে এমনি দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে আরবদের দুর্নিবার আক্রমণের প্রতিরোধ পারসীকদেব পক্ষে ছিল সাধ্যাতীত। পারস্যের যখন পতন ঘটল তখন সাসানিড বংশীয় ব্যক্তিরা চীন দেশে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। ৬৭৪ খৃষ্টাব্দে য়েসদিগাদেব পুত্র ফিরোজ চাং-আনে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি সেখানে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছিলেন এবং চীন সম্রাটেব সেনাপতির পদ লাভ কবেছিলেন।

কাও সুং ছিলেন বৌদ্ধধর্মেব পরম অনুরাগী। অনেক বৌদ্ধ মঠ নির্মাণ করেছিলেন তিনি, কিন্তু তা সত্ত্বেও চীনেব প্রাচীন ধর্মানুষ্ঠানের পুনঃপ্রচলন করতে তাঁব উৎসাহের অভাব ছিল না। স্মরণ থাকতে পারে, হ্যান সম্রাট উ তি স্বর্গ ও পৃথ্বীপূজা (ফেং ও স্যান) করতেন। তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে কাও সুং তা'ই সান পাহাড়ের চূড়ায় ফেং বা স্বর্গপূজা আরম্ভ করেছিলেন।

দক্ষিণ কোরিয়ায় কাও সুং-এর রাষ্ট্রনীতি সফল হয়েছিল। তাঁর সমর্থন লাভ করে দক্ষিণ কোরিয়ার সিল্‌লা রাজ্য সমগ্র কোরিয়া দেশকে সংযুক্ত করে একরাষ্ট্রে পরিণত করতে পেরেছিল। কোরিয়ার বিভিন্ন অংশের সংযোগ এই প্রথম। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলে আবার ভাঙন ধরবার লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। কাও সুং পিতার মত সমরদক্ষ ছিলেন না। তিব্বতীরা পরাক্রান্ত হয়ে তারিম উপত্যকার কয়েকটি শহর অধিকার করেছিল, এবং মোঙ্গলিয়া ও অন্যান্য স্থানে তুর্কী জাতিরাও অধীনতা-পাশ থেকে মুক্ত হবার উদ্যোগ করছিল।

সম্রাজ্ঞী উ হাও

৬৩৭ খৃস্টাব্দে সম্রাট তা'ই সুং-এর গণিকারূপে প্রাসাদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন বারো বছর বয়সের বালিকা উ হাও। সম্রাটের মৃত্যুর পর প্রথামত অন্যান্য রাজ-গণিকাদের সঙ্গে তাঁকেও একটি বৌদ্ধ মঠে পাঠানো হয়েছিল। সেখানে মাথা মুড়িয়ে সারা জীবন ভিক্ষুনীভাবে থাকবার কথা, ভাগ্যক্রমে উ হাও এইরূপ জীবন্মৃত্যুর হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলেন। একদা নূতন সম্রাট কাও সুং মঠ পরিদর্শনকালে এই চব্বিশ বছর বয়সের অপরূপ সৌন্দর্যবতী তরুণীকে দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে আবার প্রাসাদে নিয়ে যান। অন্য একটি বিবরণে বলা হয়েছে, সম্রাট নয়, সম্রাজ্ঞী তাঁকে প্রাসাদে এনেছিলেন কণ্টক দিয়ে কণ্টক তোলার মত কোন প্রতিদ্বন্দ্বিনী গণিকার প্রভাব থেকে সম্রাটকে মুক্ত করবার জন্য। সে যাই হোক, প্রাসাদে এসে অল্পকাল-মধ্যে সম্রাটকে যেন যাদুমন্ত্রে বশীভূত করেছিলেন উ হাও। তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষার বাধাস্বরূপ সম্রাজ্ঞী ও একটি রাজ-গণিকাকে কারাগারে তপ্ত কটাহ-মধ্যে নিক্ষেপ করে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিলেন, এবং নিজে উপস্থিত থেকে সেই বীভৎস দৃশ্য পরমানন্দে উপভোগ করেছিলেন। এখন আর তাঁর সম্রাজ্ঞী হতে কোন বাধা রইল না। সম্রাটের রাজ্যকালের শেষভাগে সম্রাজ্ঞী উ হাও ছিলেন সাম্রাজ্যের প্রকৃত শাসক আর সম্রাট কাও সুং ছিলেন তাঁর হাতের পুতুল মাত্র। কাও সুং-এর মৃত্যুর পর উপর্যুপরি দুই অপদার্থ সন্তানকে রাজসিংহাসন থেকে অপসৃত করে তিনি স্বয়ং প্রকাশ্যভাবে রাজকার্য পরিচালনা করেছিলেন। 'স্যাং তি' বা 'পরম

পিতা'র পূজার অধিকার একমাত্র সম্রাটের, সেই অধিকার আত্মসাৎ করে উ হাও পরমেশ্বরের পূজা-অর্চনা করতেন। জনগণ কর্তৃক মৈত্রেয়ী বুদ্ধরূপে পূজিতা হবার অভিপ্রায়ে নিজেকে তিনি 'জগন্মাতা' (Holy Mother—Divine Majesty) বলে প্রচার করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধির সঙ্গে রাজপরিবার মধ্যে এবং অন্যত্র বিপক্ষীয়দের প্রতি নির্মম নির্যাতন চলতে লাগল। খামখেয়ালের তাঁর অন্ত ছিল না। সভাসদবর্গকে আদেশ দেওয়া হয়েছিল, সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে পদ্মের তুলনা করতে গিয়ে সম্রাজ্ঞী পদ্মের মত সুন্দর এ কথার পরিবর্তে তাঁরা যেন বলেন, পদ্মের শোভা অনেকটা সম্রাজ্ঞীর রূপের মতই মনোহর! উ হাও-র উপপতি ছিল কয়েকজন, তাদের সঙ্গে তাঁর সংসর্গের কাহিনী জনসমাজে প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু চারিত্রিক দৌর্বল্য যেমনই হোক, রাজ্যশাসন ব্যাপারে তাঁর ছিল অসাধারণ দক্ষতা। কোরিয়া ও তারিম উপত্যকায় প্রভুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে তিনি চীনের ক্ষুণ্ণ গৌরবের পুনরুদ্ধার করেছিলেন। চীনের ইতিহাসে আর দুইজন সম্রাজ্ঞী উ হাও-র সমকক্ষ বলে বিবেচিত হয়ে থাকেন, তাঁরা হলেন অতীতের হ্যান সম্রাজ্ঞী লু হৌ আর ভবিষ্যতের মাঞ্চু সম্রাজ্ঞী জু সি। তিনজনাই ছিলেন শাসনকার্যে সুদক্ষা, শক্তিশালিনী ও প্রতিভাবতী। ৭০৫ খৃস্টাব্দে আশি বছর বয়সে সম্রাজ্ঞী উ হাও একটি চক্রান্তের ফলে শাসনভার পুত্র চুং সুং-এর হাতে ছেড়ে দিয়ে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হন। তারপর যে মঠের জীবন্ত সমাধি থেকে তিনি পঞ্চাশ বছর পূর্বে বেরিয়ে এসেছিলেন সেখানে আবার ফিরে গিয়ে জীবনের অবশিষ্ট বছরখানেক কাল অতিবাহিত করেছিলেন।

সম্রাজ্ঞী উ হাও-র দুর্বলচিত্ত অযোগ্য পুত্র চুং সুং মাতার রাজত্বকালের অধিকাংশ সময়েই কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন। মুক্তিলাভের পর যখন প্রভু-শক্তি তাঁর হাতে এসে পড়ল তখন দেখা গেল, তিনি সেই দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ অক্ষম। রাজপ্রাসাদ অন্তঃপুরবাসিনীদের ষড়যন্ত্রের একটি মৌচাক-বিশেষ হয়ে উঠেছিল। তাঁর পত্নী ওয়েই হাউ ভূতপূর্ব সম্রাজ্ঞী উ হাও-র মত শক্তিশালিনী হবার দুরাকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন, যদিও উ হাও-র কোন গুণই তাঁর ছিল না। পাঁচ বছর পর দুষ্প্রবৃত্তির তাড়নায় স্বামীকে তিনি বিষ-প্রয়োগে হত্যা করেন (৭১০ খৃঃ)। তখন বিদ্রোহ জেগে উঠল, সম্রাজ্ঞী

ওয়েই হাউ নিহত হলেন। একজন দুর্বল সম্রাট দুই বছর রাজত্বের পর সিংহাসন ত্যাগ করেন, তাঁর স্থলে চুং সুং-এর ভ্রাতুষ্পুত্র লি লু চিং সম্রাট হয়ে বসলেন (৭১৩ খৃঃ)। তিনি সুয়ান সুং নাম গ্রহণ করেছিলেন।

সুয়ান সুং (মিং হুয়াং)

সুয়ান সুং-এর রাজত্বকাল ৭১২-৭৫৬ খৃস্টাব্দ। এত দীর্ঘকাল ট্যাং বংশের অন্য কোন সম্রাট দেশশাসন করেন নি। সম্রাট ছিলেন একজন বিরুদ্ধ স্বভাব-ধর্মের গুণী মানুষ, কবি শিল্পী ও সুধীজনের পালক ও পৃষ্ঠপোষক, নিজেও তিনি পদ্য রচনা করতেন, সংগীতচর্চায় উৎসাহ দিতেন। চাং-আন শহরে সম্রাট 'হ্যানলিন ইউয়ান' নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন, কয়েক শতাব্দ পর এই সুধী-গঠিত প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সম্মান বহন করত। বিদেশে সামরিক অভিযানে সাফল্য আর দেশে নানান প্রশাসনিক ও সামাজিক সংস্কার—যেমন, প্রাণদণ্ড রদ, কারাগার ও আইন-আদালতের সুব্যবস্থা—রাজত্বের প্রারম্ভে সম্রাটের এইসব কীর্তি দেশের সামনে একটি বিরাট সম্ভাবনা এনে ধরেছিল, কিন্তু তার শেষরক্ষা আর হয়ে ওঠে নি। জীবন আরম্ভ করেছিলেন সম্রাট বিলাসব্যসন সংযত করে, প্রাসাদ-মহিলাদের রেশমের বেশভূষা, অলংকারসজ্জা বর্জন করতে আদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর এই উদগ্র সংযমের পরিসমাপ্তি হয়েছিল ইয়াং-কুয়েই ফেই নামে এক পরমা রূপসী রমণীর ভুজবন্ধনে নিজেকে একান্ত-ভাবে সমর্পণ করে। তাঁর এই পতন সত্ত্বেও জনসমাজে তিনি 'মিং হুয়াং' বা 'জ্যোতির্ময় সম্রাট' নামে পরিচিত। মিং হুয়াং অমরত্ব লাভ করেছিলেন সুদীর্ঘ চুয়াল্লিশ বৎসর রাজত্বকালের কোন বিশেষ সফলতা বা কৃতিত্বের জন্য নয়, ইয়াং-কুয়েই ফেই-র সঙ্গে প্রেমের রসঘন কাহিনী এই সম্রাটকে চির-অমর করে রেখেছে যুগে যুগে রচিত ছন্দ-মুখর কাব্য আর নাটকের বাঙ্ময় রূপের মধ্যে। কিন্তু কাহিনীর রোমান্স কাব্যে ও নাটকে যেমনই বর্ণোজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করুক না কেন, প্রকৃত ইতিহাস কিন্তু প্রীতিকর নয়, বীভৎস। এই মহিলাটি ছিলেন সম্রাটের পুত্রবধূ। ৭৪৫ খৃস্টাব্দে ষাট বছর বয়সে বৃদ্ধ সম্রাট তরুণী পুত্রবধূর রূপে আকৃষ্ট হয়ে পুত্রকে তার পত্নীর সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ করতে বাধ্য করেন। সেই থেকে যে প্রেমলীলা

শুরু হয়ে গেল তার অপরিহার্য পরিণামস্বরূপে বৃদ্ধকে তরুণীর কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল। সম্রাটেব ওপব এই নারীর প্রভাব সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে দেশের যে প্রভূত অনিষ্ট সাধন করেছিল তার প্রথম বহিঃপ্রকাশ সেনাপতি আন লু-সান-এব বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল কিরূপে এবং তাব পরিণামই বা হয়েছিল কত ভয়ংকর, আমরা এখন সেই কথা বলব।

আন লু-সান ছিলেন খিতান খণ্ডজাতীয় তুর্কী, নীচ বংশসম্ভূত, স্থূলকায় কদাকার মানুষ। শৈশবে কোন চীনা সামবিক কর্মচারীর কাছে দাসরূপে বিক্রীত হয়েছিলেন, সামান্য সৈনিক থেকে ক্রমে সেনাপতি-পদে উন্নীত হয়েছিলেন। দক্ষতা ও কর্মকুশলতা তাঁর যথেষ্ট ছিল সন্দেহ নেই, আসলে কিন্তু ধূর্ততা, চাটুকারিতা এবং বিদূষকসুলভ ভাঁড়ামি তাঁর উন্নতির পথ সুগম কবে দিয়েছিল। বাজ-অন্তঃপুবে তাঁব গতিবিধি ছিল, ইয়াং কুয়েই-ফেই তাঁকে ধর্মপুত্ররূপে গ্রহণ কবেছিলেন। প্রমোদ উৎসবে প্রাসাদ-নারীগণ তাঁকে নিয়ে নানাবকম কুৎসিত রঙ্গকৌতুক করত, তাব অমার্জিত ব্যবহার উপলক্ষ কবে ব্যঙ্গ করত। সম্রাট এইসব অশ্লীল আমোদপ্রমোদ উপভোগ করতেন, কোন আপত্তি কবতেন না। ইযাং কুয়েই-ফেই-র সঙ্গে আন লু-সান-কে জড়িত কবে নানান কুৎসা প্রচাবিত হয়েছিল, সম্রাট কিন্তু সেসব কানেও তোলেন নি।

সম্রাটেব অনুগ্রহে আন লু-সান সাম্রাজ্যেব শ্রেষ্ঠতম সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি হলেন, এমন কি 'প্রিন্স' পদবীও পেয়েছিলেন। কিন্তু ঐশ্বর্য, পদমর্যাদা এসব তাঁব অন্তবে দুবাকাঙ্ক্ষাব তীব্র বিষ ছড়িয়ে দিয়েছিল, বাহ্য ভাঁড়ামির অন্তরালে গোপন কৃতঘ্নতাকে শাণিত কবে তুলেছিল। সম্রাট তাঁব গুপ্ত অভিসন্ধির সন্ধান না পেলেও, প্রধান মন্ত্রীব সন্দিগ্ধ দৃষ্টি ছিল তাঁব ওপর নিবদ্ধ। ইযাং কুয়েই-ফেই-র ভ্রাতা ছিলেন প্রধান মন্ত্রী ইয়াং কুয়ো চুং, রাজ-গণিকাই তাঁকে মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত কবেছিলেন। আন লু-সান-এব প্রতিপত্তি দেখে তিনি বোধ করি ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন। সেই ঈর্ষা-বশতই হোক, কিংবা বিদ্রোহের সন্দেহ মনে জেগেছিল বলেই হোক, প্রধান মন্ত্রী এই ব্যক্তিটির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ করলেন, আর সম্রাটও তাঁকে দরবারে হাজির হবার জন্য তলব দিলেন। আন লু-সান-এর বিদ্রোহেব

আয়োজন তখনো সম্পূর্ণ হয় নি, তাড়াতাড়ি তিনি এসে সাশ্রুনেত্রে সম্রাটের কাছে নিজের নির্দোষত্ব নিবেদন করলেন। সম্রাট তাঁর রাজভক্তির প্রতিশ্রুতি বিশ্বাস করলেন, এবং তারপর থেকে রাজগণিকার এই ধর্মপুত্রের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগেই কর্ণপাত করেন নি।

তিন বছর পর (৭৫৫ খৃঃ) ভণ্ডামির মুখোশ খুলে ফেলে নিজমূর্তি ধারণ করলেন আন লু-সান। তাঁর নেতৃত্বে বিদ্রোহ মাথা খাড়া করল, বিদ্রোহী সৈন্যরা পীত নদী পার হয়ে সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী লো-ইয়াং শহর অধিকার করল। সম্রাট একটি বাহিনী সংগঠিত করে বিদ্রোহীদের অগ্রগতি বন্ধ করবার চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু যুদ্ধে তাঁর শোচনীয় পরাজয় ঘটল। দলবল সঙ্গে নিয়ে ভীত ত্রস্ত সম্রাট তখন জেচুয়ান প্রদেশে পলায়ন করলেন।

এদিকে সম্রাটের বাহিনীর মধ্যে নানা কারণে অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। তারা সন্দেহ করল, রাজ-গণিকার ভ্রাতা প্রধান মন্ত্রী ইয়াং কুয়ো চুং তিব্বতীয়গণের সঙ্গে রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্র করছে, আর রাজ্যের দুর্বিপাকের জন্য রাজ-গণিকা ইয়ং কুয়েই-ফেইকে দায়ী করল। সঙ্গে সঙ্গেই তারা প্রধান মন্ত্রীকে পাকড়াও করে হত্যা করল এবং রাজ-গণিকার শিরচ্ছেদ দাবি করল। দুর্বলচিত্ত সম্রাটের সাধ্য ছিল না সেই দাবি প্রত্যাখ্যান করেন। ইয়াং কুয়েই-ফেইকে ক্রুদ্ধ জনতার হাতে তুলে দেওয়া হল। প্রধান খোজা এই হতভাগিনীকে একটি প্যাগোডায় নিয়ে গিয়ে গলা টিপে মেরে ফেলল। এইরূপে বৃদ্ধ সম্রাট মিং হুয়াং-এর প্রণয়-কাহিনীর বিয়োগান্ত পরিসমাপ্তি ঘটেছিল।

রাজত্বের প্রারম্ভে সম্রাট মিং হুয়াং চীনের পশ্চিম দিকের দেশগুলিতে তুর্কী ও তিব্বতীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিরাট সাফল্যলাভ করেছিলেন। তখন সুদূর পশ্চিমাঞ্চলে মুসলিম সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তার তরঙ্গাভিঘাত চীনের দ্বার-প্রান্তে এসে পৌঁছেছিল। এই সময় (৭০৫-৭১৫ খৃঃ) আরবগণ অক্সাস্ (আমু) নদী অঞ্চল জয় করে তারিম উপত্যকার ওপর চাপ দিতে শুরু করেছিল। সমরকন্দ্, বোখারা, তাসকেন্দ্ ও তোখারিস্থানের রাজন্যবর্গ চীন দেশের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল—এইসব দেশ তাই সুং-এর বশ্যতা স্বীকার করেছিল—এখন আর চীন তাদের সামরিক সাহায্য প্রদান করল না, তবে কূটনীতির প্রয়োগে সেইসব দেশ থেকে

আরবদের বহিষ্করণ ব্যাপারে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করেছিল।* কাশ্মীর ও পামির দেশে সম্রাট হ্‌যাং স্বং সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন, চীন সেনাপতি কাও সিয়েন চি কাসগর থেকে যাত্রা করে পামির ও হিন্দুকুশের গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়ে সিন্ধু উপত্যকায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন তিব্বতীদের সঙ্গে আরবদের যোগাযোগ নষ্ট করবার জন্য। কাও সিয়েন চি-র এই অসমসাহসিক অভিযান চীনের মর্যাদা বহুল পরিমাণে বর্ধিত করেছিল। সিন্ধু উপত্যকার কয়েকজন ভারতীয় রাজাও তখন চীনের সার্বভৌম প্রভুত্ব স্বীকার করেছিলেন।

আন লু-সান-এর বিদ্রোহের পূর্বেই চীনের বাহুশক্তির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবার লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। সেনাপতি কাও সিয়েন চি-র অর্থগৃধ্নুতা এবং মধ্য এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা সে অঞ্চলে বিষম অসন্তোষ জাগিয়ে তুলেছিল, তারই ফলে ৭৫১ খৃস্টাব্দে ফারগানার উত্তরে আরবদের সঙ্গে যুদ্ধে চীনা বাহিনীর পরাজয় ঘটে। তখন পশ্চিমাঞ্চলে চীনা প্রভুত্ব তাসের ঘরের মতই ভেঙে পড়েছিল। পশ্চিমে কারলুক আর উত্তর ও পূর্বে উইঘার, এই দুইটি তুর্কী জাতির স্বাধীন শাসন শুরু হয়ে গেল। উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের খিতান জাতি দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া থেকে উত্তর চীনের সমতল ক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হল। দক্ষিণ-পশ্চিমে বর্তমান ইউনান অঞ্চলেও চীনাদের বিষম বিপর্যয় ঘটেছিল (৭৫১ খৃঃ)। ইতিপূর্বে সেখানকার নান-পাও নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ট্যাং সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেছিল, এখন তিব্বতীদের সমর্থনে নান-পাও স্বাধীনতা ঘোষণা করে চীনা সৈন্যদের সে দেশ থেকে বিতাড়িত করলে।

---

* বল্‌খ্‌, তোখারিস্থান, ফারগানা প্রভৃতি অঞ্চলে যুদ্ধাভিযান পরিচালনার ভার ছিল খালিফের পরাক্রান্ত সেনাপতি কুতাবার ওপর। এই অভিযান প্রসঙ্গে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে: সমরকন্দ বিজয়ের পর সেনাপতি নাকি সদম্ভে শপথ করেছিলেন, তিনি চীনের ভূমি পদদলিত করবেন। এই শপথের কথা শুনে সে অঞ্চলের চীনা রাজ্যপাল তাঁকে এক বস্তা মাটি পাঠিয়ে দিলেন এইজন্য যে, তিনি যেন চীনের ভূমি পদদলিত করে অতি সহজেই তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করতে পারেন। আর সেই সঙ্গে পাঠালেন একটি ব্যাগ-ভর্তি চীনা মুদ্রা কর-স্বরূপে। চারজন যুবককে পাঠানো হল পরিচারকরূপে, তাদের দেহে সিলমোহরের ছাপ মেরে। গল্পটিতে বাস্তবতার মুখোশের ভেতর পরিহাসের ইঙ্গিত সত্যই উপভোগ্য।

চাং-আন নগর অধিকার করে বিদ্রোহী সেনাপতি আন লু-সান আর অধিক দূর অগ্রসর হতে পারেন নি। এদিকে জেচুয়ান প্রদেশে পলায়নের চরম লাঞ্ছনার পর সম্রাট স্যুয়ান স্যুং-এর আর রাজ্যশাসনের প্রবৃত্তি রইল না, সিংহাসন যুবরাজকে দিয়ে অবসর গ্রহণ করলেন (৭৫৬ খৃঃ)।

স্যু স্যুং

নূতন সম্রাট স্যু স্যুং চীনা, তুর্কী প্রভৃতি দেশবিদেশের সৈন্য নিয়ে বিপুল বাহিনী গঠন করেছিলেন। বাগদাদের খালিফ জাফর উল্ মনস্যুরের সঙ্গে ইতিপূর্বেই সম্রাটের সৌহার্দ্য স্থাপিত হয়েছিল, সম্রাটের নবগঠিত বাহিনীতে যোগদানের জন্য খালিফ এখন একদল আরব সৈন্য প্রেরণ করলেন। এই মিশ্র বাহিনীর নেতৃত্বভার গ্রহণ করেছিলেন সম্রাটের পরম অনুগত সুযোগ্য সেনাপতি কুয়ো-জুই। দশ বছর যুদ্ধ চলবার পর ৭৬৬ খৃস্টাব্দে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিদ্রোহের নেতা আন লু-সান পুত্র-হস্তে নিহত হয়েছিলেন (৭৫৭ খৃঃ)। তারপর চলেছিল একটি হত্যাকাণ্ডের পর আর একটি হত্যাকাণ্ড। পরিশেষে সম্রাট স্যু স্যুং সসৈন্য এসে রাজধানী চাং-আন নগর পুনরধিকার করেন (৭৬১ খৃঃ)। শান্তি প্রতিষ্ঠিত হল বটে, কিন্তু ওই বিদ্রোহে সাম্রাজ্যের যে প্রভূত ক্ষতি হয়েছিল ট্যাং বংশের রাজত্বকালে সে ক্ষতি আর পূরণ হয় নি।

ট্যাং বংশের অবনতি ও পতন

সম্রাট স্যুয়ান স্যুং-এর রাজত্বকাল থেকেই বংশের পতন শুরু হয়েছিল, সূচনায় ছিল আন লু-সান-এর বিদ্রোহ। বিদ্রোহ দমনের পর ৭৬৩ খৃস্টাব্দ থেকে ৮৬৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সাম্রাজ্যকে কতগুলি নূতন আপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। প্রধানত দুইটি আপদ, একটি বাইরের আর একটি ঘরের। অন্তর্বিরোধ বহির্দেশের রাজ্যগুলির সঙ্গে বন্ধন শিথিল করে দিয়ে চীনের প্রাধান্য খর্ব করেছিল। পশ্চিম প্রত্যন্তের প্রতিবেশীদের হানার উপদ্রব ক্রমেই বেড়ে চলেছিল, বিশেষত তিব্বতীদের স্পর্ধিত আক্রমণ সাম্রাজ্যের বিঘ্নস্বরূপ হয়ে উঠেছিল। একসময় তারা চাং-আন নগর পর্যন্ত অধিকার

করে বসেছিল (৭৬৩ খৃঃ)।* আবার বিদ্রোহ দমনের জন্য যেসব চীনা সেনাপতি সসৈন্য বিভিন্ন অঞ্চল অধিকার করেছিলেন, তাঁরাই হয়ে উঠলেন এক একটি ঘরের আপদ। সেনাপতিরা স্ব স্ব অধিকৃত অঞ্চলের শাসনভার গ্রহণ করে একরকম স্বাধীনই হয়ে পড়েছিলেন, তাঁদের ওপর সম্রাটের আধিপত্য ছিল নামমাত্র। তার ওপর যখন এই প্রদেশ-শাসকেরা শাসনভার নিজ নিজ পুত্রকে অর্পণ করে বংশানুক্রমিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা করলেন, তখনই তাঁদের সঙ্গে সম্রাটের বিরোধ বাধল। কেন্দ্রশক্তির প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখবার আগ্রহে সম্রাট এই উত্তরাধিকার-পদ্ধতির প্রবর্তনে বাধা দিয়েছিলেন, সেই থেকে বিভিন্ন অঞ্চলে স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের উদ্যোগ শুরু হয়ে গেল। আবার বিদ্রোহ জেগে উঠল, কিন্তু সে বিদ্রোহ সীমাবদ্ধ ছিল পূর্বাঞ্চলের সানটাং, হোনান ও হোপেই প্রদেশে। ইয়াংসি উপত্যকা ও দক্ষিণ অঞ্চলে শান্তি বিরাজ করছিল, ট্যাং বংশের আদিকাল থেকে এ অঞ্চলে কখনো শান্তিভঙ্গ হয় নি। দক্ষিণ দেশে এই দীর্ঘকালস্থায়ী শান্তির ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। পূর্বে চীন সাম্রাজ্যের ভার-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ছিল উত্তর ভূভাগে, সুপ্রাচীন চীনা সভ্যতার জন্মস্থান পীত নদীর উপত্যকায়। এখন ইয়াংসি নদীর দক্ষিণে ন্যানকিং ও ক্যানটন অঞ্চলই প্রাধান্য লাভ করেছিল, তার কারণ উত্তর ও পশ্চিম ভূখণ্ডে উইঘার, তুর্কী, খিতান প্রভৃতি নানান বিদেশী জাতির আবির্ভাব হয়েছিল। দক্ষিণ দেশের অভ্যুদয়ের প্রারম্ভ এই সময় থেকে, আর সেইজন্যেই ক্যানটন অঞ্চলের লোকেরা নিজেদের 'ট্যাং জেন' বা 'ট্যাং-এর মানুষ' ("man of T'ang") বলে থাকে। চীনের অন্যান্য অংশের লোক নিজেদের সম্পর্কে 'হ্যান জেন' বা 'হ্যান-এর মানুষ' ("man of Han") এই পুরনো নামই ব্যবহার করে।

৮৪৯ খৃস্টাব্দে আভ্যন্তরীণ বিপর্যয়ের জন্য তিব্বতী রাজবংশের পতন হল। এ-যাবৎকাল তিব্বতীরা চীন দেশের প্রতি ঘোর শত্রুতাচরণ করে এসেছিল,

* "In Tibet there is a stone obelisk dating from A. D. 763 which records the fact that in that year the Tibetan armies marched to the gates of the Chinese capital and there dictated to the Chinese terms of peace, which included an annual tribute of fifty thousand bales of silk."—*Seven Years in Tibet* by Heinrich Harrer, p. 148.

কিন্তু শত্রু শুধু তিব্বতীরাই ছিল না। ইতিপূর্বে দক্ষিণ-পশ্চিমে ইউনান প্রদেশে যে নান-চাও রাষ্ট্রের অভ্যুত্থানের কথা বলা হয়েছে সেই রাষ্ট্রই বিগত দুই শতাব্দী ধরে ট্যাং সাম্রাজ্যের এ অঞ্চলে পদসঞ্চারের পথ বন্ধ করে দাঁড়িয়ে ছিল। নান-চাও রাষ্ট্র স্থানীয় আদিবাসীগণ কর্তৃক সংগঠিত হয়েছিল। চীনাদের বিরুদ্ধে আদিবাসীর প্রতিরোধ এ ক্ষেত্রে যেমন সফল হয়েছিল এমন আর কখনো হয় নি। কিন্তু তিব্বত ও ইউনান সীমানায় খণ্ডযুদ্ধ এবং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের রাজ-প্রতিনিধিগণের বিদ্রোহ সত্ত্বেও ট্যাং রাজত্বের শেষভাগে এক শতাব্দীকাল দেশে শান্তি বিরাজ করেছিল, বিশেষত দক্ষিণ অংশে, সমৃদ্ধিরও অভাব ছিল না। এই সময়ের মধ্যে ট্যাং বংশ আবার হয়তো শক্তিশালী হয়ে উঠত, কিন্তু বংশের পরম দুর্ভাগ্য এমন কোন দৃঢ়চরিত্র কর্মকুশল নৃপতির আবির্ভাব হয় নি, যাঁর একনিষ্ঠ উদ্যোগে সাম্রাজ্যের পুনর্গঠন সম্ভব হতে পারত। ট্যাং রাজত্বের শেষভাগে একমাত্র সম্রাট টি স্থং বিশ বছরের অধিক রাজত্ব করেছিলেন (৭৭৯-৮০৫), অন্যান্য সম্রাটের রাজত্বকাল কদাচিৎ দশ বৎসর অতিক্রম করেছে। অনেকেই তাঁরা ছিলেন অল্পায়ু, পঞ্চাশ বছরে পদার্পণের পূর্বেই ভবলীলা সাঙ্গ করেছেন। এইসব ভগ্নস্বাস্থ্য ক্ষীণজীবী নৃপতিরা বিদ্রোহের ভয়ে প্রাদেশিক রাজ্যপালদের ওপর প্রভুত্ব করতে ভয় পেতেন, বরঞ্চ তাদের তুষ্টিসাধনই নিজের স্বার্থের অনুকূল বলে মনে করতেন। হ্যান যুগে আমরা দেখেছি প্রাসাদ-নারীদের ষড়যন্ত্র ও খোজাদের প্রাধান্য। এই দুই প্রকার অমঙ্গল ট্যাং বংশীদের শাসনকালে প্রায় দেখা যায় নি, কিন্তু বংশের অধোগতির সঙ্গে খোজারা নিজেদের প্রতিপত্তি আবার জাঁকিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছিল। সম্রাট ওয়েন স্থং-এর রাজত্বকালে (৮২৭-৮৪১) খোজারা একযোগে রাষ্ট্রশক্তি করায়ত্ত করবার উদ্যোগ করেছিল মন্ত্রীদের আর তাদের অনুগত ১৬০০ ব্যক্তিকে হত্যা করে, কিন্তু সম্রাট ও তাঁর উত্তরাধিকারীগণের প্রতিকূলতায় তাদের সেই অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। পরবর্তী সম্রাট উ স্থং (৮৪১-৮৪৭) ছিলেন ধর্মদ্বেষী, অসংখ্য বৌদ্ধ মন্দির ধ্বংস করে কুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এই উৎসাদন নীতির অবসান ঘটেছিল উ স্থং-এর উত্তরাধিকারী সম্রাট স্যুয়ান-স্থং-এর রাজত্বকালে (৮৪৭-৮৬০)।

ট্যাং সাম্রাজ্যের মত এত বৃহৎ আয়তনের ভূখণ্ড চীনের ইতিহাসে আর কোন বংশের রাজত্বকালে দেখা যায় নি। নবম শতাব্দে সাম্রাজ্যের বহির্দিকের

আকারের পরিবর্তন হয় নি, তার কারণ লি-প্রতিষ্ঠিত বংশের অসাধারণ মর্যাদা। আসলে কিন্তু এই বিশাল মহাবৃক্ষের অভ্যন্তরে ঘুণ ধরেছিল। আন লু সানের বিদ্রোহ দমনের পর সাম্রাজ্যকে সাতচল্লিশটি জেলায় বিভক্ত করে জেলাগুলিতে এক একজন সৈন্যাধ্যক্ষকে প্রদেশপালরূপে সেই যে বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তারপর থেকে ক্রমশ তারা স্ব স্ব প্রধান হয়ে উঠল। সম্রাটের প্রতি তারা আনুগত্য প্রকাশ করত বটে, কিন্তু তাদের সেই আনুগত্য ছিল সম্পূর্ণরূপে মৌখিক। ৮৬৮ খৃস্টাব্দে আনাম সীমান্তে সম্রাটের বাহিনী বিদ্রোহী হয়ে উঠল। সৈন্যেরা ছিল উত্তরাঞ্চলের অধিবাসী, অস্বাস্থ্যকর স্থানে দীর্ঘকাল অবস্থিতি ও বেতনের স্বল্পতাই তাদের বিদ্রোহের কারণ। তারা সকলে দল বেঁধে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করল, পথে নগর লুণ্ঠন, গ্রামাঞ্চল বিধ্বস্ত করল। সম্রাট প্রথমে তাদের উপদ্রবসমূহ দেখেও দেখেন নি, পরে প্রতিবোধার্থ সৈন্য প্রেরণ করেও কোন ফল হয় নি। বিদ্রোহী সৈন্যরা দেশে ফিরে অসন্তোষের আগুন জ্বালিয়ে নিজেদের দল ভারি করে তুলল। এই দেশব্যাপী বিদ্রোহ দীর্ঘকাল চলেছিল। অবশেষে বিদ্রোহীদের মধ্যে একজন সুদক্ষ নেতার আবির্ভাব হয়েছিল, তার নাম হুয়াং সাও। তিনি ছিলেন একজন শিক্ষিত যুবক, চাকরি-পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে বিদ্রোহের পথে ভাগ্যের সন্ধানে বেরিয়েছিলেন। ৮৭৫ খৃস্টাব্দ থেকে ৮৭৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত হুয়াং সাও-র নেতৃত্বে বিদ্রোহী সৈন্যরা হোনান, হুপেই প্রভৃতি প্রদেশ উপদ্রুত করে। ৮৮১ খৃস্টাব্দে চাং-আন নগরের পতন হয়, এবং পূর্বকালের ট্য'াং সম্রাট মিং হুয়াং-এর মতই সম্রাট সি স্থ (৮৭৪-৮৮৯) রাজধানী ছেড়ে পলায়ন করেন। কিন্তু অল্পকাল-মধ্যেই সম্রাট তুর্কীদের সাহায্যে বিদ্রোহ দমন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই তুর্কীরা কৃষ্ণবর্ণের পরিচ্ছদ পরিধান করত বলে তাদের নাম দেওয়া হয়েছিল "কাক" ("The Crows")। "কাক' দলের নেতা ছিলেন লি কো ইয়াং, তাঁর নেতৃত্বে অজস্র রক্তপাতের পর বিদ্রোহ নির্মূল হল। বিদ্রোহী নেতা হুয়াং সাও নিহত হলেন (৮৮৪)।

এইরূপে বিদ্রোহ চূর্ণ হলেও সাম্রাজ্য রক্ষা পায় নি। বস্তুত ৮৮১ খৃস্টাব্দে বিদ্রোহীরা যেমন চাং-আন নগর অধিকার করল, সাম্রাজ্যের পতনও ঘটেছিল তখনই, যদিও আরও সাতাশ বৎসর-কাল ঘোর অরাজকতার মধ্যে

এই রাজবংশের নামমাত্র অস্তিত্ব বজায় ছিল। খোজা-কর্তৃত্ব আবার মাথা খাড়া করেছিল। মাতাল অবস্থায় সম্রাট চাও-সুং (৮৮৯-৯০৫) যখন কয়েকজন প্রাসাদ-নারীকে হত্যা করল, খোজারা তখন সেই অপদার্থ সম্রাটকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে একটি লৌহকক্ষে বন্ধ করে রাখল। এই বদ্ধাবস্থা থেকে সম্রাটকে মুক্ত করলেন চু ওয়েন নামে জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষ। তিনি ছিলেন বিদ্রোহী নেতা হুয়াং সাও-র সহচর, বিদ্রোহে যোগদান করেছিলেন, পরে সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করে হোনানের প্রদেশপাল নিযুক্ত হন। চু ওয়েন অযোগ্য সম্রাট চাও সুং-কে অপসৃত করে তাঁর চোদ্দ বছর বয়সের বালক পুত্র চৌ সুয়ানকে সিংহাসনে স্থাপন করেন (৯০৫)। কিন্তু তার দুই বৎসর পরেই বালক সম্রাটকে সরিয়ে তিনি নিজে সিংহাসন অধিকার করলেন (৯০৭)। তখন অন্যান্য রাজ্যপালেরা তাঁর বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়ে উঠল, দেশব্যাপী উচ্ছৃঙ্খল আলোড়ন দেখা দিল। রাজ্যপালগণ সার্বভৌম কর্তৃত্বের দাবি করে স্বাধীন হয়ে পড়ল, কেউ বা সম্রাট নামের দাবি করতেও ছাড়ে নি। এমনিভাবে এগারোটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে পড়ল চীন দেশ, এবং সেই সঙ্গে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের ওপর যবনিকার পতন হল।

৩. ট্যাং যুগের শাসনব্যবস্থা : ব্যবসা-বাণিজ্য : অর্থনীতি

ট্যাং বংশের তিন শতাব্দ রাজত্বকালের শেষ কয়েকটি বছর বাদ দিলে এমন সমৃদ্ধ ও সৃষ্টি-মুখর সংস্কৃতির যুগ চীনের ইতিহাসে আর দেখা যায় না। যে বিশাল সাম্রাজ্য সম্রাট তাই সুং প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, আয়তনে বা জনসংখ্যায় সেই সাম্রাজ্য ছিল সে-কালের পৃথিবীতে বৃহত্তম। রাজধানী চাং-আন থেকে সিভিল সার্ভিস বা কর্মচারী-সংস্থার মাধ্যমে রাজ্যশাসন চলত। হ্যান যুগে এই সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সুই যুগে সার্ভিসের নানাবিধ উন্নতির ব্যবস্থা কিরূপ করা হয়েছিল, আমরা তা ইতিপূর্বে দেখেছি। সেই উন্নত ধরনের সিভিল সার্ভিস শাসনকার্যে আরও দক্ষতা অর্জন করে পরম শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ট্যাং সম্রাটেরা পূর্ব-ইতিহাসের শিক্ষা ভুলে গিয়ে সামন্ততন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন নি, সামন্ত বা করদ রাজ্য সৃষ্টি করে দূর অঞ্চলে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিকে মাথা তুলবার সুযোগ দেন নি।

সম্রাট তা'ই সুং-এর একটি প্রধান সংস্কারকার্য এই যে, সারা চীন দেশকে তিনি দশটি 'তাও'-এ অর্থাৎ প্রদেশে বিভক্ত করেছিলেন। এই বিভাগগুলি করা হয়েছিল ভৌগোলিক প্রকৃতির অনুসরণ করে, রাজনৈতিক কৃত্রিম সীমানা ধরে নয়। আন-লু সান-এর বিদ্রোহ (৭৫৫) কেন্দ্রশক্তিকে দুর্বল করেছিল, সাম্রাজ্যের মর্যাদাও নষ্ট হয়েছিল। এই বিদ্রোহের পূর্বকাল পর্যন্ত কেন্দ্র কর্তৃক নিযুক্ত পরীক্ষোত্তীর্ণ রাজকর্মচারীর দল সম্রাটের সর্বময় কর্তৃত্বাধীনে প্রদেশগুলির শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। বংশের সরকারী ইতিহাস 'ট্যাং সু' গ্রন্থে সাম্রাজ্যের আয়তন, জনসংখ্যা প্রভৃতি অনেক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়, যদিও পরিসংখ্যানগুলি সব ক্ষেত্রে সঠিক বলে মনে হয় না। সাম্রাজ্যের আয়তন সম্বন্ধে বলা হয়েছে, মহাপ্রাচীরের উত্তর প্রান্তের ঘাটি থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণে আনামের সীমান্ত পর্যন্ত ৫৬৩০ মাইল এবং পশ্চিমে তিব্বতের সীমান্ত থেকে পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত ৩১৭০ মাইল, এই বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে ট্যাং সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। প্রকৃতপক্ষে এই দূরত্বের অঙ্কগুলি অত্যধিক। সম্ভবত মোঙ্গলিয়া ও মধ্য এশিয়ার রাজ্যগুলিকে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেই আয়তনের অঙ্কের উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বলা যেতে পারে, দক্ষিণ-পশ্চিমে আদিবাসীদের বাসস্থান ইউনান প্রদেশ স্বাধীনভাবে সাম্রাজ্যের বিরোধিতা করেছে, বশ্যতা স্বীকার করে নি। আর একটি বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় পরিসংখ্যানে দেখা যায়। সাম্রাজ্যের পরিধি অসম্ভবরূপে বিস্তার লাভ করলেও জনসংখ্যা পাঁচ কোটি থেকে হ্রাস পেয়ে আড়াই কোটিতে দাঁড়িয়েছিল, অর্থাৎ অর্ধেক হয়ে গিয়েছিল। জনসংখ্যা হ্রাসের কারণ যে অন্তর্বিদ্রোহ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ট্যাং যুগের সমাজগঠন সামন্তিক ছিল না বটে, কিন্তু অভিজাত-কুলের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল বিলক্ষণ এবং তাদের সেই প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখবার ব্যবস্থা বিশেষভাবে করা হয়েছিল। সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করত সুবিধাভোগী আমীরের দল ও কর্মচারীবৃন্দ, তাদের রাজভক্তি কায়েম করা হত কর প্রদান থেকে অব্যাহতি দিয়ে। আভিজাত্যের উপাধি ছিল নয় শ্রেণীর, যেমন দুই শ্রেণীর ওয়াং বা রাজা, তিন শ্রেণীর কুং বা ডিউক, হাউ বা মারকুইস, পো বা কাউন্ট, জু বা ভাইকাউন্ট এবং নান বা ব্যারন। কয়েকটি উচ্চশ্রেণীর উপাধি সম্রাট-বংশের ব্যক্তিদের জন্য সংরক্ষিত ছিল,

নিম্নশ্রেণীব উপাধি বিশিষ্ট রাজকর্মচারীদের দান করা হত তাদের কর্ম-কুশলতার জন্য। এইসব উপাধি বংশানুক্রমিক ছিল বটে, কিন্তু সেজন্য নিযমিত বৃত্তি ছাড়া উপাধিধারীগণ অন্য কোন সুবিধা লাভ করত না। উপাধিধারীদের ভূমি দান করা হত না, পদমর্যাদা অনুসারে বৃত্তি লাভ করত তারা সংগৃহীত কর থেকে।

তা'ই সুং সাম্রাজ্যকে তাও (প্রদেশ), চৌ (জেলা) ও সিয়েন (মহকুমা) এইরূপ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র বিভাগসমূহে বিভক্ত কবে প্রতিটি বিভাগে রাজকর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন, আমরা সে কথা পূর্বে বলেছি। পরিদর্শক নিযুক্ত করা হয়েছিল স্থানীয় কর্মচারীদের কার্য পযবেক্ষণ কবার জন্য। কিন্তু উপদেষ্টাব প্রযোজন হয সম্রাটের এবং সেজন্য মন্ত্রীদের নিযে একটি উপদেষ্টা সভা (স্যাং সু) গঠিত হয়েছিল। মন্ত্রী ছাড়াও এই সভার সভ্য ছিলেন উচ্চপদস্থ সবকারী কর্মচারীগণ। প্রশাসনকার্য নিযন্ত্রণ করবার জন্য মন্ত্রী-বিভাগ ছিল ছযটি :

(১) লি পু বা সরকারী চাকরি বিষযক মন্ত্রী-বিভাগ। এই বিভাগের কাজ ছিল কর্মচারীদের কার্য পযবেক্ষণ।

(২) হু পু বা 'পরিবার' মন্ত্রী-বিভাগ (Family Ministry)। অর্থ ও রাজস্ব সংক্রান্ত বিষযগুলি এই বিভাগেব অন্তর্গত। শুল্ক আদায, আদম-সুমারি ও কৃষিব্যবস্থা এই বিভাগের কায। আব একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল নানা স্থানে সংগৃহীত শস্যের পরিবহণ।

(৩) লি পু (এই নামের পূর্বোক্ত শব্দটির লিখন-রূপ ভিন্ন) বা অনুষ্ঠানাদি ধর্মকর্মের মন্ত্রী-বিভাগ।

(৪) পিং পু বা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী-বিভাগ। সৈন্যবাহিনীর শিবিব, গতি-বিধি নিযন্ত্রণ প্রভৃতি এই বিভাগের কায।

(৫) সিং পু বা দণ্ডের মন্ত্রী-বিভাগ (Punishment Ministry)। শুধু ফৌজদারী বিচারালযগুলিই এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। দেওযানী বিবাদ-বিসংবাদ স্থানীয প্রথামত নিষ্পত্তি করাই ছিল বিধান, আইন-আদালতের বিচারযোগ্য ছিল না। ফৌজদারী অপরাধের দণ্ড ছিল তিন প্রকার : বেত্রদণ্ড, নির্বাসন ও মৃত্যুদণ্ড।

(৬) পিং পু বা নির্মাণকার্যের মন্ত্রী-বিভাগ (Ministry of Works)। রাজপথ ও বাঁধ নির্মাণ, প্লাবন রোধ ও পূর্তকার্য এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

ট্যাং রাজত্বকালে চীনের সঙ্গে বিদেশের সংযোগের পথ মুক্ত হবার ফলে বিদেশীর সমাগম ঘটেছিল পূর্বের চেয়ে বেশি, ব্যবসা-বাণিজ্যও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ কথা অবশ্য ঠিক যে বিদেশে চীনা বণিকের চেয়ে চীনে বিদেশী বণিকের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি, তার কারণ অনুমান করা কঠিন নয়। সুবিস্তীর্ণ বিশাল দেশে অভাব পূরণের যথেষ্ট সুযোগ চীনাদের ছিল, সেইজন্য ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে তাদের বিদেশযাত্রার প্রয়োজন হত কদাচিৎ। রাজধানী চাং-আন (বর্তমান সিয়ান-ফু) ছিল একটি জনাকীর্ণ জনপদ, চীনে প্রবেশপথের প্রধান ঘাঁটি। সওদার আমদানি-রপ্তানি চলত এই শহরের মধ্য দিয়ে, সেজন্য পশ্চিমের বিবিধ জাতির ব্যক্তিগণের মিলন-ক্ষেত্ররূপে এই নগরটি পরম সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

দক্ষিণে সমুদ্রপথে বিদেশের সঙ্গে সংযোগ-ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছিল। সপ্তম শতাব্দে ক্যান্টন বন্দরে বাণিজ্যদ্রব্যের আমদানি-রপ্তানি দেখা গেছে। সেই বাণিজ্য প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল অষ্টম শতাব্দীতে যখন সুবৃহৎ অর্ণবযানে পণ্যদ্রব্যসহ পারস্য, আরব ও ভারতীয় ব্যবসায়ীদের আবির্ভাব হল। আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ ও শুল্ক সংগ্রহের জন্য একটি সরকারী দপ্তর খোলা হয়েছিল। ইসলামের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সমুদ্রপথে দূরপ্রাচ্যে আরবদের ব্যবসা-বাণিজ্যে যথেষ্ট জোর ধরেছিল, এবং এই উপলক্ষে ক্যানটনে তারা একটি উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। এখানে বিদেশী ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এরূপ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে ৭৫৮ খৃস্টাব্দে চীনাগণ কর্তৃক অতিরিক্ত শুল্ক আদায়ের জন্য ক্রুদ্ধ পারসীক ও আরবগণ শহরটিকে লুণ্ঠন করেছিল। নবম শতাব্দে নেস্টোরিয় (Nestorian) খৃস্টান ও ইহুদিগণের আবির্ভাব দেখা যায়। সেই সময়কার আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয়, মুসলমান সম্প্রদায়ের শাসনভার একজন মুসলমান কাজীর ওপর অর্পণ। সেই কাজীই ঐসলামিক বিধান অনুসারে নিজ সম্প্রদায়-মধ্যে শান্তিরক্ষার কাজ করতেন। আধুনিক যুগে ইউরোপীয়ানরা চীনের দুর্বল হস্ত থেকে এই ধরনের একটি সাম্প্রদায়িক শাসনব্যবস্থা আদায় করেছিলেন, সেই ব্যবস্থার নাম Extra-territoriality. চীন দেশে ইউরোপীয়ানরা চীনাদের শাসনাধীনে ছিলেন না, শাসনের ভার ছিল স্ব-জাতীয় ব্যক্তিগণের ওপর, বিচার হত স্বদেশের আইন অনুসারে। অতীত যুগে চীনারা নিজেদের স্বার্থের খাতিরে মুসলিম

সাম্প্রদায়িক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল, কাজী নিযুক্ত করত চীনারা, আর সেই কাজী তার কার্যের জন্য দায়ী থাকত চীনা রাজশক্তির কাছে। Extra-territorialityর ক্ষেত্রে কিন্তু ইউরোপীয়ান শাসনকর্তাদের চীন সম্রাটের কাছে দায়িত্বের কোন বালাই ছিল না, চীনে তাদের ব্যবসা-কেন্দ্রগুলি প্রকৃতপক্ষে ছিল উপনিবেশ।

চীনের বড় বড় শহরগুলির প্রায় অর্ধেক অধিবাসী রেশমী পোশাক পরিধান করত, আর 'ফার'-কোটের চলন ছিল এত বেশি যে সে তুলনায় বর্তমান কালের ধনী আমেরিকায়ও নাকি এই দুর্লভ পরিচ্ছদেব সংখ্যা অল্পই বলতে হয়। রাজধানীর নিকটে রেশমের কারখানাগুলিতে এক লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত ছিল, শুধু এই তথ্যটুকু থেকে চীন দেশে রেশমশিল্পের গুরুত্ব অনুমান করা যায়। অতীত কাল থেকেই রেশম ছিল একটি প্রধান রপ্তানির সামগ্রী। রোমান সাম্রাজ্যে চীনা রেশমের চাহিদা যে কিরূপ ভীষণ আকার ধারণ করেছিল, আমরা তা ইতিপূর্বে দেখেছি। এই সময়েব ভারতবর্ষেও যে চীনা রেশম রপ্তানি হত, তার প্রমাণ আছে। কবি কালিদাসেব 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' নাটকে 'চীনাংশুক' শব্দের ব্যবহার দেখা যায়; অনেকে মনে করেন শব্দটিব অর্থ চীনা রেশমের বস্ত্র। রপ্তানির আর দুটি প্রধান সামগ্রী মসলা ও চীনা-বাসন (porcelain)। আর বিদেশ থেকে আমদানি হত হাতীর দাঁত, ধূপ, তাম্র, কচ্ছপের চাড়ি এবং গণ্ডারের শৃঙ্গ। সমুদ্রযাত্রী বণিকেরা অধিকাংশই ছিল বিদেশী, ট্যাং যুগে চীনাবা সমুদ্রপথে বাণিজ্য করতে কদাচিৎ বিদেশে গিয়েছে। এই যুগে অন্তত একবার সমুদ্রযাত্রা সম্রাট তা'ই সুং-এর আদেশে নিষিদ্ধ হয়েছিল।

ট্যাং শাসনকালে চীন দেশ কি ধনদৌলত, কি বাহ্যাড়ম্বর সর্ব বিষয়ে সমৃদ্ধির চূড়ায় আরোহণ করেছিল, সেজন্য এই যুগকে বলা হয়, 'সমৃদ্ধির স্বর্ণযুগ'। ধনীরা ছিল বিলাসী শিক্ষিত মানুষ, সৌন্দয উপভোগ করতে জানত, শিল্পের মূল্য দিতে কার্পণ্য করত না। বহুমূল্য আসল চুনির পাথর কেটে মূর্তি নির্মাণ করা হয়েছে, মৃতকে মুক্তাখচিত শয্যায় শায়িত করে কবব দেওয়া হয়েছে।*

* এই যুগ সম্বন্ধে লেখক Murdoch বলেন, "At this time, China undoubtedly stood in the very forefront of civilization. She was then the most

প্রথম ট্যাং সম্রাট জমি পুনর্বণ্টন করেছিলেন, প্রজারা সমান পরিমাণ জমির দখলকার হয় এরূপ একটি পরিকল্পনা অনুসারে। ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা বৃহৎ জমিদারি গঠনের উদ্যোগ ব্যর্থ করবার চেষ্টাও বারবার করা হয়েছিল, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নি। ভূমিশূন্য প্রজার ধনী ভূস্বামীর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ শোনা গেছে, তা সত্ত্বেও কৃষক ভূমির মালিক হয়েছে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব ছিল না। সরকারী উদ্যোগে পূর্তকার্যের প্রসার হয়েছিল যথেষ্ট, আবার মন্বন্তরও দেখা দিয়েছিল কয়েকবার। দুর্ভিক্ষকালে খাদ্য বিতরণের ব্যবস্থা করা হত, এবং ট্যাক্সও মকুব হত। ট্যাক্স ছিল অনেক রকমের, যেমন ভূমি-কর, ব্যবসায়ের ওপর কর, পণ্যদ্রব্যের ওপর কর। শহরবাসী প্রতি পরিবারের ওপর কর ধার্য করা হত, নিযুক্ত শ্রমিকসংখ্যার ওপর ধার্য ট্যাক্স পরিবারকেই দিতে হত। অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে ইয়াং ইয়েন নামক জনৈক রাজনীতি-বিশারদ প্রচলিত বিবিধ প্রকার ট্যাক্সের পরিবর্তে একটি মাত্র ভূমি-কর ধার্য করে বছরে দুইবার সেই কর আদায়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। দ্রব্যমূল্যস্বরূপ তাম্র 'মুদ্রা' ও রেশম দেওয়া হত। এই সময়ে তাম্রমুদ্রায় খাদ মেশানো হত, এবং তার পরিণাম হয়েছিল বিশুদ্ধ তাম্রমুদ্রার অন্তর্ধান। 'মুদ্রা' ছিল ছিদ্র-করা তাম্র বা দস্তা, স্বর্ণ বা রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত ছিল না।

ট্যাং যুগের এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক আলোচনায় মোটামুটিভাবে বোঝা যায়, সমাজ ও অর্থনীতির মূল কাঠামোর পরিবর্তন পূর্বকালের ওয়াং মেং কি ভবিষ্যৎকালের সুং-বংশীদের বিরাট সংস্কারকার্যের তুলনায় অতি অল্পই হয়েছিল।

৪. ট্যাং যুগে দেশী ও বিদেশী ধর্ম

হুয়ান-ৎসাং ও আই চিং

স্থলপথ ও জলপথ মুক্ত হবার ফলে, উভয় পথে চীনের সঙ্গে বহির্জগতের সংযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে বিদেশীদের সমাগম বৃদ্ধি পেয়েছিল,

---

powerful, the most enlightened, the most progressive, and the best governed empire on the face of the globe...It was the most polished epoch the world has ever seen." (Quoted from Will Durant's *Our Oriental Heritage*—p. 703).

সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে চীনা বণিকদের বিদেশে যাবার প্রয়োজন তেমন ছিল না বটে, কিন্তু পরিব্রাজকগণ ভারতবর্ষে যেত ধর্মশিক্ষার জন্য। এ যুগের প্রখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হুয়ান-ৎসাং, তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ভারত-ইতিহাসের ঘনান্ধকারে একটি আলোকস্তম্ভবিশেষ। সপ্তম শতাব্দের প্রথম দশকে হোনান প্রদেশে হুয়ান-ৎসাং-এর জন্ম, তিনি ছিলেন একজন পণ্ডিত রাজকর্মচারীর পুত্র। বিদেশযাত্রার বিরুদ্ধে সম্রাটের আদেশ উপেক্ষা করে তিনি চীন ত্যাগ করেন ৬২৯ খৃস্টাব্দে, তারপর তারিম উপত্যকার মধ্য দিয়ে পর্যটন করে বৌদ্ধধর্মের জন্মভূমি ভারতবর্ষে এসে উপনীত হন। ভারতে তিনি বৌদ্ধদের অনেক পবিত্র তীর্থভূমি পরিদর্শন করেন, নানা সংঘারামে ধর্মশিক্ষা ও শাস্ত্রালোচনা করেন, অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ সংগ্রহ করেন। এইরূপে ষোল বছর ভারতে অবস্থানের পর তিনি স্থলপথে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ তিনি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন, গ্রন্থসমষ্টির আকার পর্বতপ্রমাণ।* জীবনের অবশিষ্ট বিশ বৎসর কাল তিনি অধ্যাপনা এবং শাস্ত্রগ্রন্থগুলির চীনা অনুবাদের কার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর অনুবাদ-গ্রন্থের সমষ্টি আকারে খৃষ্টীয় বাইবেলের পঁচিশগুণ। এই গ্রন্থগুলি বৌদ্ধধর্মকে একান্ত জনপ্রিয় করে তুলেছিল, সেজন্য রাজসম্মানও পেয়েছিলেন তিনি প্রচুর। চীনে বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রে তাঁর একটি বিশেষ অবদান, 'ধর্ম-লক্ষণ' অর্থাৎ বিশুদ্ধ বিজ্ঞান (চৈতন্য) বা যোগাচার-দর্শনের শিক্ষাদান। এই দর্শন-তত্ত্ব মহাযানের অত্যন্ত জটিল 'আলয়-বিজ্ঞান' কল্পনার অনুসরণ করেছে। একটু পরেই আমরা এই তত্ত্বটি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করব।

হুয়ান-ৎসাং-এর মৃত্যুর পর আর একজন চীনা পরিব্রাজক ধর্মশিক্ষা উদ্দেশ্যে

* "Hsuan-Tsang brought to China from India 520 bundles of 857 books and translated 75 of them consisting of 1330 fascicles I-Tsing brought to China from India nearly 400 books and translated 56 of them consisting of about 230 fascicles. These are not only some of the most splendid and glorious achievements of Chinese culture, but also magnificient feats in the history of world civilization"—*Tan Yun-Shan in the Sino-Indian Journal*—Vol. I, pt 1, p 46.

ভারতে এসেছিলেন, তাঁর নাম আই-চিং। তিনি যাত্রা করেছিলেন সমুদ্র-পথে ৬৭১ খৃস্টাব্দে দক্ষিণের একটি বন্দর থেকে। ৬৯৫ খৃস্টাব্দে তিনি ক্যানটনে প্রত্যাগমন করেন, সঙ্গে অনুবাদের জন্য অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ নিয়ে এসেছিলেন।

বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মের অবস্থা ও প্রভাব

ভারতবর্ষে তখন বৌদ্ধধর্ম পতনোন্মুখ, কিন্তু বৌদ্ধ শ্রমণদের চীন দেশে আগমনের বিরাম ছিল না। এই সাংস্কৃতিক সংযোগের ফলে চীনে গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা এবং চিকিৎসা-বিদ্যা যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করেছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রভূত সম্মান ও সমাদর ছিল বটে, কিন্তু স্থানীয় ধর্মের, বিশেষত কনফুসীয় নীতিধর্মের বিষদৃষ্টি অনেক সময়েই এই বিদেশী ধর্ম এড়াতে পারে নি। বৌদ্ধধর্মের পারত্রিক চিন্তা ও সংসার-বৈরাগ্য কনফুসীয় নীতির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনুশাসনগুলির সম্পূর্ণ বিপরীত। সম্রাটগণ ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই তাও বা বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, কিন্তু রাজ্যশাসন ব্যাপারে কনফুসীয়গণ কর্তৃক প্রভাবিত না হয়ে তাঁদের গত্যন্তর ছিল না। কনফুসীয় পদ্ধতিমত শিক্ষিত বিদ্বৎসমাজ প্রশাসন ও সমাজের কাঠামো অটুট রেখেছিলেন, হ্যান ও সুই যুগে যেমন ট্যাং আমলেও তেমনি। চাকরি-পরীক্ষার মুখ্য পাঠ্য বিষয় ছিল নীতিধর্ম, এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্ররা দেশের সর্বত্র শাসক-পদে নিযুক্ত হতেন। রাজকর্মচারীর দল যে বৌদ্ধধর্মের ঘোর বিরোধী হবেন এবং সুবিধামত বৌদ্ধগণের ওপর নির্যাতনের প্রশ্রয় দেবেন, সেটা কিছু আশ্চর্যের বিষয় নয়। ৬২৬ খৃস্টাব্দে বৌদ্ধ ও তাও ধর্মের অনুষ্ঠান বন্ধ করবার জন্য সরকারী আদেশ জারি হয়েছিল। তাও-পন্থীরা মুষ্টিযোগ, ভেষজ-চর্চা, স্পর্শমণির সন্ধান এবং 'সঞ্জীবনী রসায়নে'র (Elixir of life) গবেষণা করতেন। ফলে কয়েকটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও তাঁরা করেছিলেন, যেমন চুম্বক-কম্পাস (magnetic compass)। কিন্তু কনফুসীয় পণ্ডিতদের বিজ্ঞান-চচার দিকে দৃষ্টি ছিল না ; আর তাও-ধর্ম ব্যক্তি-কেন্দ্রিক, অসামাজিক ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল বলে মূলত কনফুসীয় নীতির আদর্শবিরুদ্ধ। এই কারণে বিদেশী বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে দেশী তাও-ধর্মকেও বিলক্ষণ নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল কনফুসিয়ানগণের হস্তে। অষ্টম শতাব্দের

প্রারম্ভে বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি উত্থাপিত হয়। হ্যান ইউ নামে জনৈক বিখ্যাত কনফুসীয় পণ্ডিত কর্মচারী বুদ্ধদেবের এক খণ্ড অস্থির সরকারী সংবর্ধনা উপলক্ষে সরকারী কার্যের ও বৌদ্ধধর্মের নিন্দা করেন। এই প্রতিবাদের জন্য তিনি অবশ্য কর্মচ্যুত হন, কিন্তু তার আসল কারণ প্রতিবাদটি ঠিক সময়োচিত হয় নি। জনগণের কাতারে কাতারে মঠে প্রবেশ করে ভিক্ষু-ভিক্ষুনীব ব্রত গ্রহণের কুফল শক্তিমান ট্যাং সম্রাটেরা যে উপলব্ধি করতে পারেন নি এমন নয়। তখনকার অবস্থার বিষয় চীনা ইতিহাসে বলা হয়েছে: "সেনাপতিরা দলে দলে বাহিনী পরিত্যাগ করেছে, মন্ত্রীগণ রাজকর্ম, রাজ-পরিবারের ব্যক্তিগণ রাজপ্রাসাদ, বণিকগণ বাণিজ্য ত্যাগ করেছে, সকলেই অস্ত্রের ঝনঝনা, রাষ্ট্রের চিন্তা এবং সংসারের কোলাহল বর্জন করে মঠে গিয়ে সন্ন্যাসী হয়েছে।" এইসব কারণে সম্রাটেরা ব্রতধারী মঠবাসীর সংখ্যা হ্রাসের চেষ্টা করেছিলেন। ৮৪৫ খৃস্টাব্দে সম্রাট উ সুং-এর আদেশমত চল্লিশ হাজার বৌদ্ধমন্দির বিধ্বস্ত করা হয়েছিল, মন্দিরের বিত্ত বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল এবং দুই লক্ষ ভিক্ষু-ভিক্ষুনীকে সংসারে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য করা হয়েছিল। বিবরণের সংখ্যায় অতিশয়োক্তি থাকা বিচিত্র নয়। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের ওপর এই আঘাতটা যে প্রচণ্ড রকমের হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সৌভাগ্য-ক্রমে এই বৌদ্ধ উৎসাদন-পর্ব দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। ৮৫২ খৃস্টাব্দে সম্রাট উ সুং-এর উত্তরাধিকারী নির্যাতনের আদেশ প্রত্যাহার করেছিলেন।

সম্ভবত অন্যান্য বিদেশী ধর্ম, বিশেষত নেস্টোরীয়* খৃস্টধর্মের ওপর নির্যাতনের খড়্গ প্রবলভাবে পতিত হয়েছিল। ষষ্ঠ খৃস্টাব্দে বল্‌খ্‌, হিরাট, সমরকন্দ্‌ প্রভৃতি মধ্য এশিয়ার স্থানসমূহে নেস্টোরীয় খৃস্টধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, সেখান থেকে সেই ধর্ম চীনে প্রবেশ করে সম্ভবত ট্যাং যুগে। খৃস্টধর্মের আরও একটি শাখার আবির্ভাব হয়েছিল, শাখাটির নাম 'জেকোবাইট' (Jacobite)। নেস্টোরিয়ান সম্প্রদায়ের পূর্ণ বিবরণ চাং-আন শহরে প্রাপ্ত ৭৮১ খৃস্টাব্দের একটি স্মৃতি-নিদর্শনের ওপর লিখিত রয়েছে। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে তুন হুয়াং-এর পর্বতগুহায় কতগুলি লিখিত কাগজ

* নেস্টোরিয়ানদের মতে যিশু খৃস্টের প্রকৃতি দ্বিবিধ, মানবীয় ও ঐশ্বরিক। আর জেকোবাইট সম্প্রদায় খৃস্টকে সম্পূর্ণ ঐশ্বরিক প্রকৃতিসম্পন্ন বলে কল্পনা করতেন।

এবং অন্যান্য রাজকীয় আদেশপত্রেও এই সম্প্রদায়ের উল্লেখ দেখা যায়। চাং-আনের শিলালিপি থেকে জানা যায়, তা-চিন বা পশ্চিম এশিয়ার রোমান রাজ্য থেকে আ-লো-পেন নামক জনৈক ধর্মযাজক ৬৩৫ খৃস্টাব্দে সম্রাট তা'ই সুং-এর রাজত্বকালে এই ধর্ম প্রচারের জন্য চীন দেশে আসেন। সম্রাট তাঁর যথেষ্ট সংবর্ধনা করেছিলেন, এবং এই সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থগুলি অনুবাদের ব্যবস্থা করে ধর্ম প্রচারে উৎসাহ দান করেছিলেন। গির্জা নির্মাণ হল। সেই থেকে এই ধর্ম রাজার পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্য লাভ করেছিল, কিন্তু মাঝে মাঝে যে নির্যাতন ভোগ করতে হয় নি এমন নয়। পরিশেষে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দে বৌদ্ধধর্মের মত এই ধর্মের ওপর কঠোর উৎপীড়নের ফলে, খৃস্টধর্মের নেস্টোরীয় ও জেকোবাইট উভয় শাখারই বিলোপ ঘটল। বৌদ্ধধর্ম কিন্তু প্রভূত ক্ষতি সত্ত্বেও অল্পকাল-মধ্যে আবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিল।

আরও কয়েকটি বিদেশী ধর্ম ট্যাং যুগে বা তৎপূর্বে চীনে প্রবেশ করেছিল। সেই ধর্মগুলি পারস্যের মাজ্‌দা-ধর্ম (Mazdaism), মনি-প্রবর্তিত ধর্ম 'মনিকিজ্‌ম' (Manichaeism) এবং ইসলাম-ধর্ম। পারসীকদের মাজদা-ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা জরথুষ্ট্র, এই ধর্মের আবির্ভাব হয়েছিল ট্যাং যুগের পূর্বেই। চীনে মাজদা-ধর্মাবলম্বীরা সকলেই ছিলেন পারস্যের বণিক বা উদ্বাস্তুশ্রেণীর ব্যক্তি, কোন চীনাকে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল এরূপ প্রমাণ নেই। তৃতীয় খৃস্টাব্দে পারসীক ও খৃস্টধর্মের প্রভাবে ইরান দেশের মনি নামক জনৈক মনীষী কর্তৃক উদ্ভাবিত ধর্ম মনিকিজ্‌ম্ ইরানীরা চীন দেশে এনেছিল সপ্তম শতাব্দে। চীনা জ্যোতির্বিদ্যা মনিকীয়ান জ্যোতির্বিদগণ কর্তৃক প্রভাবিত হয়েছিল, তার একটি বিশেষ উদাহরণ চীনাদের সাত দিনে সপ্তাহ গণনা। চাং-আন, লো ইয়াং প্রভৃতি প্রধান শহরগুলিতে এই ধর্ম সম্প্রদায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু মনিকিজম্ চীনাদের কাছে কোন কালে জনপ্রিয় হয় নি, উইঘারগণই ছিল এই ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। মধ্য এশিয়ায় উইঘার জাতির আধিপত্যকালে চীনেও এই ধর্মের প্রবেশের সুযোগ ঘটেছিল, কিন্তু নবম শতাব্দে সেই উপজাতির পতনের সঙ্গে এই ধর্মও চীন থেকে অন্তর্ধান করেছিল।

সকল বিদেশী ধর্মের আবির্ভাবের কাহিনী চীনের ইতিহাসে স্পষ্টভাবে

বর্ণিত আছে, নেস্টোরীয় ধর্ম, মাজ্‌দা ধর্ম, মনিকিজ্‌ম্‌ প্রভৃতি যেসব ধর্ম কোন দিন সে দেশের ভূমিতে শিকড় বসাতে পারে নি, সেই ধর্মগুলির প্রবেশের কথাও ইতিহাসে আছে, কিন্তু ইসলাম-ধর্মের চীন দেশে আগমনের বিবরণ কোথাও লিপিবদ্ধ নেই। বর্তমান কালে চীনে, বিশেষত কান্‌সু, সেনসি, ইউনান প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা যথেষ্ট। এমন একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের চীন দেশে আগমনের আদি কথা অজ্ঞাত, এ কথা চিন্তা করলে অনেকেই বিস্ময় বোধ করবেন সন্দেহ নেই। চাং-আন শহরের মসজিদে একটি শিলালিপি ট্যাং যুগের তারিখ বহন করে, কিন্তু শিলা-লিপিটি জাল, নেস্টোরীয় শিলালিপির অনুকরণে পরবর্তী মিং যুগে প্রস্তুত বলে প্রমাণিত হয়েছে। চীন দেশে মুসলমানদের ঐতিহ্যও নির্ভরযোগ্য নয়, কেননা তারা সুই যুগে চীনে প্রবেশের দাবি করে, অথচ সুই যুগ শেষ হয়েছে হিজেরার কয়েক বৎসর পূর্বে। ট্যাং যুগে দক্ষিণাঞ্চলের বন্দরগুলিতে মুসলমানদের দেখা যায় বণিকরূপে, আর পশ্চিম অঞ্চলে তারা ছিল যুদ্ধ-ব্যবসায়ী। নবগঠিত মুসলমান দেশগুলি থেকে ট্যাং রাজ-দরবারে দূত প্রেরণও দেখা যায়, কিন্তু এই মুসলমানগণ চীনাদের ধর্মান্তরিত করবার জন্য কোনরূপ প্রচারকার্য করেছিল, এমন প্রমাণ নেই। একজন আরব পর্যটকের চীন ভ্রমণের বর্ণনায় বলা হয়েছে, তিনি একজন চীনাকেও ইসলাম-ধর্ম গ্রহণ করতে দেখেন নি, যদিও অনেক নগরেই সমৃদ্ধ বিদেশী মুসলমানের বসবাস ছিল। বর্তমান কালে মুসলমানরা যদিও চীনা পোশাক পরে, চীনা ভাষায় কথা বলে, মোটকথা চীনা জাতীয় জীবনের সঙ্গে সর্ব-প্রকারে মিশে গেছে, তথাপি বিদেশ থেকে আগত ভিন্ন জাতির বংশধর তারা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, তাদের অনেকেরই আর্মানয়েড ছাঁদের মুখাকৃতি, লম্বা দাড়ি-গোঁফ, বাঁশির মত উন্নত নাসিকা।

বিদেশী ধর্মগুলির ওপর নির্যাতন চলেছিল সত্য, কিন্তু ইসলাম কোনরূপে উপদ্রুত হয় নি, কারণ একাধিক হওয়াই সম্ভব। প্রথমত, বোগদাদের খালিফ ছিলেন একজন পরাক্রান্ত নৃপতি, চীনের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। চীনের আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনকার্যে আরব বাহিনীর মূল্যবান সাহায্য যথাকালে লাভ করা সম্ভব হয়েছিল হয়তো বা খালিফেরই অনুগ্রহে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, মুসলমানেরা এখানে ধর্ম-প্রচার বা ধর্মান্তরিতকরণ থেকে সম্পূর্ণরূপে

বিরত ছিল। ইসলাম-ধর্ম ছিল বিদেশীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, চীনা সামাজিক জীবনের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল না, সেজন্য এই বিদেশী ধর্মে কোনরূপ হস্তক্ষেপের প্রযোজন হয় নি। আর ধর্মাচরণে বাধা ছিল না বলেই ধীরে ধীরে মুসলমানদেব সংখ্যা বৃদ্ধি পেযেছিল, এবং তাব ফলে চীন দেশে তারা এখন একটি প্রতিষ্ঠাশালী সম্প্রদায় হযে উঠেছে।

নূতন দর্শন চতুষ্টয়

বৌদ্ধধর্মেব পুনবভ্যুত্থান সম্ভব হয়েছিল, তার কাবণ ট্যাং বংশের সম্রাটেবা অনেকেই বৌদ্ধধর্মের প্রতি ছিলেন পবম শ্রদ্ধাবান, এবং তাঁদেব বিপুল সমর্থন লাভ কবে অচিরেই এই ধর্ম সর্বোত্তম গৌরবশিখরে উঠতে পেরেছিল। চীন দেশে বৌদ্ধ শ্রমণগণের শেষ অবদান এই যুগেই, তারপর থেকে আজ পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ সমযেব মধ্যে কযেকটি সম্প্রদায গঠন ভিন্ন আর তাঁরা কোন কৃতিত্বেব দাবি করতে পাবেন নি। ইতিপূর্বে মহাযান-পন্থার অমিতাভ-তত্ত্ব, 'বিশুদ্ধ ভূমি'বাদ, চ্যান-যোগ ও তিযেন-তাই প্রভৃতি দর্শনতত্ত্বের বিষয আলোচনা হযেছে, সেই দর্শনসমূহেব আবির্ভাব হযেছিল ট্যাং যুগেব পূর্বে। ট্যাং যুগে প্রধানত অতিরিক্ত আবও চারটি দর্শনের উদ্ভব হযেছিল। সেই দর্শন চতুষ্টয় এই :

(১) হুযান ৎসাং-এর 'ধর্মলক্ষণ' বা যোগাচার-দর্শন। এই প্রসিদ্ধ পর্যটক-দার্শনিকের মতে চিত্ত বা চিৎ-স্বরূপই একমাত্র সত্য, সকল বহির্বস্তু চিত্তের বিজ্ঞান বা চৈতন্য থেকে সমুদ্ভূত। মহাযান-পন্থীদের জটিল 'আলয বিজ্ঞান'-তত্ত্ব এই দর্শনের শ্রেষ্ঠ পরিণতি। অব্যক্ত ভাব-সমুচ্চযের আলযরূপে চিত্ত বা মনকে বলা হয আলয-বিজ্ঞান। সৃষ্টিব মূল কারণ, আলয়-বিজ্ঞানে অবস্থিত ভাব-সমুচ্চযেব আত্মপ্রকাশ। এই আলয়-বিজ্ঞানেব সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য মনস্তত্ত্বেব 'অবচেতন' বা 'অচেতন মনে'র বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায।

(২) তু স্থন-এর 'হুয়া ইযেন স্থন' দর্শন। তু স্থন (৬৪০ খৃঃ) বৌদ্ধ ও তাও তত্ত্বের সংমিশ্রণে এই দর্শনের রূপাযণ করেন। অতীতে অনেক মহাপুরুষ বোধি লাভ করে বুদ্ধ হযেছেন, ভবিষ্যতেও অনেকে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হবেন। মহাযানের অমিতাভ-তত্ত্বেব সঙ্গে তাও-দর্শনের এই মূল-সূত্রটিও গ্রহণ

করা হয়েছে যে, বস্তু-র উর্ধ্বে এক পারমার্থিক সত্তা বিরাজমান, সর্ব বস্তু, এমন কি পরস্পরবিরোধী গুণধর্মও সেই অদ্বিতীয় সত্তার বিভিন্ন রূপ।

(৩) তাও স্যুযান (৬৬৭ খৃঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত 'লু-জুং' তত্ত্ব। এই দর্শন কল্পনাবিলাসী মানসিকতার বিরুদ্ধে চীনা ব্যবহারিক বুদ্ধিবৃত্তির প্রতিক্রিয়া-বিশেষ। তাও স্যুযান-এর শিক্ষার সারমর্ম এই যে, দর্শনের তর্কজাল বয়ন করা একান্তই বৃথা, বুদ্ধদেবের উপদেশ-বিরোধী। দযাধর্মের অনুশীলনই শ্রেযলাভেব প্রকৃত উপায়। এই ধর্মানুশীলনেব প্রথম সোপান চিত্তশুদ্ধি। বিশুদ্ধ নির্মল চিত্তের সার্বভৌম মহাকরুণার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান দ্বারা জগতের হিতসাধন বৌদ্ধদের কর্তব্য। এই মতবাদ কনফুসীয নীতিধর্মের সমর্থন লাভ করে অমিতাভ-তত্ত্বেব প্রভাব খর্ব করতে সক্ষম হযেছিল। লু-জুং তত্ত্বে মানবতার প্রচাব উন্নত নৈতিক জীবনাদর্শেব প্রেরণা জাগিযে চীনা সমাজের প্রভূত কল্যাণ কবেছিল, সেজন্য এই তত্ত্বের মর্যাদা কোনদিন হ্রাস পায নি।

(৪) বজ্রবোধি (৭১৯ খৃঃ) ও অমোঘ (৭৭৪ খৃঃ) প্রবর্তিত 'মন্ত্রাযণ' দর্শন। এই দর্শনেব চীনা নাম 'চেন ইযেন জুং', জাপানী নাম 'সিঙ্গন'। মন্ত্রায়ণ বা চেন ইযেন একটি গুহ্য তত্ত্ব, চীনা নামটিব অর্থ, 'সত্যের বাক্য' ('Word of Truth')। বুদ্ধ বৈরোচন, চীনা নাম 'পি-লু ফো', প্রধান উপাস্য দেবতাব স্থানে অধিষ্ঠিত। এই তত্ত্বেব প্রবর্তক বজ্রবোধি ও অমোঘ উভয়ই ছিলেন ভাবতীয় ব্রাহ্মণ, ধর্মানুষ্ঠানে নানারূপ তান্ত্রিক বিধিমন্ত্র ও মুদ্রাব ব্যবস্থা করেছিলেন। তান্ত্রিক বিধানগুলি শৈবধর্ম-প্রভাবিত। মন্ত্রের বিশুদ্ধ আবৃত্তি ও মুদ্রার নিখুঁত ভঙ্গি স্বতন্ত্র দুটি বিজ্ঞানে পবিণত করা হযেছিল, একটি শব্দ বা ধ্বনি-বিজ্ঞান অপবটি ভঙ্গি-বিজ্ঞান। দর্শন যেমনই হোক, এই তত্ত্বের প্রভাব জাতিকে কুসংস্কারে আচ্ছন্ন করে প্রভূত অকল্যাণের হেতু হযেছিল।

চীনের সাংস্কৃতিক মঞ্চে বৌদ্ধধর্ম যে আসন লাভ করেছিল, তার স্থাযিত্ব বা মর্যাদা কোন দিন ক্ষুণ্ণ হয নি। ইউরোপে খৃষ্টীয ধর্মসংঘগুলির মত বৌদ্ধ সংঘ কখনো রাজশক্তিকে করাযত্ত করবার প্রযাস করে নি। রাজশক্তি পরিচালনা করত কনফুসিয়ানগণ, বৌদ্ধ সংঘের পক্ষে তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা হয়তো বা সম্ভব ছিল না।

পরিশেষে কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি প্রতিবেশী দেশগুলির ওপর চীনা সংস্কৃতির, বিশেষত বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের কথা সংক্ষেপে বলা প্রয়োজন।

কোরিয়া চীনের সামরিক শক্তিকে যথাসাধ্য প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করেছিল বটে, কিন্তু সে দেশ চীনা সংস্কৃতিকে এবং সেই সঙ্গে বৌদ্ধধর্মকে সাগ্রহে বরণ করে নিয়েছিল। ট্যাং-দের সাংস্কৃতিক প্রভাবের গণ্ডির মধ্যে ইন্দো-চীনও এসে পড়েছিল, এমন কি তিব্বতী ধর্মেও চীনা বৌদ্ধগণের ভাবধারা অনুপ্রবেশ করেছিল। সুই বংশীদের আমল থেকেই জাপানে বৌদ্ধধর্মের নিঃশব্দ পদ-সঞ্চার শুরু হয়েছিল। ক্রমে সেখানে সেই ধর্মের সঙ্গে চীনা সংস্কৃতির নব নব উপকরণের আবির্ভাব 'নারা যুগে'র জাপানী সাহিত্য, শিল্প ও রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্ষেত্রে যুগান্তকর বিপ্লবের সৃষ্টি করেছিল।

৫ ট্যাং যুগের সাহিত্য

কবি ও কবিতা

প্রাচীন কালের কবিতা সংকলন করেছিলেন কনফুসিয়াস তাঁর সি-কিং গ্রন্থে, গান, পদ্য রচনা ও স্তোত্রের সংকলন। কনফুসীয় পণ্ডিতেরা এই রচনাগুলির স্থান পরবর্তী কালের কবিতার চেয়ে উচ্চে নির্দেশ করেছেন, তার কারণ সাহিত্যিক গুণ বিচারে প্রাচীন কবিতা যে সত্যই অধিকতর রসোত্তীর্ণ তা নয়, নৈতিক আদর্শের জন্যই প্রাচীন কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করা হয়েছে। চৌ-যুগের প্রসিদ্ধ কবি চু ইউয়ানের জন্ম কনফুসিয়াসের পরবর্তী কালে, তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা 'লি সাও' বা 'দুঃখ বরণ' সম্বন্ধে আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। হ্যান যুগের কোন কবির পদ্য-রচনাই এই কবিতাটির মত উৎকৃষ্ট বলে মনে করা হয় না। দীর্ঘকালের পর কাব্যের পরিপূর্ণ স্ফূর্তি দেখা দিল ট্যাং যুগে, এমন সর্বাঙ্গসুন্দর বিকাশ ঘটেছিল বলেই ট্যাং যুগের তিন শতাব্দীকে 'কাব্যের স্বর্ণযুগ' বলা হয়। জাতির ইতিহাসে তখন এক বসন্তঋতুর আবির্ভাব হয়েছিল, সাহিত্য বা শিল্পকলার এমন কোন শাখা ছিল না যা সেই ঋতু-উৎসবে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে নি। শিল্পে ফুটেছিল যৌবনশ্রী, সাহিত্যে ধরল নানা বর্ণের শোভা। এই নব-বসন্ত উদ্গমের কারণ নির্ণয় করতে হলে সে-যুগের অন্তরতম প্রদেশে অবতরণ করতে হয়। সেখানে দেখতে পাই, বৌদ্ধধর্ম ও তাও-দর্শন জীবনকে একটি অপরূপ পারমার্থিক ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ করে তুলেছে, আর সেইসব

তত্ত্ব-দর্শনের সোনার কাঠির স্পর্শে সাহিত্য ও শিল্প এমন প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে পদ্য-রচনাই ছিল যেন এ যুগের প্রতিভার প্রকৃত পবিচয়। রচনার পরিমাণ প্রভূত, 'ট্যাং যুগের কাব্য-সংগ্রহে'র দশটি গ্রন্থে ৪২০০ কবি রচিত আটচল্লিশ সহস্র কবিতা এবং তিন হাজার কবির নাম লিখিত রয়েছে।* অবশ্য সকল কবিতা উচ্চাঙ্গের নয়, সকল কবিও উচ্চশ্রেণীর রসশিল্পী ছিলেন না। কিন্তু পদ্যেব পবিপূর্ণ সৌষ্ঠব ফুটেছিল এই যুগে, বিশেষত চীন দেশের সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম কবি লি পো ও তু ফু-র রচনায়। উভয়েই পূর্বকালীন বা সমকালীন কবিদের মতই উচ্ছৃঙ্খল, মদ্যপ, নিন্দনীয় চরিত্রের মানুষ, তাঁদের উন্মার্গ সুবাসক্তিব বিবরণ দিয়েছেন তু ফু তাঁর বিখ্যাত একটি কবিতায। কবিতাটির নাম 'সুরাপাত্রের আটজন অমব' ("Eight Immortals of the Wine Cup")। কবি লি পো সম্বন্ধে পদ্যে এই কযেকটি ছত্র লিখেছেন তিনি :

লি পো-ব হাতে দাও সুরাপাত্র ভরা,
নিমেষ না যেতে লেখে এক শত ছড়া।
মদের দোকানে শুযে আবামে ঘুমায,
'স্বর্গপুত্র' ডাক দিলে ফিবেও না চায।

লি পো-র বর্ণনাচ্ছলে কবি তু ফু কিন্তু নিজেবই একটি সত্যিকাব প্রতিকৃতি অঙ্কিত কবেছেন। তু ফু ছিলেন একজন রাজকর্মচারী, উদ্দাম প্রবৃত্তির দাস। তাঁর উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের পবিণাম হযেছিল অশুভ, নিতান্ত শোচনীয়ভাবে মত্তাবস্থায় একটি মন্দিরের দ্বারপ্রান্তে তাঁর বিষাদময জীবনের অবসান ঘটে (৭৭০ খৃঃ)। চাকরি-পরীক্ষায কোন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি তিনি, যদিও পদ্য-রচনা ছিল একটি পবীক্ষার বিষয়। তিনি কিন্তু নিজের রচনা বিষয়ে দম্ভ প্রকাশ করতে ছাডেন নি, বলেছেন, তাঁর 'রচনা পাঠে ম্যালেরিযা রোগ আরোগ্য হয'। কবিব রচনাবলী সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। তাঁর কবিতায আছে ঝংকার,

* ট্যাং যুগের কাব্যগ্রন্থ, চীনা নাম 'চুয়ান ট্যাং সি' সংকলন করেছিলেন মাঞ্চু সম্রাট ক্যাং সি ১৭০৭ খৃস্টাব্দে। ৯০০টি বাঁধানো গ্রন্থের স্তূপ এই কাব্য-সংগ্রহ।

দোলনার দোদুল দোল। নমুনাস্বরূপ সৈন্যদের যুদ্ধযাত্রা বিষয়ে একটি কবিতার একটুখানি অনুবাদ দেওযা গেল :

রথচক্র ঘর্‌ঘর্, তুরঙ্গের হ্রেষা রব উঠে,
সৈন্যদের অভ্রভেদী কোলাহল চারদিকে ছুটে,
দামামার ডামাডোল, দুর্নিবার বাজে তূর্যধ্বনি,
চিক্‌চিক্ বর্শার সাগর, ফলকের শব্দ ঝনঝনি।

চীনের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিরূপে লি পো-র খ্যাতি, তাঁর জীবন ট্যাং যুগের অন্যান্য পণ্ডিত কবিদেরই অনুরূপ, অর্থাৎ কনফুসীয ধারায সংসারের প্রতি কর্তব্য আর তাও-আদর্শমত সংসার-বৈরাগ্য এই দুটি পরস্পরবিরোধী ভাব দ্বারা প্রভাবিত। দরিদ্র পরিবারে লি পো-র জন্ম (৭০১ খৃঃ), ট্যাং বংশের সঙ্গে সম্পর্কের দাবি করেছেন তিনি, কিন্তু সেজন্য সম্রাটের নিকট থেকে কোন সুযোগ সুবিধা লাভ করেন নি। তরুণ বযসেই তিনি কনফুসীয নীতিধর্মে পারদর্শী হযে ওঠেন, এবং সেই বিদ্যার প্রতিক্রিযার ফলেই যেন সিন পর্বতে গিযে একজন সন্ন্যাসীর শিষ্যরূপে তাও তত্ত্ব অধ্যয়ন করেন। ৭২৪ খৃস্টাব্দে সানটাং-এ প্রত্যাবর্তন করে সেখানে একটি সাহিত্য-সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। সমিতিটির নাম 'বাঁশবনের ছযটি কুঁড়ের ধাড়ি' (Six Idlers of the Bamboo Grove")। এই নামকরণ পূর্বকার সিন রাজবংশীদের আমলের আর একটি সমিতির কথা স্মরণ করিযে দেয। সেই সমিতির নাম ছিল 'বাঁশবনের সপ্তর্ষি' ("Seven Sages of the Bamboo Grove")। উচ্ছৃঙ্খল ভবঘুরে জীবনের মাঝেও তাঁর কাব্যরচনা অবাধে চলেছিল এবং তাঁর কবি-প্রতিভার খ্যাতি একদিন সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সেই সূত্রে ৭৪২ খৃস্টাব্দে সম্রাট মিং হুযাং-এর দরবারে কবি লি পো-র প্রথম আগমন। সম্রাটের আমন্ত্রণ ও কবির রাজসভায আসার বৃত্তান্তটি একটি আখ্যাযিকায বর্ণনা করা হযেছে এইরূপ : সম্রাট মিং হুযাং-এর যখন সুসময তখন একদিন কোরিযা-রাজের জনৈক দূত একখানি পত্র নিযে দরবারে এসে উপস্থিত হল, কিন্তু কোরীয ভাষায লিখিত চিঠি কেউ পড়তে পারল না। ক্রুদ্ধ হযে সম্রাট বললেন, "কি আশ্চর্য! সুবিজ্ঞ মন্ত্রী, সুপণ্ডিত সভাসদ, যোদ্ধৃবৃন্দ, কত মহারথী রযেছেন এখানে, আর তাঁদের মধ্যে এমন একজন নেই যিনি এই পত্রখানা পড়তে পারেন।

তিন দিনের মধ্যে যদি এই পত্রপাঠের ব্যবস্থা না হয় তবে সকলকেই বরখাস্ত করা হবে।" মন্ত্রী, সভাসদবর্গ সকলেই বিষম চিন্তিত হয়ে পড়লেন, পরস্পরের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন কিরূপে এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। তারপর হো চিং চেং নামে একজন মন্ত্রী দরবারে এসে সসম্ভ্রমে সম্রাটকে অভিবাদন করে বললেন, "সম্রাটের অনুমতি হলে বলি, লি নামে এক গুণী কবি আছেন। সকল রকম জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাঁর অতুলনীয় অধিকার। সম্রাট তাঁকে আদেশ করুন, তিনি যেন দরবারে হাজির হয়ে চিঠিখানা পাঠ করেন।" সম্রাটের আদেশ অচিরেই প্রেরণ করা হল, কিন্তু লি পো আসতে অস্বীকার করলেন এই বলে যে এই কার্যের যোগ্য ব্যক্তি তিনি নন, কারণ চাকরি-পরীক্ষায় পণ্ডিত পরীক্ষকেরা তাঁর রচিত প্রবন্ধটি সবেমাত্র প্রত্যাখ্যান করেছেন। সম্রাট তখন তাঁকে ডক্টরের সম্মানিত উপাধিদানে তুষ্ট করলেন। প্রাসাদে উপস্থিত হয়ে লি পো দেখলেন, মন্ত্রীদের মধ্যে কয়েকজন আছেন যাঁরা ছিলেন তাঁর পরীক্ষক। তখনই তিনি তাঁদের আদেশ দিলেন তাঁর পায়ের জুতা খুলে দিতে এবং সেই মন্ত্রীরা তাঁর আদেশ পালন না করা পর্যন্ত কর্মে প্রবৃত্ত হলেন না। পত্রখানা অনুবাদ করে দেখা গেল, কোরিয়াকে স্বাধীনতা দান না করলে সে যুদ্ধ করবে, উদ্ধত ভাষায় এই কথা জানানো হয়েছে। লি পো একটি বিজ্ঞোচিত কঠিন প্রত্যুত্তর লিখলেন, সম্রাট বিনা দ্বিধায় সেটি সই করলেন। সেই পত্রখানি পাঠ করে কোরিয়ার রাজা নিজের ধৃষ্টতা বুঝতে পেরেছিলেন, এবং অবিলম্বে ক্ষমা প্রার্থনা করে সম্রাটের কাছে প্রচুর উপঢৌকন পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

কবি লি পো তিন বছরকাল সম্রাট ও তাঁর প্রেয়সী গণিকা ইয়াং কুয়েই ফেই-র প্রিয়পাত্র ছিলেন, তারপর তাঁর ভাগ্যের গ্রহটি ম্লান হয়ে এল। খোজা-প্রধান কাও লি সি-র বিরাগভাজন হয়েছিলেন তিনি, তারই চক্রান্তে কবির ওপর রাজগণিকার বিষদৃষ্টি পড়েছিল। এই প্রাসাদ-ষড়যন্ত্রের ফলে নির্বাসিতের ভবঘুরে জীবন আবার তাঁকে বরণ করতে হয়েছিল। ঘটনাক্রমে আন-লু-সান-এর বিদ্রোহের সঙ্গে তিনি জড়িত হয়ে পড়েন এবং অতি কষ্টে তাঁর প্রাণরক্ষা হয়। ৭৬১ খৃস্টাব্দে আনহুয়েই প্রদেশে তা'ই-পিং নগরে তাঁর মৃত্যু হয়। সম্রাট মিং হুয়াং নেই, রাজ-গণিকা ইয়াংও নেই, তাঁর কবিতা লেখা কিন্তু তখনো বন্ধ হয় নি। লেখা শেষ করলেন তিনি এই কবিতাটি লিখে :

সাঙ্গ হল গান গাওয়া আমি তাই হাসি,
বিশাল সে সুখ হর্ষ পারাবারে ভাসি।
ওগো মৃত্যুহীন পন্থ! চেন্ পিং গান
তুমি রবে চিরদিন গৌরবে অম্লান
রবি শশী সম।

লি পো-র মৃত্যু সম্বন্ধে অনেক প্রকার কিংবদন্তী আছে। তিনি নাকি শত্রুর উৎপীড়ন থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছিলেন। একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, চাঁদনি রাত্রে স্বচ্ছ জলের ঢেউ-এর মাথায় চন্দ্রের প্রতিবিম্ব দেখে মুগ্ধ আত্মহারা কবি অতলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, এই কথাটি চীৎকার করে বলে, 'সমুদ্রে ডুব দিলাম চাঁদ ধরবার জন্যে'। বর্ণনার কবিত্বের অংশ বাদ দিলে খাঁটি সত্য বোধ করি এই দাঁড়ায় যে, মাতাল অবস্থায় লি পো জলে ঝাঁপ দিয়েছিলেন চন্দ্রের প্রতিবিম্বকে আলিঙ্গন করবার জন্যে। উপরোক্ত বৃত্তান্তটির সঙ্গে কিন্তু একটি অলৌকিক কাহিনী জুড়ে দিতে বাধা হয় নি। বলা হয়েছে, দুইটি 'ডলফিন' বা জলদেবী ও দুইটি অমৃতের শিশুসন্তান কবিকে সাদরে বরণ করে স্বর্গধামে নিয়ে গেলেন।

লি পো-র কবিতার ইংরেজি অনুবাদ করেছেন জাপানী লেখক মিঃ ওবেতা। রচনার গুণবিচার প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "লি পো-র পদ্যে একটি করুণ সুরের সাড়া বেজে ওঠে, সুরামত্ত উল্লাসের ছন্দেও কাতরতার স্পন্দন শোনা যায়। এমন কি যখন তিনি কোন উৎসববাসরে গানের ঝংকার তোলেন, তখনই তাঁর অন্তরের বিষাদমগ্ন চিন্তাটি ফুটে বেরিয়ে যেন চাপা গলায় বলে, চুপ চুপ! ওই দেখ পূর্ববাহিনী নদীর জলে সব কিছুই ভেসে যায়।"

লি পো-র সমসাময়িক কবি মেং হো-যান। চীনাদের মধ্যে এই কবির খ্যাতি যথেষ্ট, কিন্তু তাঁর কবিতাবলী ইংরেজিতে অনুবাদ হয় নি। লি পো তাঁর সম্বন্ধে কয়েকটি কবিতা লিখে গেছেন, তার মধ্যে একটি এইরূপ:

কবিবর লহ মোর হৃদয়বন্দনা,
কীর্তি তব আকাশ পরশে।
শিরোপা স্যন্দন ত্যজি যৌবনের উদ্দাম কামনা,
বনচ্ছায়া বরিয়াছ মেঘলোক পরম হরষে।

শুভ্রশীর্ষ, স্বপ্ন-ঋষি, মত্ত তুমি চন্দ্রমধু পানে,
আত্মহারা কুসুমের যাদুমন্ত্রে, নাহি যায কানে
সম্রাটের ডাক। ওগো নগ অধিরাজ,
দূরে অতি দূরে তুমি করিছ বিবাজ,
নাগাল ধবিতে নারি, গন্ধ ভেসে আসে,
চন্দন সুরভি যেন বসন্ত নিশ্বাসে।

পো চু-ই র কবি-প্রতিভা প্রায লি পো ও তু ফু র সমান শ্রেণীর। এই কবি অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের মানুষ (৭৭২-৮৪৬ খৃঃ)। একজন সামান্য কর্মচারীর পুত্র, তিনি নিজেও অল্প বযসে পবীক্ষায উত্তীর্ণ হযে রাজকর্মচারীর পদ লাভ কবেছিলেন। বাজকার্যে জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত কবেন তিনি, অনুগ্রহ লাভ ও নিগ্রহ ভোগ তাঁব অদৃষ্টে দুই-ই ঘটেছিল। পো চু-ই-র বচনায কনফুসীয আদর্শ বিশেষভাবে প্রতিফলিত, কাব্যের মাধ্যমে তিনি চেযেছিলেন নীতিশিক্ষা দান কবতে, এবং সেজন্য কবিতাগুলি তেমন মনোজ্ঞ কি উপভোগ্য হয নি। কিন্তু তাঁর আদিরসাত্মক বিচিত্র রচনাবলী, যেগুলিব তেমন মূল্য তিনি কখনো দেন নি, সেইসব প্রেমেব কবিতাই অত্যন্ত জনপ্রিয হয়ে উঠেছিল। চীনেব সর্বশ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে তাঁব স্থান কবে দিযেছে তেমনি একটি রোমান্স্, 'ক্ষয নেই যে দুষ্কৃতির' ("Everlasting Wrong') শীর্ষক সুদীর্ঘ কাব্যরচনা। ইযাং কুযেই-ফেই-র সঙ্গে সম্রাট মিং হুযাং-এব প্রণয ব্যাপার যা ইতিপূর্বে বলা হযেছে, সেই কাহিনীর মর্মান্তিক পরিণামের কথাই এই কাব্যের বর্ণনার বিষয। আন-লু-সান-এর বিদ্রোহ দমনেব পর ভগ্নহৃদয বৃদ্ধ সম্রাট যখন বিধ্বস্ত রাজধানীতে প্রত্যাগমন করলেন, তিনি তখন তাঁর প্রিযতমাকে ফিরে পাবার জন্যে ব্যাকুল হযে উঠলেন, প্রিযতমা ইযাং কুযেই-ফেই, যাকে তিনি নির্মমভাবে মৃত্যুর আবর্তে নিক্ষেপ করেছিলেন। ইন্দ্রজাল দ্বাবা এই রাজ-গণিকাকে পুনরুজ্জীবিত করতে অনেক চেষ্টা করলেন সম্রাট। অবশেষে একজন তাও ঐন্দ্রজালিক মৃতা নারীর সন্ধান পেযেছিলেন স্বর্গে নয়, পাতালেও নয়, পূর্ব সাগরে এমন একটি যাদু-ঘেরা দ্বীপে যেখানে কোন মর্ত্যমানবের পদার্পণ ঘটে নি। সেখানে সম্রাট-প্রেরিত ঐন্দ্রজালিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে একটি আশার বাণী শুনিয়েছিলেন ইয়াং কুয়েই-ফেই।

ভবিষ্যতে এক শুভদিনে উভয়ের পুনর্মিলন হবে, কিন্তু প্রিয়তমাকে বিসর্জন দিয়ে অপকর্ম করেছিলেন সম্রাট, কালের পট থেকে মুছে যাবার নয় সে এমন দুষ্কৃতি, 'ক্ষয় নেই যে দুষ্কৃতির'।

সকল দেশেই নরনারীর প্রেম কাব্যের একটি প্রধান উপাদান, চীনা কবিতায় কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই আদিরসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। উপমা ও অলংকারের ব্যবহার সামান্য, প্রাচীন সাহিত্যের উল্লেখ ভূরি ভূরি। এই মারাত্মক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ট্যাং যুগে তেমন হয় নি, যেমন ঘটা ও ছটা করে ঐসব উপসর্গ দেখা দিয়েছিল মিং ও মাঞ্চু যুগে। চীনা পদ্যে প্রেমের স্থান নেই, তার কারণ বোধ করি এই যে প্রেমের বর্ণনা কনফুসীয় সুরুচিসম্মত নয়। তা ছাড়া অন্য কারণও আছে, চীনা সমাজব্যবস্থায় বিবাহযোগ্যা কন্যার জন্য পাত্র স্থির করেন পিতামাতা, পাত্র বা পাত্রীর মতামত গ্রহণ করা হয় না। বিবাহের পূর্বে পাত্রপাত্রীর সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ, এরূপ অবস্থায় পূর্বরাগ, অনুরাগ প্রভৃতি আবেগ-উচ্ছ্বাসময় কবিতা রচনা নিতান্তই অবাস্তব। তাই দাম্পত্য প্রেমের স্থলে চীনা পদ্য দুই বন্ধুর ভালোবাসাকেই বরণ করে নিয়েছে। বন্ধুত্ব, বন্ধুর প্রতি আকর্ষণ অল্পবিস্তর সকল দেশে থাকলেও চীন দেশে বন্ধুপ্রীতি পরস্পরের ওপর যেরকম অদ্ভুত দাবির সৃষ্টি করেছিল, এমনটি অন্য কোথাও হয়েছে কিনা সন্দেহ। এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয় যে সহপাঠীর ভরণপোষণের ভার দীর্ঘকাল অকাতরে বহন করেছে তারই এক সহৃদয় বন্ধু। এমন অবস্থায় বন্ধুপ্রীতির ফলে চীনা সামাজিক ও রাজনীতিক জীবন যে বন্ধুপোষণ প্রভৃতি দোষে কলুষিত হয়ে পড়েছিল, তার আশ্চর্য কি?

কবি-কল্পনা বন্ধুপ্রেমকে কেমন উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করে, চীনা সাহিত্যে তার দৃষ্টান্তের অভাব নেই। 'স্যান কুয়ো'র রোমান্স্, তিন বন্ধুর 'পিচ বাগানের শপথ', বন্ধুপ্রেমের এই বিচিত্র কাহিনীটি মিং যুগের গদ্য-রচনা, এই গ্রন্থের আলোচনা আমরা যথাকালে করব। ট্যাং যুগের কবিতায় দেখা যায় বন্ধুর বিদায়-বর্ণনা একটি বিশেষ বিষয়বস্তু, দাম্পত্য বিচ্ছেদের মত করুণ, প্রেমিক-প্রেমিকার বিরহবেদনার মতই মর্মে আঘাত করে। কবি লি পো বন্ধুর বিদায় উপলক্ষে একটি কবিতায় লিখেছেন:

উত্তর শিখরে ওই নীলাচল কাজলের লেখা,
নগরের পূর্বপ্রান্তে রজতের শুভ্র বাঁকা রেখা—

স্রোতে ভাসা ব্রততীব মত বন্ধু ছেড়ে যাবে মোরে,
সহস্র যোজন পথ অতিক্রমি দেশ-দেশান্তরে।
উডন্ত মেঘেব কোলে আমি যেন নিবখি তোমারে,
আরক্তিম অস্তরবি দেখি তুমি স্মবিও আমারে।
ঘন ঘন হাত-নাড়া বিদায়ের শেষ সম্ভাষণ—
অশ্ব হ্রেষারবে ডাকে, কণ্ঠে জাগে আবেগকম্পন।

গল্প-সাহিত্য

মানুষ গল্প শুনতে ভালবাসে মানবজাতির শৈশব থেকে, গল্প বলার আর গল্প শোনার আগ্রহ মানুষের সহজাত। ইতিহাসের গোড়া থেকেই চীনে গল্প লেখা চলে এসেছিল, খৃস্ট পূর্ব দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দে সোচুয়ান, সিকি প্রভৃতি গ্রন্থে মানুষের চরিত্রের বর্ণনা, মানুষের বিবোধের কাহিনী লেখা রয়েছে। গল্পে থাকে রসসৃষ্টির প্রয়াস। প্রেম, ভালবাসা, মমতা এমনি সব বিচিত্র রসেব অনুভূতি দরদী পাঠকের মনে চবিত্রগুলির নিখুঁত চিত্রার্পণেব মধ্য দিযে প্রতিফলিত করাই কথাসাহিত্যেব ধর্ম। ভাবতেব গুপ্তযুগের মত ট্যাং যুগ কাব্যের স্বর্ণযুগ, তখন চীনে শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভার উন্মেষ হযেছিল। কিন্তু শুধু কাব্যই নয়, গল্প-সাহিত্যও তখন ডিমেব খোসা ভেঙে তরুণ জীবনেব আলোকে ফুটে বেরিয়েছিল। সে যুগের বল-বীর্য সাম্রাজ্য বিস্তারের উদগ্র উৎসাহেব সঙ্গে লোকের কল্পনাও ছুটেছিল উধাও হযে, যেন তার কোন সীমা-পরিসীমা নেই, সম্ভব-অসম্ভবেব মাঝে সীমাবেখাটুকুও যেন মুছে গেছে, আর সেখানে তখন আসব জমিযে বসেছিল ভারতীয় বৌদ্ধদের অপরূপ কথিকাগুলি। এমনি কর্মচঞ্চল ভাবমুখব পটভূমিতে কথাসাহিত্যের সার্থক পরিণতি হয়েছিল সর্বপ্রথম ট্যাং যুগেই। উপন্যাস লেখা তখনো শুরু হয় নি। মিং ও মাঞ্চু যুগে বৃহৎ কাহিনী রচনার আগ্রহ ও উদ্যম জেগে উঠেছিল, কিন্তু সেসব উপন্যাসের উপাদান সংগ্রহ করা হয়েছিল ট্যাং যুগের ছোট গল্পগুলি থেকে। নাটক রচনা মোঙ্গল ইউয়ান যুগের একমাত্র সাহিত্যিক কীর্তি, কিন্তু সেই নাট্যকলার সূত্রপাত হয়েছিল ট্যাং সম্রাট মিং হুয়াং-এব পৃষ্ঠপোষকতার ফলে এবং সেজন্য এই সম্রাট আজও নাট্যসমাজের পূজনীয়।

অনেক ছোট গল্প রচিত হয়েছিল ট্যাং যুগে, সেগুলি কিন্তু লেখা হয়েছিল

চু'উযান-চু'ই বা পণ্ডিতী ভাষায, সুতরাং সাধারণ ব্যক্তির বোধগম্য ছিল না। হুযা পেন বা কথ্যভাষায কথিকা রচনা আরম্ভ হয়েছিল পরবর্তী সুং যুগে। ৯৮১ খৃস্টাব্দে বিগত কালের কথা ও কাহিনী সংগ্রহ করে তা' ইপ' ইং কুযাং চি নামে একটি প্রসিদ্ধ সংকলন গ্রন্থ লেখা হযেছিল, সেই গ্রন্থে ট্যাং যুগের কাহিনীগুলি হুয়া পেন বা কথ্যভাষায রূপান্তরিত হযে স্থান পেয়েছিল। এ যুগের শ্রেষ্ঠ গল্প-লেখকগণের মধ্যে দুজন পণ্ডিতের নাম করা যেতে পারে, একজন তাও দার্শনিক চ্যাং চি হো, অন্যজন প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ হ্যান ইউ। চ্যাং চি হো নিজেকে 'কুযাশা ও জলের বৃদ্ধ ধীবর' ("Old Fisherman of the Mists and Waters") এই নামে অভিহিত করতেন। কুযাশাচ্ছন্ন নদীর ধারে তিনি বসতেন ছিপ নিযে, বড়শিতে টোপ গাঁথতেন না, কেননা মাছ ধরা তার উদ্দেশ্য ছিল না। কেউ যদি তাঁকে তাঁর ভবঘুরে জীবন সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করত, তিনি অমনি জবাব দিতেন, "আকাশের চন্দ্রাতপতলে যার বাস, উজ্জ্বল চন্দ্রকিরণ যার সাথী, চতুঃসমুদ্র যার অন্তরঙ্গ বন্ধু, কোন যুক্তিবলে তাকে তোমরা বলবে ভবঘুরে? আমি বরঞ্চ বলাকাশ্রেণীর সঙ্গে মেঘলোকে বিহার করব, কিন্তু সংসারের ধূলি-আবর্জনাস্তূপের নিচে নিজের সমাধি রচনা কখনো করব না।"

প্রসিদ্ধ ট্যাং কবি ইউযান চেন-এর সুন্দর একটি প্রেমের গল্প যেন চীনা কথাসাহিত্যের মধ্যমণি, যেমনি তার ঝিকিমিকি তেমনি বিচিত্র তার বর্ণচ্ছটা। সম্ভবত কবি তাঁর নিজের জীবন কথাই লিখেছেন, কিন্তু লেখার ধরন এমন যে, মনে হয কাহিনীটি যেন অন্য কোন লেখকের রচনা। ইউযান ছিলেন একজন প্রতিপত্তিশালী রাজকর্মচারী, চরিত্রের খ্যাতি তার তেমন ছিল না। কিন্তু তা হলেও আত্মপ্রশস্তি না করে কেন যে তিনি প্রথম যৌবনের একটি কলঙ্কিত অধ্যায লিখতে প্রবৃত্ত হলেন সে কথা বোঝা কঠিন। ইউযানের তখন ছাত্রজীবন, কবিযশপ্রার্থী তিনি, অধ্যযনের জন্য সুদূর শহরে প্রবাসযাত্রার পথে মনোরম দৃশ্যসৌন্দর্যঘেরা কোন বৌদ্ধ মঠে কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন। পাশেই উদ্যান বাটিকার রম্য ভবনে এক তরুণীকে দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। সাক্ষাৎ-পরিচযের সুযোগ না পেযে মেযেটিকে তিনি একটি প্রেমের কবিতা লিখে পাঠান। গোপনে মিলন হল,

চলল প্রেমের অভিসার। তারপর একদিন বিদায়ের সময় এসে পড়ল। চোখের জলে শেষ হল বিদায়ের পালা। বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে কবি গেলেন শহরের শিক্ষায়তনে, সেখানে গিয়ে প্রতিশ্রুতি ভুললেন, উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে এক ধনীর কন্যাকে বিবাহ করলেন। গল্পে অভিসারিকা মেয়েটির প্রেমোন্মাদনায় তনু ভাসিয়ে দেবার তপ্ত বিবরণ আছে, কিন্তু সবচেয়ে সুন্দর চিত্রটি হল বঞ্চিতার আত্মসংযম। এই শান্ত সংযত কিন্তু দৃঢ় চরিত্রের পাশে ইউয়ানের কদর্য আচরণ বড়ই বীভৎস হয়ে উঠেছে, তা সত্ত্বেও তিনি যে প্রেমের কবিতাটি লিখে তরুণীর হৃদয় জয় করেছিলেন তার মধ্যে ফুটেছিল অসামান্য কবি-প্রতিভা, সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কবিতাটি এই :

আঙিনায় নীল আলোর ঝুরি,
তারার তন্দ্রাহারা আঁখি,
লুকিয়ে থাকে ছায়ার কোলে
ডাকে না আর সোনার পাখী।
বিপ্রলব্ধ প্রেমিক শুধু
গুণেই মরে একনাগাড়ে,
রক্তকমল পাপড়ি ভাসে
খুশ্ বাগিচার জলাধারে।
ভোরের পাংশু চাঁদের পানে
আমি কখন চেয়ে ছিলাম,
চাঁদমুখেরই স্বপন মাঝে
বিষাদ-মনে ডুব যে দিলাম।
দমকা হাওয়ায় দীপের শিখা
ক্ষীণ আশা মোর কেঁপে ওঠে,
হাতছানি দেয় ফুলের দোলা
মন ভোলানো হাসি ফোটে।

গল্প রচনা হত হরেকরকমের প্রেমকথা, ভূতের গল্প, অপরাধ-কাহিনী এমনি কত সব, কিন্তু ট্যাং যুগের কল্পনা রূপকথার মধ্যেই যেন তার মনের মত বিলাসকুঞ্জ খুঁজে পেয়েছিল। 'সিণ্ডারেলা' (Cinderella) নামে

একটি পরীর গল্প ইংরেজি সাহিত্যে অমর হয়ে আছে, এই ইউরোপীয় কাহিনীর আদিরূপ দিয়েছিলেন দেস্ পেরিয়ার্স (Des Perriers) ১৫৫৮ খৃস্টাব্দে। এই রূপকথাটির মতই একটি সিণ্ডারেলা কাহিনী ট্যাং কথা-সাহিত্য সংগ্রহে দেখা যায়, সংগ্রহকারীর নাম তুয়ান চ' এংসি, ৮৬৩ খৃস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। এখানেও আমরা পাই, সেই বিমাতার ঘরে অনাদৃতা সিণ্ডারেলা, সেই স্বর্গদূতের (ইংরেজি গল্পে পরীর) আবির্ভাব, সেই বেশভূষা পরে মেলায় যাওয়া, পাদুকা ফেলে আসা, শেষে রাজার সঙ্গে ইয়ে সিযেনের, অর্থাৎ সিণ্ডারেলার বিবাহ। ইংরেজি সিণ্ডারেলার সঙ্গে এই গল্পটির আশ্চর্য সাদৃশ্য, বিশেষত উভয় কথিকার মধ্যে পাদুকার বৃত্তান্তটি এমন এক যোগসূত্র স্থাপন করেছে যে তা দেখে মনে না করে উপায় নেই যে অষ্টম শতাব্দের এই প্রাচীন চীনা উপাখ্যানটির ছায়া অবলম্বনে—আর শুধু ছায়া বলি কেন, কায়ার প্রতিবিম্বরূপেই পাশ্চাত্ত্যের এই অপূর্ব পরীকথা রচিত হয়েছিল।

দার্শনিক হ্যান ইউ

চীনা ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ কনফুসীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে রাজনৈতিক হ্যান ইউ অন্যতম। তত্ত্বসন্ধানবিরোধী সম্পূর্ণ ব্যবহারিক তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী, তিনি ছিলেন কনফুসিয়াস ও সুং যুগের নব্য দার্শনিকদের মধ্যে যোগসূত্রবিশেষ। কনফুসীয় বাস্তবতার ঐতিহ্য নিয়ে তিনি সদর্পে বৌদ্ধ শ্রমণদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বিতর্কে তাদের পরাভূত করেছিলেন। কনফুসীয় নীতির উৎকর্ষ সম্বন্ধে শুধু প্রবন্ধ লিখে ক্ষান্ত হন নি তিনি, কার্যত তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছিলেন স্বয়ং একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল জনৈক শাসনকর্তা, সম্রাটের বাহুশক্তি এই উদ্ধত বিদ্রোহীকে শায়েস্তা করতে পারে নি, এমন ভীষণ শত্রুর শিবিরে একাকী উপস্থিত হয়ে তিনি তাকে ভর্ৎসনা করেছিলেন। তখন সেই বিদ্রোহীর মনে জাগল আত্ম-ধিক্কার, সে অস্ত্র ত্যাগ করল। ৮১৯ খৃস্টাব্দে সম্রাট মহাসমারোহে বুদ্ধদেবের একখণ্ড অস্থির সংবর্ধনা করলেন, সেই অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে হ্যান ইউ একটি স্মারকলিপি প্রস্তুত করেছিলেন। একটি শ্রেষ্ঠ পদ্য-রচনারূপে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সেই স্মারকলিপি। তাঁর অভিযোগের মর্ম এই: বুদ্ধ

পশ্চিম দেশের দেবতা, চীন সম্রাট তাঁর পূজা করেন নিজের দীর্ঘজীবন এবং রাজ্যের সুখশান্তির জন্য। বুদ্ধের আগমনের পূর্বে প্রাচীন কালের প্রসিদ্ধ রাজা হুয়াং তি, ইউ, ওয়েন, উ সকলেই ছিলেন দীর্ঘায়ু, দেশে অখণ্ড শান্তি বিরাজ করত। হ্যান সম্রাট মিং কর্তৃক এই বিদেশী ধর্ম আমদানির পর থেকে যুদ্ধবিগ্রহ, অরাজকতা দেখা দিয়েছে।···সম্রাট লিয়াং উ তি তিনবার বৌদ্ধ মঠে আত্মবিক্রয় করেছিলেন, সেজন্য কি পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি ?* বুদ্ধ একজন পশ্চিম দেশীয় বর্বর মাত্র, রাজা-প্রজার সম্বন্ধ ছিন্ন করে, বশংবদ পুত্রের পিতার প্রতি কর্তব্য বিস্মৃত হয়ে সংসার-ধর্ম ত্যাগ করেছিল। আজ যদি সে বেঁচে থাকত, যদি চীন দরবারে এসে উপস্থিত হত, তা হলে সম্রাট তাকে ভোজে নিমন্ত্রণ করতেন, উপঢৌকন দিতেন যথেষ্ট, কিন্তু জনগণের সংস্পর্শ থেকে দূরে রেখে তাকে প্রত্যন্ত সীমার পরপারে বিদায় করতেন।

সম্রাটের বৌদ্ধ অনুষ্ঠানের এই কঠোর প্রতিবাদের জন্য হ্যান ইউ-কে নির্বাসনদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সম্রাট মু সুং দণ্ড মকুব করে তাঁকে দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্যে নিযুক্ত করেছিলেন।

৬. ট্যাং শিল্প ঃ মুদ্রণ

ট্যাং যুগে শিল্প ও ধর্ম উভয় ক্ষেত্রেই একটি বিশ্বজনীন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। চাং-আন শুধু বাণিজ্যিক মিলনস্থান-রূপেই প্রসিদ্ধি লাভ করে নি, নানান ধর্মচর্চার তীর্থভূমি ছিল এই রাজধানী। ভারতবাসী, আরব, পারসীক, উইঘার, কোরিয়ান, জাপানী, বিভিন্ন জাতীয় মানুষের সহাবস্থান স্বভাবতই এখানে একটি উদার সহনশীল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল, আর তারই প্রভাব সারা দেশময় এমনিভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল যে কনফুসীয় পণ্ডিতগণের প্রবল বিরুদ্ধাচরণও জনসমাজে বৌদ্ধ কি তাও ধর্মের প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি। বস্তুত শেষোক্ত এই দুই ধর্ম জাতীয় প্রকৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছিল, ট্যাং শিল্পের প্রতি দৃষ্টিপাত

* শত্রু কর্তৃক পরাজিত হয়ে নিতান্ত হীন অবস্থায় মর্মান্তিক যন্ত্রণায় কারাগারে এই সম্রাটের জীবনান্ত ঘটে (৫৫০ খৃঃ)।

করলে বিষয়টি সহজেই উপলব্ধি করা যায়। বৌদ্ধধর্ম আগমনের পূর্বকালের চৌ ও হ্যান শিল্পের ওপর বিদেশীর অপরোক্ষ প্রভাব অল্পই দেখা গেছে, প্রত্যক্ষ প্রভাব আদৌ ছিল না বলা যায়। হ্যান যুগের শেষভাগে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে যে নূতন জীবনাদর্শের আবির্ভাব হয়েছিল সেই আদর্শ শুধু চীনাদের ধর্ম-চেতনাকেই প্রভাবিত করে নি, শিল্পক্ষেত্রে বিদেশী বৈদগ্ধ্যের অনুপ্রবেশ, রূপায়ণ-কল্পনারও পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। প্রাক্ বৌদ্ধ যুগে চীন দেশে মৃৎশিল্প কি প্রস্তর-শিল্প আদিম অপরিণত অবস্থাকে অতিক্রম করে নি। চীনা প্রস্তরশিল্পের পরিণত রূপ, যে রূপের সাক্ষাৎ মেলে কানসু-র পশ্চিম প্রান্তস্থিত তুন-হুয়াং গুহায়, সেই রূপ-সৌষ্ঠবের সৃষ্টি হয়েছিল পশ্চিমাঞ্চলের বিদেশী জাতিদের বিবিধ প্রকার শিল্পের সংমিশ্রণে—গান্ধারে গ্রীক-প্রবর্তিত গান্ধারশিল্প, পারস্যে সাসানিড্‌দের গ্রীকো রোমান শিল্প, ভারতে গুপ্তযুগের শিল্প ও মাথুর শিল্প।

ভাস্কর্য ও গুহামন্দির

চীন দেশের ভাস্কর্যের চরম উন্নতির যুগ ট্যাং রাজত্বের প্রথম শতাব্দে। হ্যান যুগের ঐতিহ্যের অনুসরণ করে পশুপক্ষী, গার্হস্থ্য জীবন প্রভৃতির প্রতিরূপ পাথরে উৎকীর্ণ করবার প্রথা কোন কোন স্থানে তখনো প্রচলিত ছিল, কিন্তু বৌদ্ধ মন্দিরসমূহে অনেক দেবদেবীর প্রস্তরমূর্তি খোদিত হয়েছিল, সেই মূর্তিগুলির গঠন-সৌষ্ঠবে, রেখার বিন্যাসে গান্ধারশিল্পের এবং পরবর্তী কালের গুপ্তযুগীয় শিল্পের আঙ্গিক বিশেষভাবে পরিস্ফুট। ট্যাং যুগের শিল্পে উচ্চাঙ্গের শৈলীর বিকাশ ঘটেছিল, বস্তুত সারা জগতের কয়েকটি শ্রেষ্ঠতম ভাস্কর্যের নিদর্শন এই সময়কার ট্যাং শিল্পে দেখা যায়। এই ভাস্কর্যে চীনা আঙ্গিক নাই, আছে ইরানী, গ্রীক ও ভারতীয় আঙ্গিকের প্রাচুর্য, এবং প্রাচীরগাত্রে চীনা অক্ষরে লিখনের অভাব থেকে এই অনুমান করা হয়েছে যে এইসব শিল্প হয়তো দেশীয় ভাস্করের সৃষ্টি নয়, বিদেশ থেকে, বিশেষত মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধ-প্রভাবিত অঞ্চল থেকে সমাগত ভাস্করগণই এই প্রস্তরশিল্প-বস্তুগুলির নির্মাণকর্তা।* এখানে বলা প্রয়োজন যে বৌদ্ধ ভাস্কর্য বহুলাংশে উত্তর চীনেই সীমাবদ্ধ ছিল, যদিও ইয়াংসি নদীর দক্ষিণে এই শিল্পের দৃষ্টান্ত

* Fitzgerald বলেন, "The frequent presence of Indian, Iranian and Hellenistic motifs in these sculptures, the corresponding absence of

যে দেখা যায় না তা নয়। দক্ষিণ দেশের এই ভাস্কর্য চীনা শিল্পীর সৃষ্টি, এবং এই দক্ষিণ দেশীয় শিল্পই সমুদ্রপথে কোরিয়া ও জাপানে প্রবেশ করেছিল এরূপ অনুমান করা হয়েছে। পক্ষান্তরে উত্তর চীনের ভাস্কর্য অধিকতর প্রাচীন। শ্যানসি প্রদেশে ইউন ক্যাং নামক স্থানে চীনের প্রাচীনতম গুহা-মন্দির, এই স্থানের নিকটেই ছিল পঞ্চম খৃস্টাব্দের তাতার তো-বা রাজবংশের রাজধানী তা-তুং ফু। পঞ্চম শতাব্দের শেষভাগে এখান থেকে রাজধানী লো ইয়াং নগরে স্থানান্তরিত হয়েছিল, এবং এই প্রাচীন শহরটির কাছে লুং মেন নামক স্থানে ওয়েই বা তো-বা সম্রাটেরা ইউন ক্যাং-এর অনুকরণে আর একটি গুহা-মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। এই গুহা-মন্দিরের শিল্প সম্পূর্ণভাবেই চৈনিক এবং তার মূল নিহিত ছিল চীনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে। ৬৭৬ খৃস্টাব্দে সম্রাজ্ঞী উ এখানকার গুহা-মন্দিরে বৈরোচন বুদ্ধের একটি বিরাটাকার মূর্তির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই বুদ্ধ-মূর্তি বজ্রবোধি ও অমোঘবজ্র প্রবর্তিত চেন-ইয়েন বা মন্ত্রায়ণ-পন্থীদের উপাস্য দেবতা। লুং মেন গুহা-মন্দিরের ভাস্কর্য ওয়েই বংশী, সুই বংশী এবং ট্যাং বংশী সম্রাটগণের পৃষ্ঠপোষকতায় ধারাবাহিকভাবেই পরিপুষ্ট হয়ে এসেছিল। সুই বংশের অনতিদীর্ঘ রাজত্বকালে এখানকার ভাস্কর্যশিল্প সর্বাধিক উৎকর্ষ লাভ করেছিল। সুই-কালীন বুদ্ধমূর্তি ধর্মীয় ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, গভীর ধর্ম-চেতনার প্রতিচ্ছবি। লুং মেন গুহার প্রাচীরগাত্রে অনেকগুলি অতিকায় মূর্তি উৎকীর্ণ রয়েছে।

সুই রাজত্বের পূর্বে বাস্তবতাবর্জিত ভাব-কল্পনার নির্দিষ্ট রূপায়ণই ছিল শিল্পের আদর্শ, সুই সম্রাটদের আমলে সেই বাঁধা-ধরা রূপাদর্শ বর্জন করে ভাস্কর্যের আঙ্গিক অনেকখানি স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। ট্যাং যুগে ভাস্কর্যের এই স্বভাবপ্রবণতা আরও অধিক পরিস্ফুট দেখা যায়। ও-মি-তো (অমিতাভ) বুদ্ধের নূতন পূজা-পদ্ধতি প্রবর্তিত হবার সঙ্গে ধর্মের পারত্রিক

characteristically Chinese motifs and the almost total lack of contemporary inscriptions in Chinese are strong indications that the artists who worked at Yun Kang were not Chinese, but foreigners, most probably Central Asiatics from Khotan and other places of Turkestan which were at that time strong Buddhist centres."

ভাব বা সংসারের অনিত্যতা-বোধ যেমন শিথিল হয়ে এসেছিল, শিল্পীরাও তখন আরাধ্য দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণে মানবতার কোমল রূপ দেহসৌষ্ঠবে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছে। ট্যাং সম্রাজ্ঞী উ হাও-র প্রভাব-প্রতিপত্তির সময়ে এই স্নিগ্ধ মানবতার দৈহিক প্রকাশ শিল্পের একটি বিশেষ অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। বোধিসত্ত্বকে নারীভাবে রূপায়িত করবার প্রেরণা জেগেছিল, এবং সেই ভাবটি পূর্ণতা লাভ করেছিল পরবর্তী স্থং যুগে যখন বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর, চীনা নাম কুয়ান ইন, সম্পূর্ণরূপে নারীমূর্তি ধারণ করেছিলেন। স্থং যুগের ভাস্কর্যে ম্যাডোনার মত কুয়ান ইন-এর ক্রোড়ে শিশুপুত্র দেখা যায়। বোধিসত্ত্বের এরূপ মাতৃত্ব-কল্পনার সঙ্গে মৌলিক বৌদ্ধধর্মের সংগতি নেই, সে কথা বলাই বাহুল্য।

সম্রাজ্ঞী উ-র মৃত্যুর পর বৌদ্ধধর্মের ওপর নির্যাতনের ফলে বহু মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল, সেই সঙ্গে মন্দিরের ভাস্কর্যও যে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বৌদ্ধধর্ম কিছুকাল-মধ্যেই পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু ধর্মীয় ভাস্কর্যের সেই যে পতন ঘটল আর তার পুনরভ্যুত্থান হয় নি। ট্যাং যুগের পর লুং মেন-এর মত বিরাট ভাস্কর্যের পুনরাবৃত্তি ঘটে নি। মুসলমানদের মধ্য এশিয়া ও পারস্য বিজয় পশ্চিমাঞ্চল ও ভারতবর্ষ থেকে নব নব ধর্মীয় রূপ-কল্পনার আগমনের পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। স্থং ও পরবর্তী বংশগুলির রাজত্বকালেও মন্দিরসমূহ শিল্পসজ্জায় অলংকৃত করা হয়েছিল বটে, কিন্তু সেই শিল্পে ওয়েই স্থই ও ট্যাং যুগের মত শিল্পীর প্রতিভা তেমন ফুটে ওঠে নি, আর প্রেরণার অভাবে শিল্পকলা নিতান্তই নৈষ্ঠিক হয়ে পড়েছিল। বস্তুত ভাস্কর্যের এই অধঃপতন কিছু আশ্চর্যের বিষয় নয়। চীন দেশে ভাস্কর্য একটি বিদেশী শিল্প। বিদেশ থেকে আগত এই শিল্পে ধর্ম-চেতনা যেমনই দেশী রূপ ধরুক না কেন, কলা-সৌষ্ঠবের উৎকর্ষ সত্ত্বেও ভাস্কর্যকে চীনারা কোন দিন উচ্চাঙ্গের শিল্প বলে গ্রহণ করে নি। চীনাদের 'লিউ আই' বা 'ছয় শিল্পে'র বর্ণনায় ভাস্কর্যের স্থান নেই।* ভাস্কর্য

* 'লিউ আই' বা 'ছয় শিল্পে'র বিষয়গুলি এই : (১) ধর্মানুষ্ঠান (rituals), (২) সংগীত-বিদ্যা, (৩) ধনুর্বিদ্যা, (৪) রথ-চালনা, (৫) লিখন-শিল্প (calligraphy) এবং (৬) অঙ্ক। লিখন-শিল্পের সঙ্গে চিত্রাঙ্কনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, সেজন্য চিত্রাঙ্কন (painting) শিল্পরূপে পরিগণিত। এই হিসাবে চিত্রাঙ্কনের স্থান ভাস্কর্য অপেক্ষা উচ্চে।

ছিল প্রধানত চীনা বৌদ্ধগণের ধর্মীয় আদর্শ-কল্পনার মাধ্যম, যদিও প্রাক্-বৌদ্ধ যুগেও বৃহৎ ব্রঞ্জ ও প্রস্তরমূর্তির কথা হ্যান সাহিত্যে উল্লেখ আছে। চীনা ভাস্কর্য কখনো প্রস্তরখণ্ডের 'গোলাকৃতি মূর্তি' সৃষ্টি করে নি, শুধু প্রস্তর-গাত্রে মূর্তি উৎকীর্ণ করেছে (bas-relief)। মূর্তিগুলি সবই দেবদেবীর, সেজন্য দৈবী ভাব-কল্পনাই অনেক ক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত স্বচ্ছন্দ মানবতার ঊর্ধ্বে স্থান পেয়েছে।

প্রাক্-বৌদ্ধ যুগ থেকে আর একটি শিল্প চলে এসেছিল, সেই শিল্প সমাধি-ভাস্কর্য। সম্রাটদের সমাধি-মন্দিরের প্রহরীস্বরূপ মনুষ্য ও পশুমূর্তি স্থাপিত হত, বিশেষত সিংহ ও পক্ষযুক্ত দানব-মূর্তি। সিংহ চীন দেশের জন্তু নয়, সুতরাং প্রশ্ন স্বভাবতই করা চলে, পশুরাজের রূপ-কল্পনা কোথা থেকে এসেছিল। আসিরিয়ার পশুমূর্তি ছিল অতিশয় জীবন্ত, বিশেষত সিংহমূর্তি, আর শিল্পের সেই জীবনীশক্তি পারস্য উত্তরাধিকার-সূত্রে পেয়েছিল। পারস্যের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সংযোগের ফলে চীন দেশের সিংহমূর্তি নির্মাণে আসিরীয় ও পারস্য প্রভাব এসে পড়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। সমাধিশিল্পে মনুষ্যমূর্তিগুলি নিতান্ত নির্জীব, অভিব্যক্তিহীন, সেই তুলনায় পশুমূর্তি প্রকৃতই শ্রেষ্ঠ। বৌদ্ধধর্মের আগমনের পর থেকে সমাধি-ভাস্কর্যের ক্রম-অবনতি ঘটে এসেছিল। এই অবনতির কারণ পিতৃপূজার বিলুপ্তি নয়, বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তন সত্ত্বেও পিতৃপুরুষের প্রাচীন পূজা-পদ্ধতি পূর্বাপর সমভাবেই চলে এসেছে। কিন্তু প্রস্তরশিল্প তখন সমাধিক্ষেত্র ছেড়ে রাজন্যবর্গ-সেবিত বৌদ্ধ মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল, সমাধি-ভাস্কর্যের অবনতি দেখা দিয়েছিল বোধ করি সেই কারণেই।

মৃৎশিল্প

পাথর ও ব্রঞ্জশিল্প ছাড়া মৃৎশিল্পেরও অনেক বস্তু সমাধি-গর্ভে দেখা যায়। মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ ছিল প্রাচীন পিতৃপূজার উপচার, নানান মাটির মূর্তি মন্ত্র-পূত করে প্রোথিত করা হত। সমাধি-মধ্যে সেই মূর্তিগুলি মন্ত্রশক্তির বলে তাদের পার্থিব প্রতিরূপের মতই জীবন্ত হয়ে উঠবে, মৃত পিতৃপুরুষের পরিচর্যা করবে এই ছিল সাধারণ বিশ্বাস। ওয়েই ও ট্যাং যুগের সমৃদ্ধ ব্যক্তিগণের মৃতদেহকে নর্তকী, ভৃত্য, প্রহরী, অভিনেতা, গণিকা প্রভৃতি মাটির মূর্তি দিয়ে

ঘিরে রাখা হত। অশ্ব, উষ্ট্র, বিদেশী সহিস ও রথচালকের মূর্তিসমূহ পারলৌকিক জগতে আত্মার দূর-যাত্রার সহায় হত। বাড়িঘর এবং প্রয়োজনীয় বিবিধ বস্তুর ক্ষুদ্রাকার মৃন্ময় প্রতিকৃতি, মৃতের ভোগের জন্য সমাধি-মধ্যে রক্ষিত এইসব জিনিস থেকে আমরা সে-কালের দেশী বিদেশী নানান জাতীয় লোকের মুখাকৃতি, বসনভূষণ, আরাম-বিরামের যেরূপ পরিচয় পেয়েছি তেমনটি কোন ঐতিহাসিকের বর্ণনায় খুঁজে পাওয়া যায় না।

ট্যা'ং যুগে এই সমাধি-মৃৎশিল্প বাস্তব রূপ-সৌষ্ঠবে প্রস্তর-ভাস্কর্যকে অতিক্রম করেছিল। সম্রাটেরা ভাস্কর্যের পৃষ্ঠপোষক, কিন্তু সেই শিল্প ছিল বিদেশী, আর মৃৎশিল্পের জন্ম দেশীয় পঙ্ককর্দমে, মৃৎশিল্পীর উৎসাহ যোগাত সর্বসাধারণ। প্রস্তরশিল্প যুগে যুগে মানুষের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, বিশ্বজনের জাগ্রত চোখের সামনে শিল্পী তার সৃষ্টির মধ্যে চিরকাল অমর হয়ে আছে। সমাধির মৃৎশিল্পীর সে সৌভাগ্য নেই, তার শিল্পসামগ্রী থাকে মাটির তলে প্রোথিত, কোনদিন যে সে শিল্প আত্মপ্রকাশ করে শিল্পীর গুণকীর্তন করবে এমন সম্ভাবনা নেই। আত্মপ্রচারের উদ্দেশ্য কি চির-অমরতার প্রেরণার অভাব সত্ত্বেও শিল্পীর হাতে-গড়া মূর্তিগুলিতে চঞ্চল হাস্যলাস্যময় জীবন্ত রূপচ্ছটা কিরূপে ফুটে বেরিয়েছে, সে কথা ভাববার বিষয়। সম্ভবত শিল্পে ছিল একটি ভিন্নরূপ ধর্ম-ভাবের প্রেরণা। নকল মূর্তিকে আসলের জীবন্ত আকৃতি দান করলে, মন্ত্রবলে নকল যখন আসল হয়ে ওঠে তখন আর উভয়ের মধ্যে আকৃতির কোন প্রভেদ থাকে না বলে সেই মূর্তির পরিচর্যায় পরলোকগত পিতৃপুরুষ প্রীত হয়ে থাকেন, এমনি কোন ধর্মবিশ্বাস শিল্পীর অন্তরে প্রেরণার সঞ্চার করা বিচিত্র নয়।

মৃৎশিল্পের একটি ব্যবহারিক রূপ 'পর্সিলেন' বা চীনামাটির বাসন। চীনের পর্সিলেন বিখ্যাত, সম্ভবত ষষ্ঠ কি সপ্তম শতাব্দে পর্সিলেন-এর প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তী কালের সুং যুগের পূর্বে এই শিল্পের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে নি। পর্সিলেন শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা সুং যুগের সংস্কৃতির বিবরণ প্রসঙ্গে করা হবে।

চিত্রাঙ্কন

ভাস্কর্য ও মৃৎশিল্প ছিল কায়িক পরিশ্রমের পর্যায়ভুক্ত, সেজন্য এই দুটি শিল্প কোন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির চর্চার বিষয় ছিল না। পক্ষান্তরে বিশিষ্ট

পণ্ডিতেরা এমন কি কোন কোন সম্রাটও চিত্রাঙ্কন-বিদ্যার চর্চা করতেন। পণ্ডিতসমাজে চিত্রাঙ্কনের অসাধারণ প্রতিষ্ঠার একটি বিশেষ কারণ ছিল। চীনের লিখন 'হায়রোগ্লাইফিক' বা চিত্র-লিখন, অক্ষর বা 'আইডিওগ্রাম' প্রত্যেকটি এক-একটি ছবি, তাই 'ক্যালিগ্রাফি' বা লিখন-বিদ্যা একটি শিল্পে পরিণত হয়েছিল। স্যাং ও চৌ-যুগের লিখন অস্থি ও ব্রঞ্জের ওপর খোদাই করা হত, লিখনগুলি ছিল কোণবিশিষ্ট, পরবর্তী কালের মত ব্রাশের চিত্রাঙ্কন নয়। হ্যান যুগে সেনাপতি মেং তিয়েন কর্তৃক উষ্ট্রলোমের ব্রাশ আবিষ্কারের পর থেকে রেশমের ওপর ব্রাশের লিখনগুলি রেখা-সৌষ্ঠবে চিত্র-রূপ পরিগ্রহ করেছিল। চিত্র-লিখনের সঙ্গে চিত্রাঙ্কনের চমকপ্রদ সাদৃশ্য, উভয় ক্ষেত্রে ব্রাশের ব্যবহার বিদ্যা দুটিকে আত্মীয়তা-সূত্রে বেঁধে দিয়েছিল। বস্তুত কালি-মাখা ব্রাশ দিয়ে চিত্র-লিখনের পদ্ধতি থেকেই চীনা চিত্রাঙ্কন-বিদ্যার সূত্রপাত, সেজন্য শিক্ষিত সমাজ প্রথমাবধি এই বিদ্যার অনুশীলন করেছিলেন। অশিক্ষিত ব্যক্তির চিত্রাঙ্কনে প্রধান বাধা ছিল এই যে লিখনক্ষম পণ্ডিতদের মত ব্রাশের ব্যবহারে পটুত্ব অর্জনের সুযোগ তাদের ছিল না। চিত্রবিদ্যা গণ্যমান্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণের বিশেষ অনুশীলনের বিষয় ছিল বলে ঐতিহাসিকেরা চিত্রকরদের জীবনী সযত্নে লিপিবদ্ধ করে গেছেন, মর্যাদায় কবির পরের স্থান অধিকার করেছে চিত্রশিল্পী, বিশেষত ট্যাং যুগে। এই কারণে প্রসিদ্ধ চিত্রকরদের নাম ও শিল্প-পরিচয় আমাদের অজ্ঞাত নয়। কিন্তু ভাস্কর্য ও মৃৎশিল্পের শ্রেষ্ঠ রূপকারদের আমরা চিনি না, জানি না, এই অনাদৃত অবজ্ঞাত সাধকদের জীবন অলিখিতই থেকে গিয়েছিল।

'ছয় রাজবংশে'র রাজত্বকালে বিভক্ত দেশের টুঙ্গু-অধিকৃত উত্তরখণ্ডেই হোক কি চীনাদের দক্ষিণখণ্ডেই হোক নানারূপ অরাজকতার মধ্যেও বৌদ্ধ-ধর্মের প্রভাবে শিল্পের চর্চা অব্যাহতভাবে চলেছিল। শিল্পচর্চায় উৎসাহ দান করতেন ন্যানকিং-এর শাসকেরা, শিল্পীরা বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদের চিত্র অঙ্কিত করত। এই সময়ে কু কা'ই-চি (৩৪৪-৪০৬) নামক জনৈক চিত্রকর অনেক ধর্মীয় চিত্র মন্দিরগাত্রে অঙ্কিত করেছিলেন, মন্দির-ধ্বংসের সঙ্গে সেগুলি বিনষ্ট হয়েছে। মন্দির আর নেই, এ যুগের রূপদর্শীদের চিত্র-সমালোচনা থেকেই চিত্রাঙ্কনের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দে সিয়ে হো নামে একজন চিত্রশিল্পী একখানা বই লিখেছিলেন, অঙ্কনবিদ্যা সম্বন্ধে সেইটেই প্রথম

গ্রন্থ। রূপ-সৃষ্টির 'ছয়টি লক্ষণে'র ("six canons") নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি, চিত্রাঙ্কনে সেই লক্ষণগুলি মিলিয়ে দেখে গুণাগুণ বিচারের ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই ছয়টি গুণ এইরূপ : (১) ছন্দের প্রাণবন্ত রূপ, (২) দেহের প্রাত্যঙ্গিক সৌষ্ঠব, (৩) প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য, (৪) বর্ণচ্ছটার বিন্যাস, (৫) শৈল্পিক লাবণ্য, (৬) সমাপ্তি। সিয়ে হো এই লক্ষণগুলির বিশদ বর্ণনা করেন নি। মিং ও মাঞ্চু যুগের চিত্রশিল্পীরা তাঁদের দোষগুলিকে হয়তো বর্জন করতে পারতেন যদি তাঁদের দৃষ্টি এই লক্ষণগুলির দিকে বিশেষভাবে নিবদ্ধ থাকত।

চীনাদের ঐতিহাসিক বিবরণে মন্দির নির্মাণ ও মন্দির ধ্বংসের সংখ্যা দেওয়া হয়েছে, কেবলমাত্র সুই যুগের কয়েক দশকে অন্যূন ৩৭৯২টি মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল। মন্দিরের প্রাচীরগাত্রে চিত্র অঙ্কিত করা হত, দেবদেবীর চিত্র, যেমন ও-মি-তো (অমিতাভ), কুয়ান-ইন (অবলোকিতেশ্বর), সেসব ছবি এখন আর নেই। সুই যুগের একজন প্রখ্যাত শিল্পী ছিলেন ওয়েই চি-পো-চি-না, তিনি মধ্য এশিয়ার মানুষ। এই সময় তিনজন ভারতীয় চিত্রকরও চীন দেশে এসেছিলেন। ভাস্কর্যে রূপের আয়তন-ত্রয় (three dimensionality) আর চিত্রে মূর্তিগুলির সংস্থান ও ভঙ্গীর বৈচিত্র্য, এসব বিদেশীদের অবদান। সুই-শিল্পের মত ট্যাং প্রাচীরচিত্রগুলিও লোপ পেয়েছে সে যুগের ব্যাপক মন্দির-ধ্বংসের ফলে। কিন্তু চীন প্রত্যন্তের তুন হুয়াং গুহায় ও নিকটস্থ ওয়ান ফো-সিয়া মন্দিরে অষ্টম ও নবম শতাব্দের চিত্রশিল্প এখনো সুরক্ষিত অবস্থায় বিদ্যমান। ও-মি-তো-র স্বর্গভূমির চিত্র, কেন্দ্র সংস্থানের পিছনে দিগন্তের বিস্তার, দৃশ্যপটের ফাঁকে হর্ম্যরাজি, চিত্র-দর্শনে ধর্মভাবের চেয়ে রাজ-দরবারের অতুলনীয় বৈভবের স্মৃতিই মনে জাগিয়ে তোলে, চিত্রে সেই বৈভবই যেন আনন্দ-রূপে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তুন হুয়াং-এর গুহাসমূহে এই শ্রেণীর চিত্রের বিবিধ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। চেন ইয়েন-পন্থীদের একটি চমৎকার দেবদেবীর চিত্র তুন হুয়াং-এর ওয়ান ফো-সিয়া মন্দিরে দেখা যায়। দৃশ্যপটের পুরোভাগের দৃষ্টিকেন্দ্রে অবস্থিত কয়েকটি বৌদ্ধ দেবতার মূর্তি, মধ্যস্থলে পি-লু-ফো (বৈরোচন বুদ্ধ), দক্ষিণ দিকে সিংহপৃষ্ঠে আসীন ওয়েন-সু (মঞ্জুশ্রী) এবং বাম দিকে হস্তীর ওপর সমারূঢ় পু-সিয়েন (সামন্তভদ্র)। চিত্রে বৈরোচন বুদ্ধের মুখমণ্ডলে

দিব্য প্রশান্তি পরিব্যাপ্ত, পাশের দেবদেবী, পশু, পশুরক্ষক সবই যেন জীবন্ত। চীনা শিল্প-জীবন থেকে আরও দূরে মধ্য এশিয়ার তুরফান নামক স্থানে তুন হুয়াং-এর মতই মন্দিরের প্রাচীর-গাত্রে চিত্রাবলী অঙ্কিত রয়েছে। তুন হুয়াং ও তুরফান এই দুই স্থানে কেবল যে প্রাচীরচিত্রই দেখা যায় তা নয়, রেশম ও কাগজের ওপর আঁকা চিত্রও আবিষ্কৃত হয়েছে। তুরফানে ট্যাং যুগীয় শিল্পের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন কিরীটি-পরিশোভিত 'বোধিসত্ত্ব-মস্তক' রেশমের ওপর চিত্রিত। তুরফানে তেমনি রেশমের ওপর 'আঁকা ক্রুদ্ধ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী'র চিত্রটিতে একজন পরম শক্তিমান শিল্পীর অসামান্য প্রতিভা ফুটে বেরিয়েছে।

মন্দির-শিল্পের দেবদেবী ছাড়াও এ যুগের চিত্রাঙ্কনের বিষয়বস্তু ছিল ইতিহাসের, বিশেষত রাজ-প্রাসাদের ঘটনাবলী। প্রাসাদ-সভার চিত্রে নারীকে উপেক্ষা করা হয় নি। মানুষের দৈনন্দিন জীবন, গাড়ি-ঘোড়া সবই অঙ্কিত হত, কিন্তু দৃশ্যপট অঙ্কনের ওপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল।

ট্যাং যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর উ তাও-জু, তাঁকে চীনের 'র‍্যাফেল' বলা হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কনে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত, তা ছাড়া বৌদ্ধ ও তাও ধর্ম বিষয়ক চিত্রাবলীও অঙ্কিত করেছেন। সম্রাট মিং হুয়াং-এর রাজসভার উজ্জ্বল রত্ন এই চিত্রকর সম্বন্ধে একটি উপকথা আছে: সম্রাটের প্রাসাদ-প্রাচীরে তিনি একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য এঁকেছিলেন। সভাসদগণের মধ্যে কয়েকজনের এই চিত্র সম্বন্ধে বিরূপ সমালোচনা শুনে তিনি চিত্রটির সামনে দাঁড়িয়ে হাততালি দিলেন। অমনি সেই দৃশ্যপট দু' ভাগ হয়ে গেল, আর তিনি সেই পটের মধ্যে প্রবেশ করলেন। বিস্মিত সম্রাট ও সভাসদগণ কর্তৃক তাঁকে ফিরিয়ে আনবার উদ্যোগের পূর্বেই দ্বিধাবিভক্ত পট বন্ধ হয়ে গেল, শিল্পীও চিরকালের জন্য অদৃশ্য হলেন। চাং-আন ও লো-ইয়াং-এর মন্দিরসমূহের প্রাচীরচিত্র এই শিল্পীর প্রধান কীর্তি। তিনি বাস্তবতার অনুসরণ করতেন, যদিও প্রাচীন পদ্ধতি বর্জন করেন নি। কল্পনা ও শৈলী-কুশলতা—তিনি ছিলেন এই উভয় গুণের অধিকারী।

প্রথম ট্যাং সম্রাটের প্রপৌত্র লি স্সু-স্সুন প্রাক-সুং যুগের একজন বিখ্যাত দৃশ্যপটশিল্পী। লি স্সু-স্সুন ও তাঁর বন্ধু ওয়াং ওয়েই 'উত্তর শিল্পায়তন'

(Northern School) ও 'দক্ষিণ শিল্পায়তন' (Southern School) নামক দুইটি শিল্পধারার প্রবর্তক। প্রকৃতপক্ষে উত্তর ও দক্ষিণ শিল্পায়তন এই দুইটি নাম অর্থহীন। শিল্পপদ্ধতি দুটির কোন ভৌগোলিক বাসস্থান ছিল না, এমন কি 'দক্ষিণ শিল্পায়তনে'র প্রতিষ্ঠাতা ওয়াং ওয়েই দক্ষিণ চীনের অধিবাসীও ছিলেন না, তাঁর জন্ম উত্তর চীনের সানসি প্রদেশে। আসলে, সংখ্যাবাচক শব্দ যেমন 'শত দর্শন প্রতিষ্ঠান' কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা বোঝায় না, তেমনি শিল্পের উপরোক্ত নাম দুটিও কোন ভৌগোলিক অবস্থানের ইঙ্গিত করে না, লি সু-সুন ও ওয়াং ওয়েই প্রবর্তিত দুটি বিভিন্ন শিল্পপদ্ধতি বোঝায়।

উ তাও-জু-র বন্ধু ছিলেন ওয়াং ওয়েই, একাধারে কবি, কর্মচারী, চিকিৎসক ও চিত্রকর। বিবিধ বিদ্যায় তাঁর এই পারদর্শিতা প্রখ্যাত ইতালীয় শিল্পী লিওনার্দো দা ভিনসি-র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ওয়াং ওয়েই ছিলেন বৌদ্ধ, বিবিক্ত-দেশসেবী। রাজদ্রোহী আন-লু-সান-এর যুদ্ধে যোগদান করে পরিশেষে তাঁকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল। প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কনে কৃতিত্বের জন্য তিনি প্রসিদ্ধ।

ওয়াং ওয়েই-র বন্ধু হ্যান-কান ছিলেন অশ্বের চিত্রাঙ্কনে সিদ্ধহস্ত। চ্যাং সুয়ান আঁকতেন নারীমূর্তি। ট্যাং সম্রাট মিং হুয়াং-এর রাজসভার দুই শিল্পী ছিলেন হ্যান-কান ও চ্যাং সুয়ান। রাজবংশীয় দৃশ্যশিল্পী লি সু-সুন-এর পুত্র লি চাও-তাও পিতার শিল্প-কুশলতাকেও অতিক্রম করেছিলেন। তাও ও বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক চিত্র এবং ঐতিহাসিক দৃশ্যাবলী অঙ্কিত করতেন ইয়েন লি তে ও তাঁর ভ্রাতা ইয়েন লি পেন। উভয়েই ছিলেন উচ্চ রাজকর্মচারী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। বৃক্ষ, পুষ্প, পক্ষী, পতঙ্গ, নানা জীবের অনেক সুন্দর ছবি আঁকা হয়েছে, সকল চিত্রশিল্পীর নামের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। ট্যাং যুগের অনেক চিত্রই ধ্বংস হয়েছে। কয়েকটি চিত্র এখনো বিদ্যমান, সেগুলি বিখ্যাত শিল্পীদের মৌলিক সৃষ্টি, এইরূপ বলা হয়ে থাকে।

মুদ্রণশিল্প

জগতের একটি বৈপ্লবিক ব্যবহার-শিল্পের আবির্ভাব হয়েছিল চীন দেশে ট্যাং বংশীদের রাজত্বকালে, সেই শিল্প মুদ্রণ-শিল্প। তুন হুয়াং গুহা থেকে

জগতের প্রাচীনতম ছাপা-গ্রন্থ উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রন্থটি একটি বৌদ্ধ সূত্র, ৮৬৮ খৃস্টাব্দে কাঠের ব্লক থেকে মুদ্রিত, সর্বসাধারণকে বিতরণের জন্য।* গ্রন্থ বিতরণ পুণ্য কার্য মনে করা হত। মুদ্রণ সর্বপ্রথম কখন আরম্ভ হয়েছিল সে বিষয়ে সঠিক বলা যায় না, তবে স্থই যুগ থেকে মুদ্রণের প্রচলন এরূপ অনুমান যুক্তিসংগত। সম্ভবত সিলমোহর বা মুদ্রার বিবর্তনরূপেই মুদ্রণ দেখা দিয়েছিল। হ্যান যুগে কনফুসীয় গ্রন্থাবলী পাথরে খোদাই করে রাখা হয়েছিল, তারপর ১০৫ খৃস্টাব্দে কাগজ প্রস্তুত হল, সেই সময় থেকে কাগজের ওপর তুলি দিয়ে লেখা চলে আসছিল, অবশ্য তার পূর্বে রেশমের ওপর লেখা হত। কাঠের ব্লক দিয়ে মুদ্রণকার্যের সূত্রপাতের সঙ্গে কনফুসীয় প্রাচীন গ্রন্থরাজি ছাপা হল। যেমন ইউরোপে তেমনি চীনে ছাপার কাজের প্রথম ব্যবহার হয়েছিল ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। ধর্মের বাণী কানে শোনায় পুণ্য আছে, ছাপার অক্ষরে ধর্মের বাণীকে চোখে দেখাও তেমনি একটি পুণ্য কর্ম, সম্ভবত এমনি কোন ভাবই মুদ্রণের প্রথম প্রেরণা যুগিয়েছিল। কিন্তু ধর্মগ্রন্থ ছাপানো ছাড়া আর একটি ক্ষেত্রে মুদ্রণের ব্যবহার অচিরে শুরু হয়ে গেল। ৯৬৯ খৃস্টাব্দে বা তৎপূর্বেই খেলার তাস মুদ্রিত হয়েছিল, খেলার তাস সর্বপ্রথম ছাপানো হয় চীন দেশে, সেখান থেকে ইউরোপে আবির্ভাব হয় ষোড়শ খৃস্টাব্দে। স্থং যুগে কাগজের নোট ছাপানোর কাজে মুদ্রণ-শিল্পের ব্যবহার অর্থনীতির গুরুভার অনেকটা লাঘব করেছিল।

চীন দেশে ব্লক প্রস্তুত ও গ্রন্থ মুদ্রণ একটি জাতীয় শ্রমশিল্পে পরিণত হয়েছিল। একাদশ শতাব্দে কর্দমের সঙ্গে আঠা মিশিয়ে ছাপার টাইপ প্রস্তুত

* ১৯০৭ খৃস্টাব্দে প্রত্নতাত্ত্বিক স্যর অরিয়ল স্টিন তাও-পুরোহিতদের অনুমতি নিয়ে তুন হুয়াং-এ 'সহস্র বুদ্ধের গুহা'র অভ্যন্তর অনুসন্ধান করেন। ১০৩৫ খৃস্টাব্দে এই গুহার একটি অংশ প্রাচীর তুলে বন্ধ করা হয়েছিল, সেই অংশ বন্ধ অবস্থায় ছিল ১৯০০ খৃঃ পর্যন্ত। সেখানে ১১৩০টি কাগজের বস্তা পাওয়া যায়, প্রতি বস্তায় গোটা ১২ পাণ্ডুলিপির তাড়া (rolls)। কাগজগুলি ছিল সুরক্ষিত, বস্তাগুলির মধ্যে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মুদ্রিত পুস্তক 'হীরক সূত্র' আবিষ্কৃত হয়েছে, তার ওপরে ছাপার অক্ষরে লেখা: "ওয়াং চিয়ে কর্তৃক (গণনানুসারে আধুনিক তারিখ) ১১ই মে ৮৬৮ খৃস্টাব্দে পিতামাতার সশ্রদ্ধ পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে সর্বসাধারণকে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য মুদ্রিত।" গুহায় পাণ্ডুলিপিগুলির সঙ্গে আরও কয়েকখানা মুদ্রিত গ্রন্থ পাওয়া গিয়েছিল।

করা হয়, আর সেই টাইপ পুড়িয়ে শক্ত করে বসানো হয় লোহার পাতের ওপর। পরে আঠা ও কাদার পরিবর্তে তাম্রনির্মিত টাইপ প্রস্তুত করা হল, তখনই দেখা দিল আধুনিক মুদ্রণ। ইতিমধ্যে চীনা আবিষ্কার বাণিজ্য-পথ ধরে পশ্চিম জার্মানির গটেনবার্গ নগরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, কিন্তু সে আরও কয়েক শতাব্দ পরের কথা। এখানে উল্লেখযোগ্য একটি বিষয় এই যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে চীন সাম্রাজ্যে মুদ্রিত গ্রন্থের সংখ্যা ছিল সারা পৃথিবীতে ছাপা বইয়ের সমষ্টির চেয়েও অধিক।

এই প্রসঙ্গে চীনের আর একটি অবদানের কথা বলা আবশ্যক, সেটি চা-পানের অভ্যাস। চীনে চা পান আরম্ভ হয়েছিল বহু পূর্বে, ষষ্ঠ খৃস্টাব্দে দক্ষিণ অঞ্চল থেকে এসে উত্তর চীনে চায়ের ব্যবহার ছড়িয়ে পড়েছিল। 'চা' শব্দটি চীনা, কবিরা প্রথম পেয়ালা, দ্বিতীয় পেয়ালা, তৃতীয় পেয়ালা, উপর্যুপরি চা-পানের মৌতাত-মাহাত্ম্য কীর্তন করে কবিতা লিখতে অবহেলা করেন নি। ৭৮০ খৃস্টাব্দে জনৈক লেখক 'চা সাহিত্য' ('Tea Classic') নামক গ্রন্থে এই কবিত্বপূর্ণ রসোত্তীর্ণ বর্ণনাটি দিয়েছেন: "সবচেয়ে ভাল চা পাতার ভাজ তাতার অশ্বারোহীর বুট জুতোর ভাঁজের মত, বলিষ্ঠ বৃষের গলার ঝুলন্ত চামড়ার মত কোঁকড়ানো, সেই ভাজ মেলতে থাকে কুণ্ডলী পাকানো নদীর কুয়াশার মত, বাতাসে দোল-খাওয়া হ্রদের মত ঝকঝকে বর্ষণসিক্ত মাটির মত নরম।"

ষষ্ঠ পর্ব

রাজনৈতিক দুর্যোগ ও বর্ণোজ্জ্বল সংস্কৃতির কথা

১. 'পঞ্চ রাজবংশ' (৯০৭-৯৬০ খৃঃ)

হ্যান বংশের পতনের পর দেশ যখন খণ্ডবিখণ্ড হয়ে পড়েছিল, সংযুক্ত মহাচীনের আবির্ভাব হতে তখন লেগেছিল চার শতাব্দকাল, এবার কিন্তু অল্প কয়েকটি দশকের শেষেই সমগ্র চীন জুড়ে সুং সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। ট্য'াং বংশের তিরোধান ও সুং বংশের অভ্যুত্থান এই দুটি ঘটনার মধ্যবর্তী কিঞ্চিদূর্ধ্ব পঞ্চাশ বছরকাল চীনা ঐতিহাসিকেরা 'পঞ্চ রাজবংশের যুগ' বলে অভিহিত করেছেন। আসলে কিন্তু কেবলমাত্র পাঁচটি রাজবংশ নয়, অনেক অধিকসংখ্যক নৃপতি নানা বংশের দাবি নিয়ে পর পর রাজত্ব করেছিলেন। এমন কি প্রদেশপালগণ ও সৈন্যাধ্যক্ষরাও স্বাধীনতা ঘোষণা করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বংশগুলির ঘন ঘন উত্থানপতন ঘটেছিল উত্তর চীনে, দক্ষিণ অঞ্চলে পরিবর্তন তেমন দেখা যায় নি। উত্তর চীনে যে পাঁচটি রাজবংশ অল্প কিছুকালের জন্য সামরিক একনায়কত্ব স্থাপনে সমর্থ হয়েছিল, সেই বংশগুলির নাম ও রাজত্বকাল এইরূপ :

উত্তরকালের বা নব লিয়াং বংশ—
রাজত্ব সতর বৎসর (৯০৭-৯২৩)

উত্তরকালের বা নব ট্য'াং বংশ—
রাজত্বকাল চোদ্দ বৎসর (৯২৩-৯৩৬)

উত্তরকালের বা নব সিন বংশ—
রাজত্বকাল বারো বৎসর (৯৩৬-৯৪৭)

উত্তরকালের বা নব হ্যান বংশ—
রাজত্বকাল চার বৎসর (৯৪৭-৯৫১)

উত্তরকালের বা নব চৌ বংশ—
রাজত্বকাল দশ বৎসর (৯৫১-৯৬০)

এইসব ক্ষীণায়ু রাজবংশের সম্রাটেরা প্রকৃতপক্ষে ছিলেন সামরিক নেতা, অধিকাংশই বর্বরজাতীয়। সম্রাটের দাবি নিয়ে পুরাতন রাজধানী অঞ্চলকে

কেন্দ্র করে তাঁরা রাজত্ব করতেন বটে, কিন্তু তাঁদের প্রভুত্ব কখনো সমগ্র চীন দেশের ওপর প্রসারিত হয় নি। বস্তুত তাঁদের রাজত্ব সীমাবদ্ধ ছিল বর্তমান সেনসি সানসি হোনান হোপেই এবং সানটাং প্রদেশের মধ্যে। আমরা দেখেছি ট্যাং রাজত্বের অবসানে উত্তরকালীন লিয়াং বংশের প্রতিষ্ঠাতা চু ওয়েন যখন সম্রাট হয়ে বসলেন, তখন তাঁর বিরুদ্ধে প্রদেশপালরা যুদ্ধ করে নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। চীনের প্রথামত রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত পঞ্চ বংশের শাসকগণ সম্রাট বলে পরিগণিত হলেও তাঁরা কখনো সেইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যগুলিতে কেন্দ্রীয় অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দের প্রারম্ভে চীনের উত্তর ও উত্তর-পূর্বে এখন যে দেশকে বলা হয় মোঙ্গলিয়া ও মাঞ্চুরিয়া, এই দুটি দেশে একটি নূতন বর্বর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, রাষ্ট্রটির নাম লিয়াও। এই অঞ্চলে এরূপ রাষ্ট্রগঠন ইতিপূর্বে আরও দেখা গেছে, চীনের নদী-উপত্যকার উর্বর ভূমিতে সেইসব রাষ্ট্রের আক্রমণ বরাবর চলেছিল। এখন যে জাতি রাজ্য স্থাপন করেছিল সেই জাতির নাম খিতান। চীনা ইতিহাসে এই জাতির সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ৬৯৬ খৃস্টাব্দে। আটটি দলে বিভক্ত জাতি, দলের প্রধানরা একজন অধিনায়ক ("Great Khan") নির্বাচন করতেন, তিন বছর পর নির্বাচিত অধিনায়কের পদত্যাগ করাই ছিল নিয়ম। দশম শতাব্দের প্রারম্ভে এই নিয়ম ভঙ্গ করলেন আপাওকি নামে একজন অধিনায়ক নির্ধারিত কালের পর পদত্যাগ করতে অস্বীকার করে। তারপর অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে তিনি সম্মিলিত খিতান জাতির বংশানুক্রমিক নৃপতি হয়েছিলেন। ৯১৬ খৃস্টাব্দে শেষ ট্যাং সম্রাটের মৃত্যুর পর তিনি নিজেকে 'সম্রাট' বলে অভিহিত করেছিলেন।

খিতানরা মোঙ্গল ভাষাভাষী তুঙ্গু বা তাতারজাতীয় মানুষ। তারা যে শুধু চীনের ত্রাসরূপে প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থান করছিল তা নয়, দ্বাদশ শতাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় দুই শত বৎসর জুড়ে খাস চীন দেশের কিয়দংশ বলপূর্বক নিজেদের দখলে রেখেছিল। মধ্যযুগের ইউরোপে চীনের নাম ছিল 'কাথে' (Cathay), 'খিতান' এই জাতিবিশেষের নাম থেকেই 'কাথে' শব্দের উৎপত্তি। খিতানরা ছিল পশুপালক জাতি, কিন্তু চীনাদের সংস্পর্শে এসে যাযাবর জাতির অভ্যাসগুলি অনেকটা বর্জন করেছিল। চীনাদের থেকে

সম্পূর্ণ পৃথক তাদের সংস্কৃতি এবং নিজেদের সংস্কৃতি তারা বিশুদ্ধ রাখতে চেষ্টা করত চীনাদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক পরিহার করে। চীনা গ্রন্থ পাঠ বা চাকরি-পরীক্ষা দেওয়া তাদের পক্ষে ছিল নিষিদ্ধ। মহাপ্রাচীরের দক্ষিণ দিকে অধিকৃত স্থানে চীনা প্রজাদের ওপর ভারি রকমের ট্যাক্স বসানো হত, কিন্তু চীনাদের নিজেদের প্রথামত জীবনযাত্রার ওপর অন্য কোন উপায়ে হস্তক্ষেপ করা হয় নি। চীন দেশে পঞ্চ রাজবংশীদের আমলের ও পরবর্তী কালের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অনিশ্চিত পরিস্থিতিকে খিতানরা কিরূপে জটিল করে তুলেছিল আমরা এখনি তা দেখতে পাব।

নব লিয়াং বংশের প্রতিষ্ঠাতা চু ওয়েন নিজের পুত্রেব হস্তে নিহত হন। পিতৃহন্তা পুত্র আত্মহত্যা করে। এই বংশের উচ্ছেদ করেন কৃষ্ণপরিচ্ছদ-ধারী তুর্কী 'কাক'-দের ("Crows") সেনাপতি লি কো-ইয়াং-এর পুত্র লি স্থন স্থ। ট্যাং বংশের পতনের পর 'কাক'-সেনাপতি লি কো-ইয়াং বর্তমান সানসিতে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং চু ওয়েনের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করেছিলেন। লি স্থন স্থ-র নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যের রাজধানী ছিল লো-ইয়াং। বংশের নাম দেওয়া হয়েছিল নব ট্যাং বংশ, যেহেতু পুরাতন ও নূতন দুই ট্যাং বংশের প্রতিষ্ঠাতা একই 'লি' নামে পরিচিত।

৯৩৬ খৃস্টাব্দে সি চিং ট্যাং নামে জনৈক সেনাপতি রাজবংশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে খিতান জাতির সাহায্যে নব ট্যাং বংশের উৎসাদন করেন, এবং স্বয়ং সম্রাট হয়ে সিংহাসনে বসেন। তিনি যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই বংশের নাম নব সিন বংশ। সি চিং ট্যাং ছিলেন খিতানদেব একান্ত বশংবদ, খিতান-রাজকে 'পিতা সম্রাট' বলে সম্বোধন করতেন, এবং তাঁকে প্রভূত কর প্রদান করতেন। তা ছাড়া তিনি উত্তর-পূর্ব প্রান্তে পিকিং থেকে মহাপ্রাচীর পর্যন্ত একটি বিরাট ভূখণ্ড এবং মোঙ্গলিয়া ও হোপাই-র মধ্যবর্তী ইন-সান গিরিবর্ত্ম খিতান-রাজের হস্তে সমর্পণ করেছিলেন। এইরূপে বহিরাঞ্চল থেকে উপত্যকা ভূমিতে যাযাবর জাতির আগমনের পথ বেঁধে দেওয়া হয়েছিল, এবং এই ব্যবস্থার প্রথম সুযোগ মোঙ্গলেরা গ্রহণ করেছিল কয়েক শতাব্দী পরে। নব সিন বংশের প্রথম সম্রাট লো-ইয়াং শহর থেকে কাই ফেং ফু নগরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন। সুং বংশীরা তাঁদের রাজধানী এই শহরেই বজায় রেখেছিলেন।

সি চিং ট্যাং-এর পুত্র খিতানদের প্রভাব থেকে রাজ্যকে মুক্ত করবার চেষ্টা করলেন, ফলে এই দুর্ধর্ষ জাতি কর্তৃক দেশ বিধ্বস্ত, ধনসম্পদ লুণ্ঠিত হল। সম্রাট সপরিবারে বন্দী হলেন, তারপর তাঁদের রজ্জবদ্ধ অবস্থায় তাতার দেশে নির্বাসিত করা হল। খিতানরা লিউ চি ইউয়ান নামে সিন-রাজের একজন সেনাপতিকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করলেন (৯৪৭ খৃঃ)। নূতন বংশের নাম নব হ্যান বংশ, রাজত্বকাল মাত্র চার বৎসর। বংশের দ্বিতীয় সম্রাটকে হত্যা করে তাঁর সেনাপতি কাও সিংহাসনে আরোহণ করলেন (৯৫১ খৃঃ)।

সেনাপতি কাও সম্রাটরূপে অধিষ্ঠিত হয়ে নব চৌ বংশ প্রতিষ্ঠিত করলেন, কিন্তু বিচ্ছিন্ন খণ্ডিত সাম্রাজ্যে শান্তি স্থাপনের পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হল। তাঁর পুত্র সি সুং (৯৫৪-৯৬০) সুদক্ষ শাসক ছিলেন, কিন্তু তিনিও সাত বছরের একটি পুত্র রেখে অকালে মারা গেলেন। সেই সময় একদল সৈন্য সহ জনৈক সেনাপতি উপদ্রবকারী খিতানদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হলেন। সেই সেনাপতির নাম চাও কুয়াই-ইন। একদিন প্রভাতে "চে'ন সেতু"র ('The Bridge of Chên') নিকটবর্তী স্থানে শিবির-মধ্যে মদের নেশার ঘোরে যখন তিনি গভীর নিদ্রায় অভিভূত সেই সময় তাঁর সৈন্যরা এসে তাঁকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলল, এবং তাঁকে পীতবর্ণের রাজসজ্জায় ভূষিত করে সম্রাট বলে সোল্লাসে সংবর্ধনা করল। এইরূপে সেনাপতি চাও কুয়াং-ইন সম্রাট হয়েছিলেন। তিনিই সুবিখ্যাত সুং বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

সুং বংশ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে দেশে আবার শান্তি স্থাপিত হয়েছিল, পূর্বকার কয়েক দশকের ইতিহাস রাজনৈতিক কদর্যতায় পরিপূর্ণ। বলপ্রয়োগ ও উৎকোচ দ্বারা সম্রাটরা তখন সিংহাসন রক্ষা করতেন, আর সিংহাসনের অসংখ্য দাবিদার গজিয়ে উঠত বর্ষায় ব্যাঙের ছাতার মত। পঞ্চ রাজবংশের কালে যে একটিমাত্র কল্যাণকর বিষয়ের ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে, সেই বিষয়টি হল কনফুসীয় প্রাচীন গ্রন্থাবলীর মুদ্রণ ও প্রচার। আমরা দেখেছি ট্যাং যুগের শেষ ভাগে বই ছাপার কাজ শুরু হয়েছিল, কিন্তু তখন কোন প্রাচীন গ্রন্থ ছাপানো হয় নি। চীনা চিন্তাধারার ওপর এই প্রাচীন গ্রন্থ ছাপানোর ফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। সস্তা দামে পর্যাপ্ত পরিমাণ বই সরবরাহ আরম্ভ হল, যেমনটি পূর্বে কখনো হয় নি। পণ্ডিতগণের সংখ্যা

বৃদ্ধি পেল এবং সাহিত্য বিষযে জ্ঞান জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। লিখন-পঠনের এই প্রসারের সুফল সুং যুগে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল।

২. সুং বংশ (৯৬০-১২৭৯ খৃঃ)

চীনেব বিভক্ত খণ্ডগুলির পুনঃসংযোগে তৃতীয় কেন্দ্রীভূত সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল সুং বংশীদেব রাজত্বকালে, কিন্তু পূর্বকার হ্যান ও ট্যাং এই দুইটি সাম্রাজ্যের সঙ্গে তুলনায় নূতন সাম্রাজ্যে অনেকগুলি বিশেষ প্রভেদ লক্ষণ দেখা যায়। হ্যান ও ট্যাং বংশীরা বাহুবলকে আশ্রয় করে সুবৃহৎ সাম্রাজ্য গঠন করেছিলেন, সুং সম্রাটেরা কিন্তু বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে একত্র করতে কোনরূপ শক্তি প্রযোগ করেন নি। নানা দুর্ভোগের পর খণ্ডিত দেশেব সর্বত্র শান্তির আগ্রহ জেগেছিল, সাংস্কৃতিক ঐক্যের চেতনাও উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। ট্যাং ও সুং যুগের মধ্যে আর একটি প্রভেদ এই যে, ট্যাং যুগে ছিল বর্ণ-বৈচিত্র্য ও উপভোগের তীব্র স্পৃহা, আর সুং যুগে দেখা যায় আধ্যাত্মিক আত্মনিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বোপলব্ধির প্রযাস, প্রাচীনের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি। সুং সাম্রাজ্য তার অস্তিত্ব রক্ষা করতে পেরেছিল প্রজাবর্গের সম্মতি ও সমর্থনেব ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে,-তাই তাকে হ্যান ও ট্যাং বংশীদেব মত কোন গণ-বিদ্রোহের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয নি। আবার হ্যান ও ট্যাং বংশেব মত সুং বংশের পতনের কারণ আভ্যন্তরীণ শত্রুপক্ষেব ক্রিযাকলাপ নয, চীনেব বহির্ভাগে উত্তর দিকের ঊষর প্রান্তরভূমি থেকে আগত বিদেশী আততায়ী-দলের আক্রমণ শান্তিপ্রিয সমরবিমুখ সুং বংশীরা প্রতিরোধ করতে পারে নি, সাম্রাজ্যের তিরোধান ঘটেছিল সেই কারণে।

তা'ই জু ও তা'ই সুং

"চে'ন সেতু"র শিবিরে একদিন সুপ্রভাতে সৈন্যগণ তাদের সেনাপতি চাও কুয়াং-ইন-কে পীত পরিচ্ছদ পরিযে সম্রাট-পদে বরণ করেছিল, কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি সেনাপতি সেই পদটি বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেন নি। রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হবার পূর্বে তিনি সকলকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি রাজপদ কামনা করেন না, কেবলমাত্র এই সর্তে তাদের প্রস্তাব

গ্রহণ করতে সম্মত আছেন যে সৈন্যরা সর্ববিষয়ে তার আনুগত্য স্বীকার করবে, বিরুদ্ধাচরণ কখনো করবে না। সৈন্যরা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করল, তখন তিনি এই আদেশ দিলেন যে রাজধানীতে প্রবেশ করে তারা যেন সম্রাট ও তার পরিবারবর্গ, মন্ত্রীগণ বা নাগরিকদের ওপর কোনরূপ অত্যাচার না করে। সেই আদেশ মেনে নিয়ে সৈন্যরা বিনা উপদ্রবে রাজধানী অধিকার করল, সম্রাট-পরিবারকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করল। তখন নাবালক সম্রাটের অছি রাজমাতা চাও কুয়াং-ইন-এর বশ্যতা স্বীকার করলেন।

চাও কুয়াং-ইন সম্রাট হয়ে সুং বংশের প্রতিষ্ঠা করলেন, উত্তরপুরুষের কাছে তিনি তাই জু নামে পরিচিত। তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্রাট বিলক্ষণ জানতেন, ইতিপূর্বে পর-পর পাঁচটি রাজবংশ জল-বুদবুদের মত শূন্যে মিলিয়ে গেছে, তেমনি তার প্রতিষ্ঠিত বংশটিরও যে সেই একই গতি হবে না এমন মনে করবার কারণ নেই। সিংহাসনে আরোহণ করেই তিনি নিজের ও বংশের রাজত্ব স্থায়ী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে মনোযোগ দিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও ঔদার্য প্রদর্শন করতে কার্পণ্য করলেন না। শেষ রাজবংশী পরিবারবর্গের যথোচিত সম্মান বজায় রাখবার ব্যবস্থা করলেন, রাজকর্মচারীদের পরিতুষ্ট করলেন, আর বিচক্ষণতার পরাকাষ্ঠা দেখালেন সৈন্যদের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে। সৈন্যরা আজ তাঁকে তক্তে বসিয়েছে, কাল তারা সেখান থেকে তাঁকে নামিয়ে দিয়ে অন্য কোন ব্যক্তিকে সম্রাটের পদে অভিষিক্ত করতে পারে, এই আশঙ্কা নিতান্ত সংগতভাবেই তাঁর মনে জেগেছিল। তিনি সৈন্যবাহিনীর প্রতিপত্তি নাশ করতে উদ্যোগী হলেন, কিন্তু এই উদ্যোগে কোনরূপ ছল-চাতুরির আশ্রয় গ্রহণ করেন নি, বলপ্রয়োগও করেন নি, এমন একটি সহজ সরল উপায় অবলম্বন করেছিলেন যা সে যুগের দ্বন্দ্ব-বিরোধ-বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় চরিত্র-বলকেই অভীষ্ট স্বার্থের অনুকূল করে তুলেছিল।

সম্রাট সামরিক কর্মচারীদের ভোজে নিমন্ত্রণ করলেন। পানাহারে পরিতুষ্ট প্রফুল্ল সেনানায়কদের বললেন সম্রাট: "রাত্রে আমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে পারি না।"

"কেন সম্রাট?"

সম্রাট বললেন, "কে জানে, আপনাদের মধ্যে কেউ হয়তো সিংহাসন কামনা করেন।"

বিস্মিত সেনানায়কেরা বিনীত প্রতিবাদ করল, "সে কি সম্রাট! এমন কথা কেন বলছেন? স্বর্গের পরোয়ানা (Mandate of Heaven)- বলে যিনি সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত, কে করবে তাঁব প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা?"

সম্রাট বললেন, "আপনাদের রাজভক্তি সন্দেহ করি না। কিন্তু ধরুন, আপনাদের মধ্যে কাউকে যদি ভোরবেলা শয্যা থেকে তুলে সম্রাটের পীত পরিচ্ছদ পরিয়ে দেওয়া হয়, তবে তিনি কিরূপে বিদ্রোহকে এড়িয়ে যাবেন?"

সেনানায়কেরা আব কোন প্রতিবাদ না করে জানাল, সম্রাট যা আদেশ করবেন তারা তা-ই মেনে নেবে।

সম্রাট বললেন, "মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী, জীবনকে উপভোগ করাই সুখ। সুখভোগের উপায় অর্থ, নিজেব জন্যে আর উত্তরাধিকাব-রূপে বংশধরদের দিয়ে যাবার জন্যে অর্থ। আপনারা যদি সামরিক কর্তৃত্ব ছেড়ে প্রদেশ অঞ্চলে অবসর যাপন করেন, যদি সেখানে পছন্দমত জমিজমা নিয়ে আনন্দময় গৃহে বাস করেন তা হলে জীবন কত সুখময় হয়ে ওঠে বলুন তো? মৃত্যুকাল পর্যন্ত সুখে-স্বচ্ছন্দে শান্তিময় আবেষ্টনেব মধ্যে অবস্থান কি বিপজ্জনক অনিশ্চিত জীবন অপেক্ষা শ্রেয় নয়?"

সামরিক কর্মচারীরা সম্রাটের উপদেশমত অবসর গ্রহণ করলেন, সম্রাটও তখন সামরিক শাসকদের স্থলে বেসামরিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করলেন। অবসরগ্রহণকারী সামরিক কর্মচারীদের উপাধি ও ঐশ্বর্য দান করে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন। সেনানায়কদেব প্রতিপত্তি খর্ব হল, সৈন্যদলের বিদ্রোহের সম্ভাবনাও আর রইল না। কোন প্রকার সংঘর্ষে প্রবৃত্ত না হয়ে বিরাট সাফল্য লাভ করেছিলেন সম্রাট তা'ই জু চারিত্রিক মহত্ত্বের গুণে। এই চরিত্র-বলে তিনি জনসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন, সেজন্য আর একটি বিশেষ কার্যে তাঁর উদ্যম সার্থক হয়েছিল। রক্তপাত বিনা খণ্ডিত দেশের অংশগুলির পুনর্মিলনই সেই সুমহান কার্য। সু (জেচুয়াং), ন্যানপিং (হুপেই), ন্যানহ্যান (ক্যানটন), ন্যানটাং (ইয়াং সি প্রদেশ) এইসব খণ্ডরাষ্ট্র একে একে সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

তা'ই জু শাসন-ব্যবস্থার সংস্কার করেছিলেন কেন্দ্রীয় শাসকের অধীনে

আমলাতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। কনফুসীয় শাস্ত্র শিক্ষায় উৎসাহ-দান তিনি একটি বিশেষ কর্তব্য মনে করতেন, নীতিধর্মে পারদর্শী পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিগণ রাজপদে নিযুক্ত হত। নূতন ফৌজদারী আইন বিধিবদ্ধ হয়েছিল, প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের বিচারে প্রাণদণ্ডের আদেশ সম্রাটের অনুমতিসাপেক্ষ, এইরূপ একটি ব্যবস্থা আইনে করা হয়েছিল।

চাও কুয়াং ইন-এর তের বছর রাজত্বকালে (৯৬০-৯৭৩) আভ্যন্তরীণ সুখসমৃদ্ধি যথেষ্ট বৃদ্ধিলাভ করলেও ট্যাং সাম্রাজ্যের মত সমগ্র চীন দেশের ওপর তাঁর আধিপত্য ছড়িয়ে পড়ে নি। তাঁর মৃত্যুকালে উত্তর-পর্বে বর্তমান হোপেই ও সানসি প্রদেশে খিতানদের প্রভুত্ব তখনো প্রতিষ্ঠিত ছিল। দক্ষিণাঞ্চলে উ ইয়ে (চেকিযাং) এবং ইউনানে নান-চাও তখনো স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। চাও কুয়াং-ইন-এর পরবর্তী সম্রাট তা'ই সুং (৯৭৩-৯৯৮)। এই সম্রাটের একটি প্রধান কর্ম হয়েছিল উপরোক্ত খণ্ডরাষ্ট্রগুলির একীকরণ ও সাম্রাজ্য-মধ্যে অন্তর্ভুক্তির প্রচেষ্টা। তাঁর এই ব্রত আংশিকভাবে সফল হয়েছিল। উ ইয়ে (চেকিযাং) ও উত্তর হ্যান (সানসি) প্রদেশদ্বয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল (৯৭৮-৭৯), কিন্তু খিতান বিতাড়নের উদ্যোগ ব্যর্থ হল। সম্রাট তা'ই সুং-এর বাহিনী পিকিং নগরের উত্তরে খিতানদের সঙ্গে যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। বিজেতারা কিন্তু এই পরাজয়ের সুবিধা গ্রহণ করতে পারে নি, ফলে উভয় শক্তির মধ্যে একটি স্থিতাবস্থা স্থাপিত হয়েছিল, সুং-রা পারে নি খিতান-অধিকৃত বাকি অংশের পুনরুদ্ধার করতে, আর খিতানরা পারে নি সুং সাম্রাজ্যের অধিকার সংকোচ করতে। উভয় রাজ্যের মধ্যে বিরোধ চলেছিল কয়েক বৎসর, তারপর তৃতীয় সুং সম্রাট চে'ন সুং খিতানদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে বিরোধের অবসান করলেন (১০০৪)। ইউনানের নান-চাও ও অন্যান্য প্রদেশ সাম্রাজ্যের বাইরে থেকে গিয়েছিল।

চে'ন সুং ও জেন সুং

তৃতীয় সম্রাট চে'ন সুং (৯৯৮-১০২২) যে সর্তে খিতানদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেছিলেন, ট্যাং বা হ্যান সম্রাটেরা সেরূপ প্রস্তাবে সম্মত হতে লজ্জা বোধ করতেন। এই সন্ধিসূত্রে খিতান-অধিকৃত চীনের অংশের ওপর সুং

বংশীদের দাবি পরিত্যাগ করা হয়েছিল, তা ছাড়া খিতানদের প্রভূত পরিমাণে অর্থ দেওয়া হয়েছিল যা তারা গ্রহণ করেছিল চীন-প্রদত্ত করস্বরূপে। স্থং-দের পররাষ্ট্রনীতির মূলমন্ত্র ছিল শান্তিপ্রিয়তা, এক হিসাবে এই রাজনীতিকে তোষণ-নীতি বললেও অত্যুক্তি হয় না। হ্যান ও ট্যাং বংশীরা ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী, নির্মমভাবে প্রতিদ্বন্দ্বীদের উচ্ছেদ করবার জন্যে উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে দিগ্বিজয় অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। স্থং-রা কখনো দিগ্বিজয়ের অভিলাষ পোষণ করেন নি, সাম্রাজ্যবাদ তাঁরা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেছিলেন, সেজন্য তাঁদের সাম্রাজ্য হ্যান বা ট্যাং সাম্রাজ্যের মত বিস্তৃতি লাভ করে নি। কিন্তু স্থং সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা পূর্বোক্ত দুটি সাম্রাজ্যের চেয়ে অধিকতর শ্রীমন্ত ও শান্তিপূর্ণ ছিল বলেই মনে হয়, তার একটি প্রমাণ এই যে স্থং যুগে কোনরূপ গণ-বিদ্রোহ দেখা দেয় নি, আন-লু-সান বা হুয়াং সাও-র মত কোন সাম্রাজ্যের শত্রু মানবতার অঙ্গে খড়্গাঘাত করে নি।

প্রাচীন চীনা ঐতিহাসিকগণ এবং আধুনিকদের মধ্যেও অনেকে খিতানদের সঙ্গে সম্রাট চে'ন স্থং-এর অপমানকর সন্ধি স্থাপনের বিস্তর নিন্দা করেছেন। এসব ঐতিহাসিকদের মতে ওই প্রকার সন্ধির পরিবর্তে প্রাণান্তিক যুদ্ধের সমূহ বিপদ বরণ করাও ভাল ছিল। কিন্তু আজ আমরা যুগ-যুগান্তের ধূলি-আবরণ কাটিয়ে যখন দেখি ১০০৭ খৃস্টাব্দের সেই সন্ধির ফলে উত্তর-পশ্চিমের প্রত্যন্ত অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র দেশে শতাধিক বৎসর জুড়ে শান্তি ছিল বিরাজমান, এবং এই সময়ের মধ্যেই স্থং যুগের সাংস্কৃতিক সৌষ্ঠব, প্রজ্ঞা ও শিল্প-কলার পরিপূর্ণ বিকাশ চীনকে সভ্য জগতের পুরোভাগে প্রতিষ্ঠিত করেছিল, তখন আমাদের মনে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকে না যে খিতানদের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে বিবাদের অবসান ঘটিয়ে সম্রাট সুবুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছিলেন। এই সম্রাটের বিরুদ্ধে কনফুসিয়াস-পন্থী প্রাচীন ঐতিহাসিকদের আর একটি অভিযোগ এই যে তিনি বৌদ্ধ ও তাও-ধর্মের সংমিশ্রণে একটি নূতন ধর্মমত পরিকল্পনার চেষ্টা করেছিলেন, এবং নিজেকে 'দৈববাণী'র ("revelation") নির্দেশে সাম্রাজ্যের শাসক বলে প্রচার করে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করেছিলেন। কিন্তু কনফুসিয়াস-পন্থীরা যা-ই বলুন, সম্রাট রাজ্য শাসন করেন 'স্বর্গের পরোয়ানা'র বলে, এ বিশ্বাস চীন দেশে সর্বজনীন, সুতরাং এখানে প্রতারণার অভিযোগ একান্তই ভিত্তিহীন।

সম্রাট জেন-স্থং-এর রাজত্বকাল ১০২৩-১০৬৩ খৃস্টাব্দ। এই সম্রাটের প্রতি ঐতিহাসিকেরা অধিকতর স্থবিচার করেছেন দেখা যায়। তার কারণ এই যে তিনি ছিলেন একজন গোঁড়া কনফুসিয়াস-পন্থী, এবং জু-মা কুয়াং নামক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও অন্যান্য সুধীগণ তার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। তাঁরা সকলেই এই সম্রাটের ভূয়সী প্রশংসা করে গেছেন। এই সময়ে দুটি বিরুদ্ধ মতাবলম্বী রাজনৈতিক ও দার্শনিক দলের সৃষ্টি হয়েছিল, এক দল রক্ষণশীল ও অপর দল সংস্কারপন্থী। এই দুই দলের মতান্তর নিয়ে বাগবিতণ্ডা সারা স্থং যুগ ধরে চলেছিল।

সেন-স্থং

জেন-স্থং-এর উত্তরাধিকারী মাত্র তিন বছর রাজত্ব করেছিলেন, তারপর সম্রাট সেন-স্থং এর 'বৈপ্লবিক' শাসন (১০৬৮-১০৮৫) শুরু হল। তিনি কনফুসিয়াস-পন্থী রক্ষণশীল রাজকর্মচারীদের অপসারিত করে এমন একজন মন্ত্রী নিযুক্ত করলেন, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে যার নব-বিধানের পরিকল্পনাগুলি আধুনিক বিচারে 'প্রগতিশীল' বলে বিবেচিত হলেও সে-কালের রক্ষণশীল সমাজের তীব্র প্রতিবাদের ঝটিকা সৃষ্টি করেছিল। এই মন্ত্রীর নাম ওয়াং আন-সি। "লোকটি নোংরা পোশাক পরে, মুখ পর্যন্ত ধোয় না," তার অভ্যাস-প্রকৃতির এইরূপ বর্ণনা করে প্রাচীনপন্থী ঐতিহাসিকেরা ওয়াং আন-সি-র প্রতি আন্তরিক বিদ্বেষ ব্যক্ত করেছিলেন। অনাবৃষ্টির বছরে এই কথা প্রচার করা হল, কুশাসনের জন্য স্বর্গের অভিসম্পাত অজন্মার সৃষ্টি করেছে। তৎক্ষণাৎ ওয়াং প্রতিবাদ করে বললেন, "এ কথা আদৌ সত্য নয়। প্রাকৃতিক অবস্থা নির্ভর করে প্রাকৃতিক নিয়মের ওপর, মানুষের কোন নৈতিক কাজের ওপর নয়।" বলা বাহুল্য চীনের চিরাগত ভাবধারার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ এই মতবাদ নৈষ্ঠিক রক্ষণশীলের দল বরদাস্ত করতে পারেন নি। এই প্রতিপত্তিশালী দলের বিরুদ্ধাচরণের জন্য ওয়াং-প্রবর্তিত নূতন সংস্কার ব্যবস্থাগুলি প্রত্যাহার করতে হয়েছিল। নানা অর্থনৈতিক বিষয়—যেমন, ভূমি, কৃষি, বাণিজ্য, ঋণ, ট্যাক্স—ওয়াং আন-সি-র নববিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, একটি পৃথক পরিচ্ছেদে পরে আমরা সেই নববিধানের বিস্তারিত আলোচনা করব।

সম্রাট সেন-স্থং ছিলেন আদর্শ চরিত্রের মানুষ, মিতাচারী, বিলাসবর্জিত। রাজোচিত বিলাস-উপকরণসমূহ তিনি দরবার থেকে অপসারিত করেছিলেন, আর কর্মে ছিল তাঁর অফুরন্ত উৎসাহ। বস্তুত মন্ত্রীর 'বৈপ্লবিক' সংস্কার প্রস্তাব গ্রহণ ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে তাঁকে দোষ দিতে তাঁর পরম শত্রুও পারে নি।

সি-সিয়া কিন ও খিতান জাতি

উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে একটি নূতন বিপদ দেখা দিয়েছিল। সেখানে ট্যাং বংশের শেষ দিকে সি-সিয়া নামে এক টেঙ্গুত বা তুর্কী জাতি পীত নদীর ঊর্ধ্বভাগ থেকে নেমে এসে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেছিল, আর সেই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল মোঙ্গল আক্রমণ-কাল পর্যন্ত। প্রথম অবস্থায় এই জাতির সভ্যতা ছিল অত্যন্ত আদিম প্রকৃতির। তারা নিজেদের বানরের বংশধর বলে মনে করত, পশুচর্ম পরিধান করত, কৃষি ও পশুচারণ ছিল তাদের একমাত্র বৃত্তি। চীনাদের সংস্পর্শে এসে কালক্রমে তাদের সংস্কৃতির প্রভাব এই জাতিকে সভ্যতার পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছিল, এবং তখন তারা চীনা লিখনের মত একটি লিখন-পদ্ধতির প্রবর্তন করেছিল। এমন কি তারা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাপন করেছিল, এবং সেখানে কনফুসীয় শাস্ত্রগ্রন্থ শ্রদ্ধা সহকারে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। একাদশ শতাব্দে সি-সিয়া-রা এমনি দর্পাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল যে একজন শাসক নিজেকে সম্রাট বলে জাহির করতে দ্বিধা করে নি। খিতানদের মতই তারা স্থং সাম্রাজ্যে প্রবেশ করে প্রত্যন্তদেশ গ্রাস করতে শুরু করেছিল। এই সূত্রে মাঝে মাঝে খিতানদের সঙ্গেও তাদের যুদ্ধ বাধত, এবং মোঙ্গল আক্রমণে খিতান রাজ্য নিশ্চিহ্ন হবার পূর্ব পর্যন্ত এই যুদ্ধের অবসান ঘটে নি।

এইরূপে সি-সিয়া ও খিতান প্রত্যন্তের এই দুটি খণ্ডজাতির উপদ্রবে স্থং সম্রাট যখন অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছিলেন, সেই অবস্থা-সংকটে আর্তের ত্রাণকর্তা-রূপে আর একটি জাতি খিতানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিল। এই জাতির নাম সু-চেন বা কিন (কিন বা চিন, অর্থ 'স্বর্ণ')। কিন-রা ছিল খিতানদের অধীন, খিতান কর্মচারীদের উৎপীড়নে জর্জরিত হয়ে উঠেছিল। আকুতা নামক জনৈক ব্যক্তি ছিল তাদের দলপতি, কিন-দের

সংঘবদ্ধ করে প্রভুশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল (১১১৪), তারপর খিতান রাজ্য অধিকার করে পরাজিত খিতানদের পশ্চিম তুর্কীস্থানে বহিষ্কৃত করে দিয়েছিল। নির্বাসিত খিতানরা ইলি (Illi) উপত্যকায় এসে বসবাস করেছিল, এবং এই নূতন দেশে অনুকূল পরিবেশের মধ্যে নেস্তোরীয় খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। এই ধর্মান্তরের ব্যাপার নিয়ে 'প্রেস্টার জন-এর রাজ্যের কাহিনী' ("Legends of Prestor John") নামে নানা কিংবদন্তী পরবর্তী কালের ইউরোপে প্রচলিত হয়েছিল। এ অঞ্চলে মোঙ্গল বিজয়ের কাল পর্যন্ত খিতানদের নব-প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে নি।

হুই সুং

খিতানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সুং সম্রাট হুই সু (১১০০-১১২৫) বিদ্রোহকারী কিন-দের মিত্ররূপে সাহায্য করেছিলেন এই ভরসায় যে খাস চীন দেশের অংশ হোপেই যা খিতানরা জবরদখল করে বসেছিল, সেই হোপেই প্রদেশ তাকে প্রত্যর্পণ করা হবে, আর চীন কর্তৃক খিতানদের নিয়মিত অর্থ প্রদানও বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু অচিরে তার এই আশা আকাশকুসুমে পরিণত হল। খিতান বিতাড়নের পর কিন-দের নেতা আকুতা চীন সম্রাটের কাছে অপমানকর দাবি উত্থাপন করল। সম্রাট হুই সুং ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী, কিন্তু রাজনীতি বিষয়ে অর্বাচীন, নিজের বাহুশক্তির অসারতা উপলব্ধি করবার মত বিবেচনা-বুদ্ধি তার ছিল না। সম্রাটের পরামর্শদাতা ছিলেন রাজমন্ত্রী সা'ই চি, সংস্কারক ওয়া আন-সি র শিষ্য, রক্ষণপন্থীদের সঙ্গে দ্বন্দ্বকলহে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তিনি, সম্ভবত সেই কারণে সম্রাটকে সদ্‌যুক্তি দিতে পারেন নি। অশুভ ক্ষণে হঠকারিতাবশেই কিন-দের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরিত হল হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য, কিন্তু তার ফল হল অত্যন্ত শোচনীয়। চীনা বাহিনী কিন-দের সঙ্গে সংগ্রামে পরাজিত হল। সম্রাট হুই সুং তাঁর পুত্রকে সিংহাসন সমর্পণ করে রাজধানী ছেড়ে দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করলেন (১১২৫)। নতন সম্রাট চিন সুং আক্রমণকারী কিন-দের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে তাদের বহু অর্থ প্রদান করলেন, কিন্তু রক্ষণশীল মনোবৃত্তিসম্পন্ন মন্ত্রীগণের মন্ত্রণাক্রমে শীঘ্রই তাঁকে সন্ধিভঙ্গ করতে হয়েছিল।

এই অহেতুক সন্ধিভঙ্গই সুং সাম্রাজ্যের সার্বভৌম গৌরবের ওপর মৃত্যুবাণ নিক্ষেপ করেছিল। কিন-রা ফিরে এসে চীনা বাহিনীকে যুদ্ধে পরাস্ত করে রাজধানী অধিকার করল, এবং তিন হাজার অনুচর সহ ভূতপূর্ব সম্রাট হুই সুং আর তাঁর পুত্র সম্রাট চিন সুং দু'জনকেই বন্দী করে সুদূর পশ্চিমাঞ্চলে পাঠিয়ে দিল। সেখান থেকে আর তাঁরা প্রত্যাবর্তন করেন নি।

দক্ষিণাঞ্চলের সুং বংশ

সুং বংশীরা 'স্বর্গের পরোয়ানা' হারান নি। হুই সুং এর একটি পুত্র কিন-দের বেড়াজালের ভেতর থেকে পালিয়ে দক্ষিণাঞ্চলে এসেছিলেন, চীনারা তাঁকেই সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করল। এই সম্রাটের ঐতিহাসিক নাম কাও সুং (১১২৭-১১৬৩)। রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল লিন আন,* বর্তমান হ্যাং-চৌ নগরে। কিন-দের সঙ্গে যুদ্ধে বিরতি ঘটে নি দীর্ঘকাল, কিন্তু সুং সম্রাটের সুদক্ষ সেনাপতি ইয়ো ফেই আততায়ীদের আক্রমণ থেকে দক্ষিণাঞ্চলকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ইয়াংসি নদীর দক্ষিণে নরম মাটির দেশটি যাযাবর অশ্বারোহী বাহিনীর উপযুক্ত সংগ্রাম ক্ষেত্র নয়, সেই কারণে কিন-রা অধিক দূর অগ্রসর হয় নি। সম্রাট যদি সেনাপতি ইয়ো ফেই-কে কিন দের বিরুদ্ধে অবাধে যুদ্ধ পরিচালনার সুযোগ দান করতেন তা হলে হয়তো উত্তরাংশের পুনরুদ্ধার সম্ভবপর হত। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী চিন কুয়েই ছিলেন একজন শান্তিবাদী মানুষ, সম্রাটের প্রিয়পাত্র। বিষম বিপর্যয় থেকে দেশকে উদ্ধার করবার জন্যই বোধ করি সংগ্রামের অবসান কামনা করেছিলেন তিনি। সেনাপতি ইয়ো ফেই তখন পিয়েন নগর (কাই ফেং ফু) আক্রমণ করবার উদ্যোগ করছিলেন এমন সময় প্রধান মন্ত্রী তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসবার আদেশ দিলেন, একদিনে পর পর বারোটি রাজকীয় পরোয়ানা পাঠিয়ে। অগত্যা ইয়ো ফেই-কে সংগ্রাম পরিত্যাগ করে ফিরে আসতে হল। রাজধানীতে সংবর্ধনার পরিবর্তে এই বীরপুরুষের ভাগ্যে জুটেছিল বন্ধন ও মৃত্যু, কারাগারে বন্দী অবস্থায় তাঁকে বিষপ্রয়োগে

* এই নগরটির বর্ণনা দিয়েছিলেন মার্কো পোলো এইরূপ: 'Beyond dispute the finest and noblest city in the world'

হত্যা করা হয় (১১৪১)। সেই বছরেই কিন-দের সঙ্গে সুং সম্রাট একটি সন্ধি স্থাপন করলেন। এই সন্ধির ফলে চীন দেশ উত্তর ও দক্ষিণ দুই ভাগে দ্বিতীয় বার বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। দক্ষিণাঞ্চলের সুং বংশীরা সাতটি প্রদেশ হারিয়েছিলেন, অর্থাৎ হুয়াই নদীর সমগ্র ভূখণ্ড, দক্ষিণ হোনানের পার্বত্যভূমি এবং হ্যান ও পীত নদীর মধ্যবর্তী স্থান। ইয়াংসি উপত্যকা এবং তার দক্ষিণে অন্যান্য প্রদেশ সুং সম্রাটের অধিকারে ছিল। উত্তরের সাতটি প্রদেশ জুড়ে কিন রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল, মোঙ্গলিয়া ও মাঞ্চুরিয়ার সমতল ভূমিও ছিল কিন-দের শাসনাধীন। বিভক্ত দুই খণ্ডে কিন ও সুং সাম্রাজ্য ১৫৩ বৎসর অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল, তারপর এল ঝঞ্ঝার মত পশ্চিমাঞ্চলের যাযাবর মোঙ্গলদের আক্রমণ। তখন উভয় খণ্ডের পুনর্মিলনে যে সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হল, সে সুং সাম্রাজ্য নয়, কিন সাম্রাজ্যও নয়, সেখানে স্থাপিত হয়েছিল বিজেতাগণ কর্তৃক অধিকৃত সমগ্র চীন দেশ নিয়ে একটি বিরাট মোঙ্গল সাম্রাজ্য।

সন্ধির পর সুং রা শান্ত পরিবেশের মধ্যে নানা সাংস্কৃতিক বিষয়ের চর্চা, দর্শনের আলোচনা নিয়ে কাল কাটাতে লাগলেন। শান্তিবাদ বর্বরশক্তির আক্রমণাত্মক অভিসন্ধিকে নিরস্ত করবার পক্ষে যথেষ্ট নয়, একথা তারা ভুলে গিয়েছিলেন। ১১৬১ খৃষ্টাব্দে কিন-রা ইয়াংসি উপত্যকায় হানা দিয়েছিল, সুং বাহিনী তাদের পরাজিত করে বিতাড়িত করল। তারপর দীর্ঘ সত্তর বছর ধরে চলল একটি সত্যকার শান্তিপর্বের মহড়া। কারুশিল্পী, চিত্রকর, মুদ্রাকর ও সুধীমণ্ডলী সকলেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে লাগলেন। এই সময় পণ্ডিতপ্রবর চু সি কনফুসীয় নীতিশাস্ত্রের নব্য ভাষ্য সবিস্তারে রচনা করেছিলেন, এবং সেই থেকে এই ভাষ্যকে প্রামাণ্য বলে বরাবর গ্রহণ করা হয়েছে। সুং সম্রাটেরা কিন্তু চু সি র পৃষ্ঠপোষকতা কিংবা তার ভাষ্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নি, পক্ষান্তরে চু সি ও রক্ষণ-পন্থী দল কর্তৃক বহুনিন্দিত ওয়াং আন-সি-র সংস্কার পরিকল্পনাগুলিকে কার্যে পরিণত করেছিলেন। সেই কারণে এবং উত্তরাঞ্চল পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট না হবার জন্য তাঁরা কনফুসীয় পণ্ডিতগণের বিরাগভাজন, এমন কি অযথা কটু নিন্দার ভাগী হয়েছিলেন। এখানে একটি লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে দার্শনিক চু সি ও বিপ্লবী অর্থনৈতিক ওয়াং আন-সি উভয়েই দক্ষিণ দেশের মানুষ,

একজন ফুকিয়াং, অপরটি কিযাংসি প্রদেশের। ইতিপূর্বে এ অঞ্চলে স্থানীয ব্যক্তিগণের কোন কৃতিত্বই দেখা যায় নি। উত্তরাঞ্চল বর্বর-অধ্যুষিত হওযাব ফলে চীনা সংস্কৃতির ধারক ও বাহক গণ্যমান্য ব্যক্তিব অনেকেই দক্ষিণ দেশে চলে এসেছিল, এবং সেই থেকে এখানকার অনগ্রসর স্থানীয অধিবাসীদের মধ্যে অপূর্ব সাংস্কৃতিক জাগরণ দেখা দিযেছিল। কুযানটাং ও কুযাংসি অঞ্চলে 'হাক্কা' নামক একটি জাতি আছে, 'হাককা' শব্দের অর্থ 'অতিথি পরিবাব' ("Guest family")। তাদেব ভাষায উত্তর দেশীয অনেক শব্দ ব্যবহৃত হয। সেজন্য পণ্ডিতেরা এরূপ অনুমান করেন যে এই জাতি উত্তরাঞ্চল থেকে এসেছিল, এবং তারা স্থানীয জাতিগুলিব সঙ্গে মিশে যেতে পারে নি, তাব কারণ উভযের মধ্যে ভাষাগত প্রভেদ।

এদিকে পশ্চিমাঞ্চলেব মরুদেশে যাযাবব মোঙ্গলেরা একজন অসাধারণ ব্যক্তির নেতৃত্বাধীনে একটি বিশাল সাম্রাজ্যের ভিত্তি পত্তন কবেছিল। বিশ্ব-বিশ্রুত দিগ্বিজযী জেঙ্গিস খাঁ-ই সেই নেতা। এই অক্লান্তকর্মী পুরুষসিংহেব উদ্যোগে একটি নগণ্য উপজাতি কিরূপে সাবা বিশ্বেব ত্রাস হযে উঠেছিল তাব বিস্তারিত বর্ণনা মোঙ্গল সাম্রাজ্য প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করা হবে। কিন সাম্রাজ্যের দ্বারপ্রান্তে এই পরাক্রান্ত জাতির অভ্যুত্থান কিন-দেব বিলক্ষণ বিব্রত কবে তুলেছিল। প্রথমে সি-সিযা-রা আক্রান্ত হযেছিল, তাবপব কিন-বা। উত্তর চীনে মোঙ্গলদের বারবাব হানা প্রজাপুঞ্জেব সমূহ ক্ষতির কারণ হযে উঠেছিল। এই দারুণ সংকটে কিন-রা মোঙ্গলদেব বিরুদ্ধে সংগ্রামে সুং সম্রাট নিং সুং (১১৯৪-১২২৪) এবং লি সুং (১২২৪-১২৬৫)-এব সাহায্য প্রার্থনা করেছিল, কিন্তু সম্রাটদ্বয তাদেব চিরশত্রুব কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন নি। পক্ষান্তবে কিন-দের বিরুদ্ধে অভিযানে মোঙ্গলদেবই সাহায্য কবেছিলেন লি সুং হোনানে কিন-দেব শেষ ঘাঁটি সাই চাউ নগব অবরোধের জন্য একদল পদাতিক সৈন্য প্রেরণ কবে। সাই চাউ র পতনেব (১২৩৩) পব মোঙ্গল অশ্বারোহী বাহিনী যখন উত্তব দিকে প্রত্যাবর্তন কবছিল, সেই সময় দুর্বুদ্ধিবশত সুং সম্রাট লি সুং উত্তবাঞ্চল পুনরুদ্ধাব কববার উদ্দেশ্যে পরম উৎসাহভরে কাই-ফেং, লো-ইযাং প্রভৃতি নগবসমূহ অধিকার করে বসলেন। এই সংবাদ শুনে মোঙ্গল শাসক ওগোতাই সসৈন্যে ফিরে এসে সুং সাম্রাজ্য আক্রমণ করল, সে আক্রমণ সম্রাট-বাহিনী প্রতিরোধ করতে

পারে নি। যুদ্ধ চলেছিল কিন্তু দীর্ঘকাল, তার কারণ মোঙ্গলদের সামরিক উদ্যম বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল বলে একমাত্র চীনের ওপর তারা সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করতে পারে নি। কিন্তু এই যুদ্ধের শেষ নিষ্পত্তি একদিন চূড়ান্তভাবেই ঘটেছিল (১২৭৬ খৃঃ)। রাজধানী হ্যাং-চৌ অধিকার করে মোঙ্গলরা সম্রাটকে বন্দী করে উত্তরাঞ্চলে প্রেরণ করল। সুং বংশের সমর্থকেরা তখন এক শিশুকে সম্রাটরূপে খাড়া করেছিল, আর নৌ-সেনাপতি সেই শিশু সম্রাটকে জাহাজে চড়িয়ে সমুদ্রপথে কুয়ানটা-এর একটি বন্দরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেই বন্দরটি যখন অবরুদ্ধ হল এবং প্রতিরোধের সকল ব্যবস্থাই যখন ব্যর্থ হয়ে গেল, নৌ-সেনাপতি তখন জাহাজ থেকে নিজের পত্নী ও পুত্রকন্যাদের একে একে জলে নিক্ষেপ করলেন, তারপর সেই শিশু সম্রাটকে অঙ্কে তুলে নিয়ে সুনীল জলধির অতল গর্ভে ঝাঁপ দিলেন। এইরূপে শেষ অবতংসের মৃত্যুর সঙ্গে সুং বংশের অবসান ঘটল (১২৭৯), যে বংশের যশোজ্জ্বল কোন কৃতী সম্রাট তেমন করেন নি যেমন করেছিলেন সে যুগের রাজনীতিকেরা এবং স স্কৃতির ধারক ও বাহক সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও শিল্পীগণ।

৩. সুং যুগে বৈদেশিক বাণিজ্য

ট্যাং বংশের রাজত্বকালে আমরা দেখেছি অবাধ যাতায়াতের সুবিধার ফলে চীনের সঙ্গে বিদেশের বাণিজ্যিক সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল স্থলপথে ও জলপথে, বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল, আর সেই সঙ্গে বহুসংখ্যক বিদেশীর সমাগম হয়েছিল। সু আমলে এই অবস্থার একটি বিশেষ পরিবর্তন দেখা যায়। উত্তরাঞ্চল সুং-দের অধিকারচ্যুত হবার পর সেখান থেকে চীনা শাসকেরা যখন দক্ষিণ দেশে চলে এলেন, চীনের সাংস্কৃতিক ভারকেন্দ্রও তখন দক্ষিণ দিকে ঢলে পড়েছিল। ইতিপূর্বে ট্যাং যুগের শেষ ভাগে যে অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছিল, সেই বিশৃঙ্খল অবস্থাই পশ্চিম দেশের সঙ্গে স্থল-পথের সংযোগ বিঘ্নিত করে তুলেছিল। এইসব কারণে সুং রাজত্বকালে বহির্জগতের সঙ্গে জলপথে বাণিজ্যই প্রাধান্য লাভ করেছিল। এ যুগে সামুদ্রিক বাণিজ্য বিদেশীদের, বিশেষত আরবদের হাতে ছিল, তারা ক্যানটন, চুয়ান-চৌ,

হ্যাং-চৌ প্রভৃতি বন্দরে এসে বসবাস করত, কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতেন চীন সরকার, তাঁরাই বাণিজ্যিক শুল্ক আদায় করতেন। প্রতি বন্দরে একজন বৈদেশিক বাণিজ্য পরিদর্শক নিযুক্ত হয়েছিল। দ্বাদশ শতাব্দে চাও জু-কুয়া নামে ফুকিয়াং অঞ্চলের জনৈক পরিদর্শক কর্মচারী আরব ব্যবসায়ীদের নিকট সন্ধান নিয়ে ভৌগোলিক তথ্যাদি সংবলিত একখানি পুস্তক রচনা করেছিলেন। স্থং আমলের প্রথম দিকে একজন চীনা দূত বিদেশে প্রেরিত হয়েছিল বিদেশী বণিকদের চীন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যে উৎসাহ-দানের জন্য। বাণিজ্য ব্যাপারে তাদের বিশেষ স্থবিধা দানের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছিল। বাণিজ্যের কোন কোন দ্রব্য ছিল সরকারের একচেটিয়া ব্যবসা, লাইসেন্স-প্রাপ্ত ভেণ্ডার দ্বারা সেই ব্যবসা চালানো হত। জিনিসের মূল্যের ওপর শুল্ক (*ad valorem*) ধার্য হত।

সমুদ্রপথে যেসব বিদেশী বণিক চীনে এসেছিল, অধিকাংশই আরব মুসলমান, তাদের প্রতি ভদ্রোচিত নম্র ব্যবহার করা হত। ট্যাং আমলে তাদের নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বকলহের মীমাংসা ব্যাপারে আত্ম-কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং সেই উদ্দেশ্যে কাজী নিয়োগের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল, এখন সেই বিধানটিকে আরও প্রসারিত করে শুধু চীনাদের বিরুদ্ধে বিদেশীদের গুরুতর অপরাধগুলি ব্যতীত অন্য সকল প্রকার মকদ্দমা ইসলামী আইন অনুসারে বিচারের অধিকার কাজীদের দেওয়া হল। মুসলমানদের অনেকেই চীনা নারী বিবাহ করত। এই সময়ে এখানে একটি ইহুদি কলোনিও দেখা যায়। ইহুদিরা কাইফেং নগরে একটি গির্জা (Synagogue) নির্মাণ করেছিল। চম্পা (ইন্দো-চীন), জাভা, স্থমাত্রা, এমন কি ভারতবর্ষ থেকেও রাজদূতের সমাগম হয়েছিল নানা উপঢৌকন নিয়ে। এখানে চীনা রাজন্য-বর্গের একটি কৌতুকপ্রদ আত্ম-প্রতারণামূলক মনোবৃত্তির উল্লেখ করা যেতে পারে। বিদেশীদের উপঢৌকন তাঁরা গ্রহণ করতেন অধীনস্থ দেশগুলি থেকে 'স্বর্গ-পুত্রে'র প্রাপ্য কর-স্বরূপে। আসলে কিন্তু রাজদূতদের আগমন চীন সম্রাটের সার্বভৌম অধিকার মেনে নেবার জন্য হয় নি, তাঁরা এসেছেন চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্বন্ধ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে স্বদেশকে লাভবান করতে, এই স্থূল কথাটি চীনা রাজা-প্রজার না বুঝবার কথা নয়।

চীনারাও সমুদ্রপথে বিদেশে যেতে আরম্ভ করেছিল এবং সেই ভ্রমণ-সূত্রে

তাদের ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছিল। নদী ও সাগরগামী জাহাজ নির্মাণে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। জাহাজের গতির দিক-নিরূপণ যন্ত্র-রূপে চুম্বক কম্পাসের ব্যবহার সমুদ্রপথে যাতায়াতের বিস্তর সুবিধা করে দিয়েছিল, জাহাজের আকার-প্রকারেরও অনেক উন্নতি ঘটেছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ভারতবর্ষ পর্যন্ত সমুদ্রপথে চীনা নিয়ন্ত্রণের সূত্রপাত আমরা প্রথম দেখতে পাই স্থং যুগে। তবে এ কথা ঠিক যে চীনা জাহাজ জাপান, ফিলিপাইন, কোচিন-চায়না ও মালয় দ্বীপপুঞ্জ পরিভ্রমণ করলেও, ভারত-সমুদ্রে প্রধানত আরব জাহাজই পাড়ি জমাত, আরবদের হাতে ছিল ভারত মহাসাগর পারাপারের ব্যবস্থা। বাণিজ্যের সামগ্রী ট্যাং যুগে যেমন ছিল এখনও প্রায় সেইসব জিনিসেরই আমদানি-রপ্তানি হত, যেমন ধূপ, চন্দন, হাতির দাঁত, গণ্ডারের শৃঙ্গ, প্রবাল, মুক্তা, রেশম প্রভৃতি। এই বাণিজ্যিক আদানপ্রদানে চীনই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। স্মরণ থাকতে পারে হ্যান যুগে রোমান সাম্রাজ্যে চীনা রেশমের আমদানি হত এত অধিক পরিমাণে যে তার মূল্য দিতে রোমের ধন-ভাণ্ডারে স্বর্ণ প্রায় নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। স্থং যুগে চীনের অর্থনৈতিক অবস্থা তখনকার রোমের মতই ভীষণ আকার ধারণ করেছিল। স্বর্ণ, রৌপ্য, বিশেষত চীনা তাম্রমুদ্রার রপ্তানি অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। চীনা সরকার বিলাসবস্তুর ব্যবহার নিষিদ্ধ করে মূল্যবান ধাতুর রপ্তানি বন্ধ করবার চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু এই প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল। সেই সময়ে কি পরিমাণ ধাতু চীন থেকে রপ্তানি হয়েছিল তার কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যায় এই থেকে যে জাভা, সিঙ্গাপুর, জাঞ্জিবার, এমন কি আফ্রিকার সোমালীভূমিতেও স্থং ধাতুমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। চীনে ধাতুমুদ্রার অভাবই সম্ভবত কাগজের নোট প্রবর্তনের কারণ। স্থং-দের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় কাগজের নোটের আবির্ভাবই সে যুগের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।* তখনকার পরিসংখ্যান অনুসারে চীন দেশের জনসংখ্যা ছিল ছয়

* দশম খৃস্টাব্দে জেচুয়ান প্রদেশে সর্বপ্রথম কাগজের ওপর ব্লকে ছাপা নোটের আবির্ভাব হয়। তারপর থেকে অর্থের প্রয়োজন হলেই সরকার নোট ছাপিয়ে মুদ্রাস্ফীতির আশ্রয় গ্রহণ করতেন। এই পদ্ধতির অনুকরণ করেছিল পারস্য ১২৯৪ খৃস্টাব্দে। মার্কো পোলো চীনে প্রচলিত কাগজের নোটগুলিকে অদ্ভুত বলে বর্ণনা করেছেন। কাগজের মুদ্রার এই ভেল্কিবাজি ইউরোপ প্রথম শিক্ষা করেছিল ১৬৫৬ খৃস্টাব্দের পূর্বে নয়।

কোটি, কিন্তু যুদ্ধে ও দুর্ভিক্ষে বহু কোটি অধিবাসীর মৃত্যু হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। চতুর্দশ শতাব্দের কোন ইউরোপীয় পর্যটক বলেছেন, সুং যুগের চীনে নগরের সংখ্যা ছিল দুই শত, এবং সবগুলি শহরই ভিনিসের চেয়ে বড়।

৪. ওয়াং আন-সি-র বৈপ্লবিক নববিধান

সম্রাট সেন-সুং-এর মন্ত্রী ওয়াং আন-সি প্রবর্তিত নববিধানের বিরুদ্ধে কনফুসীয় সনাতনপন্থীরা খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছিল, সে কথা আমরা পূর্বে বলেছি। সংস্কারপন্থী ও সনাতনীর মধ্যে বিবাদ অতীত সামন্ত যুগেও চীন দেশে দেখা গেছে। ফা চিয়া বা 'লেজিস্ট' সম্প্রদায় সে-কালে প্রাচীন ঐতিহ্যের মূলোচ্ছেদ করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল যার ফলে কনফুসীয় নীতিশাস্ত্রের সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটেছিল চি'ন বংশীদের রাজত্বকালে। কিন্তু সুং যুগে নব-বিধানীদের ("Innovationists") সঙ্গে সনাতনীদের বাদ-বিসংবাদ সেই প্রাচীন বিরোধের পুনরাবির্ভাব হলেও পুনরাবৃত্তি মাত্র নয়। নববিধানী দল প্রাচীন ঐতিহ্য বা কনফুসীয় নীতিধর্মকে 'লেজিস্ট'দের মত মূলত অস্বীকার করেন নি, ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োজনমত শুধু নীতির রদবদলকেই সমর্থন করেছেন। কিন্তু গোঁড়া সনাতনীরা 'পান থেকে চুন খসা'ও বরদাস্ত করতে রাজী ছিলেন না, সেজন্য প্রাচীন আচারবিচার-নিয়মপদ্ধতির এতটুকু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে প্রতিকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করা হয়েছিল ব্যাপকভাবেই। পরিণামে জয় হয়েছিল সনাতনীদের তাতে বিস্ময়ের কারণ নেই, কেননা শিক্ষার বিষয় সর্বত্রই ছিল কনফুসীয় নীতিশাস্ত্র, এবং সেই শাস্ত্রে বিশ্বাসী পণ্ডিতেরাই সকল প্রকার রাজকার্যে নিযুক্ত থেকে সুদৃঢ় কাঠামোর মধ্যে প্রশাসনকে ধারণ করে রেখেছিল।

১০২১ খৃস্টাব্দে ওয়াং আন-সি-র জন্ম হয়েছিল এক পণ্ডিতকুলে। সেই শ্রেণীর অন্যান্য ব্যক্তির মত তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রাজকার্যে প্রবেশ করেন। কনফুসীয় নীতিকে তিনি অশ্রদ্ধা করেন নি, কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধির বিচারে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন-ব্যবস্থার দোষত্রুটি তাঁর চোখে সহজেই ধরা পড়েছিল। দারিদ্র্য-প্রপীড়িত ঋণভারগ্রস্ত কৃষকের কল্যাণসাধনের জন্য তিনি যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন সেগুলির সমাজতান্ত্রিক মূল্য বিবেচনা

করে অনেক আধুনিক পণ্ডিত তাঁকে 'সোসিয়ালিস্ট' বা 'কমিউনিস্ট' আখ্যা দান করেছেন। আসলে কিন্তু আধুনিক কোন রাষ্ট্রীয় ভাবাদর্শের কল্পনা তাঁর মনে ঘুণাক্ষরেও জাগে নি। স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের কোন পরিবর্তনই তিনি কামনা করেন নি, শ্রেণীহীন সমাজে সর্বমানবের সাম্যের আদর্শও চিন্তা করেন নি, তিনি চেয়েছিলেন শুধু অতীত কালের চি'ন ও হ্যান যুগের 'প্রগতিশীল' সমাজের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করতে। অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে প্রচলিত ব্যবস্থাগুলির আমূল পরিবর্তন করে তিনি যে নববিধানের প্রবর্তন করেছিলেন তার প্রধান কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে নিচে আলোচনা করা হল :

(১) বাণিজ্যের 'রাষ্ট্রীকরণ' : চীনের প্রচলিত করদান প্রথামত পূর্বে সকল প্রদেশ থেকে ফসল রাজধানীতে প্রেরণ করা হত। দূরবিস্তৃত দেশে পরিবহণের অসুবিধা ও ব্যয় তো ছিলই, তা ছাড়া সকল প্রদেশের ফসল-কর রাজধানীতে জমা হয়ে অল্প মূল্যে বিক্রীত হত, আর দূর অঞ্চলে যেখানে খাদ্যের অনটন সেখানে ফসলের দাম অগ্নিমূল্য হয়ে উঠত। এই প্রথায় রাষ্ট্রের আর্থিক ক্ষতি হয় ও দরিদ্রের দুর্গতিরও অবধি থাকে না, এইসব অনর্থ থেকে রাষ্ট্র ও প্রজাদের রক্ষা করবার জন্য ওয়াং একটি নূতন নিয়ম প্রবর্তন করলেন। প্রত্যেক জেলায় রাষ্ট্রের নিজস্ব শস্য গোলা স্থাপন করা হল এবং সেই গোলায় কর-লব্ধ স্থানীয় শস্য মজুত রাখবার ব্যবস্থা হল। প্রয়োজনমত সরকার গোলার শস্য অন্যত্র পাঠিয়ে বিক্রি করতেন। এই 'ঘাটতি পূরণ' ('Equalization of loss') ব্যবস্থা এমন কিছু নূতন নয়, হ্যান বংশী সম্রাট উ-র রাজত্বকালে এইরূপ একটি ব্যবস্থা (পিং চুন) অবলম্বন করা হয়েছিল। শস্যের ক্রয়বিক্রয় ও আমদানি-রপ্তানি রাষ্ট্রীকরণের উদ্দেশ্য : রাষ্ট্রের অর্থলাভ এবং কৃষকদের উদ্বৃত্ত শস্যের ন্যায্য মূল্য পাওয়ার পক্ষে সকল প্রকার বাধা অপসারণ। নূতন ব্যবস্থার সমালোচকেরা এই আপত্তি তুলেছিলেন যে কর্মচারীদের ব্যবসা পরিচালনায় অভিজ্ঞতা না থাকায় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে, দুর্নীতিও দেখা দিয়েছে, আর রাষ্ট্রের পক্ষে দুর্নীতির পরিণাম ধনী ব্যবসায়ীর অর্থগৃধ্নুতার চেয়েও ভয়ংকর। এই প্রাচীন সমালোচনা অনেকটা আধুনিক কালের সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদীর অভিযোগের মতই শোনায়।

(২) রাষ্ট্র কর্তৃক কৃষিঋণ দান: সুদখোর মহাজনদের কবল থেকে প্রজাদের রক্ষা করবার জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক বার্ষিক ৩৩'৩ সুদে ঋণ দানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। জমি বন্ধক রেখে কৃষক ঋণ গ্রহণ করত কৃষি আরম্ভের প্রাক্কালে, আর সেই ঋণ সুদ সমেত পরিশোধ করত সে শস্য সংগ্রহের পর। এই ব্যবস্থার সমালোচনা হয়েছিল সুদের হারের জন্য নয়, মহাজনের সুদের হার ছিল প্রাণান্তকর, সে হিসাবে সরকারী সুদকে লঘু বলতে হয়। নূতন বিধানটির নিন্দা করা হয়েছিল এই বলে, কর্মচারীদের উৎপীড়নে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। ঋণ আদায়ের জন্য কঠোর পুলিশী ব্যবস্থা করা হয়েছে, প্রজার ওপর নির্যাতন চলেছে, এই ছিল সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের অভিযোগ।

(৩) রাষ্ট্রের কার্যে বেগার প্রথার বিলোপ এবং সেই স্থলে নূতন কর ধার্যকরণ: চিরাগত প্রথামত প্রজাদের নির্দিষ্ট কোন সময়ে রাষ্ট্রের কাজে বেগার খাটতে বাধ্য করা হত। অর্থনীতি ও কর্মের সুষ্ঠু সম্পাদন এই উভয়ের পক্ষেই বেগার প্রথা ক্ষতিকর, কারণ যে সময়ে যেখানে যে কাজটি প্রয়োজন, এই প্রথামত সেই কাজটি করবার জন্য লোকের তলব করলে অনেক ক্ষেত্রে শস্য কাটার বা শস্য বপনের বিঘ্ন ঘটে। আবার দূরদেশে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য হয় শ্রমিকের প্রয়োজন, সেখানে বেগার খাটাবার অসুবিধা বিস্তর। এইসব কারণে ওয়াং আন-সি বেগার প্রথার বিলোপ করে রাষ্ট্রের কার্যের জন্য নগদ পারিশ্রমিক দানের ব্যবস্থা করেছিলেন, এবং সেজন্য যে অর্থের প্রয়োজন হয়েছিল তা তিনি কর ধার্য করে সংগ্রহ করবার পরিকল্পনা করেছিলেন। পাঁচটি স্তরে বিত্তের বিভাগ করা হয়েছিল এবং সেই বিত্তের অনুপাতে ভিন্ন ভিন্ন হারে কর ধার্য হয়েছিল। এই বিধান দরিদ্র কৃষকের বর-স্বরূপ হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও ছিদ্রান্বেষীর নিন্দা থেকে অব্যাহতি পায় নি।

(৪) দ্রব্যমূল্য স্থিরীকরণ ও মুনাফা নিয়ন্ত্রণ: প্রত্যেক 'সিয়েন' বা মহকুমার কর্মচারীকে প্রজাদের বিত্তের মূল্য নির্ধারণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। বিত্তের বিক্রয়মূল্যের এক-পঞ্চমাংশের ঊর্ধ্বে মুনাফা নিষিদ্ধ ছিল। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার বিত্তের ফিরিস্তি দাখিল করতে হত, এবং সেই বিবরণ অনুসারে সরকারী তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছিল।

(৫) জমিব জরিপ ও কব ধাযকরণঃ ভূমি জরিপ করে নূতনভাবে কর ধার্য করা হয়েছিল। সম্ভবত উদ্দেশ্য ছিল এই যে, প্রত্যেক খণ্ড জমির ওপর যেন ন্যায্য কব ধায হয। জমি পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছিল উর্বরতা অনুসারে এবং ফসল কি প্রকাব তা-ই বিবেচনা করে। অনুর্বর বা লোনা-ধরা জমি, পাহাড, জঙ্গল, মরভূমি, সমাধিক্ষেত্র প্রভৃতি কর ধাযের যোগ্য ভূমির তালিকাভুক্ত করা হয নি।

(৬) সামবিক পুনর্গঠন ঃ এই ব্যবস্থামত অপ্রয়োজনায সৈন্যদের নানাবিধ উৎপাদন-কাযেব জন্য দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছিল, এব' সামরিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন কবা হয়েছিল এক প্রকাব বাধ্যতামূলক প্রণালীমত সৈন্য স'গ্রহ করে। এই প্রণালীব চীনা নাম 'পাও চিযা'। প্রত্যেক দশটি পবিবারকে একজন মোড়লেব অধীনে, পঞ্চাশটি পবিবাবকে একজন মণ্ডল-বৃদ্ধের অধীনে, এব' ঐরূপ দশটি পবিবাব-গোষ্ঠীকে একজন মণ্ডল-প্রধানেব অধীনে স্থাপন কবা হয়েছিল। পবিবাব গোষ্ঠীর কোন একজনেব অপবাধের জন্য অন্য সকলে দাযী হত। মণ্ডল-প্রধানকে একটি বেজিস্টাবি বাখতে হত প্রত্যেক ব্যক্তিব বিষয়ে জ্ঞাতব্য তথ্যাদি লিপিবদ্ধ কবে বাখবাব জন্য। এই ব্যবস্থায শুধু যে অপবাধ নিবারণ প্রভৃতি পুলিশী কাযেব সাহায্য হত তা নয, প্রতিটি পবিবাব থেকে সৈন্য স'গ্রহ সম্ভব হয়েছিল এই নূতন পদ্ধতিব দ্বাবা। যেসব পবিবাবে দুজনেব অধিক প্রাপ্তবযস্ক ব্যক্তি আছে, সেই পবিবাবগুলিব প্রত্যেকটি থেকে একজনকে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা কবে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে হত। এই বাধ্যতামূলক সৈন্য সংগ্রহেবই আধুনিক নাম conscription এ কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে উত্তবকালেব চীন সাম্রাজ্যে ওযা' আন সি-ব বৈপ্লবিক ব্যবস্থাসমূহেব কোনটিবই পুনবাবিভাব হয নি কেবলমাত্র একটি বিধান ছাড়া, আব সেই বিধানটি এই 'পাও চিযা' প্রণালীমত 'কনসক্রিপসন'। মাঞ্চু যুগে এই ব্যবস্থাব পুনঃপ্রবতন হয়েছিল, আধুনিক কালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেব পূবে কম্যুনিস্ট অধিকৃত অঞ্চলের সম্প্রসাবণ বন্ধ কববাব জন্য চিযাং কই-সেক এইরূপ বাধ্যতামূলক সৈন্য স'গ্রহেব ব্যবস্থাই অবলম্বন কবেছিলেন।

(৭) অশ্ব প্রজনন ব্যবস্থাঃ যাযাবর জাতিগণেব আক্রমণ প্রতিবোধ অসম্ভব করে তুলেছিল তাদেব দুর্ধর্ষ অশ্বাবোহী বাহিনী, হ্যান ও ট্যা'ং যুগেও এরূপ অভিজ্ঞতাব অভাব ঘটে নি। ওযা আন-সি বিলক্ষণ বুঝতে

পেরেছিলেন যে যাযাবরদের সেই দুর্নিবার্য আক্রমণকে প্রতিহত করতে হলে শক্তিশালী অশ্বারোহী বাহিনী সংগঠনের প্রয়োজন। কিন্তু চীন দেশে অশ্ব প্রজননের প্রচলন ছিল না, মোঙ্গলিয়া থেকেই অশ্বের আমদানি করা হত। সমরবাহিনীর একটি অতি-প্রয়োজনীয় অঙ্গের এমন বিদেশের ওপর অশ্ব সরবরাহের জন্য নির্ভর করা বিপজ্জনক, সেইজন্যে চীন দেশে অশ্ব প্রজননের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছিল। এই পরিকল্পনা অনুসারে উত্তরে ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে প্রত্যেক পবিবারকে সরকার-প্রদত্ত একটি অশ্ব, সমৃদ্ধ পরিবারকে দুইটি অশ্ব প্রতিপালন করতে হত। এইরূপে ত্রিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের একটি বাহিনী প্রস্তুত করা হযেছিল। এই ব্যবস্থাটি যদি রদ না করে আরও কিছুকাল বজায় রাখা হত তা হলে সম্ভবত কিন-দের সঙ্গে যুদ্ধে সম্রাট হুই স্যু-এর বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ঘটত না।

১০৬৮ খৃস্টাব্দে ওয়াং আন-সি রাজমন্ত্রী নিযুক্ত হবার পর থেকে বিশ বছর-কাল নববিধান প্রচলিত ছিল। সম্রাট সেন-স্যুং-এর জীবনকালে নববিধান প্রত্যাহৃত হয় নি, যদিও তাঁর বিরাগভাজন হয়ে ১০৭৬ খৃস্টাব্দে মন্ত্রী ওয়াং আন-সি-কে বিদায় গ্রহণ করতে হয়েছিল। সেন-স্যুং-এব মৃত্যুব পবের বছব তাঁর বালক পুত্র চে স্যুং-এব বাজত্বকালে নববিধান প্রত্যাহার করা হয়েছিল (১০৮৬ খৃঃ), এবং নববিধানের অন্তর্ধানের সঙ্গে সেই বছরেই এই বৈপ্লবিক পরিকল্পনার স্রষ্টা ওয়াং আন-সি-রও তিরোধান ঘটেছিল। সনাতনী পণ্ডিতদের প্রতিকূলতায় এই বিধানগুলি কার্যকবী হয় নি, সেই পণ্ডিতকুলেব অগ্রণী ছিলেন জু মা কুয়াং। সম্রাট-মাতা তাঁকেই প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করলেন। তিনি ছিলেন একজন সুপণ্ডিত ঐতিহাসিক, এ যুগের কাহিনীব বর্ণনায় তিনি যে সাম্রাজ্যের যত কিছু অশুভের জন্য, প্রজাকুলের সকল দুর্ভোগের জন্য নববিধানকেই দায়ী করবেন, এতে আশ্চর্য হবার কাবণ নেই। নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, তিনি এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ কনফুসীয় সনাতনীরা নববিধানের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উপস্থিত করেছিলেন সেগুলি বহুলাংশে অসার। প্রজার সর্বনাশ, প্রজার ওপর জুলুম হয়েছে, সাধারণভাবে এরূপ কতগুলি উক্তি ছাড়া কোন বিশেষ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেন নি তাঁরা, চীন দেশের অতি-প্রাচীন চিরাগত ব্যবস্থাগুলির পরিবর্তন করে দেশের সর্বনাশ করা হয়েছে, এই ছিল তাঁদের অভিযোগের একমাত্র ধুয়া।

বলা বাহুল্য এরূপ যুক্তি আদৌ বিচার-সহ নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও আধুনিক কালেও এমন লেখক আছেন যাঁরা এই বৈপ্লবিক বিধানগুলির পরিণামের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে সমাজতন্ত্র বা সোসিয়ালিজ্‌ম্‌-কেই তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে চান। ফলকথা নববিধান প্রবর্তনের জন্য প্রজার যদি সত্যকার সর্বনাশই হত তা হলে তারা যে বিদ্রোহ করত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। চীনের ইতিহাসে দেখা যায় অসন্তোষের বহ্নি যখনই প্রজ্বলিত হয়েছে, বিদ্রোহও তখন ব্যাপকভাবে মাথা তুলেছে। হ্যান যুগে ওয়াং মে°, ট্যাং যুগে আন লু সান ও হুয়াং সাও র বিদ্রোহ তখনো চীনের স্মৃতি থেকে মুছে যায় নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও সারা সুং যুগে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বিরাজ করছিল, কোথাও অন্তর্বিরোধের লেশমাত্র দেখা দেয় নি, এই থেকে সংগত-ভাবেই অনুমান করা যায় যে নববিধান জনসাধারণের অমঙ্গলকর ছিল না বলেই তারা কোন উপদ্রব সৃষ্টি করে নি।

কিন্তু নববিধানকে কার্যকরী করে তুলবার পক্ষে বাধা ছিল অপরিসীম। কনফুসীয় পদ্ধতিমত শিক্ষিত রাজকর্মচারীরা ছিল শাসন-ব্যবস্থার প্রতিটি ঘাটি অধিকার করে, তাদের অসহযোগিতা বা বিরুদ্ধাচরণই এই বিরাট পরিকল্পনাটিকে বানচাল করে দিয়েছিল। আসলে ওয়াং আন-সি প্রবর্তিত নববিধানের ব্যর্থতার প্রধান কারণ উৎসাহী, কর্তব্যপরায়ণ, নিঃস্বার্থ কর্মচারীর অভাব। ক্ষেত্র প্রস্তুত হবার পূর্বে বৈপ্লবিক সংস্কার-কার্যের বিপদ পূর্বেও প্রকট হয়ে উঠেছে চৌ-যুগের আদর্শবাদে ও সম্রাট ওয়াং মে°-এর সমাজশাসন ব্যবস্থায়। চীন দেশে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিধানগুলির পরিবর্তনের চেষ্টা বারবার দেখা দিয়েছে, নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও রাষ্ট্র ও অর্থনীতির প্রগতি নিয়ে পরীক্ষার ত্রুটি হয় নি।

রক্ষণশীলতার গুরুচাপের তলে চীনের প্রগতিমুখী বুদ্ধি-প্রকৃতি যে পিষে মরে নি, ওয়াং আন-সি-র সংস্কার তার যথেষ্ট প্রমাণ, কিন্তু নববিধানীদের সঙ্গে রক্ষণপন্থীদের দ্বন্দ্বে দেশটি একেবারে ছারেখারে যেতে বসেছিল। ১১৯৪ খৃস্টাব্দে আবার নববিধানীদের প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল। এইরূপ বারবার অর্থনীতির পরিবর্তনের ফলে সাম্রাজ্যের মূল ভিত্তি যে দুর্বল হয়ে পড়বে তার আশ্চর্য কি? সকলেই বিব্রত ছিল এই প্রাচীন ও নবীনের কলহ নিয়ে, আর ঠিক সেই সময়ে কিন, তাতারগণ যে উত্তর দিকে অবস্থিত

খিতান রাজ্য অধিকার করে কালান্তক যমের মত চীনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সেদিকে দৃষ্টিপাত করবার অবসর কারু ছিল না।

৫. সুং দর্শন: কনফুসীয় নীতির নবভাষ্য

ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের উজ্জ্বল নৈতিক আদর্শ ক্রমে দার্শনিক তত্ত্বের স্থূল আবরণে এমনধারা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল যে মৌলিক বস্তুটিকে আর খুঁজে পাওয়া যায় নি। চীন দেশে কনফুসীয় নীতির দশাও হয়েছিল এখন তাই। পণ্ডিতেরা ইতিমধ্যে নিরীশ্বরবাদী ও বস্তুতান্ত্রিক হয়ে পড়েছিলেন, পিতৃপূজার চিরাগত প্রথায় বিশ্বাস হারিয়েছিলেন। এই অবস্থায় প্রাচীন কনফুসীয় নীতিধর্মের সহজ রূপ ও ব্যবহারিক আদর্শকে পরমার্থ-দর্শনের সাজসজ্জায় ভূষিত করবার প্রয়োজন হয়েছিল। সেই দর্শনের সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলিকে সুং যুগের কনফুসীয় নব্যনীতি ভারতবর্ষ থেকে গ্রহণ করেছিল, এরূপ অনুমান বোধ করি অসত্য নয়। অথবা সম্ভবত এই সিদ্ধান্তই অধিকতর সংগত যে লাওৎসি-র তাও-দর্শন ও বৌদ্ধ চ্যা'ন তত্ত্বের সঙ্গে কনফুসীয় নীতিধর্মের সংমিশ্রণে এই নব্যনীতির উদ্ভব হয়েছে। সে যা-ই হোক, এ-কালের দর্শনচিন্তা 'লি সিয়া' বা সাংস্কৃতিক জাগরণের সূত্রপাত করেছিল, সেই জাগরণের ধারাটি চলেছিল সাত শ' বছর মিং যুগ পর্যন্ত। এই সময়ের মধ্যে সহস্রাধিক দার্শনিক পণ্ডিতের আবির্ভাব হয়েছিল বলা হয়, কিন্তু সত্যকার গুণী ব্যক্তি ছিলেন মুষ্টিমেয়, আটজনের বেশি নিশ্চয়ই নয়।

চে'ন তু'য়ান ও চৌ তুন-ই

সুং যুগে আমরা একজন প্রসিদ্ধ তাও-দার্শনিকের সাক্ষাৎ পাই, তাঁর নাম চে'ন তু'য়ান (৯৯০ খৃঃ)। চে'ন-এর দর্শনতত্ত্বে যে বিশ্বকল্পনা প্রতিফলিত, অনেকে সেই তত্ত্বটিকে হয়তো নিরীশ্বরবাদ বলবেন, কেননা সেখানে কোন সৃষ্টিকর্তার স্থান নেই। তিনি বলেন, 'তা'ই চি' এক অব্যক্ত মহৎ সত্তা, যার পর আর কিছু নেই, সেই অব্যক্তকে প্রকাশ করে 'লি' বা নৈতিক বিধান। তা'ই চি বা অব্যক্তের মধ্যে 'লি' নিহিত রয়েছে, সেই বিধানগুলি থেকেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। তা'ই চি-রই স্বভাবধর্ম লি, ব্রহ্মাণ্ড তা'ই চি-র বাহ্য

রূপ। বলা বাহুল্য এই তত্ত্বটির সঙ্গে উপনিষদ-দর্শন ও তাও-তত্ত্ব উভয়েরই যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়।

চে'ন তু'যান-এর দার্শনিক মতবাদ লাওৎসি-র তাও-তত্ত্বের প্রতিরূপ হলেও ধর্মের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই, সেজন্য নিছক একটি দর্শন-তত্ত্ব হিসাবে কনফুসীয়দের কাছে চে'ন-এর দর্শন যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিল। বস্তুত কনফুসীয় নব্যনীতির (Neo-Confucianism) আবির্ভাব হয়েছিল এই দর্শনকেই কেন্দ্র করে, আর সেই নব্যনীতির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন চৌ তুন-ই (১০১৭-১০৭৩)। তাঁর মতে প্রাচীন নীতিধর্মের আর যে সার্থকতাই থাক না কেন, সেটি একটি কবন্ধবিশেষ, সেখানে 'ইয়াং' 'ইন' গুণদ্বয় আর 'পঞ্চভূত'ও* আছে, কিন্তু এগুলি ধড়ের মত নির্জীব পড়ে রয়েছে ওপরে কোন মাথা নেই বলে। চে'ন তু'যান বর্ণিত তা'ই চি-কেই তিনি গুণদ্বয় ও পঞ্চভূতের সমন্বয়কারী অদ্বিতীয় সত্তারূপে কল্পনা করলেন। এই অদ্বিতীয় সত্তা একটি সার্বভৌম মৌলিক বস্তু, সনাতন বিধানমত বিবর্তনের পথে এগিয়ে চলেছে। বিবর্তনের সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ মানুষ, বস্তু-সত্তা মানুষের মধ্যে বুদ্ধিদীপ্ত হয়ে উঠেছে। মানুষ এই বিবর্তনের খেলার কিছুটা অনুমান করতে পারে, ভবিষ্যতের বিষয়ও জানতে পারে ডায়গ্রাম ও সংখ্যার সাহায্যে। মানুষের বুদ্ধি অসমান, তাদের মধ্যে বিবর্তনের মাত্রাও বিভিন্ন। মহাপুরুষ তারাই যাঁদের বুদ্ধিবৃত্তির স্ফুরণ সর্বাধিক, মহাপুরুষকুলের সর্বশ্রেষ্ঠ অলংকার কনফুসিয়াস। মানুষ পূর্ণত্ব লাভ করে সে যখন প্রকৃতির সঙ্গে তার স্বভাবের মিলন ঘটাতে পারে। কনফুসিয়াস বর্ণিত 'পঞ্চশীলে'র অনুশীলন দ্বারা এই মিলন সম্ভব হয়। মানবতা, শালীনতা, ধর্মানুষ্ঠান, বিচার-বিবেচনা ও রাজভক্তি এই পাঁচটি বিষয় সম্বন্ধে বিধানই কনফুসীয় "পঞ্চশীল" (Five Principles)।

সাও ইয়াং

কনফুসীয় নীতির শকটে চাপিয়ে মুখোশ-পরা তাও-তত্ত্বকে কেমন ঢাকের বাদ্য বাজাতে দেওয়া হয়েছে, চৌ তুন-ই-র উপরোক্ত দর্শন তারই একটি

* পঞ্চভূত পাঁচটি—ক্ষিতি অপ তেজ কাঠ ধাতু। চৌ তুন ই র মতে পঞ্চভূত সৃষ্টি হয়েছে মৌলিক গুণদ্বয় ইয়াং ও ইন এর নানারূপ সংযোগের ফলে। চৌ তুন ই র রচিত 'তাই চি তু সুয়ো' এবং 'তুং সু' নামে দুখানি গ্রন্থ চীনা দর্শন সাহিত্যে প্রসিদ্ধ।

প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সাও ইয়াং (১০১১-১০৭৭) ছিলেন একজন ছদ্মবেশী তাও-দার্শনিক, কনফুসিয়াসকে যিনি সর্বকালের একজন মহামানব বলে শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু তাঁর নিম্নোদ্ধৃত চতুষ্পদী কবিতায় কনফুসিয়াসের কণ্ঠের কোন সাড়া পাওয়া যায় না :

'তিয়েন' (স্বর্গ) কহে না কথা,
থাকে না সে নীলাকাশে—
উপরে সে নাই, দূরেও না পাই,
নিরালা কল্পবাসে
মানব-মানসে ভাসে।

'তিয়েন' বা স্বর্গের বাস্তব অস্তিত্ব অস্বীকাব প্রাচীন কনফুসীয় নীতিধর্ম নিশ্চয়ই সমর্থন করে না।

চৌ-যুগের 'শত দর্শনে'র মতই এ-কালে বহু দার্শনিকের আবির্ভাব হয়েছিল, সকলের নামের উল্লেখ বা দর্শন-তত্ত্বেব আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। তাঁরা মৌলিক দর্শন রচনা কবেন নি 'শত দর্শন' যুগের দার্শনিকদের মত। অনেকেই তাঁরা কনফুসিয়াস-পন্থী, চৌ তুন-ই-র পদাঙ্ক অনুসরণ করে নীতিধর্মের নব ভাষ্য রচনা করেছিলেন। কনফুসিয়াসের 'ই কিং' বা 'পরিবর্তন গ্রন্থে' তা'ই চি নামে একটি মৌলিক সত্তার (Supreme Ultimate) সামান্য উল্লেখ আছে, জ্যোতির্গণনা ও ট্রিগাম আলোচনা প্রসঙ্গে এই উল্লেখ। নব ভাষ্যকারগণ কনফুসীয় গ্রন্থের এই নবাবিষ্কৃত তা'ই চি-র ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে নীতিধর্মের নামে জটিল দর্শন-তত্ত্বের অবতারণা করেছিলেন, যে তত্ত্বের সঙ্গে কনফুসিয়াসের নাম সংযুক্ত করা হয়তো বা অপ্রাসঙ্গিক। সার্বভৌম মৌলিক সত্তাই সর্ব বস্তু, সত্তা সর্ব বস্তুর মধ্যে বিরাজমান, সর্ব বস্তু সেই সত্তারই বিকার মাত্র। 'লি' বা নৈতিক বিধান ও 'চি' বা প্রাকৃতিক শক্তির মধ্যে মূলগত কোন প্রভেদ নেই। লি ও চি উভয়ই এক এবং অদ্বিতীয় মৌলিক সত্তা কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। যে নৈতিক আদর্শে মানবচরিত্র গঠিত হওয়া উচিত, সেই আদর্শই লি।

চু সি

সুং দার্শনিকেরা মৌলিক সত্তা তা'ই চি-কে ঈশ্বর বা চৈতন্যময় আত্মারূপে কল্পনা করেছিলেন, না বস্তুতান্ত্রিক আদি কারণই ছিল তাঁদের কল্পনার বিষয়, সে সম্বন্ধে চীন-তত্ত্ববিদগণের মধ্যে মতভেদ আছে। এই যুগের সর্বপ্রধান দার্শনিক চু সি (১১৩০-১২০০ খৃঃ) তা'ই চি ও তিয়েন (স্বর্গ) এর একত্বের কথা বলেছেন বটে, কিন্তু মৌলিক সত্তার ব্যক্তিত্বের কোন আভাসই তিনি দেন নি। এই সার্বভৌম সত্তা একমেবাদ্বিতীয়ং, অনন্ত, অনাদি, অব্যয়, সর্বভূত সেই সত্তা থেকে উদ্ভূত হয়ে তারই মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু মৌলিক সত্তা বিষয়ে এই তাঁর শেষ কথা নয়, নানান সময়ে নানান কথা বলেছেন চু সি। একদা তিনি বলেছিলেন, "স্বর্গে কোন বিচারক নেই।" তারপর তাঁকে যখন এ বিষয়ে আবার প্রশ্ন করা হল তখন তিনি বললেন, "বিশ্বের কোন শাসনকর্তা নেই এ কথা বললে ভুল করা হবে।' বস্তুত এ যুগের দার্শনিকেরা তা'ই চি কিংবা স্বর্গের বিভূতি বর্ণনার দিকে মন দেন নি, পরমার্থ-তত্ত্বের আলোচনা যথাসম্ভব এড়িয়ে নৈতিক নিষ্ঠার ওপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

'স্যাং তি' বা 'পরমপিতা'র ('The Great Ancestor') পূজা করতেন নৃপতিরা, স্যাং তি-কে ঈশ্বররূপেই কল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু এই ব্যক্তিত্বময় ঈশ্বর-কল্পনার আশ্রয় সুং দার্শনিকেরা অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করেন নি, সেজন্য স্যাং তি, তা'ই চি ও লি একই আদি-কারণের (First Cause) বিভিন্ন রূপ বলে বর্ণিত হয়েছে। লি বা নৈতিক নিয়মই বিশ্বকে নিয়ন্ত্রিত করে। চু সি বলেছেন, "স্বর্গই বিধান" ("Heaven is Law")। ইন ও ইয়াং নামে গুণদ্বয় এবং পঞ্চভূতের মাধ্যমে লি বা নৈতিক নিয়ম দ্বারা মানবজাতির জীবন বিধৃত। চারটি গুণধর্মে নৈতিক নিয়মের অভিব্যক্তি—মহানুভবতা, সত্যাশ্রয়, শ্রদ্ধা ও প্রজ্ঞাই সেই চারিটি গুণ। এই গুণ-চতুষ্টয়ের সঙ্গে যোগ করা হয়েছে একটি পঞ্চম গুণ—অকপটতা। নৈতিক নিয়ম লি ও প্রাকৃতিক শক্তি চি, এই দুইটির মধ্যে কোন প্রভেদ নেই বলে পঞ্চভূতের বস্তু-প্রকৃতি নৈতিক নিয়মের বহিঃপ্রকাশ, পৃথিবীর ঋতু-পরম্পরাও তাই। আধুনিক দার্শনিকের ভাষায় এ কথার অর্থ, দেশ ও কাল উভয়ের সঙ্গে নৈতিক নিয়ম

অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, প্রকৃতি-জগৎ নৈতিক নিয়মে বাঁধা। এই তত্ত্বটিব খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করে কোন্ কোন্ নৈতিক গুণধর্ম কি কি প্রাকৃতিক বস্তু ও ঋতুকে প্রকাশ করে, সুং দার্শনিকেরা তার একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন। তালিকাটি এইরূপ :

নৈতিক গুণধর্ম	পঞ্চভূত (দেশ)	ঋতু-পরম্পরা (কাল)
মহানুভবতা	কাষ্ঠ	বসন্ত
সত্যাশ্রয়	ধাতু	গ্রীষ্ম
শ্রদ্ধা	তেজ বা অগ্নি	হেমন্ত
প্রজ্ঞা	অপ বা জল	শীত
অকপটতা	ক্ষিতি	(কোন বিশেষ ঋতু নেই—প্রতি ঋতুব ১৮ দিন)

সর্বশ্রেষ্ঠ গুণধর্ম মহানুভবতা, অন্য গুণগুলি সেই শ্রেষ্ঠ গুণেরই বিভিন্ন রূপ। বলা বাহুল্য, উপবোক্ত বিভাগত্রয়ের পারস্পরিক সম্বন্ধের তালিকাটি কষ্টকল্পিত, দুর্বোধ্য ও কৃত্রিম বলেই মনে হয়।

জগৎ নিয়ন্ত্রিত হয় নৈতিক নিয়ম দ্বারা আব সর্বশ্রেষ্ঠ নৈতিক নিয়ম মহানুভবতা, এরূপ প্রাকৃতিক বিধানেব মধ্যে অশুভের আবির্ভাব হয় কেমন কবে, বিষয়টির আলোচনা প্রসঙ্গে সুং দার্শনিকেরা অশুভের বাস্তব অস্তিত্ব অস্বীকার করে বলেছেন, মানুষের স্বভাব-প্রকৃতিই অশুভের জন্য দায়ী। এখানে চৌ-যুগেব দার্শনিক মেনসিয়াস ও সুন-জু-র অশুভ সম্বন্ধে মতবাদ স্মরণ করা যেতে পারে। মেনসিয়াস বিশ্বাস করতেন মানুষ স্বভাবত ভাল, সৎগুণ তার আদি প্রকৃতি। সুন-জু-র মত ছিল তার বিপরীত, অর্থাৎ মানবপ্রকৃতি মূলত মন্দ। সুং দার্শনিকেরা সুন-জু-র মতবাদ প্রত্যাখ্যান করে মেনসিয়াসেব মতকেই গ্রহণ করেছেন। মানবপ্রকৃতি 'স্বর্গ' বা নৈতিক বিধানেবই প্রতিচ্ছবি, সুতরাং শুভ, এই ছিল চু সি-র বিশ্বাস। এই শুভ প্রকৃতি পার্থিব লোভ-মোহের মলিন আবরণে ঢাকা পড়ে বটে, কিন্তু পঙ্কিল জলে মুক্তার মত প্রকৃতি বিশুদ্ধই থেকে যায়, কলুষিত হয় না : মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির বিশুদ্ধতা প্রমাণের জন্য আর একটি উপমা চু সি বারবার ব্যবহার করেছেন, ধূলি-

সমাচ্ছন্ন দর্পণের উপমা। মলিন দর্পণের ধূলাবালি মুছে ফেললে সেটি আবার ঝকঝকে হয়ে উঠে, মানবপ্রকৃতিও লোভ-মোহ কাটিয়ে তেমনি বিশুদ্ধ হয়। মানবপ্রকৃতি-রূপ এই দর্পণটিকে সদ্‌গুণের অনুশীলন ও সদ্ধর্মের চর্চা দ্বারা বিশুদ্ধ রাখাই মানুষের কর্তব্য। সকল জীবের মধ্যে একমাত্র মানুষই তার জীবন-প্রকৃতিকে পূর্ণত্ব দান করতে পারে। এই পূর্ণত্ব প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ একটি পন্থার বিধান দিয়েছেন চু সি, সেই পন্থার নাম 'চুং ইয়াং' বা মধ্যপন্থা। এই মধ্যপন্থা কোন নূতন বিধান নয়। কনফুসিয়াসের পৌত্র সি-জে 'চু ইয়াং' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, সেই গ্রন্থে কনফুসিয়াস-বর্ণিত মধ্যপন্থার বিশদ আলোচনা রয়েছে। ইতিপূর্বে কনফুসিয়াসের মধ্যপন্থার সারমর্ম সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে, এখানে তার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। প্রাচীন কালের নীতিধর্মে মধ্যপন্থার উল্লেখ থাকলেও নীতি হিসাবে তার স্থান ছিল অপেক্ষাকৃত নিম্নে, চু সি-র দর্শনে কিন্তু মধ্যপন্থাকে একটি উচ্চ আসন দেওয়া হয়েছে। এই মধ্যপন্থাকে আশ্রয় করে সুং দার্শনিক মানবচরিত্রে সর্বপ্রকার আতিশয্যের কঠোর নিন্দা করেছেন, এক দিকে যেমন অসংযম, উচ্ছৃঙ্খলতা, স্বেচ্ছাচারের নিন্দা, অন্য দিকে তেমনি বিষয়-বৈরাগ্যের নিন্দা। দার্শনিকদের আক্রমণের বিশেষ লক্ষ্য হয়েছিল বৌদ্ধধর্ম, কারণ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা সংসার ত্যাগ করেন, আত্মীয়-পরিজনের প্রতি, পিতার প্রতি, পিতৃপুরুষের প্রতি কর্তব্যের অনুষ্ঠান বর্জন করে মধ্যপন্থা-নির্দিষ্ট নীতির বিরুদ্ধাচরণ করেন।

বৌদ্ধধর্মের ওপর আরও একটি দিক দিয়ে আক্রমণ করেছিলেন চু সি। দৃশ্যমান জগৎ অনিত্য মায়াময়, এই ভাবটি অথবা বোধিসত্ত্বের আদর্শ উভয় মতবাদের কোনটিকেই তিনি গ্রহণ করেন নি। পাপের ভার বহনের জন্য কোন বোধিসত্ত্বের প্রয়োজন নেই, 'পরিবর্ত' কল্পনা সম্পূর্ণ অমূলক। পুণ্যের পুরস্কারদানের কোন স্বর্গীয় বিধান নেই, কর্তব্য নিজের পুরস্কার নিজেই বহন করে। প্রার্থনা বা উপাসনার কোন প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন নি তিনি, যে নৈতিক বিধান দ্বারা জগৎ বিধৃত সেই বিধান স্ব-নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হয়, মানুষের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবার আগ্রহে পথ থেকে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের ওপর এইসব আক্রমণ সত্ত্বেও তাই চি কল্পনায় যে বৌদ্ধ চ্যা'ন শাখার প্রভাব নিতান্ত অনিবার্যভাবেই এসে পড়েছিল, সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। চ্যা'ন-পন্থী বৌদ্ধ যে সত্তাকে ধ্যানের যোগ

সাধনায় উপলব্ধি করেন, তা'ই চি-ই সেই অন্তর্নিহিত সত্তা। ভারতে বৌদ্ধ-ধর্ম তখন লুপ্তপ্রায়, চীন দেশে ক্ষয়িষ্ণু। ট্যাং যুগ থেকেই অবনতির লক্ষণ দেখা দিয়েছিল, সুং-দের নানারূপ আর্থিক ব্যবস্থার অসংগতি বৌদ্ধধর্মের পতনের পথ আরও প্রশস্ত করে দিয়েছিল। এই সময়ে অনেক অযোগ্য ধনী ব্যক্তি ধার্য কর ও বাধ্যতামূলক সামরিক কর্তব্য থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য বৌদ্ধ মঠে প্রবেশ করে ভিক্ষু হয়েছিল, শ্রমণেরা নাকি ঋণদান করে দস্তরমত সুদখোর হয়ে উঠেছিল। এইসব কারণে বৌদ্ধধর্মের প্রতি জন-সাধারণের জন্মেছিল অশ্রদ্ধা, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম চীন দেশের মাটিতে শিকড় গেড়ে বসেছিল, সাময়িক অশ্রদ্ধা বা বিদ্বেষ ধর্মের মূলোৎপাটন করতে পারে নি। সাম্রাজ্য-মধ্যে বৌদ্ধধর্মের প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট, শিক্ষিত ব্যক্তিরা এই ধর্মকে সম্মান করতে কুণ্ঠিত হত না।

সুং দার্শনিকদের নব ভাষ্য সব পণ্ডিতেরা একবাক্যে গ্রহণ করেন নি, এবং এই নূতন ভাষ্যকারদের সঙ্গে সনাতনী কনফুসীয়গণের গুরুতর বিরোধ বেধে গিয়েছিল। দার্শনিক চু সি-র বিরুদ্ধাচরণ করেছিল যে দুটি দল, সেই সম্প্রদায় দুটির নাম 'হু' ও 'সু', অভিজাত বংশীয় প্রতিষ্ঠাতার নাম অনুসারে এই দুই সম্প্রদায়েব নামকরণ হয়েছিল। চু সি ছিলেন একজন রাজকর্মচারীর পুত্র, নিজেও ছিলেন কর্মচারী। অধিকাংশ সময় তাঁর রাজকার্যে কাটত, তার মধ্যেও তিনি গভীর দার্শনিক চিন্তার অবসর করে নিতেন। বিরুদ্ধ পক্ষের প্রতিকূলতার ফলে তাঁকে একাধিকবার অবসর গ্রহণ করতে হয়েছিল, কিন্তু তাঁর লেখার বিরাম ছিল না, আর সেই লেখা ছিল ক্ষুরধার পরম শক্তিশালী। হু ও সু সম্প্রদায়দ্বয়ের সঙ্গে তাঁর বিতর্কের বিষয় ছিল, কতগুলি শব্দের সংজ্ঞা ও ভাষ্য নিয়ে, যেমন 'ভাল' 'মন্দ' কথা দুটির অর্থ কি, 'ভাল' শব্দটি কোন আপেক্ষিক গুণের দ্যোতক কিনা, মানবপ্রকৃতি চারটি গুণের সমষ্টি, না গুণাতীত। হু সম্প্রদায় বলতেন, মানবপ্রকৃতি গুণ-চতুষ্টয়ের ঊর্ধ্বে। এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে চু সি যে মতবাদ প্রচার করেছিলেন তার বিবরণ আমরা পূর্বেই দিয়েছি, তাঁর মতে মানবপ্রকৃতি ভাল এবং চতুর্গুণ সমন্বিত। তিনি একটি সংঘ গঠন করেছিলেন এই মত প্রচারের জন্য, সংঘের নাম 'পন্থার শিক্ষায়তন' ('The School of the Way')। সংঘের আর একটি প্রচারের বিষয় ছিল 'বস্তুসন্ধান'-তত্ত্ব ("Investigation

of things")। শাসন-শৃঙ্খলা রক্ষা, সমাজগঠন এবং চরিত্রের উৎকর্ষ-সাধনের জন্য জ্ঞানবৃদ্ধির প্রয়োজন, আর জ্ঞানবৃদ্ধি সম্ভব হয় 'বস্তুসন্ধান' দ্বারা। কথাটায় মনে হতে পারে আধুনিক বিজ্ঞান যেমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা নানা বস্তু বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে চেষ্টা করে, নব-কনফুসীয়দের 'বস্তুসন্ধান'ও বুঝি তেমনি কোন বিদ্যার চর্চা। প্রকৃতপক্ষে এরূপ মনে করা ভুল। কনফুসীয় নীতি বস্তুবিজ্ঞান-চর্চার বিরোধী না হলেও বিজ্ঞানের প্রতি ছিল উদাসীন, জ্ঞানকে এই নীতি সদাচার, অনুষ্ঠানাদির মধ্যে নিবদ্ধ করে রেখেছিল। নব-কনফুসীয়গণের সর্বাত্মক 'বস্তুসন্ধান'ও তেমনি মানুষের মনের ভিতর নৈতিক বস্তুর সন্ধান করেছে, বাহ্য বস্তুর দিকে ফিরেও তাকায় নি

এইসব নূতন সুং দার্শনিক নিজেদের কনফুসীয় নীতিধর্মের ভাষ্যকার বলেই প্রচার করতেন। প্রাচীনপন্থীরা কনফুসিয়াসের বাণীর মর্ম উপলব্ধি করতে পারেন নি, সেইজন্যে নূতন ভাষ্য রচনার প্রয়োজন হয়েছে, এই ছিল তাঁদের যুক্তি। নবীন ও প্রাচীন এই দুটি বিবদমান দার্শনিক দলের কোনটিই কিন্তু রাজনৈতিক ব্যাপারে নির্লিপ্ত ছিল না। রাজনীতি-ক্ষেত্রে আমরা যে সংস্কারক দল ও রক্ষণশীল দলের (Innovators and Conservatives) দ্বন্দ্বের কথা বলেছি, সেই দ্বন্দ্ববিরোধের মধ্যে দর্শনতত্ত্বগুলিও জড়িত হয়ে পড়েছিল। চু সি ও তাঁর অনুচরবর্গ কিন-দের বিতাড়িত করে উত্তরাঞ্চল পুনরধিকার করবার পক্ষপাতী ছিলেন। কনফুসীয় বিধানে আছে, পুত্র পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করবে। সুং সম্রাট হুই সুং আততায়ী কিন-গণের কারাগারে প্রাণত্যাগ করেছিলেন, কনফুসীয় বিধানমত তাঁর বংশধরগণের কর্তব্য পিতৃপুরুষের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করা। কিন্তু তৎকালীন মন্ত্রী চি'ন কুয়েই ছিলেন পরম শান্তিবাদী, চু সি-র পরামর্শ তিনি অগ্রাহ্য করেছিলেন। তারপর কালক্রমে যখন 'পন্থা'-সংঘের পরম শত্রু হ্যান তৌ চৌ মন্ত্রী হয়ে বসলেন, তাঁর প্রথম কর্মই হয়েছিল এই প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিদের একটি তালিকা প্রস্তুত করা এবং তালিকভুক্ত লোকদের রাজকার্যে নিয়োগ নিষেধ করা। দল-প্রধানদের রাখা হয়েছিল পুলিশের নজরবন্দী এবং প্রতিষ্ঠানটিকে 'মিথ্যা প্রতিষ্ঠান' ('The School of Lies'), পরে 'বিদ্রোহী দল' নাম দেওয়া হয়েছিল।

১২০০ খৃস্টাব্দে পুলিশের নজরবন্দী অবস্থায় ভক্ত শিষ্যগণ পরিবৃত হয়ে চু সি দেহত্যাগ করেন। জীবদ্দশায় তাঁর ভাগ্যে সম্মান লাভ ঘটে নি, লাঞ্ছনা-গঞ্জনাই সার হয়েছিল, মৃত্যুর পর তিনি হলেন মৃত্যুঞ্জয়ী। মোঙ্গলদের সাম্রাজ্য অধিকারের পূর্বেই সুং সম্রাট লি সুং চু সি-র 'পন্থা-দর্শন' প্রচার শুরু করলেন, এবং সেই দর্শনকে জু মা কুয়াং-এর ইতিহাসের সঙ্গে পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট করলেন। সেই থেকে সুদীর্ঘ সাত শতক চু সি-র এই নব ভাষ্যই সুপ্রাচীন কনফুসীয় নীতিধর্মের একমাত্র বিবরণরূপে খ্যাতি লাভ করে এসেছে।

৬ সুং সাহিত্য : মুদ্রণ : নানা বিদ্যার চর্চা

কনফুসীয় নব দর্শন এবং প্রতিদ্বন্দ্বীগণের সমালোচনা-সাহিত্য ছাড়াও এ যুগে নানাবিধ পদ্য রচনা, প্রবন্ধ, বিশেষত ইতিহাস গ্রন্থের প্রাচুর্য দেখা দিয়েছিল। ইতিহাসের প্রতি চীনা মনের আকর্ষণ চিরদিনকার, পণ্ডিতেরা ইতিহাসকে প্রাচীন শাস্ত্রের (classic) অঙ্গ বলেই সমাদর করতেন। কনফুসিয়াস স্বয়ং সু কিং নামে একটি ইতিহাস প্রণয়ন করেছিলেন, তারপর প্রাত যুগেই প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকগণের আবির্ভাব হয়েছে, হ্যান যুগে জু মা চিয়েন, ট্যাং যুগে হ্যান ইউ। অতীত ইতিহাসের প্রতি সুং পণ্ডিতগণের অপরিমেয় শ্রদ্ধা নানারূপে প্রকাশ পেয়েছিল। নব দার্শনিকেরা নিজেদের কনফুসিয়ান নীতিধর্মের ভাষ্যকার বলেই অভিহিত করেছিলেন, তার কারণ অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা। এমন কি ওয়া আন-সি-ও তার বৈপ্লবিক নববিধান কনফুসীয় নীতিসম্মত বলেই দাবি করেছিলেন। আবার প্রাচীনের প্রতি এই অনুরাগ স্বভাবতই ইতিহাস রচনার জন্য প্রচুর আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল। সুং ঐতিহাসিকরা শুধু অব্যবহিত পূর্বকার পঞ্চ রাজবংশ ও ট্যাং যুগের কাহিনীই লিখে রেখে যান নি, তারা রচনা করেছিলেন চীন দেশের সমগ্র অতীত কালের ইতিহাস। এ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকরূপে খ্যাতি লাভ করেছিলেন জু মা কুয়াং (১০১৯-১০৮৬)। ওয়াং আন-সি-র বিরুদ্ধাচরণে প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকায় তাঁর সাফল্যের কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম 'জু চি তুং চিয়েন', খৃস্ট পূর্ব পঞ্চম শতাব্দ থেকে পঞ্চ

রাজবংশের শাসন পর্যন্ত সুদীর্ঘ কালের একটি বিস্তৃত ইতিহাস। আরও কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তি ইতিহাস লিখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের বিচারে চে চিযাও একজন প্রথম শ্রেণীর ঐতিহাসিক বলে পরিগণিত। তার 'তুং চি' গ্রন্থে পৌরাণিক রাজা ফু সি থেকে শুরু করে ট্যাং বংশ পর্যন্ত সকল ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত বিস্তারিতভাবে লিখিত আছে।

প্রাচীন তত্ত্ব, প্রাচীন সাহিত্যের সারসংগ্রহ পূর্বকার লেখকগণের রচনার সমালোচনা, রাজদরবারে অনুষ্ঠান ও আচরণাদি বিষয়ে নানান প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল। সমসাময়িক ঘটনাগুলির নিখুঁত বিবরণ লিপিবদ্ধ করে অনেক প্রবন্ধ লিখেছিলেন তারা, এইসব রচনায় তাদের ঐতিহাসিক মনোবৃত্তি বিশেষভাবে পরিস্ফুট।

এ যুগের একটি বিশেষ প্রকার রচনা 'বিশ্বকোষ' (Encyclopaedia)। এই ধরনের রচনা পূর্বেও হয়েছিল, কিন্তু সুং যুগে নানান বিষয়ে বড় ছোট অনেক গ্রন্থ লিখিত হয়েছিল। সবচেয়ে বেশি খ্যাতি লাভ করেছিল যে বিশ্বকোষটি তার নাম 'তাই পিং ইউ লান', সম্রাটের আদেশে প্রণীত এক সহস্র গ্রন্থের সমষ্টি, বহুগুলিতে সতর শ' গ্রন্থের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হয়েছে। পণ্ডিতগণের অনাধারণ নিষ্ঠা, অনুরাগ ও অধ্যবসায়ের কথা বাদ দিয়েও বলা যায়, এরূপ একটি বিরাট গ্রন্থের সম্পাদনা দ্বারা প্রাচীন প্রজ্ঞাকে তারা বাঁচিয়ে রেখেছিলেন উত্তরপুরুষের জন্য, এবং তাদের এই উদ্যোগের ফলেই অতীতের অনেক বিষয়ের বিলোপ ঘটে নি।

সুং পদ্যেও অতীতের পিছুটান অনুভব করা যায়, ট্যাং যুগের স্বচ্ছন্দ সাবলীল ভঙ্গী আর নেই, আটঘাট বাঁধনে গতি কেমন আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে। অবশ্য সকলের সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না, এমন কবিও ছিলেন যারা ট্যাং কবিদের প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত করে কল্পনার পথে স্বাধীনভাবেই বিচরণ করেছেন। স্মরণ রাখা প্রয়োজন ট্যাং কবিরা ছিলেন 'পেশাদার' কবি, তাঁদের বাস ছিল কল্পলোকে, আর সুং যুগে পণ্ডিতেরা রাজকার্য বা ধর্মচর্চার অবসরে কবিতা লিখে কবি হতেন, অনেকেই ছিলেন 'মন্দঃ কবি যশঃ প্রার্থী'। কবি সু সি ওরফে সু তুং পো (১০৩৬-১১০১) এ যুগে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সুবিজ্ঞ পণ্ডিত, পরীক্ষোত্তীর্ণ

রাজকর্মচারী, শিল্প-সমালোচক, একাধারে দার্শনিক, কবি ও প্রাবন্ধিক। তাঁর দর্শনগ্রন্থগুলি জাপানে দীর্ঘকাল ধরে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই কবির একজন যোগ্য সহযোগী ছিলেন আউ-ইয়াং সিউ, তাঁর প্রতিভা ট্যাং কবিদের সমান বলে মনে করা হয়। আউ-ইয়াং সিউ ছিলেন একজন পণ্ডিত, কবি ও ঐতিহাসিক।

ট্যাং যুগ ছিল 'কাব্যের স্বর্ণযুগ' কিন্তু কথাসাহিত্যে সে যুগকে ছাড়িয়ে জনপ্রিয়তার পথে আরও বেশি দূর অগ্রসর হয়েছিল সুং যুগ। পূর্বে গল্প লেখা হত চ' উয়ান চুই বা পণ্ডিতী ভাষায়, সে ভাষা ছিল কঠিন শব্দ-গাম্ভীর্যের দুন্দুভি। এই বিদগ্ধ রচনাবলী ক্রমে লোকসাহিত্যে পরিণত হল যখন চায়ের দোকানে চা-পানরত জনসাধারণের বোধগম্য হুয়া পেন বা চলিত ভাষায় লেখকেরা গল্প লিখতে শুরু করলেন। সাহিত্যে তখন ট্যাং যুগের আবেগ-উচ্ছ্বাসের তরঙ্গ শান্ত হয়ে এসেছে, গল্প গণ-সাহিত্যের স্বাভাবিক রূপ সহজ প্রাকৃত ছন্দ দেখা দিয়েছে।

সুং রাজত্বের গোড়ার দিকে ৯৮১ খৃস্টাব্দে ত' আইপ' ইং কুয়াং চি নামে একটি গল্প-সংগ্রহ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১০০০ খৃস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত যুগে যুগে যেসব কথিকা রচিত হয়েছিল তাই থেকে বাছাই-করা শ্রেষ্ঠ একখানা গল্পগুচ্ছ এই গ্রন্থ। ট্যাং যুগের সবগুলি শ্রেষ্ঠ গল্পই বইখানায় স্থান পেয়েছে। সুং রাজধানীতে ছিল হরেকরকমের পেশাদার গল্প-কথক, কারু গল্পের বিষয়-বস্তু ছিল ঐতিহাসিক রোমানস, কারু বা ধর্মকাহিনী বা বীরবৃন্দের জীবনী। চলিত ভাষায় এমনি রসঘন আসর-জমানো গল্প বলতে পারত কথকেরা যে বাড়িতে পিতা ও অভিভাবকেরা দুরন্ত ছেলেদের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাবার জন্য তাদের পাঠাতেন পেশাদারী কথকের কাছে গল্প শুনবার জন্য। কথিত আছে, সম্রাট জেনৎ সুং (১০২৩-১০৬৩) রাজদরবারে তাঁর সভাসদদের কাছে প্রতিদিন একটি গল্প শুনতেন। সুং যুগের কথকদের বর্ণিত গল্পসমূহের দুটি সংগ্রহ-পুস্তক আবিষ্কৃত হয়েছে, একটির নাম চিং পেন টুং সু সিয়াও সিউ, অপরটি চিং পিং সান ট্যাং। প্রথমটিতে আছে আটটি গল্প, তার মধ্যে দুটি ভূতের গল্প, একটি অপরাধ-কাহিনী। দ্বিতীয় গ্রন্থে 'অপরিচিতের পত্র' নামে চীনা কথাসাহিত্যের রত্নস্বরূপ একটি প্রসিদ্ধ কথিকা রয়েছে। গল্পটির মর্ম এই : কোন ক্রূর নির্মম অত্যাচারী স্বামীর ছিল একটি কোমল নম্রস্বভাব

পতিপরায়ণা পত্নী, বানরের গলায় মুক্তাহারের মত। একজন ধুরন্ধর অপরিচিত ব্যক্তি এই নির্যাতিতা নারীকে উদ্ধার করবার জন্যই যেন মোক্ষম একটি দাবার চাল চাললেন। তিনি তাকে একটি প্রেমপত্র লিখে এমন কৌশলে সেখানা পাঠালেন যে পত্রটি স্ত্রীর কাছে না পৌঁছে স্বামীর হাতে গিয়ে পড়ল। চিঠিখানা পড়ে স্বামী ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে বসল এই ভেবে যে তার অনুপস্থিতির সময় নিশ্চয়ই তার স্ত্রী পরপুরুষের সঙ্গে ব্যভিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিল। পত্নীর ওপর নানান রকমের জুলুম করেও যখন সে তার কাছ থেকে কোন স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারল না, তখন সে তাকে আদালতে আইনমত ত্যাগ করে ঘর থেকে দূর করে দিল। নিরপরাধিনী পরিত্যক্তা নারী মনের দুঃখে মৃত্যুকে বরণ করবার জন্য যেমন নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়বার উদ্যোগ করেছে, ঠিক সেই সময়ে একটি প্রৌঢ়া এসে তাকে পিছন থেকে ধরে ফেলল, বললে, "ছি ছি! মরতে কি আছে সামান্য কারণে? কি হয়েছে তোমার বল।" রোরুদ্যমানা মেয়েটিকে সে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল, তার মুখে সকল কথা শুনে যত্ন করে তাকে আশ্রয় দিল। এখানে কর্মোপলক্ষে আসত একটি মধ্যবয়সী সুপুরুষ ব্যবসায়ী। তার সঙ্গে মেয়েটির আলাপ হল, মেলামেশা ক্রমেই ঘনিষ্ঠ হয়ে এল। একদিন সেই লোকটি তার স্বামীর ব্যবহারের নিন্দা করে বললে, "সে ছাড় দিয়েছে তো বেঁচেছ। এখন তুমি মনের মানুষকে বিয়ে করতে পারবে।" উভয়ের মধ্যে প্রেম তখন বেশ জমে উঠেছিল, কিন্তু লোকটির ভাবভঙ্গি কথাবার্তায় মেয়েটির মনে সন্দেহের ছায়া পড়েছিল, এ ব্যক্তি সে নাকি যে সকল অনর্থের মূল? সে হঠাৎ প্রশ্ন করল, "আচ্ছা, সত্যি বল তো, তুমিই কি আমায় চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলে?" হো হো করে হেসে উঠে লোকটি বললে, "কে বললে তোমায় আমি লিখেছি? আর যদি লিখেই থাকি, তা হলে ওই পশু স্বামীটার হাত থেকে মুক্ত করে তোমার কত উপকার করেছি বল তো?" স্থির দৃষ্টিতে তার পানে চেয়ে রইল মেয়েটি, তারপর হঠাৎ হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ল তার কোলের ওপর, তপ্ত আবেগে তার গলা ধরে চুমু খেয়ে সোহাগভরে বলল, "তুমি একটি শয়তানের ধাড়ি!"

ইতিহাস, প্রাচীন সাহিত্য, পদ্য ও গদ্য রচনা প্রভৃতি মানবীয় ও রাজনৈতিক বিষয়সমূহের চর্চার মধ্যেই সুং-প্রতিভা আবদ্ধ ছিল না। জ্যোতির্বিদ্যা, আয়ুর্বেদ,

উদ্ভিদবিদ্যা ও গণিতশাস্ত্রেও নানা গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। ফলফুলের একখানি গ্রন্থে লেবুজাতীয় ফলের প্রাচীনতম বৈজ্ঞানিক বিবরণ লিখিত আছে। কথ্য ভাষায় কথাসাহিত্য রচনার স্থচনা হয়েছিল বটে, কিন্তু সাহিত্যের ক্রম-বিকাশে উপন্যাস উৎকর্ষ লাভ করেছিল পরবর্তী ইউয়ান ও মিং যুগে।

সাহিত্য রচনার বিপুল উদ্যম সম্ভব হয়েছিল গ্রন্থ ছাপার কল্যাণে, আর চীনা যান্ত্রিক উদ্ভাবন মুদ্রণপ্রণালীর উন্নতি করে বই ছাপার কাজে বিলক্ষণ সাহায্য করেছিল। ট্যাং ও 'পঞ্চ রাজবংশে'র যুগে প্রাচীন গ্রন্থগুলি সবই মুদ্রিত হয়েছিল। এখন সরকারী উদ্যোগে রাজবংশের সুবৃহৎ ইতিহাসগুলিও ছাপা হল। বইগুলিতে রচয়িতা ও মুদ্রাকরের নাম থাকত, সুং যুগের অনেক ছাপানো বই এখনো দেখা যায়। এই গ্রন্থগুলির ছাপা এত সুন্দর যে আধুনিক কালেও সুং ধরনে মুদ্রিত গ্রন্থ যথেষ্ট প্রকাশিত হয়েছে। প্রথমে কাঠের ব্লক দিয়ে ছাপা হত, ক্রমে মাটির টাইপ প্রস্তুত করা হয়েছিল, এবং মোঙ্গল আক্রমণের পূর্বেই ধাতুনির্মিত টাইপ (movable type) দেখা দিয়েছিল। কিন্তু চীনা হরফ টাইপে ছাপার চেয়ে ব্লক মুদ্রণেই বেশি সুন্দর দেখায়, সেজন্য ব্যাপকভাবে টাইপের ব্যবহার কোন দিন হয় নি। বইগুলি যে শুধু সুধীগণের বৈদগ্ধ্যকেই উৎসাহ দান করেছিল তা নয়, জনসমাজে শিক্ষা বিস্তার করে সে যুগের চীনা সংস্কৃতিকে জগতে অতুলনীয় করে তুলেছিল।

এই যুগে চীনের উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় অন্যান্য দিকেও পাওয়া যায়, যেমন 'ব্যালিস্টা' (ballista) নামে এক রকম ক্ষেপণযন্ত্রের উল্লেখ উদাহরণ-স্বরূপ করা যেতে পারে। বারুদের আবির্ভাব ইতিপূর্বেই হয়েছিল, বারুদ ব্যবহার হত বাজি প্রস্তুতের জন্য, এখন সেই বারুদকে যুদ্ধে ব্যবহারের উপযোগী করে প্রস্তুত করা হয়েছিল।

৭. চিত্রাঙ্কন ও পর্সিলেন শিল্প

পূর্বকালের হ্যান, ট্যাং আর পরবর্তী সুং যুগের মধ্যে নানাবিধ প্রভেদ লক্ষণের কথা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। ট্যাং যোদ্ধবৃন্দের দর্পিত

অসিঝঙ্কনা সুং যুগে নীরব হয়ে গিয়েছিল, ট্যাংদের বর্ণবৈচিত্র্যময় সম্ভোগের উন্মাদনাও আর ছিল না। সেই চঞ্চল বাসনামত্ত জীবনানন্দের উৎসটি যেন সুং যুগের আধ্যাত্মিক আত্মসংযমের তলায় চাপা পড়ে গয়েছিল। যেখানে ছিল ভোগবিলাসের উদ্দাম প্রবৃত্তি, সেখানে দেখা দিল বিবিক্ত দেশসেবিত্ব, নির্জন স্থানে বসে প্রকৃতির সঙ্গে এক'ত্মবোধ। শিল্পক্ষেত্রে বৌদ্ধ, চ্যান ও তাও-চিন্তার প্রভাব এসে পড়েছিল, শুধু এই কথাটা মনে রাখলে সুং চিত্রাঙ্কনের বৈশিষ্ট্য আর সুং চিত্রকরের মর্মবাণী বুঝতে কোন কষ্ট হয় না।

ট্যাং যুগের খ্যাতি কবি-প্রতিভার জন্য, সে যুগ কাব্যের স্বর্ণযুগ। আর সুং যুগের খ্যাতি অতুলনীয় চিত্র-শিল্পের জন্য, প্রাকৃতিক বন্য দৃশ্য (land-scape) অঙ্কনই ছিল যে শিল্পের প্রাণবস্তু। ট্যাং যুগের অধিকাংশ শিল্প ধ্বংস পেয়েছে, তার কারণ চিত্রগুলি আঁকা হয়েছিল রাজধানীতে, সেখানকার রাজ-চিত্রশালায় রক্ষিত হয়েছিল, আর রাজধানী চাং-আন শহর শত্রুহস্তে বারবার বিধ্বস্ত হয়েছিল। প্রধান চিত্রকরগণের অঙ্কিত কতগুলি চিত্র কিন্তু রক্ষা পেয়েছিল, জাপানেও কয়েকটি ট্যাং যুগের চিত্র পাওয়া গেছে। সে যুগের চিত্রকরেরা নানা ঐতিহাসিক বিষয়, জীবজন্তু প্রভৃতি অঙ্কিত করতেন, প্রাকৃতিক দৃশ্যও যে আঁকেন নি তা নয়। ট্যাং চিত্রকর উ তাও জি ও লু সু-সুন উভয়েই ছিলেন প্রাকৃতিক দৃশ্যচিত্রের অঙ্কনে সুদক্ষ, সে কথা আমরা পূর্বে বলেছি।* সে যা-ই হোক, ট্যাং যুগের অতি অল্পসংখ্যক আসল

* এই প্রসঙ্গে এখানে পাশ্চাত্ত্য ও চীনা চিত্রশিল্পের একটি ঐতিহ্যগত প্রভেদের উল্লেখ করা যেতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দের পূর্বে ইউরোপীয় কবি বা শিল্পীর মনে পাহাড়, জঙ্গল, জলাভূমি প্রভৃতি নগ্ন প্রকৃতির প্রতি কোন আকর্ষণ প্রবল হয়ে ওঠে নি। ইউরোপে প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কন-শৈলী একটি সম্পূর্ণ নূতন জিনিস, কিন্তু চীনে প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকা শুরু হয়েছিল ট্যাং যুগে। চীন ও পাশ্চাত্ত্য-দেশ উভয় ক্ষেত্রে ঐতিহ্যের বিকাশের সঙ্গে প্রাকৃতিক দৃশ্য চিত্রাঙ্কনের সম্বন্ধ নির্দেশ করেছেন Fitzgerald এইরূপ: "Perhaps an appreciation of the natural scenery uncontrolled by the work of man is a product of long and continuous civilization, of sophistication in fact, which is achieved after many generations of culture. In China that point had been reached by the educated class in the T'ang period.. In Europe where the cultural tradition was set back by the Dark Ages...it was not achieved until the 18th century."

চিত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে এবং সেই তুলনায় সুং চিত্র অসংখ্য, চিত্রাঙ্কন-বিদ্যায় সুং যুগকে ট্যাং অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান দেবার একটি বিশেষ কারণ সম্ভবত মৌলিক চিত্রেব সংখ্যাধিক্য। ট্যাং যুগের চিত্রশিল্পের যথার্থ গুণ বিচার সম্ভব নয় সংখ্যাল্পতার জন্য এবং সেজন্য এ কথা বলাও হয়তো ঠিক নয় যে গুণের বিচারে সুং-শিল্প ট্যাংকে অনেকখানি অতিক্রম করে গেছে। তথাপি বলতে বাধা নেই, সুং চিত্রশিল্প উৎকর্ষের চরম শিখরে উঠেছিল, নবযুগের নব ভাবধারা রূপ-সৃষ্টির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল। এ যুগেও পূর্বকার মত নানা বিষয় অবলম্বনে ছবি আঁকা হত বটে, তবে ঐতিহাসিক চিত্র, ধর্মীয় চিত্র বা অনুরূপ চিত্রের প্রাধান্য তেমন দেখা যায় না, প্রাকৃতিক রম্যদৃশ্য অঙ্কনই শিল্পনিষ্ঠার আদর্শ হয়ে উঠেছিল। দৃশ্যচিত্র আঁকতে শিল্পী অনুভব করত কবি-চিত্তের আনন্দ, তার আভাস একজন প্রবাসী চিত্রকরের লেখা কবিতার কয়েকটি ছত্রে পাওয়া যায়ঃ

আমার কুটির ঘিরে পাহাড়ের সারি যায় দেখা,
ভুলি নাই—আমি বসে সেই ছবি আঁকি,
কুটির পাহাড় যদি একাকার মুছে চিত্রলেখা,
স্মৃতি মাঝে তবে আর কি রহিবে বাকি ?

চিত্রকর চেং সু সিয়াও ছিলেন অর্কিড অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত, উচ্চ উপাধি লাভ করেছিলেন, নিজগৃহে নির্জনে বসে ছবি আঁকতেন। তাঁর চিত্রবিদ্যার খ্যাতি শুনে কোন স্থানীয় কর্মচারীর চিত্রগুলি আত্মসাৎ করবার লোভ হল। কোন এক ছুতা ধরে তিনি চেং-কে গ্রেপ্তার করলেন, তাঁর মতলব বুঝতে পেরে চেং গর্জে উঠলেন, "তুমি আমার মাথা নিতে পাব, কিন্তু আমার আঁকা অর্কিডগুলি কিছুতেই তোমায় দেব না।" বিচাবপতি লজ্জিত হলেন, চেং মুক্তিলাভ করলেন। চেং-রচিত নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটি ছত্রে প্রাকৃতিক দৃশ্যপটের সঙ্গে তাঁর অন্তরের নিবিড় ঘনিষ্ঠতা সুপরিস্ফুট ঃ

ঝিরঝিরে বায়ু বয়ে যায়,
যত ডাক আর ফিরিবে না।
মেঘপুঞ্জ সাঁঝের বেলায়
বৃথা সাজে, ভোরে থাকিবে না।

আমার তুলির স্পর্শে লুকানো যে কুঁড়ির স্বপন,
মলযার মৃদু গন্ধ, চিত্রে জাগে নবীন জীবন।

পূর্বে বলা হয়েছে বৌদ্ধ চ্যান যোগের প্রভাব সুং শিল্পের ওপর পড়েছে, কারণ চ্যান পন্থার অনুসরণ করে শিল্পী প্রকৃতির অন্তস্তলে একটি আদর্শ-লোকের সন্ধান পেয়েছে, আর সেই আদর্শলোকের মনোরম কল্পনাকেই সে রূপদান করতে চেয়েছে। এই প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ সুং চিত্রকর লি চেং-এর (২৭০ পৃঃ) 'শীতের বনানী' নামে একটি চিত্রের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। একটি উপত্যকা ভূমির দৃশ্য, সারি সারি পাইন গাছ, দূর পটভূমিকায় পাহাড়ের শ্রেণী। পাইন গাছ সুং শিল্পীদের একটি প্রিয় বিষয়বস্তু, ঝরনার পাশে বহুকালের বাত্যাহত বনস্পতি, কঠিন বক্র বৃক্ষকাণ্ডটি যেন নৈতিক চরিত্রবলের প্রতীক, মাথার ওপর দিয়ে বয়ে গেছে কত শীতের হিমানী-প্রবাহ, জীবন-তরু খিন্ন হয় নি, কনফুসীয় নীতির চিরন্তন মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠ।

সুং সম্রাট হুই সু-এর (১১০০-১১২৬) সাম্রাজ্য পরিচালনার কৃতিত্ব নেই, কিন দের কারাগারে বন্দী অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। কিন্তু এই সম্রাট ছিলেন একজন কৃতী শিল্পী, শিল্পের পৃষ্ঠপোষক, ট্যাং সম্রাট মিং হুয়াং-এর মতই শিল্প-রসিক। চীন দেশে তিনিই প্রথম শিল্প আকাদামি স্থাপন করেন। এই আকাদামি বা 'তু হুয়া ইউয়ান' ডিগ্রি দান করত। সম্রাট স্বয়ং শিক্ষাদানে অংশ গ্রহণ করতেন, চিত্রের গুণের বিচার ও সমালোচনা করতেন। তার 'সুয়ান হো হুয়া ইউয়ান' বা চিত্রশালা অসংখ্য মনোরম চিত্র-সংগ্রহ দ্বারা সমৃদ্ধ করা হয়েছিল। সংগ্রহ তালিকায় ৬১৯২টি চিত্রের নাম দেখা যায়।

এ যুগে চিত্রের সংখ্যা যেমন অনেক, চিত্রকরও ছিল যথেষ্টসংখ্যক। সকলের পরিচয় এখানে দেওয়া সম্ভব নয়, আমরা মাত্র কয়েকজন খ্যাতিমান শিল্পীর কথা বলব, কিন্তু তার পূর্বে চিত্রাঙ্কন-পদ্ধতি সম্বন্ধে একটু আলোচনা প্রয়োজন। অঙ্কন-পদ্ধতি ছিল দুই রকমের, উত্তরাঞ্চলের পদ্ধতি ও দক্ষিণাঞ্চলের পদ্ধতি। সুং যুগের দেশবিভাগের ফলে পদ্ধতি দুটির সৃষ্টি হয় নি, ট্যাং যুগে এমন কি প্রাচীন কালেও উত্তর ও দক্ষিণ পদ্ধতির প্রচলন ছিল। প্রকৃতপক্ষে এই দুই পদ্ধতির চিত্রাঙ্কন ভৌগোলিক কোন অঞ্চল-

বিশেষে সীমাবদ্ধ ছিল না, দুটি বিভিন্ন প্রকার শৈলীকেই উত্তর ও দক্ষিণ পদ্ধতি নামে অভিহিত করা হয়েছিল।* দক্ষিণ পদ্ধতির চিত্র স্বপ্নালু ভাবে আচ্ছন্ন, আবছায়ামণ্ডিত, আর উত্তর পদ্ধতিকে ব্যঞ্জনা করে উজ্জ্বল বর্ণের শোভা, সুস্পষ্ট দৃপ্ত রেখা। দক্ষিণ দেশবাসী লি সু-সুন ছিলেন একজন উত্তর পদ্ধতির শিল্পী, আর ওয়াং ওয়েই ছিলেন উত্তরাঞ্চলের অধিবাসী, জন্মভূমিতে বাস করে দক্ষিণ শিল্প-পদ্ধতির চর্চা করেছিলেন।

লি সিয়াং (৯৭৬-৯৯৭) সাহিত্যিক হলেও চিত্রানুরাগী ছিলেন, বৌদ্ধ-ধর্মীয় চিত্র এঁকেছিলেন। পুখোই-র 'উদীয়মান ড্রাগন মন্দিরে' তাঁর আঁকা ছবি রেখে গেছেন।

কুয়ো সি (১০২০) বৌদ্ধ ও তাও-ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, মন্দির ও প্রাসাদ-প্রাচীরগাত্রে চিত্রাঙ্কন তাঁর বৈশিষ্ট্য। দৃশ্যচিত্র এঁকে এবং চিত্রশিল্প বিষয়ে একখানা বই লিখে খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

লিন কুন-লিন ওরফে লি লুং মিয়েন (১০৭০-১১০৬) সর্বশ্রেষ্ঠ সুং চিত্র-শিল্পীদের অন্যতম। তিনি ছিলেন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি, উচ্চ রাজকর্মচারী। তাঁর সম্বন্ধে এই কথা বলা হয়েছেঃ "ত্রিশ বছর রাজকার্যের মধ্যে একটি দিনের জন্যও তিনি পর্বত-অরণ্যের কথা বিস্মৃত হন নি। সেইজন্যেই তিনি প্রাকৃতিক দৃশ্যকে তাঁর স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে চিত্রে সন্নিবিষ্ট করতে পেরেছিলেন।" অবসর গ্রহণের পর 'ড্রাগন-মুখো পাহাড়ে'র কাছে নিজের বাড়িতে বাস করতেন, তাই তাঁর নাম হয়েছিল 'লি লুং মিয়েন' অর্থাৎ 'ড্রাগন-মুখো-র লি'। তিনি কতগুলি ঘোড়ার ছবিও এঁকেছিলেন, একখানি ছবির নাম, 'খোটানী সহিস ও অশ্ব'। অঙ্কনের নৈপুণ্য, বিশেষত অশ্বের আঙ্গিক বিন্যাসে তাঁর কুশলতা ছিল কিরূপ এই পদ্যটিতে সে বিষয়ে কিছু পরিচয় পাওয়া যায়ঃ

---

* "The best that can be said (of this denomination and division) is that the so-called Southern School laid greater weight upon emotional expression, and on the use of pure ink ..whereas the Northern is more interested in colour, contour and detail and is more inclined to lean upon the T'ang period. Moreover, the division holds good only for landscapes." (Cuhn's *Chinese Painting*, p. 80).

লুং মিয়েনের মাথায় গজায়
ঘোড়া একটি হাজার,
মাংসপেশী অস্থি পাঁজর
আঁকে ভারি মজার।

মিং ফেই (১০৫১-১১০৭) শুধু শিল্পী ছিলেন না, সমালোচক বলেও তাঁর খ্যাতি ছিল। চিত্র-লিখনে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, মানুষ জন্তু দৃশ্যাবলী এঁকেছেন।

সিয়া কুয়েই ও মা ইউয়ান (১১৯০-১২২৪)—উভয়েই দৃশ্যচিত্রশিল্পী। চীনের সর্বোৎকৃষ্ট দৃশ্যচিত্র অঙ্কিত করেছেন সিয়া কুয়েই, সুদীর্ঘ চিত্রপটে (rolls) মোড়া ইয়াংসি নদীর ছবি। তিব্বত সীমান্তের পর্বত থেকে নেমে অনতিপরিসর অধিত্যকা ভূমির মধ্য দিয়ে নদী বয়ে চলেছে, চিত্রপটখানি মেলে ধরবার সঙ্গে পাহাড, নদী, বনভূমি কত রকমারি দৃশ্যের মনোরম শোভাযাত্রা, তারপর শহর, মন্দির, বন্দব, সমুদ্রের 'ফুটন্ত জলে' সঞ্চরমাণ জাহাজ আর ছোট ছোট পাল-তোলা জেলে ডিঙ্গি।

লিয়াং কা'ই (১২০০) সম্রাট লিং সুযাং-এর রাজত্বকালে আকাদামির একজন বিশিষ্ট শিল্পী ছিলেন, তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শনস্বরূপ আজও তাঁর চিত্রসমূহ বিদ্যমান। প্রথমে তিনি ধর্ম বিষয়ক ছবি আঁকতেন, রেশমের ওপর অঙ্কিত 'বোধিবৃক্ষ অভিমুখে বুদ্ধদেব' নামক চিত্রে সন্ন্যাসব্রতী তপঃখিন্ন ভগবান বুদ্ধকে দেখা যায় বনবীথি দিয়ে এগিয়ে চলতে। তাব আর একটি পসিদ্ধ ছবি কাগজের ওপর আঁকা কবি লি পো-র প্রতিকৃতি। কোন নিরুদ্দেশ-যাত্রায় চলেছেন কবি, ভাবসমৃদ্ধ গতিভঙ্গী কি চমৎকাব ফুটে উঠেছে!

বৌদ্ধধর্মের ক্ষযেব সঙ্গে ট্যা'ং যুগেব শেষ ভাগ থেকেই ভাস্কর্য মৃতকল্প হয়ে পড়েছিল, আর তার শ্রীবৃদ্ধি হয় নি। কিন্তু প্রস্তরশিল্পের অবস্থা যেমনই হোক, সূক্ষ্ম সৌন্দর্যে সুং-পর্সিলেনের উৎকর্ষ চরম শিখরে উঠেছিল, এবং তারপরও তিন শ' বছর ধরে মিং-শ্রমশিল্পীরা সেই শ্রেষ্ঠত্ব বিশেষভাবে রক্ষা করেছিল। 'পর্সিলেন' শব্দটি রোমক Porcellana থেকে উদ্ভূত, অর্থ 'কড়ি'। ধাতুমিশ্রিত একপ্রকাব মৃত্তিকা অগ্নি-মধ্যে নিক্ষেপ কবলে সেই মাটি গলে গিয়ে অস্বচ্ছ কাঁচের রূপ ধারণ কবে, সেই বস্তুই 'পর্সিলেন'। খৃষ্টীয় নবম শতকে ট্যা'ং শাসনকালে ব্যাপক চা-পানের অভ্যাসেব দরুন নূতন রকম

পেয়ালা তৈরির প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল, সেই প্রয়োজনই হয়তো উদ্ভাবনের প্রেরণা দান করেছিল, উদ্ভাবন আকস্মিক হওয়াও বিচিত্র নয়। ব্রঞ্জ ও প্রস্তরপাত্রের তুলনায় এই পর্সিলেন পেয়ালাগুলির শিল্পসৌষ্ঠব কোন অংশে নিকৃষ্ট ছিল না। পাত্রগুলির ওপর চক্‌চকে এক-রঙা (monochrome) পালিশ মাখানো হত, পাত্রের ওপর চিত্র সামান্যই আঁকা হত, নানান বর্ণের (Polychrome) রঙীন চিত্রাঙ্কন পরবর্তী মিং যুগে দেখা দিয়েছিল। পর্সিলেন নানান স্থানে তৈরি হত, রাজধানী কাই-ফেং নগরে সম্রাটের নিজস্ব কারখানা ছিল। বিদেশী বাণিজ্যের একটি প্রধান রপ্তানির সামগ্রী ছিল পর্সিলেন।

জীবন-দর্শনের মতই চীনের শৈল্পিক আদর্শ ব্যবহারিক। ভারতের মত চীন দেশে কি দর্শন, কি শিল্প কোনটিই তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার ধূম্রজালে নিজেকে কখনো হারিয়ে ফেলে নি। দর্শন ছিল শুধু ব্যক্তি ও সমাজকল্যাণের উপায় আলোচনা, তেমনি শিল্প কোন অবাস্তব কল্প-লোকের অচেনা রূপাদর্শের সন্ধানে না ফিরে জীবনানন্দের প্রয়োজনে শুধু উপভোগের জন্যই সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে, চিত্র-লিখন থেকে শুরু করে পানাহারের পাত্রগুলি পর্যন্ত আহারে বিহারে জীবনের প্রতিটি ব্যবহার্য বস্তুকেই পরম সৌষ্ঠবে রূপায়িত করেছে। সুং যুগের বসনভূষণ, অঙ্গরাগ, মন্দির ও গৃহসজ্জা সবই ছিল অপূর্ব, কোথাও সুশোভন সৌন্দর্যবিন্যাসের অভাব ছিল না। বস্ত্রবয়ন, ধাতু ও পাথরের কাজে অনুপম শিল্পকুশলতা ফুটে উঠেছিল। কাঠ ও হাতির দাঁতের কারু-কার্যের প্রতিযোগিতায় চীনকে অতিক্রম করতে পেরেছিল একমাত্র জাপান, চীনেরই শিষ্যস্থানীয়।

সপ্তম পর্ব

মোঙ্গলদের শাসন কাল

১. জেঙ্গিস খাঁ ও মোঙ্গল জাতি

মোঙ্গলিয়ার প্রান্তভাগে সুবিস্তীর্ণ বাতাহত উচ্চ প্রান্তরভূমি, দূর আকাশে ঝুলন্ত মেঘপুঞ্জের কাছাকাছি। কোন শহর নেই সেখানে, ধুধু বালুর স্তূপ, শুধু অল্প কয়েকটি নদীর শীর্ণ শ্যামল উপকূল ভিন্ন উর্বরতার লেশমাত্র কোথাও নেই। তরুহীন দেশ, কিন্তু চারণ-ভূমি আছে যথেষ্ট। গ্রীষ্মের অসহ্য তাপ, ঝঞ্ঝাবাত্যা, শীতের তুষারবর্ষণ, শৈত্যাতপের চরম আধিক্য, গোবি মরুভূমির এমনি বর্ণনা দিয়েছেন সে অঞ্চলের প্রথম ইউরোপীয় পরিদর্শক ফ্রা কারপিনি। এই রুক্ষ কঠিন পরিবেশের মধ্যে মোঙ্গলরা বাস করত ইট-পাথর কি মাটির ঘরে নয়, পর্ণ-কুটিরেও নয়, মাথা গুঁজে কোন মতে থাকত তারা পশুলোম-নির্মিত তাঁবুর তলে। এইসব তাঁবুর নাম 'ইয়ার্ট' (yart), গ্রীষ্মকালে সেই ইয়ার্টগুলি গরুর গাড়িতে চাপিয়ে সাইবেরিয়ার প্রান্তরভূমিতে নিয়ে যাওয়া হত, শীতকালে আবার দক্ষিণাঞ্চলে ফিরিয়ে আনা হত। মোঙ্গলরা ছিল অশ্বারোহণে সুদক্ষ, মদ্যপায়ী, মাংসাশী জাতি, মেষ ও ঘোড়ার মাংস ছিল তাদের খাদ্য, পশুচারণ একমাত্র বৃত্তি, অভ্যাস প্রকৃতি অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অস্নাত থাকাই ছিল বিধান। তারা তুর্কী বা তেঙ্গুত জাতির অন্তর্গত একটি উপজাতি, তুর্কীদের সঙ্গে তাদের ভাষার সাদৃশ্য ছিল। মরু অঞ্চলের যাযাবর খণ্ডজাতিগুলির সঙ্গে চীনের সংঘর্ষের কাহিনী সে দেশের সুদীর্ঘ ইতিহাসে বিরল নয়। সিয়াং নু বা হুন কর্তৃক চীন বহুবার উপদ্রুত হয়েছিল, সি সিয়া ও কিন-রা চীনের বুকের ওপর উত্তর ও পশ্চিম অংশ জুড়ে তখনো বসে ছিল। কিন্তু মোঙ্গলদের বিশেষত্ব এই যে, পূর্ববর্তী যাযাবর আততায়ীর মত তারা চীন দেশের অংশমাত্র অধিকার করে তুষ্ট হয় নি, পশ্চিমে মধ্য এশিয়া ছাড়িয়ে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ, আর পূর্বে ও দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসাগর, সিন্ধু নদ ও পারস্য উপসাগর, এই বিশাল ভূখণ্ড জুড়ে এমন একটি সুবৃহৎ সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল যার তুলনা জগতে আজ পর্যন্ত দেখা যায় না। একটা নগণ্য উপজাতি কিরূপে এমন অসাধ্য সাধনে সমর্থ হয়েছিল,

হাউইবাজির মত এই সাফল্য চোখ-ঝলসানো নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার হলেও প্রহেলিকাময় সন্দেহ নেই। সেইজন্যেই মোঙ্গল জাতির উত্থান-পতনের কাহিনী শুধু চীনের নয়, জগতের ইতিহাসে একটি কৌতূহলোদ্দীপক পরিচ্ছেদ।

দ্বাদশ শতাব্দের প্রারম্ভে মোঙ্গলদের বিভিন্ন উপজাতি বইকাল হ্রদের পূর্ব তীরে, মোঙ্গলিয়ার প্রান্তদেশে, সাইবেরিয়া ও মাঞ্চুরিয়ার নানান স্থানে ছড়ানো-ভাবে বসবাস করত। এইসব খণ্ডজাতির মিলন ও সহযোগিতায় একটি প্রবল পরাক্রান্ত শক্তি গড়ে তুলেছিলেন যে অসাধারণ পুরুষ, তাঁর নাম তামুজিন। তাঁর জন্ম ১১৫৫ বা ১১৫৬ খৃস্টাব্দে। তিনি ছিলেন একটি উপজাতি-সমাহারের (Confederacy) দলপতি-পুত্র, পিতার মৃত্যুর পর বাহুবলেই তাঁকে পিতার স্থান অধিকার করতে হয়েছিল। শৌর্যবীর্য ও কৌশল প্রভাবে অন্যান্য কয়েকটি মোঙ্গল উপজাতিকে সমাহারভুক্ত করবার পর তিনি মোঙ্গলিয়ার খিতান বা কিরাইট রাজ্য আক্রমণ করতে প্রস্তুত হলেন। এই কিরাইটরা তুর্কী জাতি, নেস্টোরীয় খৃস্টান, মোঙ্গল উপজাতিগুলির ওপর প্রভুত্বের দাবি করত। সম্ভবত এই জাতিই উত্তর চীন থেকে কিন-গণ কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে মরু অঞ্চলের কারাকোরাম নগরকে রাজধানী করে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কিরাইটদের নেতা ছিল ওয়াং খাঁ নামে একজন নেস্টোরীয় খৃস্টান। তখন আর্মেনিয়া থেকে 'কাথে' পর্যন্ত সর্বত্রই নেস্টোরীয় খৃস্টানরা ছড়িয়ে পড়েছিল, সম্ভবত তাদের প্রভাবেই নবাগত কিরাইটরা খৃস্টধর্ম গ্রহণ করে। মধ্য এশিয়ায় পরাক্রমশালী খৃস্টান রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা-রূপে 'প্রেস্টার জন'-এর খ্যাতি সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল, এবং এই রহস্য-মানবটিকে কেন্দ্র করে নানান কিংবদন্তীর প্রচলন হয়েছিল। ওয়াং খাঁ-ই বোধ করি সেই 'প্রেস্টার জন'। মোঙ্গল বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে ওয়াং খাঁ যুদ্ধে পরাজিত হলেন। বিজেতা মোঙ্গলদের নেতা তামুজিন যখন সমগ্র মোঙ্গলিয়ায় প্রভুত্ব স্থাপনের কার্য শেষ করলেন তখন তিনি তাঁর অনুগত জনসাধারণ কর্তৃক 'জেঙ্গিস খাঁ' বা 'সার্বভৌম সম্রাট' বলে অভিনন্দিত হয়েছিলেন (১২০৬ খৃঃ)। কারাকোরাম নগর বর্তমান উরগা-র সন্নিকটে, জেঙ্গিস খাঁ তাঁর রাজধানী সেই নগরে প্রতিষ্ঠিত করেন। তখন পশ্চিমের সিনকিয়াং অঞ্চলের উইঘার, কারলুক খণ্ডজাতিরাও জেঙ্গিস খাঁর আধিপত্য মাথা পেতে নিয়েছিল।

মোঙ্গলিয়া ও সংলগ্ন পশ্চিমাঞ্চলে রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করে জেঙ্গিস খাঁ প্রথমেই চীন দেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে সি-সিয়া-দের আক্রমণ করলেন। কয়েকবার যুদ্ধের পর সি-সিয়া-রা বশ্যতা স্বীকার করল, এবং সেই সঙ্গে চীনে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কিন রাজ্য আক্রমণের পথও পরিষ্কার হয়ে গেল। কিন-দের সঙ্গে দ্বন্দ্বকলহের একটা সুযোগ° উপস্থিত হয়েছিল। কিন শাসক নিজেকে লিয়াও বংশীয় চীন-সম্রাট বলেই দাবি করতেন, সেই সূত্রে পশ্চিম প্রান্তের রাজ্যগুলির ওপর আধিপত্যের দুরাশাও পোষণ করতেন। নূতন সম্রাট ওয়েই ওয়াং সিংহাসনে আরোহণ করেই গোবি অঞ্চলে জেঙ্গিস খাঁ-র নিকট কর আদায় করবার জন্য দূত প্রেরণ করলেন। দূত এসে মোঙ্গল-রাজের হাতে সম্রাটের পরোয়ানাখানা দিলেন। সম্রাটের অধীনস্থ রাজাদের পক্ষে নতজানু হয়ে পরোয়ানা গ্রহণই নিয়ম, জেঙ্গিস খাঁ কিন্তু নমিত না হয়ে স্থির দাঁড়িয়ে রইলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, "কে এই নূতন সম্রাট?" "ওয়েই ওয়াং," রাজদূত জবাব দিলেন। নিষ্ঠীবন ত্যাগ করলেন জেঙ্গিস খাঁ, বললেন, "আমি মনে করতাম স্বর্গপুত্র একজন অসাধারণ ব্যক্তি। কিন্তু দেখছি, তিনি নির্বোধ, রাজসিংহাসনের অনুপযুক্ত। আমি কেন তাঁর কাছে নতি স্বীকার করব?" পরদিন জেঙ্গিস খাঁ দূতকে আহ্বান করে কিন (স্বর্ণ) সম্রাটের কাছে এই বার্তাটি বহন করতে বললেন, "আমাদের রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত, আমরা উত্তর চীন (Cathay) অভিযানে প্রস্তুত। স্বর্ণ-সম্রাট কি আমাদের অভ্যর্থনা করবার মত শক্তিসামর্থ্য রাখেন? আমরা সমুদ্রের মত গর্জনশীল সৈন্যবাহিনী সঙ্গে নিয়ে যাব। স্বর্ণ-সম্রাট যদি আমাদের বন্ধু হতে ইচ্ছা করেন তা হলে আমাদের অধীনে রাজ্যের শাসকরূপে থাকতে পারেন। আর যদি তিনি যুদ্ধ কামনা করেন তা হলে আমাদের এক পক্ষের জয়, অপর পক্ষের পরাজয় না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে।"

কিন বা জুচেন-দের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হল। ১২১৫ খৃস্টাব্দে কিন রাজধানী ইয়েন চিং (বর্তমান পিকিং) নগরের পতন ঘটল। কিন রা কা'ই ফেং নগরে রাজধানী স্থানান্তরিত করল। ১২১৯ খৃস্টাব্দে মোঙ্গলরা কোরিয়া দেশ জয় করল। পীত নদীর দক্ষিণে অপেক্ষাকৃত স্বল্প ভূখণ্ড এখনো কিন-দের দখলে ছিল বটে, কিন্তু উত্তরে মোঙ্গল অধিকার ও দক্ষিণে সুং সাম্রাজ্যের মাঝে পড়ে এই ক্ষুদ্র রাজ্যের অস্তিত্ব একান্ত বিপন্ন হয়ে পড়ল।

মোঙ্গলদের প্রতিরোধ করবার জন্য কিন-রা দক্ষিণাঞ্চলের সুং সম্রাটের সাহায্য ভিক্ষা করেছিল, কিন্তু চীনের ওপর কিন-দের আক্রমণের কথা সম্রাট বিস্মৃত হন নি, তাই সে প্রার্থনায় তিনি কর্ণপাত করেন নি।

কোরিয়া বিজয়ের অল্পকাল পরেই মোঙ্গলদের যুদ্ধোদ্যম পশ্চিম দিকে ঘুরল। চীন দেশে যুদ্ধ চালাবার ভার কয়েকজন সেনাপতির হাতে দিয়ে জেঙ্গিস খাঁ বোখারা, সমরকন্দ্ এবং পশ্চিমাঞ্চলের অন্যান্য দেশসমূহে, অকসাস (আমু) ও সিন্ধুতীরে, এমন কি ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলেও সামরিক অভিযান পরিচালনায় সর্বশক্তি নিয়োজিত করেছিলেন। এইসব অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেবার প্রয়োজন নেই। মোঙ্গলদের হিংস্র স্বভাব, ধ্বংসাত্মক কাযকলাপ সর্বত্রই ত্রাসের সঞ্চার করেছিল। আত্মরক্ষার জন্য যদি কোন নগর কিছুমাত্র বাধাদান করেছে, আত্মসমর্পণ করলেও সেখানকার অধিবাসীদের অব্যাহতি ছিল না, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলকেই নির্মমভাবে হত্যা করা হত। অধিকৃত দেশের নগর গ্রাম বিধ্বস্ত, শস্যক্ষেত্র ধ্বংস করে চারণ-ভূমিতে পরিণত করা হয়েছিল।*

জেঙ্গিস খাঁ পশ্চিমাঞ্চল থেকে প্রত্যাগমন করবার পর তাঁর সেনাপতিরা বললেন, "আমরা চীন দেশ অধিকার করেছি বটে, কিন্তু চীনারা একেবারে অকর্মণ্য, আমাদের কোন কাজেই তারা লাগে না। এখানে সকল ভূমিই শস্যক্ষেত্র, কিন্তু আমাদের প্রয়োজন চারণ-ভূমির, আমাদের ঘোড়াগুলি ঘাস খেতে পায় না চারণ-ভূমির অভাবে। খাঁ যদি আদেশ করেন তবে চীনাদের নির্মূল করে তাদের আবাদী জমিগুলিতে ঘোড়ার জন্য প্রচুর ঘাস জন্মানোর ব্যবস্থা করি।" জেঙ্গিস খাঁ সম্ভবত তাঁদের এই প্রার্থনা মঞ্জুর করতেন, কিন্তু

---

* এই নিরর্থক ধ্বংসকাণ্ড সম্বন্ধে একজন ইংরেজ লেখক বলেছেন, "Because Genghis Khan did not, like Alexander and Napoleon, make war on the world for personal and political aggrandizement, we have been mystified. The explanation of the mystery lies in the primitive simplicity of the Mongol's character He (the Mongol) took from the world what he wanted for his sons and his people. He did this by war because he knew no other means. What he did not want, he destroyed, because he did not know what else to do with it." (Harold Lamb)

সৌভাগ্যক্রমে তাঁর একজন পরম হিতৈষী চীনা সহচর ছিল, নাম ইয়েলু চু'ৎসা'ই, তাঁরই পরামর্শমত এই দুষ্কার্য থেকে তিনি বিরত হয়েছিলেন। দুর্ধর্ষ জেঙ্গিস খাঁকে ভারতের সিন্ধুতীর ত্যাগ করে চলে আসতে পরামর্শ দিয়েছিলেন এই মহানুভব পুরুষ, তাই ভারত রক্ষা পেয়েছিল। এখন তিনি চীনকেও সমূহ বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন। চীন বেঁচে থাকলে প্রচুর রাজস্ব আদায় করা চলবে, যা দিয়ে মোঙ্গলরা স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম জীবনভোর উপভোগ করতে পাববে, এই স্বার্থলোলুপ যুক্তি দেখিয়ে সুকৌশলে তিনি জেঙ্গিস খাঁর জিঘাংসা-বৃত্তিকে সংহত করতে পেরেছিলেন।

ইয়েলু চু'ৎসা'ই-র অপূর্ব জীবন-কাহিনী সত্যই বিস্ময়কর, এমন কি রোমাঞ্চকরও বলা চলে। তিনি ছিলেন দীর্ঘাকৃতি শ্মশ্রুধারী পুরুষ, উত্তর চীনের অধিবাসী, দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা ও ভেষজ-বিজ্ঞানে পারদর্শী। কিন-দের অধিকৃত চীনের অংশবিশেষ 'কাথে' দখলের সময়ে তিনি মোঙ্গলদের হাতে বন্দী হন। জেঙ্গিস খাঁ-র কাছে তাঁকে হাজির করা হল, তাঁর নাম ও পরিচয় শুনে মোঙ্গল-সম্রাট জানতে পারলেন, তিনি কিন-জাতীয় তাতার নন, খাঁটি চীনা, লিয়াং তুং-এর একজন রাজ-বংশী। জেঙ্গিস জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন-রা তোমার পরিবারের পুরনো শত্রু। তুমি তবে কেন তাদের সঙ্গে বাস করছিলে?" ইয়েলু জবাব দিলেন, "আমার পিতা কিন-দের রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। অন্যান্য আত্মীয়রাও ছিলেন তাদের কর্মচারী। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণকেই আমি কর্তব্য মনে করেছি।" জেঙ্গিস খাঁ খুশি হলেন, বললেন, "ভূতপূর্ব প্রভুর কাজে তুমি বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করেছ। তার কাজ যেমন করেছ তেমনি এখন তুমি আমার কাজ কর।" তখন থেকে ইয়েলু চু'ৎসা'ই হলেন জেঙ্গিস খাঁর পরামর্শদাতা। নির্ভয়ে বিজ্ঞোচিত পরামর্শ দিতেন, কখনো বিশ্বাসের অমর্যাদা করেন নি। একদা মোঙ্গল-সম্রাটকে বলেছিলেন, "অশ্বপৃষ্ঠে আপনি মহাদেশ জয় করেছেন। অশ্বপৃষ্ঠ থেকে শাসন পরিচালনা চলে না।"* তিনি জেঙ্গিস খাঁ চালিত সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে অশ্বপৃষ্ঠে ভ্রমণ করতেন,

* এখানে হ্যান-সম্রাট কাও-র প্রতি মন্ত্রী লু চিয়া-র উপদেশ-বাণী স্মরণ করা যেতে পারে। তিনিও বলেছিলেন, অশ্বপৃষ্ঠে শাসন পরিচালনা সম্ভব নয়। ইয়েলু-র এই বাক্য হয়তো বা হ্যান-মন্ত্রীর উপদেশ-বাণীর প্রতিধ্বনি।

এবং বিজয়ী সৈনিকেরা যখন লুণ্ঠনে ব্যাপৃত থাকত, তিনি সেই অবসরে নানান গ্রন্থ, জ্যোতিষ-পঞ্জী, ভেষজ প্রভৃতি সংগ্রহ করতেন। একজন ধনুর্ধর সেনাপতি একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "যোদ্ধবৃন্দ যার সহচর এমন ব্যক্তির বই-এর প্রয়োজন কি?" তিনি জবাব দিলেন, "ভাল ধনু তৈরি করতে হলে এমন ব্যক্তির প্রয়োজন যে কাঠের কাজে সুদক্ষ। তেমনি সাম্রাজ্য পরিচালনায় একজন সুবিজ্ঞ ব্যক্তির প্রয়োজন হয়।" জেঙ্গিস খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ওগোতাই-র সাম্রাজ্য পরিচালনা করতেন ইয়েলু চু'ৎ-সা'ই। শুধু শাসন ব্যাপারে নয়, শুভাশুভ সকল বিষয়েই তিনি প্রভুকে সদুপদেশ দিতেন। ওগোতাই ছিলেন মদ্যপ, ইয়েলু তাঁর স্বাস্থ্য বিষয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। উপদেশ যখন ব্যর্থ হল, তিনি তখন একটি লৌহ-পাত্র ভবে মদ রেখে দিলেন, এবং অনেকদিন পর যখন দেখা গেল পাত্রটির অভ্যন্তর ক্ষয় হয়ে গেছে, তখন সেই পাত্রটি ওগোতাই-কে দেখিয়ে বললেন, "মদের তেজে লোহা কেমন ক্ষয়ে গেছে দেখুন। মদ আপনার অন্ত্রগুলির কি অবস্থা করেছে ভাবুন তো।" এই ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত ওগোতাই-কে যে কিছুটা প্রভাবিত করে নি, তা নয়। সাময়িকভাবে তিনি মদ্যপানের অভ্যাস সংযত করেছিলেন, পরিশেষে কিন্তু অতিরিক্ত সুরাপানের ফলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

জেঙ্গিস খাঁর মৃত্যু হয় ১২২৭ খৃস্টাব্দে। সুবিস্তীর্ণ রণাঙ্গন থেকে তাঁর অন্তর্ধান অভিযাত্রীদের অগ্রগতির বিশেষ বাধা সৃষ্টি করে নি। জেঙ্গিস খাঁর তিন পুত্র ওগোতাই, চাটাগাই ও টুলি এবং একটি পৌত্রের মধ্যে তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য বণ্টন হয়েছিল বটে, কিন্তু গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারের পরিত্যক্ত সাম্রাজ্যের মত বিভক্ত অংশগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে নি। কারণ, মোঙ্গল প্রধানদের একটি জিরগা জেঙ্গিস খাঁর তৃতীয় পুত্র ওগোতাই-কে সমগ্র সাম্রাজ্যের শীর্ষরূপে নির্বাচিত করেছিল। এবার ওগোতাই পীত নদীর দক্ষিণে কিন-অধিকৃত অবশিষ্ট অংশ অধিকার করবার জন্য সেই অঞ্চল আক্রমণ করলেন। দীর্ঘ অবরোধের পর কিন-দের শেষ ঘাঁটি সাই চাও নগরের পতন ঘটল এবং সেই সঙ্গে কিন রাজবংশও বিলুপ্ত হয়ে গেল। এই যুদ্ধে মোঙ্গলদের সাহায্য করেছিলেন সুং সম্রাট, একটি বাহিনীও পাঠিয়েছিলেন চিরশত্রু কিন-দের উৎসাদিত করবার জন্য। সম্রাটের আশা ছিল, মোঙ্গলদের সাহায্যদানের ফলে কিন-দের কবল

থেকে তাঁর পূর্বপুরুষের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার সম্ভব হবে, কিন্তু অচিরেই তাঁকে নিরাশ হতে হয়েছিল, কেননা মোঙ্গলরা অধিকৃত রাজ্যের কোন অংশই তাঁকে প্রত্যর্পণ করে নি। তখন অপরিণামদর্শী সম্রাট কোনরূপ বিবেচনা না করেই কা'ই ফেং, লো ইয়াং প্রভৃতি নগরগুলি অধিকার করলেন। ওগোতাই অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে উত্তরাঞ্চলে প্রত্যাবর্তন করছিলেন, এই সংবাদ পেয়ে ফিরে এসে সুং রাজ্য আক্রমণ করলেন। জেচুয়ান প্রদেশ সহজেই মোঙ্গলরা অধিকার করল, কিন্তু ইয়াংসি নদীর পরপারে সুং সাম্রাজ্য আরও কিছুকাল অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিল।

১২৪১ খৃস্টাব্দে ওগোতাই-র মৃত্যুর পর দশ বছর-কাল মোঙ্গল অগ্রগতির বিরাম ঘটেছিল দুর্বল বিভক্ত নেতৃত্বের ফলে। এই সময়ে ওগোতাই-র বিধবা পত্নী ছিলেন পুত্র কাযুকের অভিভাবিকা। কাযুকের মৃত্যুর পরও কয়েক বৎসর এই বিধবাই সাম্রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন। ১২৫১ খৃস্টাব্দে মঙ্গু সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। মঙ্গু জেঙ্গিস খাঁর পুত্র টুলি-র জ্যেষ্ঠ পুত্র, তিনি অধিনায়ক হবার পর থেকেই আবার সাম্রাজ্যবিস্তৃতির পালা শুরু হল। পশ্চিম এশিয়ায় তাঁর ভ্রাতা হুলাগু খাঁ বোগদাদ, আলেপ্পো, দামাস্কাস অধিকার করে আব্বাসিড্ খালিফ বংশের মৃত্যুশয্যা প্রস্তুত করেছিলেন। অপর ভ্রাতা কুবিলায়কে পাঠালেন তিনি দক্ষিণ চীনের হোনান অঞ্চল অধিকারের জন্য, এবং নিজে সসৈন্যে সেনসি আক্রমণ করলেন। এখনকার ইউনান প্রদেশে নান-চাও নামে যে স্বাধীন রাজ্যটির কথা পূর্বে বলা হয়েছে, সেই রাজ্যটির অস্তিত্ব তখনো লুপ্ত হয় নি। নান-চাও অধিকার করে মোঙ্গল বাহিনী টংকিং-এও প্রবেশ করেছিল। প্রত্যাবর্তনের পথে জেচুয়ানে মঙ্গুর মৃত্যু হয় ১২৫৯ খৃস্টাব্দে। সেখান থেকে তাঁর মৃতদেহ মোঙ্গলদের রাজধানী কারাকোরামে বহন করা হয়েছিল, এবং শবদেহের এই সুদীর্ঘ যাত্রাপথে যে কোন জীব মোঙ্গলদের চোখে পড়েছে, জাতীয় প্রথামত সেই জীবকেই তারা হত্যা করেছিল।

কুবিলায় যখন ইয়াংসি নদী পার হয়ে সুং সাম্রাজ্য অধিকারের পথে বিজয়গর্বে এগিয়ে চলেছিলেন, সেই সময়ে ভ্রাতা মঙ্গুর আকস্মিক মৃত্যুর সংবাদ তাঁর কাছে পৌঁছল। সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে বিবাদের লক্ষণ দেখা দিয়েছিল, সেজন্য কুবিলায়কে সুং সম্রাটের সঙ্গে সন্ধি করে অচিরে

কারাকোরামে প্রত্যাগমন করতে হল। স্থং সম্রাট মোঙ্গলদের অধীনতা স্বীকার করলেন, এই ছিল সন্ধির একটি সর্ত, কিন্তু কুবিলায় সসৈন্যে প্রস্থান করবার পর স্থং কর্মকর্তারা সন্ধিভঙ্গ করতে দ্বিধা করলেন না। স্থং সেনাপতি মোঙ্গল শিবিরে অবস্থিত সৈন্যদেব অতর্কিতে আক্রমণ করে নিমূল করলেন। এই বিশ্বাসঘাতকতাব সংবাদ কুবিলায় যথাকালে পেলেন, প্রতিশোধ নেবাব সংকল্পও করলেন, কিন্তু রাজধানীতে উত্তরাধিকার নিয়ে যে বিবাদ আরম্ভ হয়েছিল তার মীমাংসাই তখন তাঁব প্রথম কর্তব্য হযে উঠেছিল। ইতিমধ্যে তাঁর ভ্রাতা আরিকবুগা সিংহাসন দখল করে বসেছিলেন, কুবিলায সসৈন্যে কারাকোরাম প্রবেশ করে ভ্রাতাকে সিংহাসন থেকে অপসারিত করলেন। ১২৭১ খৃস্টাব্দে সম্মিলিত জিরগা কুবিলায়কে মোঙ্গল জাতিব খান-খানান বা সর্বাধিনায়ক ('The Great Khan') রূপে নির্বাচিত কবল। ভ্রাতাকে কুবিলায় ক্ষমা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর পরামর্শদাতাদেব প্রাণদণ্ড হয়েছিল। এইরূপে সিংহাসনে নিজেকে স্থপ্রতিষ্ঠিত করে তিনি আবাব স্থং সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন।

স্থং-দের দুর্বলতা ও রাজনৈতিক নির্বুদ্ধিতা সত্ত্বেও সাম্রাজ্য বিজয় মোঙ্গলদের পক্ষে সহজসাধ্য হয় নি। হ্যান নদীর অপর তীবে হুপে প্রদেশের দুইটি নগর পাঁচ বছর অবরোধের পর আত্মসমর্পণ করে (১২৬৮-১২৭৩)। তখন মোঙ্গল বাহিনী ধীরে ধীরে এগিযে এসে রাজধানী হ্যাং-চাউ নগর অধিকার করে (১২৭৬)। শিশু সম্রাটকে বন্দী করে উত্তরাঞ্চলে পাঠানো হয়। তাবপর স্থং-সেনাপতিবা আর একটি শিশুকে সম্রাটরূপে খাড়া করে তাকে নিয়ে দক্ষিণ অঞ্চলে প্রস্থান করেন। ক্যানটন নগবেব পতন হয় ১২৭৭ খৃস্টাব্দে, পর-বছরে শিশু সম্রাটের মৃত্যু হয়। তখন একটি তৃতীয় শিশু সম্রাট তুলে ধবা হয়েছিল, এবং ১২৭৯ খৃস্টাব্দে কুয়ানটাং-এর একটি বন্দরে এই শিশু সম্রাটকে কোলে নিয়ে একজন নৌ-সেনাপতি কিরূপে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিলেন, সেই অবিস্মরণীয় কাহিনী ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। এইরূপে স্থং-দের বিরুদ্ধে যে অভিযান শুরু করেছিলেন ওগোতাই ১২৩৫ খৃস্টাব্দে, তারই পরিসমাপ্তি হল ১২৭৯ খৃস্টাব্দে।

স্থং বংশ ধ্বংস হল। কুবিলায় মহাচীনের অপরাজেয় একচ্ছত্র অধিপতি-রূপে ইউয়ান-বংশ প্রতিষ্ঠিত করলেন। স্থদূর গোবির মরু-নগর কারাকোরাম

থেকে রাজধানী পিকিং-এ স্থানান্তরিত করলেন। এই নগরটির পরিকল্পনা ও নির্মাণ তিনিই করেছিলেন, সেজন্য মোঙ্গলরা এই শহরটির নাম দিয়েছিল 'খান-বালিগ' (Cambuluc), অর্থাৎ খাঁ-র শহর। কুবিলায় শিক্ষালাভ করেছিলেন একজন চীনা পণ্ডিতের কাছে, শিক্ষার গুণে তাঁর রুচি মার্জিত, প্রবৃত্তিও সংযত হয়েছিল, তাই তিনি কারাকোরামের উষর, ধূসর, রুক্ষ, কঠিন পরিবেশ অপেক্ষা চীনা সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শকেই অধিকতর শ্রেয়ঃ বলে মনে করেছিলেন।

২. ইউয়ান বংশ (১২৭৯-১৩৬৮)

In Xanadu did Kubla Khan
A stately pleasure-dome decree,
Where Alph the sacred river ran
Through caverns measureless to man
Down to a sunless sea.

ইংরেজ কবি স্যামুয়েল কোলরিজ জানাডু নগরে কুবিলায় খাঁ-র একটি প্রাসাদ-ভবন নির্মাণ-কল্পনা উপরোক্ত কবিতাটিতে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। পবিত্র আল্‌ফ্ নদী বয়ে যায় প্রমোদ-ভবনের পাদদেশ চুম্বন করে, কত বন উপত্যকা পার হয়ে, পর্বতগুহার অপরিমেয় আঁধারপুঞ্জের ভিতর দিয়ে, পরিশেষে উল্লাসে কলধ্বনি করে রবিরশ্মিবিহীন প্রাণশূন্য সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আর সেই বিপুল কলকল নিনাদ কুবিলায়ের অন্তরে জাগিয়ে তোলে তাঁর পূর্বপুরুষগণের কণ্ঠে যুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী। আশ্চর্য নির্মাণ-কৌশল এই প্রমোদ-ভবনের, রবিকরোজ্জ্বল প্রমোদ-ভবন, তারই সাথী হিমশীতল তুষার-কন্দর! সত্য, এসব কথা কবি-কল্পনা, জীবনানন্দ ও মৃত্যুর বিভীষিকা, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ, কিন্তু কোলরিজের এই অপরূপ ছবিকে কুবিলায়ের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের প্রতিবিম্ব বলে মনে করলে কিছুমাত্র ভুল করা হবে না। কুবিলায়ের সাম্রাজ্যের আয়ুষ্কাল ছিল মাত্র ৮৯ বৎসর, তারপর সেই সাধের সৌধটির স্বপ্ন চিরদিনের মত শূন্যে বিলীন হয়ে গিয়েছিল।

কুবিলায়ের চীনা নাম সি সু, রাজত্বকাল ১২৫৯-১২৯৪ খৃস্টাব্দ। এই

সময়কে বলা হয় 'মোঙ্গল শাসনের স্বর্ণযুগ'।* ইউরোপ ও এশিয়ার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে বিশাল মোঙ্গল সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হলেও মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া প্রভৃতি দূর অঞ্চলে তাঁর প্রকৃত আধিপত্য ছিল নামমাত্র। এইসব দেশের শাসন-ভার ছিল মোঙ্গল পবিবারের আত্মীয় প্রদেশপালদের ওপর, তাঁরাই ছিলেন সেখানকার সর্বময় কর্তা। পূর্ব তুর্কীস্থান (সিনকিয়াং) এবং দক্ষিণ সাইবেরিয়া অঞ্চলে কাযেদু নামে কুবিলায়ের জনৈক আত্মীয় শুধু তাঁর প্রভুত্ব অস্বীকাব করেই ক্ষান্ত হয় নি, সে মোঙ্গলিয়া আক্রমণ করেছিল, এবং যুদ্ধে কখনো তার জয়লাভ না হলেও কুবিলাযের মৃত্যু পর্যন্ত অক্লান্ত উদ্যমে প্রতিরোধ চালিয়ে গিয়েছিল। মাঞ্চুরিয়া ও কোবিযার মোঙ্গল শাসক চেপি নয়ান নামে জনৈক সেনাপতি বিদ্রোহী হযেছিল, কিন্তু পরিশেষে তার যুদ্ধে মৃত্যু ঘটল। কুবিলায়ের জীবনকালেই পশ্চিম অঞ্চলেব সঙ্গে কেন্দ্র-শক্তির বন্ধন শিথিল হয়ে পড়েছিল, তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পবেই প্রদেশগুলি একেবারে বিচ্ছিন্ন হযে গেল। ১২৯৫ খৃস্টাব্দে পশ্চিমের মোঙ্গল খান বা শাসকেরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল, এবং এই ধর্মান্তর গ্রহণই মোঙ্গল সাম্রাজ্যেব অবশিষ্ট সংহতিটুকুও বিনষ্ট কবেছিল। কুবিলায ছিলেন বৌদ্ধ, তাঁব বংশধরেবা 'কাফেব' বলে মুসলমান মোঙ্গলগণ তাঁদের নামমাত্র আধিপত্যও অস্বীকার করেছিল।

এমনি হিমশীতল মৃত্যু-পরিবৃত মোঙ্গল স্বপ্ন-রাজ্য তখন বাহ্যত অপরাজেয় বলেই বোধ হয়েছিল, যদিও সকল ক্ষেত্রে সাম্রাজ্য প্রসারের চেষ্টা সফল হয নি। কোরিয়ায় বিদ্রোহ দমন করা হয়েছিল, নানা বাজ্যে দূত প্রেরণ করা হল নৃপতিদের বশ্যতার স্বীকৃতি গ্রহণের জন্য। চম্পা (বর্তমান ক্যাম্বোডিয়া) মোঙ্গলদের আধিপত্য স্বীকার করেছিল কিন্তু চম্পা-রাজ স্বয়ং কুবিলায়ের দরবাবে উপস্থিত হতে সম্মত হন নি বলে সে দেশ আক্রমণ করা হল (১২৮২)। চম্পা-রাজের সৈন্যরা মোঙ্গলদের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে যুদ্ধ করল না, আড়ালে থেকে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে গেল। আনামের বিরুদ্ধেও অভিযান

* "He (Kubilai) ruled over an wider extent than any Mongol or any other sovereign. He was the first to govern by peaceful means. The splendour of his court and magnificence of his entourage surpasses that of any Western ruler." (*The Cambridge Medieval History*)

প্রেরিত হয়েছিল, স্থং-দের সমর্থকেরা সেখানে আশ্রয় নিয়েছে এই ওজুহাতে। এখানেও কয়েকবার সংগ্রামে মোঙ্গল সৈন্যরা জয়লাভ করল বটে, কিন্তু অরণ্যভূমির ভাপসা গরম সহ্য করতে না পেরে পরিশেষে শ্রান্ত জ্বরাক্রান্ত হয়ে তাদের সে দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল (১২৮৭ খৃঃ)।

জাপানের বিরুদ্ধে কুবিলায়ের যুদ্ধোদ্যম শোচনীয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। ১২৬৮ খৃস্টাব্দ থেকে কয়েকবার তিনি জাপানের বশ্যতার স্বীকৃতি আদায়ের জন্য হুকুমনামা সহ দূত পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু প্রতিবার জাপানীরা সে আদেশ ঘৃণার সহিত প্রত্যাখ্যান করেছিল। ১২৭৪ খৃস্টাব্দে মোঙ্গল বাহিনী জাপানের কিউসি দ্বীপে অবতরণ করল। দ্বীপ অধিকৃত হল, জাপানীরা কিন্তু পরাজয় স্বীকার করল না, ক্রমাগত আক্রমণ চালিয়ে গেল। পরিশেষে মোঙ্গলদের দ্বীপ ছেড়ে জাহাজে উঠতে হয়েছিল। প্রত্যাগমনের পথে সমুদ্রে ঝড় উঠে মোঙ্গল নৌ-বহরের বিস্তর ক্ষতি হল। কিন্তু পরাজয় সত্ত্বেও কুবিলায় জাপান অধিকারের সংকল্প পরিত্যাগ করেন নি। ১২৮১ খৃস্টাব্দে একটি বিরাট নৌ-বহর (Armada) মোঙ্গল, চীনা ও কোরীয় সৈন্য নিয়ে জাপান আক্রমণের জন্য প্রেরিত হয়। আবার তারা জাপানের একটি দ্বীপ অধিকার করে, কিন্তু তাদের জল ও স্থল উভয় দিক থেকেই প্রবল জাপানী আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এবারও ঝটিকা-ক্ষুব্ধ সমুদ্রে অনেকগুলি আক্রমণকারী জাহাজ জলমগ্ন হল।* এই দ্বিতীয় পরাজয়ের পর নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত কুবিলায় জাপান অধিকারের দুঃস্বপ্ন ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। সৈন্যবাহিনী এই বিঘ্নসংকুল সামুদ্রিক অভিযানের বিরোধী হয়ে উঠেছিল, যেহেতু শুষ্ক ভূমির ওপর সংগ্রামে অপরাজেয় হলেও জলযুদ্ধে তারা আদৌ অভ্যস্ত ছিল না।

ব্রহ্মদেশে কুবিলায়ের সামরিক অভিযান অপেক্ষাকৃত সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল, যুদ্ধে জয়লাভ করে মোঙ্গল বাহিনী ইরাবতী উপত্যকায় অবতরণ

---

* জাপানী ঐতিহাসিকেরা কুবিলায়ের এই নৌ-অভিযানের সঙ্গে ১৫৮৮ খৃস্টাব্দে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে স্পেনের রাজা ফিলিপ কর্তৃক প্রেরিত 'আরমেডা'র তুলনা করে থাকেন। তখন ইংলণ্ডের রানী ছিলেন এলিজাবেথ, তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করে স্পেনের প্রভুত্ব ইংলণ্ডে প্রসারিত করবার জন্য ওই আরমেডা পাঠানো হয়েছিল। ইংলিশ চ্যানেলে ব্রিটিশ রণতরীর আক্রমণে ছত্রভঙ্গ এবং ঝঞ্ঝাবাত্যার প্রকোপে বিধ্বস্ত ফিলিপের নৌ-বহর কুবিলায়ের যুদ্ধ-জাহাজগুলির মতই জলমগ্ন হয়েছিল।

করেছিল। কিন্তু ব্রহ্ম-বিজয়ও স্থায়ী হয় নি। জাভা দ্বীপপুঞ্জ অধিকারের জন্য মোঙ্গল ও চীনা সৈন্য সহ একটি নৌ বহর প্রেরিত হয়েছিল। যুদ্ধে জয়লাভ সত্ত্বেও দূরত্বের অন্তরায়, উষ্ণ দেশের প্রতিকূল পরিবেশে অপরিমিত লোকক্ষয় ও অন্যান্য অসুবিধার জন্য সৈন্যবাহিনীকে অচিরেই চীনে প্রত্যাগমন করতে হয়েছিল। রিউ-কিউ দ্বীপ আক্রমণের উদ্যোগও ব্যর্থ হল। শ্যামদেশ কুবিলায়কে কর প্রেরণ করেছিল, যদিও সেখানে কোন মোঙ্গল বাহিনী পদার্পণ করে নি। কুবিলায়ের দূত জলপথে দক্ষিণ ভারত, এমন কি আফ্রিকার ম্যাডাগাসকারেও এসে উপনীত হয়েছিল, রাজনৈতিক দেশজয়ের উদ্দেশ্যে নয়, বাণিজ্যিক সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য।

প্রভূত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও কুবিলায় সাম্রাজ্যের সীমা অনেকখানি প্রসারিত করেছিলেন। দক্ষিণ-পশ্চিমের ইউনান প্রদেশ বহু শতাব্দ ধরে স্বাধীনতা রক্ষা করে এসেছিল, এখন এই অঞ্চলটি চিরদিনের মত চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল। সুবিশাল মোঙ্গল সাম্রাজ্যের এরূপ চমকপ্রদ অভ্যুত্থান জাতির ও জাতির প্রধানদের গভীর নিষ্ঠা ও অদম্য শক্তির পরিচায়ক সন্দেহ নেই। শক্তিবলে তাঁরা দূরবিস্তৃত বিভিন্ন দেশগুলিকে একচ্ছত্র সম্রাটের অধীনে একীকরণে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু এই কার্যের চেয়েও আর একটি দুরূহতর সমস্যার সমাধানের ওপর সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব নির্ভর করে, সাম্রাজ্যের ভিতর বিভিন্ন জাতির ও সংস্কৃতির সমন্বয়ে একটি মহাজাতির গঠন করাই সেই সমস্যা। অবস্থা-বৈগুণ্যে মোঙ্গলদের এই মহাজাতি গঠনের সকল উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছিল, এবং সেইজন্যেই তাসের ঘরের মত সাম্রাজ্যটি অল্পকাল-মধ্যে ভেঙে পড়েছিল।

১২৯৪ খৃস্টাব্দে কুবিলায়ের মৃত্যু হয়, তখন তাঁর বয়স আশি বৎসর। তাঁর বংশধরেরা ছিল দুর্বল ও অল্পায়ু। মোঙ্গল সাম্রাজ্য আরও ৭৪ বৎসর টিঁকে ছিল। এই সময়ের মধ্যে, অর্থাৎ ১২৯৫ থেকে ১৩৩৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত, সাতজন মোঙ্গল সম্রাট দ্রুত পরম্পরায় সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। এই অযোগ্য সম্রাটগণের নাম ও বিবরণ দিয়ে কাহিনীকে ভারাক্রান্ত করবার আবশ্যক নেই। সকলেই তাঁরা চীনা সভ্যতায় প্রভাবিত হয়েছিলেন, মোঙ্গলদের অভ্যাস-প্রকৃতি বর্জন করে চীনাদের মতই শান্তিপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। অন্যান্য দেশগুলিতেও মোঙ্গলরা নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতি বিসর্জন দিয়ে সেখানকার স্থানীয় আচার-পদ্ধতি, এমন কি ধর্মও গ্রহণ করেছিল।

পারস্য ও ট্রানস্-অকসেনিয়ায় মোঙ্গল শাসকেরা মুসলমান হয়েছিল, তারা এখন কুবিলায়ের বংশধরদের আনুগত্য অস্বীকার করল। কুবিলায় তাঁর পিতা ও পিতামহের মত তিব্বতী সামান-পন্থী বৌদ্ধ ছিলেন, তাঁর বংশধরেরাও ছিলেন বৌদ্ধ এবং কুবিলায়ের মতই সকল ধর্মের প্রতি ন্যায়-সংগত উদার ব্যবহার করতেন।

সর্বশেষ মোঙ্গল সম্রাট স্থন তি (১৩৩৩-১৩৬৮)। সিংহাসনে আরোহণ করেন তিনি বাল্যকালে, বয়সের সঙ্গে তাঁর চারিত্রিক দৌর্বল্য ও ভোগ-বিলাস দেখা দিয়েছিল। তাঁর রাজত্বকালে সাম্রাজ্য অধোগতির পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছিল। তখন রাজমন্ত্রী ছিলেন বায়ান, তিনি একজন হিংস্র-স্বভাব মোঙ্গল, চীনাদের আন্তরিক ঘৃণা করতেন। বায়ানের পরামর্শমত চীনাদের বিরুদ্ধে আপত্তিকর আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল, যেমন মোঙ্গল ভাষায় চীনাদের কথা বলা নিষিদ্ধ করা, পরিধেয় বস্ত্রের বর্ণের নির্দেশ, চীনাদের সামগ্রিক হত্যা (mass massacre) প্রথার পুনঃপ্রবর্তন। বিদ্রোহ জেগে উঠল। 'পাই লিয়েন লুই' বা 'শ্বেত পদ্ম সমিতি' নামে একটি গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আমরা দেখতে পাব, এই সমিতির বিপ্লবাত্মক ক্রিয়া-কলাপ দীর্ঘকাল ধরে চলেছিল এবং দূর ভবিষ্যতে মাঞ্চুদের শাসনকালে ঘোর বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল। মোঙ্গল রাজমন্ত্রী বায়ান বিদ্রোহী চীনাদের ওপর নানারূপ নিগ্রহ-নির্যাতন শুরু করলেন। উত্তরাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ, পীত নদীর উপত্যকা ভূমিতে অশান্তি দেখা দিল। রাজকোষে অর্থাভাব ঘটল, সেই অভাব পূরণের জন্য প্রাচীন চীনা পদ্ধতিমত কাগজের নোট ছাপানো হল। মুদ্রাস্ফীতি নিতান্ত অনিবার্যভাবেই দেখা দিল, এবং তার ফলে অচিরেই নোটগুলি একেবারে মূল্যহীন হয়ে পড়ল। প্রজাসাধারণের দুর্দশার আর সীমা রইল না।

বিদ্রোহের আগুন চার দিকে জ্বলে উঠল, একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সুযোগ্য পুরুষ ছিলেন বিদ্রোহীদের নেতা, কিন্তু এই নেতার আবির্ভাব হতে প্রচুর সময় লেগেছিল। এই নেতা চু ইউয়ান চ্যাং, তাঁর জীবন চীনা ইতিহাসের একটি রোমাঞ্চকর কাহিনী। ১৩২৮ খৃস্টাব্দে আনহুই প্রদেশে দরিদ্র কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম, সতর বছর বয়সে দুর্ভিক্ষের সময় তাঁর পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হয়, তখন তাঁকে জীবিকার জন্যেই একটি বৌদ্ধ মন্দিরে প্রবেশ

করতে হয়েছিল। কয়েক বৎসর পর সন্ন্যাসীর গেরুয়া বস্ত্র ছেড়ে অসি গ্রহণ করলেন তিনি মোঙ্গলদের দেশ থেকে বিতাড়িত করবার জন্য, এবং সমর-কৌশলে, দক্ষতা-গুণে অচিবে বিদ্রোহী বাহিনীর নেতার স্থান অধিকার করলেন। ১৩৫৫ খৃস্টাব্দে তিনি ন্যানকিং অধিকার করেন। ইয়াংসি উপত্যকার নিম্নভাগে বিশাল ভূখণ্ড অধিকার করে 'উ-র রাজা' (Prince of Wu) নাম গ্রহণ করেন। তারপর উত্তব দেশ আক্রমণের পালা আরম্ভ হল। ১৩৬৮ খৃস্টাব্দে মোঙ্গল রাজধানী ক্যামবালুক (বর্তমান পিকিং) নগর অধিকৃত হল। সেই বছর বিদ্রোহী নেতা চু ইউয়ান চ্যাং সম্রাট হুং উ নাম গ্রহণ কবলেন। ভয়ার্ত মোঙ্গল-রাজ স্থন তি নিশীথরাত্রের অন্ধকারে উত্তরাঞ্চলের সেই জনশূন্য, রুক্ষ, কঠিন প্রান্তরভূমিতে পলায়ন করলেন যেখান থেকে এক শতকের অল্পকাল পূর্বে তাঁরই দিগ্বিজয়ী পিতৃপুরুষগণ চীন দেশে নেমে এসে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। পূর্বপুরুষের মরু-অঞ্চলে বছর দুইয়ের মধ্যেই স্থন তি-র মৃত্যু হয়।

কুবিলায়-প্রতিষ্ঠিত ইউয়ান বংশ ধ্বংস হল। চু ইউয়ান চ্যাং সম্রাট হুং উ নাম গ্রহণ করে সুপ্রসিদ্ধ মিং বংশের প্রতিষ্ঠা করলেন (১৩৬৮ খৃঃ)।

৩. আভ্যন্তরীন অবস্থা ও ব্যবসা-বাণিজ্য

কুবিলায়েব শাসন-পদ্ধতি ও সাম্রাজ্যেব অবস্থার কথা মার্কো পোলোর বিবরণ থেকে বিশেষভাবে জানা যায়। মার্কো পোলো ছিলেন একজন ইতালীয় পর্যটক, রাজকার্য গ্রহণ করে দীর্ঘকাল চীনে অবস্থান করেছিলেন. তাঁর জীবন-কাহিনী আমবা বিদেশীদের আগমন প্রসঙ্গে এখনি বর্ণনা করব। সাম্রাজ্যের বিশালতা ও সার্বভৌমত্ব, শাসন-ব্যবস্থা, বিপুল ঐশ্বর্য, ঠাট ও জাঁকজমক, চীনা সভ্যতার বৈশিষ্ট্য, সকল বিষয়ে একটি বর্ণোজ্জ্বল রূপের ছাপ তরুণ বিদেশীব অন্তরে গভীরভাবে অঙ্কিত হয়েছিল, তাঁকে বিস্ময়-মুগ্ধ করেছিল। কুবিলায়ের মহিমা কীর্তন করেছেন মার্কো পোলো পরম উৎসাহ-ভরে, সেই উচ্ছ্বাসের তলে কিন্তু সাম্রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা একেবারে চাপা পড়ে গেছে। কুবিলায়ের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল ধ্বংসস্তূপের ওপর, সেই স্তূপের মধ্যে প্রোথিত অসংখ্য নর-কঙ্কাল, এই সত্য জানতে অনুমানের আশ্রয়

নিতে হয় না, সমকালীন আদমসুমারির পরিসংখ্যানই তার প্রমাণ। স্থং যুগে চীন দেশের জনসংখ্যা ছিল দশ কোটি, কুবিলায়ের রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের আয়তন প্রভূত পরিমাণে বর্ধিত হওয়া সত্ত্বেও জনসংখ্যা হ্রাস পেয়ে মাত্র পাঁচ কোটি নয় লক্ষে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেখা যায়, মার্কো পোলো বর্ণিত স্বর্ণরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে কুবিলায়কে পাঁচ কোটিরও অধিকসংখ্যক চীনা জীবন বলি দিতে হয়েছিল।

মার্কো পোলোর বর্ণনায় কুবিলায়ের যে দুটি বিশেষ গুণ ইউরোপের আত্যন্তিক প্রশংসা অর্জন করেছিল, সেই গুণদ্বয়ের একটি পরধর্মসহিষ্ণুতা, অপরটি বিশ্ব-প্রেম, অর্থাৎ বিদেশীর প্রতি সহানুভূতি, রাজকার্যে বিদেশীদের নিয়োগ যার চূড়ান্ত প্রমাণ। কুবিলায় তাঁর পিতৃপুরুষের আদিম 'সামান' অনুষ্ঠানাদি যথারীতি নির্বাহ করতেন, তিনি ছিলেন তিব্বতী বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী। মোঙ্গল লিখন উইঘারদের লেখার অনুরূপ, কুবিলায় সেই লিখন পরিবর্তন করে তিব্বতী বর্ণমালার ধাচের লিখন প্রবর্তন করেছিলেন বৌদ্ধ-ধর্মের প্রতি বিশেষ অনুরাগবশতই, কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্যান্য ধর্মকে বৌদ্ধ-ধর্মের সমান সুযোগ-সুবিধা দান করতে কুণ্ঠিত হন নি। বৌদ্ধ শ্রমণ, তাও ও নেস্টোরীয় পুরোহিত, মুসলমান মোল্লা সকলেই তাঁরা করদান থেকে সমভাবে নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন। কিন্তু তাও-ধর্মের মন্ত্রতন্ত্রের ইন্দ্রজালকে তিনি কখনো প্রশ্রয় দেন নি, এবং তাও-তে-কিং গ্রন্থ ভিন্ন সকল তাও-গ্রন্থই ধ্বংস করবার আদেশ দিয়েছিলেন। সর্বধর্মের প্রতি তাঁর সমদৃষ্টি ইউরোপের বিস্ময়ের কারণ হয়েছিল, যেহেতু তৎকালীন খৃস্টান ও মুসলিম জগতের ধর্মীয় গোঁড়ামির মধ্যে ঔদার্যের স্থান ছিল অল্পই। কিন্তু চীন দেশে পরধর্মসহিষ্ণুতার ঐতিহ্য দীর্ঘকাল ধরে চলে এসেছিল, হ্যান থেকে শুরু করে প্রতিটি চীনা রাজবংশ এই মহা নীতির অনুসরণ করেছে। মধ্য এশিয়া ও ভারত থেকে দলে দলে শ্রমণেরা এসেছে, চীন তাদের সাদরে বরণ করে নিয়েছে, ভারতীয় ভাস্করগণ নানা স্থানে শিল্প সৃষ্টি করেছে, চীন সেই প্রতিভার সম্মান করেছে ভাস্করের সমর্থকরূপে। চীনাদের চরিত্রগত জিনিস এই বিশ্বজনীন ঔদার্যের অভিব্যক্তি, পক্ষান্তরে কুবিলায়ের বিদেশী পোষণ, গুরুত্বপূর্ণ কর্মে বিদেশী নিয়োগ এসব করা হয়েছিল রাজনৈতিক কারণে, চীনাদের প্রতি অবিশ্বাসই সেই কারণ। চীনের শাসন-পদ্ধতির বিশেষ কোন পরিবর্তন করা হয় নি

বটে, কিন্তু দায়িত্বের কাজগুলি চীনাদের প্রায়ই দেওয়া হত না। চাকরি পরীক্ষা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, নিয়োগ ব্যাপারে বিদেশীদের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে না হয় সেইজন্যে। চীনাদের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছিল, তাদের পক্ষে অস্ত্র রাখা ছিল নিষিদ্ধ। এরূপ অবস্থায় মোঙ্গলদের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ চীনাদেব স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। কুবিলায়ের মুখ্য মন্ত্রী ছিল আহমদ নামে একজন বিদেশী মুসলমান, সে ছিল অত্যাচারী, কদাচারী ও অর্থগৃধ্নু, তার উৎপীড়নের প্রতিশোধ নিয়েছিল একজন চীনা দেশপ্রেমিক প্রাসাদ-মধ্যে তাকে হত্যা করে। এই ঘটনাটি থেকে বেশ বোঝা যায়, কুবিলায়ের শাসন কখনো জনপ্রিয় হয়ে ওঠে নি।

পররাজ্যাপহারীর স্বাভাবিক দোষক্রটির কথা ছেড়ে দিলে কুবিলায় কয়েকটি জনহিতকর অনুষ্ঠানের দাবি করতে পারেন। এক হাজার মাইল দীর্ঘ যে বৃহৎ খাল সুই সম্রাটেরা খনন করেছিলেন, কুবিলায় সেই প্রাচীন মজা খালটির সংস্কার করলেন উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের দূরবিস্তৃত সাম্রাজ্যে সংযোগ-ব্যবস্থার জন্য। ডাক চলাচলের সুবিধা করেছিলেন তিনি কয়েকটি রাজপথ নির্মাণ করে। প্রজাদের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতি তাঁর দৃষ্টি ছিল সতর্ক। সরকারী শস্য-গোলা নির্মাণ করেছিলেন তিনি, যদিও চীনে এই ব্যবস্থা নূতন নয়। তা ছাড়া বয়োবৃদ্ধ পণ্ডিত, অনাথ-আতুরদের খাদ্য বিতরণের বন্দোবস্ত করেছিলেন। তিনি জনশিক্ষায় উৎসাহী ছিলেন। একটি আকাদামি স্থাপন করেছিলেন তিনি, সেই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে অনেক চীনা পণ্ডিত নিযুক্ত হয়েছিলেন।

পূর্বে বলা হয়েছে কুবিলায় রাজধানীকে কারাকোরামের মরু-অঞ্চল থেকে সরিয়ে এনে খানবালিক (ক্যামবালুক) বা বর্তমান পিকিং নগরে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। প্রকাণ্ড নূতন নগর গড়ে উঠেছিল, অতুল ঐশ্বর্যশালী জনাকীর্ণ রাজধানী দেশী-বিদেশীর, এমন কি ইউরোপীয়ানদেরও বিস্ময়ের বস্তু হয়ে উঠেছিল। আমরা দেখেছি সুং যুগে মধ্য এশিয়া ও পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে চীনের সংযোগ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, এখন একচ্ছত্র সাম্রাজ্যে মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া চীনের সঙ্গে গ্রথিত হবার ফলে সংযোগ-ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শাসনকার্যে বিদেশী নিযুক্ত হত বলে রাজপদ লাভের আশায় অন্য দেশ থেকে চীনে অনেক লোক আসত, তা ছাড়া মোঙ্গল সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেবার

জন্য দলে দলে বিদেশী আগন্তুক এসে জুটত। মোঙ্গল শাসন-ব্যবস্থার গুণে বাণিজ্যপথগুলি নিরাপদ হয়ে উঠেছিল, বণিকেরা পণ্যসম্ভার নিয়ে নির্বিঘ্নে যাতায়াত করত। এ সময়ে চীনে বিদেশী বাণিজ্যের প্রভূত সংবৃদ্ধির কারণ এই নিরাপত্তাবোধ, এত বৃহৎ বাণিজ্য-ক্ষেত্র এখানে পূর্বে কখনো দেখা যায় নি। উত্তর আফ্রিকা থেকে ইবন বাতুতা নামে জনৈক পর্যটক এসেছিলেন, তিনি চীনে প্রতিষ্ঠিত বিদেশী বণিকদের একটি বৃহৎ উপনিবেশের বর্ণনা দিয়েছেন। আরবরা একজন কাজী ও সেখ-উল-ইসলাম-এর শাসনাধীনে থাকত। চীনা বণিকরাও এখন স্থলপথে বিদেশযাত্রা শুরু করেছিল, চীনা জাহাজ জাভা, ভারত ও সিংহলে যেত, চীনা ইঞ্জিনিয়রগণ ইউফ্রেটিস-টাইগ্রিস উপত্যকায় পূর্তকার্যে নিযুক্ত ছিল। রাশিয়ার মস্কো, নভোগোরাদ, তাব্রিজ প্রভৃতি নগরে চীনা উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। ইউয়ান সম্রাটেরা দক্ষিণ ভারতের অন্তত দুটি রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন তার প্রমাণ আছে।

বাণিজ্য জলপথ ও স্থলপথ, উভয় পথেই চালানো হত। স্থলপথ ছিল সিনকিয়াং বা চীনা তুর্কীস্থানের মধ্য দিয়ে, বাণিজ্যপথের শহর ও বন্দরগুলি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এই শহরগুলির মধ্যে সকলের চেয়ে প্রসিদ্ধ ছিল ফুকিয়েন প্রদেশে অবস্থিত বর্তমান চুয়ান-চৌ, ইউরোপীয় পর্যটকেরা নগরটির নাম দিয়েছিল 'জাইটুন' (Zaitun)। আমদানি-রপ্তানির পণ্য ছিল সবই বিগতকালের মত, রেশম ছিল প্রধান রপ্তানির সামগ্রী। এখন কিছু কিছু পর্সিলেন ও অন্যান্য দ্রব্য রপ্তানি হতে শুরু হয়েছিল। আমদানির সওদাপত্রের মধ্যে ছিল মসলা, মুক্তা, দামী পাথর, সূক্ষ্ম সূতার কাপড়। এই বাণিজ্যিক দেনাপাওনার ব্যাপারে মোঙ্গল শাসকেরা যে বিব্রত হয়ে পড়েন নি, তা নয়। তাম্রমুদ্রা ও রৌপ্যের বিদেশে অন্তর্ধান রীতিমত উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছিল।

চীনারা পশ্চিম ইউরোপে গিয়েছিল কি না সে কথা জানা নেই, যদিও তাদের রাশিয়ায় আগমনের বিষয় পূর্বে বলা হয়েছে। কিন্তু ইউরোপের কাছে মোঙ্গল জাতি অপরিচিত ছিল না। মোঙ্গলদের ইউরোপ আক্রমণ-কালে পোল, ব্যাভিরিয়ান ও অন্যান্য টিউটনিক জাতি সমরক্ষেত্রে তাদের বলবীর্যের পরিচয় পেয়েছিল। মোঙ্গল সাম্রাজ্য থেকে নানান জাতির লোকেরা

যে স্থলপথে ইউরোপে আসা-যাওয়া করত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ১২৮৭ কিংবা ১২৮৮ খৃস্টাব্দে রব্বান সাউমা নামে একজন উইঘার জাতীয় নেস্টোরীয় খৃস্টানের রোম, বোরদোঁ ও প্যারিসে আগমন হযেছিল কূটনৈতিক দৌত্যকার্যের প্রযোজনে। ইউরোপ তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল, কি জনবল, কি আর্থিক সম্পদ কোন বিষযেই ইউবোপ বিশাল চীন সাম্রাজ্যের সমকক্ষ ছিল না। এরূপ অবস্থায ইউরোপে চীনা ভ্রমণকাবী অপেক্ষা চীন দেশে অর্থোপার্জন উদ্দেশ্যে আগত ইউরোপীযানদেব সংখ্যাই বেশি হওযা স্বাভাবিক। জেনোয়া ও ভিনিসের অনেক ব্যবসাযী চীনে গিযেছিলেন সে বিষযে কোন সন্দেহ নেই, তবে তথ্যের অভাবে তাঁদেব সংখ্যানির্ণয সম্ভব হয নি।* সুবিস্তীর্ণ মোঙ্গল সাম্রাজ্যের চীন ও ইউরোপের ওপর ঘাত প্রতিঘাতের ফল হযেছিল কিরূপ সে কথা বিবেচনা কবলে দেখা যায, পশ্চিম এশিযার ছোট ছোট মুসলিম রাষ্ট্রগুলির অন্তর্ধানের সঙ্গে বাণিজ্যপথ মুক্ত হযে গিযে ইউরোপে দূরপ্রাচ্য সম্বন্ধে ভৌগোলিক জ্ঞান যথেষ্ট বর্ধিত হযেছিল, এবং সে হিসাবে ইউরোপ হয়েছিল লাভবান, কিন্তু চীনের পক্ষে মোঙ্গল সাম্রাজ্য লাভের চেযে ক্ষযক্ষতির কাবণই হযেছিল বেশি। এশিযাব পশ্চিম অঞ্চলের সঙ্গে চীনের পরিচয় দীর্ঘকালেব, সে দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শের নূতন সুযোগ পবাধীনতার নানাবিধ অসুবিধাব ক্ষতিপূরণ কবতে পারে নি। পক্ষান্তরে দূরপ্রাচ্যের সভ্যতা ও সমৃদ্ধি এখন আর ইউরোপের স্বপ্ন-কল্পনা মাত্র ছিল না, সেই ঐশ্বর্যের যে চাক্ষুষ বিবরণ ইউবোপীয পবিদর্শকেবা দিযে গেছেন, পরবর্তী কালে তাই ইউরোপে প্রাচ্যেব জলপথ অন্বেষণের প্রেরণা যুগিয়েছিল, নৌ-অভিযানে বেবিযেছিল অভিযাত্রীবা, যাব ফলে সম্ভব হযেছিল কলম্বাস ও ভাস্‌কো-দা-গামাব যুগান্তকারী দুইটি আবিষ্কার, আমেরিকার আবিষ্কার আর উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করে প্রাচ্যের জলপথেব আবিষ্কার।

---

* পূব ইউবোপ অধিকার করে সেখান থেকে অনেক ইউরোপীয় বন্দী নিযে এসেছিল মোঙ্গলবা। মোঙ্গলরাজ মঙ্গু খাঁর রাজধানী কারাকোরামেব বর্ণনায় ফ্রা রুব্রুক নামে জনৈক খৃস্টান পাদ্রী বলেছেন: "There were vast multitude of Hungarians Alans, Ruthenians, Russians and Georgians who had all received the sacrament since they were taken prisoner"—Fra Rubruque's account of the Travelling Court of Mongu Khan.

৪. পোলোগণ ও অন্যান্য বিদেশী পর্যটকদের কথা

পূর্বে আমরা চীন ও পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে যে বাণিজ্যপথের কথা বলেছি, সেই পথ ছিল সংখ্যায় দুটি : একটি কৃষ্ণসাগরেব উপকূল দিযে গিয়ে ভলগা নদী পার হয়ে মধ্য এশিযায় ইলি দেশ অতিক্রম করে চীনের কাংসু, অপর পথ পারস্য, অকসাস নদী পার হযে তারিম উপত্যকাব মধ্য দিয়ে কাংসু। এই শেষোক্ত পথ দিয়ে দুইজন ভিনিসীয়, নিকোলো পোলো আর তাঁর ভাই মাফিও পোলো চীন দেশে এসেছিলেন। নিকোলো তাঁর একুশ বছরের পুত্র মার্কো পোলোকেও সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন (১২৭৫ খৃঃ)। এই মার্কো পোলোই সেই প্রখ্যাত পর্যটক যাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত থেকে ইউরোপ চীনা সাম্রাজ্যের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানতে পেরেছিল। পোলো ভ্রাতৃদ্বয়ের চীন দেশে এই প্রথম আগমন নয। দক্ষিণ চীনে সুং সাম্রাজ্য ধ্বংসের পূর্বে তাঁবা খানবালিক নগরে এসে কুবিলাযের অনুগ্রহ লাভ কবেছিলেন। কুবিলায় তখন খৃষ্টীয ধর্মগুরু পোপেব নামে লিখিত তাঁব একখানা পত্র নিয়ে তাঁদের স্বদেশে ফিবে যেতে আদেশ দিলেন। সেই পত্রে পোপকে এই মর্মে অনুবোধ করা হয়েছিল, তিনি যেন লোকশিক্ষার্থ এক শ' জন বিজ্ঞানের ও ধর্মের শিক্ষক প্রেরণ কবেন। ভ্রাতৃদ্বয় পত্র নিয়ে দেশে প্রত্যাগমন করেন, কিন্তু নানান কারণে তাঁদেব দ্বিতীয়বাব চীন দেশে যেতে বিলম্ব ঘটেছিল। কুবিলায়ের অনুরোধ বক্ষার্থ পোপ তাঁদেব সঙ্গে এক শ' দূবে থাক, মাত্র দুজনের বেশি ধর্মশিক্ষক পাঠাতে সক্ষম হন নি, এবং সেই দুইজনও আবার অর্ধ-পথ থেকে ফিরে এসেছিল। এই দ্বিতীয়বাবের যাত্রায মার্কো পোলোকে নিযে নিকোলো ও মাফিও পাবস্য উপসাগব পাব হযে পারস্য ও তাবিম উপত্যকার পথে চীনেব বাজধানীতে গিযে উপনীত হলেন। পোলো ভ্রাতৃ-দ্বয়ের পুনরাগমনে বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করলেন কুবিলায, তাঁর কৃপাদৃষ্টি তরুণ মার্কোর ওপর পডতেও বিলম্ব হয নি, মার্কোকে তিনি রাজকাযে নিযুক্ত করলেন। কার্য উপলক্ষে দেশেব নানান স্থান পবিদর্শন করেছিলেন মার্কো, আর সেই সময়ে চীনা সমাজজীবনের বিভিন্ন দিকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। এইরূপে কিঞ্চিদধিক পনর বছর-কাল চীনে অবস্থানের পর পোলোদের দেশে ফিরবার একটি সুযোগ উপস্থিত হয়েছিল। পারস্যের

একজন মোঙ্গল শাসকের সঙ্গে কোন রাজকন্যার বিবাহ স্থির হয়েছিল, পাত্রী-পক্ষের দল রাজকন্যাকে নিয়ে জাইটুং বন্দর থেকে জলপথে পারস্য যাত্রার উদ্যোগ করছিল। পোলোরা পাত্রীপক্ষের সঙ্গে যোগদান করলেন, জাহাজে চড়ে পারস্যে এসে পৌছলেন, পথে তাঁদেব সুমাত্রা ও দক্ষিণ ভাবত পরিদর্শনের সুযোগ হয়েছিল। পারস্য থেকে স্থলপথে ভিনিস নগবে এসে পৌছলেন, তাঁরা ছিলেন এই নগরের অধিবাসী। কিছুকাল পব মার্কো পোলো যুদ্ধ-বন্দী অবস্থায় জেনোয়ার একটি কারাগাবে প্রেরিত হন। সম্ভবত তাঁর এই আবদ্ধ-কালেই তিনি চীন-ভ্রমণের বিচিত্র কাহিনী জনৈক সহচরেব কাছে বর্ণনা করেন, আব সহচরটি সেই বিবরণ লিখে গিয়েছিলেন। এইরূপে বচিত হয়েছিল 'মার্কো পোলোর ভ্রমণ-কথা'। এই গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট, দূরপ্রাচ্যের সমৃদ্ধির বিষয় বিস্তারিতভাবে সর্বপ্রথম জানতে পেবেছিল ইউরোপ এই গ্রন্থ থেকে।

মার্কো পোলোর বিবরণ

মার্কো পোলো কিছুকাল হ্যাং-চৌ-ব গভর্নব ছিলেন, এই শহরটিকে তিনি তাঁর 'ভ্রমণ-কথা'য় ইউরোপীয় নগরগুলিব চেয়ে সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ বলে বর্ণনা করেছেন। নগরের ব্যাস এক শ' মাইল। সুদৃশ্য হর্ম্য, সুন্দব সেতু, অসংখ্য হাসপাতাল, মনোরম উদ্যানবাটিকা, অফুরন্ত ব্যসন-বিলাস, সুবেশা হাস্য-লাস্যময়ী বারনারী, সবই অতুলনীয়। শান্তিবক্ষার ব্যবস্থা উৎকৃষ্ট। নাগরিকদের রুচি চমৎকার, ব্যবহার সৌজন্যপূর্ণ। বড ছোট নানা প্রকাব সেতু, সংখ্যা বারো হাজাব। কতগুলি সেতুব খিলানের ওপর বাঁধানো পথে গাড়িঘোড়া চলে, আর সেই সেতুব নীচে খাল দিয়ে পাল-তোলা নৌকা যাতায়াত করে।···শহরে দশটি প্রধান পার্ক ও মার্কেট আছে, তা ছাড়া রয়েছে অনেক দোকান। সুবৃহৎ খালেব ধারে বড বড প্রস্তরনির্মিত গৃহ, সেগুলি ভারতবর্ষ ও অন্যান্য স্থান থেকে আগত বণিকদের বাসস্থান ও পণ্যাদি বক্ষার গুদাম।···শহরের সড়কগুলি ইঁট বা পাথর দিয়ে বাঁধা, খিলান-করা ড্রেন দিয়ে বৃষ্টির জল খালে গড়িয়ে নামে। গাড়িগুলি লম্বা ধাঁচের, মাথায় ছাপ্পর, রেশমী গদি আঁটা ছয়টি আসন রয়েছে।···শিকার অফুরন্ত···পনর মাইল দূরবর্তী সমুদ্র থেকে শহরে প্রতিদিন পর্যাপ্ত পরিমাণে মাছের চালান

আসে।...অসংখ্য রাস্তা বাজারের দিকে গেছে, রাস্তার ওপর কতগুলি স্নানাগার, সেখানে পরিচারক-পরিচারিকা কর্তৃক পরিচর্যার ব্যবস্থা আছে। স্নানের অভ্যাস সকল নাগরিকেরই রয়েছে, বিশেষত আহারের পূর্বে...অন্য কতগুলি রাস্তায় বেশ্যালয়। দাসী-সেবিত বারবনিতাদের বাহারে সুগন্ধি সাজসজ্জা, বাড়ির আসবাবপত্র মনোহর।...অন্যান্য রাস্তায় চিকিৎসক ও জ্যোতির্বিদগণের বাড়ি। রাস্তার উভয় পার্শ্বে প্রকাণ্ড সৌধ। ফর্সা রঙের সুন্দর নরনারী, অনেকেরই পরিধানে রেশমী বস্ত্র...

রাজধানী খানবালিক (পিকিং) শহরের বর্ণনায় 'ভ্রমণ-কথা'য় বলা হয়েছে: বারোটি অতি সুন্দর শহরতলি, শহরের চেয়েও মনোরম, সেখানে বণিকদের অনেক সুরম্য অট্টালিকা আছে। খাস শহরটিতে অগণিত হোটেল, হাজার হাজার দোকান, প্রচুর খাদ্যসামগ্রী আছে। প্রতিদিন অসংখ্য গাড়ি-বোঝাই রেশম নগর-দ্বার দিয়ে শহরে প্রবেশ করে, সেই রেশম বুনে নগরবাসীর বস্ত্র প্রস্তুত হয়। (এই সমৃদ্ধ নগরে লক্ষ লক্ষ লোকের বাস ছিল)। কুবিলায় খাঁর প্রাসাদটি ছিল মর্মর-প্রাচীর দিয়ে ঘেরা, প্রাসাদের জানালাগুলি কাঁচের, নানা বর্ণের টালির ছাদ। মার্কো পোলো অকপটে স্বীকার করেছেন, এমন সমৃদ্ধ নগর তিনি আর দেখেন নি, এমন বিপুল ঐশ্বর্যশালী শক্তিমান নৃপতিও দেখেন নি।

ফ্রা কারপিনি ও ফ্রা রুবরুক

মোঙ্গলদের রাজত্বকালে মার্কো পোলোর পূর্বে ও পরে চীন দেশে কয়েকজন ইউরোপীয় খৃস্টান পাদ্রীর আগমন হয়েছিল। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ খৃস্টাব্দে ইউরোপে দুটি খৃস্টীয় সম্প্রদায় গঠিত হয়েছিল, একটি ফ্রানসিস্কান, অপরটি ডোমিনিকান। মোঙ্গল রাজ-দরবারে দুজন ফ্রানসিস্কান পাদ্রী এসেছিলেন, তাঁদের নাম ফ্রা কারপিনি (Fra Carpini) ও ফ্রা রুবরুক (Fra Rubruque)। মার্কো পোলোর মত দুজনাই তাঁদের অভিজ্ঞতার বিবরণ লিখে গেছেন। মনে হয়, ধর্মপ্রচার অপেক্ষা দৌত্যের কর্মই ছিল অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, ফ্রা রুবরুক কারাকোরামে মঙ্গু খাঁর দরবারে এসেছিলেন ফ্রান্সের রাজা হেনরির একটি শুভেচ্ছা-পত্র নিয়ে। কিন্তু উদ্দেশ্য যা-ই হোক, তিনি মঙ্গুর ধর্মাচরণের প্রতি বক্র কটাক্ষ করতে ছাড়েন নি। তাঁর লিখিত

বিবরণ থেকে জানা যায়, খাঁর পারিষদবর্গকে বলেছিলেন তিনি, "মঙ্গুকে বলতে চাই, ঈশ্বর তাঁকে অনেক বৈভব দিয়েছেন, তাঁর ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য বৌদ্ধ মূর্তিগুলি থেকে আসে নি।" পারিষদরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ঈশ্বরের আদেশের কথা জানলেন কেমন করে? স্বর্গে গিয়েছিলেন নাকি?" তারপর তাঁরা গিয়ে মঙ্গুকে জানালো ফ্রা রুবরুকের কথা। তখন মঙ্গু তাঁকে ডেকে বললেন, "আমরা মোঙ্গলরা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করি এবং তাঁর প্রতি আমাদের অচলা ভক্তি।...ঈশ্বর মানুষের হাতকে দিয়েছেন কয়েকটি আঙ্গুল আর মানুষকে দিয়েছেন বিভিন্ন পন্থা। ঈশ্বর তোমাদের দিয়েছেন শাস্ত্রগ্রন্থ, কিন্তু তোমরা শাস্ত্রবাক্য মান না। তোমাদের শাস্ত্রে নিশ্চয়ই এই উপদেশ নেই যে একে অন্যেব ধর্মের নিন্দা করবে।" ফ্রা রুবরুকের এই বিবরণে মোঙ্গলদের ধর্মচেতনায় একটি উদাব মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, যে মহত্ত্ব প্রকৃতপক্ষে চীনা সংস্কৃতির মূলগত সহনশীলতারই প্রতিবিম্ব।

গিয়াভোনি মনটি করভিনো

১২৯৪ খৃস্টাব্দে খাস চীন দেশেব খানবালিক নগরে একজন ফ্রানসিস্‌কান পাদ্রী এসেছিলেন কেবলমাত্র ধর্মপ্রচার উদ্দেশ্যে, তাঁর নাম গিয়াভোনি মনটি করভিনো (Giavonni Monte Corvino)। সমুদ্রপথে চীনে আসবার সময় তাঁর ভারতবর্ষেও' পদার্পণ হয়েছিল। কুবিলায়ের উত্তরাধিকারীর বিশেষ অনুগ্রহ লাভের ফলে তিনি ছয় হাজার চীনাকে ধর্মান্তরিত করতে পেরেছিলেন, উপাসনার জন্য একটি গির্জাও নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর এই অভাবনীয় সাফল্যে উৎফুল্ল হয়ে রোমের পোপ তাঁকে 'খানবালিকের বিশপ' নিযুক্ত করলেন, এবং তাঁর সাহায্যার্থ আরও কয়েকজন পাদ্রী চীন দেশে পাঠিয়ে দিলেন। কিছুকাল এইভাবে রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের যাতায়াত চলেছিল জল ও স্থল উভয় পথেই, কিন্তু চীন থেকে মোঙ্গলরা বিতাড়িত হবার সঙ্গেই পাদ্রীদের আসা-যাওয়া ও ধর্মান্তরীকরণ বন্ধ হয়ে গেল। তখন স্থলপথে ইউরোপের সঙ্গে যোগাযোগ একেবারেই ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, এই কারণ ছাড়াও পাদ্রীদের চীনে অবস্থান ও ধর্মপ্রচারের একটি বিশেষ বাধা দেখা দিয়েছিল। বিদেশী পাদ্রীরা ছিল মোঙ্গল সম্রাটের অনুগ্রহের পাত্র, আর মোঙ্গলদের চীনারা শত্রু বলেই মনে করত, সেজন্য

খৃস্টধর্ম ও খৃস্ট ধর্মযাজক তাদের কাছে সমানে বিরাগভাজন হয়ে উঠেছিল। ফলে কয়েক বছরের মধ্যে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম জনপ্রিয়তা হারিয়ে সমূলে বিনষ্ট হল। খৃস্টধর্ম দেশ থেকে অন্তর্ধান করল, এই ধর্মের প্রতি চীনাদের বিদ্বেষ ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। ট্যাং যুগ থেকে নেস্টোরীয় খৃস্টধর্ম চীনের নানা স্থানে বিশেষত উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে তখনো চলে আসছিল, মোঙ্গল শাসনের অবসানে প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে নেস্টোরীয় ধর্মের পক্ষেও আপন অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব হয় নি। বিদেশী নেস্টোরীয়গণ দেশত্যাগ করল কিংবা নিহত হল, প্রত্যন্তবাসীরা ইসলাম বা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করল।

খৃস্টধর্ম ও ইসলাম, উভয়েরই আবির্ভাব হয়েছিল চীন দেশে, কিন্তু ধর্ম দুটির প্রতি অধিবাসীদের ভিন্নরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলে খৃস্টধর্ম উৎসাদিত হল, আর ইসলাম সে দেশেরই মাটিতে শিকড় গেড়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, বিশেষত দক্ষিণাঞ্চলের ইউনান আর উত্তর-পশ্চিমে কানসু প্রদেশে। দক্ষিণে মুসলমান আরবদের ব্যবসা উপলক্ষে জলপথে যাতায়াত বরাবরই চলে আসছিল। এখানকার ইউনান প্রদেশের শাসক ছিলেন একজন মুসলমান, তিনি চীনাদের মোঙ্গল বিতাড়নে সাহায্য করেছিলেন, সেই থেকে মুসলমান প্রতিপত্তি ও জনসংখ্যা বেড়েই চলেছিল। পশ্চিম এশিয়ায় তখন মোঙ্গল শাসকেরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল, এবং সেখানে ঐ ধর্মের বিস্তারের সঙ্গে তার প্রভাব চীনের প্রত্যন্তে স্বভাবতই এসে পড়েছিল বলে কানসু অঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যা হ্রাস না পেয়ে বৃদ্ধিলাভই করেছিল।

৫. ইউয়ান রাজত্বকালে চীনের সংস্কৃতি

ভারতের মোগল সম্রাট বাবর তাঁর বিখ্যাত "জীবন-স্মৃতি" গ্রন্থে লিখেছেন: "আমার পিতৃপুরুষ ও পরিজনবর্গ চেঙ্গিজের আইনকানুন শ্রদ্ধাভরে মেনে নিয়েছিলেন। সভা-সম্মেলনে, পর্ব-পার্বণে, আমোদ-প্রমোদে, উঠতে বসতে কোন সময়েই তাঁরা চেঙ্গিজের নিয়ম ভঙ্গ করেন নি।"* পারসীক ও ইউরোপীয় বিবরণ থেকে জেঙ্গিসের কয়েক দফা আইন সংকলিত হয়েছে বটে, কিন্তু পূর্ণ তালিকা 'যাশ্সা জেঙ্গিসকানি' (Yssa Genghizkani)

* *Memoirs of Babar*—Erskin and Leydon Edition—p. 202.

পাওয়া যায় নি। এই দস্তুরে জেঙ্গিস মোঙ্গলদের আদেশ দিয়েছেন, "তারা যেন এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। ঈশ্বর স্বর্গ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, জীবন ও মৃত্যু, ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্য নিজেব অভিরুচিমত মানুষকে দান কবেন তিনি, সর্ব বিষয়ে তাঁর শক্তি অপরিসীম।" এই বিশ্বাসই যে পশ্চিম এশিয়ার মোঙ্গল শাসকদের একেশ্বরবাদী ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হবার পথ সুগম করে দিয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। দস্তুরের বিধানমত 'কুরিলতাই' নামক মোঙ্গল অভিজাত-বর্গের একটি সমিতি কর্তৃক রাজ্যের সর্বাধিনায়ক 'খাঁ-প্রধান' ('The Great Khan') নির্বাচিত হতেন। চীনা সভ্যতার প্রভাব সত্ত্বেও মোঙ্গলদেব যাযাবর অবস্থায় যে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল, সেই প্রথা তারা বর্জন করে নি। পুরুষের বহুবিবাহ ছিল সামাজিক নিয়ম, জেঙ্গিস খাঁ-র পাঁচ শ'রও অধিকসংখ্যক পত্নী ছিল। আর একটি প্রথা ছিল বডই অদ্ভুত, পিতার মৃত্যুর পর প্রত্যেক মোঙ্গল নিজের গর্ভধারিণী জননী ছাডা মৃতের সকল বিধবা পত্নীকেই বিবাহ করত, মৃত ভ্রাতার স্ত্রীরাও হত ভাইদের পরিণীতা পত্নী। এরূপ অগণিত পত্নী গ্রহণের ব্যবস্থা রয়েছে যে বিধানে, ব্যভিচার সেখানে একটি গুরুতর অপরাধ। মৃত্যুই ছিল ব্যভিচারেব দণ্ড।

নাটক উপন্যাস

বৈদেশিক সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সংযোগের ফলে মোঙ্গল শাসনাধীন চীনে তেমন কোন সৃজনমুখব শক্তির উদ্ভব হয় নি, যেমনটি হয়েছিল সেখানে বৌদ্ধধর্ম আগমনের পর। পদ্য ও দর্শনের চর্চা ট্যাং-সুং যুগের মত চলে নি, তার কারণ সম্ভবত রাষ্ট্র কর্তৃক উৎসাহদানের অভাব। সাহিত্য ও শিল্প-ক্ষেত্রে একমাত্র নাট্যকলাকেই উন্নতির পথে অগ্রসব হতে দেখা যায়। রঙ্গমঞ্চে অভিনয় চীনে নূতন জিনিস নয়, দীর্ঘ ইতিহাস রঙ্গমঞ্চের, এমন কি সুদূব হ্যান যুগেও পিতৃকৃত্যের অনুষ্ঠানে ঐতিহাসিক বৃত্তান্তগুলিব আবৃত্তি, নানারূপ সং-এর অভিনয়, ভোজবাজি ও নৃত্য দেখা গিয়েছে। ট্যাং-রাও নাট্যের বিশেষ সমর্থক ছিলেন, এবং এ বিষয়ে সম্রাট মিং হুয়াং-এর উৎসাহ উল্লেখযোগ্য। সুং যুগেও অসংখ্য নাটক রচিত হয়েছিল, কিন্তু পরিণত রূপটি ফুটে উঠেছিল ইউয়ান বংশের রাজত্বকালে। ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে তখন সকলেই নাট্যামোদী হয়ে পড়েছিল, চীনাদের সাংস্কৃতিক জীবনে রঙ্গমঞ্চ

একটি প্রধান স্থান অধিকার করেছিল। সে-কালের অনেকগুলি নাটক এখনো রয়েছে, নাটকের মূল উপাদান ছিল ঐতিহাসিক বিষয়। ইতিহাসের স্মৃতি জাতির ঐতিহ্যের সঙ্গে জাতীয় চেতনাকেও বাঁচিয়ে রাখবে, এই ছিল নাটকের উদ্দেশ্য।

সাহিত্য-ক্ষেত্রে নাটক ছাড়া উপন্যাসও এখন দানা বাঁধতে শুরু করেছিল, ছোট গল্পের পরিবর্ধিত সংস্করণ রূপে। আমরা 'স্যান কুয়ো'র রোমান্সের ঐতিহাসিক বিবরণ পূর্বেই দিয়েছি। এই উপন্যাসটির বিভিন্ন রচনা বিভিন্ন কালে প্রকাশিত হয়েছিল, প্রথম রচনার কাল ইউয়ান যুগ বলেই মনে হয়। সম্ভবত স্থই হু চুয়ান নামে একটি বহুপঠিত উপন্যাস এই যুগেরই রচনা। এই বইখানিতে সুং রাজত্বের পতনদশায় দুর্নীতিপূর্ণ সামাজিক অবস্থার বিরুদ্ধে উদ্যতহস্ত উদ্বাস্তুদের বিদ্রোহের মহিমা কীর্তিত হয়েছে। নাটকের ও উপন্যাসের ভাষা অনেকটা সাধারণের বোধগম্য কথ্যভাষারই রূপ ধারণ করেছিল। কারণ, কনফুসীয় পাণ্ডিত্যের প্রতি মোঙ্গল শাসক সম্প্রদায়ের অশ্রদ্ধা সুধীজনকে জনপ্রিয় সাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত করেছিল।

এই প্রসঙ্গে জনৈক দেশপ্রেমিক পণ্ডিতের প্রতি কুবিলায়ের আচরণের কথা বলা যেতে পারে। এই ব্যক্তির নাম ওয়েন তিয়েন সিয়ান। সুং বংশের প্রতি একনিষ্ঠ শ্রদ্ধাবশত তিনি মোঙ্গল শাসন স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন না, সেজন্য তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ওয়েন তিয়েন সিয়ান-এর কারা জীবনের বর্ণনা চীনা সাহিত্যের একটি বস্তুবিশেষ। তিনি বলেছেন: "আমার কারাকক্ষে জ্বলে শুধু আলেয়ার আলো। এই অন্ধ গহ্বরকে পুলকিত করবার মত বসন্তের ঈষৎ উষ্ণ নিশ্বাস একটুখানিও বয় না। কুয়াশাচ্ছন্ন হিম-খিন্ন জীবনের অবসান কামনা করেছি কতবার···কিন্তু আমার মনে জেগে উঠেছে তখন এমন একটি উপলব্ধি, সংসারের কোন দুর্ভাগ্য যাকে কেড়ে নিতে পারে না। তাই আমি রইলাম অটল অন্তর্দ্বেল, মাথার ওপর উড়ন্ত মেঘ-খণ্ডের দিকে দৃষ্টি রেখে, আকাশের মত অসীম দুঃখ বক্ষে বহন করে।" পরিশেষে কুবিলায় বন্দী ওয়েনকে নিজের সামনে আনিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি চাও বল তো?" নির্ভীকভাবে সে জবাব দিলে, "সুং সম্রাটের কৃপায় আমি তাঁর মন্ত্রী হয়েছিলাম। দুই প্রভুর সেবা করতে আমি অক্ষম। আমি প্রার্থনা করি মৃত্যু।" কুবিলায় তাঁর প্রার্থনামত বর দান করতে

কার্পণ্য করলেন না। বধ্যভূমিতে ওয়েন জল্লাদের খড়্গাঘাতে মৃত্যু বরণ কববার পূর্বে দক্ষিণে সুং রাজধানী হ্যানকিং-এর দিকে মুখ ফিবিয়ে মাথা নত করেছিলেন সুং সম্রাটের উদ্দেশে। একনিষ্ঠ বাজভক্তির এমন মূর্ত আদর্শ শুধু চীনের নয়, জগতের ইতিহাসেও বিরল।

চিত্রাঙ্কন ও অন্যান্য শিল্প

মোঙ্গল শাসনকালে সংগীত-বিদ্যা, অঙ্ক ও চিকিৎসা-বিদ্যাব উন্নতি দেখা গিয়েছিল। চিত্রাঙ্কন প্রকৃতপক্ষে সুং-শিল্পের ঐতিহ্যের অনুসবণ করেছিল। কুবিলায় শিল্পানুরাগী ছিলেন কি না, সে বিষযে মার্কো পোলো কিছু লেখেন নি। সুং সম্রাট হুই সুং যে শিল্প-আকাদামি স্থাপন কবেছিলেন, সেটির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছিল, সে স্থলে কুবিলায কোন নূতন আকাদামি প্রতিষ্ঠিত কবেন নি। কিন্তু এ-কথা স্বীকার না কবে উপায় নেই যে ইউয়ান সম্রাটদেব আশ্রয়ে চিত্রকবদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে রীতিমত একটি শিল্পী-সমাজ গড়ে উঠেছিল। নাটক-উপন্যাসেব মত চিত্রশিল্পও এখন বুর্জোয়াদেব পৃষ্ঠপোষকতায় জনপ্রিয় হতে আরম্ভ করেছিল।

ইউয়ানদের রাজত্বকাল দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। এই অল্প সময়ে শিল্পের কোন নূতন শৈলীর উদ্ভাবন প্রত্যাশা কবা যায় না সত্য, কিন্তু শিল্প তখন স্থাণুব মত নিশ্চল ছিল না, নূতন পন্থাব সন্ধানে বেবিয়েছিল। তাই অল্পকাল-মধ্যেই ইউয়ান শিল্প অনাগত চিত্রকলার ওপর আপন বৈশিষ্ট্যের ছাপ অঙ্কিত করেছিল, আর সেই ছাপ আঁকা সম্ভব হয়েছিল এই সময়কাব কযেকজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর ঐকান্তিক সাধনার ফলে। বর্ণের বিন্যাস ও বাস্তবতাব দিক দিয়ে বিচার করলে এই শিল্পীগণের সৃষ্টি সুং-চিত্রেব সুব-ছন্দস এড়িয়ে গিয়ে ট্যাং শিল্পকলায় প্রত্যাবর্তন করেছিল বলে মনে হয়। এই নূতন প্রচেষ্টার মধ্যেই অভিনব শৈলীর জাগরণের লক্ষণ দেখা যায়।

১২৬০ খৃস্টাব্দে চিত্রকর চি'য়েন সুয়ান সুং-দের আকাদামির একটি বিশিষ্ট পদ অধিকার কবতেন। মোঙ্গলদের অধীনে রাজপদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করে তিনি নির্জন স্থানে গিয়ে চিত্রাঙ্কনে আত্মনিয়োগ করলেন। প্রাকৃতিক শোভা-সৌন্দর্যের দৃশ্যপট আঁকতে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত, বিভিন্ন বস্তুর বিশদ রূপায়ণ তিনি যেমন করেছেন, এমনটি চীনের আর কোন চিত্রকরের অঙ্কিত

চিত্রে দেখা যায় না। আমেরিকার ডিট্রয়েট ইন্‌স্টিটিউট অফ আর্ট-এ এই শিল্পীর অঙ্কিত একখানা চিত্র আছে। চিত্রটির নাম 'পতঙ্গ ও পদ্ম'। চিত্রদর্শনে পতঙ্গের গুঞ্জনরব শ্রবণে প্রবেশ করে, কাশের বনে উড়ন্ত পতঙ্গ, সূক্ষ্ম ডানা মেলার ভঙ্গী নিখুঁতভাবে অঙ্কিত। এই ছবিটিই চি'য়েন-এর একমাত্র সৃষ্টি নয়। আরও কয়েকটি শ্রেষ্ঠ চিত্রে আমরা এই চিত্রকরের প্রতিভার পরিচয় পাই।

চি'য়েন স্যুয়ান মোঙ্গলদের রাজপদ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, আর চাও মেং ফু (১২৫৪-১৩২২) কুবিলায়ের অধীনে যুদ্ধমন্ত্রীর দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করেন নি। সেজন্য দেশপ্রেমিক চি'য়েন স্যুয়াং তাঁকে ভর্ৎসনা করেছিলেন। চিত্রাঙ্কন-বিদ্যায় যাঁরা সর্বাধিক খ্যাতিলাভ করেছেন, চাও মেং ফু তাদের অন্যতম। তাঁর "ছাগল ও ভেড়া" চিত্রটি ওয়াশিংটন আর্ট গ্যালারিতে রক্ষিত আছে। সুনিপুণ শৈলীর পরিচায়ক এই ছবিখানা।

চিত্রশিল্পী আরও অনেক আছেন, তাদের নাম ও বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা শুধু এক মহিলা শিল্পীর পরিচয় দিয়ে এই প্রসঙ্গ শেষ করব। এই মহিলা চিত্রকর চাও মেং ফু-র পত্নী কুয়ান তাও সেং। তাঁর বাঁশবনের চিত্র প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, একটিমাত্র বাঁশবনের স্বতন্ত্র ছবি নয়, একটানা দৃশ্যের মধ্যে স্থানে স্থানে বাঁশবন। চিত্রে নারী-হস্তের সূক্ষ্ম নিপুণ তুলির স্পর্শ স্পষ্টই অনুভব করা যায়। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলে এই চিত্র এঁকেছেন এরূপ বলা হয়ে থাকে, কিন্তু দেখে মনে হয় না যে ছবিখানা দুই হাতের আঁকা।

১২২১ খৃস্টাব্দের পর ইউরোপ চীনে আবিষ্কৃত বারুদের কথা প্রথম জানতে পারে, জেঙ্গিস খাঁ তখন ইউরোপে যাতায়াতের পথ মুক্ত করে দিয়েছিল। 'হো পাও' নামক একপ্রকার অগ্নি-নিক্ষেপক অস্ত্রে বারুদ ব্যবহার হত। একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে, হো-পাও আগ্নেয়াস্ত্রে বারুদের বিস্ফোরণে 'বজ্রের মত শব্দ হয়, সেই শব্দ এক শ' লি (অর্থাৎ ত্রিশ মাইল) দূরে শোনা যায়'। এই বর্ণনা হয়তো অতিশয়োক্তি। কুবিলায় খাঁ-র সময়কার একটি বর্ণনায় আছে, "সম্রাট অগ্নিনিক্ষেপের আদেশ দিলেন। বিস্ফোরণের শব্দে শত্রুরা ভীত চকিত হয়ে উঠল।" এইসব বিবরণ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, চীনারা বা মোঙ্গলরা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করত বিচ্ছুরিত অগ্নি দিয়ে দগ্ধ করবার জন্য এবং বিস্ফোরণ-শব্দে শত্রুর মনে ত্রাস সঞ্চারের জন্য। লোহা ঢালাই করে কামান তখনো তৈরি হয় নি, গোলার ব্যবহারও শুরু হয় নি।

অষ্টম পর্ব

মিং বা উজ্জ্বল বংশ (১৩৬৮-১৬৪৪ খৃঃ)

১. চীনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা

বিদ্রোহী বীর চু ইউয়ান চ্যাং চীন থেকে মোঙ্গলদের বিতাড়িত করে স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করেন, মিং বংশের প্রতিষ্ঠাতা তিনিই, সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে। 'মিং' শব্দের অর্থ 'উজ্জ্বল', বংশের এই নামকরণে একটু বিশেষত্ব আছে। পূর্বকার রাজবংশসমূহের নামের উৎপত্তি হয়েছে বংশ-প্রতিষ্ঠাতার বাসভূমি থেকে, যেমন হ্যান বংশের প্রথম সম্রাট লিউ প্যাং ছিলেন হ্যান নামক ক্ষুদ্র একটি রাজ্যের নৃপতি, প্রথম ট্যাং সম্রাট ছিলেন সুই সম্রাটের অধীনে ট্যাং নামক স্থানের 'ডিউক', আর সুং নামে একটি প্রাচীন রাজ্যের সঙ্গে সুং বংশের প্রথম সম্রাটেরও তেমনি একটি সম্বন্ধ ছিল। এই সম্রাটেরা সকলেই ছিলেন উচ্চ বংশের ব্যক্তি, কিন্তু চু ইউয়ান চ্যাং-এর কোন কুল-মর্যাদা ছিল না। দরিদ্র কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম, রাজ্যলাভের পূর্বে তিনি ছিলেন একজন দস্যুসর্দার মাত্র। এরূপ আভিজাত্যহীন ব্যক্তির সঙ্গে কোন স্থানবিশেষের নাম জড়িত থাকা অশোভন, সম্ভবত এই কারণেই বংশের নামকরণে প্রচলিত প্রথার ব্যতিক্রম ঘটেছিল। এই বংশের রাজত্ব-কালে চীন আবার সামরিক শক্তিবলে পরাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল, সুং-দের শান্তির নীতি বর্জন করে তেজস্বী ট্যাং সম্রাটদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিল। ফলে, মিং সাম্রাজ্য বিশাল চীন দেশের সীমা ছাড়িয়ে দক্ষিণ দিকে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।

হুং উ (১৩৬৮-১৩৯৮)

চু ইউয়ান চ্যাং সম্রাট হয়ে হুং উ নাম গ্রহণ করেন। বংশের নামকরণের মত তাঁর এই নাম গ্রহণের মধ্যেও বেশ একটু নূতনত্ব আছে। পূর্বে চীন সম্রাটেরা সিংহাসনে আরোহণের পর প্রথামত যে নাম গ্রহণ করতেন সেই নাম তাঁরা খুশিমত পরিবর্তন করতে পারতেন। সম্রাটের ব্যক্তিগত নামের উল্লেখ ছিল নিষিদ্ধ, মৃত্যুর পর ধর্মমন্দির থেকে তাঁকে একটি নাম বা পদবী

দান করা হত, এই 'রাজত্বকালীন নাম' বা 'রাজত্বকালীন পদবী' (নিয়েন হাও) ইতিহাসে ব্যবহার হত। এই নিয়মে রাজত্বের কাল নির্ধারণ অনেক সময় দুঃসাধ্য হয়ে পড়ত, কেননা সম্রাট তাঁর রাজত্বকালে পাঁচ-ছয় বার নাম পরিবর্তন করেছেন এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নয়, এবং সেই নামগুলি একজন না একাধিক সম্রাটের, পরবর্তী কালে তা-ই নির্ণয় করতে গোল বেধে গিয়েছে। হুং উ এই প্রথার পরিবর্তন করে রাজত্বের কাল নির্ধারণের বিঘ্ন দূর করলেন। তাঁর বিধানমত সম্রাট একটিমাত্র নাম গ্রহণ করবেন, এবং সে নামের আর পরিবর্তন চলবে না। মিং সম্রাটেরা এই নিয়ম পালন করেছিলেন, পরবর্তী মাঞ্চু সম্রাটেরাও এই প্রথার অনুসরণ করতেন। সুতরাং শেষ দুই বংশের সম্রাটেরা তাঁদের রাজত্বকালে গৃহীত নামেই পরিচিত হয়েছেন।

চু ইউয়ান চ্যাং-এর পূর্বজীবন যেমনই অগৌরবময় হোক না কেন, মোঙ্গল বিতাড়নের অল্পকাল-মধ্যেই সমগ্র চীন তাঁর আধিপত্য স্বীকার করেছিল। সম্রাটের সেনাপতি সু তা সেনসি ও কানসু অধিকার করেছিলেন। জেচুয়ান প্রদেশে জনৈক ভাগ্যান্বেষী স্বাধীন রাজত্ব স্থাপন করেছিল, তাকে পরাভূত করে জেচুয়ান-কে মিং সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হল। ইউনানে মোঙ্গলদের শেষ ঘাঁটি ধ্বংস হবার পর সে দেশ মিং সম্রাটের পদানত হল। কোরিয়া ও রিউ-কিউ দ্বীপ হুং উ-র প্রভুত্ব স্বীকার করেছিল। ব্রহ্ম ও নেপাল থেকে রাজদূতের শুভাগমন হয়েছিল। হুং উ মোঙ্গলদের বৃহৎ প্রাচীরের বাইরে তাড়িয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হন নি, মোঙ্গলিয়ায় অভিযান প্রেরণ করে প্রাচীন রাজধানী কারাকোরাম তুবার অধিকার করেছিলেন। কিন্তু চীনের বহির্দেশের এই মরু-অঞ্চলকে তিনি স্থায়ীভাবে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করবার প্রয়োজন বোধ করেন নি, শুধু কানসু প্রদেশের দ্বারদেশে হামি নামক স্থানটি নিজের আয়ত্তাধীনে রেখেছিলেন বাণিজ্যপথের নিরাপত্তার জন্য। আসলে মোঙ্গল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়বার ফলে পশ্চিমাঞ্চলে বাণিজ্যপথের গুরুত্ব অনেকখানি হ্রাস পেয়েছিল, সেইজন্যেই মিং সম্রাট পূর্বকার ট্যাং ও হ্যান সম্রাটদের মত মধ্য এশিয়ায় দিগ্‌বিজয় অভিযানের কোন উদ্যোগ করেন নি।

হুং উ-র সার্বভৌম কর্তৃত্বের মহিমাময় জয়যাত্রার পথে প্রধান অন্তরায়রূপে দেখা দিল সমরকন্দের কুখ্যাত দিগ্বিজয়ী তৈমুরলঙ্গ। এই নির্মম দুর্ধর্ষ যোদ্ধা

তখন মোঙ্গল রাজশক্তির ভাঙা টুকরোগুলি জোড়া দিয়ে পূর্বপুরুষগণের বিশাল সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। মিং সম্রাটের দূতদের তিনি কারারুদ্ধ করলেন, অবশ্য পরে তাদের মুক্তি দিয়ে সম্রাটের সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপন করেছিলেন। কিছুকাল তৈমুর ও মিং সম্রাটের মধ্যে দৌত্যের বিনিময় চলল, কিন্তু চীনের প্রভুত্ব স্বীকার করা দূরে থাক, তৈমুর চীন আক্রমণের জন্য সজ্জিত হয়ে যুদ্ধযাত্রা করেছিলেন এমন সময় দৈবক্রমে তাঁর মৃত্যু হল (১৪০৫ খৃঃ)।

সম্রাট হুং উ-র আর একটি অস্বস্তির কারণ হয়েছিল জাপানী জলদস্যু দলের উৎপাত। চীনের সমুদ্রতটে ঘন ঘন হানা দিয়ে অনর্থের সৃষ্টি করেছিল তারা, এই উপদ্রব রোধের ব্যবস্থা করবার অনুরোধ জানিয়ে চীন সম্রাট জাপানে দূত পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু জাপানে তখন অরাজক অবস্থা, গৃহ-যুদ্ধের অবসান সবেমাত্র ঘটেছিল, তাই দূত প্রেরণের উদ্দেশ্য সফল হল না। অবশ্য চীনা রণতরী লু চু দ্বীপ পর্যন্ত জাপানী বোম্বেটেদের জাহাজগুলির পশ্চাদ্ধাবন করেছিল।

আভ্যন্তরীণ শাসন সুনিয়ন্ত্রিত করবার উদ্দেশ্যে হুং উ-র প্রথম কর্ম হয়েছিল খানবালিক বা পিকিং থেকে দক্ষিণ দেশের ন্যানকিং শহরে রাজধানী অপসারণ। পরবর্তী কালে রাজধানী আবার পিকিং-এ স্থানান্তরিত হয়েছিল, এবং তার পরিণাম যে শুভ হয় নি আমরা তা এখনি দেখতে পাব। হুং উ ন্যানকিং শহর পুনর্নির্মাণ করেছিলেন, সেই শহরই আজ বর্তমান। প্রাকার-বেষ্টিত নগর, ৬০ ফিট উচ্চ প্রাচীর, দৈর্ঘ্য কুড়ি মাইল, এত দীর্ঘ নগর-প্রাচীর জগতে আর নেই। সম্রাট যে রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন সেটি ধ্বংস হয়েছে, শুধু একটি ভগ্ন তোরণদ্বার স্থানটিকে চিহ্নিত করে রেখেছে।

হুং উ ট্যাং সম্রাটদের বিদেশী নীতি গ্রহণ না করলেও সেই বংশের শাসন-প্রণালীর আদর্শমতই তার প্রশাসন-ব্যবস্থা সংগঠিত হয়েছিল। তাই সুং-এর দশটি 'তাও' বা প্রদেশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আয়তন ও জনসংখ্যা অনুসারে সমগ্র দেশ পনরটি প্রদেশে বিভক্ত হয়েছিল। মাঞ্চু যুগে প্রদেশের সংখ্যা পনরটির স্থলে আঠারটি হয়েছিল। প্রদেশপাল কর্তৃক প্রদেশ শাসিত হত, এবং কয়েকটি প্রদেশ নিয়ে একটি অঞ্চল গঠন করে প্রতিটি অঞ্চলে একজন সম্রাট-পুত্রকে অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল আঞ্চলিক প্রদেশগুলির শাসন-

কার্য নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য। এই আঞ্চলিক নিয়ন্তাদের নাম দেওয়া হয়েছিল 'ওয়াং'। হুং উ প্রধান মন্ত্রিপদের বিলোপ করে 'নেই কো' নামে একটি মন্ত্রণা সভা স্থাপন করেছিলেন। স্মরণ থাকতে পারে, কুবিলায় চাকরি পরীক্ষা বন্ধ করে দিয়েছিলেন, মিং সম্রাট হুং উ সেই পরীক্ষাগুলিকে পুনঃ-প্রবর্তন করে পরীক্ষোত্তীর্ণ পণ্ডিতদের রাজকার্যে নিযুক্ত করবার ব্যবস্থা করলেন। এই পরীক্ষার জন্য যে শিক্ষা দান করা হত সেই শিক্ষার প্রণালী বা বিষয়বস্তু নির্বাচনে কোন মৌলিকতার প্রশ্রয় দেওয়া হয় নি, শুধু কনফুসীয় প্রাচীন গ্রন্থের চর্বিত চর্বণ আর কৃত্রিম সাহিত্যিক ভঙ্গীতে রচনাই ছিল শিক্ষার প্রধান বিষয়। রচনা-শৈলীর ট্যাং যুগীয় আঁট-সাঁট গ্রন্থি এখন এমন শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল যে কোথাও তার একটু নড়চড় করবার সুযোগ ছিল না।

হুং উ বৌদ্ধদের ওপর প্রসন্ন ছিলেন, তিনি তাদের সংঘগঠন-কার্যে সাহায্যও করেছিলেন, কিন্তু কনফুসীয় নীতিধর্মের প্রতি তাঁর ছিল পরম শ্রদ্ধা, সেজন্য দেশের সর্বত্র কনফুসীয় শিক্ষায়তন স্থাপন করে নীতিধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। হ্যানলিন আকাদামিকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছিলেন তিনি। রাজাদের প্রাচীন পূজা-পদ্ধতিমত ফেং ও স্যাং এর পূজা আরম্ভ করেছিলেন। মোঙ্গল রাজত্বকালে বিদেশীদের প্রভাব ছিল অত্যন্ত বেশি, তারই প্রতিক্রিয়ারূপে এখন দেখা দিয়েছিল একটা উৎকট জাতীয়তাবাদ, জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি উদগ্র আসক্তি। ঐতিহ্যের প্রতি চীনাদের এই আত্যন্তিক আকর্ষণ কনফুসীয় নীতির প্রাচীন ব্যবস্থাগুলিকে শাশ্বত মর্যাদায় মণ্ডিত করে সকল রকম পরিবর্তনের পথ চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দিয়েছিল।

ইয়াং লো (১৪০৩-১৪২৫)

১৩৯৮ খৃস্টাব্দে ত্রিশ বছর রাজত্বের পর বৃদ্ধ বয়সে হুং উ-র মৃত্যু হয়। সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী ছিলেন জ্যেষ্ঠ পুত্র, কিন্তু তাঁর মৃত্যু হল সিংহাসনে আরোহণের পূর্বেই, তখন বংশ-প্রতিষ্ঠাতার ষোল বছরের পৌত্র হুই তি রাজপদে অভিষিক্ত হলেন। কিন্তু এই তরুণ সম্রাটের কর্তৃত্ব তাঁর প্রভূত প্রতিপত্তিশালী পরাক্রান্ত পিতৃব্য চু তি স্বীকার করতে অসম্মত হলেন। চু তি ছিলেন উত্তরাঞ্চলের প্রান্তিক দেশের শাসক, পিকিং নগরে তাঁর বাস,

জনসমাজে 'ইয়েনের রাজা' নামে পরিচিত। তিনি অচিরেই বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে ধবলেন, এবং তার ফলে যে গৃহযুদ্ধ বেধে গেল, সেই ধ্বংসের তাণ্ডব প্রায় চার বছর কাল ধরে চলেছিল। সম্রাটের বিপুল বাহিনী বারবার যুদ্ধে পরাজিত হবাব পর চু তি রাজধানী ন্যানকিং নগর অধিকার কবতে সমর্থ হন (১৪০৩)। রাজপ্রাসাদ অগ্নিদগ্ধ হল, সেই আগুনে রাজমহিষী ও অন্য অনেকে পুড়ে মরল, বাজভক্ত অনুচরদের নির্মমভাবে হত্যা কবা হল। তরুণ সম্রাট বৌদ্ধ ভিক্ষুব ছদ্মবেশে পালিযে বাঁচলেন। ত্রিশ বৎসর-কাল তিনি একটি মঠে বেশ সাফল্যের সঙ্গে আত্মগোপন করে অবস্থান করেছিলেন, পরিশেষে তাঁব লিখিত কযেকটি পদ্যে প্রকৃত পবিচয প্রকাশ পেল।

চু তি-র রাজত্বকালীন নাম চেং স্থ, মৃত্যুর পব তিনি ইযাং লো নামেই ইতিহাসে পরিচিত হযেছিলেন। হত্যাকাণ্ডের চরম নিষ্ঠুরতা সত্ত্বেও শাসন-কার্যে এই সম্রাটেব অসাধারণ দক্ষতা দেশবিদেশে চীনেব গৌরব বর্ধিত করেছিল। তিনি ন্যানকিং শহর থেকে বাজধানী আবাব পিকিং-এ স্থানান্তবিত করলেন (১৪২১)। রাজধানীরূপে পিকিং-এর অনুপযোগিতার বিষযটি প্রতিভাত হযেছিল মিং শাসনের শেষভাগে, সম্রাট ইযাং কিন্তু সে সময়ে প্রত্যন্তের এই নগরটিকে প্রতিরক্ষার জন্য সামরিক ঘাঁটিরূপে ব্যবহাব কববার প্রযোজন অনুভব করেছিলেন। সম্রাটের বাসভূমি ছিল উত্তরাংশে, বহু বছব ধবে তিনি মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিযে এসেছিলেন। তৈমুরলঙ্গের চীন আক্রমণের সংকল্প ও উদ্যোগের কথা পূর্বে বলা হযেছে। ইয়াং লো র রাজত্বেব দ্বিতীয় বৎসরেই তৈমুর সসৈন্যে চীন আক্রমণে যাত্রা কবেছিলেন। ইযাং লো নিশ্চযই তাঁর বিপুল বাহিনী নিযে সেই অপবাজিত দিগ্বিজযীর সম্মুখীন হতেন, কিন্তু যাত্রাপথের মাঝখানে ১৪০৫ খৃস্টাব্দে তৈমুরেব অকস্মাৎ মৃত্যু হয। তৈমুবলঙ্গের এই অকালমৃত্যু চীনের পরম সৌভাগ্য বলতে হয। মিং সম্রাট সামরিক বলে শক্তিমান ছিলেন বটে, কিন্তু তৈমুর বেঁচে থাকলে তাঁর পরিচালনায় মোঙ্গল বাহিনীর সঙ্গে সংগ্রামে জয়টীকা যে কার ললাটে অঙ্কিত হত তার সঠিক বৃত্তান্ত ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার কোলে চিরকাল প্রচ্ছন্ন থাকবে।

ইয়াং লো পিকিং পুনর্নির্মাণ করেছিলেন, সেই নগরে রাজধানী স্থানান্তরিত

করবার পূর্বেই, নগর-প্রাচীর, রাজপ্রাসাদ ও মন্দিরসমূহে সম্রাটের নির্মাণ-কার্যের বিচিত্র স্থাপত্যের নিদর্শন আজও বিদ্যমান। কিন্তু ন্যানকিং নগরে তিনি যে অতি সুন্দর একটি 'পর্সিলেন প্যাগোডা' নির্মাণ করেছিলেন, সেই সৌধটি এখন আর নেই, ১৮৫৬ সালের তা'ই পি'ং বিদ্রোহকালে ধ্বংস পেয়েছে। সম্রাজ্ঞীর প্রীত্যর্থে এই প্যাগোডা তৈরি হয়েছিল উনিশ বছর-কাল ধরে বহু লোকের পরিশ্রমে এই হর্ম্য শেষ করা হয় নি, পরিকল্পিত ১৩ তলার স্থলে ৯ তলা মাত্র তোলা হয়েছিল। ৩০০ ফুট উঁচু মন্দির, উজ্জ্বল রঙের টালির ছাদ, সেই টালি ও পর্সিলেনের টুকরাগুলি সম্প্রতিকালেও ন্যানকিং-এ ছড়ানো দেখা গেছে।

মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ব্যতীত সম্রাটের পররাষ্ট্র নীতির সাফল্য দেখা দিয়েছিল জাপানের সঙ্গে কূটনীতি সম্পর্কের উন্নতি সাধনে। জাপানের 'সোগুন' (মন্ত্রী) যোশিমিৎসু বাণিজ্যিক ও অন্যান্য কারণে চীনের সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপনে বিশেষ আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন, এবং সেই উদ্দেশ্যে চীনের সমুদ্রতটে জাপানী জলদস্যুর উপদ্রব বন্ধ করতে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। আনামের আভ্যন্তরীণ বিরোধের সুযোগ নিয়ে ইয়াং লো সে দেশের একটি বৃহৎ অংশ চীনা শাসনের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। উত্তর ব্রহ্মের ছোট ছোট রাজ্যের অধিপতিরা চীনের প্রভুত্ব স্বীকার করেছিল। ইয়াং লো দক্ষিণ সমুদ্রের নানান স্থানে নৌ অভিযান প্রেরণ করেছিলেন। নৌ-বহরের কাপ্তেন ছিলেন চেং হো নামক জনৈক খোজা, তাঁর নেতৃত্বাধীনে ৬২টি জাহাজ ও ৩৮০০০ সৈন্যের একটি নৌ-বাহিনী কোচিন, চীন, জাভা, সুমাত্রা, কাম্বোডিয়া, শ্যাম, সিংহল, এমন কি ভারতবর্ষেও নানাবিধ উপহার নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে চেং হো-র অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল দূর দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন ও তথ্যাদির সন্ধান, কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক স্থানে স্থানীয় নৃপতিদের ছলে-বলে চীনের প্রভুত্ব স্বীকার করাতে বাধা হয় নি। জাভা কর দান করেছিল, কিন্তু সিংহল বশ্যতা স্বীকার করে নি, সেজন্য ১৪০৮ খৃস্টাব্দে চেং হো সিংহল-রাজকে সপরিবারে বন্দী করে চীনে নিয়ে গিয়েছিলেন। দক্ষিণ ভারতের একাধিক শাসক ইয়াং লো-কে উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন, সম্রাট তাঁদের একজনকে 'রাজা' উপাধি দান করেন। কাপ্তেন চেং হো বাংলাদেশ, আরব, সোমালিভূমি ও পারস্য উপকূলে নৌ-বহর নিয়ে

গিয়েছিলেন। সম্রাটের মৃত্যুর পূর্বে সোমালি থেকে চারটি মিশন চীনে প্রেষিত হয়েছিল। দূরবিস্তৃত দেশসমূহে নৌ অভিযান পাঠিয়ে কর্তৃত্ব স্থাপনের এরূপ প্রয়াস ইতিপূর্বে কোন চীনা সম্রাট করেন নি।

সাম্রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করবার উদ্যোগ করেছিলেন ইয়াং লো, ইষ্ট বৃদ্ধির চেষ্টাও করেছিলেন। সানটাং-এর বিপজ্জনক সমুদ্র-উপকূল বর্জন করে পিকিং নগরে শস্য পরিবহণের সুবিধার জন্য তিনি 'বৃহৎ খালে'র উন্নতি করেছিলেন।

ধর্ম বিষয়ে তিনি ছিলেন তিব্বতী বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী, কিন্তু রাজনৈতিক প্রয়োজনে বৌদ্ধ ও তাও-ধর্মের নিগ্রহ করতে ছাড়েন নি। ১৪২০ খৃস্টাব্দে পিকিং শহরে স্বর্গপূজা (ফেং) ও পৃথিবীপূজার (স্যাং) জন্য একটি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। হ্যানলিন আকাদামির গৌরব জাগিয়ে তুলে এবং প্রাচীন গ্রন্থের অধ্যয়ন সমর্থন করে কনফুসীয় বিধিব্যবস্থার অনুসরণ করেছিলেন তিনি। ১১০৯৫ হস্তলিপির সমষ্টি, মোট ২২৯৩৭ গ্রন্থের একটি সুবৃহৎ বিশ্বকোষ সংগ্রহ করে তাঁর গ্রন্থাগারে রেখেছিলেন। সেই অমূল্য বিশ্বকোষটি সহ সমগ্র গ্রন্থাগার ১৯০০ খৃস্টাব্দে 'মুষ্টিযোদ্ধা' বা 'বকসার' হাঙ্গামায় পাশ্চাত্ত্য সৈন্যগণ কর্তৃক দগ্ধ হয়েছিল।

মিং বংশের কয়েকজন সম্রাট (১৪২৫-১৫৬৬)

মোঙ্গলিয়া অভিযান থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে ১৪২৫ খৃস্টাব্দে ইয়াং লো-র মৃত্যু হয়। পরবর্তী কালে মিং বংশে আর কোন শক্তিশালী সম্রাট জন্মগ্রহণ করে নি। সাম্রাজ্য আরও দু'শ' বছর টিকে ছিল, এবং এই সময়ে নানান কৃষি-বিপর্যয় ও দুর্ভিক্ষ সত্ত্বেও মোটামুটিভাবে দেশের সমৃদ্ধি অক্ষুণ্ণই ছিল বলতে হয়। কিন্তু সাম্রাজ্যের আয়তন বর্ধিত হয় নি, বরঞ্চ হ্রাসই পেয়েছিল। আনাম স্বাধীন হয়েছিল, সাগরপারের দেশগুলিও করদান বন্ধ করে দিয়েছিল, এমন কি ভাগ্যচক্রের আবর্তনে মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মিং সম্রাট চেং তুং-কে শত্রু-হস্তে বন্দী হতে হয়েছিল।

ইয়াং লো-র পুত্র হুং সি ছিলেন একজন রুগ্ন ব্যক্তি, মাত্র দশ মাস রাজত্বের পর তাঁর মৃত্যু হয়। তারপর রাজা হলেন ইয়াং লো-র পৌত্র সুয়ান সুং। তিনি এগার বছর রাজত্ব করেছিলেন (১৪২৬-১৪৩৬)। তাঁর মৃত্যুর পর সিংহাসন অধিকার করেন ইয়াং লো-র আট বছরের প্রপৌত্র

চেং তুং বা ইং স্থং (১৪৩৬-১৪৬৫)। সাম্রাজ্য শাসনে এরূপ ঘন ঘন শাসকের পরিবর্তন রাজশক্তির মূল শিথিল করবার কথা। বালক সম্রাটের মাতা হলেন অভিভাবিকা, এবং তিনি চীনা রাজসংসারে চিরপ্রচলিত সনাতন খোজা প্রভাবের অধীন হয়ে পড়েছিলেন। সম্রাট সাবালক হয়েও সেই প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন নি। খোজা ওয়াং চেং ছিল সম্রাটের পরম বিশ্বাসভাজন, তার পরামর্শে সম্রাট পাঁচ লক্ষ সৈন্য সহ মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে অভিযানে যাত্রা করলেন। পিকিং নগরের পঞ্চাশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে হুয়াই লাই নামক স্থানে যে যুদ্ধ বাধল সেই যুদ্ধে সম্রাটের শোচনীয় পরাজয় ঘটল, লক্ষাধিক চীনা সৈন্য নিহত হল। সম্রাটের দুর্বুদ্ধি, ওয়াং-কে তিনি সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেছিলেন, এই অনভিজ্ঞ ব্যক্তিটির প্রমাদ ও একগুঁয়েমির জন্যেই মোঙ্গলদের যুদ্ধ-জয় সম্ভব হয়েছিল। তারা ওয়াং-কে হত্যা করল এবং সম্রাটকে বন্দী করে মোঙ্গলিয়ায় নিয়ে গেল। মোঙ্গলদের হস্তে বন্দী হবার পূর্বে যুদ্ধ-শিবিরে সম্রাট সেই আসন্ন সংকটের সম্মুখীন হয়েছিলেন বিলক্ষণ সাহস ও ধৈর্য সহকারে। চারদিকে শরীর-রক্ষীদের মৃতদেহ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, এই রক্তাক্ত পরিবেশের মধ্যে সম্রাট একাকী একখানা কার্পেটের ওপর শান্তভাবে সমাসীন, মুখে উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নেই। মোঙ্গলরা বন্দী সম্রাটের মুক্তিপণ দাবি করে চীনে সংবাদ দিল, চীন থেকে আট গাড়ি বোঝাই ধনরত্নাদি পাঠানো হল। তারা গাড়ি আটটি রেখে দিল বটে কিন্তু সম্রাটকে মুক্তিদান করল না। ইতিমধ্যে সম্রাটের ভ্রাতা চিং তি চীনের সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন, এই সংবাদ পেয়ে মোঙ্গলরা বন্দী সম্রাটকে মুক্ত করে দিল, কেননা যে সম্রাট রাজ্যচ্যুত তাকে আটক রাখা নিরর্থক। চেং তুং দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন, কিন্তু চিং তি সিংহাসন ত্যাগ করতে অসম্মত হলেন। অগত্যা নিরুপায় চেং তুং-কেই সিংহাসন লাভের আশা ত্যাগ করতে হল। সাত বছর রাজত্বের পর (১৪৫০-১৪৫৭) যখন চিং তি অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন মন্ত্রী ও সেনাপতিগণ সভায় মিলিত হয়ে ভূতপূর্ব বন্দী সম্রাট চেং তুং-কে পুনরায় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করল।*

* চেং তুং-এর কনিষ্ঠ ভ্রাতা চিং তি-র প্রতি সুবিচার করা হয় নি। সম্রাট হয়েছিলেন তিনি ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে। মৃত্যুকালে তাঁকে রাজ্যচ্যুত করা হল। তাঁর মৃতদেহ প্রোথিত করা হয়েছিল মিং বংশীদের সমাধিক্ষেত্রে নয়, দূরবর্তী স্থানে।

তাঁর দ্বিতীয়বার রাজত্বের অবসান হয়েছিল মৃত্যুর সঙ্গে (১৪৬৫) এবং এই সময়ে তিনি তিয়েন সুং নামে পরিচিত ছিলেন। পূর্ববর্তী মিং-দের কালে সম্রাটের মৃত্যু হলে মৃতদেহের সঙ্গে রাজ-গণিকাদের জীবন্ত সমাধি দেবার বিধান ছিল। সম্রাট তিয়েন সুং এই অতি নিষ্ঠুর প্রথা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

হুয়াই লাই-র যুদ্ধে পরাজয়ের পরিণাম মিং সাম্রাজ্যের ধ্বংস-রূপ কোন মারাত্মক ব্যাপার হয়ে ওঠে নি, তার কারণ এই যে পরাক্রমের অভাবে মোঙ্গলরা তাদের জয়লাভের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে অসমর্থ হয়েছিল। কিন্তু চীনাদের সামরিক প্রাধান্য সেই পরাজয়ের সঙ্গেই লোপ পেয়েছিল, এবং এখন থেকে তাদের সকল চেষ্টা উদ্যোগ উত্তরাঞ্চলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় নিয়োজিত হল। পঞ্চদশ শতাব্দের শেষভাগেব সম্রাট চে'ং হুয়া ও হুং চি-র রাজত্বকালে সাম্রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, প্রত্যন্তদেশ রক্ষা করবার শক্তিও তাঁদের ছিল, কিন্তু ষোড়শ শতাব্দের প্রারম্ভেই চীনের মর্যাদাহানি ঘটল, এবং সেই সঙ্গে মিং বংশের পতনের লক্ষণ দেখা দিল।

চেং তি

পনর বছর বয়সে সম্রাট চেং তি বা উ সুং (১৫০৫-১৫২০) সিংহাসনে আরোহণ করেন। হুয়াই লাই যুদ্ধের পর রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে খোজা প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয়েছিল, এখন আবার তারা সর্বেসর্বা হয়ে উঠল। লিউ চিন নামক জনৈক খোজা হল রাজ্যের নিয়ন্তা, সে প্রতিদ্বন্দ্বীদেব, এমন কি মন্ত্রীদেরও হত্যা করল, প্রশাসন ব্যাপাবে দুর্নীতির অবধি রইল না, খোজারা উৎকোচ গ্রহণ করে রাজকর্মচারী নিয়োগ কবত, এবং কার্যে বহাল থাকতে হলে খোজাদের বার্ষিক অর্থদানের বরাদ্দ কবতে হত। তের শ' বছর পূর্বে হ্যান যুগে খোজা শাসনের দুর্নীতির ফলে চারদিকে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল, সেই ইতিহাসেরই এখন পুনরাবৃত্তি ঘটল।

সম্রাট চেং তি খামখেয়ালী মানুষ ছিলেন বটে, কিন্তু অযোগ্য শাসক ছিলেন না। প্রকৃত অবস্থার কথা জানা তাঁর পক্ষে হয়তো সম্ভবপর ছিল না, কিন্তু প্রজাদের অসন্তোষ যখন বিদ্রোহের আকারে দেখা দিল, তখন তিনি ব্যাপারটির গুরুত্ব বুঝতে পেরে ক্ষিপ্র হস্তে খোজাদের দমন করলেন। খোজা লিউ চিন-এর প্রতি প্রজাদের বিদ্বেষ ছিল এমনি তীব্র যে তারা তার দেহের

অস্থি থেকে মাংসপিণ্ড দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিয়েছিল। রাষ্ট্র কর্তৃক তার বিপুল ঐশ্বর্য বাজেয়াপ্ত হল। আড়াই কোটি 'তায়েল' (tael) মূল্যের স্বর্ণ ও রৌপ্য, চব্বিশ পাউণ্ড ওজনের বহুমূল্য পাথর, স্বর্ণনির্মিত দুটি বর্ম, পাঁচ শ' সোনার থালা, তিন হাজার সোনার আংটি ও চার হাজার বাষট্টি মণিমুক্তাখচিত কোমরবন্ধ তার গৃহে পাওয়া গিয়েছিল। তা ছাড়া, পিকিং নগরে তার প্রাসাদোপম বাড়িটিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। অন্যান্য খোজাদের মত লিউ চিন-ও দরিদ্র ঘর থেকে এসেছিল, একজন নগণ্য খোজার অল্প কিছু-কালের মধ্যে এরূপ প্রভূত ঐশ্বর্যের মালিক হয়ে ওঠার বৃত্তান্তটি থেকে খোজা প্রভাব ও দুর্নীতির ব্যাপকতা সম্বন্ধে কিছুটা অনুমান করা চলে।

কিন্তু খোজা-প্রভাবিত শাসনের ঘোর দুর্নীতির মধ্যেও কর্তব্যপরায়ণ বিবেকধর্মী শাসক-কর্মচারীরা দায়িত্বপূর্ণ কর্মে প্রজার হিতসাধনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, এরূপ দৃষ্টান্তও দেখা যায়, যদিও তেমন কর্মচারীর সংখ্যা বেশি না থাকাই সম্ভব। ওয়াং স্থ-জেন দক্ষিণ চীনের উপজাতিগণের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৫০৭ খৃস্টাব্দে সম্রাট সমীপে তিনি যে স্মারকলিপি লিখে পাঠিয়েছিলেন তারই মধ্যে রয়েছে সেই কর্মচারীর কর্তব্যনিষ্ঠার পরিচয়। পত্রখানা এই: "প্রজারা কিভাবে বাস করবে, কিরূপে জমি চাষ ও জলসেচ করবে, এ-সব বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া রাজকর্মচারীর কর্তব্য। স্থানীয় সরকার প্রজাদের দেবে বীজ, পশু আর কৃষিকর্মের উপকরণ, এসবই প্রজা সরকারকে প্রত্যর্পণ করবে ফসল কাটবার পর, উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ সমেত। সরকারের কর্তব্য অকর্ষিত জমি আবাদ করতে প্রজাদের উৎসাহ দান, যথা-সম্ভব অল্প পরিমাণ কর ধার্য করা যাতে সকলে বিধিমত পূজা-আচা চালিয়ে যেতে পারে, দেশভ্রমণে বেরোতে পারে এবং জীবনযাত্রার মান রক্ষা করে স্ব স্ব ব্যয় নির্বাহ করতে পারে।"

চিয়া চিং ও ওয়াং লি

সম্রাট চিয়া চিং বা সি স্থং (১৫২০-১৫৬৬) এবং সম্রাট ওয়াং লি (১৫৭২-১৬২০) এই দুই নৃপতির সুদীর্ঘ শাসনকালে অন্তর্বিদ্রোহ দমিত হলেও উত্তরাঞ্চলের মোঙ্গলদের উৎপাত বর্ধিত হয়েছিল এমন কি তারা পিকিং-এর প্রাচীর পর্যন্ত এগিয়ে আসতেও সাহস করেছিল (১৫৫০)। তা ছাড়া

জাপানীদের ব্যবসার সুযোগ খর্ব হওয়ায় এখন তারা চীনের সমুদ্রতীরবর্তী স্থানসমূহে দস্তুরমত নৌ-অভিযান শুরু করে দিয়েছিল। শত শত জাহাজে জাপানীরা এসে চীনের বন্দরগুলি ধ্বংস করত, অনেক লোককে বন্দী করে নিয়ে যেত, বন্দীমুক্তির পণ দাবি করত। এই দস্যুবৃত্তি দস্তুরমত একটি ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছিল, অনেক ধনী জাপানী এই ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগ করে যথেষ্ট লাভবান হত। এদিকে পর্তুগীজরাও চীনা বন্দরগুলিতে তাদের স্বভাবসিদ্ধ দস্যুবৃত্তি আরম্ভ করেছিল, কিন্তু চীন তাদের দৃঢ়হস্তে দমন করেছিল, তাদের উৎসাদন করেছিল জাহাজগুলি দগ্ধ করে। পর্তুগীজরা ক্যান্টন নদীর মুখে মাকাও নামক দ্বীপে একটি ঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল (১৫৫০)। সেই ঘাঁটি চীনের পাদমূলে কণ্টকস্বরূপ অদ্যাপি বিদ্যমান।

হিদেয়োশি ঃ নুরহাচু

১৫৯২ খৃস্টাব্দে প্রসিদ্ধ জাপানী সমর-নেতা হিদেয়োশি কোরিয়া আক্রমণ করেন। কোরিয়া ছিল চীনের অধীন, সম্রাটের নিকট কোরিয়া সাহায্য প্রার্থনা করল। মিং সম্রাট ওয়াং লি জাপানী আততায়ীদের বিতাড়নের জন্য সৈন্য প্রেরণ করলেন। এই যুদ্ধ ছয় বৎসর চলেছিল। যুদ্ধের প্রথম ভাগে চীনা বাহিনী সাফল্য লাভ করেছিল বটে, কিন্তু তারপর প্রভূত সৈন্যক্ষয় সহ চীনাদের ঘন ঘন পরাজয় ঘটতে লাগল। একটি যুদ্ধে ৩৮৭০০ চীনা ও কোরীয় সৈন্য নিহত হয়েছিল, তাদের নাক-কান কেটে মসলা মাখিয়ে কিয়োটো নগরে পাঠানো হয়েছিল, সেখানে কর্তিত নাক-কানগুলি জড় করে রেখে তার ওপর একটি স্তূপ নির্মাণ করা হয়েছিল। স্তূপটির নাম 'কর্ণস্তূপ' ("Ear Mound")। ১৫৯৮ খৃস্টাব্দে হিদেয়োশির মৃত্যু হয়। এই ব্যক্তিকে 'জাপানী নেপোলিয়ান' আখ্যা দিয়েছেন জাপানী লেখকেরা। তাঁর মৃত্যুর পর জাপানীরা কোরিয়া ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল।

কোরিয়ায় জাপানীদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামে মিং সম্রাট জাপানী বিতাড়নে সফলকাম হয়েছিলেন বটে, কিন্তু অজস্র রক্তমোক্ষণের ফলে তাঁর জয়লাভ হয়েছিল নিতান্তই ফাঁকা। সাম্রাজ্যশক্তি তখন এত দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে মহাপ্রাচীরের বহির্দেশ থেকে শত্রুর আক্রমণকে প্রতিরোধ করা চীনের পক্ষে

কঠিন হয়ে উঠেছিল। ১৬১৯ খৃস্টাব্দে নুরহাচু নামে জনৈক নেতার অধীনে মাঞ্চুরা চীনা ও মোঙ্গল বাহিনীকে যুদ্ধে হারিয়ে মাঞ্চুরিয়া অধিকার করে বসল, তারপর লিয়াও তু' বা দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া দখল করে বর্তমান কিরিন অঞ্চলে একটি রাজ্য স্থাপন করল। এই মাঞ্চুরা জু-চেন বা কিন-দের মত তুঙ্গু জাতীয় মানুষ সুঙ্গারি নদী উপত্যকা, কিরিন ও হেইলুং-চিয়াং-এর অধিবাসী। এই জাতিকে ঐক্যসূত্রে বদ্ধ করে পরাক্রান্ত করে তুলেছিলেন নুরহাচু (১৫৫৯-১৬২৬), তিনি ছিলেন মাঞ্চু বংশের প্রতিষ্ঠাতা। নুরহাচু সদবংশীয়, অসমসাহসী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্যক্তি ও সুদক্ষ যুদ্ধ-নেতা ছিলেন, মৃত্যুকালে তাঁর সাম্রাজ্য পূর্ব সীমানায় সমুদ্র ও উত্তর দিকে আমু নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। এই সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের রাজধানী তিনি মুকডেন নগরে স্থাপন করেছিলেন। মোঙ্গলগণ নুরহাচু ও তাঁর বংশধরের বশ্যতা স্বীকার করেছিল। মাঞ্চুরা ইউয়ান বংশের মুদ্রা বা সীলমোহর হস্তগত করে সাম্রাজ্যের ওপর দাবি কায়েম করেছিল এবং সেজন্য মোঙ্গলদের পক্ষে নুরহাচুর বংশকে চীনের রাজবংশ বলে স্বীকার করতে কোন বাধা ছিল না। বংশের নাম হল 'চিং' অর্থাৎ 'পবিত্র' বংশ, ইতিহাসে মাঞ্চুরা চিং বংশীয় বলেই পরিচিত।

১৬২৭ খৃস্টাব্দে নুরহাচুর পুত্র তা'ই সুং কোরিয়া জয় করেছিলেন, কিন্তু চীনের মূল ভূখণ্ডে ক্ষণকালের জন্য মাঞ্চু জয়যাত্রার পথ রোধ করেছিল মহাপ্রাচীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। এই প্রতিরক্ষা ভেদ করে মাঞ্চু বাহিনীর অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল তার কারণ হয়তো এই যে চীনে তখন ঘোরতর অন্তর্বিরোধ চলেছিল। রাজসভায় দলাদলি ও খোজাদের প্রাধান্য, কুশাসন, দুর্নীতি, করভার ও চাষবাসের দুরবস্থা দেশ মধ্যে ক্রমবর্ধমান অশান্তি সৃষ্টি করেছিল। এই অশান্তি দমন করতে সামরিক ব্যয় প্রভূত পরিমাণে বর্ধিত হয়েছিল। মিং রাজত্বের প্রথম ভাগে সামরিক ব্যয় ছিল মাত্র বিশ লক্ষ 'তায়েল' পরিমাণ রৌপ্য, ১৬৩৯ সনে সেই ব্যয় দুই কোটি তায়েলে পরিণত হয়েছিল।

শেষ মিং সম্রাট চু'ং চে'ং

মিং বংশের শেষ সম্রাট ছিলেন চু'ং চে'ং বা চুয়াং লিয়ে তি (১৬২৮-১৬৪৪)। তাঁর রাজত্বকালে যে ভীষণ বিদ্রোহ মাথা তুলেছিল, সেই

বিদ্রোহের নেতা ছিলেন লি জু চে'ং। এই ব্যক্তি সেনসি প্রদেশের একজন গ্রামমুখ্যের পুত্র, বিদ্রোহীদের পরিচালনায় তাঁর দক্ষতা শীঘ্রই তাঁকে বিজেতার গৌরব দান করেছিল। ১৬৪০ খৃস্টাব্দে তিনি হোনান প্রদেশ অধিকার করেন, তারপর সেনসি ও সানসি অতিক্রম করে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে পিকিং আক্রমণ করেন। এই অবস্থায় আর উপায়ান্তর না দেখে সম্রাট চু'ং চে'ং প্রাসাদলগ্ন 'কয়লা পাহাড়' (Coal Hill)-এর ওপর আত্মহত্যা করেন (১৬৪৪)। পিকিং নগরে সে স্থানটি এখনো দেখা যায়।

দক্ষিণ অঞ্চলের ন্যানকিং নগর থেকে সাম্রাজ্যের রাজধানী প্রত্যন্তের সমীপবর্তী পিকিং শহরে স্থানান্তরের অশুভ পরিণাম এতদিনে দেখা দিল। ন্যানকিং বহু দূরে অবস্থিত, কিন্তু মহাপ্রাচীরের এধারে পিকিং-এর ডাক ওধারে মাঞ্চুরা বেশ শুনতে পায়। প্রাচীরের এ-ধার থেকে সেই ডাকটি দিয়েছিলেন চীনা সেনাপতি উ সান কুয়েই। এই সেনাপতি মাঞ্চুদের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চলে সসৈন্যে অবস্থান করছিলেন। বিদ্রোহীরা পিকিং নগর অধিকার করে সেনাপতি উ সান কুয়েই-র পিতাকে বন্দী, পরে হত্যা করল, আর বিদ্রোহী নেতা লি জু চে'ং তাঁর গণিকাকে অপহরণ করল। ক্রোধান্ধ সেনাপতি উ তখন মাঞ্চুদের আহ্বান করলেন বিদ্রোহীদের কবল থেকে পিকিং উদ্ধারের জন্য। উভয়ের মিলিত সৈন্য লি জু চে'ং-কে পরাজিত করে পিকিং অধিকার করল। লি জু চে'ং পশ্চিম ও দক্ষিণ অভিমুখে পলায়ন করল, আর উ সান কুয়েই তার পশ্চাদ্ধাবন করলেন প্রতিহিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য। এই অবসরে মাঞ্চুরা উত্তর চীনে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। প্রকৃতপক্ষে মিং সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল বহিঃশত্রুর আক্রমণের জন্য নয়, অন্তর্বিদ্রোহের ফলে।

২. ইউরোপীয় বণিক ও বাণিজ্য ঃ ধর্মযাজকগণ

মার্কো পোলোর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত থেকে চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব প্রাচ্যের প্রভূত ঐশ্বর্যের বিষয় পাশ্চাত্য জগৎ প্রথম জানতে পেরেছিল, এবং সেই সময় থেকে পাশ্চাত্য দেশসমূহে চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের আগ্রহ দেখা দিয়েছিল। ইতিমধ্যে মোঙ্গল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ল, পশ্চিম এশিয়ার

মোঙ্গল শাসকেরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল, আর সেই সঙ্গে চীনে যাতায়াতের স্থলপথটিও বন্ধ হয়ে গেল। তখন ভারত ও দূরপ্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগের জন্য জলপথ আবিষ্কারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। এই প্রয়োজনের তাগিদেই ইতালীয় কলম্বাস ও পর্তুগীজ ভাস্‌কো-দা-গামা জাহাজে সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন, যার ফলে কলম্বাস আবিষ্কার করলেন আমেরিকা, আর ভাস্‌কো-দা-গামা আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্তের গুড হোপ অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করে পশ্চিম ভারতের উপকূল কালিকাটে এসে উপনীত হলেন (১৪৯৭)। ভাস্‌কো-দা-গামার ভারতে আগমনের উনিশ বৎসর পর ১৫১৬ খৃস্টাব্দে র‍্যাফেল পেরেস্ট্রেলো (Raphael Perestrello) নামে জনৈক কাপ্তেনের অধিনায়কত্বে একটি পর্তুগীজ জাহাজ দক্ষিণ চীনে পার্ল নদী-মধ্যে প্রবেশ করে ক্যানটন বন্দরে নোঙ্গর ফেলল। কোন জাহাজের সরাসরি ইউরোপ থেকে চীনে আগমন ইতিপূর্বে আর ঘটে নি, জলপথে যাতায়াতের পথ সেই যে মুক্ত হয়ে গেল আর তা বন্ধ হয় নি। প্রাচী ও প্রতীচীর এই যোগাযোগের গাঁটছড়া নিয়তি সেদিন বেঁধে দিয়েছিল, তারপর প্রায় চার শ' বছর জুড়ে উভয়ের মন কষাকষি, পরস্পরকে আক্রমণ, একের প্রতি অন্যের বলপ্রয়োগ এমনি কত ঘটনা ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করেছে তার ইয়ত্তা নেই।

বিগত চার শতাব্দের এই সংঘর্ষের কাহিনী আমরা জানতে পারি ইউরোপীয়ানদের লিখিত বিবরণগুলি থেকে। এইসব বিবরণ যে পক্ষপাত-দুষ্ট তাতে বিস্ময়ের কারণ নেই। ইউরোপীয়ানদের আগমনের পর তারা সমুদ্রপথে ও চীনের উপকূলভূমিতে লুণ্ঠন ও হত্যার দ্বারা যে বিভীষিকাময় ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল, সেই বৃত্তান্তগুলির উল্লেখ আছে সামান্যই, পক্ষান্তরে প্রতিষেধক ব্যবস্থারূপে এইসব বিদেশীর গতিবিধি ও বাণিজ্যের ওপর আরোপিত বাধানিষেধগুলিকে অপমানকর হস্তক্ষেপ বলে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করা হয়েছে বিস্তর। শ্বেতাঙ্গ বিদেশীদের চীনারা নাম দিয়েছিল 'বিদেশী শয়তান' (foreign devils), এই নামটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে ইউরোপীয়ানরা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছে যে জাতিবিদ্বেষ চীনাদের মন মারাত্মক রকমে তিক্ত, বিষাক্ত করে রেখেছে এবং এই বিদ্বেষ থেকে যত সংঘর্ষের উৎপত্তি। কিন্তু চীনের অতীত ইতিহাস এখন আমাদের অজানা

নেই, সেই ইতিহাসে বিদেশীর প্রতি বিদ্বেষের পরিচয় চীনা চরিত্রে কোথাও বিন্দুমাত্র প্রকাশ পায় নি। বিগত দীর্ঘ কয়েক শতাব্দ জুড়ে আরব, পারসীক, ভারতীয় ও মালয় ব্যবসায়ীদের প্রতি উদার আচরণ, ভ্রমণে বাধাহীনতা, ধর্মানুষ্ঠানে পূর্ণ স্বাধীনতা চীনের সর্বজনীন মহানুভবতারই পরিচয় দেয়। বস্তুত চীনের মত ধর্মান্ধতাবর্জিত মহানুভব জাতি জগতে আর ছিল না, এমন কথা বলা আদৌ অতিশয়োক্তি নয়। এরূপ নীতিজ্ঞানসম্পন্ন সদাচারী জাতি ইউরোপীয়ানদের প্রতি কঠোর ব্যবহার, তাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ, ব্যবসায়ে বাধা দান করতে বাধ্য হয়েছিল, তার কারণ এই যে, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দে ইউরোপীয় আগন্তুকদের দস্যুবৃত্তি, লুণ্ঠন, হত্যা প্রভৃতি অনাসৃষ্টি কাণ্ডগুলি তাদের প্রতি চীনাদের স্বভাবতই খড়্গহস্ত করে তুলেছিল।

পর্তুগীজদের বোম্বেটে-বৃত্তি

প্রতীচ্য জগৎ ও চীনের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্বন্ধ সর্বপ্রথম স্থাপন করেছিল পর্তুগীজরা, প্রতীচীর পুরোধারূপে এই জাতির চীনে আগমন ইতিহাসের একটি বিড়ম্বনাবিশেষ। ইউরোপ বর্বর ছিল না, সেখানে তখন রেনাসাঁর যুগ, জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্পের ক্ষেত্রে নব-জাগরণের সাড়া পড়েছিল, কিন্তু এই সাংস্কৃতিক জ্যোতির্মণ্ডল থেকে দূরে ঘনান্ধকার-মধ্যে আঁধারের কীটরূপে বিরাজ করছিল পর্তুগীজ জাতি। মুসলমান মুরগণের অধীনতা পাশ থেকে মুক্তিলাভের জন্য স্পেন ও পর্তুগাল দীর্ঘকাল সহিংস সংগ্রাম চালিয়ে এসেছিল, এবং তারই ফলে হিংসাবৃত্তি ও বিধর্মীর প্রতি তীব্র ঘৃণা বিদ্বেষ এই দুই দেশের অধিবাসীদের মজ্জাগত স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সম্ভবত ইসলামের গোঁড়ামির ছোঁয়াচ স্পেনিশ ও পর্তুগীজ জাতিকে স্পর্শ করেছিল, এবং এই সংক্রমিত ব্যাধিরই বিকৃত রূপ ফুটে উঠেছিল আমেরিকায় স্প্যানিয়ার্ডদের নৃশংসতায় আর দূরপ্রাচ্যে পর্তুগীজদের বোম্বেটে বৃত্তি ও নগর লুণ্ঠনের মধ্যে। পর্তুগীজরা ক্রূরস্বভাব ধর্মান্ধ জাতি হয়ে উঠেছিল, বিধর্মীকে হত্যা, বিধর্মীর জাহাজ বা নগর লুণ্ঠনকে পাপকার্য বা অন্যায় বলে মনে করত না। প্রাচ্যদেশের দুর্বল রাজ্যগুলির সমুদ্রকূলে নগর বা বন্দরে তারা হানা দিত, আর পরাক্রান্ত রাজ্যে তাদের আবির্ভাব হত বণিকরূপে, কিন্তু সেখানেও তারা সুযোগ-সুবিধামত পরস্বাপহরণ প্রভৃতি দুষ্কর্ম করতে বিরত হত না।

আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে পর্তুগীজদের অব্যবহিত পরেই যে ইউরোপীয় জাতির আবির্ভাব হয়েছিল সেই ওলন্দাজরাও নৈতিক মর্যাদা বা জাতীয় সুনামের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে পর্তুগীজ দস্যুদের দৃষ্টান্তের অনুসরণে লাভবান হবার চেষ্টা করেছিল। সেজন্য চীনারা ঘৃণাভরে ওলন্দাজদের নাম দিয়েছিল 'হু' মাও' বা 'লাল মাথা' (Red heads), পরে ইংরেজরাও ঐ নামে অভিহিত হত। এশিয়ার পূর্ব ভূখণ্ডে, বিশেষত দূরপ্রাচ্যে পর্তুগীজ ও ওলন্দাজেরা যে কলুষিত পরিমণ্ডল প্রস্তুত করে রেখেছিল, তার মধ্যে সর্বশেষ আগন্তুক ইংরাজদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের স্ফুরণ একপ্রকার অসম্ভব হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। তাই চীনের উপকূলে বৃটিশ জাহাজের আবির্ভাবের সঙ্গেই তাদেরও বাহুশক্তির আশ্রয় নিতে দেখা যায়।

পেরেস্ট্রেলো মাত্র একখানি জাহাজ নিয়ে এসেছিলেন, চীনারা তাঁকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেছিল, যেমন সমাদর আরব বা মালয় বণিকেরা লাভ করেছিল তেমনি। পরের বছরে ফার্নাণ্ডো ডা'ণ্ড্রাডা-র (Fernando D' Andrada) অধিনায়কত্বে চারটি পর্তুগীজ জাহাজ রাজ-দরবারে প্রেরিত একজন দূতসহ চীন দেশে উপস্থিত হল। পিকিং রাজ-দরবারে পর্তুগীজ দূত যথারীতি সংবর্ধিত হলেন, দূতের উপঢৌকন চীন দরবার প্রথামত 'কর' স্বরূপ গ্রহণ করলেন।* এমন সময় চীনারা এই সংবাদ পেল যে, পর্তুগীজরা দস্যু-জাতি, প্রথমে তাদের আবির্ভাব হয় শান্তিপূর্ণভাবে বণিকের মানদণ্ড নিয়ে, প্রতিষ্ঠা লাভের পর স্বরূপ প্রকাশ করে তারা নগর লুণ্ঠন করে অথবা রাজ্যের প্রশাসনিক বিপর্যয় ঘটিয়ে। নানারূপ কুকাণ্ডের অনুষ্ঠান করেছে তারা ভারতবর্ষে, পারস্য উপকূলে ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে, এইসব সংবাদের সমর্থন শীঘ্রই পাওয়া গেল। ক্যান্টনে ছিল ফার্নাণ্ডোর ভ্রাতা সাইমন ডা'ণ্ড্রাডা, তার পরিচালনায় পার্ল নদীতে পর্তুগীজরা রীতিমত দস্যুবৃত্তি শুরু করে দিল, এবং তাদের এই আগ্রাসী ক্রিয়াকলাপের জন্যই চীনা সরকারকে বাধ্য হয়ে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ

* প্রাচীন প্রথা ছিল এইরূপ: বিদেশ থেকে আগত রাজদূতগণের উপঢৌকনকে সম্রাট সেই বিদেশী রাষ্ট্রের বশ্যতার নিদর্শন 'কর' (tribute)-স্বরূপ গ্রহণ করতেন, আর সম্রাট বিদেশী রাষ্ট্রকে যেসব জিনিস দিতেন সেগুলিকে বলা হত 'উপহার'।

করতে হয়েছিল। ফলে পর্তুগীজ জাহাজগুলি চীনের উপকূল থেকে বিতাড়িত হল।

পর্তুগীজরা যে জলদস্যু সেবিষয়ে চীনাদের মনে এখন আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না। পর্তুগীজ জাহাজের চীনা বন্দরে প্রবেশ নিষিদ্ধ হল। ১৫২২ খৃস্টাব্দে আলফানসো ডি' মেলো (Alfanso D'Mello) পর্তুগীজ জাহাজ নিয়ে ক্যানটনের কাছে আসা মাত্রই চীনা নৌ-বহর তাকে আক্রমণ করল। কঠিন যুদ্ধের পর ডি' মেলো পরাজিত হল, যে-সব পর্তুগীজ জীবিত ছিল, বোম্বেটেগিরির জন্য প্রাপ্য প্রাণদণ্ডে তাদের দণ্ডিত করা হল। বিশ বৎসর-কাল পর্তুগীজরা চীনে পদার্পণ করে নি, তারপর ১৫৪২ খৃস্টাব্দে নিং পো-তে আবার তারা এসে উপস্থিত হল। পুরনো কাহিনী লোকেরা কতকটা ভুলে গিয়েছিল, সেইজন্যেই হোক অথবা বিদেশী বাণিজ্যের লাভের কথা ভেবেই হোক, নিং পো নগরের কর্তৃপক্ষ পর্তুগীজদের সেখানে বাণিজ্য করতে অনুমতি দিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই দেখা গেল যে চিতাবাঘের চর্মের কালো ডোরাগুলোর পরিবর্তন যদি বা সম্ভব হয়, পর্তুগীজদের অভ্যাস-প্রকৃতির পরিবর্তন একেবারেই অসম্ভব। দুই বছরের মধ্যেই নিং পো নগরে তারা জনবলে ও ধনবলে সমৃদ্ধ হয়ে উঠল, এবং শক্তি অর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই আবার নিজমূর্তি ধারণ করল। চীনাদের ওপর নানান উপদ্রব, তাদের হত্যা, আক্রমণ আরম্ভ হল, উদ্ধত স্বভাবের জন্য স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে পর্তুগীজদের সম্বন্ধ বিষাক্ত হয়ে উঠল। ভীত হয়ে পর্তুগীজরা তখন দুর্গ নির্মাণের উদ্যোগ করল। সার্বভৌম অধিকারের প্রতি এই অশ্রদ্ধা চীনারা সহ্য করল না, অচিরেই চীন-সৈন্য দুর্গ আক্রমণ করে পর্তুগীজদের নির্মূল করল। ৮০০ জন পর্তুগীজ নিহত হয়েছিল, তাদের জাহাজগুলিও দগ্ধ করা হল। এই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হয়েছিল ফুকিয়েন-এর চুযাং-চৌ উপনিবেশটিতে, এইরূপে নিং পো ও ফুকিয়েন উভয় স্থানেই পর্তুগীজরা উৎসাদিত হয়েছিল। চুযাং-চৌ বন্দরে ইতিপূর্বে অনেক আরব ও অন্যান্য বিদেশী বণিকদের শুভাগমন ঘটেছিল, বিদেশী সংসর্গে এখানকার অধিবাসীরা ছিল চিরাভ্যস্ত, কিন্তু এমন উদার অমায়িকতা সত্ত্বেও কেন তারা পর্তুগীজদের ওপর খড়্গহস্ত হয়ে উঠেছিল, তার কারণ এই জাতির ঔদ্ধত্য, অনাচার, দস্যুবৃত্তি। পর্তুগীজদের আচরণ শুধু যে নিজ

জাতিকে কলঙ্কিত করেছে তা নয়, তাদের কদাচারের জন্য সকল ইউরোপীয়ানই নির্বিশেষে চীনাদের বিরাগভাজন হযে উঠেছিল। তারা শ্বেতাঙ্গদের 'সমুদ্রের শয়তান' (Ocean Devil) বলে যে নামে অভিহিত করেছিল, আধুনিক কালেও সেই নামটি শোনা গেছে।

কিন্তু বৈদেশিক বাণিজ্য উভয পক্ষেরই লাভজনক, ব্যবসায়ে চীনা কর্মচারীদেরও লাভ ছিল মোটা রকমের। অশুভ প্রারম্ভ সত্ত্বেও বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রতি চীনাদের আকৃষ্ট করেছিল এই লাভের সম্ভাবনা। ১৫৫৭ খৃস্টাব্দে পর্তুগীজদের সঙ্গে একটি আপস-রফার ফলে ক্যানটনের নদী-মোহানার নিকটবর্তী ম্যাকাও নামক একটি উপদ্বীপে বসবাস করে তাদের ব্যবসা চালাবার অনুমতি দেওয়া হল। এই স্থানের নিকটে কোন নগর ছিল না, উপদ্বীপের সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের সংযোগ বন্ধ করা হয়েছিল একটি প্রাচীর গড়ে তুলে। এখানে চীনারা সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ দ্বারা ভবিষ্যতে পর্তুগীজদের উপদ্রব প্রতিরোধের ব্যবস্থা করেছিল। পর্তুগীজদের চীনের মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। ১৫৭৫ খৃস্টাব্দে এই নিষেধাজ্ঞার পরিবর্তন করে নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনে ম্যাকাওবাসী পর্তুগীজদের ক্যানটনে এসে ব্যবসা করতে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

সেণ্ট জেভিয়ার ও ম্যাথিউ রিক্কি

পর্তুগীজদের প্রতি চীনাদের বিরূপতা যেমনই হোক, খৃস্টান ধর্মযাজকদের চীনারা যথেষ্ট সম্মান দান করেছে, তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৫৫২ খৃস্টাব্দে সেণ্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার (St Francis Xavier) এসেছিলেন চীনের মূল ভূখণ্ডে নয়, ম্যাকাও-র নিকট একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে, সেখানেই তার মৃত্যু হয। এই সাধু-সন্ত ব্যক্তিটির নামের সঙ্গে আমাদের সকলেরই পরিচয আছে, কলকাতায় তাঁর নামে খ্যাত একটি মিশনারী কলেজও আছে। ম্যাথিউ রিক্কি (Mathew Ricci) নামে একজন ইতালীয ধর্মযাজক চীন দেশে এসেছিলেন ১৫৮২ খৃস্টাব্দে, পিকিং নগরে তাঁর মৃত্যু হয ১৬১০ খৃস্টাব্দে। তিনি ছিলেন রোম্যান ক্যাথলিক, ধর্ম প্রচারে ব্রতী হযে চীনাদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। তিনি চীনা পোষাক পরিধান করতেন, এবং চীনের প্রাচীন গ্রন্থরাজি অধ্যয়ন করে চীনা আচার-ব্যবহার যথাসম্ভব মেনে চলতেন। অঙ্ক

ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে তাঁর প্রভূত জ্ঞান চীনা পণ্ডিতদের আকৃষ্ট করেছিল, কেননা ইউরোপ তখন এইসব বিদ্যায় চীনাকে অতিক্রম করেছিল। চীনা ভাষায় গ্রন্থ রচনা ও অনুবাদ-কার্যে রিক্কিকে সাহায্য করেছিলেন তাঁর অনুগত শিষ্য সু কুয়াং চি। তিনি ছিলেন পরম পণ্ডিত মানুষ এবং একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। ১৫৯৮ খৃস্টাব্দে ফাদার রিক্কি পিকিং-এ যান অনেক উপঢৌকন সঙ্গে নিয়ে, দুই বৎসর ধরে অনেক অনুরোধ-উপরোধের পর তাঁকে রাজ-দর্শনের অনুমতি দেওয়া হয়। তিনি উপঢৌকন দিয়েছিলেন খৃষ্টীয় সন্তগণের মূর্তি ও অন্যান্য ধর্মীয় নিদর্শন। পূর্বে দেবদেবীর মূর্তি বৌদ্ধ শ্রমণেরা বিদেশ থেকে নিয়ে আসত, ফাদার রিক্কির উপহারগুলিও সেইসব বৌদ্ধ মূর্তির মতই আগ্রহভরে গ্রহণ করা হয়েছিল।

ইংরেজ ও ওলন্দাজগণের আগমন

ম্যাথিউ রিক্কি ও অন্যান্য ক্যাথলিক পাদ্রীগণের প্রচেষ্টায় যখন ইউরোপীয়দের প্রতি চীনা বিদ্বেষ কতকটা প্রশমিত হয়ে এসেছিল, এবং তার ফলে যখন পর্তুগীজদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ সুগম হয়েছিল, সেই সময় দূরপ্রাচ্যে পর্তুগীজদের ভাগ্যাকাশে শনি-রূপে দেখা দিল দুইটি ইউরোপীয় জাতি, একটি ডাচ বা ওলন্দাজ, অপরটি ইংরেজ। ইংরেজ ও ওলন্দাজরা প্রোটেস্টাণ্ট, শুধু ক্যাথলিক পর্তুগীজদের ব্যবসায়ের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপেই তাদের আবির্ভাব নয়, তারা ছিল পর্তুগীজদের ধর্মীয় শত্রু। এরূপ ক্ষেত্রে ধূর্ত পর্তুগীজদের প্রথম কর্মই হয়েছিল ইংরেজ ও ওলন্দাজ এই প্রোটেস্টাণ্ট জাতি-দ্বয়ের বিরুদ্ধে চীনাদের বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করা, এবং এই উদ্যমের প্রথম দিকে তারা যথেষ্ট সাফল্য লাভও করেছিল। পর্তুগীজরা আগন্তুক জাতি দুটির প্রচুর নিন্দাবাদ প্রচার করতে শুরু করল, সেই নিন্দা শুনে চীনাদের এ কথা বিশ্বাস করতে বাধল না যে অতীত কালের পর্তুগীজদের মতই ইংরেজ ও ওলন্দাজেরা বোম্বেটে জাতি, এবং তাদের সেই বিশ্বাস আরও দৃঢ়ভাবে জমাট বাঁধল ওলন্দাজরা যখন চীনা উপকূল লুণ্ঠন করল, আর ইংরেজরা করল তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ। ১৬৩৭ খৃস্টাব্দে জন ওয়েড্‌ডেল নামক একজন ইংরেজ তিনটি জাহাজ সহ ক্যানটনে উপস্থিত হয়ে পর্তুগীজ ডা'গুাডার বোম্বেটেগিরির পুনরাবৃত্তি করল। চীনাদের হুঁশিয়ারি ও বাধা নিষেধ

উপেক্ষা করে পরম ঔদ্ধত্যভরে ওয়েড্‌ডেল নদীর উজান-পথে যাত্রা করল। দুর্গ থেকে চীনারা গোলাবর্ষণ করল। সংঘর্ষ বাধল। ওয়েড্‌ডেলের জাহাজী নাবিকেরা তীরে অবতরণ করল, এবং দুর্গ অধিকার করে চীনা পতাকা নামিয়ে সেখানে বৃটেনের রাজার পতাকা তুলে দিল। কিন্তু ওয়েড্‌ডেলের এইসব আগ্রাসী কাণ্ডমাণ্ডের শেষরক্ষা হল না, ক্যানটনে প্রেরিত ইংরেজদের প্রাণরক্ষার জন্য শীঘ্রই তাকে সন্ধির প্রস্তাব করতে হয়েছিল। সন্ধির একটি সর্ত ছিল এই যে ইংরেজদের চীন পরিত্যাগ করে যেতে হবে, আর সেখানে তারা ভবিষ্যতে কখনো আসতে পারবে না।

ওয়েড্‌ডেলের এই কুকীর্তি চীনাদের চক্ষে ইংরেজদের দস্যু পর্যায়ভুক্ত করেছিল পর্তুগীজ ও ডাচদেরই মত। এমন কি এই ঘটনার পূর্বেও ইংরেজ ও ওলন্দাজেরা মিলিতভাবে ফিলিপাইনগামী চীনা ব্যবসায়ীদের অর্ণব-পোতগুলি লুণ্ঠন করেছিল, ওলন্দাজদের দস্যুবৃত্তি ও হত্যাকাণ্ডের জন্য জাভার সঙ্গে চীনের ব্যবসা-সম্বন্ধ ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ১৬০২ খৃস্টাব্দে ফিলিপাইন দ্বীপে স্প্যানিয়ার্ডগণ বিশ হাজার চীনাকে ঠাণ্ডা মেজাজে হত্যা করেছিল ঘৃণ্য স্বার্থের জন্য। ১৬৩৯ খৃস্টাব্দে সেই অপরাধ পুনরায় অনুষ্ঠিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দে ওলন্দাজরা জাভায় বিরাট হত্যাকাণ্ড দ্বারা চীনাদের নির্মূল করে। প্রকৃতপক্ষে এ অঞ্চলে ইউরোপীয়দের মধ্যে এমন একটি অদ্ভুত মনোভাব দেখা দিয়েছিল যে সামুদ্রিক দস্যুবৃত্তি, বিধর্মীদের হত্যা বা বিত্ত লুণ্ঠন, এসব দুষ্কার্য তারা নীতিবিগর্হিত বলে আদৌ মনে করতে পারে নি।

এইসব উপদ্রবের জন্য জাপানে বিদেশীদের আগমন বন্ধ করা হয়েছিল। চীনও সম্ভবত সেই পন্থাই অবলম্বন করত, কিন্তু বিদেশী ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল তখন চীনের পক্ষে অত্যন্ত লাভজনক। ইউরোপীয়রা জাহাজে প্রভূত পরিমাণে রুপো নিয়ে আসত এবং তাই দিয়ে রেশম ও চা খরিদ করত। এমন লাভের বাজার উঠিয়ে দিয়ে ইউরোপীয়ানদের বহিষ্কৃত করতে চীনারা স্বভাবতই ছিল কুণ্ঠিত, তার ওপর প্রচারকার্য ও জনসেবা দ্বারা খৃস্টান পাদ্রীরা চীনাদের মন অনেকখানি প্রসন্ন করতে সমর্থ হয়েছিল। এইসব ইউরোপীয় পাদ্রীদের মধ্যে ছিল পণ্ডিত ব্যক্তি, অঙ্ক ও জ্যোতির্বিজ্ঞান, এমন কি গোলন্দাজি-বিদ্যায় পারদর্শী, চীনা পণ্ডিতমণ্ডলীর কাছে তাদের সম্মান

ছিল প্রচুর। মিং-দের জ্যোতির্গণনার সহায়তা ও বর্ষপঞ্জী সংশোধনের জন্য তাদের নিযুক্ত করা হত। এমন কি মিং-দের পতনের পরেও মাঞ্চু সম্রাট পঞ্জিকা প্রস্তুতের কাজে পাদ্রী স্কল (Schall)-কে নিযুক্ত করেছিলেন। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার মিং-রা খৃস্টান পাদ্রীদের ওপর দিয়েছিল, সৈন্যদের গোলন্দাজি শিক্ষাদানই সেই কার্য। প্রকৃতপক্ষে মিং বংশের রাজত্ব-কালের শেষভাগে চীনা রাজনীতি সাময়িকভাবে বৈদেশিকদের অনুকূল হয়ে উঠেছিল এই কারণে যে মাঞ্চুদের সঙ্গে সংগ্রামে মিং সম্রাটেরা কিয়ৎপরিমাণে পর্তুগীজদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল। ১৬৩০ খৃস্টাব্দে ম্যাকাও থেকে চার শ' পর্তুগীজ সৈন্য নিয়ে গনসলভো টেকসাইরা (Gonsolvo Texeira) মাঞ্চুদের বিরুদ্ধে মিং সম্রাটের সাহায্যার্থ পিকিং অভিমুখে যাত্রা করে, কিন্তু এই অভিযান ক্যানটনের বিরোধিতায় অর্ধপথে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

১৬৪৪ খৃস্টাব্দে পিকিং-এর পতনের পর পলাতক মিং বংশীরা দক্ষিণাঞ্চলে পর্তুগীজদের মুষ্টিমধ্যে কবলিত হয়েছিল। এই বংশের শেষ রাজার নাম কুয়েই ওয়াং। কোয়াংসি ও ইউনান থেকে তিনি মাঞ্চুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, সেই যুদ্ধে পর্তুগীজরা তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিল, পর্তুগীজ গোলন্দাজদের সাহায্যে মিং বাহিনী কিছুকাল মাঞ্চু আক্রমণ প্রতিরোধ করতে সমর্থ হয়েছিল। খৃস্টধর্মের প্রভাব নির্বাণোন্মুখ মিং বংশের এই শেষ শিখাটিকে ক্ষণেকের জন্য উজ্জ্বল করে দিয়েছিল। শেষ সম্রাজ্ঞী খৃস্ট-ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং সদ্যোজাত শিশু সন্তানটিকে 'কনস্ট্যানটাইন' নামে ব্যাপটাইজ করা হয়েছিল (১৬৪৮)। কিন্তু এই মিং বংশাবতংসের খৃস্টান ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করবার সুযোগ ঘটে নি। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তার পিতা কুয়েই ওয়াং ব্রহ্মদেশে পলায়ন করলেন (১৬৫০), আর শিশু কনস্ট্যানটাইন মাঞ্চুদের হাতে বন্দী হল। বন্দী অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

মিং-দের সাহায্য করবার জন্য পর্তুগীজ ও তাদের পাদ্রীরা স্বভাবতই বিজেতা মাঞ্চুদের বিরাগভাজন হয়েছিল, কিন্তু এই কোপদৃষ্টি কেবল পর্তুগীজদের ওপর পড়েই ক্ষান্ত হয় নি, বিশেষ কারণে ইংরেজ ও ওলন্দাজদের ওপরও পড়েছিল। চেং চেং কুং নামে জনৈক চীনা জলদস্যু-পুত্রের আবির্ভাব মাঞ্চুদের যথেষ্ট বিব্রত করে তুলেছিল। ইউরোপীয়ানরা এই ব্যক্তির নাম দিয়েছিল 'কক্সিংগা' (Koxinga)। মাঞ্চুরা তার পিতা ও ভ্রাতৃদ্বয়কে হত্যা

করেছিল, সেজন্য প্রতিহিংসা গ্রহণের উদ্দেশ্যেই হোক অথবা বিদেশী মাঞ্চুদের কবল থেকে দেশ উদ্ধারের অভিপ্রায়েই হোক, ককসিংগা মাঝে মাঝে ফুকিয়েন ও চেকিয়েং-এর উপকূলভূমি অধিকার করে বসত। ফরমোসা দ্বীপ অধিকার করে সেখান থেকে ওলন্দাজদের সে বিতাড়িত করেছিল। চীনের সমুদ্রতটে মাঞ্চু সাম্রাজ্যে উপদ্রব সৃষ্টি করতে ইংরাজেরা তাকে সাহায্য করত কামান, গোলা, বারুদ প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ করে। ইংরাজদের প্রতি মাঞ্চু শাসকদের বিরক্তির কারণ প্রথম দেখতে পাই আমরা এইখানে। অবশ্য সুদীর্ঘ আড়াই শত বৎসরের মাঞ্চু শাসনে এই বিদ্বেষ আরও নানান কারণে শাখা-পল্লবিত হয়েছিল। ১৬৬২ খৃস্টাব্দে ককসিংগার মৃত্যু হয়, কিন্তু তার পুত্রের সঙ্গে মাঞ্চুদের সংগ্রাম চলেছিল ১৬৮৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত। সেই বছর ককসিংগার পুত্র মাঞ্চুদের কাছে আত্মসমর্পণ করে।

এদিকে ওলন্দাজেরা একটি অত্যন্ত গর্হিত অপকর্ম করে সমগ্র ইউরোপীয় জাতিকে চীনাদের চক্ষে ঘৃণিত করে তুলেছিল। ১৬৬১ অব্দে চিকিয়াং উপকূলের নিকটবর্তী পু তো দ্বীপে হানা দিয়ে ওলন্দাজরা সেখানকার বৌদ্ধ মন্দিরটি লুণ্ঠন ও দগ্ধ করে, বৌদ্ধ মূর্তিগুলি ধ্বংস করে এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের ওপর বর্বরোচিত নির্যাতন করে। এই পবিত্র দ্বীপটিতে কোন সংসারী ব্যক্তির বসবাস ছিল না, ছিল শুধু বৌদ্ধ মঠ ও সন্ন্যাসীর দল। একমাত্র মঠের বিত্ত লুণ্ঠন ছাড়া এই দ্বীপটিকে আক্রমণের অন্য কোন উদ্দেশ্যই থাকতে পারে না।

উপরোক্ত নানান কারণে মাঞ্চু শাসকেরা ও চীনা প্রজারা ইউরোপীয়ানদের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল। মাঞ্চুরা সমুদ্র উপকূলে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া মাত্রই ক্যানটন ভিন্ন অন্য সব বন্দরেই তাদের ব্যবসায় নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। বিদেশীদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করবার আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল। চীনারা বিজেতা মাঞ্চুদের প্রীতির চক্ষে দেখত না, পাছে বিদেশীদের পরামর্শে গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়ে উপদ্রবের সৃষ্টি করে, এইরূপ আশঙ্কা করে মাঞ্চুরা চীনাদের সঙ্গে বিদেশীর সংস্রব যথাসম্ভব সীমিত করে রাখবার চেষ্টা করেছিল। মাঞ্চুদের এই আশঙ্কা যে নিতান্ত অমূলক নয়, আমরা তা 'তাই পিং' বিদ্রোহের সময় দেখতে পাব।

কিন্তু ইউরোপীয়দের সঙ্গে সংঘর্ষ যেমনই অপ্রীতিকর হোক না কেন, তাদের আগমনের পরিণাম চীনাদের পক্ষে অবিমিশ্র অশুভ হয় নি। আধুনিক

ভারতবর্ষের মত আধুনিক চীনের উদ্ভব হয়েছে ইউরোপীয় সংঘর্ষের ফলে, রাজনীতি-ক্ষেত্রে চীনের এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কথা আলোচনা না করেও বলা প্রয়োজন যে পুরনো মিং যুগেও ইউরোপীয়দের আমদানি-করা ব্যবহারিক জিনিসপত্র ও কৃষিদ্রব্য চীন দেশে সাদরে গৃহীত হয়েছিল। এই যুগে সেখানে চশমার আমদানি হয় ইতালী থেকে। অবশ্য ইতিপূর্বেই সপ্তম শতাব্দের গ্রীক বণিকেরা ক্ষীণদৃষ্টি চক্ষে ব্যবহারের জন্য একপ্রকার ঘষা কাঁচ (optical lenses) নিয়ে এসেছিল। কৃষিদ্রব্যের মধ্যে নূতন আমদানি ছিল ভুট্টা, মিষ্টি আলু, কড়াইশুটি, তুলা, তামাক। ব্যাপকভাবে তুলার চাষ মিং যুগের পূর্বে কখনো হয় নি। তুলার চাষ করতে চীনাদের ছিল দস্তুরমত অনিচ্ছা, 'ব্যক্তি-কর' (poll tax) রেহাই দিয়ে তাদের তুলা জন্মাতে উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল। ভুট্টা আমেরিকা থেকে আমদানি করা হয়েছিল, ১৫৯৩ খৃস্টাব্দে একজন চীনা লেখক এই শস্যের প্রথম উল্লেখ করেন। তামাক এসেছিল ম্যানিলা থেকে সপ্তদশ শতাব্দে। পাশ্চাত্য জগতের আর একটি বিশেষ অবদান 'সিফিলিস' নামক ব্যাধি। ভাস্কো দা গামা তার প্রথম জাহাজে এই দুষ্ট ব্যাধির বীজ ভারতে নিয়ে এসেছিলেন।

৩. মিং যুগে ধর্ম ও দর্শন

তিন শতাব্দ মিং শাসন-কালে সাহিত্য-ক্ষেত্রে নাটক ও উপন্যাস রচনায় সার্থক উদ্যম-প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পূর্ববর্তী সুং বা ট্যাং যুগের মত এ যুগের ধর্ম ও দর্শন বিশেষ কোন নূতন আলোর সন্ধান নিয়ে উপস্থিত হয় নি। বৌদ্ধ ও তাও-ধর্ম গতানুগতিক পথ ধরে চলেছিল অনেকটা যান্ত্রিক পদ্ধতিমত, সে ধর্মে কোন প্রাণের স্পন্দন ছিল না। সম্রাটেরা আবার 'সঞ্জীবনী সুধা'র সন্ধানে তাও-ইন্দ্রজালের মন্ত্রতন্ত্র প্রভৃতি কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিতে শুরু করেছিলেন সুদূর অতীতের চি'ন ও হ্যান বংশীদের অনুকরণে, দর্শন বিষয়ে কিন্তু কনফুসীয় আদর্শকে বিন্দুমাত্র খর্ব করা হয় নি, সেই নীতিধর্মের গৌরব ছিল পূর্ববৎ অক্ষুণ্ণ। মিং যুগে সরকারী চাকরি পুনঃপ্রবর্তনের কথা পূর্বে বলা হয়েছে, পরীক্ষোত্তীর্ণ শাসক-কর্মচারীরা ছিলেন কনফুসীয় ধারায় শিক্ষিত, চু সি-র নব ভাষ্যই ছিল সরকারী নীতি-দর্শন। এই সুং দার্শনিকের প্রতি

শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন মিং যুগীয় জনৈক প্রাজ্ঞ ব্যক্তি এই কথা বলে: "দার্শনিক চু-র কাল থেকে জগতে সত্যের যথার্থ স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে। আর লিখনের প্রয়োজন নেই, এখন কর্মানুষ্ঠানের সময়।" দর্শন-তত্ত্বের গবেষণার চেয়ে এ যুগে কর্মযোগই অধিকতর প্রাধান্য লাভ করেছিল, এই উক্তিটি থেকে সে কথা বেশ বোঝা যায়।

দর্শন-চর্চার চেয়ে করিত-কর্মের দিকেই মিং-দের ঝোঁক ছিল বেশি, সে যুগে অনুষ্ঠিত কাজগুলির তালিকা থেকেই তা সপ্রমাণ হয়। খাল খনন, নগর-প্রাচীর, রাজপথ, সেতু, ধর্মমন্দির, স্তূপ ও স্মৃতিসৌধ প্রভৃতি অনেক কার্য এই যুগে সম্পন্ন হয়েছিল। ১৩৯৪ খৃস্টাব্দের একটি সরকারী বিবরণে দেখা যায় মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে ৪০৯৮৭টি পূর্ত পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা হয়েছিল। এখানে একটি প্রশ্ন স্বভাবত মনে জাগে: ট্যাং ও সুং যুগে বৃহৎ কর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে ধর্ম ও দর্শন-চিন্তার গতি ছিল অব্যাহত, কর্মের সঙ্গে চিন্তা সমান ধাপেই এগিয়ে চলেছিল, কিন্তু এ যুগে অকস্মাৎ চীনের সেই শাশ্বত নিয়মটিকে ভঙ্গ করে অর্থাৎ মৌলিক চিন্তা, গবেষণা বাদ দিয়ে কর্ম এমন প্রাধান্য লাভ করল কিরূপে? এই প্রশ্নের উত্তর আমরা অনুমান করতে পারি মাত্র। বহির্দেশ থেকে নূতন কোন ভাবের জোয়ার এসে দেশকে প্লাবিত করে নি, যেমন করেছিল বৌদ্ধধর্মের আগমন। মোঙ্গল বিতাড়নের পর দেশের কষ্টার্জিত স্বাধীনতার ফলশ্রুতিরূপেই বিবিধ কর্মোদ্যম দেখা দিয়েছিল, আর সেই সঙ্গে জেগেছিল উগ্র জাতীয়তাবোধ যা চীনের প্রাচীন সংস্কৃতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের জন্য পরম উদ্যোগী হয়ে উঠেছিল। এই রক্ষণশীল মনোভাব নূতন চিন্তার পথ রোধ করে কনফুসীয় নীতিকে সর্বকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত করবার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল।

ওয়াং ইয়াং মিং

কিন্তু বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও দর্শন-চিন্তা চীনা জাতিকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে নি। দর্শন ও সাহিত্য-চর্চার সমিতির অভাব ছিল না, সেখানে আলাপ-আলোচনা চলত, রাজনীতি প্রসঙ্গও বাদ যেত না। মিং যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ছিলেন ওয়াং ইয়াং মিং (১৪৭২-১৫২৮), তাঁর দর্শনে মৌলিকতার নিদর্শন আছে যদিও নিজেকে তিনি চু' সি-র মতই একজন

কনফুসীয় নীতিধর্মের ভাষ্যকার বলে অভিহিত করতেন। তিনি ছিলেন পণ্ডিতবংশের মানুষ। কথিত আছে, বারো বছর বয়সে শিক্ষককে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, জীবনে সবচেয়ে শ্রেয় বস্তু কি? শিক্ষক বলেন, চিন-সি বা 'ডক্টর' হবার উদ্দেশ্যে অধ্যয়নই শ্রেয়। তখন বালক বলে উঠল, না, ডক্টর হবার জন্য নয়, জ্ঞানার্জন করে প্রাজ্ঞ হবার জন্যই অধ্যয়ন শ্রেয। বিস্ময়ের বিষয় এই যে এ-হেন মেধাবী ব্যক্তিও চিন-সি পরীক্ষায় দুবার অকৃতকার্য হয়েছিলেন। তারপর চাকরি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি রাজকর্মে নিযুক্ত হন এবং জীবনের অধিকাংশ কাল নানান কর্মানুষ্ঠানে অতিবাহিত করেছিলেন, উচ্চ পদও লাভ কবেছিলেন। কিন্তু তাঁর অন্তরে ছিল গভীর জ্ঞান-পিপাসা, বৌদ্ধ মহাযান-তত্ত্ব সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেও তিনি শুধু চবিত চর্বণে তৃপ্ত হন নি। দর্শন-ক্ষেত্রে তিনি প্রখ্যাত স্থং দার্শনিক চু' সি-র বিরুদ্ধবাদী হয়ে উঠলেন, চু' সি প্রচাবিত 'বস্তু সন্ধান-তত্ত্ব'র মতবাদ খণ্ডন কবলেন, এবং প্রচলিত প্রথামত প্রাচীন গ্রন্থের বোধশূন্য আবৃত্তির ব্যর্থতা প্রতিপাদন করলেন। বিবিক্ত স্থানে নিরালায় বসে গভীব চিন্তাব দ্বারা আত্মসন্ধানকে তিনি 'বস্তু সন্ধান' বা গ্রন্থ অধ্যয়ন অপেক্ষা শ্রেয় বলেই মনে কবতেন। ওয়াং-এব অন্তরে এই উপলব্ধিটি জেগে উঠেছিল নিবাসনকালে যখন তিনি সর্পসংকুল পার্বত্য বনভূমিতে বর্ববদের মধ্যে বাস করছিলেন। বর্বব ছাডাও সেখানে পলাতক অপরাধীর দল সমবেত হত, সকলেই তারা ওয়াং-এর শিষ্য হয়েছিল, তিনি তাদের দর্শন-তত্ত্বের উপদেশ দিতেন আর গান শোনাতেন। একদিন গভীর নিশীথে শয্যা ত্যাগ করে লাফিয়ে উঠলেন তিনি, আবেগকম্পিত কণ্ঠে বললেন, "কি আশ্চয! তত্ত্বজ্ঞানের জন্য বহির্জগতের পানে চেয়ে আমি ভুল করেছি। আমার অন্তঃপ্রকৃতিই যে যথেষ্ট!" বিস্মিত শ্রোতাদের কাছে নবলব্ধ জ্ঞান তিনি বিশদভাবে বুঝিয়ে দিলেন: "মানব-চিত্তই সকল জ্ঞানের রত্নাকব, চিত্তবৃত্তি প্রাকৃতিক নিয়মেব প্রতিরূপ। চিত্তেব বহির্ভাগে সাবা বিশ্ব-মধ্যে কোন বস্তুর বা প্রাকৃতিক নিয়মের স্বাধীন সত্তা কোথায়?" তিনি বলেন, "কর্মের গোড়ায় থাকে জ্ঞান, কর্ম জ্ঞানেব পরিপূরক। যেখানে কর্ম নেই, জ্ঞান সেখানে নিষ্ফল, আবার জ্ঞানহীনের কোন কর্মই কর্ম নয়।" জ্ঞানের পূজারী কর্মযোগী ওয়াং অবশ্য ঈশ্বরকে অস্বীকার করেন নি, ঈশ্বরকে তিনি সর্বগত নৈতিক শক্তিরূপে বর্ণনা করেছেন। ওয়াং ইয়াং মিং

অনেক গ্রন্থ লিখেছেন, রচনা অধিকাংশই পদ্যে। কনফুসিয়াস সম্বন্ধে তিনি বলেছেন :

কু' প্রভু (কনফুসিযাস) অধিষ্ঠিত সবার অন্তরে,
সারা ঠাঁই লোকে তারে খুঁজে মরে।
সন্ধান না পায,
দেখে না সে যথার্থ উপায,
হলে আত্ম-জ্ঞান মানসে উদয
কুং প্রভু দেখা দেন ধ্রুব সুনিশ্চয।

কনফুসিযাস নীতিধর্মের প্রতীক। নীতিধর্ম কল্যাণময বিশ্ব-প্রকৃতির স্বরূপ। "প্রকৃতি কল্যাণময" এই সিদ্ধান্তটিতে দার্শনিক ওযাং তাঁর প্রতিপক্ষ চু' সি-র বাণীর প্রতিধ্বনি করেছেন মাত্র। কিন্তু যখন তাকে বলা হল পৃথিবীতে মন্দ জিনিসের অভাব নেই, ক্রূর সর্পও প্রকৃতিরই সন্তান, তিনি তখন ভাল-মন্দর বাস্তব অস্তিত্ব অস্বীকার করলেন, বললেন, "প্রকৃতি ভাল-মন্দর ঊর্ধ্বে, মানুষের মনই ভাল-মন্দ সৃষ্টি করে।" বস্তুত ওযাং-এর আত্মদর্শন-তত্ত্বের সঙ্গে তাও-তত্ত্ব ও বৌদ্ধ চ্যাং-এর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে, যদিও তিনি তাও-পন্থী বা বৌদ্ধ ছিলেন না। চীনের সর্বশেষ শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের মধ্যে তিনি অন্যতম, তাঁর দর্শন-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল চীনে নয, জাপানে।

জযজযকার হযেছিল চু' সি-র, তাকে কনফুসিযাসের সমান সম্মান দান করা হয়েছিল। চু' সি-র ভাষ্য প্রাক-বিপ্লব সাত শ' বছর ধরে কনফুসিয়ানদের জপ-মন্ত্র হয়ে উঠেছিল। এ কথা সত্য, মানব-প্রকৃতি, সমাজ ও রাষ্ট্র বিষযে কনফুসীয বিদগ্ধমণ্ডলীর তত্ত্বোপলব্ধি ঘটেছিল যথেষ্ট, কিন্তু সেই সঙ্গে একটা উৎকট আত্মাভিমান তাঁদের অন্তরকে সমাচ্ছন্ন করে রেখেছিল। যে নীতিধর্মের সাক্ষাৎলাভ করেছেন তারা সেই নীতি অভ্রান্ত, যে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয ব্যবস্থা রযেছে সেই নীতিধর্মে সেসব বিধি-বিধান সনাতন ও সর্বজনীন, কোন কালে কোন অবস্থায় সেগুলির পরিবর্তন নেই, এই ছিল তাঁদের বিশ্বাস। কিন্তু যুগে যুগে অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, কবির ভাষায় বলতে গেলে কত সাগর শুখিয়ে গেছে, কত মরুভূমি পাহাড হযেছে, এমন সব বিপর্যয কাণ্ড ঘটা সত্ত্বেও যখন কনফুসীয আচার-বিচার, সমাজ ও রাষ্ট্রনীতির

কিছুমাত্র পরিবর্তন বা সংস্কার করা হল না তখনই অতীতের সেই পুঞ্জীভূত আবর্জনারাশিকে স্থূল হস্তেব সম্মার্জনী দিযে ঝেঁটিযে সাফ করবার জন্য বিপ্লবের প্রয়োজন দেখা দিযেছিল।

৪. মিং যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য

সাহিত্য-ক্ষেত্রে মিং যুগ অসাধারণ প্রতিভার পরিচয তেমন দেয নি সত্য, কিন্তু গ্রন্থ রচনার পরিমাণ ছিল প্রভূত এবং সেগুলি সবই কিছু নিকৃষ্ট শ্রেণীর ছিল না। সম্রাট ইযাং লো র সুবৃহৎ গ্রন্থাগারের কথা পূর্বে বলা হযেছে, সেখানে ছিল একটি বিশ্বকোষ, ২১৮০ জন পণ্ডিতের সমবেত উদ্যোগ ও পরিশ্রমে বিশ্বকোষটি রচিত হযেছিল (১৪০৭)। ইতিহাস, নীতিতত্ত্ব, বিজ্ঞান, ব্যবহারিক ও কলা-শিল্প, ভূগোল, প্রশাসন, ধর্ম, জ্যোতিষ প্রভৃতি সকল বিষযেব ১১০৯৫ হস্তলিখিত গ্রন্থের সমষ্টি, চীনেব যাবতীয জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধাব এই বিশ্বকোষ, চীনা নাম ইযাং লো তা তিযেন। কিন্তু এই বিরাট গ্রন্থ-সংগ্রহের একটি কুফল হযেছিল এই যে জাতির দৃষ্টি অতীতেব মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল, তাই প্রগতির পথটি তার চোখেও পড়ে নি।

এই সমযে একটি নূতন বিদ্যার সূচনা দেখা গিযেছিল, এই বিদ্যা ভাষাতত্ত্ব (Philology)। এই বিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন চে'ন তি, তিনি প্রাচীন 'পদ্য গ্রন্থে'র (Odes) শব্দগুলির মৌলিক উচ্চারণ সম্বন্ধে গবেষণায প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।*

গ্রন্থ-মুদ্রণ তখন বহুপ্রচলিত, সেজন্য সস্তা দরে বই বিক্রি এবং বই-এব বহুল প্রচাব সম্ভব হযেছিল। কাঠের ব্লক ও টাইপ দুই প্রকারে ছাপা হত। 'প্রাচীন গ্রন্থ'গুলি ছাপাবার একচেটিযা অধিকার ছিল সরকারী প্রেসের, এবং অনেক ক্ষেত্রে বইগুলি বিদ্যালযসমূহে বিতরিত হত। অন্যান্য বহু গ্রন্থ

---

* 'The classical language, perhaps the literary form of the spoken language of the Feudal Age (1000-200 B C) is so different from every dialect that a scholar could not understand a passage spoken aloud if he was unfamiliar with the Text The original pronunciation of the classical words is now forgotten ' (*China* by C. P Fitzgerald—p 490)

মালিকী ছাপাখানায় মুদ্রিত হত। এইসব গ্রন্থের মধ্যে ভূগোল, সংগীত-বিদ্যা ও উদ্ভিদ-বিদ্যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দুর্গম গিরি, কান্তার, অরণ্যভূমি পরিভ্রমণ করে স্যু লুং স্যু (১৫৮৫-১৬৪৩) অনেক ভৌগোলিক তথ্য আবিষ্কার করেছিলেন। দক্ষিণাঞ্চলের বিস্তৃত ভূখণ্ডে চার বৎসর পর্যটন করে তিনি সি ও ইয়াং সি নদীর উৎপত্তি-স্থান নির্ণয় এবং মিকং ও সালউইন নদী সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সংগীতের একখানি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন চু সাই ইউ (১৫৮৪), আর একখানি পাণ্ডিত্যপূর্ণ উদ্ভিদ-বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থ লিখেছিলেন একজন খৃস্টান চীনা, তাঁর নাম স্যু কুয়াং চি। চিকিৎসা-বিদ্যা সম্বন্ধেও একখানা বৃহৎ পুস্তক লিখিত হয়েছিল, গ্রন্থের নাম "পেন সা'ও কা'ং মু", গ্রন্থকার লি সি চেন। এই পুস্তকে ৮১৬০টি ব্যবস্থা-পত্র, বসন্তের টিকা, সিফিলিসের চিকিৎসার বিধান এবং কেওলিন, চালমুগরা তেল, আইওডিন প্রভৃতি ঔষধের উল্লেখ রয়েছে। এসব ছাড়াও নানান ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ, স্থানীয় প্রশাসনিক বৃত্তান্ত (gazetteers), জীবন-চরিত, সামরিক শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থও রচিত হয়েছিল।

মিং যুগের সাহিত্যে পদ্য রচনার আধিক্য না থাকলেও অভাব ছিল না। লি তুং ইয়াং নামে জনৈক কবি জনসমাজে যথেষ্ট যশও অর্জন করতে পেরেছিলেন, কিন্তু ট্যাং যুগের প্রতিভাবান কবিগণ সাহিত্যের মহোৎসবে যে রসভাণ্ডার মুক্ত করে দিয়ে গেছেন তার তুলনা মিং কবিতায় একেবারেই পাওয়া যায় না। সেই কাব্যরসামৃতের অভাব মিং-রা পূরণ করেছিল উৎকৃষ্ট নাটক ও উপন্যাস রচনা করে, এমন চমৎকার অভিনয় গ্রন্থ ও রম্য উপকথা পূর্বে কখনো রচিত হয় নি। আমরা এখানে চীনা নাটক ও উপন্যাসের উদ্ভব ও প্রগতি বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

নাটকের বিবর্তন কাহিনী

চীন দেশে অভিনয় কিছু নূতন জিনিস নয়, প্রাচীন কালে পিতৃকৃত্যের অনুষ্ঠানে মৃত ব্যক্তির জীবন-ইতিহাসের আবৃত্তি রঙ্গমঞ্চের পথ বেঁধে দিয়েছিল। মৃত ব্যক্তির ভূমিকায় বংশের কোন বালক অবতীর্ণ হত, পরিবারবর্গের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নৈবেদ্য সে-ই গ্রহণ করত। ইতিপূর্বে আমরা 'উ' নামে একটি ঐন্দ্রজালিক দৈবজ্ঞ সম্প্রদায়ের কথা বলেছি, দেবমন্দিরে তাদের নৃত্য ও

গীতবাদ্যের মধ্যে গীতাভিনয়ের অঙ্কুর নিহিত ছিল, অনেকে এরূপ অনুমানও করেন। সে যা-ই হোক, হ্যান যুগ থেকে ট্যাং যুগ পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ কাল ধরে আমরা দেখতে পাই ঐতিহাসিক বৃত্তান্তগুলির নৃত্যগীতে অভিনয়। সুই বংশের পতন-কাহিনী অবলম্বনে 'পো চেন' বা 'সৈন্য-ব্যূহ ভেদ' ("Breaking of the Battle Line") নামে একটি গীতিনাট্য রচিত হয়েছিল, রচয়িতা ছিলেন রাজ দরবারের গায়ক লু সা'ই। এই গীতিনাট্য মহাসমারোহে অভিনীত হয়েছিল, ১২৮ জন বালক রৌপ্যনির্মিত ঝকঝকে বর্ম পরে বর্শা হাতে নিয়ে নৃত্যগীতে অংশ গ্রহণ করেছিল। ট্যাং দরবারে অভিনয়ের আদর ছিল যথেষ্ট, প্রাসাদের রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দর্শন করে রাজ-পরিবার বিলক্ষণ আনন্দ লাভ করতেন। সম্রাট তা'ই সুং-এর পুত্র স্বরচিত নাটকের অভিনয়ে বিশেষ একটি ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় প্রথমে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ট্যাং যুগে। এই যুগের সম্রাট মিং হুয়াং (৭১২-৭৫৬ খৃঃ) ছিলেন একজন যথার্থ নাট্যামোদী, অভিনেতৃবৃন্দের পৃষ্ঠপোষক, প্রথম নাট্য-সমাজের প্রতিষ্ঠাতা-রূপে চিরস্মরণীয়। এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়েছিল প্রাসাদ-প্রান্তের একটি পিয়ার-বাগানে, সেজন্য নাট্যসমাজের নাম হয়েছিল 'পিয়ার-বাগান'। চীনের অভিনেতারা আজও এই নামের স্মৃতি বহন করেন, তাঁদের বলা হয় 'পিয়ার-বাগানের সন্তান' ("Sons of the Pear Garden")।

ট্যাং যুগের নাটকগুলি ছিল ক্ষুদ্র, সুং যুগেও নাটকের আকৃতির বা প্রকৃতির পরিবর্তন বিশেষ কিছু হয় নি। নাট্যরূপের বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটেছিল মোঙ্গলদের রাজত্বকালে। চীনাদের তুলনায় মোঙ্গলরা ছিল বর্বর, রক্তের নদী প্রবাহিত হয়েছিল তাদের শাসন-সময়ে, কিন্তু এসব সত্ত্বেও যখন আমরা দেখি যে রঙ্গমঞ্চে অভিনয়-শিল্পের অসামান্য উৎকর্ষ ঘটেছিল মোঙ্গলদের শাসন-কালেই তখন আর আমাদের বিস্ময়ের অবধি থাকে না। নাট্যামোদীর সূক্ষ্ম মার্জিত রুচি মোঙ্গলদের ছিল না, নাট্যকার ও অভিনেতাদের পৃষ্ঠপোষকও তারা ছিল না। এরূপ অবস্থায় চীনা রঙ্গমঞ্চের অভূতপূর্ব উন্নতি দেখে অনেকে মনে করেন, মোঙ্গল রাজত্বকালে যেসব ইউরোপীয় ও এশিয়াবাসী বিদেশীরা চীনে এসে ব্যবসা করেছেন বা রাজকর্মে যোগ দিয়েছিলেন, এই সময়কার নূতন ভাবধারার জন্য চীনের নাটক তাঁদের কাছে

ঋণী। কিন্তু বিদেশী ভাবধারা চীনা নাটককে প্রভাবিত করেছিল, ব্যাপারটা অসম্ভব না হলেও এ যুক্তির কোন বিচারসহ প্রমাণ নেই। সত্য বটে এ সময়ে ইউরোপে নাট্যকলা অপরূপ শোভায় বিকশিত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু প্রতীচ্যের সঙ্গে চীনা নাট্য-শিল্পের কোন সাদৃশ্যই দেখা যায় না। মোঙ্গলরা ছিল বিদেশী, চীনের নাট্য-শিল্পের প্রতি কোন অনুরাগই তাদের ছিল না। রাজকার্যে যেসব বিদেশী নিযুক্ত হয়েছিল, তারা চীনা ভাষা জানত না (মার্কো পোলোও জানতেন না), সকল রকম রাজকার্যে মোঙ্গল ভাষা ব্যবহৃত হত। তার ওপর যখন দেখা যায় মোঙ্গল যুগেব নব্বই জন নাট্যকারের মধ্যে এক জন মাত্র ছিল মোঙ্গল আর বাকি সকলেই চীনা এবং নাটকের বিষয়বস্তু চীনাদের সামাজিক জীবন বা ইতিহাস নিয়েই গঠিত হয়েছিল, যার ওপর পাশ্চাত্ত্য রীতিনীতি কিছুমাত্র রেখাপাত করে নি, তখন বোধ করি এই সিদ্ধান্তই যুক্তিসংগত যে চীন দেশে নাটকের ক্রমবিকাশ হয়েছিল পারম্পর্যের স্বাভাবিক নিয়মে, বস্তুত বৈদেশিক অবদান এখানে না থাকবারই কথা।

মোঙ্গলদের আমলে নাট্যরূপেব এমন চমৎকার বিকাশের কারণ সহজেই অনুমান করা চলে। চীন দেশে পদ্য ও চিত্রকলার গৌরব ছিল অসাধারণ, কিন্তু একটি বিশেষ কারণে নাটক ছিল সুধীগণের কাছে ঘৃণা ও অবজ্ঞার বস্তু। রঙ্গমঞ্চে কথ্যভাষার ব্যবহার প্রয়োজন, কেননা পণ্ডিতের ভাষা সাধারণের পক্ষে একান্ত দুর্বোধ্য, আর কথ্যভাষায় রচনা পণ্ডিতেরা অপাঙ্‌ক্তেয় জ্ঞানে বর্জন করতেন। পণ্ডিতশ্রেণীর ব্যক্তিরা চাকরি পরীক্ষার জন্য বিদ্যা অর্জন করতেন, রাজকার্যে রত থাকতেন, আর আলোচনা করতেন কনফুসীয় নীতিধর্ম। মোঙ্গলরা চাকরি পরীক্ষা বন্ধ করে দিয়েছিল এবং রাজকার্যে বিদেশীদের নিযুক্ত করেছিল। কথ্য ও পণ্ডিতী উভয় ভাষার প্রতি শাসক সম্প্রদায় ছিল সমানে উদাসীন। এরূপ ক্ষেত্রে যেসব পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তি সাধারণের বোধগম্য কথ্যভাষার রচনাকে ঘৃণা করতেন, দুর্দশাগ্রস্ত বেকার অবস্থায় তাঁদের মতিগতির পরিবর্তন স্বাভাবিক। তাঁরাই এখন নূতন প্রকার সাহিত্য সৃষ্টির দিকে মন দিলেন। রাজানুগ্রহ আর নেই, জনপ্রিয়তাই তখন তাঁদের একমাত্র সম্বল হয়ে উঠেছিল, তাই তাঁরা কথ্যভাষায় নাটক ও উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হলেন। চীনের সুদীর্ঘ ইতিহাসে জনসাধারণের সঙ্গে

পণ্ডিতকুলের সেই যে প্রথম সংযোগ ঘটেছিল সাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চের মাধ্যমে, সে একটা অঘটন ব্যাপার, এক রকম বৈপ্লবিক কাণ্ডও বলা চলে। মিং যুগে চীনা জাতীয়তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল বটে, কিন্তু পণ্ডিতেরা আর জনগণের সংসর্গবর্জিত পূর্বকার সেই হস্তি-দন্তের প্রাসাদ-চূড়ায় প্রত্যাবর্তন করতে সক্ষম হন নি। তার কারণ, মিং সম্রাটেরা ছিলেন নীচ কুলোদ্ভব, তাঁদের দরবারে আভিজাত্য-গৌরবের পুনর্জাগরণ অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।

'ইউয়ান যুগের শতাবধি নাটক' ("One Hundred Plays of the Yuan Dynasty") প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, সেগুলির প্লটের তো কথাই নেই, সংলাপের প্রতিটি বাক্যের সঙ্গে চীনা জনগণের পরিচয় আছে আজও, কিন্তু আশ্চর্য এই যে নাট্যকারদের বিষয়ে কোন তথ্য, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের নাম পর্যন্ত জানা নেই। আসলে 'সাহিত্যে'র পর্যায়ে চীনা নাটক কখনো উন্নীত হয় নি, নাট্যকার বা ঔপন্যাসিক কোনদিনই পণ্ডিতের, কবির বা চিত্রশিল্পীর খ্যাতি লাভ করেন নি। তাঁরা থাকতেন অখ্যাতনামা, ইউয়ান যুগে নাট্যকারদের একটি তালিকা প্রস্তুত হয়েছিল বটে, কিন্তু তাঁদের জীবন-কাহিনীর ওপর এতটুকুও রশ্মিপাত করা হয় নি। ইউয়ান ও মিং যুগে ইতিহাস, সমালোচনা-সাহিত্য ও ভাষ্য রচনার অভাব ছিল না, কিন্তু নাটক ও উপন্যাসের প্রতি সুধীজনের পরম অশ্রদ্ধা ছিল বলে তাঁদের রচনাবলীর মধ্যে তাঁরা ঐ দুইটি বিষয়ের উল্লেখমাত্র করেন নি। নাটকের প্রতি পাণ্ডিত্যাভিমানীদের এই অশ্রদ্ধা নাট্যজগতের যুগপৎ লাভ ও ক্ষতির কারণ হয়েছিল। ক্ষতি এইজন্য যে রচয়িতারা ছিল নিকৃষ্ট শ্রেণীর লেখক অথবা অবসর-বিনোদনার্থী পণ্ডিত, গুণের বিচারে তাদের নাটক কালিদাস বা সেক্স্‌পিয়ারের রচনাবলীর সঙ্গে একেবারেই তুলনীয় নয়। কিন্তু সাহিত্য হিসাবে চীনা নাটক তেমন উৎকৃষ্ট শ্রেণীর না হলেও সেইসব নাটক ছিল প্রাচীন পণ্ডিতী ভাষার বন্ধনমুক্ত প্রকৃত গণ-সাহিত্য, এবং চীনা ভাষায় এই নূতন গণ-সাহিত্যের সৃষ্টি একটি পরম লাভের বিষয় হয়ে উঠেছিল। কেননা এই গণ-সাহিত্যের জন্যেই অসাধারণ অভিনয়-প্রতিভার বিকাশ সম্ভব হয়েছিল, আর রঙ্গমঞ্চ যে আজও জনপ্রিয় ও জীবন্ত, সেদিনকার সেই গণ-সাহিত্যের উদ্ভবই তার কারণ।

চীনা নাটক পদ্যে রচিত এবং তার কিয়দংশ গীতাভিনয়, সেজন্য 'নাটকে'র

নাম 'অপেরা' বা 'গীতিনাট্য' হওয়াই সংগত। ইউয়ান যুগে চার অঙ্ক নাটকের প্রচলন ছিল, মূল চরিত্রও ছিল মাত্র চারটি। চরিত্রগুলি সবই বাঁধা-ধরা গোছের, যেমন সম্রাট, সেনাপতি, উচ্চ বংশীয়া নায়িকা বা সরলা পল্লীবালা, আর একজন গণিকা বা ক্রীতদাসী যাকে কেন্দ্র করে নাটকে ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হত। এক একটি অঙ্কে এক একজন নায়ক স্বতন্ত্রভাবে গান গাইত। মিং যুগের নাটকে অঙ্কের সংখ্যা বর্ধিত হয়েছিল। নৃত্যের তাণ্ডব ছিল অভিনয়ের একটি বিশেষ অঙ্গ, সেজন্য অভিনেতার নানাবিধ অদ্ভুত কসরত শিক্ষার প্রয়োজন হত। রঙ্গমঞ্চ ও অভিনেতৃবর্গের সাজসজ্জাই পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের অভাব প্রতিপন্ন করে। রঙ্গমঞ্চের তিন দিক মুক্ত, কোন 'ড্রপ সিন' বা যবনিকা নেই, দৃশ্যপটও নেই। অঙ্কের সমাপ্তির সঙ্গে বাজনা বেজে ওঠে। রঙ্গমঞ্চের যেমন কোন সজ্জা নেই, অভিনেতাদের সাজে ও বেশভূষায় তেমনি অতিরিক্ত জাঁকজমক দেখা যায়। শুধু জাঁকজমক নয়, সাজের বৈশিষ্ট্যগুণে অভিনীত ভূমিকার চরিত্রও প্রকাশ পায়। দুর্বৃত্ত, বিশ্বাসঘাতক ও অত্যাচারী ব্যক্তির ভূমিকায় অবতীর্ণ অভিনেতার মুখে পুরু সাদা রং মাখানো হত, যোদ্ধার মুখ লাল ও হলদে রং মাখিয়ে ভয়ংকর করে তোলা হত। অভিনয়ের কয়েকটি নিয়ম-পদ্ধতি দর্শককে অবস্থাবিশেষের তাৎপর্য বুঝিয়ে দিত, যেমন চাবুক হাতে অভিনেতার প্রবেশ দেখে বুঝতে হবে সে অশ্বারোহী, একটি পা তোলার অর্থ অবতরণ। কৃষ্ণবর্ণ পোশাক পরিহিত ব্যক্তি অন্যের অদৃশ্য, আর ঘোড়ার চুল নিয়ে অতিপ্রাকৃত ভৌতিক জীবগণের আবির্ভাব হয়।

কনফুসীয় নীতি স্ত্রী-পুরুষের মিলিত অভিনয়কে রুচিবিগর্হিত মনে করে, সেজন্য নারীর ভূমিকা পুরুষকেই গ্রহণ করতে হত। এই নারী-বেশী অভিনেতাদের অভিনয়-কৌশল একপ্রকার আর্টে পরিণত হয়েছিল, সেই আর্ট ভ্রান্তির ইন্দ্রজাল। আজ চীন দেশে নারীর রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব নিষিদ্ধ নয়, অনেক স্থানে নারীর অভিনয়ও দেখা যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও পুরুষের নারী-রূপে অভিনয় জনপ্রিয়তা হারায় নি, তার কারণ পুরুষ অভিনেতার সৃষ্ট ভ্রান্তি এমন একটি উপভোগ্য বস্তু যে দর্শক সেই মোহজালের অপসারণ কামনা করে না।

পঞ্চদশ শতাব্দে কু'ন চু নামে এক প্রকার নূতন নাট্য রচনা শুরু হয়েছিল।

ইয়াং সি উপত্যকার ধনী ও শিক্ষিত শ্রেণীর ব্যক্তিরা ছিলেন এই নাট্যের পৃষ্ঠপোষক। আর এই জাতীয় নাটকে স্বাধীন ভাবের অভিব্যক্তি ইউয়ান কালের চেয়েও বেশি, চার অঙ্কের মামুলি ধাঁচটি যেমন বদলে গেল, তেমনি গান গাওয়া নায়ক-নায়িকার একচেটে অধিকার রইল না। কু'ন চু নাটক গণ-সাহিত্য নয়, উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক ভাষায় পদ্য রচনা, তাই সুধীমণ্ডলীর সমাদর লাভ করলেও কোনদিনই তা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে নি। বিংশ শতাব্দে এই নাটক একেবারেই লোপ পেয়ে গিয়েছে।

কথা সাহিত্যের বিবর্তন-কাহিনী

মিং যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান কথা-সাহিত্য, ট্যাং যুগে যেমন কাব্য রচনা, কিন্তু চীনাদের কাছে কাব্য ও উপন্যাসের মধ্যে প্রভেদ ছিল আকাশ-পাতাল, আর সেই প্রভেদ ঘুচে গিয়ে কথা সাহিত্য তার যথার্থ মর্যাদা লাভ করেছে আধুনিক কালে। নাটকের মত উপন্যাসও 'পাই হুয়া' বা কথ্যভাষায় লিখিত হত, কিন্তু পণ্ডিতরা ব্যবহার করতেন উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক ভাষা, 'ওয়েন লি'। তাই পণ্ডিতবর্গের কাছে উপন্যাস ছিল নাটকের মতই অবজ্ঞার ও ঘৃণার বস্তু। পণ্ডিত সমাজে কোন উপন্যাসের আলোচনা, এমন কি উপন্যাস পাঠের কথা স্বীকার করা পর্যন্ত পরম লজ্জার বিষয় ছিল। কনফুসীয় ঐতিহ্য কথ্যভাষায় লিখিত কথা-সাহিত্যকে চিরদিন লঘু ও দুর্নীতিমূলকই মনে করেছে, সেদিন পর্যন্তও ছেলেমেয়েদের উপন্যাস পাঠ ছিল নিষিদ্ধ। কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তিদের অন্তরে রস গ্রহণের স্বাভাবিক স্পৃহা ঝিমিয়ে পড়ে নি, তাই কথা-সাহিত্যের প্রতি পণ্ডিতসমাজের বিরাগ সত্ত্বেও পণ্ডিতেরা গল্প-উপন্যাস পাঠে বিরত থাকেন নি। তাঁরা যেমন গোপনে উপন্যাস পড়েছেন, তেমনি আবার বেনামীতে রচনাও করেছেন। 'সাহিত্যে'র পর্যায়ে কথা সাহিত্য উঠেছে বিপ্লবোত্তর কালে, তার পূর্বে কয়েক শতাব্দ ধরে শ্রেষ্ঠ উপন্যাস রচিত হয়েছিল বটে, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই লেখকের নাম বা জীবন-কাহিনী ছিল অজ্ঞাত, কেননা কবি বা চিত্রকরের মত তাঁদের জীবন-কথা কোন ঐতিহাসিক লিপিবদ্ধ করেন নি।

মিং যুগের পূর্বে 'পাই হুয়া' বা কথ্যভাষায় লিখিত সুদীর্ঘ উপন্যাস রচিত হয় নি, কিন্তু ছোট গল্প রচনা বহুকাল ধরে চলে এসেছে, ট্যাং ও

সুং যুগের সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনায় আমরা তা দেখেছি। কথ্য ও পণ্ডিতী উভয় ভাষায় লিখিত এই গল্পগুলিই উপন্যাসের অগ্রদূত। সুং যুগের জনসাধারণ কথা-সাহিত্যের প্রতি পণ্ডিতবর্গের অশ্রদ্ধাকে উপেক্ষা করে গল্প ও রস-সাহিত্যের অনুরাগী হয়ে উঠেছিল। গল্প রচনা হয়েছিল তখন বিস্তর, লেখকদের আর্থিক সচ্ছলতাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। গল্প পাঠের আগ্রহ এমনি জেগে উঠেছিল যে পাঠকদের সুবিধার জন্য একপ্রকার নূতন লেখা 'পেন হুয়া' বা গল্প-সার (digest) রচনা করতে হয়েছিল। ইউয়ান নাটকের প্লট এইসব গল্প-সার থেকে গৃহীত, মিং যুগের উপন্যাসও এই গল্প-সার অবলম্বনে রচিত হয়েছিল।

কথা-সাহিত্যের বিবর্তন প্রসঙ্গে প্রাচীন চীনা ছোট গল্পের নমুনাস্বরূপ এখানে গোটা দুই কথিকার মর্মানুবাদ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মিং যুগের নয়, তার অনেক আগেকার পূর্বসূরিগণের এইসব রচনায় যে চমৎকার বৈশিষ্ট্য ও নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে, তারই ফলশ্রুতিরূপে ইউয়ান নাটক ও মিং উপন্যাসের সৃষ্টি হয়েছিল। একটি গল্পের নাম 'বিচারের রায়', খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দে রচিত, অন্যটির নাম 'মাথা না থাকাই ভাল', রচনা নবম শতাব্দে।

বিচারের রায় : লিন হুয়াই নগরে একজন ব্যাপারী বিক্রির জন্য একখণ্ড রেশমের বস্ত্র নিয়ে এসেছিল। ঝমঝম নামল বৃষ্টি, বস্ত্রটিকে সে ছাতার মত মেলে ধরল মাথার ওপর। আর একটি লোকও এসে দাঁড়াল তার পাশটিতে, ছত্রাকারে মেলে ধরা রেশমী বস্ত্রের নীচে। বৃষ্টি যেমন ধরল, আগন্তুকটি অমনি রেশমের বস্ত্রখানা টান দিয়ে বললে, এখানা আমার। তখন বস্ত্রের মালিকের সঙ্গে লোকটার বাধল ঝগড়া। বিচারপ্রার্থী হয়ে দুজনাই গেল ধর্মাধিকরণে মন্ত্রীর কাছে। মন্ত্রী সুয়ে সুয়ান বললেন, "রেশমের দাম তো মাত্র কয়েক শত মুদ্রা। এ নিয়ে ঝগড়া করছ কেন?" রেশমী বস্ত্রটি কেটে দু'ভাগ করলেন তিনি, একখণ্ড দিলেন ব্যাপারীকে, অন্য খণ্ড আগন্তুককে। বিচারক কিন্তু উভয়ের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিলেন। তিনি দেখলেন, ব্যাপারী ক্ষুণ্ণ প্রতিবাদের সুরে অবিচারের অভিযোগ জানাচ্ছে, আর আগন্তুকটি প্রসন্ন মুখেই বিচারকের রায় মেনে নিয়েছে। মন্ত্রীর তখন জানতে বাকি রইল না রেশমখণ্ডের যথার্থ মালিক কোন

ব্যক্তি। তিনি আগন্তুককে মিথ্যা দাবির দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে দণ্ড দিলেন।

এই উপাখ্যানটি বাইবেলে বর্ণিত একটি কাহিনী, দু'জন বারবনিতার একটি নবজাত শিশুকে নিজের পুত্র বলে দাবি কববার কথা স্মরণ কবিয়ে দেয। বিচারে বসে রাজা সলোমানও শিশুটিকে দ্বিখণ্ডিত করে উভযকে দেবার আদেশ দিয়েছিলেন, এবং গণিকাদ্বযের ওপর আদেশটির প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে সঠিক সিদ্ধান্ত করতে পেরেছিলেন।

মাথা না থাকাই ভাল: হ্যান ইউ তি-র রাজত্বকালে (১৪০-৮৭ খৃঃ পূঃ) চিয়া ইয়াং ছিলেন ইয়ুচাং-এর জনৈক ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি দস্যু দমন করতে বের হলেন। দস্যুদের সঙ্গে সংগ্রামে তিনি আহত হলেন, তাঁর মাথাটিও কাটা গেল। ছিন্নমুণ্ড ফেলে রেখেই অশ্বারোহণে শিবিরে ফিরলেন তিনি। সৈন্যরা তাঁর মস্তকহীন কবন্ধের পানে বিস্মিত নেত্রে চেযে রইল। ইয়াং-এর কথা বেরুল বক্ষের ভেতর থেকে। তনি বললেন, "দস্যুরা আমাকে পরাজিত করেছে, তারা আমার মাথা কেটে ফেলেছে। এখন তোমরা বল দেখি, আমায় মানায় কোনটি, মাথা থাকলে, না মাথা না থাকলে?" তারা কেঁদে বললে, "মাথা না থাকলে মানাবে কেন? মাথা থাকা ভাল।" জবাবে ইযাং বললেন, "দূর দূব! মাথা দিয়ে কি হবে? মাথা না থাকাই তো ভাল।"

পঞ্চদশ শতাব্দেব প্রারম্ভ থেকেই জীবন্ত লৌকিক ভাষায় লিখিত উপন্যাস জনপ্রিয় হতে শুরু করেছিল। এই সময প্রথমেই আমরা 'স্যান কুযো চি-ইযেন আই' নামক উপন্যাসটির সাক্ষাৎ পাই। 'স্যান কুয়ো রম্য-কাহিনী' ইতিহাস অবলম্বনে লিখিত, এই গ্রন্থেব বিষযবস্তু যেমন তিন বন্ধুর রক্তেব স্বাক্ষর, 'পিচ বাগানের শপথ' এই বৃত্তান্তগুলি ইতিপূর্বে আমরা বিশদভাবেই বর্ণনা করেছি। সুদীর্ঘ উপন্যাস, পবিচ্ছেদেব সংখ্যা ১২০টি, ১৬৮ খৃস্টাব্দ থেকে এক শ' বছরের ঘটনা নিয়ে 'তিন রাজ্যে'ব কাহিনী লিপিবদ্ধ হযেছে। গ্রন্থেব রচয়িতা লো কুয়াং চুং, আরও কয়েকটি উপন্যাস লিখেছিলেন তিনি, কিন্তু কোনটিই 'স্যান কুয়ো'র মত রসোত্তীর্ণ হয নি। গ্রন্থখানায যে যুগের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে সেই যুগে দ্বন্দ্ব, কলহ, যুদ্ধবিগ্রহ ও বিশ্বাসঘাতকতার

অন্ত ছিল না। লো কুয়াং চুং-এর লেখনীর ইন্দ্রজাল এই মসীকৃষ্ণ পটচ্ছবিকে বীরত্ব ও মহৎ কীর্তির বর্ণোজ্জ্বল শোভাযাত্রায় রূপান্তরিত করেছে। গ্রন্থের একটি প্রধান নায়ক সাও-সাও আশ্রয়দাতাকে হত্যার জন্য সহচর কর্তৃক তিরস্কৃত হয়ে এই প্রসিদ্ধ উক্তিটি করেছিলেন, "বিশ্বের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করব আমি সেও ভাল, তবু বিশ্বকে আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে দেব না।" এই ঐতিহাসিক রোমান্সের তিন ভাগ সত্য ও এক ভাগ কাল্পনিক কাহিনী। চীনা ইতিহাস সম্বন্ধে গ্রন্থকার চুং-এর একটি পরম সত্য বাণী বিশেষ প্রণিধানযোগ্য: "সাম্রাজ্য ঐক্যবদ্ধ হলে ভাঙবার পথে এগিয়ে যায়, আর সাম্রাজ্য যখন বিভক্ত তখন খণ্ডগুলি আবার ঐক্যের কামনা করে।"

মিং যুগের দ্বিতীয় বৃহৎ উপন্যাস 'সুই হু', অর্থ 'জলাভূমির উপান্তের কাহিনী', নব্বইটি পরিচ্ছেদে সমাপ্ত।* ষোড়শ খৃস্টাব্দের রচনা, গ্রন্থকারের নাম সি নাই-আন, ছদ্মনাম হওয়াই সম্ভব। দ্বাদশ শতাব্দের একদল দস্যুর উপাখ্যান, অনেকটা ইংরেজি আখ্যায়িকার দস্যু রবিনহুডের মতই কাহিনী, সুং যুগের শেষ ভাগে কিন আক্রমণের পূর্বের বৃত্তান্তের বর্ণনা। দস্যু-সর্দার সুং চিয়াং একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি, রবিন হুডের মতই সে সানটাং-এর পার্বত্য ভূমি ছেড়ে শান্তি ও শৃঙ্খলার রাজ্য উপদ্রুত করত, শক্তিহীন দুর্বলের ওপর সমাজের অবিচার-অত্যাচারের প্রতিশোধ নেবার জন্যে। গ্রন্থে এই দস্যুরা সাহসী, বীর, মাননীয় পুরুষরূপে বর্ণিত হয়েছে, আর রাজকর্মচারী, মন্ত্রী ও সুং-বংশীরা অত্যাচারী কাপুরুষের কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত হয়েছে। সুই হু একটি বৈপ্লবিক উপন্যাস, মিং ও মাঞ্চুদের বিষদৃষ্টিতে পড়েছিল, তাতে বিস্ময়ের কারণ নেই।

'স্যান কুয়ো' ও 'সুই হু' উভয় উপন্যাসই অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল, এবং বিষয়বস্তু ঐতিহাসিক বলে জনসাধারণ তাদের অতীত ইতিহাসের জ্ঞান প্রধানত এই দুটি উপন্যাস থেকেই আহরণ করত। 'সুই হু'র 'উপসংহার'-রূপে অনেকগুলি গ্রন্থ রচিত হয়েছিল, বাংলা সাহিত্যে যেমন দেখা দিয়েছিল

* 'সুই হু' উপন্যাসটি প্রসিদ্ধ লেখিকা পার্ল বাক ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেছেন। অনুবাদ গ্রন্থের নাম: *All Men Are Brothers*.

বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি উপন্যাসের 'উপসংহার', কিন্তু সব ক্ষেত্রেই মূল গ্রন্থের তুলনায় উপসংহারগুলি ছিল নিকৃষ্ট ধরনের রচনা। এই শ্রেণীর রচনার ভিতর থেকে বেরিয়েছিল একটি নূতন ধাঁচের রম্য আখ্যায়িকা, এই গ্রন্থের নাম 'চিন পিং মেই', গ্রন্থকার জনৈক অখ্যাত অজ্ঞাত ব্যক্তি, তবে অনুমান করা হয় বইখানা বেনামীতে লিখেছিলেন মিং যুগের প্রখ্যাত চিত্রকর, লেখক ও বিচারমন্ত্রী ওযাং সি চেন (১৫২৬-১৫৯৩)। 'সুই হু'র উপসংহার হলেও মূল গ্রন্থের যুদ্ধবিগ্রহের ঐতিহাসিক পরিবেশ ছেড়ে দিয়ে কাহিনীটি ক্রমে গিয়ে গৃহস্থের দৈনন্দিন জীবনে প্রবেশ করেছিল, নায়িকা 'স্বর্ণকমলিনী' যখন কোন মধ্যবিত্ত ব্যক্তির গৃহে গৃহিণী-রূপে অধিষ্ঠিতা হলেন। এই নায়িকা এবং তাঁর দুই সপত্নীর পরস্পর ঈর্ষা, তিনজনেরই পরস্পরকে বঞ্চিত করে স্বামীর ভালবাসা লাভের তীব্র কামনা, সংসারের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার বর্ণনায় এইসব ভাব উপন্যাসটিতে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সমালোচকেরা বইখানির আদিরসাত্মক বর্ণনাকে অশ্লীল বলেছেন, হয়তো বা এই অভিযোগ অনেকখানি সত্য। কিন্তু সত্যকার জীবনের বর্ণনায় অংশবিশেষ অশ্লীল হলেও মূল আখ্যানবস্তুটি যে পঙ্কমলিন হয়ে ওঠে নি সে কথা অনস্বীকার্য। এই উপন্যাসের রচনায় প্রচলিত নিয়মের একটি বিশেষ ব্যতিক্রম দেখা যায়। কথা-সাহিত্যের স্ত্রী-চরিত্র ছিল নৈষ্ঠিক নিয়মে বাধা, নারীকে কোন প্রধান স্থান দেওয়া হয় নি। চিন পিং মেই গ্রন্থে তিনজন নারীকে মুখ্য চরিত্ররূপে বর্ণনা করে লেখক যে নূতন ধারার প্রবর্তন করেছিলেন তারই ফলে উপন্যাস-জগতে একটি যুগান্তর উপস্থিত হয়েছিল।

মিং যুগে আরও কয়েকটি গার্হস্থ্য উপন্যাস রচিত হয়েছিল, কিন্তু পূর্ব-বর্ণিত উপন্যাসসমূহের তুলনায় এগুলির বিষয়বস্তু ছিল একান্ত বাস্তবতা বর্জিত যদিও চরিত্রের অভিনবত্ব যে ছিল না তা নয়। সে যা ই হোক, এই ধারাবাহিক সৃষ্টি-প্রবাহই চীনা সাহিত্যের মুকুটমণি মাঞ্চু যুগে লিখিত সর্বকালের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'হুং লাউ মেং' বা 'লাল কামরার স্বপ্ন' রচনার পথ প্রস্তুত করেছিল।

মিং সাহিত্যে অত্যদ্ভুত কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ ক্ষেত্রবিশেষে যে দেখা যায় না এমন নয়। উ চেং-এন (১৫০০-১৫৮২) রচিত 'সি ইউ চি' নামে উপন্যাসটি সুং যুগের একটি কাব্য অবলম্বনে লিখিত। উপন্যাসের নায়ক মানুষ নয়,

বানর, সে ছিল তাও ধর্মী, বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়ে প্রখ্যাত পরিব্রাজক হুয়ান-ৎসাং-এর সহচর হয়েছিল। উভয়ে তারা ভারতবর্ষে যায় নি, গিয়েছিল স্বর্গে। বইখানি নানান দেশের দেব-দানব-মানুষের কল্পিত বর্ণনায় পরিপূর্ণ।

৫ মিং স্থাপত্য, কারু ও কলা-শিল্প

ট্যাং পদ্য ও স্থং চিত্রাঙ্কনের মত মিং-যুগীয় স্থাপত্য খ্যাতি লাভ করেছে, তার কারণ স্থাপত্য-শৈলীর শ্রেষ্ঠত্ব নয়। প্রাক-মিং যুগীয় স্থাপত্যের অতি অল্প নিদর্শনই এখন বিদ্যমান। মিং-রা অনেক বৃহৎ প্রাসাদ ও মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, সেগুলি টিঁকে আছে। প্রাক-মিং যুগের নির্মাণ কাযগুলিও সম্ভবত ছিল তেমনি সুবিশাল ও সৌষ্ঠবযুক্ত, কিন্তু সেসবের অস্তিত্ব এখন নেই। অবশ্য চি'ন বংশী সি হুয়াং তি নির্মিত 'বৃহৎ প্রাচীর' এখনো জগতের বিস্ময়রূপে দণ্ডায়মান, তবে সি হুয়াং তি-র পরবর্তী কালে প্রাচীরটি অনেক-বার সংস্কৃত ও পুনর্নির্মিত হয়েছে। লো ইয়াং-এর 'শ্বেতাশ্ব-মন্দির' এবং চাং-আনের বহির্দেশে তা ইয়েন মঠ এখনো পূর্বস্থানে দাঁড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু উত্তরকালের সংস্কার কাযে সেগুলির আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। ট্যাং যুগের কয়েকটি মন্দির ছাড়া, অবশিষ্ট সব মন্দিরই মিং যুগের।

প্রাক-মিং যুগীয় স্থাপত্যের নিদর্শন এখন নেই সত্য, কিন্তু প্রাচীন কালের সৌধ বা প্রাসাদের আকার-প্রকার আমাদের অজানা নেই। মৃতের সমাধি গর্ভে প্রত্নতাত্ত্বিক সন্ধান হ্যান যুগের গৃহের 'মাটির নমুনা' (clay models) আবিষ্কার করেছে, তা ছাড়া সে-কালের বাড়ির প্রতিকৃতি পাথরে উৎকীর্ণ দেখা যায়। হ্যান যুগের গৃহে কয়েকটি প্রাঙ্গণের পাশে পাশে ছিল কতগুলি হল-ঘর, সেই ঘরগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কামরায় বিভক্ত। মোটামুটি ঘরগুলির আকার আধুনিক গৃহের মতই যদিও ছাদের বাঁকা ছাঁদটি তেমন পরিস্ফুট নয়। ট্যাং স্থাপত্যের ধারণা করা যায় পাথরে খোদাই-করা প্রতিকৃতি থেকে. তেমনি স্থং চিত্রে দেখা যায় সে-কালের গৃহের নমুনা। কোন ক্ষেত্রেই ছাদের বক্রতা আধুনিক গৃহের প্যাগোডাকৃতির অনুরূপ নয়। মিং যুগে ছাদের দু' ধারের বক্রতা সুস্পষ্ট রূপ ধারণ করেছিল, কিন্তু এ বিষয়েও উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলের শৈলীর প্রভেদ দেখা যায়। উত্তরাঞ্চলে গৃহসমূহের ছাদের উভয় প্রান্ত

তাঁবুর মত ঈষৎ বাঁকা, পক্ষান্তরে দক্ষিণাঞ্চলের ছাদের বক্রতা শৃঙ্গের মতই উৎকট রকমের। লাল টালির ছাদ হ্যান যুগ থেকে চলে এসেছিল, মিং-দেব রাজপ্রাসাদ ও কোন কোন মন্দিবের ছাদে রঙিন পর্সিলেনেব টালি ব্যবহাব একটি অভিনব জিনিস বলতে হয়। এই পর্সিলেন টালিগুলির বর্ণরেখার সৌষ্ঠব মিং স্থাপত্যকে যেরূপ বিচিত্র শোভায মণ্ডিত করেছিল, সেরকমটি ইতিপূর্বে আর কখনো দেখা যায নি।

আমরা দেখেছি সম্রাট চি'ন সি হুযাং তি সাত লক্ষ ব্যক্তির পরিশ্রমে একটি বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। ঐতিহাসিক জু মা চিযেন এই প্রাসাদের সুদীর্ঘ বর্ণনায় বলেছেন, প্রধান হল-ঘবটির পূর্ব-পশ্চিমে দৈর্ঘ্য ছিল ৫০০ পদ আর উত্তর-দক্ষিণে ১০০ পদ প্রশস্ত। এই হলটিতে দশ হাজার ব্যক্তি সমবেত হতে পারত। আর একজন সম্রাটের নির্মাণ-কার্যে অদ্ভুত উদ্যোগ-অনুষ্ঠানেব কাহিনী ইতিপূর্বে বলা হযেছে, তিনি সুই ব'শী ইযাং তি। তিনি এক হাজার মাইল দীর্ঘ খাল খনন করেছিলেন আর সেই খালেব ধারে ধাবে অসংখ্য প্রমোদ-ভবন নির্মাণ করেছিলেন।

'নিষিদ্ধ নগব' ও 'বাজকীয় নগব'

চাং-আন ও লো-ইযাং-এ আছে শুধু মাটিব ঢিবি, হ্যান, সুই ও ট্যাং যুগের প্রাসাদের কোন চিহ্ন নেই। কিন্তু সমসাময়িক কালের লেখকেরা শুধু প্রাসাদগুলির বর্ণনা নয়, শহরের নিখুঁত নকশা রেখে গেছেন, এবং তা থেকে আমরা রাজধানীর আযতন ও অন্যান্য বিবরণ জানতে পেরেছি। চাং-আন শহরটি ছিল পিকিং-এরই মত, পিকিং পুনর্নির্মাণ ব্যাপারে মিং সম্রাট ইযাং লো যে চাং-আনের নকশার অনুকরণ করেছিলেন, সে বিষযে কোন সন্দেহ নেই। উভয় ক্ষেত্রেই 'রাজকীয় নগরে'র (Imperial City) অভ্যন্তরে ছিল একটি 'প্রাসাদ-নগর' (Palace City), পিকিং-এ এই প্রাসাদকে বলা হয 'নিষিদ্ধ নগব' ('Forbidden City')। পিকিং-এব এই 'নিষিদ্ধ নগর' প্রাচীর ও পরিখা-বেষ্টিত চতুষ্কোণ ভূখণ্ডে অবস্থিত, দ্বার চারটি। এই 'নিষিদ্ধ নগরে'ই সম্রাটের বাস, সম্রাট সন্দর্শনার্থ অথবা উৎসব-পার্বণ উপলক্ষে শুধু অমাত্যবর্গ ও রাজকর্মচারীরাই প্রবেশের অনুমতি পেয়ে থাকেন। উত্তর দিকের ফটক দিয়ে গিয়েছে রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশের পথ, সেখানে থাকেন রাজ-পরিবার ও

গণিকারা, অন্তঃপুরে খোজা ভিন্ন সকলেরই প্রবেশ নিষেধ। 'নিষিদ্ধ নগরে' আছে অসংখ্য রাজপ্রাসাদ। মিং ও মাঞ্চুদের পাঁচ শ' বছর ব্যাপী রাজত্বকালে সম্রাটেরা কোন নির্দিষ্ট রাজভবনে বাস করেন নি, অভিরুচিমত একটি পরিত্যাগ করে অন্যটিতে গিয়েছেন। এমনি ছিল তাঁদের কুসংস্কার যে মৃত্যু বা অন্য কোন দুর্দৈব ঘটলে অনেক সময়ে তাঁরা শুধু সেই প্রাসাদ পরিত্যাগ করেই ক্ষান্ত হন নি, প্রাসাদটিকে প্রাচীর দিয়ে ঘিরে তার মধ্যে প্রবেশের পথ বন্ধ করেছেন। 'নিষিদ্ধ নগরে'র রাজপ্রাসাদ ছাড়াও সম্রাটেরা রাজধানীর বাইরে প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে প্রমোদ-ভবন নির্মাণ করতেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঞ্চু সম্রাট চিয়েন-লুং ইউয়ান মিং ইউয়ান নামে বিশাল প্রমোদোদ্যান রচনা করেছিলেন পিকিং থেকে দশ মাইল দূরে, সেখানে অনেক সুরম্য হর্ম্য নির্মাণ করা হয়েছিল, সেগুলি সবই ইংরেজ ও ফরাসীদের আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল ১৮৬০ খৃস্টাব্দে।*

'নিষিদ্ধ নগরে'র বাইরে পিকিং-এর 'রাজকীয় নগর'টিও প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। আদিকাল থেকেই চীনের একটি বৈশিষ্ট্য প্রাচীর নির্মাণ, 'বৃহৎ প্রাচীর' থেকে শুরু করে বড় ছোট সকল প্রকার প্রাচীর। 'বৃহৎ প্রাচীর' পুনর্নির্মাণ করা হয়েছিল মিং যুগে, সেই প্রাচীরই আমরা এখন দেখতে পাই। প্রাচীরগুলির অভ্যন্তরভাগ মাটির স্তূপ, উভয় দিকে পাথর বা ইঁট দিয়ে গাঁথা। কোন কোন প্রাচীরের নীচের অংশ ৬০ ফুট প্রশস্ত, উপরিভাগ ৩০ ফুট। পৃথিবীর দীর্ঘতম নগর-প্রাচীরের মধ্যে ন্যানকিং নগর-প্রাচীর অন্যতম, দৈর্ঘ্য ২৮ মাইল। প্রাচীর নির্মাণ প্রতিরক্ষার্থ হলেও শিল্পের দিকে দৃষ্টিপাতের ত্রুটি ঘটে নি। শহরের আকৃতি চতুষ্কোণ, প্রাচীরও চতুষ্কোণ। এইসব

* গাইলস্ তাঁর *Civilization of China* গ্রন্থে লিখেছেন, "If we go back to the 15th century we shall find that the standard of civilization as the term is usually understood was still much higher in China than in Europe, while Marco Polo, the famous Venician Traveller of the 13th century who actually lived 24 years in China and served as an official under Kublai Khan has left it on record that the magnificence of the Chinese cities and the splendour of Chinese court outrivalled anything he had seen or heard of."

প্রাচীরের বিভিন্ন অংশে তিনতলা চূড়া, ছাদগুলি চীনা পদ্ধতিমত দুইধারে বাঁকা। এইরূপ বাঁকা ছাদ দেখা যায় প্যাগোডায়, বস্তুত এই প্যাগোডার আকার চীনা ভাস্কর্যের বৈশিষ্ট্য।

চিত্রকলা ও পর্সিলেন

মিং চিত্রকলা এতদিন পাশ্চাত্ত্য সমালোচকদের অবজ্ঞার বস্তু ছিল, কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন হয়েছে। অবশ্য ট্যাং ও সুং শিল্পের সমান শ্রেষ্ঠত্ব মিং চিত্রাঙ্কন লাভ করেছিল কি না সন্দেহ। মিং যুগে চিত্র শিল্পীর সংখ্যা ছিল অনেক, তাঁদের অঙ্কিত কোন কোন প্রাকৃতিক দৃশ্য, পক্ষী, ফুল ও প্রাসাদ-মহিলার চিত্রে সূক্ষ্ম রেখার সৌষ্ঠব ও পারিপাট্যের পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়। কিন্তু শিল্প ক্রমেই অধোদিকে চলেছিল, রূপসজ্জার আতিশয্য এবং দৃশ্যাঙ্কনে প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের অভাব দেখা দিয়েছিল। ইতিপূর্বে সুং শিল্পের আলোচনায় আমরা উত্তর ও দক্ষিণ চিত্রশৈলীব দুটি পদ্ধতির উল্লেখ করেছি। মিং চিত্রশিল্প অনেকটা দক্ষিণ পদ্ধতির মত হলেও এই শিল্পের একটি নূতন নাম দেওয়া হয়েছিল 'ওয়েন জেন হুয়া' বা 'সাহিত্যিকী চিত্রাঙ্কন' ("Painting of the literati")। চীন দেশে চিত্রাঙ্কন ছিল পণ্ডিত ও অভিজাতকুলের বিলাস, কিন্তু মিং যুগেব চিত্রকরেরা পেশাদার হতে শুরু করেছিল। এখন সেই পেশাদারি শিল্পীর বিরুদ্ধপক্ষ হয়ে দাঁড়াল 'ওয়েন জেন' অর্থাৎ 'সাহিত্যিকী অঙ্কন', এই শিল্পই নিজেকে যথার্থ সংস্কৃতির দাবিদার বলে প্রচার করল। প্রথম মিং সম্রাট লুং উ হ্যানকিং-এ চিত্রশিল্পের একটি আকাদামি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সুং-দের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। সম্ভবত চিত্রাঙ্কন অপেক্ষা শিল্প-সমালোচকদের কৃতিত্বই এ যুগে বেশি। চিত্রশিল্পের একটি বিশ্বকোষও তারা রচনা করেছিল।

মিং যুগের অন্যান্য শিল্পের মধ্যে ছিল ব্রঞ্জ ও পর্সিলেন। ব্রঞ্জের ঢালাই কাজে মিং শিল্পীরা বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিল, কিন্তু পর্সিলেন শিল্পই ছিল চীনের নিজস্ব। সুং যুগে এই শিল্প কিরূপ উৎকর্ষ লাভ করেছিল আমরা তা পূর্বে দেখেছি। সে-কালের 'মনোক্রোম' বা একরঙা পালিশের স্থানে এখন 'পলিক্রোম' বা বহুবর্ণের সজ্জা দেখা দিল, এই পলিক্রোমই মিং যুগের বিশেষত্ব। সুং যুগের পর্সিলেনে ছবি ছিল সামান্যই, এখন সাদা

পর্সিলেনের ওপর নানান বর্ণের চকচকে চিত্রাঙ্কন, লাল নীল এনামেলের কাজ শুরু হল। কালক্রমে পীত, সবুজ ও নানান রঙের সংমিশ্রণে পর্সিলেন নূতন রূপ ধারণ করল, পর্সিলেনে অনেক রকমের দৃশ্য ও মূর্তির ছবি আঁকা হল।

অনেক স্থানে পর্সিলেন প্রস্তুত হত। কিয়াংসি প্রদেশে চিং তে চিন নগরে পর্সিলেনের একটি সরকারী কারখানা ছিল। এই অঞ্চলে পর্সিলেন নির্মাণের খনিজ বস্তু ছিল বলেই শিল্পের সর্বাধিক উন্নতি সম্ভব হয়েছিল। প্রতিযোগিতায় এখানকার শিল্পদ্রব্য অন্যান্য স্থানের পর্সিলেনকে পরাভূত করেছিল। এই প্রাধান্য বজায় ছিল ঊনবিংশ শতাব্দ পর্যন্ত, তারপর খনিজ পদার্থ নিঃশেষিত হবার সঙ্গে সে প্রাধান্য আর রইল না। অধিকাংশ পর্সিলেনই বিদেশে রপ্তানি হয়েছে, ইউরোপও পর্সিলেন আমদানি করেছে রেশম ও চা-র সঙ্গে।

নবম পর্ব

চি'ং (মাঞ্চু) বংশ

১. প্রথম পর্যায় ঃ সাম্রাজ্য বিস্তার ও সমৃদ্ধির কাহিনী (১৬৪৪-১৮২০)

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি মিং সাম্রাজ্যের পতনের পূর্বে চি'ং বা মাঞ্চু বংশের প্রতিষ্ঠাতা নুরহাচুর (১৫৫৯-১৬২৬) অধিনায়কত্বে পূর্ব দিকে সমুদ্র ও উত্তর দিকে আমুর নদী পর্যন্ত বিশাল মাঞ্চুরিয়া ও কিরিন ভূখণ্ডে 'তুঙ্গু' জাতির একটি নূতন রাজত্ব স্থাপিত হয়েছিল। সেই চি'ং বা মাঞ্চু রাজ্যের রাজধানী ছিল মুকডেন। 'চি'ং' শব্দের অর্থ 'পবিত্র'। নুরহাচুর পুত্র তা'ই সুং দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া বা লিয়াও তুং অঞ্চল অধিকার করেছিলেন (১৬২৯)। বৃহৎ প্রাচীরের উত্তরভাগে মাঞ্চু রাজ্যের বিস্তার মিং শাসকদের তেমন উদ্বেগের কারণ হয়ে ওঠে নি, কেননা বারবার হানা দিয়েও মাঞ্চুরা সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা ভেঙে দিতে পারে নি। প্রকৃতপক্ষে মিং সাম্রাজ্যের পতনের কারণ অন্তর্বিদ্রোহ। এই অন্তর্বিদ্রোহেব সুযোগে মাঞ্চুরা একপ্রকার নির্বিবাদে চীন দেশের উত্তরাংশ অধিকার করতে সমর্থ হয়েছিল। করভারে প্রপীড়িত দুর্দশাগ্রস্ত প্রজাদের নেতা লি জু চেং-এর শেষ মিং সম্রাট চুং চেং-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অভিযান, 'কয়লা পাহাড়ে' সম্রাটের আত্মহত্যা ও বিদ্রোহী নেতার পিকিং অধিকার (১৬৪৪), এসব কাহিনী পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। বিদ্রোহী নেতা লি জু চেং নিজেকে 'সুন' বংশের প্রতিষ্ঠাতা বলে প্রচাব করলেন, এই দাবি করে তিনি পূর্ব-ইতিহাসের অনুবর্তন করতে চেষ্টা করেছিলেন মাত্র। প্রত্যন্ত অঞ্চলে মিং-দেব প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার সৈন্যাধ্যক্ষ উ সান-কুয়েই যদি পিকিং পতনের পব লি জু চেং-এব রাজবংশ প্রতিষ্ঠার দাবি স্বীকার কবে নিতেন তা হলে চীনের সিংহাসনে বিদেশী মাঞ্চুর পরিবর্তে একজন খাঁটি চীনাকেই প্রতিষ্ঠিত দেখা যেত। কিন্তু সেনাপতি উ সান-কুয়েই দেশপ্রেমিকের আচরণ করেন নি, প্রত্যন্তের দ্বার খুলে দিয়ে মাঞ্চুদের আহ্বান করেছিলেন পিকিং আক্রমণের জন্য। সম্ভবত এই হঠকারিতার কাজ করেছিলেন তিনি একটি ব্যক্তিগত লাঞ্ছনায়

ক্রোধান্ধ হয়ে। পিকিং-এর বিদ্রোহী নেতা লি জু চেং তাঁর একটি সুন্দরী গণিকাকে অপহরণ করেছিল, সেই ছিল তাঁর চেং-এর প্রতি ক্রোধের কারণ। সেনাপতি উ ও মাঞ্চুদের মিলিত বাহিনীর সম্মুখীন হল লি জু চেং দুই লক্ষ সৈন্য নিয়ে, পুরোভাগে ছিলেন স্বয়ং উ-র পিতা। পুত্রকে যুদ্ধে নিবৃত্ত হবার জন্য অনেক সাধ্যসাধনা করলেন পিতা, মাঞ্চু পক্ষ ছেড়ে বিদ্রোহী বিজেতা চেং-এর বশ্যতা স্বীকার করতে বললেন, কিন্তু উ-র সংকল্প অটুটই রয়ে গেল। তখন পুত্রের চক্ষের সামনে পিতাকে হত্যা করা হল। যুদ্ধ বাধল, জয়-পরাজয় যখন অনিশ্চিত সেই সময় বর্মধারী মাঞ্চু অশ্বারোহী সৈন্যরা সমরাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়ে লি-র বাহিনীকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলল। লি পিকিং-এ পালিয়ে এল, সেখানে নৃশংসভাবে রাজ-পরিবার ও উ-র স্বজনবর্গকে সমূলে বিনাশ করে প্রভূত ধনরত্ন নিয়ে পশ্চিমাঞ্চলে পলায়ন করল। সেনাপতি উ সান-কুয়েই তাঁর বাহিনী সহ লি-র পশ্চাদ্ধাবন করল পিকিং নগর মাঞ্চুদের হাতে ছেড়ে দিয়ে। পরিণামে লি জু চেং ও তার অনুচরদের অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে মৃত্যু হয়েছিল।

ইতিমধ্যে মাঞ্চুরা পিকিং-এ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে তাদের একটি ছয় বছরের বালক রাজাকে চীনের সম্রাট বলে ঘোষণা করেছিল। তিনিই পিকিং-এর প্রথম মাঞ্চু শাসক, তাঁর রাজত্বকালের নাম সুন চি।

সুন চি (১৬৪৪-১৬৬১)

সাত বছর-কাল বালক সম্রাট সুন চি-র অছি ছিলেন তাঁর পিতৃব্য ডুরগান। তিনি ছিলেন একজন সাহসী যোদ্ধা, বালককে অপসৃত করে স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করবেন এই ছিল তাঁর মনের অভিপ্রায়, কিন্তু দৈব বিপাকে একটি শিকার-অভিযানে তাঁর অকস্মাৎ মৃত্যু হল (১৬৫১)। সম্রাট সুন চি তখন নিজের হাতে রাজ্যভার গ্রহণ করলেন। তাঁর সুযোগ্য পিতৃব্যের জীবনকালেই সমগ্র উত্তর চীন ও উত্তর-পশ্চিমের অধিকাংশ বিনা বাধায় অধিকৃত হয়েছিল। উত্তরাঞ্চলের শাসন-ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল বলেই মাঞ্চুদের অধিকার বিস্তারের পথে কোন বাধার সৃষ্টি হয় নি, কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলে ন্যানকিং-এ একজন মিং-বংশীকে সম্রাটরূপে দাঁড় করানো হয়েছিল, আরও কয়েকজন রাজবংশী ফুচু ও ক্যানটনে প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত

হয়েছিল। এইসব ক্ষুদ্র মিং রাজবংশীরা ছিল নিতান্ত অপদার্থ, আত্মরক্ষা করবার মত যোগ্যতাটুকুও তাদের ছিল না। বিপুল হত্যাকাণ্ড সহকারে মাঞ্চুরা ইয়াংচো দখল করল, তারপর হল ন্যানকিং-এর পতন (১৬৪৫)। ন্যানকিং আক্রমণ-কালে মিং সম্রাট একজন উৎকৃষ্ট অভিনেতার সন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন, রাত্রিকালে নেশার ঘুম থেকে তাঁকে পলায়নের জন্য জাগিয়ে তোলা হয়, কিন্তু তাঁর আর পালানো হল না, শত্রুহস্তে তিনি কোতল হলেন। একজন মিং দাবিদার চেকিয়াং প্রদেশে গিয়ে বসেছিল, সেখান থেকে ডেরাডাণ্ডা তুলে তাকে শেষকালে জলদস্যু-বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়েছিল। ১৬৪৭ খৃস্টাব্দে ক্যানটন অধিকৃত হয়। তখনকার ব্যাপক বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে একজন ধুরন্ধর ব্যক্তি সেনসি, সানসি ও জেচুয়ান প্রদেশগুলি অধিকার করেছিল, অনেক রক্তপাতের পর মাঞ্চুরা তাকে উৎখাত করতে সমর্থ হল। সর্বশেষ মিং বংশী কুয়েই ওয়াং সম্রাটের দাবি নিয়ে দীর্ঘকাল কোয়াংসি ও ইউনান প্রদেশে রাজত্ব করেছিলেন। পরিশেষে তাঁকেও রাজ্য ছেড়ে বর্মা অঞ্চলে পলায়ন করতে হয়েছিল (১৬৬২)।

এইরূপে আঠার বৎসর অবিশ্রাম যুদ্ধবিগ্রহের পর মাঞ্চুদের দক্ষিণাঞ্চল আয়ত্তাধীনে আনবার উদ্যম সফল হয়েছিল। সাফল্যের কৃতিত্ব বহুলাংশে ভূতপূর্ব মিং সেনাপতি উ সান-কুয়েই-র প্রাপ্য, কারণ দক্ষিণদেশে খণ্ড রাজ্যগুলির শক্তি চূর্ণ করবার ভার মাঞ্চুরা তাঁকেই অর্পণ করেছিল, যুদ্ধে মাঞ্চু সৈন্য নিয়োজিত হয়েছিল অল্পই। দক্ষিণাঞ্চল বিজয়ের পর সে দেশ তিন ভাগে বিভক্ত করে প্রতি খণ্ডে একজন চীনা রাজা প্রতিষ্ঠিত করেছিল মাঞ্চুরা, সেই সূত্রে উ সান-কুয়েই দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের অধিপতি হলেন। চীনা শাসকত্রয়ের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে বেশি পরাক্রান্ত, অন্য দুইজন ছিল অপেক্ষাকৃত দুর্বল। দক্ষিণাঞ্চলের এই শাসকদের ওপর, এমন কি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলেও মাঞ্চুদের আধিপত্য ছিল সামান্য, কেন্দ্র-শক্তি ছিল শিথিল, সেজন্য মাঞ্চু সাম্রাজ্যের প্রথম ত্রিশ বৎসর-কাল এইসব স্থানে বিদ্রোহের আশঙ্কা সর্বদা বিদ্যমান ছিল।

সুন চি ছিলেন দুর্বলচিত্ত, পিকিং-এর 'নিষিদ্ধ নগরে'র খোজাদের প্রভাবাধীন হয়েছিলেন, তার ওপর বৌদ্ধধর্মাচরণের গোঁড়ামি তাঁকে ধর্মান্ধ করে তুলেছিল। ১৬৬১ খৃস্টাব্দে সম্রাটের মৃত্যুর পর তাঁর সাত বছরের বালক

পুত্র সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হল, এবং সেই নাবালক সম্রাটের নামে অছিমণ্ডলীর শাসন প্রবর্তন প্রয়োজন হল। এই বালক সম্রাটই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কা'ং সি, টলটলায়মান রাজ্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে প্রায় তিন শতক-কাল মাঞ্চু বংশের স্থায়িত্ব বিধান যাঁর অতুলনীয় কীর্তি।

কা'ং সি (১৬৬১-১৭২৩)

বাষট্টি বছর রাজত্ব করেন সম্রাট কা'ং সি। পনর বছর বয়সে অছিমণ্ডলীর প্রভাব চূর্ণ করে নিজের হাতে শাসন ভার গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ইউরোপ ও এশিয়ার কয়েকজন বিখ্যাত নৃপতির সমকালীন। তখন ফ্রান্সের রাজা ছিলেন চতুর্দশ লুই, রাশিয়ার জার পিটার দি গ্রেট, ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়ম এবং দিল্লীর বাদশাহ আওরংজেব। এইসব রাজন্যবর্গের প্রত্যেকেরই স্ব স্ব দেশে চিরস্মরণীয় কোন না-কোন কীর্তি বা কুকীর্তি আছে। কা'ং সি-র অসামান্য কর্মকুশলতা ও ব্যক্তিত্ব, সদা-জাগ্রত মনের অপরিসীম জ্ঞান-পিপাসা, সুদুর্লভ স্মৃতি ও মেধা, অক্লান্ত শারীরিক শ্রমশীলতা অচিরেই প্রশাসন ক্ষেত্রে নবীন শক্তির সঞ্চার করেছিল, শাসন-ব্যবস্থাকে দৃঢ় করে তুলেছিল, এবং তারই ফলে সারা দেশে শান্তিময় অবস্থার ও আর্থিক সমৃদ্ধির সৃষ্টি, এমন কি সাংস্কৃতিক বিকাশও সম্ভব হয়েছিল। শুধু তাই নয়, সম্রাট তাঁর স্বজাতীয়দের সঙ্গে চীনাদের বিরোধ মীমাংসার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হয়েছিলেন, এবং এই জাতীয় ঐক্য প্রতিপন্ন করবার জন্যই বোধ করি মিং সম্রাটদের সমাধিক্ষেত্রে সশ্রদ্ধ অর্ঘ্য নৈবেদ্য ষোড়শোপচারে দান করতেন।

দক্ষিণাঞ্চলে উ সান-কুয়েই এবং অন্যান্য চীন নৃপতিরা সম্রাটের অধীনে ছিল নামমাত্র, কা'ং সি-র চারিত্রিক নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা তাদের একান্ত বিচলিত করেছিল। কথিত আছে, কা'ং সি দু-দুবার উ সান-কুয়েই কে পিকিং দরবারে উপস্থিত হয়ে বশ্যতা স্বীকার করতে আদেশ দিয়েছিলেন, কিন্তু প্রতিবারই উ সম্রাটের আদেশ প্রত্যাখ্যান করেন। উ সান কুয়েই ছিলেন পরম শক্তিশালী, দশ বৎসর কাল নিশ্চেষ্টভাবে অপেক্ষা না করে তিনি যদি উত্তরাঞ্চলে মাঞ্চু রাজ্য আক্রমণ করতেন তা হলে মাঞ্চুরা সম্ভবত চীন দেশ থেকে পূর্বেই বিতাড়িত হত। দক্ষিণাঞ্চলে বিদ্রোহ জেগে উঠতে যথেষ্ট বিলম্ব ঘটেছিল, কিন্তু বিলম্ব সত্ত্বেও এই নবজাগ্রত বিদ্রোহ মাঞ্চু সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড প্রায়

ভেঙেই দিযেছিল। সমস্ত দক্ষিণদেশ মাঞ্চুদের হস্তচ্যুত হয়েছিল, উ সান-কুয়েই মোঙ্গলদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি লাভ করে উত্তরদেশ আক্রমণ করলেন মোঙ্গল বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য, এমন সময় হঠাৎ সমুদ্রকূলের কয়েকজন চীনা রাজা তাদের নেতা উ সান-কুয়েই-কে পরিত্যাগ করে মাঞ্চু সম্রাটের পক্ষ অবলম্বন করল। মাঞ্চুরা সমুদ্রতট অধিকার করে এই চীনা রাজাদের রাজ্যচ্যুত কবেছিল, সিংহাসন হারানোই হল তাদের বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার। এইরূপে মাঞ্চুরা জয়লাভ করল বটে কিন্তু উ সান-কুয়েই পরাজিত হলেন না। তিনি বৃদ্ধ হযেছিলেন, পাঁচ বছর সাফল্যের সহিত মাঞ্চু বাহিনীর প্রতিরোধ কবে দক্ষিণ-পশ্চিম চীনে নিজেব প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন, মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন অপরাজিত। তাঁর পুত্ররা পিতার গুণেব অধিকারী হয় নি, তারা পবস্পব কলহ শুরু করল। এই আত্মকলহের সুযোগ নিযে সুচতুর সম্রাট কা'ং সি তাঁর অসমাপ্ত কার্যটি শেষ কবলেন। ১৬৮১ খৃস্টাব্দে তিনি ইউনানের রাজধানী ইউনান-ফু দখল করে উ পবিবাবকে সমূলে উচ্ছেদ কবলেন। এইরূপে মাঞ্চু রাজ্য প্রতিষ্ঠাব প্রায চল্লিশ বছব পর দক্ষিণাঞ্চলে সম্রাটের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল, অর্ধস্বাধীন সামন্তবাজ্যগুলির বিলোপ ঘটল, কেন্দ্রীভূত শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করে কা'ং সি সাবা দেশের ঐক্য ও সংহতি পুনর্গঠিত কবলেন। ১৬৮২ খৃস্টাব্দে মাঞ্চুদের পবম শত্রু কক্সিংগা-র পুত্রের মৃত্যুর পর ফরমোসা সর্বপ্রথম চীন কর্তৃক অধিকৃত হযেছিল।

দক্ষিণাঞ্চলে শান্তি স্থাপনেব সঙ্গে সঙ্গেই সম্রাট কা'ং সি-কে পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমের দিকে দৃষ্টিপাত করতে হল। মোঙ্গলরা বিভিন্ন অংশে, বিশেষত পশ্চিম ও পূর্ব শাখায বিভক্ত হযে প'ড়েছিল। সম্রাট যখন উ সান-কুযেই-র সঙ্গে যুদ্ধে বিরত, সেই সময় মোঙ্গলিযায তাঁব অধীনস্থ পূর্ব শাখার একটি মোঙ্গল উপজাতি বিদ্রোহ করেছিল। কা'ং সি সেই বিদ্রোহ দমন করে পশ্চিম মোঙ্গল সাম্রাজ্যের ওপব আধিপত্যের দাবি করলেন। কাশগর, পূর্ব তুর্কীস্থান, তুরফান, হামি প্রভৃতি স্থানে 'এলিউথ' নামে মোঙ্গল উপজাতির একটি নূতন রাজ্য গঠিত হয়েছিল, সেই রাজ্যের অধিপতি গালাদান ছিলেন একজন পরম শক্তিমান পুরুষ, তিনি তিব্বতের ওপরও প্রভুত্ব কবতে ছাড়তেন না। ১৬৮০ থেকে ১৬৯৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ষোল বছর-কাল ধবে সম্রাট কা'ং সি পশ্চিমাঞ্চলের মোঙ্গলরাজ গালাদানের বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধ

চালিয়ে অবশেষে তুর্কীস্থানের অধিকাংশ ভূখণ্ড অধিকার করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

তিব্বতে মাঞ্চু আধিপত্য স্থাপন

চতুর্দশ শতাব্দের শেষভাগে স কাপা নামে জনৈক ধর্মগুরু তিব্বতে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্মের সংস্কার করেছিলেন, যার ফলে পূর্বকার রক্তাম্বর পরিহিত 'লাল সম্প্রদায়ে'র স্থলে গেরুয়াধারী 'হলদে সম্প্রদায়' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 'হলদে সম্প্রদায়ে'র ব্রত ছিল আজীবন ব্রহ্মচর্য ও আচারনিষ্ঠা। যথাকালে এই নব সম্প্রদায়ের শীর্ষদেশে দুইটি ধর্মগুরুর আবির্ভাব হয়েছিল, একজন দালাই লামা, অপরটি পাঞ্চ-আন লামা। মৃত্যুর পর তাঁরাই পুনর্জন্ম গ্রহণ করে তাঁদের পূর্বস্থান অধিকার করেন, বোধিসত্ত্ব, অবলোকিতেশ্বর ও অমিতাভ বুদ্ধের অবতার তারা, এই ছিল 'হলদে সম্প্রদায়'ভুক্ত তিব্বতীদের বিশ্বাস। দুই লামার মধ্যে দালাই লামাই ছিলেন অধিকতর প্রতিষ্ঠাবান, তাঁর রাজধানী ছিল লাসা নগরে। মিং সম্রাটেরা দালাই লামাকে যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করতেন, মাঞ্চুরাও তাঁকে অশ্রদ্ধা করেন নি। ইতিপূর্বে ১৬৫২ অব্দে দালাই লামা একবার পিকিং পরিদর্শনে গিয়েছিলেন, কিন্তু চীনের সঙ্গে তিব্বতের এই ঘনিষ্ঠতা সত্ত্বেও তিব্বত কখনো চীনের বশ্যতা স্বীকার করে নি। সম্রাট কা'ং সি এখন দালাই লামা ও তাঁর রাজ্যের ওপর আধিপত্য বিস্তার করবার উদ্যোগ করলেন। মোঙ্গলদের পশ্চিম শাখার 'এলিউথ' উপজাতিগণের প্রভাব ছিল 'লাল সম্প্রদায়ে'র ওপর, তারা ছিল সেই সম্প্রদায়ের সমর্থক। পক্ষান্তরে পূর্ব শাখার 'খালখাজ' নামক মোঙ্গল উপজাতির অনেক ব্যক্তিই 'হলদে সম্প্রদায়'ভুক্ত হয়েছিল। ফলে পশ্চিম ও পূর্ব শাখার মোঙ্গলদের পৃষ্ঠপোষকতা-পুষ্ট সম্প্রদায় দুটির মধ্যে গভীর মনোমালিন্য দেখা দিয়েছিল। ১৬৮৪ অব্দে কা'ং সি এই ব্যাপারে শান্তি স্থাপনের জন্য দালাই লামার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। মোঙ্গলদের পশ্চিম শাখার 'এলিউথ' উপজাতির প্রধান ছিলেন গালাদান, তিনি দালাই লামার সঙ্গে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি স্থাপন বিষয়ে পত্রালাপ শুরু করেছিলেন, এমন সময় গালাদানের মৃত্যু হওয়ায় সম্রাট কা'ং সি-র মধ্যস্থের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার পথ সুগম হয়ে এসেছিল। কিন্তু বাধা সৃষ্টি করল দালাই লামার একজন মন্ত্রীর

ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ, যার ফলে বিষয়টি আবার গুরুতরভাবে ঘোরালো হয়ে উঠেছিল। এই মন্ত্রী চীনের দক্ষিণ অঞ্চলের বিদ্রোহী অধিপতি উ সান-কুয়েই র সঙ্গে গোপন চক্রান্তে লিপ্ত আছেন, এই সন্দেহ করে সম্রাট কা'ং সি তিব্বতের মালভূমিতে নিজের প্রতিপত্তি দৃঢ করতে কৃতসংকল্প হলেন (১৭০০)। কিছুকালের মধ্যেই দালাই লামার উত্তরাধিকার নিয়ে বিবাদের সূত্রে তিব্বতে সম্রাটের প্রভুত্ব স্থাপনের সুযোগ উপস্থিত হয়েছিল। একজন দাবিদারের সমর্থক ছিল মোঙ্গলরা, তারা লাসা অধিকার করে মাঞ্চু পক্ষীয় ব্যক্তিদের হত্যা করল। তখন সম্রাট কা'ং সি অন্য একজন দাবিদারের পক্ষ সমর্থন করে তিব্বতে অভিযান প্রেরণ করলেন। যুদ্ধে সম্রাট-বাহিনীর জয়লাভ হল, বিজয়গর্বে তারা লাসায় প্রবেশ করল (১৭২০)। সম্রাট কর্তৃক সমর্থিত দাবিদারই হলেন তখন দালাই লামা, পিকিং থেকে দুজন উপদেষ্টা নিযুক্ত হল রাজকার্য পরিচালনায় লামাকে সাহায্য করবার জন্য, আর তিব্বতে মাঞ্চু বাহিনী প্রতিষ্ঠিত হল প্রতিরক্ষার জন্য। এমনিভাবে চীনের সঙ্গে তিব্বতের রাজনৈতিক গাঁটছড়া যেমন বাঁধা হয়ে গেল, তিব্বতও তখন চীনের সার্বভৌম কর্তৃত্বের আওতায় এসে পড়ল।

কা'ং সি-র সময়ে ইউরোপীয়ান বণিক ও পাদ্রী

মিং যুগ থেকেই চীন দেশে ইউরোপীয়ানদের সমাগম চলে আসছিল, মাঝে মাঝে তাদের অসংযত উচ্ছৃঙ্খল আচরণ কিরূপ আকার ধারণ করত, সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে। কা'ং সি তাদের প্রতি উপযুক্ত দৃঢতা প্রদর্শন করতে সংকোচ বোধ করেন নি। চীন দেশে তখন ম্যাকাও ছিল একমাত্র ইউরোপীয় অধিকৃত স্থান, কা'ং সি সেখানেও তাঁর সার্বভৌম প্রভুত্ব স্থাপন করেছিলেন। ইতিপূর্বে ওলন্দাজদের প্রতিনিধিরা যখন এসে উপস্থিত হয়েছিল, পিকিং দরবার তখন তাদের গ্রহণ করেছিল করদ রাজ্যের দূতরূপে। ওলন্দাজরা এখন সম্রাট কা'ং সি-কে কয়েকটি জাহাজ পাঠিয়ে ফরমোসা দ্বীপটি অধিকার করতে সাহায্য করেছিল। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দ থেকে রাশিয়া সাইবেরিয়ার 'টুণ্ড্রা' (tundra) ভূমিতে অগ্রসর হতে শুরু করেছিল, পিকিং-এ রুশদের আবির্ভাব হয়েছিল মিং শাসন-কালেই, এবং প্রথম মাঞ্চু সম্রাট শুন চি-র রাজত্বকালে রুশ দূত সহ বণিকের দল রাজধানীতে প্রেরিত

হয়েছিল। সম্রাট কা'ং সি-র সময়ে রুশ বণিক সম্প্রদায়ের ক্যারাভান আসতে আরম্ভ করেছিল। পশ্চিমাঞ্চলের মোঙ্গল উপজাতি এলিউথদের ওপর রুশ অগ্রগতির ক্রমবর্ধমান চাপ এসে পড়েছিল রাশিয়ার এই চাপই সেই মোঙ্গল শাখার সঙ্গে বিবাদের ব্যাপারে সম্রাট কা'ং সি-কে বিলক্ষণ সাহায্য করেছিল। কিন্তু সেই রুশরা যখন এসে দাঁড়াল আমুর নদীর তীরে চীনা শক্তির মুখোমুখি, তখন সীমানা নিয়ে উভয় পক্ষের বিবাদ-বিসংবাদ একরকম অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। চীন ও রাশিয়ার মধ্যে ছোট-খাট সংঘর্ষ ঘটল, কিন্তু রীতিমত যুদ্ধ বাধিয়ে বসতে কোন পক্ষেরই তেমন আগ্রহ ছিল না। ১৬৮৯ অব্দে নেরচিনস্ক্ (Nerchinsk) নামক স্থানে রাশিয়া ও চীনের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হল, কোন ইউরোপীয় শক্তির সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হওয়া চীনের পক্ষে এই প্রথম। এই সন্ধিপত্রে উভয় রাজ্যের সীমা নির্ধারণ করা হল, এবং তার ফলে প্রথমত রাশিয়ার দাবিকৃত কয়েকটি অঞ্চল চীন পেয়েছিল আর দ্বিতীয়ত দুই দেশের মধ্যে কিছু বাণিজ্যিক আদানপ্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু সন্ধিপত্রে আর একটি সর্ত ছিল এই যে, কোন রুশ বা চীনা যদি অপরের দেশে অপরাধ করে তা হলে তাকে নিজের দেশে পাঠানো হবে স্বজাতীয় বিচারকের কাছে বিচারের জন্য। এই স্বজাতীয় কর্তৃক বিচার-পদ্ধতিরই অদ্ভুত পরিণতি উনবিংশ শতাব্দীর 'একস্ট্রাটেরিটোরিয়ালিটি', যে বিধানের কল্যাণে বিদেশী শক্তিপুঞ্জ চীন দেশে আপন আয়ত্তাধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপনিবেশ গঠনে সমর্থ হয়েছিল। এই ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাটি প্রবর্তন করতে শক্তিপুঞ্জের বিলক্ষণ বলপ্রয়োগ করতে হয়েছিল, পক্ষান্তরে নেরচিনস্ক্-এর সন্ধিপত্রের সর্তটি উভয় পক্ষ স্বাধীনভাবে স্বেচ্ছায় মেনে নিয়েছিল।

চীনে খৃস্টধর্ম প্রতিষ্ঠার একটি নূতন অধ্যায় উন্মুক্ত করেছিলেন কা'ং সি। তাঁর বাল্যকালে খৃস্টানদের ওপর জবর অত্যাচার হয়েছিল, সেই অত্যাচার তিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, মিং সাম্রাজ্যের পতনের পর পিকিং-এ জার্মান রোমান ক্যাথলিক পাদ্রী অ্যাডাম স্কল (Schall) পঞ্জিকা-প্রস্তুতকারীর গুরুত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করে মাঞ্চু সম্রাটকে সাহায্য করেছিলেন। শুধু পঞ্জিকা প্রস্তুত নয়, স্কল চীনাদের কামান নির্মাণ কাজেও শিক্ষাদান করেছিলেন। মাঞ্চু বিজয়কালে ফিলিপাইন থেকে

অনেক ফ্রানসিস্‌কান ও ডোমিনিকান সম্প্রদায়ের পাদ্রীর আগমন হয়েছিল, এবং সেই সময় থেকে তারা চীন দেশে বসবাস করছিল। সম্রাট কা'ং সি রোমান ক্যাথলিক জেস্থয়িটদের প্রতি ছিলেন অত্যন্ত বন্ধুভাবাপন্ন, ভার্বিয়েস্ট (Verbiest) নামক জনৈক বিদ্বান ফরাসী পাদ্রী এবং তাঁর সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিত ব্যক্তিরা সম্রাটের বিশেষ প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। বিদ্যানুরাগী সম্রাট এইসব ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কাছে বিজ্ঞান, অঙ্ক ও সংগীত-বিদ্যা শিক্ষা করতেন, তাঁরা জ্যোতির্গণনা ও সাম্রাজ্যের মানচিত্র প্রস্তুত প্রভৃতি সরকারী কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। পিকিং ও হ্যানচৌ-এ খৃস্টানদের উপাসনার জন্য গির্জা নির্মিত হয়েছিল, একটি পরোয়ানায় সম্রাট তাদের ধর্মাচরণ ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন (১৬৯২)। অষ্টাদশ শতাব্দের প্রারম্ভে চীন দেশে চীনা খৃস্টানদের সংখ্যা হয়েছিল দুই লক্ষেরও অধিক।

একটি খৃস্টীয় অনুষ্ঠান নিয়ে পাদ্রীদের মধ্যে বিতণ্ডা চলে আসছিল ১৬২৮ খৃস্টাব্দ অর্থাৎ মাঞ্চুদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব থেকে। বিতর্কের বিষয় ছিল দুইটি—প্রথমত, 'ঈশ্বর' শব্দটির চীনা প্রতিশব্দরূপে 'তিয়েন' বা 'স্বর্গ' বাক্যটির ব্যবহার চলে কি না, দ্বিতীয়ত, চীনা খৃস্টানদের পক্ষে কনফুসিয়াস অনুমোদিত পিতৃগণের পূজানুষ্ঠান বিধেয় কি না। এই বিতর্ক চলেছিল এক শতাব্দেরও অধিক কাল। জেস্থইটগণ 'তিয়েন' শব্দের ব্যবহার ও পিতৃপুরুষের তর্পণ, চীনাদের চিরাগত এই দুটি প্রথা নির্বিবাদে গ্রহণ করেছিল, কিন্তু অন্যান্য সম্প্রদায়ের খৃস্টানেরা ছিল চীনা প্রথা প্রত্যাখ্যান করবার পক্ষপাতী। রোমান ক্যাথলিক খৃস্টানদের বিভিন্ন শাখার মধ্যে এই বাগ্‌বিতণ্ডা যথেষ্ট তিক্ততার সৃষ্টি করেছিল, বিষয়টি যখন সম্রাটের কাছে উত্থাপন করা হল, তিনি তখন জেস্থইটদের সমর্থন করে প্রাচীন চীনা প্রথা রক্ষণের ব্যবস্থা করলেন। ইতিমধ্যে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু পোপ খৃস্টানদের ধর্মানুষ্ঠানে চীনা প্রথা দুটির কোন স্থান নেই এই নির্দেশ দিয়ে অনুশাসন পাঠিয়েছিলেন। সম্রাট ক্রুদ্ধ হলেন বিদেশী ধর্মগুরুর চীনা প্রথার বিরুদ্ধে অনুশাসন প্রেরণের স্পর্ধা ও ধৃষ্টতা দেখে, এবং তিনি এই আদেশ দিলেন যে পোপের নির্দেশ পালন করতে চায় যেসব মিশনারি দল তারা যেন অবিলম্বে চীন দেশ ত্যাগ করে (১৭১৬)। অনেকেই সম্রাটের অনুমতি নিয়ে চীনে অবস্থান করেছিল, তিনি তাদের ধর্মাচরণে বাধা দেন নি, কিন্তু অন্যান্য প্রজাদের

মতই বিদেশী পাদ্রী ও চীনা খৃস্টানের ওপর সম্রাটের আধিপত্য অক্ষুণ্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, এই সত্য তিনি তাদের স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে পেরেছিলেন।

আমরা দেখেছি সম্রাট কা'ং সি-র শাসন-কালে চীন সাম্রাজ্য দ্রুত বিস্তৃতির পথে এগিয়ে চলেছিল। কিন্তু শুধু সাম্রাজ্যের বিস্তার বা চীনের অভ্যন্তরে সার্বভৌম শক্তির প্রতিষ্ঠাই সম্রাটের একমাত্র কীর্তি নয়। প্রজাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধনে মনোযোগী হয়েছিলেন তিনি, সাহিত্যচর্চায় উৎসাহ দান করেছিলেন। ৪৪৪৩৯ বর্ণাক্ষরের একটি অভিধান প্রণয়ন করা হয়েছিল, সেই অভিধান আজও প্রামাণিক রূপে ব্যবহার করা হয়। ১৬২৮টি গ্রন্থের সমষ্টি 'তু স্থ চি চেং' নামক সুবৃহৎ বিশ্বকোষ ও আরও অনেক পুস্তক মুদ্রিত হয়েছিল, এবং এই মুদ্রণ-কাযের জন্য ২,৫০,০০০ তামার টাইপ ব্যবহারের উপযোগী একটি ছাপাখানা পতিষ্ঠিত হয়েছিল। সম্রাট ছিলেন শাস্ত্রানুরাগী, অধ্যয়ন-প্রিয়, তাঁর উদ্যোগে অনেক চীনা গ্রন্থ মাঞ্চু ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। প্রজাদের করভার লাঘব করেছিলেন তিনি, কর্মচারীদের সাধুতা রক্ষা ও দক্ষতা বৃদ্ধির দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল যথেষ্ট। রাস্তা নির্মাণ, খাল খনন প্রভৃতি অনেক জনকল্যাণ-কায অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এই প্রসঙ্গে পীত নদীর প্লাবন রোধ-কল্পে বাঁধ নির্মাণই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ কথা সত্য, মাঞ্চু প্রথা অনুসারে মাথায় লম্বা চুল রেখে বেণী বাঁধতে চীনাদের বাধ্য করা হয়েছিল, কিন্তু মেয়েদের পা বাঁধার চীনা কু-প্রথাকে* উচ্ছেদ করবার চেষ্টা করেছিলেন সম্রাট, তাঁর সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল।

---

* চীন দেশে মেয়েদের পা বাঁধার প্রথা কখন শুরু হয়েছিল ঠিক জানা নেই তবে কোন কোন পণ্ডিতের মতে এই প্রথার সূত্রপাত ঘটে লী হৌ চি র সময়ে (৯৭০ খৃঃ)। বাল্যকালে সাত বছর বয়সে মেয়ের পা দুটি এমন করে ব্যাণ্ডেজ করা হত যে চিরদিন পদদ্বয় যেন ছোটই থেকে যায়, আর বাড়তে না পারে। ছোট ছোট পা ফেলে গুটি গুটি চলাই নাকি নারীর সৌষ্ঠব বর্ধন করে। কোন মেয়ের পায়ের দিকে তাকানো এমন কি কোন রমণীর সামনে পা বা জুতো শব্দের উল্লেখ পর্যন্ত শালীনতাবিরুদ্ধ। পা বাঁধার ফলে উরু ও নিতম্বদেশের মাংস ও পেশীর নিটোল আকার কামোদ্দীপক হয়ে ওঠে, এ বিষয়ে লিন ইউটাং বলেন "The Chinese ladies have flabby muscles, an ideal consciously cultivated through the institution of footbinding which has other sex appeals" (*My Country and My People*—p 25), এই প্রথার তিরোধান বিপ্লবোত্তর কালের একটি শুভ পরিণতি।

১৭২২ খৃস্টাব্দে উনসত্তর বছর বয়সে কা'ং সি-র মৃত্যুর সঙ্গে চীনের ইতিহাসের একটি সুদীর্ঘ, শাসন-গৌরবে সমৃদ্ধ, পরমোজ্জ্বল রাজত্বকালেব অবসান ঘটে।

ইয়াং চেং (১৭২৩-১৭৩৫)

সম্রাট কা'ং সি-র পুত্র ও পৌত্রগণের সংখ্যা ছিল শতাধিক, তাঁর মৃত্যুর পূর্ব থেকেই উত্তরাধিকার নিয়ে পুত্রদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়েছিল। বংশের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে কোন সুনির্দিষ্ট বিধান ছিল না, পুত্রদের পরস্পর প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করেছিলেন চতুর্থ পুত্র, সম্রাট কা'ং সি-র মৃত্যুর পব তিনিই সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই নূতন সম্রাটের রাজত্বকালের নাম, ইয়াং চেং। প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতাদেব প্রতি সদয় ব্যবহার করেন নি তিনি, অনেকেই তাঁবা কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। সম্রাট বিশেষ গুণী না হলেও পরিশ্রমী ছিলেন, অর্থনীতির সংস্কার এবং কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি অপসারণের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ধর্মের চর্চা, বিশেষত বৌদ্ধ চ্যা'ন যোগের সাধনা করতেন, কয়েকটি গ্রন্থও রচনা করেছিলেন। সন্দিগ্ধ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি, ষড়যন্ত্রকারী গুপ্ত সমিতি আবিষ্কাবের জন্য একটি গোয়েন্দা বিভাগ সৃষ্টি করেছিলেন। খৃস্টানদের তিনি সুনজরে দেখেন নি, যদিও পিকিং নগরে জেসুইটরা পূর্বের মতই রাজকার্যে নিযুক্ত ছিল। এইসব রাজকর্মচারী ছাড়া অন্যান্য খৃস্টান পাদ্রীদের বিতাড়িত করে তিনি প্রায় তিন লক্ষ ধর্মান্তরিত চীনা খৃস্টানদের ধর্মাচরণ ব্যাপাবে গুরুতর বাধাব সৃষ্টি করেছিলেন। শাসন-ব্যবস্থা অধিকতর কেন্দ্রীভূত হযেছিল, মিং-দের 'নেই কো' বা মহাকারণিক (Grand Secretariat)-এর স্থলে 'চুন চি চু' বা মহাসংসদ (Grand Council or Council of State)-এর প্রতিষ্ঠা সম্রাট ইয়া' চেং-এর একটি উল্লেখযোগ্য সংস্কার।*

বৈদেশিক ব্যাপারে অশান্তি দেখা দিয়েছিল। তাঁর পিতৃশত্রু পশ্চিমাঞ্চলের এলিউথগণ আবার সংগ্রাম শুরু করেছিল, সম্রাট তাদেব যুদ্ধে পরাজিত করলেন বটে, কিন্তু চূড়ান্তভাবে নয়। এলিউথদের চূড়ান্ত পরাজয় ঘটেছিল

* মাঞ্চুদের শাসন-ব্যবস্থার বর্ণনা পরবর্তী একটি অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

পরবর্তী সম্রাট চি'য়েন লুং-এর হাতে। ১৭২৭ খৃস্টাব্দে রুশদের সঙ্গে সম্রাট ইয়াং-চেং-এর 'কিয়াখ্‌টার সন্ধি' (Kiakhta) নামে একটি নূতন সন্ধি স্থাপিত হয়, সেই সন্ধিপত্রে উভয় সাম্রাজ্যের প্রত্যন্তের সীমানা পুনর্নির্ধারণ, বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ও পিকিং-এ স্থায়ীভাবে রুশ কূটনৈতিক দলের অবস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

চি'য়েন লুং (১৭৩৬-১৭৯৬)

পঞ্চাশ বছর বয়সে ইয়াং চেং-এর মৃত্যুর পর তাঁর পঁচিশ বছর বয়সের চতুর্থ পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সম্রাটের রাজত্বকালের নাম চি'য়েন লুং। তিনি ষাট বৎসর রাজত্বের পর সিংহাসন ত্যাগ করেন, কিন্তু মৃত্যুকাল পর্যন্ত (১৭৯৯) তাঁর শাসন-ক্ষমতা অক্ষুণ্ণই ছিল। পিতামহ কাং সি-র মতই তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ শাসক, পরিশ্রমী ও কর্মঠ। কবি, চিত্রশিল্পী, সুপণ্ডিত, সাহিত্যের ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক, ছত্রিশ হাজার গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে তিনি রাজপ্রাসাদের একটি সুন্দর গৃহে গ্রন্থাগার স্থাপন করেছিলেন। রম্যরচনা, শিল্প, স্থাপত্য, কারু-শিল্প, শ্রম-শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, শাসন-পদ্ধতি, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হয়েছিল। বস্তুত মাঞ্চু সাম্রাজ্য সমৃদ্ধির শিখরে উঠেছিল তাঁরই রাজত্বকালে, সমসাময়িক কালে চীনের মত সমৃদ্ধ জনবহুল দেশ জগতে ছিল না। কিন্তু ঐতিহাসিক সত্যের বিচারে আবার এ কথাও স্বীকার করতে হয় যে মাঞ্চুদের সৌভাগ্য-সূর্য ঢলে পড়তে শুরু করেছিল এই সম্রাটেরই রাজত্বের শেষভাগ থেকে।

চি'য়েন লুং-এর রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের আয়তন যেমন বিস্তৃত হয়েছিল, এমনটি চীনের ইতিহাসে পূর্বে কখনো হয় নি। প্রথমে এলিউথ নামক মোঙ্গলদের পশ্চিম শাখার উপজাতিকে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছিল। ওই মোঙ্গল শাখার দুই দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতাই সম্রাটকে তাদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের সুযোগ দান করেছিল। আমুরসানা নামক জনৈক মোঙ্গল নেতার পক্ষ সমর্থন করে সম্রাট তাকে মোঙ্গল রাজধানী কুলজা-য় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন, কিন্তু তাকে স্বাধীনভাবে ক্ষমতা পরিচালনা করতে দেওয়া হল না, সম্রাটের প্রতিনিধি শাসন-কার্য তত্ত্বাবধানের জন্য রাজধানীতে অবস্থান করতে লাগলেন। এই ব্যবস্থা মোঙ্গল আমুরসানা মেনে নেয় নি, সে বিদ্রোহ করল।

রাজধানীতে অবস্থিত চীনা সৈন্যরা নিহত হল, সম্রাট-প্রেরিত একদল বাহিনীও পরাজিত হল। এদিকে আবার পূর্ব মোঙ্গল শাখার খাল্‌খা-দের মধ্যেও অসন্তোষ জেগে উঠেছিল, তারা চিং-দের অধীনতা থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা করতে লাগল। এই বিষম আপদকালে সমগ্র মোঙ্গলিয়া যখন চীন সাম্রাজ্যের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল, সেই সময় চাও হুই নামে একজন মাঞ্চু সেনাপতির অদ্ভুত পরাক্রম দুর্যোগের মোড় ঘুরিয়ে অবস্থাটির আমূল পরিবর্তন করে দিয়েছিল। এলিউথ বাহিনীর হাজার হাজার সৈন্য যুদ্ধে নিহত হল, বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল অনেকের, শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে আমুরসানা সাইবেরিয়ায় পলায়ন করল। সম্রাট তখন মাঞ্চুরিয়া ও অন্যান্য স্থানের অধিবাসীদের মোঙ্গলিয়ার পরিত্যক্ত ভূমিতে বসবাসের জন্য পাঠিয়ে দিলেন।

এলিউথদের পরাজয়ের পর তারিম উপত্যকা জয়েব উদ্যোগ আবস্ত হল। কাশগর ও ইয়ারকান্দে রাজবংশীয় দুজন মুসলমান ভ্রাতা সম্রাট চি'য়েন লুং-এর বিরুদ্ধাচারী হয়ে উঠেছিল। সেনাপতি চাও হুই তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হলেন, এবং যদিও যুদ্ধের প্রথমভাগে বিশেষ সাফল্য লাভ করেন নি, পরিশেষে কিন্তু তিনি কাশগর, ইয়াবকান্দ ও খোটান অধিকারান্তে স্থানীয় বিদ্রোহী বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করে পামিরে এসে উপনীত হয়েছিলেন। মধ্য এশিয়ার এই অধিকৃত রাজ্যে মাঞ্চু ও চীনাদেব, বিশেষত কানসু ও সেনসি প্রদেশের মুসলমানদের পাঠানো হয়েছিল স্থায়ীভাবে বাস কববার জন্য।

তিব্বতে অশান্তি দেখা দিয়েছিল। ১৭৫০ খৃস্টাব্দে তিব্বতীরা মাঞ্চু ও চীনাদের হত্যা করে। চি'য়েন লু' অচিরে সৈন্য পাঠিয়ে বিদ্রোহ দমন করেন। দালাই লামাকে তিব্বতের শাসন-ভার দেওয়া হল, কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক কার্য পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য পিকিং থেকে দুজন 'আমবান' বা প্রতিনিধি প্রেরিত হয়েছিল। ১৭৯১ খৃস্টাব্দে নেপালের গুর্খারা তিব্বতে পাঞ্চ-আন লামার বাসভূমি আক্রমণ করে। সম্রাট অবিলম্বে একটি চীনা বাহিনী তিব্বতে প্রেরণ করেন। সেই বাহিনী গুর্খাদের তিব্বত থেকে বিতাড়িত করে নেপালে প্রবেশ করেছিল। হিমালয়ের গগনস্পর্শী পর্বত-প্রাচীর অতিক্রম করে চীনা সৈন্যদের নেপালের রাজধানীর উপান্তে আগমন সামরিক কৃতিত্বে নেপোলিয়ানের আল্‌প্‌সের ওপর দিয়ে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বিজয়-

অভিযানের সঙ্গে তুলনীয়। গুর্খারা চীনের বশ্যতা স্বীকার করল, 'কর'দানেও সম্মত হয়েছিল (১৭৯২ খৃঃ)।

চীনের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসীরা মাঞ্চু শাসন কোন দিন অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করে নি, চি'য়েন লুং-এর পিতার আমলেও তারা বিলক্ষণ উপদ্রব সৃষ্টি করেছিল। সম্রাট ইয়াং চেং-এর জনৈক প্রতিনিধি চীনাদের নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে স্থানীয় প্রথানুযায়ী ব্যবস্থা বাতিল করে সম্রাটের শাসন প্রবর্তন করলেন, কিন্তু অধিবাসীরা এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করল। সেই সংগ্রাম চি'য়েন লুং-এর সময়েও চলেছিল, এবং দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর বিদ্রোহ দমিত হয়েছিল। এদিকে সীমান্ত নিয়ে বর্মার সঙ্গেও বিরোধ উপস্থিত হয়েছিল, এই দুই রাজ্যের মধ্যবর্তী সীমারেখা কোনদিন চূড়ান্তভাবে নির্দিষ্ট হয় নি। চার বৎসর-কাল (১৭৬৫-১৭৬৯) বিবাদ চলবার পর বর্মা চীনের ইউনান প্রদেশ আক্রমণ করল, চীনও অমনি দুইটি অভিযান ব্রহ্মের অভ্যন্তরে পাঠিয়ে দিল। জয়-পরাজয় চূড়ান্ত হয় নি, চীন-সম্রাটকে ব্রহ্মের বশ্যতার স্বীকারোক্তি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। আনামে তখন গৃহ-বিবাদ চলছিল, সেই বিবাদের রন্ধ্রপথে চি'য়েন লুং সেখানে প্রবেশলাভের সুযোগ পেয়েছিলেন কোন একটি পক্ষের সমর্থন করে। ফলে আনামের শাসকদেরও চীনে 'কর' প্রেরণ করতে হয়েছিল।

বৈদেশিকদের ব্যাপারে চি'য়েন লুং দৃঢ়তা অবলম্বন করেছিলেন তাঁর পূর্বসূরিদেরই মত। বিদেশী বাণিজ্য ক্যান্টনে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল, সেখানে ইংরেজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, পর্তুগীজ ও আমেরিকানগণ ব্যবসা চালাত। ১৭৫৯ সালে ফ্লিণ্ট নামে জনৈক ইংরেজ সম্রাটের কাছে একখানা আবেদনপত্র প্রেরণ করেছিলেন, পত্রে ব্যবসার সুনিয়ন্ত্রণ ও কর্মচারীদের অন্যায়মত অর্থ আদায় নিষিদ্ধ করবার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছিল। এই নিতান্ত সংগত প্রার্থনাকেও বেয়াদবি বলে ধরা হল, এবং এই কল্পিত অপরাধের জন্য ফ্লিণ্ট চীন থেকে বহিষ্কৃত হলেন, চীনা আবেদন লেখকের প্রাণদণ্ড হল আর সেই সঙ্গে চীনা বাণিজ্য-পরিদর্শকেরও চাকরি গেল। পূর্বে নেরচিনস্ক্ সন্ধির উল্লেখ করা হয়েছে, সেই সন্ধির পর রাশিয়ার সঙ্গে চীনের আরও দুটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল ১৭৬৮ ও ১৭৯২ অব্দে, সন্ধির বিষয় ছিল বাণিজ্যিক আদান-প্রদান আর পলাতক অপরাধীদের বিচারের জন্য নিজ দেশের কর্তৃপক্ষের হস্তে

তাদের সমর্পণের ব্যবস্থা (Extradiction)। সন্ধিসূত্রে রাশিযা বাণিজ্যের প্রায় কোন সুবিধাই লাভ করে নি, বস্তুত বিদেশী বাণিজ্যের ক্ষেত্র যথাসম্ভব সংকুচিত করে রাখাই ছিল সম্রাট চি'যেন লুং-এর নীতি।

'ম্যাকার্টনি মিশন'

সম্রাটের পররাষ্ট্র-নীতির হাস্যাস্পদ পবাকাষ্ঠা দেখা গিযেছিল 'ম্যাকার্টনি মিশন' ঘটিত একটি ব্যাপাবে। ১৭৯৩ সালে লর্ড ম্যাকার্টনি নামে একজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয জর্জ কর্তৃক চীন-সম্রাটের কাছে লিখিত একখানা পত্র নিযে পিকিং দরবাবে এসেছিলেন। উদ্দেশ্য, চীনে বৈদেশিক বাণিজ্যেব সুবিধা-সুযোগের জন্য আবেদন। জাঁকজমক সহকাবে নৌকা, শকট প্রভৃতি যানবাহনে ম্যাকার্টনিকে তিযেনসিন থেকে পিকিং-এ নিয়ে যাওযা হযেছিল, এই শোভাযাত্রার পুরোভাগে নিশানে লেখা ছিল, "ইংলণ্ডেব করবাহী রাজদূত। ম্যাকার্টনির আপ্যাযনে ত্রুটি হয নি, দুই পক্ষেব উপহার বিনিমযও হযেছিল, কিন্তু ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয জর্জের পত্রের যে অদ্ভুত জবাব দিযেছিলেন সম্রাট চি'যেন লুং তার তুলনা বোধ করি ইতিহাসে কোন স্বাধীন নৃপতিদ্বযের পত্র ব্যবহাবেব মধ্যে একেবারেই পাওযা যায না। চি'যেন লুং লিখেছিলেন নিম্নোদ্ধৃত এই পত্রখানা :

"হে রাজন, তোমার বাস অতি দূর দেশে, মাঝে অনেক সমুদ্র। এই দুস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও আমাদের সভ্যতাব সংস্পর্শে উপকৃত হবার জন্য বিনযনম্র আগ্রহে তুমি আমার কাছে সম্ভ্রমপূর্ণ নিবেদনপত্র সহ মিশন প্রেরণ করেছ, সেই পত্রেব প্রতি ছত্রে যে সশ্রদ্ধ বিনয় প্রকাশ পেযেছে তা সত্যই প্রশংসার্হ।

"সুবিস্তীর্ণ ভূমণ্ডলের অধিপতি আমি, আমার একমাত্র লক্ষ্য সুশাসন ও রাষ্ট্রীয় কর্তব্য পালন। বিচিত্র বা মহার্ঘ পণ্যদ্রব্যের প্রতি আমাব আকর্ষণ নেই, তোমার দেশে উৎপন্ন বস্তুব কোন প্রয়োজনই আমি অনুভব করি না। হে রাজন, আমার মনোভাবের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হওয়া, এবং ভবিষ্যতে আমার প্রতি আরও অধিক ভক্তি ও আনুগত্য প্রদর্শন করা তোমার একান্ত কর্তব্য, কেননা আমাদের সিংহাসন

সমীপে চিরবশ্যতা নিবেদন দ্বারাই তোমার দেশের শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা।

"কম্পমান হয়ে আমার এই আদেশ পালন কর, যেন অবহেলা না হয়।"

এই দুর্বিনীত ঔদ্ধত্যপূর্ণ পত্রে মূঢ় আত্মপ্রত্যয়, এবং তার সঙ্গে ইংরেজের জগৎ-জোড়া ক্রমবর্ধমান প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে কিরূপ গভীর অজ্ঞতা পরিব্যক্ত হয়েছে, সে কথা বিবেচনা করলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। সত্তর বৎসরের মধ্যেই ইংলণ্ড ও ফরাসীর হাতে অসহনীয় লাঞ্ছনা ভোগ করে চীনের সকল গর্ব ধূলিসাৎ হয়েছিল। বিদেশী রাষ্ট্রের প্রতি চীনের গর্বিত উপেক্ষা প্রদর্শন ট্যাং বংশীদের রাজত্বকালে হয়তো বা তেমন দূষণীয় ছিল না, কেননা সে যুগে মর্যাদায় ও পরাক্রমে জগতের কোন জাতিই চীনের সমান হতে পারে নি। কিন্তু ট্যাং সম্রাটদের প্রগতিশীল শাসনাধীনে চীন ছিল গ্রহিষ্ণু, বিদেশীদের এবং বিদেশ-জাত দ্রব্যাদি সাদরে গ্রহণ করত। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রতি মাঞ্চুদের ছিল অপরিসীম ঘৃণা, তারা যে সেই সভ্যতা শুধু উপেক্ষাই করেছে তা নয়, পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান অর্জনে বাধা দিয়ে চীনাদের মন নীরন্ধ্র অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। জনসাধারণকে বিদেশী সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখবার জন্য ইউরোপীয় বাণিজ্য ক্যানটনের সীমা-মধ্যে আবদ্ধ করা হয়েছিল।

চি'য়েন লুং তাঁর পিতা-পিতামহের মত রোমান ক্যাথলিকদের ধর্ম প্রচার বিষয়ে প্রশ্রয়দানে বিমুখ ছিলেন বটে, কিন্তু বিদেশী খৃস্টানরা তখনো বিবিধ রাজকার্যে নিযুক্ত ছিল, জ্যোতির্গণনা, ইউরোপীয় ধরনে চিত্রাঙ্কন ও গৃহনির্মাণ ছিল তাদের বিশেষ কর্ম। তারা নানান স্থানে ছড়িয়ে ছিল, নিষেধ সত্ত্বেও ধর্মপ্রচার করত, কর্তৃপক্ষ সক্রিয়ভাবে তাদের এই প্রচার-কার্যে বাধা দান করেন নি। কিন্তু খৃস্টানদের মধ্যে তখন একটি বিপর্যয় বেধে গিয়েছিল। ১৭৭৩ খৃস্টাব্দে পোপ জেস্যুইটদের ক্যাথলিক সমাজ থেকে বহিষ্কৃত করেন। চীনে অধিকাংশ পাদ্রীই ছিলেন জেস্যুইট সম্প্রদায়ের, পর্তুগাল, স্পেন ও ফরাসী দেশসমূহ থেকে বিতাড়িত হয়েছিল জেস্যুইটরা, এবং চীনে তাদের অবস্থানের বাধা না থাকলেও তাদের প্রতিপত্তি বিশেষভাবেই ক্ষুণ্ণ হয়েছিল।

সম্রাট কা'ং সি চীন দেশে সমৃদ্ধির যে বিরাট সৌধটি নির্মাণ করে গিয়েছিলেন তার বাইরের জাঁকজমক, চাকচিক্য, ঠাট সবই নিখুঁতভাবে বজায় রেখেছিলেন চি'য়েন লুং, এমন কি সমৃদ্ধির সংবর্ধনও করেছিলেন অনেকখানি, কিন্তু এই বহিরাবরণের তলদেশে গভীর অসন্তোষ বিরাজ করছিল, এবং সেই অসন্তোষের ফলে কয়েকটি ষড়যন্ত্রকারী গুপ্ত সমিতিও গঠিত হয়েছিল। চি'য়েন লুং সর্বপ্রকার রাজদ্রোহিতার কার্য দমনে কৃতসংকল্প হলেন, রাজদ্রোহমূলক পুস্তিকা প্রচার বন্ধ করলেন। কিন্তু তাঁর এই নির্যাতন সত্ত্বেও 'পাই লেন চিয়াও' বা 'শ্বেতপদ্ম' ও 'পা কুয়া' বা 'অষ্ট ত্রিগ্রাম' নামক দুটি গুপ্ত সমিতির পরিচালনায় দুবার বিদ্রোহ জেগে উঠেছিল। তা ছাড়া, কোকোনোরে মুসলমানেরা এবং ফরমোসার অধিবাসীরাও বিদ্রোহ করেছিল। এইসব বিদ্রোহ ঘটেছিল সম্রাটের রাজত্বের শেষভাগে, তিনি তখন অতিবৃদ্ধ ও ভগ্ন-স্বাস্থ্য হয়ে পড়েছিলেন।

১৭৯৬ খৃস্টাব্দে চি'য়েন লুং সিংহাসন পরিত্যাগ করেন। ১৫০ বছর ধরে বিরাজিত শান্তি ও নিরাপত্তার মধ্যে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল, আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছিল এবং সংস্কৃতিও বিলক্ষণ পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিল। নগরের সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে চীনের জনসংখ্যা স্ফীত হয়ে ত্রিশ কোটির অঙ্কে পৌঁছেছিল (তদানীন্তন আদমসুমারির এই সংখ্যা সঠিক না হলেও মোটামুটিভাবে নির্ভরযোগ্য), তা ছাড়া অধীনস্থ দেশসমূহের কোটি কোটি অধিবাসী সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেছিল। এই প্রসঙ্গে সুই ও ট্যা'ং যুগ থেকে আরম্ভ করে মাঞ্চুদের কাল পর্যন্ত সরকারী আদমসুমারি অনুসারে চীন দেশের জনসংখ্যার একটি তুলনামূলক পরিসংখ্যান নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল :

সুই ও ট্যা'ং বংশ

	পরিবারের সংখ্যা	জনসংখ্যা
সুই :		
৬০৯ খৃঃ	৮৯,০৭,৫৩৬	৪,৬০,১৯,৯৫৬
ট্যা'ং :		
৭২৬ খৃঃ	৭০,৬৯,৫৬৫	৪,১৪,১৯,৭১২
৭৪০ খৃঃ	৮৪,১২,৮৭১	৪,৮১,৪৩,৬০৯
৭৫৪ খৃঃ	৯০,৬৯,১৫৪	৫,২৮,৮০,৪৮৮

আন-লু-সান-এর বিদ্রোহের পর

	পরিবারের সংখ্যা	জনসংখ্যা
৭৬৪ খৃঃ	২৯,০০,০০০	১,৬৯,০০,০০০
৭৮০ খৃঃ	৩০,৮০,০০০	উল্লেখ নাই
৮৩৯ খৃঃ	৫৯,৯৬,৭৫২	”
৮৪৫ খৃঃ	৪৯,৫৫,১৫১	”
ইউয়ান বংশ		
১২৯০ খৃঃ		৫,৮৮,৩৪,৭১০
মিং বংশ		
১৩৯১ খৃঃ		৫,৬৭,৭৪,৫৬১
১৫৭৮ খৃঃ		৬,৩৫,৯৯,৫৪১
চিং (মাঞ্চু) বংশ		
১৬৬১ খৃঃ		১০,৮৩,০০,০০০

বিপুল জনসংখ্যা ও আর্থিক সমৃদ্ধি সত্ত্বেও চি'য়েন লুং-এর রাজত্বের শেষ-ভাগ থেকে সাম্রাজ্যের গৌরব মধ্যাহ্নশিখর ছেড়ে ধীরে ধীরে নামতে শুরু করেছিল। রাজ্যের সর্বত্র দুর্নীতির ঘুণ ধরেছিল। সম্রাটের বার্ধক্যকালে ক্ষমতা পরিচালনা করত হো-সেন নামে জনৈক নীচবংশীয় মাঞ্চু, তার দুর্নীতি ও উৎপীড়ন প্রজাদের জর্জরিত করে তুলেছিল।

চিয়া চিং (১৭৯৬-১৮২০)

চি'য়েন লুং-এর পর তাঁর পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন, এই সম্রাটের রাজত্বকালীন নাম চিয়া চিং। তখন মাঞ্চু বংশের পতনের সূত্রপাত হলেও রাজশক্তিকে পরবর্তী কালের মত কোন ভয়ংকর বিপদের সামনে দাঁড়াতে হয় নি। পিতার মৃত্যুর (১৭৯৯) অব্যবহিত পরেই চিয়া চিং পিতার প্রিয়পাত্র দুর্নীতিপরায়ণ হো-সেন-কে ক্ষমতাচ্যুত করে তার অন্যায়লব্ধ অপরিসীম বিত্ত সরকারে বাজেয়াপ্ত করলেন, হো-সেন-কে আত্মহত্যা করবার অনুমতি দিয়ে প্রাণদণ্ডের কলঙ্ক থেকে অব্যাহতি দিলেন। চীন দেশে 'গুপ্ত সমিতি' একটি

প্রাচীন প্রতিষ্ঠান, পিতার আমল থেকেই কতগুলি ষড়যন্ত্রকারী গুপ্ত সমিতির ক্রিয়াকলাপ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে তুলেছিল, চিয়া চিং এই সমিতিগুলিকে দৃঢ় হস্তে দমন করলেন। 'শ্বেতপদ্ম' সমিতির কথা পূর্বে বলা হয়েছে, এই সমিতিকে উচ্ছেদ করতে দীর্ঘকাল লেগেছিল। ষড়যন্ত্রের সন্দেহে বিশ হাজারেরও অধিকসংখ্যক ব্যক্তির প্রাণনাশ করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল নির্দোষ। নির্যাতনকারী রাজকর্মচারীরা শুধু অর্থাগমের সুযোগ-সুবিধার সন্ধানে রত ছিল, আর সম্রাট মত্ত ছিলেন ইন্দ্রিয়-সুখ, ব্যসন-বিলাস নিয়ে। পিতা বা বৃদ্ধ পিতামহের যোগ্যতা তাঁর ছিল না, চেষ্টা করেও তিনি দরবারের ব্যয় হ্রাস করতে পারেন নি। হো-সেন-এর অপসারণ সত্ত্বেও তিনি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন নি, বারবার বিদ্রোহ মাথা তুলেছিল, এবং একবার সম্রাটকে হত্যার চক্রান্ত প্রায় সফল হয়েছিল আর কি!

রবার্ট মণ্টগোমারি ও লর্ড আমহার্স্ট

বিদেশী ইউরোপীয়দের প্রতি আচরণে সম্রাট তাঁর পিতার চেয়েও কঠোরতর নীতির অনুসরণ করেছিলেন। রোমান ক্যাথলিক পাদ্রীরা পাছে গোপনে রাজদ্রোহের উৎসাহ দান করে, এই আশঙ্কায় তিনি তাদের নানারূপে নির্যাতন করেছিলেন। অবশ্য এ কথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে ভাবীকালের অনেক অনর্থের বীজ বপন করেছিল এইসব বিদেশী ধর্মযাজকগণ, তারা ছিল পাশ্চাত্ত্য সাম্রাজ্যবাদী অভিযানের অগ্রদূত। ১৮০৭ খৃস্টাব্দে রবার্ট মণ্টগোমারি নামে একজন প্রোটেস্টাণ্ট পাদ্রী লণ্ডন মিশনারি সোসাইটি কর্তৃক ধর্মপ্রচারার্থ চীনে প্রেরিত হয়েছিলেন। ধর্মপ্রচারের অনুমতি তিনি পান নি, তা সত্ত্বেও চীন দেশে দীর্ঘকাল অবস্থান করে বিলক্ষণ অধ্যবসায় সহকারে ভাষা শিক্ষা করেন, এবং একটি অভিধান রচনা ও বাইবেলের অনুবাদ-কার্যে তাঁর অসাধারণ মেধা নিয়োজিত করেছিলেন।

১৮১৬ খৃস্টাব্দে লর্ড আমহার্স্ট ইংলণ্ডের স্বার্থের অনুকূলে বাণিজ্যিক বিষয়সমূহের সুব্যবস্থা সম্পাদন ও ব্যবসা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে পিকিং-এ প্রেরিত হন, এবং এই উপলক্ষে একটুখানি গোলযোগেরও সূত্রপাত হয়। চীন-সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎকামী সকল বিদেশীকেই করদ রাজ্যের রাজদূত বলে মনে করা হত, এবং সেজন্য রাজ-দরবারে দেশী প্রথামত বিদেশীকেও অবনত মস্তকে

সম্রাটের সম্মুখে হামাগুড়ি দিয়ে অগ্রসর হয়ে আনুগত্য প্রকাশ করতে হত। মাটিতে মাথা ঠুকতে ঠুকতে হামাগুড়ি দিয়ে দরবারে প্রবেশ করবার প্রথাটির নাম 'কাউটাউ' ('Kowtow'), শব্দটির অর্থ 'মাথা ঠোকা'। লর্ড আমহার্স্ট 'কাউটাউ' করে ইংলণ্ডের রাজাকে চীন-সম্রাটের অধীনস্থ রাজা বলে মেনে নিতে অস্বীকার করলেন। তখন তাকে ব্যর্থমনোরথ হয়েই চীন দেশ থেকে ফিরে যেতে হয়। ইতিপূর্বে ১৮০৬ খৃস্টাব্দে রাশিয়ার রাজদূতও সম্রাটের কাছে 'কাউটাউ' করে অপদস্থ হতে অস্বীকার করেছিলেন, সেজন্য তাকেও রিক্তহস্তে বিদায় নিতে হয়েছিল।

২. দ্বিতীয় পর্যায় : বিদেশী শক্তির সঙ্গে সংঘর্ষের কাহিনী

চীন দেশে বিদেশীদের আগমন স্মরণাতীত কাল থেকে চলে এসেছে। বৌদ্ধ শ্রমণ ও শিল্পী, নেস্টোরীয় ও জ্যাকোবাইট খৃস্টান, আরব ও ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ, এমন কি পূর্ব ইউরোপের অধিবাসীরাও দলে দলে চীনে এসে কার্যোপলক্ষে বসবাস করেছে। চীনা সম্রাট তাদের সাদরে আশ্রয় দিয়েছেন, চীনাদের সঙ্গে এইসব আগন্তুকদের সম্পর্ক ছিল সৌহার্দ্যপূর্ণ। ষোড়শ শতাব্দে পর্তুগীজদের আগমনের পর থেকে সেই প্রীতির সম্বন্ধ বদলে গিয়ে কিরূপে চীনাদের মন ইউরোপীয়দের প্রতি গভীর ঘৃণা-বিদ্বেষে ভরে উঠেছিল তার বিস্তারিত ইতিহাস আমরা ইতিপূর্বে দিয়েছি। মিং সাম্রাজ্যের অবসানে বিদেশী মাঞ্চুরা প্রথম থেকেই ইউরোপীয়ানদের সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে আরম্ভ করেছিল, তার কারণ এই যে মাঞ্চু অভিযানের বিরুদ্ধে তারা মিং-দের সাহায্য করেছিল। কিন্তু ইউরোপীয় পাদ্রীরা ছিল জ্যোতির্গণনা, অঙ্ক প্রভৃতি বিদ্যায় পারদর্শী এবং কামান প্রস্তুত বিষয়ে সুদক্ষ, তা ছাড়া বিদেশী বাণিজ্যে রূপোর পরিবর্তে রেশম, চা ও পর্সিলেন রপ্তানি চীনের পক্ষে ছিল বিশেষ লাভজনক, এইসব কারণে চীনাদের, বিশেষত মাঞ্চু শাসকবৃন্দের বিরাগভাজন হওয়া সত্ত্বেও ইউরোপীয়গণের অবস্থিতি বরদাস্ত করা হয়েছিল। কিন্তু বিগতকালে ইউরোপীয়রা বাণিজ্য-ক্ষেত্রে যেটুকু সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত, চুয়াং-চৌ, আময় ও লিং-পো প্রভৃতি বন্দরে বিদেশী জাহাজের আগমন বন্ধ করে সেই সুযোগ-সুবিধারও অনেকখানি সংকুচিত করা হয়েছিল। এখন পর্তুগীজ-

অধিকৃত ম্যাকাও ছাড়া ক্যানটনই ছিল একমাত্র বন্দর যেখানে ইউরোপীয় বণিকদের ব্যবসা চালাতে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। ক্যানটন চীনের দক্ষিণ অংশে অবস্থিত, বিদেশে রপ্তানির রেশম প্রভৃতি পণ্য উত্তরাংশের অনেক দূর দেশ থেকে ক্যানটনে আনতে হত, যদিও সমুদ্রের উপকূলে কয়েকটি বন্দর ছিল সেইসব স্থানের সমীপবর্তী। সেই বন্দরগুলি থেকে পণ্যদ্রব্য চীনা জাহাজে ক্যানটনে আনা ছিল নিষিদ্ধ, সুতরাং খালপথে নৌকাযোগে বা স্থলপথে অন্য উপায়ে মালবহন ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। এই ধরনের নানান বাণিজ্যিক অসুবিধা দূর করবার অভিপ্রায়ে আরও কয়েকটি বন্দরে ব্যবসা চালাবার অনুমতি বিদেশী বণিকেরা বারবার প্রার্থনা করেও পায় নি। বিদেশী ব্যবসার কল্যাণে ক্যানটন নগর প্রভূত ধনশালী হয়ে উঠেছিল, সেজন্য অন্যান্য বন্দরে বিদেশী ব্যবসার সম্প্রসারণ ক্যানটনের চীনা বণিকদের স্বার্থের অনুকূল ছিল না। কিন্তু এই বণিক সম্প্রদায়ের স্বার্থই শুধু মাঞ্চু সম্রাটকে বাণিজ্য-ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ বিষয়ে অনুমতি দানে নিরস্ত করে নি, অন্য আরও কয়েকটি বিশেষ কারণ ছিল। চীনারা পরাধীন জাতি তাদের সঙ্গে বিদেশীদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ মাঞ্চু শাসকেরা বাঞ্ছনীয় মনে করে নি। মাঞ্চুদের ভয় ছিল, পাছে তাদের শাসনের বিরুদ্ধে বিদেশীরা চীনাদের উত্তেজিত করে তোলে, এবং এই ধরনের আশঙ্কা যে নিতান্ত অমূলক ছিল না, উনবিংশ শতাব্দের মধ্যভাগে তাই পিং বিদ্রোহই তার প্রমাণ। চীনাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মিলনের সুযোগ হতে বিদেশীদের বঞ্চিত করবার উদ্দেশ্যে বাণিজ্য-ক্ষেত্রের সংকোচ ছাড়াও আরও কয়েকটি ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিদেশীদের সঙ্গে ব্যবসা চালাবার অধিকার ছিল শুধু 'হং' নামে একটি ক্ষুদ্র চীনা বণিক সম্প্রদায়ের, 'হং' বণিকদের সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়, তারা বিদেশী বণিক ও জাহাজীদের সদাচারের জন্য দায়ী থাকত 'হোপো' এবং অন্যান্য রাজকর্মচারীদের কাছে। 'হোপো' ছিল বন্দরের মাঞ্চু শুল্ক পরিদর্শক, একচেটিয়া ব্যবসার জন্য 'হং' বণিকদের 'হোপো'কে প্রভূত অর্থদান করতে হত, আবার বিদেশী বণিকদের কাছ থেকেও নানান অছিলায় 'হোপো' ও অন্যান্য কর্মচারীরা যথেষ্ট অর্থ আদায় করত। উভয় দিক থেকে রাজপুরুষদের এরূপ শোষণ সত্ত্বেও বাণিজ্যের আদানপ্রদানে দেশী-বিদেশী উভয় শ্রেণীর বণিকেরা বিশেষ লাভবান হত, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

বিদেশীদের চীনা ভাষা শিক্ষা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, বিদেশীর সঙ্গে চীনার অন্তরঙ্গভাবে মিলনে বাধা সৃষ্টি করাই ছিল এই বিধানের উদ্দেশ্য। 'হং' বণিকদের সঙ্গে বাণিজ্যের কথাবার্তা চালাবার জন্য একটি অদ্ভুত ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল, এই ভাষার নাম 'পিজিন ইংলিশ' ('Pidgin English')। পর্তুগীজ ও ইংরেজি শব্দের অপভ্রংশ ও ক্যানটনি ব্যাকরণ নিয়ে এই ভাষা গড়ে উঠেছিল। চীনা ভাষা শিক্ষার নানান বাধানিষেধ সত্ত্বেও কতিপয় বিদেশী পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে নিষিদ্ধ ভাষার চর্চা করে সুপণ্ডিত হয়ে উঠেছিলেন। কালক্রমে নিষেধাজ্ঞাটি উঠে না গেলেও বিদেশীদের চীনা ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে কোন বিঘ্ন দেখা দেয় নি।

চীন সাম্রাজ্যের সঙ্গে প্রতীচ্য শক্তিপুঞ্জের সংঘর্ষের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল উপরোক্ত বাণিজ্যিক বাধানিষেধ, রাজকর্মচারীদের যথেচ্ছাচার, ব্যাপক দুর্নীতি ও বিদেশীর জাতীয় অবমাননা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রথম সংঘর্ষ বাধে ইংরেজের সঙ্গে ১৮৩৯ খৃস্টাব্দে, তার পূর্বে কোন প্রতীচ্য জাতির সঙ্গে চীনের মুখোমুখি যুদ্ধ হয় নি। অর্ধ শতাব্দীরও অধিক কাল জুড়ে এশিয়ায় ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের বিশেষত ইংরেজের সাম্রাজ্যবিস্তার প্রচেষ্টার কাহিনী স্মরণ করলে এই বিশেষ ক্ষণটিতে ইংরেজের এই চীনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হবার তাৎপর্য সহজেই উপলব্ধি হয়। অষ্টাদশ খৃস্টাব্দে ইংলণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের ফলে অতিরিক্ত শিল্পদ্রব্য বিদেশে চালান দিয়ে বিক্রয়ের সুবিধা খুঁজবার প্রয়োজন হয়েছিল, * এবং ইংরেজের এই উদ্যম ভারতবর্ষে বিশেষরূপে

* ১৭৬৫ খৃস্টাব্দে ওয়াট (Watt) বাষ্পচালিত ইঞ্জিন আবিষ্কার করেছিলেন, শিল্পায়নের ইতিহাসে এ সন বিশেষভাবে স্মরণীয়। ঊনবিংশ খৃস্টাব্দে ইংলণ্ডে শ্রমিকদের সংগঠন করে বড় বড় শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা ছাড়া নূতন নূতন যান্ত্রিক আবিষ্কার কায়িক শ্রমের অনেকটা লাঘব করেছিল। এই প্রসঙ্গে এইচ. জি. ওয়েলস্ বলেন "The machine and the employer now superseded his skill and he either became an employer of his fellows and grew towards wealth and equality with the other rich classes or he remained a worker and sank very rapidly to the level of a mere labourer This great change in human affairs is known as the Industrial Revolution Beginning in Great Britain it spread during the nineteenth century throughout the world" (*The Outline of History*—p 856)

সাফল্য লাভ করেছিল ইস্ট ইণ্ডিযা কোম্পানি কর্তৃক রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে। ওলন্দাজেরা ইন্দোনেশিয়ায অনুরূপভাবেই ঔপনিবেশিক রাজ্য স্থাপন করেছিল। ভারত বা ইন্দোনেশিযার মত চীন দেশে বিলাতী শিল্পজাত দ্রব্য চালানের তেমন কোন সুবিধা ঘটে নি, ইংলণ্ডেশ্বরকে লিখিত সমাট চি'যেন লুং-এর পত্রখানাই তার প্রমাণ। ঊনবিংশ শতাব্দের দ্বিতীয দশকে ইউরোপে নেপোলিযনকে যুদ্ধে পরাস্ত করে অপবাজেয সামবিক শক্তিরূপে ইংলণ্ড প্রাচ্য ভূখণ্ডে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হযে উঠেছিল, সমগ্র ভারতের ওপব একচ্ছত্র প্রভুত্ব বিস্তারেব পথে দ্রুত এগিযে চলেছিল। ইস্ট ইণ্ডিযা কোম্পানির দৌলতে চীন দেশেও ইংবেজের ব্যবসা-বাণিজ্য একচেটে হযে উঠেছিল। ভারতেব রাজন্যবর্গ সেবিত, বিশ্ববরেণ্য, মহাপবাক্রমশালী ইংবেজ, সেই ইংবেজের প্রতি চীনাদের দুর্ব্যবহাব নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই একটি মনস্তাত্বিক প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করেছিল। জ্ঞানবিজ্ঞানে পারদর্শী শক্তিমান ইংরেজ প্রাচ্যভূমিকে দেখত ঘৃণাপূর্ণ দাম্ভিক দৃষ্টিতে, প্রাচ্যের সংস্কৃতিকে মনে করত নিম্ন শ্রেণীর, ইংরেজের এই উদ্ধত আত্মাভিমান তাকে এমনি বিবেকবুদ্ধিহীন করে তুলেছিল যে যুদ্ধ বাধাবাব অছিলা নির্বাচনেও সে কাণ্ডজ্ঞানের পবিচয দিতে পারে নি। ১৮৩৯ খৃস্টাব্দেব প্রথম যুদ্ধেব কারণ, চীনে আফিং আমদানি নিষিদ্ধকরণ এবং ইংবেজদেব পাচার-করা আফিং বাজেয়াপ্তকবণ!

পূর্বে বিদেশী বণিকেরা রেশমের মূল্যস্বরূপ রৌপ্য প্রদান করত, ইতিমধ্যে ইস্ট ইণ্ডিযা কোম্পানি শুরু করে দিল ভারত থেকে চীনে আফিং আমদানির ব্যবসা। এই ব্যবসাটিকে নূতন বলা যায না, অনেক শ্রেষ্ঠ অবদানের পালা শেষ করে খৃষ্টীয পঞ্চদশ শতাব্দে ভারতবর্ষ আফিং-এর বিষভাণ্ড চীনে রপ্তানি করতে প্রথম শুরু করে। সেই থেকে রপ্তানি বরাবর চলে আসছিল, রপ্তানির পরিমাণ ছিল তখন অল্পই, ইংরেজ কোম্পানি কিন্তু আফিং চাষের সুবন্দোবস্ত আর উৎপন্ন আফিং অঢেল রপ্তানি করে অর্থ উপার্জনের সহজ সুন্দর পথ প্রস্তুত করলেন। পূর্বাঞ্চলে ওলন্দাজেরা ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধকস্বরূপ তামাকের সঙ্গে আফিং মিশিয়ে ধূমপান করত। আফিং-এর ধূমপান চীনারা শিখেছিল এই ওলন্দাজদের কাছ থেকে। মাঞ্চু সরকার চীনাদের এই আফিং সেবনের

কু-অভ্যাস বন্ধ করতে সংকল্প করলেন, চীনাদের নৈতিক হিতার্থে যত না হোক, রাষ্ট্রের আর্থিক অপচয়ের প্রতিবিধানের জন্য। ১৮০০ খৃস্টাব্দে আফিং আমদানি নিষেধ করে সরকারী আদেশ ঘোষণা করা হল, কিন্তু এই ব্যবসাটি ছিল অত্যন্ত লাভজনক, ইংরেজ বণিকেরা রাজকর্মচারীদের ঘুষ দিয়ে বেআইনীভাবে আফিং পাচার কর্তে লাগল।

তাও কুয়াং (১৮২১-১৮৫১) : আফিং যুদ্ধ ও ন্যানকিং সন্ধি

এই সময় সম্রাট ছিলেন চিয়া চিং-এর পুত্র তাও কুয়াং। একদা তিনি রাজপ্রাসাদে ষড়যন্ত্রকারী আততায়ীদের কবল থেকে পিতাকে উদ্ধার করে বিলক্ষণ সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। তুর্কীস্থান ও ফরমোসায় বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল (১৮২৫), ইউনানে মিয়াও নামক আদিবাসীরাও বিদ্রোহ করেছিল, সকল বিদ্রোহই সম্রাট দৃঢ়হস্তে দমন করেছিলেন। কিন্তু তার সর্বশেষ শক্তিপরীক্ষা হয়েছিল আফিং পাচার নিয়ে ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে, সেই যুদ্ধের বিবরণ আমরা এখনি দেব।

ইতিমধ্যে ১৮৩৪ খৃস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চীনে কারবার চালাবার অনুমতির মেয়াদ ফুরিয়ে গিয়েছিল, এবং লর্ড নেপিয়ারকে রাষ্ট্রদূতরূপে ক্যানটনে পাঠানো সত্ত্বেও কোম্পানি ব্যবসায়ের নূতন অনুমতি লাভে সমর্থ হয় নি। লর্ড নেপিয়ারকে চীন ত্যাগ করবার আদেশ দেওয়া হল, কিন্তু সেই আদেশ পালনের কোন লক্ষণই যখন দেখা গেল না, তখন সম্রাটের প্রতিনিধি ইংরেজের ব্যবসা বন্ধ করে দিল এবং সেই সঙ্গে তাদের বাস-পল্লীটিও অবরোধ করল। সেখানে জিনিসপত্রের সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেল, এই অবস্থার মধ্যে রোগাক্রান্ত হয়ে লর্ড নেপিয়ারের মৃত্যু হয়। অবরোধ ও ব্যবসার বাধানিষেধ তখন প্রত্যাহৃত হল।

চীন সরকার আফিং পাচার বন্ধ করতে কৃতসংকল্প হয়েছিল, এবং সেই উদ্দেশ্যে লিন সে-সি নামে একজন সুযোগ্য কর্মচারীকে কমিশনার নিযুক্ত করে ক্যানটনে পাঠানো হল। লিন-এর প্রথম কর্ম হয়েছিল, সমস্ত মজুত আফিং তাঁর হাতে সমর্পণের জন্য বিদেশী বণিকদের ওপর আদেশ জারি। ইংরেজ কুঠিয়াল কাপ্তেন ইলিয়ট ও অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকেরা একযোগে লিন-এর আদেশ অমান্য করলেন। লিন বিদেশীদের কুঠিগুলি অবরোধ করে

খাদ্যের সরবরাহ বন্ধ করে দিলেন। বিদেশীদের তখন লিন-এর আদেশ পালন ছাড়া গত্যন্তর রইল না। বেআইনীভাবে আমদানি-করা বিশ হাজার বাক্স ভর্তি আফিং লিন-এর হাতে তুলে দিতে হল, তিনি সেই আফিং ধ্বংস করলেন। ভবিষ্যতে আফিং আমদানি আর যাতে সম্ভব না হয় সেজন্য কয়েকজন ইংরেজকে প্রতিভূ করা হয়েছিল। ইংরেজরা ক্যানটন ছেড়ে ম্যাকাও গেল, সেখান থেকে তাদের হংকং দ্বীপে আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

লিন-এর কঠোর ব্যবস্থা আপাতত ফলপ্রসূ হয়েছিল বটে, কিন্তু তার ভয়ংকর পরিণামের কথা তিনি কখনো স্বপ্নেও ভাবেন নি। ১৮৩৯ সালে হংকং-এর কাছে বৃটিশ ও চীনা নৌ বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ হয়। উভয় পক্ষের মধ্যে মাঝে মাঝে এরূপ নৌ যুদ্ধ এখন থেকে কয়েক বছর ধরে চলতে লাগল, আবার তারই ফাঁকে হত আপসের কথাবার্তা। বৃটিশ নৌ বহর ক্যানটন থেকে ইয়াংসি পর্যন্ত বন্দরসমূহের ওপর আক্রমণ চালাত। ১৮৪২ সালে চিংকিয়াং অধিকার করে ইংরেজেরা পিকিং-এর সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলের সংযোগ ছিন্ন করল। পরিশেষে ন্যানকিং এ ইংরেজ ও চীনা রাজশক্তির মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হল (১৮৪২)। সম্রাট তাও কুয়াং অত্যন্ত অনিচ্ছাভরে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন। সন্ধির প্রধান শর্তগুলি এইরূপ: (১) বিদেশীদের বসবাস ও বাণিজ্যের জন্য পাঁচটি বন্দর মুক্ত করা হল, এই পাঁচটি 'সন্ধি বন্দরে'র (Treaty Port) নাম ক্যানটন, সাংঘাই, আময়, নিংপো ও ফুচু , (২) নৌ-বহর ও বাণিজ্যের ঘাঁটি স্থাপনের জন্য ইংরেজকে হংক দ্বীপ প্রদান , (৩) চীনা রাজপুরুষের সমান মর্যাদা ইংরেজ কর্মচারীকে দান , (৪) আমদানি ও রপ্তানির ওপর 'ন্যায্য' ও বিধিমত শুল্কের তালিকা চীন সরকার কর্তৃক প্রস্তুত ও প্রকাশ , (৫) 'হং' বণিক প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তি , (৬) লিন কর্তৃক বিনষ্ট আফিং-এর মূল্য ও যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দান। বৃটিশ কর্তৃক চিংকিয়াং অধিকারের পর আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সুযোগ্য রাজকর্মচারী লিন আত্মহত্যা করেছিলেন।

সন্ধির শর্তমত মুক্ত পাঁচটি বন্দরে বাণিজ্য করবার সুযোগ থেকে অন্যান্য পশ্চিমী শক্তিরাও বঞ্চিত হয় নি। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের সঙ্গে অনুরূপ সুবিধা দানের মর্মে পৃথক সন্ধি হল, অধিকন্তু রোমান ক্যাথলিক

গির্জা স্থাপনের ও চীনাদের খৃস্টধর্ম গ্রহণের অনুমতিপত্রও ফ্রান্স সম্রাটের নিকট থেকে আদায় করল। ধর্ম সংক্রান্ত অধিকারগুলি সন্ধিসূত্রে প্রথমে রোমান ক্যাথলিকরা পেয়েছিল বটে, কিন্তু পরে সেইসব অধিকার প্রোটেস্টাণ্টদেরও দেওয়া হয়েছিল। বেলজিয়াম, সুইডেন, নরওয়ে ও রাশিয়া, সকলের সঙ্গেই বাণিজ্য বিষয়ক পৃথক সন্ধি হয়েছিল।

চীনে আফিং চালান বন্ধ হয় নি। ১৮৬০ খৃস্টাব্দের 'পিকিং সন্ধি'পত্রে আফিং আমদানি আইনমত বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল। আফিং সেবনের অনিষ্টকর পরিণামের বিষয় উল্লেখ করে স্বয়ং চীন-সম্রাট তদানীন্তন ইংলণ্ডের রানী ভিক্টোরিয়াকে ব্যক্তিগত পত্র লিখে আফিং চালান বন্ধ করবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু সেই পত্রের কোন জবাব পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। এই তো সেদিন চি'য়েন লুং পত্র লিখেছিলেন তৃতীয় জর্জকে, কি দম্ভদর্পিত আত্মাভিমানই না ফুটে উঠেছিল সেই পত্রে, আর আজ সেই সম্রাটেরই বংশধর সৌজন্য-মাখা মিনতি-ভরা একখানা আবেদনপত্র লিখে পাঠালেন রানী ভিক্টোরিয়ার কাছে! অদৃষ্টের পরিহাসই বটে!

এই যুদ্ধের 'আফিং যুদ্ধ' নামটি নিরর্থক নয়। চীনকে জোর করে আফিং গিলতে বাধ্য করা হয়েছিল। এমন একটি দুর্নীতিপূর্ণ ব্যাপারের সমর্থনে যুক্তিসংগত কারণের সন্ধান পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের একটি মনস্তাত্ত্বিক বিকারে পরিণত হয়েছে। এমন কথাও বলা হয় যে, আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামে যেমন বোস্টন বন্দরের চা, চীনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আফিংও তেমনি শুধু একটা উপলক্ষ! কথাটা অর্ধসত্য মাত্র। স্বাধীনতার জন্য আমেরিকার যুদ্ধ করবার যে নৈতিক অধিকার ছিল, চীনের সার্বভৌমত্বের ওপর হস্তক্ষেপ তেমনি কোন নীতিসম্মত কায বলে ইংরেজ নিশ্চয়ই দাবি করতে পারে না। ইংরেজকে ব্যবসার সুযোগ-সুবিধা দান করতে চীনের কোন নৈতিক বা আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা ছিল না। ভারতের অবস্থা লক্ষ্য করে দোর্দণ্ড-প্রতাপ ইংরেজের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে বিরোধে লিপ্ত হওয়া চীনের ঘোর নির্বুদ্ধিতার কায হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু এ কথা মনে করবার কারণ তার যথেষ্ট ছিল যে ইংরেজের অনুপ্রবেশ চীনকে ভবিষ্যতে বিষম বিপন্ন করে তুলতে পারে। ব্যবসার গরজ ইংরেজের, চীনের দুর্ব্যবহার সে যদি অপমানকর মনে করে অথবা তার শর্তমত ব্যবসা চালানো যদি তার পক্ষে

সম্ভবপর না হয় তবে তার চীন ছেড়ে চলে আসাই ছিল সংগত। যুদ্ধাবসানের পর ইংরেজ যখন দাবিকৃত সুযোগ-সুবিধা লাভ করল তখনো তারা অর্থলোভে চীনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আফিং আমদানি করে এমন একটি অপকর্ম করেছিল, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যা ইংরেজ জাতির দুরপনেয় কলঙ্কস্বরূপ হয়ে চিরকাল টিঁকে থাকবে।

‘এক্স্ট্রা-টেরিটোরিয়ালিটি’

ন্যানকিং সন্ধি ও অন্যান্য অনুমতিপত্র শুধু যে বিদেশী ব্যবসার পথ মুক্ত করেছিল তা নয়, বিপুল অনর্থের উৎস-মুখও খুলে দিয়েছিল, আর সেই অনর্থই বন্যার আকার ধারণ করে চীনের স্বাধীনতাকে ভাসিয়ে দেবার উপক্রম করেছিল। খৃস্টান মিশনারীদের ধর্ম প্রচারের যে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল, অনেক ক্ষেত্রে সেই স্বাধীনতার অপব্যবহার করতে তারা কিছুমাত্র ত্রুটি করে নি, এবং সেই সূত্রে চীনাদের সঙ্গে তাদের বিবাদ বাধত। বিদেশী সাম্রাজ্য-বাদীর পুরোধারূপেই চীন দেশে মিশনারীর আবির্ভাব হয়েছিল,* তাদের ঔদ্ধত্য বা অপকর্মের প্রতিবিধান করবার শক্তি চীন সরকারের ছিল না। বিদেশীরা একটি নূতন অধিকার লাভ করেছিল, তার নাম ‘এক্স্টাটেরি টোরিয়ালিটি’ (Extra-territoriality)। এই বিধানমত বিদেশীর শাসন ও বিচারের ভার ন্যস্ত ছিল তার স্বজাতীয়ের ওপর, চীনে বাস করেও বিদেশীরা ছিল চীনা রাজশক্তির আয়ত্তের বহির্ভূত। এই অদ্ভুত সাম্রাজ্যবাদী বিধানটি চীন দেশে প্রায় পঁচাত্তর বছর ধরে চলেছিল। বিদেশী মিশনারীরা এই বিধানের সুযোগ গ্রহণ করত, এমন কি ধর্মান্তরিত দেশীয় খৃস্টানরাও চীনা রাজশক্তির প্রভুত্ব অস্বীকার করতে ছাড়ে নি। মিশনারীদের ক্রিয়াকলাপের ফলে গ্রামের সঙ্গে গ্রামের বিরোধ বাধত, এবং তারই পরিণামরূপে যদি কোন মিশনারী উত্তেজিত জনতা কর্তৃক আক্রান্ত বা নিহত হত অমনি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিপুঞ্জ স্ব স্ব বাহিনী নিয়ে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হতেন শান্তিবিধানের জন্য। এমনি কয়েকটি ঘটনার পর দেখা গেল, উত্তেজিত চীনা জনতা কর্তৃক মিশনারী

* একজন ইংরেজ লেখক বলেছেন: ‘ First the missionary, then the gunboat, then the land-grabbing—that is the procession of events in the Chinese mind ”

নিধন পর্ব বিদেশীদের কাছে ব্যবসার চেয়েও লাভজনক, কেননা প্রতিবারই সেই ব্যাপারটিকে উপলক্ষ করে একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে তারা কিছু-না-কিছু নূতন সুবিধা আদায় করবার সুযোগ পেয়েছে।

সিয়েন ফেং (১৮৫১-১৮৬১)

সম্রাট তাও কুয়াং-এর মৃত্যুর পর তাঁর উনিশ বছর বয়সের পুত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। নূতন সম্রাটের রাজত্বকালীন নাম সিয়েন ফেং। কি বিদেশীদের সম্পর্কে, কি আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে পূর্ববর্তী সম্রাটের চেয়েও তিনি অধিকতর অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন, এবং রাজ্যের শেষভাগে একান্ত নিরুপায়ভাবেই বিলাস-ব্যসনে মগ্ন হয়েছিলেন। ১৮৬০ অব্দে ইংরেজ ও ফরাসী বাহিনী যখন পিকিং অভিমুখে অগ্রসর হল, তিনি তখন প্রাণভয়ে উত্তরাঞ্চলে জিহোলে পলায়ন করেন। তারপর তিনি বেশিদিন বাঁচেন নি, মাত্র এক বছর অন্তে সিংহাসনের উত্তরাধিকারীরূপে একটি পাঁচ বছরের পুত্র রেখে মারা যান।

'অ্যারো'-ঘটিত কাণ্ড

ন্যানকিং সন্ধির পর ১৮৫৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত দেশে রাজনৈতিক শান্তি বাহ্যত বিরাজ করলেও বিদেশীদের সঙ্গে চীনাদের বিবাদ-বিসংবাদ ক্রমাগত চলেছিল। ক্যানটনের বিদেশী এলাকার বিস্তৃতি প্রচেষ্টায় বাধা দিয়েছিল চীনারা, তাই নিয়ে দাঙ্গা খুন বিস্তর ঘটেছিল অন্য কয়েকটি বন্দরেও গোলমাল বেধেছিল। খনির ও কৃষির কাজের জন্য ক্যালিফরনিয়া, পেরু, কিউবা ও বৃটিশ গায়নায় চীনাদের কুলীরূপে চালান দেওয়া হত, এই চালান ব্যাপারে ইউরোপীয়রা নানা প্রকার অসাধুতা, জোর-জবরদস্তি, এমন কি প্রতারণার আশ্রয় নিতেও ছাড়ত না। এরূপ অবস্থায় চীনা ও ইউরোপীয়ানদের সংঘর্ষ বাধা নিতান্তই স্বাভাবিক, এবং এই সংঘর্ষের সামান্য একটা উপলক্ষও জুটেছিল। ১৮৫৬ খৃস্টাব্দে ক্যানটনের চীনা গভর্নর ইয়ের আদেশ অনুসারে বন্দরে ভিড়ানো 'অ্যারো' নামক একটি জাহাজ থেকে নাবিকদের গ্রেপ্তার করা হয় জলদস্যুতার অভিযোগে। জাহাজটির মালিক চীনা, অভিযুক্ত নাবিকরাও চীনা, কাপ্তেন ইংরেজ। জাহাজ হংকং-এ রেজিস্ট্রি করা হয়েছিল বটে, কিন্তু গ্রেপ্তারের সময়

রেজিষ্ট্রির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। মাস্তুলে উড্ডীয়মান বৃটিশ পতাকাটি চীনারা নামিয়ে দিয়েছিল, এবং তাদের এই কার্যে পতাকার অর্থাৎ বৃটিশ সার্বভৌমত্বের অবমাননা করা হয়েছে, এই অজুহাতে ইংরেজেরা চীনা কর্তৃপক্ষের কাছে কৈফিয়ত তলব করল। চীনারা কৈফিয়ত দিতে অস্বীকার করল, তখন ইংরেজ নৌ-বাহিনী ক্যানটনের উজান-পথের ধারে একটি দুর্গ দখল করে নিল। চীনে ইংরেজ কর্তৃপক্ষের এই আক্রমণাত্মক কার্যাবলী সম্বন্ধে বৃটিশ পার্লামেণ্টে বিরুদ্ধপক্ষ কর্তৃক উত্থাপিত বিতর্কের ফলে সরকারের পতন ঘটেছিল, কিন্তু পুনর্নির্বাচনে দেখা গেল, জনমত এই আক্রমণকেই সমর্থন করেছে!

'টিয়েনসিন সন্ধি'

চীনের কোন একটি স্থানে মিশনারী হত্যার অছিলায় ফ্রান্স যুদ্ধে যোগ দিল ইংরেজের সঙ্গে। আমেরিকা ও রাশিয়া অনুরুদ্ধ হয়েও যুদ্ধে যোগ দেয় নি, কিন্তু যুদ্ধের পর লুটের ভাগ গ্রহণ করতে ক্রটি করে নি। ভারতে তখন সিপাহী বিদ্রোহ চলছিল (১৮৫৭), সেজন্য চীন অভিযানে প্রেরিত বৃটিশ সৈন্য-বোঝাই জাহাজকে ভারতে আসতে হয়েছিল। ভারতের বিদ্রোহ দমন করে সৈন্যদের চীনে পৌছতে বিলম্ব হল। ১৮৫৮ অব্দে ইংরেজ ও ফরাসী বাহিনীর চীনের ওপর যৌথ আক্রমণ ঘটল। চীনের দক্ষিণাংশে তখন মাঞ্চু সম্রাটের বিরুদ্ধে একটি গণ-বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল, ইতিহাসে এই বিদ্রোহের নাম দেওয়া হয়েছে তা'ই পিং বিদ্রোহ। চীনা রাজশক্তি এই বিদ্রোহ নিয়ে বিব্রত থাকার দরুন ইংরেজ-ফরাসীর যৌথ আক্রমণে বাধা দান করতে সক্ষম হয় নি। ক্যানটন দখল করা হল এবং গবর্নর ইয়ে-কে বন্দী করে কলকাতায় পাঠানো হল। টিয়েনসিন-এর নিকটবর্তী তাকু নামক স্থানের দুর্গসমূহ অধিকার করে যৌথ বাহিনী যখন পিকিং-এর দিকে অগ্রসর হল, সম্রাটের তখন আর নতি স্বীকার না করে উপায় রইল না। চীন সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করল শুধু ইংরেজ ও ফরাসীর সঙ্গে নয়, রাশিয়া ও আমেরিকার সঙ্গেও সন্ধি করতে হল। এই সন্ধির নাম 'টিয়েনসিন সন্ধি' (১৮৫৮)। সন্ধির পরিণামস্বরূপ শুল্ক আদায়ের নূতন ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সেই ব্যবস্থামত বিদেশীদের কর্তৃত্বাধীনে 'সাম্রাজ্যিক সমুদ্র শুল্ক চাকরি'

(Imperial Maritime Customs Service) নামে একটি নূতন সার্ভিস সৃষ্টি করা হল। শুল্ক আদায় ব্যাপারে বিদেশীদের তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা চীনা সরকার স্বীকার করে নিয়েছিল, এবং এই ব্যবস্থাটি ক্রমশ সকল বন্দরেই অবলম্বন করা হয়েছিল। ১৮৬৩ অব্দে রবার্ট হার্ট নামে জনৈক আইরিশম্যান শুল্ক বিভাগের ইনস্পেক্টর-জেনারেল নিযুক্ত হন। তিনি ঐ কার্যে বহাল থাকেন মৃত্যুকাল পর্যন্ত (১৯১১)।

পাশ্চাত্ত্য শক্তিপুঞ্জের আগ্রাসী ক্রিয়া-কাণ্ডের পরিসমাপ্তি এখানেই হয় নি। স্বাক্ষরিত সন্ধিপত্রের অনুমোদন (ratification) ও পরস্পর বিনিময়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল পিকিং নগরে। রুশ রাজদূতের স্বদেশ থেকে পিকিং আগমনে কোন বিঘ্ন ঘটে নি। ইংরেজ, ফরাসী ও আমেরিকান রাজদূতেরা টিয়েনসিন বন্দরে সমবেত হয়ে নদীপথে পিকিং যাত্রার উদ্যোগ করলেন। তখন তা'ই পিং বিদ্রোহীদের আক্রমণের আশঙ্কায় পেই হো নদীর তীরে স্থানে স্থানে চীনারা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা করেছিল, সুতরাং চীনা কর্তৃপক্ষ রাজ-দূতদের নৌকাযোগে জলপথের পরিবর্তে স্থলপথে পিকিং আসবার জন্য অনুরোধ করলেন। অত্যন্ত সংগত অনুরোধ, আমেরিকান রাজদূত স্থলপথেই পিকিং যাত্রা করলেন, কিন্তু ইংরেজ ও ফরাসীরা চীনা অনুরোধে কর্ণপাত না করে পেই হো নদীর উজান-পথে প্রতিরক্ষা ব্যূহের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হল। এই অমার্জনীয় ঔদ্ধত্য সহ্য করতে না পেরে চীনারা গোলাবর্ষণ করল, তখন প্রভূত ক্ষতির বোঝা মাথায় নিয়ে ইংরেজ ও ফরাসীদের প্রত্যাবর্তন করতে হল।

পিকিং দখল : 'পিকিং সন্ধি' ও তার শর্তাবলী

কিন্তু দাম্ভিক বল-দর্পিত ইংরেজ ও ফরাসীরা এরূপ ক্ষতি নীরবে সহ্য করবার পাত্র নয়। লর্ড এলগিন ও ব্যারন গ্রোসের অধিনায়কত্বে শক্তিদ্বয়ের সম্মিলিত বাহিনী অবিলম্বে এসে পিকিং দখল করল (১৮৬০)। ক্ষয়ক্ষতির প্রতিশোধ নিল তারা লুটপাট ও লঙ্কাকাণ্ড দ্বারা। ইউয়েন-মিং-ইউয়েন নামে সম্রাটের যে বিখ্যাত গ্রীষ্মাবাস চি'য়েন লুং সম্পূর্ণ করেছিলেন, পাশ্চাত্ত্য আততায়ীরা সেই বিচিত্র ভবনটিকে অগ্নিসংযোগে ভস্মসাৎ করলো। সেখানে চীনা শিল্প ও সাহিত্যের অমূল্য সম্পদগুলি সংরক্ষিত ছিল, সুন্দর ব্রঞ্জের কারু-

শিল্প, মনোহর পর্সিলেন, গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি, প্রসিদ্ধ চিত্রকরদের আঁকা ছবি, সবই ধ্বংস হয়ে গেল। সভ্যতাভিমানী পাশ্চাত্য জাতির এই প্রতিহিংসা-মূলক অপকীর্তি নিছক ধ্বংসলীলায় হুন ও মোঙ্গলদের বর্বরতাকে অতিক্রম করে নি, এমন কথা বোধ করি কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তিই বলবেন না।

১৮৬০ অব্দের পিকিং সন্ধি পূর্ববর্তী টিয়েনসিন সন্ধির মুক্তবেণীকে যুক্ত করেছিল, নূতন সন্ধিপত্রে কয়েকটি নূতন শর্তও সংযোজিত হয়েছিল। এই দুটি সন্ধি চীনে শ্বেতাঙ্গ প্রভাব বিস্তারের পথ আরও প্রশস্ত করে দিয়েছিল। সন্ধির প্রধান শর্তগুলি এইরূপ : (১) ব্যবসার জন্য আরও অনেকগুলি নূতন বন্দর মুক্ত করা। এই বিধানেব ফলে চীনে নানান স্থানে ব্যাপকভাবে বিদেশীদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে তাদের চিন্তা ও ধারণা প্রভৃতির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, এবং চীনা সমাজে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে বিলম্ব হয় নি। (২) বিদেশী শক্তিপুঞ্জের বাণিজ্য-তরী ইয়াংসি নদীপথে যাতায়াতের অধিকার দান। (৩) পিকিং নগরে বিদেশী দূতদেব মর্যাদা সহ বসবাসের অধিকার দান। (৪) পাসপোর্টধারী বিদেশীদের চীনের অভ্যন্তরে ভ্রমণের অধিকাব দান। (৫) দেশী বিদেশী সকল খৃস্টানদের ধর্ম প্রচারে অধিকার দান। ফলে, দেশী খৃস্টানগণ প্রকারান্তরে বিদেশীদের 'একস্ট্রাটেরিটোরিয়ালিটি'র আওতায় গিয়ে পডেছিল। (৬) বিগত দেড় শ' বছর ধরে ফরাসী বোমান ক্যাথলিক গির্জা ও সম্পত্তির যে ক্ষতি হয়েছিল চীনা রাজশক্তিব হাতে, সেই ক্ষতির দাবি স্বীকার কবা। এই শর্তটির বিবিধ ব্যাখ্যা নিয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষদ্বয়ের মধ্যে বিবাদ চলেছিল দীর্ঘকাল। (৭) একস্ট্রাটেরিটোরিয়ালিটি-ব বিধানগুলির ব্যাপকতা বৃদ্ধি। (৮) হংকং-এর অপর দিকে মূল ভূখণ্ডের কিয়দংশ দান। (৯) যুদ্ধের জন্য ক্ষতিপূরণ। (১০) আফিং-এর ওপব কর ধায করে আফিং আমদানি ব্যাপারকে আইনসিদ্ধ করা।

চীনের দুর্বলতার সুযোগে পাশ্চাত্য জাতিবা অনেক সুবিধা আদায় করেছিল বটে, কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া চীনেব ভূখণ্ড তারা অধিকার করে নি। হংকং দ্বীপ ও নিকটস্থ মূল ভূখণ্ডেব সামান্য একটু অংশ ইংরেজ অধিকার করেছিল, আর ম্যাকাও উপদ্বীপে পর্তুগীজ সার্বভৌমত্ব আকারে-প্রকারে স্থাপিত হয়েছিল, যদিও চীন তাদের এই অধিকার তখনো স্বীকার করে নি।

১৮৫৮ অব্দে চীন যখন ইংরেজ ও ফরাসী বাহিনী কর্তৃক পরাজিত এবং আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহে বিপন্ন, সেই সময়ে আইগুন নামক স্থানে রাশিয়ার সঙ্গে চীন একটি সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়, এবং পরে ১৮৬০ অব্দে পিকিং-এ রুশ দূত সেনাপতি ইগনাটিয়েফের 'মধ্যস্থতা'র পুরস্কারস্বরূপ আরও একটি সন্ধি স্থাপিত হয়। এই দুটি সন্ধির র্ত অনুসারে চীন আমুর নদীর উত্তরাংশ এবং উশারি নদীর পূর্বে সমগ্র ভূখণ্ড রাশিয়াকে প্রদান করেছিল। এইরূপে কোরিয়ার উত্তরে এশিয়ার সমগ্র সমুদ্রতট রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। মাঞ্চুরিয়ার উত্তরাংশে চীনের ভূখণ্ড পরিত্যাগ তখন তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বিবেচিত হয় নি, মাঞ্চুরিয়া তখন ছিল বিরলবসতি এবং সেই পরিত্যক্ত স্থানসমূহে চীনারা উপনিবেশ স্থাপনের কোন প্রয়োজন অনুভব করে নি। কিন্তু কালক্রমে দেখা গেল, চীনের এই ত্যাগ-স্বীকার জাতীয় স্বার্থের অনুকূল হয় নি, কেননা তা রুশের সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের স্পৃহাকে সংযত না করে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল।

উত্তরে যেমন রাশিয়া দক্ষিণে ফ্রান্স তেমনি আগ্রাসী কার্যকলাপ শুরু করে দিয়েছিল। ইন্দো চীন ছিল চীনের করদ রাজ্য। ইন্দো-চীনকে করায়ত্ত করবার উদ্দেশ্যে মিশনারীদের ওপর অত্যাচারের মামুলী ছুতা ধরে ফ্রান্সের নৌ-বাহিনী ইন্দো-চীন আক্রমণ করল (১৮৫৮), ফ্রান্সের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল স্পেন। ১৮৬২ অব্দে সন্ধি স্থাপিত হল, সেই সন্ধিসূত্রে ফ্রান্স কোচিন চীনের তিনটি প্রদেশ অধিকার করল।

সিয়েন ফেং-এর রাজত্বকালের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা, সাংঘাই বন্দরে ইংরেজ, ফরাসী ও আমেরিকান কনসালগণ কর্তৃক সামুদ্রিক শুল্কের কার্যালয় প্রতিষ্ঠা। পরবর্তী সম্রাট তুং চি'-র রাজত্বকালে ইংরেজ কনসাল স্যর রবার্ট হার্ট এবং তার সহযোগীরা আমন্ত্রিত হয়ে পিকিং-এ এলেন, সেখানে তাঁরা চীনা সরকারের শুল্ক কর্মচারীরূপে নিযুক্ত হলেন, আর বিদেশী বাণিজ্যের শুল্ক বিভাগ তাদের হাতে তুলে দেওয়া হল। শুল্ক আদায়ের এই নব ব্যবস্থাকে একটি আনুষ্ঠানিক পরিবর্তন বা সংস্কার বলে মনে করা চলে না, কেননা এই ব্যবস্থার ফলে চীনের অর্থনীতি পরিচালনার ভার বিদেশী ইংরেজের ওপরই ন্যস্ত করা হয়েছিল।

১৮৬২ খৃস্টাব্দে সিয়েন ফেং-এর মৃত্যু হয়। তাই পিং বিদ্রোহ তখনো

প্রশমিত হয নি। এই বিদ্রোহের সূত্রপাত, বিদ্রোহ কিরূপ প্রলয়ংকর আকার ধারণ করেছিল, এবং কি উপাযে বিদ্রোহ দমন করা হয়েছিল, এই-সব বৃত্তান্ত আমরা এখন বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব।

৩. তা'ই পি'ং বিদ্রোহ

মাঞ্চুদেব আড়াই শ' বছরের কিঞ্চিদধিক বাজত্বকালে তা'ই পি'ং বিদ্রোহেব চেয়ে গুরুতর আভ্যন্তরীণ বিপদ আর দেখা দেয নি। ১৯১১ খৃস্টাব্দে মাঞ্চু বংশেব পতন হযেছিল বিপ্লবীদেব তেমন কোন যুদ্ধবিগ্রহেব জন্য নয়, বাজবংশের সমর্থকের অভাবই পতনেব মুখ্য কারণ। তা'ই পি'ং আন্দোলনের ফলে যুদ্ধ চলেছিল কিন্তু দীর্ঘ তেব বছব, সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ড বিধ্বস্ত হযেছিল, মাঞ্চুদের শক্তি নিঃশেষিত হযেছিল। পরিশেষে তা'ই পি'ং-দের পরাজয় ঘটেছিল, তার প্রথম কারণ তাবা দেশবাসীব সামগ্রিক সমর্থন লাভ কবে নি, এবং দ্বিতীয কাবণ পাশ্চাত্ত্য শক্তিপুঞ্জ মাঞ্চু রাজত্ব বজায রাখা তাদের স্বার্থের অনুকূল বিবেচনা কবে সম্রাটকে সামবিক সাহায্য-দানে অগ্রসর হযেছিল।

তা'ই পি'ং আন্দোলনের স্রষ্টিকাবী হুং সিউ-চু'যান ছিলেন একজন ক্যানটনবাসী হাক্কা শ্রেণীব ব্যক্তি। তিনি চাকবি-পরীক্ষায উত্তীর্ণ হতে পারেন নি, অকৃতকাযতার কাবণ মনে করতেন তাঁব প্রতি মাঞ্চুদের বিদ্বেষ, দেড শ' বছর পূর্বে তার পূর্বপুরুষগণ কর্তৃক মাঞ্চু সাম্রাজ্যেব বিরুদ্ধাচরণের জন্য। পণ্ডিতশ্রেণীব চীনাদের মধ্যে সত্যকাব বা কল্পিত অবিচারেব জন্য অসন্তুষ্ট মাঞ্চু-দ্বেষী ব্যক্তির অভাব ছিল না, এরূপ লোকের পক্ষে মাঞ্চু রাজত্বেব অবসান কামনা স্বাভাবিক। ১৮৩৭ অব্দে হুং সিউ-চ'যান যখন কঠিন রোগে শয্যাশাযী তখন তাঁব নাকি দিব্যদর্শন ঘটেছিল। স্বপ্নে দেখলেন তিনি, এক সৌম্যদর্শন বৃদ্ধ মানুষ তাঁকে জ্যোতির্ময়লোকে নিযে গিয়ে পূত শুদ্ধ করে নূতন হৃদয দান করলেন, এবং সেই সঙ্গে আদেশ দিলেন যেসব দানব মানুষকে সেই বৃদ্ধেব সেবা-ধর্ম থেকে বঞ্চিত করে দূরে সবিয়ে রেখেছে, সেই দানব-কুলকে তিনি যেন নির্মূল করেন। ১৮৪৩ খৃস্টাব্দে প্রোটেস্টাণ্ট খৃস্টান কর্তৃক চীনা ভাষায় অনূদিত বাইবেলেব একাংশ হুং-এর

দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রন্থটি পাঠ করে তাঁর মনে হল, তিনি যেন স্বপ্নদর্শনের অর্থ উপলব্ধি করতে পেরেছেন, সেই বৃদ্ধটিই যেন ঈশ্বর, বৌদ্ধ দেবদেবী-মূর্তি সেই দানবকুল, সেই মূর্তিগুলিকে ধ্বংস করে সত্যকার ঈশ্বরপূজা প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই তাঁকে স্বপ্নে আদেশ দেওয়া হয়েছে। হুং তখন বাইবেলের কিয়দংশ অবলম্বনে একটি ধর্মমত গঠন করলেন, এবং সেই নূতন ধর্মে দেশবাসীদের দীক্ষিত করতে লাগলেন। এই ধর্মকে 'তা'ই পি'ং খৃস্টধর্ম' বলে ইতিহাসে অভিহিত করা হয়। তা'ই পি'ং শব্দের অর্থ 'পরম শান্তি'।

'তা'ই পি'ং খৃস্টধর্ম'

তা'ই পি'ং খৃস্টধর্মের অভ্যুত্থানের কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সমসাময়িক কালে বৌদ্ধধর্ম, তাওধর্ম বা কনফুসীয় নীতিধর্ম কোনটিতেই চীনাদের আর তেমন আস্থা ছিল না। চিরদিনই তারা মনে করে এসেছিল, এই তিনটি ধর্মমার্গের লক্ষ্য একই বস্তু, মূল নীতি বা ক্রিয়াকাণ্ড বিষয়ে যে একটি অপরটির বিরোধী সে চিন্তা মনে তাদের কখনো জাগে নি। বৌদ্ধধর্মের সংসার-বৈরাগ্য, তাওধর্মের নানান কুসংস্কার, কনফুসীয়দের 'প্রাচীন বিদ্যা'র পাণ্ডিত্যাভিমান, কোন মিল বা সংগতি নেই ত্রয়ীর চিন্তাধারায় কিংবা অনুষ্ঠানের মধ্যে, কিন্তু তা সত্ত্বেও শিক্ষাদীক্ষার রুচি-মত চীনারা আপন আপন পথ বেছে নিয়েছিল, যার ফলে 'শিক্ষিতদের সব কিছুতেই অবিশ্বাস জন্মেছিল, আর অশিক্ষিতরা হয়ে উঠেছিল সব কিছুতে অতিমাত্রায় বিশ্বাসী'। ঊনবিংশ শতাব্দে বৌদ্ধধর্মের 'অষ্টমার্গ' প্রভৃতি দার্শনিক তত্ত্বগুলি বিলুপ্ত হয়ে এসেছিল, 'অমিতাভ'-নামজপ মাত্র অবশিষ্ট ছিল, নামজপে মুক্তি অর্থাৎ অনন্ত স্বর্গলাভ ঘটে, এই ছিল ধর্মের সারকথা। সত্যকার বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব যে ছিল না এমন নয়, সে ধর্ম জনসমাজ ছেড়ে নির্জন পার্বত্য অঞ্চলের মঠগুলিতে আশ্রয় নিয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের পতনের কারণই হয়তো বা লোকালয়ের সঙ্গে সম্বন্ধচ্ছেদ, কিন্তু আসল ধর্ম যেমনই হোক 'অমিতাভ'-জপ নামের গণধর্মের প্রতি পণ্ডিতকুলের ছিল ঘোর অশ্রদ্ধা, যেমন ছিল তাওধর্মের প্রতি। তাওধর্ম কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল তা আমরা পূর্বেই দেখেছি, পুরোহিত শ্রেণীর মধ্যে তাও-পূজারী ছিল সকলের

চেয়ে ঘৃণিত। তাও পূজারীর কর্ম ছিল ঐন্দ্রজালিক মন্ত্রতন্ত্র দ্বারা আধি-ব্যাধি অনাবৃষ্টির দূরীকরণ, তাবিজ মাদুলি দান, হাতুড়ে চিকিৎসা, অদৃষ্ট গণনা। কনফুসীয় পণ্ডিতমণ্ডলী এইসব 'ঝুটা বিদ্যা', এমন কি রসায়ন ও পদার্থ-বিদ্যাও সন্দেহের চোখে দেখতেন, সেজন্য বিজ্ঞানের চর্চা তাও-পন্থীদের মধ্যে আবদ্ধ এক প্রকার গুপ্তবিদ্যায় পরিণত হয়েছিল। গুপ্তবিদ্যার প্রতি তাও-ধর্মীদের এই আসক্তিই বোধ করি তাদের 'গুপ্ত সমিতি' গঠনে তৎপর করে তুলেছিল। চীনে 'গুপ্ত সমিতি'র প্রাদুর্ভাব দেখা যায় হ্যান যুগ থেকে, অনেক ক্ষেত্রেই এইসব সমিতির উদ্যোক্তা ছিলেন তাও-ধর্মীরা।

কনফুসীয় নীতিধর্মের প্রতি মাঞ্চুদের ছিল গভীর অনুরাগ, তার কারণ সহজেই অনুমেয়। এই রক্ষণশীল নীতির পরিবর্তন-বিরোধী প্রাচীন নিয়ম-নিষ্ঠা আর রাজভক্তি অনুশীলনের বিধানসমূহ বিদেশী মাঞ্চুদের শাসনাধিকার কায়েম করে রেখেছিল, সেজন্য তাঁরা ছিলেন গোঁড়া কনফুসীয় পণ্ডিতদের 'প্রাচীন শাস্ত্র' শিক্ষার সমর্থক। কিন্তু যে কারণে কনফুসীয় নীতিধর্ম শাসক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠার একটি প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠেছিল, ঠিক সেই কারণই আবার এই বিশিষ্ট নীতিধর্মের প্রতি জনসাধারণের চিরাগত শ্রদ্ধা একরকম মুছেই দিয়েছিল। এক দিকে যেমন বিদেশী শাসনের সমর্থক কনফুসীয় পণ্ডিতেরা জনগণের আস্থা হারিয়েছিল, অন্য দিকে আবার তেমনি দেশবাসীর সঙ্গে ইউরোপীয়ানদের সংস্পর্শ ও খৃস্টধর্মের প্রচার দেশের অবস্থাকে আরও জটিল করে তুলেছিল।

এমনি অবস্থার মধ্যে হুং সিউ-চু'য়ান তাঁর নবধর্ম প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। এই নবধর্ম খৃস্টধর্মেরই একটি চীনা রূপ। তা'ই পি'ং-রা নিজেদের একমাত্র 'স্যাং তি-র উপাসক' বলে অভিহিত করত, প্রোটেস্টান্ট খৃস্টানরাও স্যাং তি শব্দটির অর্থ 'ঈশ্বর' বলেই মেনে নিয়েছিল। তা'ই পি'ং-রা প্রোটেস্টান্টদের বাইবেল সর্বাংশে গ্রহণ করেছিল, বাইবেল-বর্ণিত 'দশ আদেশ' ছিল তাদের ধর্মের মূলমন্ত্র। সপ্তাহে একদিন সমবেত উপাসনা করা হত। আফিং তামাক সেবন, মদ্যপান ছিল নিষিদ্ধ। ধর্মে প্রেমের স্থান অল্পই ছিল। ভূমি বিলি প্রভৃতি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার সমর্থন করা হত বটে, কিন্তু কার্যত উদার নীতি অনুসরণের কোন লক্ষণ দেখা যায় নি।

এই নূতন ধর্ম-সম্প্রদায় খৃস্টান ও ইহুদিদের থেকে ঈশ্বর-কল্পনা ও কয়েকটি আচার-অনুষ্ঠান ছাড়া আর যে জিনিসটি লাভ করেছিল, তার নাম ধর্মান্ধতা। তা'ই পি'ং-দের লক্ষ্য ছিল পৌত্তলিক বৌদ্ধধর্ম ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন তাওধর্মের সম্পূর্ণ উচ্ছেদসাধন এবং মন্দিরগুলির সর্বাত্মক ধ্বংস। এই বিদ্রোহ যদি সত্যই সফল হত, তা হলে ইসলামের অভ্যুত্থানে উত্তর-পশ্চিম ভারতের মত চীন দেশেও আর বৌদ্ধধর্মের চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট থাকত না, এবং সেই সঙ্গে যে চীনের স্থাপত্য ও অমূল্য কলা-শিল্প সমূলে উৎসাদিত হত, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, এই বিদ্রোহের মধ্যেই সুসভ্য ইংরেজ ও ফরাসী বাহিনী ইউয়েন-মিং-ইউয়েন নামক পিকিং-এর রাজকীয় গ্রীষ্মাবাসটি অগ্নিদাহে ধ্বংস করেছিল (১৮৬০ খঃ), ধর্মান্ধতার পূজারী তা'ই পি'ং-দের এই পাশ্চাত্ত্য জাতি প্রদর্শিত জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত অনুসরণের সম্ভাবনা ছিল যথেষ্ট।

তা'ই পি'ং ধর্মের পরম বিরোধী হয়ে উঠেছিল খৃষ্টীয় মিশনারী দল, তার প্রধান কারণ এই যে নবধর্মের মঞ্চে ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাকে একটি বিশেষ স্থান দেওয়া হয়েছিল। প্রোটেস্টান্ট বাইবেলের যিশু খৃস্টকে সর্বতোভাবে স্বীকার করেও হুং সিউ-চু'য়ান নিজেকে 'স্বর্গীয় রাজা' ('Heavenly King') বলে প্রচার করেছিলেন। কোন মিশনারীর কাছে হুং ধর্মশিক্ষা লাভ করেন নি, নৈষ্ঠিকভাবে খৃস্টধর্মে দীক্ষিতও হন নি। এরূপ লোকের পক্ষে 'ঈশ্বর দর্শন' এবং 'যিশু খৃস্টের অনুজ'-রূপে ভগবদ্বাণী প্রচারের অধিকার দাবি স্বভাবতই মিশনারীদের কাছে অমূলক বলে মনে হয়েছিল। মিশনারীদের বিরোধিতার উদ্ভব হয়েছিল ধর্ম সম্বন্ধীয় কারণে, কিন্তু ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জ এই বিদ্রোহকে দেখেছিল অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে। মাঞ্চুরা দুর্বল, শক্তিপুঞ্জ তাদের কাছে অনেক সুবিধা-সুযোগ আদায় করেছে, হয়তো বা ভবিষ্যতে চীনকে বিভক্ত করে ভাগাভাগির স্বপ্ন দেখাও শুরু হয়ে গিয়েছিল। তা'ই পি'ং-রা ব্যবসা-ক্ষেত্রে ইউরোপীয়ানদের নানান সুবিধা ও দেশ-মধ্যে চলাফেরার অবাধ অধিকার দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু ইউরোপীয়েরা এই নব-জাগ্রত বৈপ্লবিক শক্তির অভ্যুত্থানকে বিষম শঙ্কার চক্ষে দেখেছিল, তাই বিদ্রোহীদের প্রতিশ্রুতির কথায় কর্ণপাত না করে বিদ্রোহ দমনে মাঞ্চুদের সাহায্যদানই শ্রেয় মনে করেছিল।

বিদ্রোহের প্রকৃতি ও পরিণাম

এই আন্দোলন গোড়া থেকেই বিদ্রোহরূপে আত্মপ্রকাশ করে নি। উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম প্রচার, ধর্মান্তরিতকরণ ও দেশীয় ধর্মগুলির কুৎসা কীর্তন। মাঞ্চুরা কনফুসীয়পন্থী হলেও তাও ও বৌদ্ধধর্ম-বিরোধী এই আন্দোলনকে উপেক্ষা করতে পারেন নি সমাজ-বিপর্যয় ও শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায়, তাই তাঁরা আন্দোলন বন্ধ করে দেবার উদ্যোগ করলেন। হুং-এর অনুচরেরা তখনি সরকারী চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে অস্ত্র ধারণ করল (১৮৫০)। যুদ্ধে তাদের অভাবনীয় সাফল্য ঘটল। ইয়াং-আন শহর বিদ্রোহীগণ কর্তৃক অধিকৃত হল। ১৮৫১ অব্দে হুং সিউ-চু'য়ান নিজেকে 'তি'য়েন ওয়াং' বা 'স্বর্গীয় রাজা' বলে ঘোষণা করলেন এবং 'তা'ই পি'ং তি'য়েন কুয়ো' অর্থাৎ 'পরম শান্তির স্বর্গীয় বংশ' নামে একটি বংশের প্রতিষ্ঠা করলেন। বিদ্রোহীদের সংখ্যা বৃদ্ধি হল, দক্ষিণাঞ্চলে তাদের অগ্রগতিও চলতে লাগল। ১৮৫৩ খৃস্টাব্দে ন্যানকিং শহর অধিকৃত হল, সেখানেই হুং তার রাজধানী স্থাপন করলেন। ন্যানকিং-এর নাম পরিবর্তন করে নূতন নামকরণ হল তি'য়েন চিং অর্থাৎ 'স্বর্গীয় রাজধানী'। হুং-এর দুর্ভাগ্য তিনি পিকিং অভিমুখে যাত্রা না করে ধর্মপ্রচার কার্যে ও ধর্মান্তরীকরণে মনোযোগ দিলেন। হুং-এর সেনাপতি চুয়াং ওয়াং মাত্র সাত হাজার সৈন্য নিয়ে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর সাহায্যার্থ কোন নূতন সৈন্যদল প্রেরিত হয় নি, সেজন্য তাঁকে ফিরে আসতে হয়েছিল। তিনি যদি উপযুক্ত সৈন্যবল নিয়ে অবিলম্বে পিকিং আক্রমণ করতে পারতেন, তা হলে মাঞ্চু রাজত্বের অবসান হত তখনই সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ভারতের সিপাহীযুদ্ধের প্রায় সমকালীন ব্যাপার এই তা'ই পি'ং বিদ্রোহ, দুই বিদ্রোহেরই উদ্দেশ্য বাইরে থেকে অনেকটা একই রকম দেখা যায়। ইংরেজদের মত মাঞ্চুদেরও বিদেশী বলা চলে, এবং উভয় দেশেই বিদেশীর শাসনকে বিলুপ্ত করবার জন্যেই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ দুটি বিদ্রোহের মধ্যে প্রভেদ ছিল বিলক্ষণ। ভারতের বিদ্রোহ ছিল ধর্মসম্পর্কশূন্য, বিদেশী বিতাড়নই ছিল যার একমাত্র লক্ষ্য, পক্ষান্তরে তা'ই পি'ং বিদ্রোহকে ধর্মযুদ্ধ বলা চলে। তা'ই পি'ং-রা যুদ্ধ করেছিল খৃস্টধর্ম

প্রতিষ্ঠার জন্য, সারা দেশের লোককে ধর্মান্তরিত করে একনায়কত্বের অধীনে একটি ধর্মরাজ্য স্থাপন করাই ছিল তাদের আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু তা'ই পিং বিদ্রোহ প্রকৃতপক্ষে ধর্মযুদ্ধ হলেও অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিদ্রোহকে দেখা আদৌ অসংগত নয়। বিদ্রোহীরা ছিল কৃষক ও কারিগর শ্রেণীর মানুষ, গ্রাম্য জনসাধারণ ও দরিদ্র ভদ্রলোক, তাদের অভিযান চলেছিল ধনী কৃষক, বণিক সম্প্রদায় ও বিত্তশালী ভদ্রব্যক্তিদের বিরুদ্ধে। এই যুদ্ধে তা'ই পিং-দের পরাজয় ঘটেছিল প্রধানত রক্ষণশীল সমাজের বিরুদ্ধাচরণের ফলে, কিন্তু অন্য কতগুলি কারণও ছিল যার জন্য এই আন্দোলন জনগণের পূর্ণ সমর্থন লাভে বঞ্চিত হয়েছিল। তা'ই পিং-দের নিষ্ঠুরতার অন্ত ছিল না, বৌদ্ধ মন্দির, বৌদ্ধ মূর্তি চূর্ণ করে জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত দেওয়া হয়েছিল, সর্বত্রই চলেছিল নৃশংস ধ্বংসের তাণ্ডব। হুং আশা করেছিল উত্তরাঞ্চল বিদ্রোহে যোগদান করবে, কিন্তু তার সেই আশা সফল হয় নি। যেসব কনফুসীয় পণ্ডিত সম্রাটের পক্ষ গ্রহণ করে বিদ্রোহ দমনে প্রবৃত্ত হলেন, সেং কুয়ো ফ্যান ছিলেন তাঁদের অগ্রণী। একজন সাধুচরিত্রের ব্যক্তি তিনি, পণ্ডিতমণ্ডলীর আদর্শ পুরুষ, প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থায় তার ছিল পরম বিশ্বাস। তার সুদক্ষ পরিচালনা-গুণে সম্রাট-বাহিনী ধীরে ধীরে বিদ্রোহীদের উচ্ছেদ সাধনে সমর্থ হয়েছিল, এবং এই উৎসাদন-কার্যে বিদেশী স্বেচ্ছাসেবকেরা মাঞ্চুদের বিলক্ষণ সাহায্য করেছিল। এই প্রসঙ্গে ওয়াড ও বুরগেভিন নামে দুজন আমেরিকান ও কর্নেল গর্ডন নামে একজন ইংরেজের নাম উল্লেখযোগ্য, তাঁরাই সৈন্য সংগঠন ও যুদ্ধ পরিচালনা বিষয়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৬৪ সালে ন্যানকিং পুনরুদ্ধারের সঙ্গে তা'ই পিং মার্কা চীনা খৃস্টধর্মের চিরকালের জন্য তিরোধান ঘটল। কয়েক সপ্তাহ পূর্বে প্রতিষ্ঠাতা হুং আত্মহত্যা করেছিল। এই ধর্মের চিহ্নমাত্র আর অবশিষ্ট রইল না, পুরনো ঐতিহ্যের প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল।

পঞ্চাশ বছর পর যখন বিপ্লব দেখা দিল, চীন তখন পাশ্চাত্ত্যের ধর্মকে বাদ দিয়ে সেখানকার রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের শরণ নিয়েছিল, এবং তারই আদর্শ ধরে চিরাগত রাজতন্ত্রের ঐতিহ্যকে পরিহার করে সে স্থানে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

৪. মাঞ্চু রাজত্বের শেষ পঞ্চাশ বছর

তা'ই পি'ং বিদ্রোহ সফল হলে দেশের অবস্থা কি হত সে সম্বন্ধে আমরা নানান কল্পনা করতে পারি। এই বিদ্রোহ হয়তো বা চীনের পূর্ব ইতিহাসের একটি পরিচিত অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি করত মাত্র, অর্থাৎ নূতন একটি চীনা রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করত, এবং তার ফলে চিরাগত রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আয়ুষ্কাল আরও কয়েক শতাব্দ বর্ধিত হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু এই রাষ্ট্র সম্ভবত মাঞ্চু শাসনের মত প্রতিক্রিয়াশীল হত না, নূতন রাজবংশ সমসাময়িক জাপানের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রবর্তনে আগ্রহান্বিত হত। যথাকালে শিক্ষা প্রভাবে চীন হয়তো জাপানের মত উন্নত হয়ে উঠত, কিন্তু সেই সম্ভাবনার পথ বন্ধ করে মাঞ্চু সিংহাসন আরও পঞ্চাশ বছর অটল হয়ে রইল প্রধানত বিদেশী বণিকের সাহায্যে। নানান বিপর্যয়-কাণ্ড ও চূড়ান্ত অপমানের পর দেশবাসীর কঠিন চাপে যখন মাঞ্চু রাজত্বের অবসান ঘটল তখন দেখা গেল অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও অজ্ঞানের জন্য চীনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের মনেও স্বার্থবুদ্ধিকে ছাপিয়ে দেশাত্মবোধ জেগে ওঠে নি। আত্মকলহে ও অন্তর্দ্বন্দ্বে জাতি দুর্বল হয়ে পড়েছিল, এবং তারই ফলে আরও চল্লিশ বছর-কাল তাকে বিদেশী শক্তিপুঞ্জের পদাঘাত লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য করতে হয়েছিল। এমন কি সাম্রাজ্যবাদী জাপানের অহেতুক আক্রমণের বিরুদ্ধেও তার দাঁড়াবার শক্তি ছিল না।

তু'ং চি (১৮৬২-১৮৭৫)

সম্রাট সিয়েন ফেং-এর মৃত্যুর পর তাঁর ছয় বছরের পুত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, এই সম্রাটের রাজত্বকালীন নাম তু'ং চি। তখন দাবানলের মত অগ্রসরমাণ তা'ই পি'ং বিদ্রোহ আর বিদেশী শক্তিপুঞ্জের কাছে চীনের শোচনীয় পরাজয়, এমনি সব লাঞ্ছনা দুর্বিপাকের মধ্যে সিংহাসনে একটি বালকের অধিষ্ঠান সাম্রাজ্যের অবশ্যম্ভাবী পতনকে ত্বরান্বিত করবারই কথা। কিন্তু এই শোচনীয় পরিণাম থেকে রাজবংশ আপাতত রক্ষা পেয়েছিল কয়েকটি আকস্মিক ঘটনাসমষ্টির ফলে, প্রধানত একটি নারীর

অদ্ভুত কর্মশক্তির প্রভাবে। এই নারী বালক সম্রাটের মাতা, সাধারণ্যে 'বিধবা সম্রাজ্ঞী' নামে পরিচিত। পাশ্চাত্ত্যসমাজ তাঁর নাম দিয়েছিল 'বৃদ্ধা বুদ্ধ' (Old Buddha)।

বিধবা সম্রাজ্ঞী স্থু সি (১৮৬২-১৯০৮)

পূর্বকালের হ্যান সম্রাজ্ঞী লু ও ট্যাং সম্রাজ্ঞী উ হৌ-র মত অসাধারণ বুদ্ধিমতী উদ্যমশীলা এই রমণী চীনের ইতিহাসে তার নাম তুরপনেয় স্থায়ী অক্ষরে লিখে রেখে গেছেন, কোন কল্যাণময় জীবনাদর্শের প্রতীকরূপে নয়, কর্মক্ষেত্রে জু সি যে অদম্য শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, সেইজন্যেই তাঁর প্রসিদ্ধি। ১৮৩৫ অব্দে কোন মাঞ্চু সদ্-বংশে তাঁর জন্ম, সম্রাট সিয়েন ফেং-এর গণিকারূপেই তিনি রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছিলেন। অচিরেই সম্রাট তাঁর বশীভূত হয়ে পড়লেন। বংশের উত্তরাধিকারী হয়েছিল তারই পুত্র, সম্রাটের মৃত্যুর পর তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু জুং লু ও দেবর কুং-এর সাহায্যে তিনি নিজেকে বালক সম্রাট তুং চি-র অছি নিযুক্ত করলেন। মৃত সম্রাটের পাটরানী হয়েছিলেন দ্বিতীয় অছি, কিন্তু রাজকার্য পরিচালনা করতেন জু সি স্বয়ং। ১৮৭৫ অব্দে উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়পরায়ণ পুত্রহীন সম্রাট তুং চি-র যখন বসন্ত রোগে অকস্মাৎ মৃত্যু হল, রাজমাতা সম্রাজ্ঞী জু সি তখন প্রমাদ গণলেন। শোক করবার অবসর তাঁর ছিল না। তিনি জানতেন প্রাসাদ, নগর ও জনগণের মধ্যে একটি শক্তিশালী দল দেশকে রাজমাতাদ্বয়ের প্রভাব থেকে মুক্ত করে কোন চীনা ব্যক্তিকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করবার পক্ষপাতী। নিজ হাতে ক্ষমতা রক্ষার জন্য রাজমাতাকে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে হয়েছিল। তিনি সেনাপতি লি হু-কে তলব দিলেন। আশি মাইল দূরে তিয়েনসিন থেকে এই পরাক্রান্ত সেনাপতি যখন পিকিং-এ রাজমাতার কাছে এসে উপস্থিত হলেন, জু সি তখন তাঁকে কামান সহ চার হাজার অশ্বারোহী সৈন্য গোপনে রাজধানীতে আনতে আদেশ দিলেন। ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে এই কাযটি এমন সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছিল যে কি সম্রাটের মৃত্যুর সংবাদ, কি নগরে সৈন্য-সমাবেশের কথা ঘুণাক্ষরেও কেউ জানতে পারে নি। এইরূপে সৈন্যদের সাহায্যলাভ বিষয়ে সুনিশ্চিত হয়ে নিশীথ রাত্রে বিধবা সম্রাজ্ঞী তাঁর বোনের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলেন, এবং শয্যায় সুপ্ত তিন বছরের শিশু

বোনপো-টিকে কোলে তুলে নিয়ে প্রাসাদে প্রত্যাগমন করলেন। ভোব বেলা নাগবিকগণ সবিস্ময়ে ঘোষণা শুনল যে অপুত্রক মৃত সম্রাটেব সিংহাসনে বিধবা সম্রাজ্ঞী তাঁব শিশু বোনপো-কে প্রতিষ্ঠিত করেছেন! এই বালক সম্রাটের রাজত্বকালীন নাম কুযাং স্থ।

বাজ্যের সর্বময়ী কর্ত্রী হলেন জু সি। সম্রাট সাবালক হবার পরও তিনি রাজ্য পরিচালনার কর্তৃত্বভাব ত্যাগ কবেন নি। তাঁর এই সময়কার কাজগুলি অনেক ক্ষেত্রেই কল্যাণের পরিবর্তে নানান অনর্থ ঘটিযেছিল। আধুনিক নৌ-বহব গঠনের জন্য সংরক্ষিত অর্থের অপব্যবহার করেছিলেন তিনি মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে নিজের জন্য একটি সুরম্য গ্রীষ্মাবাস নির্মাণ কবে। সম্রাট কুযাং স্থ-র প্রগতিশীল সংস্কার-কার্যগুলিতে বাধা দান, এমন কি সম্রাটকে বন্দীকরণ, এবং 'বকসাব হাঙ্গামা'র ব্যাপারে তাঁর অপরোক্ষ সমর্থন প্রভৃতি বিষযগুলি যথাস্থানে পবে বর্ণনা করা হবে। ১৯০৮ খৃস্টাব্দে সম্রাট কুযাং স্থ-র মৃত্যুর সময তিনি অতিবৃদ্ধা, তথাপি এই পবম শক্তিশালিনী নারী তাঁর অভ্যস্ত ক্ষমতা শেষবাবেব মত প্রযোগ করতে দ্বিধা না করে একটি শিশুকে সিংহাসনে বসাবার জন্য নির্দেশ দিযেছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধা সম্রাজ্ঞীব তখন আযু ফুবিয়ে এসেছিল, সম্রাট কুযাং স্থ-র মৃত্যুব পর তিনি মাত্র কযেক ঘণ্টা-কাল জীবিত ছিলেন।

সম্রাট চি'যেন লুং-এব পর জু সি ব মত এমন কর্মশক্তিপরাযণ শাসকের আবির্ভাব হয় নি, এ কথা সর্ববাদীসম্মত। কিন্তু তিনি ছিলেন কুসংস্কাবাচ্ছন্ন, অর্থগৃধ্নু, দুর্নীতিপরাযণ, কর্মক্ষম হযেও দ্বিধাগ্রস্ত, ফলে রাজনীতি ও শাসন-ক্ষেত্রে অনেক বড বকম ভ্রম-প্রমাদ ঘটেছিল। জীবনেব প্রথম ভাগে তাঁর কর্মনৈপুণ্য বংশকে পতন থেকে রক্ষা করেছিল বটে, কিন্তু শেষরক্ষা আর হল না, রাষ্ট্রবিপ্লব ও অরাজকতা দেখা দিযেছিল তাঁবই অদূবদর্শিতাব জন্য। যুগোপযোগী চিন্তাব সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না, পাশ্চাত্ত্য জাতির সংস্পর্শে দেশের ভাবধারা ও জীবনযাত্রা এবং সেই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তনেব প্রযোজন দেখা দিয়েছে, এই সত্য তিনি আদৌ উপলব্ধি করেন নি। তিনি ভালবাসতেন শুধু ক্ষমতা ও অর্থ, উচ্চ বাজপুরুষদের গুণাগুণ বিচারেব সূক্ষ্ম দৃষ্টি তাঁর যথেষ্ট ছিল, আর অভীষ্ট-সিদ্ধির কৌশলও তিনি ভালরূপই জানতেন। সাহিত্যানুরাগিণী ও চিত্রকুশলা বলে তাঁর বেশ খ্যাতি ছিল।

সম্রাট তু'ং চি-র রাজত্বকালের প্রথম ভাগে সেং কুযো ফ্যান, লি হুং-চ্যাং প্রভৃতি চীনা পণ্ডিতগণেব সাহায্যে তা'ই পি'ং বিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে চূর্ণ কবা হযেছিল (১৮৬৪)। চীনের অন্তর্বিদ্রোহের সুযোগ নিযে ইউনানে মুসলমান বিদ্রোহ দেখা দিযেছিল, বিদ্রোহেব নেতা ছিল তু ওযেন-সিউ। এই বিদ্রোহ দমন কবতে কয়েক বছর সময লেগেছিল (১৮৭৩)। ইতিমধ্যে সেনসি ও কানসু অঞ্চলেও মুসলমানবা বিদ্রোহ করেছিল, এবং মুসলমান অধ্যুষিত সিংকিযা' প্রদেশ স্বাধীন হয়ে পড়েছিল (১৮৬৪)। বিদ্রোহ দমন করে পশ্চিমাঞ্চল পুনরুদ্ধাব কবেন সে' কুযো-ফ্যান এব সুযোগ্য সহকর্মী সো সু'-ট্যা'ং। সেনসি ও কানসু প্রদেশ দুটিতে শান্তি স্থাপিত হল (১৮৭৩)। কাশগর, ইযারকন্দ্ ও খোটান আত্মসমর্পণ কবল (১৮৭৮) তত্রত্য বিদ্রোহী নেতা ইযাকুব বেগ এব মৃত্যুব পব। সো সুং-ট্যা'-এর এই সার্থক অভিযান হ্যান ও ট্যা' যুগে পশ্চিমাঞ্চলে বিরাট সাফল্যের কথা স্মরণ করিযে দেয।

কুয়াং সু (১৮৭৫-১৯০৮)

ভগ্নীব পুত্র বালক কুযা' সু-কে নাটকীযভাবে সি'হাসনে বসিয়ে বিধবা সম্রাজ্ঞী জু সি ব'শের উত্তরাধিকাব নিযম ভঙ্গ কবেছিলেন। সেইজন্যেই কুযাং সু-ব বাজ্যলাভ ছিল আইনমত অসিদ্ধ। সম্রাট তু ং চি-র মৃত্যুকালে তাঁব পত্নী ছিলেন অন্ত সত্বা, তিনি জু সি ব স্বেচ্ছাচাবিতাব ঘোব প্রতিবাদ ক'ছিলেন। কিন্তু তাঁব সেই প্রতিবাদে জু সি কর্ণপাত কবেন নি, তখন ক্ষোভে বোষে অন্তঃসত্বা অবস্থায তিনি আত্মহত্যা করলেন। কযেক বছর পর ১৮৮৯ অব্দে জু সি তাঁর কোন আত্মীযকন্যাব সঙ্গে সম্রাট কুযা' সু-ব বিবাহ দেন, এবং তাবপর বাহ্যত বাজকর্ম থেকে অবসব গ্রহণ কবেন। প্রকৃতপক্ষে সম্রাটকে তিনি একটি সাক্ষীগোপাল মাত্র কবে বেখেছিলেন, রাজ্য শাসনের চাবিকাঠি ছিল তাঁর নিজেব হাতে। সম্রাটেব সি'হাসনে আরোহণেব অল্পকাল মধ্যেই পশ্চিমাঞ্চলের মুসলমান বিদ্রোহ দমন করা হল, তারপব দেখা দিল উপর্যুপরি কযেক বছর প্লাবন, অনাবৃষ্টি এবং আকালের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, দুর্ভিক্ষ। লক্ষ লক্ষ মানুষ দুর্ভিক্ষে মারা গেল ।

সম্রাট কুযাং সু-র রাজত্বকালের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর পুরোভাগে আমরা দেখতে পাই, কোরিযাব ওপব আধিপত্য নিযে চীনের সঙ্গে

দূরপ্রাচ্যের 'উদীয়মান সূর্য' জাপানের বিবাদ। ১৮৮২ অব্দে কোরিয়ায় জাপানী প্রতিপত্তি হ্রাস করবার উদ্দেশ্যে চীনের উপদেশমত সেখানে বিদেশী শক্তিপুঞ্জের প্রবেশদ্বার মুক্ত করা হল, এবং এই ব্যাপার নিয়ে চীনের সঙ্গে জাপানের যে বিবাদের সূত্রপাত হল তার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল ১৮৯৪ সালের চীন-জাপান যুদ্ধে। ইতিপূর্বে ১৮৮৫ অব্দের জুন মাসে ফ্রান্স চীনকে টংকিং পরিত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল। চীন-জাপান যুদ্ধে জাপান জয়ী হল, সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছিল জাপানের সিমোনোসেকি নগরে (১৮৯৪)। জাপানের হাতে চীনের এই শোচনীয় পরাজয় ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জকে উপর্যুপরি নানাবিধ দাবি উত্থাপন ও অধিকার আদায় করতে উৎসাহিত করেছিল। ফ্রান্স টংকিং সীমান্তে রেলপথ নির্মাণের এবং নূতন কয়েকটি বন্দরে বাণিজ্যের অধিকার লাভ করল। ১৮৯৭ খৃস্টাব্দে সানটাং-এ চীনাদের হাতে দুজন জার্মান মিশনারী প্রাণ হারিয়েছিল, সেই অছিলায় জার্মান নৌ-বহর সানটাং-এর সমুদ্রকূলে কিয়াচাও বন্দর দখল করল। মাঞ্চুরিয়ার দিকে অগ্রসরমাণ রুশরা চীনের নিকট থেকে পোর্ট আর্থার ও তালিয়েন-ওয়ান-এর ইজারা এবং উত্তর মাঞ্চুরিয়ায় রেলপথ নির্মাণের অধিকার আদায় করল। ইংরেজেরা পঁচিশ বছরের জন্য ওয়েই-হেই-ওয়েই ও হংকং-এর চারপাশের ভূখণ্ড আর ফরাসীরা কুয়াং-চৌ উপসাগর ইজারা গ্রহণ করল। ইতালীয়দের দুর্ভাগ্য, স্যমেন উপসাগর ইজারা চেয়েও পায় নি। বলা বাহুল্য, চীন এইসব অন্যায্য অধিকার স্বেচ্ছায় দান করে নি। প্রতিবারই বিদেশী শক্তির যুদ্ধ-জাহাজ গোলাবর্ষণের হুমকি দিয়ে সুবিধা আদায় করেছে।* এখন চীন-রূপ পরিপক্ক 'তরমুজ'টির ফালি কেটে সেই খণ্ডগুলিকে বণ্টন করবার সময় আগতপ্রায়, ইতিমধ্যেই বিদেশী শক্তিপুঞ্জ 'প্রভাব ব্যূহ' (sphere of

---

* এই প্রসঙ্গে জওহরলাল নেহরু তাঁর *Glimpses of World History* বইখানায় যে উচ্ছ্বাসোক্তি করেছেন তা উল্লেখযোগ্য : "What shall we call this scandalous behaviour ? Highway robbery ? Brigandage ? It is the way of imperialism Sometimes it works in secret, sometimes it covers its evil deeds under a cloak of pious sentiment and hypocritical pretence of doing good to others But in China in 1898 there was no cloak or covering. The naked thing stood out in all its ugliness." (p. 459)

influence) গঠনে তৎপর হয়ে উঠেছিল। রাশিয়া দাবি করল মাঞ্চুরিয়া, জার্মানি সানটাং ও উত্তর চীন, বৃটেন ইয়াংসি উপত্যকা, জাপান ফুকিয়েন, ফ্রান্স দক্ষিণ ইউনান ও কোয়াংসি। পরিশেষে ১৮৯৯ অব্দে 'বক্সার' (Boxer) হাঙ্গামা অর্থাৎ বিদেশীদের ওপর চীনা 'বক্সার' বা 'মুষ্টিযোদ্ধা' সম্প্রদায়ের আক্রমণ শুরু হল, এবং তারই প্রতিক্রিয়ারূপে দেখা দিল বিদেশী শক্তিপুঞ্জের নির্মম ধ্বংসলীলা।

উপরোক্ত বিবরণে দুটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষাৎ মেলে: প্রথমটি জাপানের অভ্যুত্থান ও চীন-জাপান সংঘর্ষের কাহিনী এবং অপরটি 'বক্সার' বা 'মুষ্টিযোদ্ধা' হাঙ্গামা। আমরা এখন এই দুটি বিষয় একটু বিশদভাবে আলোচনা করব।

উদীয়মান জাপান ও রাহুগ্রস্ত চীন

ঊনবিংশ শতাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে এশিয়ার বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলির মধ্যে জাপানের অভ্যুত্থান বোধ করি সবচেয়ে বেশি চমকপ্রদ। পাশ্চাত্ত্য শক্তিপুঞ্জের উৎপীড়নে জর্জরিত চীন যখন তমসাচ্ছন্ন অন্ধ গহ্বরে নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছিল, সেই সময়ে জাপানে দেখা দিল নবীন সূর্যের উদয়, যে সূর্যের ক্রমবর্ধমান ভাস্বর দীপ্তি অচিরেই জগতের বিস্ময়-দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। পাশ্চাত্ত্যের চ্যালেঞ্জ চীনের অতিকায় ঘুণে-ধরা রাষ্ট্রে একটা বিশৃঙ্খল বিপর্যয় ঘটিয়েছিল, কিন্তু সেই চ্যালেঞ্জই আবার ক্ষুদ্র জাপানের দ্বীপপুঞ্জে বহমান স্রোতের ভাটার টান বন্ধ করে নূতন জীবন-শক্তির জোয়ার ছুটিয়ে দিয়েছিল। জাপান ছিল চীনের মতই রক্ষণপন্থী, পরিবর্তন-বিমুখ। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে সেখানে ইউরোপীয়ানদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল প্রধানত তাদের কদর্য আচরণ ও বোম্বেটে বৃত্তির জন্যই, ঊনবিংশ শতাব্দের মধ্যভাগেও সেই নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল। বস্তুত জাপানের বিদেশী সংস্রব বর্জনের নীতি ছিল চীনের চেয়েও কঠোরতর, কেননা চীনে অন্তত বিদেশী ব্যবসায়ীদের জন্য কয়েকটি বন্দর মুক্ত করা হয়েছিল, আর জাপানে পাশ্চাত্ত্য বণিকদের আগমনের অনুমতি কি ব্যবসা পরিচালনার সুযোগ-সুবিধা দান করা হয় নি। এই 'রুদ্ধদ্বার' নীতি নির্বিরোধে স্বীকার করে নেবার মত মনোবৃত্তি শক্তিশালী পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহের না

থাকারই কথা। ইউরোপ ও আমেরিকায় বিজ্ঞানের উন্নতি ও দ্রুত শিল্পায়নের সঙ্গে অর্থনীতির ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছিল, শিল্পজাত পণ্যবস্তুর বিদেশে বপ্তানি সেখানকাব সমাজের এই নূতন অর্থনৈতিক সংগঠনের একটি অপরিহার্য প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল। পাশ্চাত্ত্য জাতিগুলির সামরিক শক্তিকে প্রতিহত কববার সামর্থ্য কোন প্রাচ্য দেশেবই ছিল না, এরূপ অবস্থায ইউরোপের জাতীয় অর্থনীতির প্রতিবন্ধক জাপানের 'রুদ্ধদ্বাব' বলপ্রয়োগে মুক্ত করবার চেষ্টা পাশ্চাত্ত্য শক্তিপুঞ্জের পক্ষে স্বাভাবিক। ১৮৫৩ সালে চীনের সঙ্গে ইংরেজেব যুদ্ধের অব্যবহিত পবেই কমোডোর পেরির অধিনায়কত্বে বিখ্যাত আমেরিকান নৌ-অভিযান জেডো উপসাগরে প্রেরিত হল। বাষ্পীয় অর্ণবপোত জাপান দেখল এই প্রথম। পর বৎসরে 'সোগুন' অর্থাৎ জাপানী প্রধানমন্ত্রী দুটি বন্দব আমেরিকান ব্যবসায়ের জন্য মুক্ত করে দিলেন। তখন বৃটিশ, রুশ ও ওলন্দাজবাও অনুরূপ বাণিজ্যিক সুবিধার দাবি করল, 'সোগুন' তাদেব দাবি মেনে নিয়ে সন্ধি কবলেন। এইরূপে ২১৩ বছব ধরে বিদেশীদের সঙ্গে সংস্রব বর্জনের পব জাপানেব রুদ্ধদ্বার অকস্মাৎ মুক্ত হয়েছিল।

পাশ্চাত্ত্য জাতিব সংস্পর্শে এসেও চীনের বাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতিব কাঠামোর বিশেষ কোন পবিবর্তন হয় নি, তাব প্রধান কারণ বিদেশী মাঞ্চু শাসনের স্বার্থে কনফুসীয় প্রাচীন বিধানগুলির সংরক্ষণ, তা ছাড়া ও ছিল শাসক সম্প্রদায়ের ব্যাপক অনাচার এবং সংস্কারাচ্ছন্ন বিশাল চীনা সমাজের পরিবর্তন-বিমুখ মানসিক জড়তা। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্ত্য সংস্পর্শের প্রতিক্রিয়া জাপানীদের মনে তীব্র আগ্রহ জাগিয়ে তুলেছিল বিজ্ঞান শিক্ষাব জন্য, যে বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধনায় প্রকৃতিকে জয় করে ইউবোপ পরম শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। কনফুসীয় নীতিধর্মের প্রভাব জাপানে ছিল যথেষ্ট, কিন্তু এই নীতির আদর্শ জাপানের নিজস্ব নয়, চীন থেকে এখানে আমদানি করা হয়েছিল। বস্তুত জাপানী সভ্যতার অধিকাংশই চীনা সভ্যতার প্রতিরূপ, জাপান একদিন চীনের সভ্যতাকেই গ্রহণ করেছিল। জাপানের সেই পূর্বকার গ্রহিষ্ণু মনোবৃত্তি এখন তাকে ইউরোপের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জনে, রাষ্ট্রের সমাজজীবনের সংস্কার সাধনে উৎসাহিত করল। ১৮৯৪ অব্দের পূর্বেই নবগঠিত জাপান জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথে বহু-দূর অগ্রসর হয়েছিল, শক্তি-

সামর্থ্যেও পরাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। এই বিরাট সাফল্যের কৃতিত্ব কয়েকজন মেধাবী ব্যক্তির, জাতির পরম সৌভাগ্য সংকটকালে জাতির নেতৃত্বের ভার ন্যস্ত ছিল এইসব সুযোগ্য মানুষের ওপর। তাঁরা বিলক্ষণ উপলব্ধি করেছিলেন, সারা পৃথিবী পাশ্চাত্ত্য শক্তিপুঞ্জের পদানত হয়ে পড়েছে, এমন অবস্থায় পাশ্চাত্ত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা এবং পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতির অনুসরণ দ্বারা শক্তি-গঠনই জাতীয় স্বাধীনতা রক্ষার একমাত্র উপায়। নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে জাপান প্রাশিয়ার রাজতন্ত্রের অনুরূপ একটি সংবিধান রচনা করেছিল, প্রশাসনের সংস্কার এবং সামন্ততন্ত্রের বিলোপসাধন করেছিল, পাশ্চাত্ত্য ধাঁচে সৈন্যবাহিনী ও নৌ-বহর সংগঠন করেছিল। শিক্ষাপ্রণালীর আমূল পরিবর্তন করে ইউরোপীয় আদর্শে স্কুল স্থাপিত হল, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য জাপানী ভাষায় অনূদিত হল। অর্থনীতি-ক্ষেত্রে শিল্পায়নের সূত্রপাত হল, এই শিল্পায়নই কালক্রমে অসংখ্য কলকারখানা স্থাপন, রেলপথ নির্মাণ, বাষ্পীয় বাণিজ্য-জাহাজ বাহিনীর সংগঠন প্রভৃতি নানান কার্য দ্বারা জাপানকে শক্তি-সামর্থ্যে ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহের সমকক্ষ করে তুলেছিল। এখানে বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় এই যে, তোকুগাওয়া সোগুনগণের যে কড়া একনায়কত্বের শাসন যুগের পর যুগ ধরে চলে এসেছিল তারই ফলে জাপানীরা আদেশ পালনে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল এবং পরিবর্তিত অবস্থায় শিল্পায়নে জাতির সেই বশংবদ অভ্যাসই নিয়মানুবর্তিতায় রূপান্তরিত হয়েছিল।

চীনের সঙ্গে জাপানের বিবাদ

শক্তি সঞ্চয়ের অব্যবহিত পর থেকেই জাপান কোন-না-কোন বিষয় নিয়ে চীনের সঙ্গে কোন্দল শুরু করে দিয়েছিল। ১৮৭১ খৃস্টাব্দে রিউ-কিউ দ্বীপ-পুঞ্জের অধিকার নিয়ে উভয় দেশের ঝগড়া বাধল। এই দ্বীপ চীনকে কর দিত, কিন্তু সেখানে জাপান নিজের অধিকার দাবি করে বসল। রিউ-কিউ-র কয়েকজন অধিবাসী চীন-অধিকৃত তাইওয়ান বা ফরমোসা দ্বীপে আদি-বাসীদের হত্যা করেছিল। এই হত্যার জন্য জাপানীরা চীনকেই দায়ী করল, এবং শান্তিবিধানের ওজুহাতে একটি নৌ-বহর পাঠিয়ে ফরমোসার একাংশ অধিকার করল। পরিশেষে আপস-মীমাংসার ফলে চীনকে ক্ষতিপূরণ

বাবদ অর্থদান করতে হল, জাপানও ফরমোসা থেকে সৈন্যবাহিনী অপসারিত করল (১৮৭৪)। তাবপর উভয় শক্তিব মধ্যে বিবাদ বাধল কোরিয়া নিযে। কোরিষাব ওপর সার্বভৌমত্বেব দাবি চীন করে এসেছে আবহমান কাল ধরে, কোবিযাও এই দাবি মেনে নিযে প্রতি বছর পিকিং-এ কর প্রেরণ করেছে। ষোড়শ খৃস্টাব্দে জাপানী সেনাপতি হিদেযোশির কোরিয়া অভিযানের পর থেকে ১৮১১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত আরও কযেকবার জাপান সেখানে মিশন পাঠিযেছিল, এবং ১৮৭৬ সালে কোরিযাব স্বাধীনতাকে ভিত্তি কবে সে দেশের সঙ্গে একটি সন্ধি স্থাপন করল। তখন চীনের পবামর্শ-মত কোরিয়া পাশ্চাত্ত্য শক্তিপুঞ্জেব সঙ্গে সন্ধি কবে কযেকটি বন্দর খুলে দিল জাপানের প্রভাব হ্রাস করবাব উদ্দেশ্যে, এবং এই ব্যাপার নিযে একটি দাঙ্গায জাপানী দূত-ভবন আক্রান্ত হল (১৮৮২)। গৃহযুদ্ধ বেধে গিয়েছিল, অরাজকতা দূর করে শান্তি স্থাপনের জন্য চীন জাপান দুই শক্তিই কোরিযায সৈন্য প্রেরণ কবল। কোবিযাব প্রাচীনপন্থীরা ছিল চীনেব দিকে চেযে, আর প্রগতিশীল ব্যক্তিবা জাপানেব সাহায্য কামনা কবত। একটি প্রাসাদ-হাঙ্গামায কোবিযা-রাজ জাপানী বক্ষীদেব শরণাপন্ন হলেন, জাপানীরা প্রাসাদ অধিকার করল (১৮৮৪)। বিদ্রোহীবা বাজপ্রাসাদ আক্রমণ করল, এই আক্রমণে চীনা সৈন্যবাও যোগ দিযেছিল। যুদ্ধ কিন্তু বাধল না, অচিরে চীন জাপান উভযেব মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হল (১৮৮৫)। সন্ধিব শর্ত ছিল এই যে, দুই পক্ষই কোবিযা থেকে তাদেব সৈন্যবাহিনী অপসাবিত করবে, এক পক্ষ অপর পক্ষকে পূর্বাহ্ণে সংবাদ না দিযে সে দেশে শান্তিরক্ষার্থ সৈন্য প্রেরণ করবে না, এবং সৈন্য প্রেরণ করা হলে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওযা মাত্রই নিজ বাহিনীকে ফিরিয়ে আনতে হবে। কিন্তু এইরূপ চুক্তি সত্ত্বেও মন্ত্রী লি হুং চ্যাং-এব পবামর্শে চীন কোরিযার ওপর সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে কৃতসংকল্প হযেছিল। কোরিযায একটি শুল্ক বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হল, সেই শুল্ক বিভাগ নামে স্বাধীন হলেও আসলে ছিল চীনা শুল্ক বিভাগেব অধীন। কোরিয়ায চীনের রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হলেন মন্ত্রী লি হুং চ্যাং-এর প্রিযপাত্র ইউযান সি-কাই, দীর্ঘকাল ধরে তিনি সেখানে সামরিক কার্যসূত্রে অবস্থান করেছিলেন। পরবর্তী কালে বিপ্লবান্তে ইউযান সি-কাই চীন দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন।

চীন-জাপান যুদ্ধ : সিমোনোসেকির সন্ধি

ধূমায়িত বহ্নি জ্বলে উঠতে বিলম্ব হল না। চীন-জাপান যুদ্ধ বাধল ১৮৯৪ খৃস্টাব্দে কোরিয়ার ব্যাপারে উভয় দেশের হস্তক্ষেপ উপলক্ষে। কোরিয়ার 'টং হাক' নামে একটি গুপ্ত সমিতির উদ্যোগে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল, সেই বিদ্রোহ দমন করবার উদ্দেশ্যে চীনা রেসিডেন্ট ইউয়ান সি-কাই-র পরামর্শে কোরিয়া-রাজ সাহায্য প্রার্থনা করলেন চীন-সম্রাটের কাছে। সেই অনুরোধমত কোরিয়ায় চীনা বাহিনী পাঠানো হল। পূর্বাহ্ণে জাপানকে সংবাদ না দিয়ে কোরিয়ায় সৈন্য পাঠিয়ে চীন সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করেছে, এইরূপ অভিযোগ করে জাপানও কোরিয়ায় সৈন্য প্রেরণ করল। ইতিমধ্যে কোরীয় সৈন্যগণ বিদ্রোহ দমন করতে সমর্থ হয়েছিল। দেশে শান্তি ফিরে এল, কিন্তু মুশকিল হল চীনা ও জাপানী সৈন্যদল নিয়ে, তারা দুটি বিরুদ্ধ-পক্ষীয় শিবিরে পরস্পরের প্রতি মারমুখী হয়ে বসে রইল। জাপান প্রস্তাব করল উভয় দেশের সহযোগিতায় কোরিয়ার ভগ্নপ্রায় প্রশাসনের সংস্কার করা হোক, কিন্তু কোরিয়ার ওপর সার্বভৌমত্বের দাবি উত্থাপন করে চীন সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। পাশ্চাত্ত্য শক্তিপুঞ্জের সঙ্গে সংঘর্ষে যে চীন প্রতি পদে লাঞ্ছিত পদানত হয়েছিল, সেই চীনের পক্ষে কোরিয়ার প্রভুত্বের দাবি কাণ্ডাকাণ্ড মাত্রাজ্ঞানের অভাবই সূচনা করে। জাপান চীনের দাবি অগ্রাহ্য করে কোরিয়ার রাজপ্রাসাদ অধিকার করল, এবং রাজাকে করায়ত্ত করে একটি রাজকীয় ঘোষণা বের করল। সেই ঘোষণায় চীনের সঙ্গে কোরিয়ার সন্ধি বাতিল করে জাপানের সাহায্য প্রার্থনা করা হল চীনা সৈন্যদের বিতাড়িত করবার জন্য। তখন বাধল চীন জাপান উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ। এই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হয়েছিল অল্প দিনের মধ্যে, পরাজয়ের গভীর কলঙ্ক চীনের ললাটে অঙ্কিত হল। চীনা সৈন্যের সাহসের অভাব হয় নি, কিন্তু আধুনিক সমরোপকরণ তাদের ছিল সামান্যই, আর শিক্ষার অভাবে সেইসব অস্ত্রের উপযুক্ত ব্যবহারও তারা করতে পারে নি। তা ছাড়া চীনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ছিল ঘোর স্বার্থপর ও দুর্নীতিপরায়ণ।

জলে স্থলে চীনকে যুদ্ধে পরাজিত করে জাপান মাঞ্চুরিয়ার পোর্ট আর্থার ও সানটাং অন্তরীপের ওয়েই-হেই-ওয়েই বন্দরদ্বয় অধিকার করল। চীনা

সেনাপতিগণ আত্মহত্যা করল। জাপানী বাহিনী ইয়ালু নদী পার হয়ে পিকিং অভিমুখে অগ্রসর হল, কিন্তু মহাপ্রাচীর অতিক্রম করবার পূর্বেই চীনের পক্ষ থেকে সন্ধি-প্রস্তাব উথাপিত হল। জাপানের অভিপ্রায় অনুসারে চীনা প্রতিনিধিরা সিমোনোসেকি নামক একটি জাপানী শহরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি হল, স্থানের নামে সন্ধির নাম হল 'সিমোনোসেকির সন্ধি' (১৮৯৫)। এই সন্ধির শর্তমত চীন কোরিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করল এবং লিয়াওটুং উপদ্বীপ জাপানকে সমর্পণ করতে সম্মত হল। পোর্ট আর্থার বন্দর ও ডায়রন শহর এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান চীনের লিয়াওটুং উপদ্বীপের অন্তর্গত। ফরমোসা ও পেসকোডেরিস দ্বীপপুঞ্জের অধিকার সন্ধিসূত্রে চীনের কাছ থেকে জাপান আদায় করে নিল। তা ছাড়া চীনকে দিতে হল ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ, আরও চারটি বন্দর মুক্ত হল, এবং পরে একটি বাণিজ্যিক চুক্তিমত জাপানকে অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিগণের মত 'এক্স্‌ট্রাটেরিটোরিয়ালিটি'র অধিকার দেওয়া হয়েছিল। সিমোনোসেকি সন্ধির পর থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত জাপানের উন্নতি অব্যাহতভাবেই চলেছিল।

কিন্তু সন্ধিপত্রের কালি শুকিয়ে যাবার পূর্বেই জাপানের মুখের গ্রাসের গলাধঃকরণে বিঘ্ন দেখা দিল। রাশিয়া, ফ্রান্স ও জার্মানি এই তিন শক্তি মিলিতভাবে জাপানের লিয়াওটুং উপদ্বীপ অধিকারের বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করল, ফলে জাপান লিয়াওটুং উপদ্বীপ চীনকে প্রত্যর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল। ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের এই আপত্তি চীনের প্রতি অন্যায়ের প্রতিবাদ বলে মনে করলে ভুল বোঝা হবে, বরঞ্চ জাপানের হাতে চীনের অপমানকর পরাজয়ে উৎসাহিত হয়েই যেন এই পরাক্রান্ত পাশ্চাত্ত্য দেশগুলি চীনের শবদেহ ঠুকরে ছিঁড়ে ফেলতে লেগে গেল। প্রকৃতপক্ষে তাদের কাণ্ডকারখানা একটা নির্লজ্জ লুটের ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। ফ্রান্সকে টংকিং ও অনামে নূতন অধিকার দান করতে হল। জার্মানির বলপ্রয়োগে সানটাং অধিকার, রাশিয়ার পোর্ট আর্থার ও তালিয়েনওয়ান, ইংরেজের ওয়েই-হেই-ওয়েই এবং ফ্রান্সের কুয়াং-চৌ উপসাগরের ইজারা গ্রহণ এসব কাহিনী আমরা পূর্বে বর্ণনা করেছি। এখানে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, সন্ধিসূত্রে প্রাপ্ত লিয়াওটুং

উপদ্বীপের পোর্ট আর্থার বন্দর জাপানকে উদ্গার করতে হয়েছিল রাশিয়ার চাপে, আর সেই রাশিয়াই এখন ইজারা-সূত্রে পোর্ট আর্থার দখল করে বসল। রাশিয়ার এই আচরণ জাপান ভোলে নি, নয বছব পর রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপান পোর্ট আর্থার অধিকার করেছিল, এব, রাশিযাকে শোচনীয়-ভাবে পরাজিত করে পূর্ব অপমানের প্রতিশোধ বড হাতেই নিযেছিল (১৯০৪-১৯০৫)।

‘শত দিবসেব সংস্কার’ ও ‘মুষ্টিযোদ্ধা (বক্‌সাব) হাঙ্গামা’

১৮৯৪ খৃস্টাব্দে ক্ষুদ্র জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে মহাকায চীনেব অপ্রত্যাশিত পবাজয চীন দেশেব কয়েকজন চিন্তাশীল ব্যক্তিব চোখ খুলে দিযেছিল। বিদেশীদের হাতে চীনেব ক্রমবর্ধমান লাঞ্ছনা এব' সেই সঙ্গে প্রতিবেশী জাপানের অল্পকাল-মধ্যে সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও শক্তি অর্জনের কথা চিন্তা কবে তাদের বুঝতে বাকি রইল না যে চিরাগত শাসন-ব্যবস্থাব স'স্কার ও প্রাচীন কনফুসীয শিক্ষাধারাব আমূল পবিবর্তন না কবলে পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহের সঙ্গে প্রতিযোগিতায আত্মরক্ষা সম্ভবপব হবে না। তাই তারা পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান শিক্ষার ও রাষ্ট্রশাসন-পদ্ধতি প্রবতনের দাবি উত্থাপন কবলেন। স স্কারেব দাবিদারদেব প্রধান অগ্রণী ছিলেন ক্যা'ং ইউ ওযেই, তাঁর একজন সহযোগী সংস্কাবক ছিলেন সান ইযাৎ-সেন যিনি পবে বিপ্লবীরূপে জগতে প্রসিদ্ধ হযেছিলেন। সান ইযাৎ-সেন পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা লাভ করেছিলেন, আর ক্যা'ং ইউ-ওযেই ছিলেন কনফুসীয বিদ্যার পক্ষপাতী, সংস্কাব-কাযে তাঁবা দুটি ভিন্ন পথ ধরেই চলেছিলেন। প্রাচীন শিক্ষাকে ভিত্তি করে ক্যা'ং ইউ ওযেই একটি নূতন সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচি প্রস্তুত করেছিলেন, এবং সেই কর্মসূচিব মধ্যে ছিল কযেকটি বিশেষ সংস্কাব-কায, যেমন জাতীয গণ্ডী-বেখার অবলুপ্তি, চিবাচরিত পরিবার প্রথা বজন, ছেলে-মেযের শিক্ষা ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধাব পরিচযার ভার জাতীয প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর অর্পণ এবং সাধারণ নির্বাচন পদ্ধতি দ্বারা কর্মচাবী নিযোগ। অবশ্য এই কার্যক্রমটি ছিল সংস্কাবের চরম লক্ষ্য, আপাতত অপেক্ষাকৃত লঘু সংস্কাব-প্রচেষ্টার সমর্থন করা হযেছিল।

সংস্কাবকদের উৎসাহদাতা ছিলেন স্বযং সম্রাট কুযা' সু, কযেকজন

মন্ত্রীও ছিলেন সংস্কারের সমর্থক। ক্যাং-এর পরামর্শমত সম্রাট শিক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার বিষয়ক কয়েকটি বিধান প্রবর্তন করলেন। এইসব বিধানের ফলে পরবর্তী বৈপ্লবিক কালের তুলনায় পরিবর্তন ঘটেছিল সামান্যই, শুধু প্রাচীন শিক্ষার সঙ্গে বিজ্ঞানচর্চার আয়োজন, চাকরি-পরীক্ষার একটু রদবদল, রেলপথ প্রস্তুতের ব্যবস্থা, সামরিক ও নৌবাহিনীর পুনর্গঠন প্রভৃতি কয়েকটি কালোপযোগী সংস্কার মাত্র করা হয়েছিল। কিন্তু এই সামান্য কয়েকটি অনুষ্ঠানই প্রাচীনপন্থীদের অতিমাত্র বিচলিত করে তুলল, তারা রাজমাতা জু সি-র শরণাপন্ন হলেন। এই পরম শক্তিমতী নারী ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল প্রাচীনপন্থীদের পৃষ্ঠপোষক, পাশ্চাত্ত্যসমাজ তাঁর নাম দিয়েছিল 'বৃদ্ধা বুদ্ধ' ("Old Buddha")। সম্রাটের প্রগতিমুখী কার্যকলাপ বন্ধ করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে 'বৃদ্ধা বুদ্ধ' রাজ্যের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করলেন (১৮৯৮)। প্রাচীন ও নবীনপন্থীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সম্রাট ও রাজমাতার একটি ব্যক্তিগত বিরোধে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, এবং এই বিরোধে আক্রমণাত্মক প্রথম আঘাত করেছিলেন সম্রাট স্বয়ং। জুং লু নামে এক কুচক্রী ব্যক্তি ছিলেন রাজমাতা জু সি র বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা, জুং লু কে হত্যা করবার জন্য সম্রাট গোপনে আদেশ দিলেন। এই আদেশ পালনের ভার ছিল পরাক্রান্ত প্রদেশপাল ইয়াং সি কাই-র ওপর, কিন্তু এই শেষোক্ত ব্যক্তি জুং লু-র কাছে সম্রাটের অভিসন্ধির বিষয় ব্যক্ত করেন, এবং সে কথা শুনে বিধবা সম্রাজ্ঞী অবিলম্বে সম্রাটকে ধৃত করলেন। সম্রাট বন্দী হয়ে রইলেন এবং তাঁর নামে জু সি সাম্রাজ্য পরিচালনা করতে লাগলেন। তাঁর প্রথম কার্যই হয়েছিল সম্রাট কুয়াং সু প্রবর্তিত সংস্কার-বিধানগুলির প্রত্যাহার। এই সংস্কারগুলি প্রবর্তিত হয়েছিল মাত্র এক শত দিবস পূর্বে, আয়ুষ্কাল এক শ' দিন বলে সংস্কারগুলির নাম দেওয়া হয়েছে 'শত দিবসের সংস্কার'।

এইরূপে সংস্কারকদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল বটে, কিন্তু দেশকে বিদেশীদের কবল থেকে মুক্ত করবার প্রয়োজন ঘুচল না। চীন-জাপান যুদ্ধের পর বিদেশী শক্তিপুঞ্জের নির্লজ্জ লুণ্ঠন-প্রবৃত্তি, চীনকে ভাগাভাগির আয়োজন, ইজারার ছদ্ম নামে নানান স্থান দখল, এইসব আগ্রাসী কার্যকলাপ রক্ষণপন্থীদের পক্ষেও অসহ্য হয়ে উঠেছিল, এরূপ ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগে বিদেশী বিতাড়নের আয়োজন এবং তার ফলে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি নিতান্তই স্বাভাবিক। দেশে দুর্ভিক্ষের

দরুন খাদ্যাভাব এই হাঙ্গামার সম্ভাবনা আরও বৃদ্ধি করেছিল। ১৮৯৭ সালে হাঙ্গামার প্রথম সূত্রপাত হয়, এবং দুই বছর পর সেই হাঙ্গামার ব্যাপকভাবে পুনরাবির্ভাব ঘটে। এই হাঙ্গামার উদ্যোক্তা ছিল 'ই হো তুয়ান' বা 'ন্যায়ের সুসমঞ্জস মুষ্টি' নামক সমিতি (Society of Righteous Harmony Fists)। এই সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা ব্যায়াম অনুশীলন করত। ব্যায়াম-ক্রিয়া ও সমিতির নাম থেকে 'বক্সার' (Boxer) বা 'মুষ্টিযোদ্ধা' নামের উৎপত্তি। 'দেশ রক্ষা কর' 'বিদেশী ধ্বংস কর'—এই ছিল বক্সারদের জিগির। প্রাচীন কাল থেকে চীন দেশে রাজনৈতিক গুপ্ত সমিতির প্রাদুর্ভাব দেখা গেছে, যেমন হ্যান যুগের 'লাল ভুরু' ও 'হলদে পাগড়ি', পরবর্তী কালের 'শ্বেত পদ্ম' ও 'অষ্ট ত্রিগ্রাম' প্রভৃতি, এসব সমিতির উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লব সৃষ্টি। 'মুষ্টিযোদ্ধা রাও ছিল তেমনি একটি গুপ্ত সমিতির দলভুক্ত সামরিক সম্প্রদায়, এবং প্রাচীন সমিতিগুলির মত তাদেরও ছিল এই দৃঢ় বদ্ধমূল সংস্কার যে মন্ত্রতন্ত্রের দুর্ভেদ্য বর্ম দ্বারা শত্রুর মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রকেও প্রতিহত করা চলে।

১৮৯৮ খৃস্টাব্দে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে ইউরোপীয়দের ওপর ভয়ংকর আক্রমণ আরম্ভ হল। এই আক্রমণের সমর্থক ছিলেন অতিবৃদ্ধা রাজমাতা জু সি এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ ব্যক্তিগণ। রাজকর্মচারীদের আদেশ দেওয়া হল ফিরিঙ্গি উৎসাদনের জন্য, এই আদেশ কিন্তু সর্বত্র প্রতিপালিত হয় নি যদিও এ বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন সেনসি র রাজ্যপাল ইয়ু সিয়েন। আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হয়েছিল মিশনারীগণ, তারা দেশের নানান স্থানে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় অবস্থান করছিল। পিকিং-এ ইউরোপীয় ও জাপানী দূতাবাসগুলি বিক্ষুব্ধ জনতা কর্তৃক অবরুদ্ধ হল। দাঙ্গায় জীবননাশ ঘটেছিল অল্পই, অবশ্য উত্তর পূর্ব অঞ্চল ছাড়া। সেখানে দুই শতেরও অধিক বিদেশী মিশনারী ও কয়েক সহস্র চীনা খৃস্টান নিহত হয়েছিল। ইতিমধ্যে বিদেশীদের উদ্ধারার্থ বিদেশী শক্তিপুঞ্জের রণসজ্জা শুরু হয়েছিল। ১৯০০ সালে বিদেশীদের মিলিত বাহিনী পিকিং অধিকার করে দূতাবাসগুলিকে মুক্ত করল। বেগতিক বুঝে সম্রাটকে সাথে নিয়ে রাজমাতা পূর্বাহ্নেই দক্ষিণাঞ্চলে পলায়ন করেছিলেন। মিলিত বাহিনী গঠিত হয়েছিল ইংরেজ, ফরাসী, রাশিয়া, জার্মানি, জাপান ও আমেরিকা এই ছয়টি শক্তির সৈন্য-সমাবেশ দ্বারা। চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন নি তাঁরা। অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল চীন দখল নয়, চীনকে সমুচিত শিক্ষা দান, এবং এই

উদ্দেশ্যটি তাঁদের বিশেষভাবেই সিদ্ধ হয়েছিল। লুণ্ঠন, হত্যা, ধ্বংস, সকল রকম নির্মম নৃশংস অত্যাচার চীনবাসীকে নীরবে সহ্য করতে হয়েছিল। পাশ্চাত্ত্য সৈন্যগণ কর্তৃক মিং সম্রাট ইয়াং লো-র সুবিখ্যাত গ্রন্থাগার ভস্মীভূত হল। এই বর্বরোচিত কার্যের ফলে অনেক অমূল্য গ্রন্থ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, এবং সেজন্য জগতের সুধীসমাজের যে প্রভূত ক্ষতি হয়েছিল সত্যই তা অপূরণীয়।

পরিশেষে চীনা রাজশক্তিকে বিদেশীদের কাছে নতি স্বীকার করে তাদের ক্ষতির দাবিদাওয়া পূরণ করতে হয়েছিল। নানান অপমানকর শর্ত মেনে নেওয়া হয়েছিল, চুক্তিপত্রে চীনের নিকট থেকে ৪০টি বার্ষিক কিস্তিতে ৩৩ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ আদায় করবার ব্যবস্থাও লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। এই ব্যবস্থামত ক্ষতিপূরণের অর্থের জামিনস্বরূপ চীনের সামুদ্রিক শুল্ক, লবণ শুল্ক ও অন্যান্য রাজস্ব বাঁধা রাখা হয়েছিল।

চীন আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা পড়ল বটে, কিন্তু দেশের বাহ্যিক স্বাধীনতা রক্ষা পেল, চীনকে খণ্ডিত করে শক্তিপুঞ্জের মধ্যে বাটোয়ারা আর হল না।

রুশ-জাপান যুদ্ধ (১৯০৪-১৯০৫) : বিপ্লবের প্রাক্‌কাল (১৯০৫-১৯১০)

'বক্‌সার' হাঙ্গামার ফলে রাশিয়াই হয়েছিল সর্বাধিক লাভবান। ক্ষতি-পূরণের অংশ রাশিয়া সবচেয়ে বেশি পেয়েছিল, এখন সে মাঞ্চুরিয়া গ্রাস করতে উদ্যত হল। জাপানকে বঞ্চিত করে রাশিয়ার ইজারা-সূত্রে পোর্ট আর্থার অধিকার হয়েছিল জাপানের একটি পরম লাঞ্ছনা, সেই লাঞ্ছনার প্রতিশোধ নিতে জাপান কৃতসংকল্প হল। সুতরাং 'বক্‌সার' হাঙ্গামার পর রাশিয়া যখন চীনের পূর্বাঞ্চলের তিনটি প্রদেশ থেকে সৈন্য অপসারণ বিষয়ে গড়িমসি করতে লাগল, তখনই দেখা দিল রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাপানের যুদ্ধারম্ভের সুবর্ণ সুযোগ। ইংলণ্ড, আমেরিকা ও জাপান এই তিন শক্তি রাশিয়ার মাঞ্চুরিয়া অধিকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল, কিন্তু আমেরিকা যুদ্ধ করতে সম্মত হয় নি, আর ইংরেজ ছিল দক্ষিণ আফ্রিকায় 'বুয়র যুদ্ধ' নিয়ে বিব্রত। ১৯০২ অব্দে জাপান ইংরেজের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হল, সন্ধির মর্ম ছিল এই যে পক্ষদ্বয়ের কোন একটিকে একাধিক শক্তি আক্রমণ করলে অপর পক্ষ তাকে রক্ষা করতে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে। এইরূপে ইউরোপীয় শক্তি-

পুঞ্জের মিলিত আক্রমণের বিরুদ্ধে বাধা সৃষ্টির পর জাপান রুশ সৈন্যের অপসারণের দাবি জানিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হল। আলোচনা যখন ব্যর্থ হল জাপান তখন রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করল (১৯০৪)। যুদ্ধ চলেছিল মাঞ্চুরিয়ায়, চীন ছিল নিরপেক্ষ। আমেরিকার চেষ্টায় ও জাপ-বৃটেন সন্ধির ফলে যুদ্ধটি জাপান ও রাশিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, বিস্তৃত হয়ে পড়ে নি। আর মূল চীনা ভূখণ্ডের স্বাধীনতারও কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটে নি।

যুদ্ধে রাশিয়ার শোচনীয় পরাজয় ঘটল। জাপান অচিরেই পোর্ট আর্থার অধিকার করেছিল। রাশিয়ার প্রসিদ্ধ বলটিক নৌ-বহর উত্তমাশা অন্তরীপ অর্থাৎ অর্ধ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে প্রশান্ত মহাসাগরে এসে পৌঁছল, সেখানে অ্যাডমিরাল টোগো চৌদ্দ হাজার নৌ-সেনা সমেত সেই বিরাট নৌ-বহর সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করলেন। মুকডেনের যুদ্ধে রাশিয়ার স্থল-বাহিনী পরাজিত হল। ১৯০৫ অব্দে ইংলণ্ডের পোর্টসমাউথ নগরে ইংলণ্ডের মধ্যস্থতায় রুশ-জাপান সন্ধি স্থাপিত হল। এই সন্ধিসূত্রে রাশিয়া কোরিয়ায় জাপানের রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক অধিকার স্বীকার করল, লিয়াং তুং উপদ্বীপে রাশিয়ার অধিকার জাপানকে অর্পিত হল, দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলপথে রাশিয়ার স্বত্ব জাপান গ্রহণ করল, জাপানের উত্তরে অবস্থিত রাশিয়ার শাখালিন দ্বীপের নিম্নার্ধ জাপানকে সমর্পণ করা হল। পোর্টসমাউথ সন্ধির একটি পরিণতি ঘটেছিল, ১৯১০ সালে জাপানী সাম্রাজ্যে কোরিয়ার অন্তর্ভুক্তি।

দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধে বামনের এই জয়লাভ পৃথিবীকে চমৎকৃত করেছিল, সমগ্র এশিয়ায় নবজীবনের স্পন্দন ছুটিয়ে দিয়েছিল। ইউরোপীয় পুরুভুজ-বন্ধন থেকে মুক্তির সম্ভাবনা সমগ্র এশিয়ার মনে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, তার প্রমত্ত প্রভাব থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল না ভারত, না চীন। ১৯০৫-০৬ সালে চীনে শাসন-সংস্কার পুনঃপ্রবর্তন করবার আদেশপত্র বের করা হল। আধুনিক প্রণালীমত শিক্ষাদান, সৈন্যবাহিনী ও নৌ-বহর পুনর্গঠন, রেলপথ নির্মাণ, আফিং সেবন নিষিদ্ধকরণ, আইন ও শাসন-বিধানের পরিবর্তন, এই-সব ব্যবস্থা করবার জন্য মাঞ্চু সরকার উদ্যোগী হলেন, প্রাচীনপন্থীরাও তখন সংস্কারক হয়ে উঠেছিলেন। প্রাদেশিক ও স্থানীয় উপদেশ-সংসদ (Advisory Council) গঠিত হল, এবং একটি জাতীয় উপদেশ-সংসদ (National

Advisory Council) আহ্বান করে ১৯১৫ সালের পূর্বে 'জাতীয় পার্লামেণ্ট' গঠনের আয়োজন করবার আদেশ দেওয়া হল। বলা বাহুল্য, এক শতাব্দী পূর্বে যদি চীনা কর্তৃপক্ষ ও পণ্ডিতকুল সংস্কারের প্রয়োজন সম্বন্ধে এতটুকু সচেতন হতেন তা হলে চীনের পক্ষে দেড় শ' বছর ব্যাপী নিদারুণ পীড়ন লাঞ্ছনা এড়িয়ে যাওয়া নিশ্চয়ই কঠিন হত না।

১৯০৮ সালের ১৫ই নভেম্বর সম্রাট কুয়াং স্থ-র মৃত্যু হয়। পরদিন অতি-বৃদ্ধা রাজমাতা জু সি-ও মারা গেলেন। সম্রাট হলেন কুয়াং স্থ-র ভ্রাতুষ্পুত্র একটি শিশু, তাঁর রাজত্বকালীন নাম স্থয়ান তুং (১৯০৮-১৯১২)। এই শিশুই চীনের শেষ সম্রাট, মাঞ্চু রাজবংশের শেষ অবতংস।* লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে মাঞ্চু বংশের প্রথম সম্রাট ছিলেন একজন শিশু, সেই বংশের শেষ সম্রাটও হলেন একটি শিশু। প্রথম মাঞ্চু সম্রাট স্থন চি-র অভিভাবক ছিলেন পুরুষসিংহ ডুরগান, তাঁর সঙ্গে শেষ সম্রাটের অভিভাবক প্রিন্স চুন-এর যোগ্যতার কোন তুলনাই হয় না। অবিলম্বে তিনি সকল উচ্চ পদে অর্থগৃধ্নু মাঞ্চু অভিজাত বংশীয় ব্যক্তিদের প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। অদূরদর্শী কর্তৃ-পক্ষের দৃষ্টির অন্তরালে কৃষ্ণ মেঘ সঞ্চিত হয়েছিল, সেই মেঘই এখন প্রভঞ্জন-বেগে অগ্রসর হয়ে মাঞ্চু বংশের উচ্ছেদ করে সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করল। সনাতনী প্রথায় সম্রাটের শাসনাধীন চীনা জনসাধারণ এরূপ সাধারণতন্ত্রের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না।

চীন-তিব্বত সম্পর্ক : ইয়ংহাজবেণ্ড মিশন ও ম্যাকম্যাহোন লাইন

অষ্টাদশ শতাব্দের প্রথম ভাগে মাঞ্চু সম্রাট কাং সি-র রাজত্বকালে তিব্বত চীনের আওতায় এসে পড়েছিল, তারপর তিব্বতে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল, আর সে বিদ্রোহ দমন করেছিলেন সম্রাট চি'য়েন লুং, এসব বৃত্তান্ত আমরা যথাস্থানে বিবৃত করেছি। সে যুগে তিব্বতের ওপর সার্বভৌমত্ব রক্ষার উদ্যোগ-আয়োজন চীন যথেষ্ট করেছিল, দালাই লামার শাসনকার্য পর্যবেক্ষণের

* ভূতপূর্ব সম্রাট স্থয়ান তুং এখনো জীবিত। জাপানীদের কর-পুত্তলিকারূপে তিনি মাঞ্চুরিয়ার শাসনকর্তা হয়েছিলেন। তখন তিনি 'হেনরি পিউ' নাম গ্রহণ করেছিলেন। জাপানের পরাজয়ের পর তিনি কম্যুনিস্ট চীনে বন্দী হয়ে ছিলেন, সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছেন।

জন্য 'আমবান' বা চীনা প্রতিনিধি নিযুক্ত হয়েছিল, এবং চীন তার সৈন্য পাঠিয়ে নেপালের তিব্বত অভিযান প্রতিহত করেছিল (১৭৯২ খৃঃ)। তারপর চীন যখন আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও বহিঃশক্তিপুঞ্জের চাপে মৃতকল্প হয়ে পড়ল, তখন নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই তিব্বত নিজেকে অধীনতা পাশ থেকে কার্যত মুক্ত করেছিল, যদিও চীনের সার্বভৌমত্ব কখনো স্পষ্টভাবে অস্বীকার করা হয় নি। উনবিংশ শতকের শেষে কিন্তু একটি নূতন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। তিব্বতের প্রকৃত শাসনকর্তা দালাই লামা রুশ রাষ্ট্রদূত দরজিয়েফ-এর (Dorjieff) কবলে গিয়ে পড়লেন, এবং এই মর্মে একটি গুজবও রটল যে রাশিয়ার সঙ্গে চীন সন্ধি করে তিব্বতের ওপর তার সার্বভৌমত্বের অধিকার রাশিয়াকে সমর্পণ করেছে। বৃত্তান্তটা হয়তো সত্য নয়, কিন্তু ভারতের প্রান্তদেশে রুশ শক্তির সম্প্রসারণের ভয়ে বৃটেন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। তিব্বতের সঙ্গে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে যখন এ-বিষয়ে আলোচনা চালানো সম্ভব হল না, বৃটেন তখন ভারত থেকে কর্নেল ইয়ংহাজবেণ্ডের অধিনায়কত্বে একটি সামরিক 'মিশন' তিব্বতে প্রেরণ করল। মিশনের সঙ্গে ছিল সৈন্যবাহিনী, সেই বাহিনীকে প্রতিরোধ করবার শক্তি তিব্বতের ছিল না। রাজধানী লাসা অধিকৃত হল (১৯০৪), কিন্তু তার পূর্বেই দালাই লামা তিব্বত থেকে পালিয়ে গিয়ে উত্তর মোঙ্গলিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। তখন পরাভূত তিব্বতের সঙ্গে চুক্তি হল ইংরেজের, এবং তার শর্তমত তিব্বতকে বাধ্য হয়ে দিতে হল যুদ্ধের ব্যয় বাবদ প্রচুর অর্থ (indemnity), আর বাণিজ্যিক দ্রব্যাদি বিনিময়ের জন্য তিব্বতের কয়েকটি বাজারও মুক্ত করা হল। অর্থদানের জামিনস্বরূপ চামবি নদীর উপত্যকাটি ইংরেজ সাময়িকভাবে কবলিত করল।

ইয়ংহাজবেণ্ড-বাহিনী কর্তৃক তিব্বতের ওপর এই প্রচণ্ড আঘাতের ফলে চীনের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছিল। পলাতক দালাই লামাকে বরখাস্ত করে একটি ইস্তাহার বের করল চীন, কিন্তু তিব্বতীরা সেই ইস্তাহার অগ্রাহ্য করা সত্ত্বেও দালাই লামা পিকিং গিয়ে চীন সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ করলেন। ১৯০৯ সালে তিব্বতে ফিরে গিয়ে তিনি দেখলেন চীনা কর্তৃপক্ষের অমানুষিক ক্রিয়াকলাপ আর জনগণের মর্মান্তিক দুর্দশা। বিরক্ত হয়ে তিনি বিশ্বমানবের কাছে নির্যাতনকারীদের হাত থেকে তিব্বতকে মুক্তিদানের

ব্যবস্থা করবার জন্য প্রার্থনা করলেন এবং সিকিমে প্রবেশ করে ভারতবর্ষের আশ্রয় নিলেন। তখন চীন তাঁকে দ্বিতীয়বার পদচ্যুত করল। দালাই লামা বৃটিশ-রাজ সপ্তম এডোয়ার্ড ও রাশিয়ার জার নিকোলাসকে ব্যক্তিগতভাবে পত্র লিখলেন, কিন্তু তাতে কোন ফলই হল না। কারণ ইতিমধ্যে রাশিযার সঙ্গে বৃটেনেব মনকষাকষি দূর হযেছিল দুটি চুক্তির ফলে। একটি চুক্তি বৃটেন সম্পাদিত করে ১৯০৬ সালে, পূর্ব চুক্তি পরিবর্তন করে নূতন চুক্তি। ইংরেজ প্রতিশ্রুতি দিল যে তিব্বতের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার দায়িত্ব চীনের এবং শুধু চীনই তিব্বতের অভ্যন্তরে সুযোগ-সুবিধাব অধিকারী হবে। দ্বিতীয় চুক্তিটি হল বৃটেন ও রাশিযার মধ্যে ১৯০৭ সালে। উভয় রাষ্ট্রশক্তিই তিব্বতের ওপর চীনেব সার্বভৌমত্ব মেনে নিয়ে প্রতিশ্রুতি দিল যে তিব্বত সংক্রান্ত ব্যাপারগুলি তারা আলোচনা করবে চীনের মাধ্যমে, এবং তিব্বতে তারা কোন প্রতিনিধি রাখবে না, সুযোগ-সুবিধাও দাবি কববে না। এরূপ অবস্থায় তিব্বত উদ্ধারেব জন্য দালাই লামার সাহায্যভিক্ষা যে অরণ্যে রোদন মাত্র হয়ে দাঁড়াল, তাতে আশ্চর্য কি? এই প্রসঙ্গে স্যর চার্লস বেল-এর উক্তিটি উল্লেখযোগ্য: "By going and then coming out again, we knocked the Tibetans down and left them for the first comer to kick"

বস্তুত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িযেছিল সেই রকমই। ইংবেজ সরে আসার ফলে চীন আবাব এখন সেখানে আসর জাঁকিযে বসল। আশ্চর্যেব বিষয় এই যে চীনা বাষ্ট্রদূত চ্যাং ইন ট্যাং তখন শুধু তিব্বতের ওপব চীনেব অধিকার নিযেই তুষ্ট হলেন না, নেপাল ও ভুটানের ওপরও সার্বভৌমত্ব সম্প্রসারণের দাবি করেছিলেন। ১৯০৮ সালে ইংবেজ ও চীনের মধ্যে যে বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের চুক্তিপত্র সম্পাদিত হযেছিল তাব ফলে ইংরেজ ও ভারতবাসীর গিয়ানসি ছাড়িয়ে তিব্বতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবার অধিকার লুপ্ত হল, সেই সঙ্গে চীনও তখন বাণিজ্য শুল্ক আদায় করে এবং প্রতিরক্ষার জন্য সৈন্য মোতায়েন রেখে তার সার্বভৌমত্বের গাঁটছড়ায় তিব্বতকে আরও আঁটসাঁট করে বাঁধবার অভূতপূর্ব সুযোগ লাভ করেছিল।

কিন্তু ঈশান কোণে তখন নূতন ঝড়ের লক্ষণ দেখা দিযেছিল। দালাই লামা ভারতে পালিয়ে এসে অবস্থান করছেন, এমন সময় চীনে ঘটল রাষ্ট্র-

বিপ্লব (১৯১১)। এই বিপ্লবে শুধু যে মাঞ্চু রাজবংশের পতন ঘটল তা নয়, চিরকালের রাজতন্ত্রের বিলুপ্তি এবং তার স্থানে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। চীনের এই আপদকালীন ডামাডোলের সুযোগ নিয়ে তিব্বতে বিদ্রোহ জেগে উঠতে বিলম্ব হল না। ১৯১২ সালে দালাই লামা তিব্বতে প্রত্যাবর্তন করেন। চীনা সৈন্যগণ সেখানে তিব্বতীদের কাছে আত্মসমর্পণ করল, রাজধানী লাসা আবার তিব্বতীদের অধিকারে ফিরে এল। কিন্তু তিব্বতের পূর্বাঞ্চল হতে চীনা সৈন্যরা বিতাড়িত হয় নি, পূর্ব তিব্বত রইল চীনাদেরই দখলে। ১৯১৩-১৪ সালে ভারত সরকারের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী সিমলা শৈলে ইংরেজ, চীনা ও তিব্বতী প্রতিনিধিদের একটি বৈঠক বসে। সেই বৈঠকে ব্রিটিশের প্রতিনিধি ছিলেন ভারত সরকারের একজন সেক্রেটারি, তাঁর নাম স্যর হেনরি ম্যাকম্যাহোন। এই বৈঠকে সমগ্র তিব্বতের ওপর চীনের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে চীনও প্রতিশ্রুতি দিল যে তিব্বতের নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ক্ষুন্ন করে তাকে চীনের একটি প্রদেশে পরিণত করা চলবে না। তিব্বতকে দুটি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছিল, একটি বহিরঞ্চল (Outer Tibet) যা চীন থেকে দূরে অবস্থিত, আর একটি অন্তর্বর্তী অঞ্চল (Inner Tibet) যা চীনের নিকটে অবস্থিত। বৈঠকে এই চুক্তি হল যে বহিরঞ্চল থাকবে স্বায়ত্তশাসিত, সেখানে চীন কোন সৈন্যবাহিনী অথবা সামরিক কি অসামরিক কর্মচারী প্রেরণ করবে না। তা ছাড়া এই চুক্তিপত্রে একটি মানচিত্রও সন্নিবিষ্ট করা হয়েছিল, ভারতের পূর্বাঞ্চল ও তিব্বতের মধ্যে সাত-আট শ' মাইল দীর্ঘ সীমান্তরেখা চিহ্নিত করে। মানচিত্রের এই সীমান্তরেখা যা ভুটানের উত্তর-পূর্ব প্রান্ত থেকে হিমালয়ের উচ্চ শিখর ও জলাশ্রয় ধরে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত, সেই রেখাচিহ্নকেই সুপ্রসিদ্ধ 'ম্যাকম্যাহোন লাইন' নাম দেওয়া হয়েছে।

তিন রাষ্ট্রের তিনজন প্রতিনিধি কর্তৃক স্বাক্ষরিত এই চুক্তিপত্র কিন্তু চীনা সরকার সরাসরিভাবেই অগ্রাহ্য করল। ১৯১৪ সালের জুন মাসে পিকিং-এর বৃটিশ রাজদূত ঘোষণা করলেন যে ইংলণ্ড ও তিব্বত মনে করে যে চুক্তিপত্রে প্রতিনিধিগণের স্বাক্ষরই সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ কর্তৃক শর্তগুলির চূড়ান্ত গ্রহণ ব্যঞ্জনা করে, সুতরাং চুক্তিপত্রটি 'র‍্যাটিফাই' বা নৈষ্ঠিকভাবে মেনে নেবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। চুক্তিপত্রের এই 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বেধে গেল। চীন তখন ঘোষণা করল যে সীমান্তচিহ্ন ব্যতীত অন্য সব শর্তগুলি চীন গ্রহণ করতে প্রস্তুত। অর্থাৎ তিব্বতের বহিরঞ্চলের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন অধিকারকে চীন গ্রহণ করে নিয়েছিল। বলা আবশ্যক, সীমান্ত সম্বন্ধে চীনের আপত্তি ছিল শুধু তিব্বতেব অন্তর্বর্তী অঞ্চল ও চীনের মধ্যকার সীমারেখা নিয়ে, তিব্বত ও পূর্ব ভারতের মধ্যস্থিত ম্যাকম্যাহোন লাইন নিয়ে কোন প্রশ্ন ওঠে নি।

৫ মাঞ্চু যুগের শাসনতন্ত্র, আইন-আদালত ও সমাজব্যবস্থা

চীনের সুদীর্ঘ কালের ইতিহাসে প্রশাসন-ক্ষেত্রে যে অভূতপূর্ব সাফল্যের নিদর্শন আমরা যুগে যুগে দেখে এসেছি, সমসাময়িক কালে জগতে কোথাও তার তুলনা ছিল না। শাসন-ব্যবস্থার গুণে সুবিশাল চীন সাম্রাজ্য সুসম্বদ্ধ ঐক্যসূত্রে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পযন্ত, সে ঐক্য শুধু রাজনৈতিক নয়, সাংস্কৃতিকও বটে, সেরূপ ঐক্যের ঘনসন্নিবিষ্ট রূপ ইউরোপে কি ভারতবর্ষে কখনো দেখা যায় নি। অতি প্রাচীন চৌ-যুগের পবস্পর বিবদমান সামন্ত-রাষ্ট্রগুলির উচ্ছেদ সাধন কবে একীকৃত বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করেছিলেন চি'ন বংশী-সম্রাট সি হুযাং তি খৃস্ট পূর্ব তৃতীয় শতাব্দে, নব-প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে তিনি নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করেছিলেন। তারপর কত যুগান্তের পরিবর্তনশীল অবস্থা-চক্রেব আবর্তন, কত রাজবংশের উত্থান-পতন ঘটল, সেই সঙ্গে শাসন-ব্যবস্থাব কিছু কিছু রদবদল হযেছিল বটে, কিন্তু প্রশাসনের আসল কাঠামোটি অপরিবর্তিতই থেকে গিযেছিল। আমরা দেখেছি, মাঞ্চু রাজত্বের প্রথম দিকে চীন সাম্রাজ্যের আযতন অসাধাবণরূপে বৃদ্ধি পেয়েছিল, এমন কি মোঙ্গলিয়া, তিব্বত ও টংকিং পর্যন্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হযেছিল। প্রাচীন কাল থেকে সুবৃহৎ চীন সাম্রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত না হয়ে অখণ্ড একত্ব বক্ষা করেছিল, চীন ক্রমে মহাচীনে পরিণত হযেছিল, তার কারণ চীনের চিরাগত শাসন-ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার ভিত্তিমূল প্রতিষ্ঠিত ছিল্ল কনফুসীয় নীতিধর্মের ওপর, আর প্রশাসনে সাফল্যের কারণ এই নীতিধর্ম। কিন্তু এই শাসন-ব্যবস্থা নিখুঁত ছিল না, তা

যদি হত, তা হলে বিদেশীদের হাতে চীনের লাঞ্ছনা অমন অনিবার্য হয়ে উঠত না। জাতির অক্ষয় সম্পদ কনফুসীয় নীতি, শত বিপর্যয়েও যে নীতির পরিবর্তন ঘটে নি, আশ্চর্যের বিষয় এই যে সেই অপরিবর্তনীয় কনফুসীয় ঐতিহ্যই চীনকে জাতীয় অবনতির চরম সীমায় টেনে নিয়ে চলেছিল। এক দিকে কনফুসীয় ঐতিহ্য সমগ্র সাম্রাজ্যকে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ করে রেখেছিল চিরাগত শাসন ব্যবস্থার দ্বারা, অপর পক্ষে সেই ঐতিহ্য সনাতনত্বের দাবি নিয়ে দেশকে সংস্কারবিমুখ করে তুলেছিল, এবং সেই সঙ্গে দেশের অগ্রগতির বিষম বাধা সৃষ্টি করেছিল।

আদিকাল থেকে চীনে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা রাজতন্ত্রের ভিত্তির ওপর, কিন্তু এই রাজতন্ত্রটি এমন যে তার প্রতিরূপ আর কোথাও দেখা যায় না। সম্রাট 'স্বর্গ' বা ঈশ্বরের সন্তান, 'স্বর্গের পরোয়ানা' (Mandate of Heaven) বলে প্রজা শাসন করেন, এবং এই পরোয়ানা বলবৎ থাকে ততদিন যতদিন না কুশাসন বা দুর্ভিক্ষ, বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে প্রজাদের মনে অসন্তোষ-বহ্নি জ্বলে না ওঠে। ষড়বিধ কনফুসীয় সম্বন্ধের মধ্যে রাজা-প্রজার সম্বন্ধ, বিশেষত রাজার প্রতি প্রজার আনুগত্য সমাজব্যবস্থায় একটি প্রধান স্থান লাভ করেছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও দুর্দশাগ্রস্ত উৎপীড়িত প্রজাদের বিদ্রোহ করবার অধিকার অস্বীকৃত হয় নি। অতীতকালে এরূপ প্রজা-বিদ্রোহের ফলে রাজবংশের পরিবর্তন অনেকবার দেখা গেছে, কিন্তু মাঞ্চুদের সুদীর্ঘ রাজত্বকালে তা'ই পিং বিদ্রোহের পূর্বে তেমন কোন প্রজা বিদ্রোহ মাথা তুলতে পারে নি, তার কারণ এ নয় যে মাঞ্চু শাসন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। মাঞ্চুরা ছিল দেশের শাসক সম্প্রদায়, তাদের শাসন ছিল অত্যন্ত কঠোর, চীনাদের সঙ্গে তাদের বিবাহ-সম্বন্ধ পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল। প্রশাসন-ক্ষেত্রে দায়িত্বপূর্ণ পদগুলির অর্ধসংখ্যক পদ মাঞ্চুদের জন্য সংরক্ষিত হয়েছিল। মাঞ্চু প্রথামত চুলের বেণী বাঁধতে চীনাদের বাধ্য করা হয়েছিল, অন্যথায় শিরশ্ছেদ-দণ্ড দান করা হত। স্বভাবতই মাঞ্চু শাসকেরা ছিল সংস্কার-বিরোধী কনফুসীয় প্রাচীনপন্থীদের পৃষ্ঠপোষক, যেহেতু নিজেদের স্বার্থ কায়েম রাখার পক্ষে রক্ষণশীল নীতির অনুসরণই তারা সমীচীন মনে করত। কনফুসীয় শিক্ষা-পদ্ধতির কোন পরিবর্তনই তারা কামনা করে নি, দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কনফুসীয় নীতি-শাস্ত্রকেই একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থরূপে গ্রহণ করে বিজ্ঞানের

প্রগতিশীল শিক্ষাকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। দেশের শাসক ও রাজকর্মচারীরা সকলেই ছিল এই কনফুসীয় ধারায় শিক্ষিত, সময়োপযোগী পরিবর্তনের কোন ধারই তারা ধারে নি। দুর্ভাগ্যক্রমে মাঞ্চুরা ছিল বিদেশী, রাজ্যচ্যুতির ভয়ে শাসন-ব্যবস্থার প্রাচীন কাঠামোকে আরও শক্ত করে বেঁধে দিয়েছিল। সম্রাটেরা মাঞ্চু না হয়ে যদি চীনা হতেন তা হলে হয়তো বা ট্যা'ং বংশের গ্রহিষ্ণু মনোবৃত্তি, যে মনোবৃত্তি আগ্রহভরে বিদেশী সংস্কৃতিকে বরণ করে নিয়েছিল, তেমনি কোন জীবনধর্মী মনোবৃত্তির পুনরাবির্ভাব ঘটা বিচিত্র ছিল না। আর তা যদি ঘটত তবে চীনকে আমরা কচ্ছপের চাড়ির মধ্যে আবদ্ধ না হয়ে জাপানের মত পরাক্রমভরে প্রগতিশীল বিশ্বের মঞ্চে ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখতে পেতাম।

মাঞ্চু সাম্রাজ্য ছিল ১৮টি 'সেং' বা প্রদেশে বিভক্ত। প্রত্যেকটি প্রদেশে একজন প্রদেশপাল ও দুইটি প্রদেশে একজন রাজ-প্রতিনিধি (Viceroy) নিযুক্ত ছিল, তারা দুজন পরস্পরের কার্যকলাপের প্রতি দৃষ্টি রেখে প্রশাসনের ভারসাম্য (checks and balances) রক্ষা করত। তা ছাড়া সম্রাট নিজস্ব পর্যবেক্ষক নিযুক্ত করতেন, তারা বিভিন্ন প্রদেশ পরিদর্শন করে রাজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে রাজদরবারে রিপোর্ট পেশ করত। এইরূপে প্রাদেশিক শাসনকে কেন্দ্র-শক্তির আয়ত্তে রাখবার বিধিব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রত্যেক প্রদেশ (সেং) কয়েকটি 'চৌ' বা 'ফু' অর্থাৎ জেলায় বিভক্ত ছিল, আর জেলাগুলি ভাগ করা হয়েছিল কয়েকটি মহকুমায় (সিয়েন ও তি'ং)। সর্বত্রই কর্মচারী বহাল করত কেন্দ্র-শক্তি চাকরি পরীক্ষার ফল অনুসারে, এরূপ ব্যবস্থা ট্যা'ং যুগেও প্রচলিত ছিল। কিন্তু মাঞ্চু রাজত্বকালে মাঞ্চুদের স্বতন্ত্র পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল সংরক্ষিত অর্ধাংশ পদে তাদের নিযুক্ত করবার জন্য। এই শাসক সম্প্রদায় ছিলেন বিচারক, পুলিশের কর্তা, ধর্মানুষ্ঠানের উদ্যোক্তা, কর সংগ্রাহক, এক কথায় সর্বপ্রকার প্রজা-শাসন ও প্রজা-পালন ব্যবস্থার পরিচালক। তাঁরাই ছিলেন প্রজাদের 'পিতৃ-মাতৃ' স্থানীয়।

কেন্দ্রে ছিল একটি 'মহা-সংসদ' (Grand Council), এই সংসদের চীনা নাম 'চুন চি চু'। 'মহা-সংসদ' মাঞ্চুরা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন (১৭৩০ খৃঃ)।

সংসদের সদস্য-সংখ্যা ছিল অনির্দিষ্ট, অনেক সময়েই চার-পাঁচ জনের বেশি ছিল না, এই সংখ্যার অর্ধাংশ ছিল মাঞ্চু। শান্তিরক্ষা প্রভৃতি সকল প্রকার গুরুত্বপূর্ণ আভ্যন্তরীণ কার্য ও যুদ্ধাদি ব্যাপার এই সংসদ কর্তৃক পরিচালিত হত। আর একটি সংসদ ছিল, সেটি 'গুহ্য সংসদ', মহা-কারণিক (Grand Secretariat), চীনা নাম 'নেই কো'। এই সংসদটি গঠিত হয়েছিল মিং যুগে, মাঞ্চুকালে এটির অস্তিত্ব ছিল নামমাত্র, 'মহা-সংসদ'ই প্রধান হয়ে উঠেছিল। এই দুইটি সংসদ ব্যতীত 'ছয়টি বোর্ড' ছিল, যেমন ছিল প্রাচীন ট্যাং যুগে। বোর্ড ছয়টি এই: (১) 'লি পু' বা সরকারী দপ্তর বোর্ড, (২) 'হু পু' বা রাজস্ব বোর্ড, (৩) 'লি পু' বা ধর্মানুষ্ঠানসমূহের বোর্ড, (৪) 'পিং পু' বা যুদ্ধের বোর্ড, (৫) 'সিং পু' বা শাস্তির বোর্ড অর্থাৎ আইন বোর্ড, (৬) 'কুং পু' বা সরকারী কার্য বোর্ড, অর্থাৎ পি. ডবলু ডি। বোর্ডগুলির নামেই তাদের কর্তব্য কর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম বোর্ড লি পু-র কায ছিল শাসক ও সরকারী কর্মচারীদের প্রতি কেন্দ্র-সরকারের নির্দেশ দান। প্রত্যেকটি বোর্ডের ছিল একজন মাঞ্চু ও একজন চীনা প্রেসিডেণ্ট, দুজন মাঞ্চু ও দুজন চীনা ভাইস প্রেসিডেণ্ট, সচিব ও কেরানীর দল। প্রত্যেকটি বোর্ড বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত ছিল। লি পু বা ধর্মানুষ্ঠান বিভাগের অন্তর্গত ছিল 'সংগীত বিভাগ', এই বিভাগের কায ছিল ধর্মানুষ্ঠানসমূহে সংগীতের ব্যবস্থা করা।

সিভিল সার্ভিস বা সরকারী চাকরি পরীক্ষা চীন দেশে স্মরণাতীত কাল থেকে প্রবর্তিত ছিল, সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে। পরীক্ষার বিষয় ছিল প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ, কনফুসীয় নীতিধর্ম, প্রবন্ধ ও কবিতা রচনা ইত্যাদি। প্রতি জেলায় প্রত্যেক প্রদেশের প্রধান নগরে সরকারী কর্তৃত্বাধীনে শিক্ষায়তন পরিচালনা ও পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। পরীক্ষায় ডিগ্রী দেওয়া হত তিনটি, সিউ সা'ই, চু জেন, চিন সি, এই তিন ডিগ্রী পযায়ক্রমে বি. এ, এম এ ও ডক্টর উপাধির সমতুল্য। উপাধিধারী ব্যক্তিদের গুণানুসারে মহকুমা ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট থেকে প্রদেশপাল ও মন্ত্রী পর্যন্ত বড় ছোট সকল রকম সরকারী পদে তাদের নিযুক্ত করা হত। চিন সি বা ডক্টর উপাধি-ধারীগণ 'হ্যানলিন ইউয়ান' বা শিক্ষা বিভাগের শ্রেষ্ঠ পদলাভ করত। উপাধিধারীদের পাঠাভ্যাস বজায় রাখবার জন্য প্রতি তিন বৎসর অন্তর

তাদের পুনর্পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল। এই শিক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটি সহজেই অনুমান করা যায়। সাহিত্যিক ভাষায় কৃত্রিম রচনা-শৈলীর ওপর আর প্রাচীন পদ্ধতিমত স্মৃতিশক্তির অনুশীলনের ওপর অধিকতর জোর দেবার ফলে পরীক্ষার্থীদের মৌলিক চিন্তা ও শাসন পরিচালনা সম্বন্ধে যোগ্যতা প্রমাণ করবার অবকাশ ছিল না। তা ছাড়া এইসব পণ্ডিত শাসকদের বুদ্ধিবৃত্তি সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বাঁধা থাকত, তারা হয়ে উঠত প্রগতি-বিরোধী। কিন্তু এতসব ত্রুটি সত্ত্বেও এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে মহাচীনের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ঐক্যের 'লৌহ-কাঠামো'স্বরূপ ছিল এই পণ্ডিত শাসক-মণ্ডলী।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণাধীনে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। গ্রাম্য বৃত্তিজীবি-সংঘ (guild) ও পরিবার-মণ্ডলী ছিল স্বায়ত্তশাসনের প্রধান ক্ষেত্র। এইরূপে সমগ্র চীন দেশ জুড়ে স্বায়ত্তশাসন প্রসারিত হয়েছিল, যদিও সেই স্বায়ত্তশাসন দেশের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছিল। পরিবার, শিল্পী-কারিগর-ব্যবসায়ীদের সংঘ ও গ্রাম্য পঞ্চায়েত নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যে নিয়ম বা রীতি অনুসারে শাসন পরিচালনা করত, সরকারী কর্মচারীদের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হত যখন প্রতিষ্ঠানগুলির কাজে বিষম ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটত অথবা তাদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ দেখা দিত, কিংবা যখন কোন গুরুতর অপরাধ সংঘটিত হত। উচ্চবংশীয় ব্যক্তি, পণ্ডিত ব্যক্তি, সচ্চরিত্র কর্মদক্ষ ব্যক্তি, এমনি সব জনবরেণ্য বিশিষ্ট গ্রামিকদের নিয়ে গ্রাম্য পঞ্চায়েত গঠিত হত, তাঁদের মধ্যে একজন হতেন 'তি পাও' অর্থাৎ 'প্রধান' বা 'মণ্ডল'। এই 'মণ্ডল' নির্বাচিত হতেন না, গ্রামবাসীদের মতামত নিয়ে স্থানীয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে তি পাও নিযুক্ত করতেন। শুধু গ্রাম নয়, বড় বড় শহরেও স্বায়ত্তশাসনের প্রচলন ছিল, শহরের ভিন্ন ভিন্ন ওয়ার্ডে পঞ্চায়েত কমিটি ও তি পাও নিযুক্ত করা হত। পঞ্চায়েত কমিটি ও তি পাও-র প্রধান কাজ ছিল রাজপথগুলি আলোকিত করা, চৌকিদারি ব্যবস্থা, বাঁধ নির্মাণ ও রক্ষা, নগর ও গ্রামের প্রাচীর নির্মাণ ও রক্ষা, পূর্তকার্য, রাষ্ট্রীয় কর আদায়, গ্রাম্য ব্যক্তিগণের বিবাদ মীমাংসা। বিবাদ গুরুতর হলে স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নালিশ রুজু করা হত। মকদ্দমা পরিচালনা ছিল বিলক্ষণ ব্যয়সাধ্য।

চীনের আইন প্রধানত ঐতিহ্য ও প্রথা অবলম্বনে প্রণয়ন করা হয়েছিল। কনফুসীয় নীতিতত্ত্বে 'লি' নামে একটি স্বভাবধর্মের উল্লেখ আছে, সেই গুণের প্রভাবই মানবীয় আচরণগুলিকে সুসমঞ্জস প্রাকৃতিক সৌষ্ঠবে মণ্ডিত করে। এই 'লি' বা প্রাকৃতিক গুণধর্মকেই আইনের মূল সূত্ররূপে কল্পনা করা হয়েছে, কেননা প্রকৃতির নিয়মমত সমাজ-মধ্যে মানুষের সুসম্বদ্ধ সুনিয়ন্ত্রিত আচার-ব্যবহারের বিধানই আইন। কিন্তু কনফুসীয় নীতিধর্ম রাষ্ট্র কর্তৃক আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করে নি, পক্ষান্তরে আইনের কঠোর শাসন দ্বারা সমাজ-শৃঙ্খলা রক্ষা করাই ছিল 'লেজিস্ট' বা 'আইন-সেবী' সম্প্রদায়ের মূল মন্ত্র। এই 'আইন সেবী'দের প্ররোচনায় খৃস্ট পূর্ব তৃতীয় শতাব্দে সম্রাট সি হুয়াং তি কনফুসীয় নীতিধর্মের মূলোচ্ছেদ করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং পরবর্তী হ্যান যুগে কিরূপে সেই নীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল, আমরা তা ইতিপূর্বে দেখেছি। কিন্তু নীতিধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও যে আইন প্রণয়ন ব্যবস্থা চি'ন বংশীয়রা প্রবর্তন করে গিয়েছিলেন, সেই ব্যবস্থাই যুগে যুগে চলে এসেছিল যদিও পরবর্তী কালে মাঝে মাঝে এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করা হয়েছিল। মাঞ্চু যুগে আইনের একটি কোড প্রণীত হয়েছিল, সেই কোডটির নাম 'তা চিং লু লি'। মিং যুগের 'লু' নামক আইনকে ভিত্তি করে এই কোড রচিত হয়েছিল। সামাজিক, আর্থিক, ধর্মীয়, সামরিক ও ফৌজদারী আইনসমূহ 'লু'র অন্তর্গত। চীনের ফৌজদারী আইনের বিশেষত্ব 'যৌথ দায়িত্ব', অর্থাৎ অপরাধের শাস্তিস্বরূপ সমগ্র পরিবারকে দণ্ডিত করা আইনসিদ্ধ ছিল। আইন-সাহিত্যের পরিমাণ ছিল প্রভূত, মকদ্দমার রায় লিপিবদ্ধ করে সযত্নে রক্ষিত হত, এবং মামলায় নজির রূপে ব্যবহৃত হত।

চীনের ব্যবহার-বুদ্ধি চিরদিন সমাজ শৃঙ্খলার সৌকর্যার্থে অর্থনৈতিক উদ্যোগকে জাগ্রত করে রেখেছিল, এবং সেজন্যেই আমরা হ্যান যুগের ওয়াং মেং ও সুং যুগের ওয়াং আন-সি-কে বৈপ্লবিক অর্থনীতির আশ্রয় গ্রহণ করতে দেখেছি। বস্তুত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা চীনের অপরিচিত ছিল না। বিদেশী মাঞ্চুদের আমলে কিন্তু সর্বপ্রকার সংস্কারের প্রয়াস লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, এবং চলতি ব্যবস্থাকে চালু রাখা, যাকে বলে *laissez faire*, সেই ব্যবস্থাই প্রকৃষ্ট নীতিরূপে গৃহীত হয়েছিল। ব্যক্তিগত স্বার্থ (vested interest)

রক্ষা করাই ছিল রাষ্ট্রের প্রধান কর্ম। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে সরকার অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ করত, দৃষ্টান্তস্বরূপ মুদ্রা-নীতির (coinage) উল্লেখ করা যেতে পারে। এই মুদ্রা প্রস্তুতের অধিকার ছাড়াও লবণের ব্যবসা ছিল সরকারের একচেটিয়া। খাদ্যমূল্যের দেশব্যাপী নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারী শস্যগোলাসমূহে শস্য মজুত রাখা হত, আর সেই শস্য ঘাটতি অঞ্চলে সরবরাহ ও বিক্রয় করা হত। ভূমির কর ছিল সরকাবী আয়ের প্রধান উপায়, এই রাজস্ব নগদ অর্থে অথবা শস্যাদিতে সংগৃহীত হত। তা ছাড়া রেশম, খনিজ তাম্র ও উৎপন্ন শস্যের ওপর শুল্ক ধার্য করা হত।

চীনের রাষ্ট্র ব্যক্তির স্বার্থরক্ষার জন্য বিশেষ উদ্যোগী হলেও ব্যক্তিকে কখনো পূর্ণ স্বাধীনতা দান করে নি। সমাজ-জীবনে ব্যক্তির কর্তব্য কর্ম নিয়ন্ত্রিত করত নানান স্থানীয় বেসবকাবী প্রতিষ্ঠান, যেমন পরিবাব (family), শিল্পী-কাবিগর-ব্যবসায়ী সংঘ (guilds) ইত্যাদি। পরিবার ও সংঘ দেশের ঐতিহ্য বা স্থানীয় প্রথা অনুসারে নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যে ব্যক্তিকে পরিচালিত করত, এই পরিচালনা ব্যাপারে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করত কদাচিৎ। স্পষ্টই দেখা যায়, এই ব্যবস্থাব সঙ্গে পাশ্চাত্য ধনতন্ত্রের সাদৃশ্য বিশেষ কিছুই নেই। যন্ত্রযুগের শুরু থেকে ইউরোপে শিল্প-মালিকেরা ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠেছিল, কিন্তু চীনে কোন যন্ত্রশিল্প গড়ে ওঠে নি, তাই ধনিকশ্রেণীর হাতে কাঁচা অর্থ সঞ্চিত হবার কোন সুযোগ ঘটে নি। চীনে ধনীদের ছিল ভূসম্পত্তি, বন্ধকী দোকান, বহুমূল্য পোশাক-পরিচ্ছদ, রত্নালংকার ও স্বর্ণ-রৌপ্য। শত শত লোকের অর্থে পরিচালিত 'জয়েন্ট স্টক' কোম্পানি ছিল না, 'স্টক একস্‌চেঞ্জ'ও ছিল না। শিল্পী, কারিগর ও ব্যবসায়ীদের সংঘ বা 'গিল্ড্'-এর উৎপত্তি হয়েছিল স্মরণাতীত কালে, বস্তুত সংঘ পরিচালনায় চীনাদের মত দক্ষতার পরিচয় জগতের অতি অল্প জাতিই দান করতে সক্ষম হয়েছে। নাপিত, রাজমিস্ত্রী, ছুতার, পাচক, কথক, অভিনেতা, এমন কি ভিক্ষুক ও অন্ধ প্রভৃতিরও এক একটি পৃথক সংঘ ছিল। সংঘগুলিতে মালিক ও শ্রমিক উভয়েরই স্থান ছিল, যদিও আধুনিক ট্রেড ইউনিয়নের মত প্রাচীন চীনেও শ্রমিক সংঘ গঠন করতে দেখা গেছে।

কৃষক ও ভূস্বামী

অতি প্রাচীন কাল থেকে কৃষিকার্যই ছিল চীনবাসীর জীবিকা অর্জনের প্রধান উপায়, সাম্প্রতিক হিসাবেও চীনের শতকরা পঁচাশি জন ব্যক্তি কৃষি ও তৎসম্পর্কিত ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহণ-কার্যাদিতে লিপ্ত ছিল। অধিকাংশ কৃষিক্ষেত্রের মালিকই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূসম্পত্তির অধিকারী, কিন্তু বিশাল জমিদারিও ছিল সংখ্যাতীত। এগুলি ছিল অভিজাত পরিবারের বিত্ত অথবা দেবোত্তর সম্পত্তি। এইসব কৃষি-ভূমির অধিকাংশ খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত করে প্রজাদের ইজারা দেওয়া হত, খাজনা বাবদ ভূম্যধিকারী উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক অংশ অথবা সেই পরিমাণ শস্যের মূল্য লাভ করত। ভূস্বামী নিজ গ্রামে জমিদার-ভদ্রলোক রূপে অথবা শহরে এসে বসবাস করতেন। বড় ছোট ভূম্যধিকারীর সংখ্যা ছিল অনেক। পরিসংখ্যান সঠিক না হলেও বলা যেতে পারে যে সমগ্র কর্ষণীয় ভূমির অর্ধেক পরিমাণ ভূস্বামীর নিজের দখলে ছিল, সেই জমি তারা নিজেরাই চাষ করত। এক-চতুর্থাংশ ভূমি কৃষকেরা ইজারা-সূত্রে দখল করত, বাকি এক-চতুর্থাংশে তারা ছিল জমিদারের প্রজা। এই জমিদারি প্রথার ফলে যেমন বিলাস-ব্যসন, আলস্য ও কর্ম-বিমুখতা ভূস্বামীদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল তেমনি আবার ভূমিশূন্য চাষীর সংখ্যাও অনিবার্যরূপে বৃদ্ধি পেয়ে সমাজের অর্থনৈতিক ভারসাম্যকে বিঘ্নিত করে তুলেছিল।* এ কথা এখন অস্বীকার করবার উপায় নেই যে

* ভারত ও চীনে ভূতপূর্ব জমিদারি প্রথার ফলাফলে আশ্চর্যরকম মিল দেখা যায়। উভয় দেশে জমিদার-শ্রেণীর মধ্যে ঔদার্যের অভাব ছিল না, তাদের সদনুষ্ঠানও ছিল প্রচুর, কিন্তু তারা যে পরগাছা-বৃত্তি অবলম্বন করে জীবনধারণ করত, সেই বৃত্তিই অনেক ক্ষেত্রে তাদের একেবারে অকর্মণ্য করে তুলেছিল। চীনের মত আমাদের দেশেও এই প্রথার বিষময় ফল সমাজের সব স্তরে সংক্রমিত হয়েছিল। বড় জমিদারেরা গ্রাম ছেড়ে এসে শহরেই বসবাস করত, তারা হয়ে উঠেছিল 'অনুপস্থিত ভূস্বামী'। এই 'absentee landlordism'-এর দরুন জমিদার ও কৃষকপ্রজার মধ্যে হৃদ্যতা বলে কোন বস্তুই জন্মায় নি, পরস্পর সহানুভূতির ছিল একান্ত অভাব, এবং জমির উর্বরতা-বৃদ্ধি বিষয়ে জমিদার ছিল একান্ত উদাসীন। ভারতে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ কয়েকটি প্রদেশে ঘটেছে, কয়েকটিতে আসন্ন। তবে কম্যুনিস্ট চীনের মত জমিদারি এখানে বাজেয়াপ্ত করা হয় নি, সংবিধানমত ন্যায্য মূল্য দিয়ে ক্রয় করে সরকার জমিদারদের ভবিষ্যৎ রুজি-রোজগারের পথ খোলা রেখেছেন।

এই ঘোর দুরবস্থার প্রতিকার করেছে বর্তমান কালের কম্যুনিস্ট চীন, জমিদারি প্রথার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করে জমিদারের খাস জমি প্রজাদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে।

পারিবারিক প্রতিষ্ঠান

পরিশেষে প্রাক্-বৈপ্লবিক চীনের পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ না দিলে সমাজ-প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। পারিবারিক জীবনকে সকল দেশে সকল কালে মনুষ্যসমাজের ভিত্তিরূপেই দেখা যায়, কিন্তু চীন দেশে পরিবার অন্যান্য সমাজ-সংস্থাব মত একটি প্রতিষ্ঠানবিশেষে পরিণত হয়েছে। চীনের পরিবার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ভারতীয় হিন্দু যৌথ পরিবারের সাদৃশ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এমন পরিবাবও আছে চীন দেশে যেখানে প্রপিতামহ তাঁর পুত্র, পৌত্র এবং তাদের স্ত্রী-পুত্র নিয়ে একসঙ্গে বসবাস করছেন। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জগতে বার্ধক্যের পেনসান, বেকার-বীমা, জীবন-বীমা প্রভৃতি অনেক রকম ব্যবস্থা করা হয়েছে ব্যক্তির অর্থনৈতিক নিরাপত্তাব জন্য, ভারতের ন্যায় চীন দেশেও এই উদ্দেশ্যটি সাধিত হত যৌথ পরিবার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। কোন কোন অপরাধের জন্য সমগ্র পরিবারকে পাইকাবী হিসাবে শাস্তি ভোগ করতে হত। নৈতিক শিক্ষা, আচার-আচরণ, ধর্মানুষ্ঠান প্রভৃতি অনুশীলনের প্রধান ক্ষেত্রই পরিবার, অতি প্রাচীন কাল থেকে কনফুসীয় নীতির এই ছিল একটি প্রাচীন অনুদেশ। পিতা ছিলেন পরিবারের কর্তা, পিতাব মৃত্যুর পব জ্যেষ্ঠ পুত্র সংসারে কর্তৃত্ব করতেন। কর্তার ক্ষমতা ছিল অসীম, জ্যেষ্ঠের প্রতি অনুজ ভ্রাতৃগণের অবিসংবাদিত আনুগত্য ও কনিষ্ঠের প্রতি অগ্রজের কর্তব্যনিষ্ঠা, এই ছিল একটি প্রধান কনফুসীয় বিধান। চীনা ঐতিহ্য পিতৃপুরুষেব বংশরক্ষাকেই প্রাধান্য দান করেছে, সেই পদ্ধতিমত চিং বংশ কর্তৃক প্রবর্তিত 'পবিত্র অনুশাসনে' ("Sacred Edict") পারিবারিক কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যে আত্মসংযম ও সদাচার আর সেই সঙ্গে পিতৃ-তর্পণের ওপর ঈশ্বর আরাধনার চেয়েও অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। 'পুত্রার্থ ক্রিয়তে ভার্যা পুত্র পিণ্ড প্রয়োজনং', হিন্দু শাস্ত্রের এই বিধানটি চীনা সমাজে ছিল সর্বতোভাবে প্রযোজ্য, কেননা সনাতনী হিন্দু সমাজে যেমন চীনা বিবাহেও

তেমনি কোন প্রেম-অনুরাগের ব্যাপার ছিল না, বিবাহের মূল উদ্দেশ্য ছিল বংশরক্ষা। পাত্র-পাত্রীর শৈশবেই অভিভাবকেরা বাক্-দান করতেন এবং কৈশোরে বিশ বৎসর বয়সের অনূর্ধ্বকালে তাদের বিবাহ হত। পণপ্রথা প্রচলিত ছিল, কিন্তু সাধারণত বরপক্ষ পণ দিত কন্যার পিতাকে আর কন্যাকে দিত যৌতুক। সগোত্র ও অন্যান্য কয়েকটি পর্যায়ে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। একাধিক দার পরিগ্রহ আইনমত ছিল অসিদ্ধ, কিন্তু পুরুষের উপপত্নী গ্রহণে কোন বাধা ছিল না, সেজন্য সমৃদ্ধ চীনা পরিবার-মধ্যে উপপত্নীর জন্যও একটি স্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। প্রসিদ্ধ আমেরিকান কথাশিল্পী পার্ল বাকের উপন্যাসে চীনা পরিবার-চিত্রে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা গৃহিণীকে উপপত্নীর প্রতি সদয় ব্যবহার, আদর-যত্ন করতে দেখি।

চীনা সমাজে 'মুই-সাই' (Mui-Tsai) প্রথা নামে একটি অত্যন্ত গর্হিত ব্যবস্থা সেদিন পযন্ত চলে এসেছে। দাসপ্রথারই নামান্তর এই ব্যবস্থা, দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট কি প্লাবনে বিধ্বস্ত অঞ্চলের দুঃস্থ পিতামাতার অল্পবয়স্কা মেয়েদের ক্রয় করত ধনী ব্যক্তিরা, ধনীগৃহে এই মেয়েরা আজীবন দাসী, কখনো বা প্রভুর শয্যাসঙ্গিনী হয়ে থাকতো। এই সেবাদাসীদের দস্তুরমত ক্রয়বিক্রয় চলত দালাল বা ব্যবসায়ীদের মারফত, ধনীরা মেয়ের বিবাহে এক বা একাধিক মুই-সাই যৌতুকস্বরূপ কন্যাকে দান করত। কখনো বা সুশ্রী কোন যুবতীকে ক্রয় করে তাকে বিবাহ করত তার রূপমুগ্ধ ক্রেতা, সেজন্য দাসীর পূর্ব-প্রভুকে বিলক্ষণ দক্ষিণা দিতে হত। প্রাচীন কাল থেকে ব্যাপক-ভাবেই এই প্রথা প্রচলিত ছিল, এবং বিংশ শতাব্দের তৃতীয় দশকে কুয়োমিন-টাং শাসনকালেও ধনীগৃহে মুই-সাই দের কেনা-বেচা দেখা গেছে। বর্তমান কম্যুনিস্ট শাসনে এই প্রথাটির অস্তিত্ব লুপ্ত হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, যদিও সম্ভবত অন্যান্য অনেক বিষয়ে ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে।

৬. মাঞ্চু যুগের সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম

মাঞ্চু শাসনের প্রথম দিকে অসামান্য কর্মোদ্যম জেগে উঠেছিল আর সেই উদ্যম চলেছিল দেড় শ' বছর ধরে। এমন সুদীর্ঘকাল শান্তিপূর্ণ

নিরাপত্তার মধ্যে সাহিত্য ও দর্শন-চর্চার অবসর চীনের ইতিহাসে ঘটেছে কদাচিৎ, ফলে গ্রন্থ রচিত হয়েছিল অসংখ্য, কিন্তু সেইসব রচনায় মৌলিকতা বা গভীর চিন্তা অপেক্ষা পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও পাণ্ডিত্যের পরিচয়ই ছিল অধিক। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, সম্রাট কা'ং সি-র উদ্যোগে একটি সুবৃহৎ অভিধান ও একটি বিরাট বিশ্বকোষ প্রণয়ন করা হয়েছিল। বস্তুত চি'ং আমলের রচনার অধিকাংশই সাধারণ বা নিকৃষ্ট ধরনের হলেও মাঝে মাঝে যে মৌলিকতা দেখা যায় নি এমন নয়। চমৎকার কবিতা রচিত হয়েছিল, অনেক উপন্যাসও লেখা হয়েছিল, চীনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির মধ্যে কয়েকটি এই সময়ের রচনা। এইরূপ একটি উৎকৃষ্ট জনপ্রিয় উপন্যাসের নাম 'হুং লউ মেং' বা 'লাল কামরার স্বপ্ন' ("The Dream of the Red Chamber")। গ্রন্থকার সা'ও চান আপন পারিবারিক পরিবেশের বর্ণনা করেছেন, কিন্তু গ্রন্থখানা তিনি অসম্পূর্ণ রেখে গিয়েছিলেন, অন্য লেখক গ্রন্থ শেষ করেন। কাল্পনিক ভ্রমণ-বৃত্তান্তের আকারে আর একখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস রচিত হয়েছিল (১৮২৫ খৃঃ), এই গ্রন্থে সমাজ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখানো হয়েছে, বলা হয়েছে স্ত্রী-শিক্ষা ও নারী-প্রগতির কথা, মেয়েদের পা বাঁধার (foot-binding) নিন্দা করা হয়েছে। এই সময়কার অনেক উপন্যাসে রাজকর্মচারীদের বিরুদ্ধে ও সমাজ-প্রথার প্রতিকূল সমালোচনা রয়েছে। জনপ্রিয় উপন্যাস অবলম্বনে রচিত নাটক রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হত, কিন্তু মঞ্চাভিনয়ের নানান পরিবর্তন সত্ত্বেও নাট্যকলার বিশেষ উন্নতির লক্ষণ দেখা যায় নি।

দর্শনতত্ত্ব ও দার্শনিক : 'হ্যান স্যুয়ে'

দর্শন-চিন্তায় গবেষণাপূর্ণ সৃজন-শক্তির যেমন পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল মাঞ্চু শাসনের প্রথম শতকে, সেরূপ শক্তির আভাস বিদেশী মোঙ্গলদের রাজত্বে কখনো দেখা যায় নি। মাঞ্চুদের চীন বিজয়, দেশের সেই পরাধীনতাই দার্শনিকদের চিন্তায় বিশেষরূপে ইন্ধন যুগিয়েছিল। কোথায় রয়েছে সেই জাতীয় দুর্বলতার মূল দেশকে যা বিদেশী শক্তির পদানত করে রেখেছে? তখন এক শ্রেণীর দার্শনিকের এই বিশ্বাস জন্মেছিল যে সুং যুগের প্রখ্যাত দার্শনিক চু' সি-র কনফুসীয় নীতিধর্মের নব ভাষ্যই জাতীয় অধঃপতনের

কারণ। মাঞ্চু যুগে এইরূপ মতাবলম্বী দুইজন দার্শনিক বিলক্ষণ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, তাঁদের নাম কু তিং লিন বা কু ইযেন-উ ও ইযেন ইউযান। দার্শনিক কু ইযেন-উ (১৬১৩-১৬৮১) মাঞ্চু বিজয় সক্রিযভাবে প্রতিরোধ করেছিলেন, বারবার অনুরুদ্ধ হযেও বিদেশী রাজার অধীনে চাকরি গ্রহণ করতে সম্মত হন নি। তিনি বিশ্বাস করতেন মিং-দের আত্মরক্ষার শক্তি নষ্ট হযেছিল, তার কারণ এই যে সে যুগের পণ্ডিতেরা শুধু মানুষের প্রকৃতিগত গুণধর্ম ও স্বর্গের আদেশ বিধান নিযে বৃথা তর্কে মস্তিষ্কের অপব্যবহার করতেন। এসব তর্ক-বিতর্ক ছেড়ে দিযে মানুষের চরিত্র গঠনে মনোনিবেশকে তিনি জাতীয অভ্যুত্থানের পন্থা বলে নির্দেশ দিযেছেন। ইযেন ইউযান (১৬৩৫-১৭০৪) ছিলেন তাঁরই মত স্বাধীন চিন্তাশীল দার্শনিক। কর্মযোগ ছিল তার দর্শন, পুঁথিগত অধীত বিদ্যাকে তিনি ঘৃণা করতেন। জীবনকালে তার রচনা অল্পই প্রকাশিত হযেছিল, দীর্ঘকাল পরে তার লিখিত গ্র সমাদর লাভ করেছিল। ব্যবহারিক জীবন ও অর্থনীতির দিকে দৃষ্টি না দিযে পণ্ডিতকুলের পুঁথিগত বিদ্যার অনুশীলন ও সাধনাই জাতীয দুর্গতির কারণ, আর সেই দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের উপায অহেতুক বিদ্যা চর্চার পরিবর্তে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের জন্য কঠোর পরিশ্রম, এই ছিল দার্শনিক ইউযানের মতবাদ। এই মতবাদ চো চু সি-র দর্শন তত্ত্বের বিরোধী, সে কথা বলাই বাহুল্য।

এ দার্শনিকদের বিরুদ্ধবাদীরা অধিকতর প্রাচীন হ্যান যুগীয দর্শন-তত্ত্বের চর্চায আত্মনিযোগ করে 'হ্যান বিদ্যা'র মূল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হযেছিলেন। এই আন্দোলনের নাম দেওযা হযেছে 'হ্যান স্যুযে' ("Han Learning")। এই 'হ্যান বিদ্যা' অধিগত করবার জন্য ভাষাতত্ত্বের (philology) অনুশীলন প্রযোজন হযেছিল, কেননা প্রাচীন শব্দগুলির অর্থ দুর্বোধ্য হযে পড়েছিল, এমন কি শব্দাক্ষরের উচ্চারণও তখন আর জানা ছিল না। ভাষাতত্ত্বের মূল ভিত্তি পত্তন করেছিলেন কু ইযেন-উ, পরে অন্যান্য পণ্ডিতেরা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণে রত হলেন। লিখনতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করবার জন্য তারা যে সংস্কারমুক্ত তথ্যানুসন্ধান প্রণালী অবলম্বন করেছিলেন তার সঙ্গে পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিসমূহের আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায। এই পদ্ধতিমত যে ভাষাতত্ত্বের উদ্ভব হযেছিল

সেই ভাষাতত্ত্বকে আশ্রয় করে ইয়েন জো-চু (১৬৩৬-১৭০৪) নামে জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁর এই সিদ্ধান্তটি প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করলেন যে 'সু কিং' প্রভৃতি প্রাচীন ইতিহাস ও শাস্ত্রগ্রন্থ ("Ancient Text" or "Ancient Script") অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের জাল রচনা। এরূপ একটি সন্দেহ সুং, ইউয়ান ও মিং যুগেও জেগে উঠেছিল বটে, কিন্তু প্রামাণিক তথ্য আবিষ্কারের কোন চেষ্টাই তখন করা হয় নি।* ইয়েন জো-চু-র সমসাময়িক ও পরবর্তী কালের কয়েকজন পণ্ডিত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে অনেক তথাকথিত প্রাচীন গ্রন্থ প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন নয়, এমন কি যেসব প্রাচীন ডায়গ্রামের ওপর নির্ভর করে সুং যুগের দর্শন-তত্ত্বের বিকাশ ঘটেছিল, সেই ডায়গ্রামগুলি দশম খৃস্টাব্দের জনৈক তাও-পুরোহিতের কল্পনা। মাঞ্চু যুগের সবশ্রেষ্ঠ দার্শনিক তাই চেন (১৭২৪-১৭৭৭), বুদ্ধি-যুক্ত যুক্তিবাদের শীর্ষদেশে উপনীত হয়েছিল চীনা দর্শন তাঁরই তত্ত্বকথার মধ্যে। তিনি সুং দর্শনে বর্ণিত বিশ্বের স্বভাবধর্ম ও মানব-প্রকৃতির দ্বৈতবাদ প্রত্যাখ্যান করে বস্তুতান্ত্রিক একত্বকে (materialistic monism) গ্রহণ করেছিলেন।

দর্শন-চর্চায় ভাটা দেখা দিল ১৮০০ খৃস্টাব্দের পর থেকে, তখন বৈদেশিকদের আক্রমণে ও অন্তর্বিদ্রোহে দেশ অতিমাত্র বিব্রত হয়ে পড়েছিল। দর্শন-চিন্তায় চীনা চিত্তবৃত্তির তৎপরতা আর কখনো জাগে নি, কিন্তু 'হ্যান সুয়ে' আন্দোলনের স্মৃতি অম্লান থেকে গিয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দ, এমন কি বিংশ শতকের বিপ্লব-কাল পর্যন্ত। এই আন্দোলন সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য বিষয় শুধু মৌলিক চিন্তা ও প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধা মাত্র নয়, চীন দেশের শিক্ষিত সমাজে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব নাশের একটি বিশেষ কারণ হয়ে উঠেছিল 'হ্যান সুয়ে'। ট্যাং যুগে বৌদ্ধদর্শন নানারূপ ভাষ্যে শাখাপল্লবিত হয়ে উঠেছিল, সুং যুগেও বৌদ্ধ ধর্ম কনফুসীয় তত্ত্বকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। চিং আমলে কিন্তু 'হ্যান সুয়ে' কনফুসীয় নীতিধর্মকে বৌদ্ধ ও তাওধর্মের কবল থেকে মুক্তিদান করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিল। ফলে, বৌদ্ধধর্মের

* ১৫৪৩ অব্দে মেই জু নামক জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তি 'সু কিং' গ্রন্থের রচনা-কাল ও তার প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন।

মাথার ওপব প্রাক্-বৌদ্ধ কনফুসীয় নীতিতত্ত্বের জয়ধ্বজা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বটে, কিন্তু সেজন্য বৌদ্ধধর্মের শক্তি চীনা সমাজ থেকে অন্তর্ধান করে নি। ভিক্ষু-ভিক্ষুনীব সমাগমে মঠগুলি পূর্ববৎ ভরে উঠতো, পল্লী গাথায় শিল্পে সামাজিক ধর্মজীবনে বৌদ্ধ প্রভাব অক্ষুণ্ণই থেকে গিয়েছিল। সম্রাট চি'য়েন লুং বৌদ্ধধর্ম ও কনফুসীয় তত্ত্বের একটি সুসম্বদ্ধ সমন্বয়ের চেষ্টা করেছিলেন। চি'ং যুগে তিব্বত চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, সেজন্যে তিব্বতী বৌদ্ধ-ধর্মের প্রসার ব্যাপারে সুবিধা দান করে মাঞ্চুরা দালাই লামার সঙ্গে বন্ধুত্বের ভিত্তিমূল দৃঢ় কবতে চেষ্টা করেছিলেন।

৭. মাঞ্চু যুগের আর্ট

মাঞ্চু যুগে পর্সিলেন ব্যতীত অন্যান্য সব ক্ষেত্রেই আর্ট পূর্বকালের পদ্ধতি অনুসরণ কবে চলেছিল, এবং শিল্পীর কর্মকুশলতা যদিও ট্যাং ও সুং যুগেব মতই উৎকর্ষ লাভে সক্ষম হয়েছিল, শৈলীও উঠেছিল উন্নত পর্যায়ে, তবু বলতে হয় সেই শিল্পসৃষ্টির মধ্যে মৌলিক কল্পনা ও প্রেরণার অভাব ছিল যথেষ্ট। ব্রঞ্জেব কাজ নিখুঁত হলেও কারুকার্যগুলি প্রাচীন রূপসজ্জার পুনরাবৃত্তি মাত্র, রূপ-কল্পনাও প্রাচীন কালের, নূতনত্বেব নামমাত্র কোথাও নেই। পাথব ও হাতীর দাঁতের কাজ শৈলীব সূক্ষ্মতায় ও নৈপুণ্যে অপরূপ, আধুনিক যুগেও সেগুলি জগতের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু এ যুগের সর্বপ্রকার শিল্পে ছিল আত্মসংবিতের একান্ত অভাব, শিল্পবস্তুও সেজন্য প্রাণবন্ত রূপ ধারণ কবে নি। শিল্পে না ছিল কোন উচ্চাদর্শের ইঙ্গিত, না ছিল কোন আনুষ্ঠানিক প্রতীকত্বের দাবি, শিল্পসৃষ্টির উদ্দেশ্য ছিল শুধু বিলাসী ধনীদেব গৃহ-সজ্জা আব চিত্তরঞ্জনেব প্রয়াস। শিল্প-প্রতিভার ওপর প্রাচীনত্বের প্রভাব জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছিল, শিল্প-জগতের প্রাচীন পরিবেশ নব সৃষ্টি-কল্পনার একটি মস্ত অন্তরায় হয়ে উঠেছিল। কনফুসীয়-পন্থীরা ছিলেন প্রাচীনের উপাসক, নূতনকে ঘৃণা করতেন তাঁরা, তেমনি এ যুগের শিল্পীর কাছেও শিল্পের প্রাচীন ধারা ও শৈলী এমনি শ্রদ্ধার বস্তু আর নূতন পরিকল্পনা এমনি ঘৃণার্হ হয়ে উঠেছিল যে নূতন সৃষ্টির আগ্রহ আব কোন শিল্পীর অন্তরে উঁকি মারতে পারে নি।

পর্সিলেন

কিন্তু পর্সিলেন-শিল্পের উদ্ভব হয়েছিল অপেক্ষাকৃত নূতন যুগে। কোন প্রাচীন ঐতিহ্য এই শিল্পকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রাখতে পারে নি বলেই মাঞ্চু যুগে পর্সিলেনের উন্নতি অব্যাহতভাবেই চলেছিল। বস্তুত অন্যান্য শিল্প যখন শোচনীয় দশায় গিয়ে নেমেছে, পর্সিলেনের আঙ্গিক তখন শ্রেষ্ঠত্বের চরম পর্যায়ে গিয়ে উঠেছিল। চীনের কোন শিল্পই ইউরোপের দৃষ্টি তেমন আকর্ষণ করে নি যেমন করেছিল চীনা পর্সিলেন, ইউরোপীয়ানদের চোখে এই শিল্প চীন দেশের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল যে দেশের নামে অভিহিত করে পর্সিলেনের নাম দিয়েছিলেন তাঁরা 'চায়না'।

সম্রাট ইউয়ান চেং ছিলেন পর্সিলেন-শিল্পের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। ১৭২৮ খৃস্টাব্দে তিনি একজন সুযোগ্য শিল্প পরিদর্শক নিযুক্ত করেছিলেন, তাঁর নাম ট্যাং ইং। বিশেষ গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা ট্যাং ইং কয়েকটি বর্ণ-চাকচিক্য (glaze) সম্পাদনের উপায় আবিষ্কার করেছিলেন। পর্সিলেন-শিল্পে ব্রঞ্জের কারুকার্যের অনুকরণ তার আর একটি বিশেষত্বপূর্ণ কার্য। কিন্তু এইরূপ অনুকরণে যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রকাশ পেলেও শিল্পের উন্নতিসাধন তেমন হয় নি, কেননা ব্রঞ্জের শিল্পকলা পর্সিলেনের পক্ষে কখনো সুশোভন হতে পারে না।

মাঞ্চু যুগের প্রথম ভাগে বিশেষত চিয়েন লুং-এর সময় পর্সিলেন শিল্প আঙ্গিক বৈচিত্র্যে পূর্ণতা লাভ করেছিল, আবার শিল্পের পতনও শুরু হয়েছিল তখন থেকেই। বস্তুত উন্নতির শিখরদেশেও এই শিল্পের রূপসজ্জায় মৌলিকত্বের চেয়ে নৈপুণ্যই বেশি প্রকাশ পেয়েছে।

চিত্রাঙ্কন

মাঞ্চু চিত্রাঙ্কনে প্রাচীন রীতির পুনরাবৃত্তি দেখা যায়, সৌষ্ঠবও কৃত্রিম, কিন্তু তুলির ব্যবহারে নৈপুণ্যের অভাব নেই। সুং চিত্রকরের অনুপম সৃষ্টির সঙ্গে এ যুগের চিত্রকলার তুলনা চলে না, ইউয়ান বা মিং যুগের সঙ্গেও নয়, তা সত্ত্বেও মাঞ্চু চিত্রশিল্পের বিন্যাসে বেশ একটু মাধুর্য দেখা যায়। লাক্ষা-কার্যের (lacquer work) ওপর অঙ্কিত চিত্রে এই রূপসজ্জার সৌষ্ঠব বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে।

দক্ষিণ সুং বংশীরা যখন চীনের দক্ষিণ-পূর্ব-ভাগে রাজত্ব করতেন তখন থেকে সেই অঞ্চলটি শিল্প ও সংস্কৃতির পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল। দক্ষিণ-পূর্ব দেশের ইযাংসি উপত্যকার সু-চৌ ও হ্যানকৌ নামে দুটি শহর বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল বিদ্যা-চর্চা ও সভ্যতার কেন্দ্ররূপে, এবং সেই সূত্রে একটি প্রবাদও শোনা যেত: "উপরে স্বর্গ যেমন, পৃথিবীতে সু-চৌ ও হ্যানকৌও তেমনি।" মাঞ্চু যুগের প্রথম ভাগে চারজন বিশিষ্ট চিত্রশিল্পীর আবির্ভাব হয়েছিল, তাঁরা সকলেই এসেছিলেন সু-চৌ নগর থেকে। আরও তাজ্জবের কথা এই যে তাঁরা শুধু একই স্থানের অধিবাসী ছিলেন না, তাঁদের নামের আদি শব্দটিও এক। সকলেই তাঁরা ওযাং, সেজন্য 'চার ওযাং' ("Four Wangs") নামে পরিচিত। সুং শিল্পীদের পদাঙ্ক অনুসবণ করে তাঁরা প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কিত কবেছেন, তাঁবা ছিলেন চীনে পূর্বাপব ধারাগত ঐতিহ্যের উত্তরসাধক। এই 'চাব ওযাং'-এব নাম (১) ওয়াং-সি মিন (১৫৯২-১৬৮০), (২) ওযাং চিযেন (১৫৯৮-১৬৭৭) যিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ মিং রাজনৈতিক ওযাং সি চেং-এব পৌত্র, (৩) ওযাং হুই (১৬৩২-১৭২০) এবং (৪) ওযাং ইউয়ান চি। এই শেষোক্ত ব্যক্তিটি ছিলেন শিল্পী ও শিল্প-সমালোচক হুই-ই, সম্রাট কাং সি-ব আদেশে তিনি চিত্রাঙ্কন ও চিত্রলিখনেব একটি ইতিহাস রচনায অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

উপরোক্ত 'ওযাং চতুষ্টয' ছাড়া সু চৌ নগবের আর একজন প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী ছিলেন ইযাং সউ-পিং (১৬৩৩ ১৬৯০)। পুষ্প, পক্ষী প্রভৃতি প্রকৃতি জীবন অঙ্কনে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত, এ বিষযে তাঁর সমকক্ষ পরবর্তী কালের কোন শিল্পীই ছিলেন না।

এই যুগে মৌলিকত্বেব দাবি নিয়ে কযেকজন বৌদ্ধ পুবোহিত চিত্রাঙ্কনে আত্মনিযোগ করেছিল। এই শ্রেণীর চিত্রকবেরা ছিল একটি প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত, সেই প্রতিষ্ঠানের নাম দেওযা হয়েছে 'ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান' ("School of Individualists")। চ্যান ঐতিহ্যেব অনুসরণ করে বৌদ্ধ পুরোহিতরা চিত্রশৈলীকে নবজীবনে সঞ্চারিত কবে তুলেছিল। প্রসিদ্ধ পুরোহিত চিত্র-কবদেব মধ্যে কযেকজনের বিষয নিম্নে বলা হল:

চু তা (১৬২০) প্রসিদ্ধি লাভ কবেন প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কনে নয, তাঁর কালি দিযে আঁকা ফুল পক্ষী প্রভৃতির চিত্র কালজযী হযেছে। তাঁর লক্ষ্য

ছিল আসল বিষয়বস্তুটির ওপর, অত্যল্প উপকরণে কিরূপে সেই বিষয়ব্যঞ্জনা চিত্রার্পিত করা যায়, তিনি তাই দেখিয়েছেন।

তাও চি (১৬৬০-১৭১০) শুধু একজন সুদক্ষ চিত্রকর ছিলেন না, শক্তিমান লেখক ছিলেন তিনি, প্রাচীন শিল্প-শৈলীর অনুকরণের বিরুদ্ধবাদী হয়েছিলেন।

চিত্রাঙ্কনে বৌদ্ধ বিষয়বস্তুর নূতন রূপ দান করেছেন কুʼন সাʼন (১৬১৫-১৭০০)। 'বনপথে বুদ্ধ' ("Buddha in the Wilderness") নামে একটি অপরূপ ছবি এঁকেছেন তিনি, সেই চিত্রের পাহাড় ও অরণ্যানী অঙ্কনে বিলক্ষণ দক্ষতার পরিচয় আছে, আর সেই দৃশ্যটিকে জ্যোতির্মণ্ডিত করে তুলেছেন স্বয়ং ভগবান বুদ্ধ।

মাঞ্চু যুগের আর এক শ্রেণীর চিত্রাঙ্কনে যথেষ্ট ইউরোপীয় প্রভাব দেখা যায়, যদিও দেশীয় ঐতিহ্যের আদর্শকে কোথাও বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ করা হয় নি। এই শ্রেণীর একজন চিত্রশিল্পী ছিলেন চিয়াং তিং-সি। কয়েকজন ইউরোপীয়ানও এই সময়ে শিল্পচর্চায় রত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ দুজনের নাম গুইসেপ্‌পো ক্যাসটিগ্লিয়োন (Guiseppo Castiglione) ও ডেনিস অ্যাটিরেট (Denes Attiret)। ক্যাসটিগ্লিয়োন একটি চীনা নাম গ্রহণ করেছিলেন, চিত্রকর হিসাবে ল্যাং সি-লিং নামে তিনি প্রসিদ্ধ, চীনা হরফে এই নামটি স্বাক্ষর করে তিনি আত্মপরিচয় দিতেন। তাঁর অনেক চিত্র এখনো বিদ্যমান। চিত্রবস্তুর আকৃতি ইউরোপীয়, কিন্তু চীনা অঙ্কন-পদ্ধতি অবলম্বন করে তিনি সেই বস্তুর প্রকৃতিকে খাঁটি চৈনিক রূপে বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন।

চিʼং বংশের সম্রাটেরা যে শুধু আর্টের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তা নয়, তাঁদের মধ্যে অনেকে চিত্রাঙ্কন-বিদ্যায় ছিলেন পারদর্শী। প্রথম মাঞ্চু সম্রাটের অঙ্কিত ছবি এখনো ভালভাবে রাখা আছে। বিলাস-ব্যসন জাঁকজমকের অনুরাগী ছিলেন যেমন সম্রাটেরা তেমনি অভিজাতবর্গ ও বুর্জোয়াগণ। শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করে তাঁরা শিল্পকে উৎসাহ দান করতেন বটে, কিন্তু তাঁদের দৃষ্টি ছিল প্রাচীন ধারার অনুকরণে সাফল্যের দিকে, নূতন শিল্প-পদ্ধতির প্রশ্রয় তাঁরা দিতেন না। ফলে শিল্পের ক্ষেত্রে নব-সৃষ্টির কোন সুযোগ ঘটে নি।

চীনে ইতিহাস রচিত হয়েছে যুগে যুগে, তেমনি শিল্প-সাহিত্য রচনাও অতি প্রাচীন কাল থেকে চলে এসেছে। অজস্র শিল্প-সাহিত্য, পাশ্চাত্ত্য দেশে

বিগত শত বৎসরের কথা বাদ দিলে চীনের মত এত অধিক পরিমাণ শিল্প-সাহিত্য জগতের আর কোথাও রচিত হয় নি। হ্যান যুগের জনৈক চিত্রকর কু কাই-চি (৩৪৪-৪০৬) তাঁর রচনায় শিল্প সম্বন্ধে যেসব নির্দেশ দিয়ে গেছেন, শিল্পী-মহলে আজও তা সুপরিচিত। পঞ্চম খৃস্টাব্দে সিয়ে হো নামে জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তি কু হুয়া পি'ন নামক যে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন সেই গ্রন্থে চীনা চিত্রাঙ্কনের মূল-প্রকৃতি প্রাঞ্জলভাবে বর্ণিত হয়েছে। লেখক বলেছেন, তিনি শুধু চিত্রবিদ্যার চিরাগত প্রকৃতির কথাই লিখেছেন, অতি প্রাচীন কাল থেকে চলে এসেছে যে প্রকৃতির ধারা। এইরূপে খৃষ্টীয় প্রথম অর্ধ শতাব্দে যে শিল্প-সাহিত্য-সৃষ্টি শুরু হয়েছিল সেই ক্ষীণ প্রবাহ ক্রমে স্ফীত হয়ে বিরাট আকার ধারণ করেছিল, শিল্প বিষয়ে রচিত অসংখ্য প্রবন্ধ, বিশ্বকোষ, জীবন-চরিত, সমালোচনা-সাহিত্য প্রভৃতি শিল্প ও শিল্পীর গৌরব বর্ধন করেছিল।

দশম পর্ব

বিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর বিশৃঙ্খলা

১. রাজতন্ত্রের বিলুপ্তি : সাধারণতন্ত্রের উদ্বোধন

দীর্ঘবিলম্বিত বিপ্লব অবশেষে সত্যই দেখা দিল। মাঞ্চু শাসনের ভিত্তিমূলে প্রথম আঘাত করেছিল তা'ই পিং বিদ্রোহ, সে বিপদ কোনমতে কেটেছিল বটে, কিন্তু এবারকার বৈপ্লবিক আক্রমণের প্রতিরোধ আর সম্ভব হল না। অশেষ লাঞ্ছনা মাঞ্চুদের অবাঞ্ছিত শাসনকে এমনি অপ্রিয় করে তুলেছিল চীনাদের কাছে যে নানারূপ সংস্কার প্রবর্তনের উদ্যোগ সত্বেও তারা সেই শাসনের উচ্ছেদ-সাধনে কৃতসংকল্প হয়েছিল। কুশাসনের বিরুদ্ধে প্রজা-বিদ্রোহ চীনের ইতিহাসে একটি নৈমিত্তিক ব্যাপার রূপে অনেকবার দেখা গেছে, বিপ্লবান্তে কয়েক দশক এমন কি কয়েক শতক ধরেও বিশৃঙ্খলা চলেছে, যেমন হ্যান যুগের শেষভাগে। শুধু এই বৃত্তান্তটির কথা বিবেচনা করলে বিংশ শতাব্দের বিপ্লবকে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি বলা চলে বটে, কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টির বিচারে নববিপ্লবে এমন একটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যা বিগত কালের সকল ঘটনা থেকে পৃথক করে এই বিপ্লবকে একটি নূতন রূপ দান করেছে। ইতিপূর্বে সকল বিদ্রোহেরই ছিল একই ফল, কোন একটি রাজবংশের উচ্ছেদ আর সেই স্থলে অন্য একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা। রাজতন্ত্রই ছিল চীনের চিরাগত ঐতিহ্য, সেই চিরপরিচিত রাজতন্ত্রকে বাতিল করে সাধারণতন্ত্রের অচেনা পথে যাত্রাই হয়েছিল এবারকার বিপ্লবেব বিশেষত্ব। পূর্ব-পরিকল্পনা বা উদ্যোগ-আয়োজন ছিল না, অভিজ্ঞতার ছিল একান্ত অভাব, এরূপ ক্ষেত্রে বিপ্লবান্তে জাতি যে দিশাহারা হয়ে পড়বে, তার আশ্চর্য কি? চীনে বিপ্লবোত্তর কালের বিশৃঙ্খলার পরিসমাপ্তি ১৯২৬ খৃস্টাব্দের পূর্বে ঘটে নি।

১৯১১ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসে হ্যানকৌ ও উচ্যাং নগরে যে বিপ্লব মাথা তুলেছিল, সেই বিপ্লবই মাঞ্চু শাসনের মূলোচ্ছেদ করে। চীনের দক্ষিণ, মধ্য ও পশ্চিম অঞ্চলে রেলপথ নির্মাণের জন্য বৈদেশিক ঋণ গ্রহণের যে সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল তার বিরুদ্ধে ইয়াংসি উপত্যকায়, বিশেষত জেচুয়ান প্রদেশে তুমুল আন্দোলন শুরু হয়, তারপর হ্যানকৌ নগরে বিপ্লবীদের গোপন কারখানায় একটি বোমা বিস্ফোরণের ফলে সামরিক ষড়যন্ত্রকারীরা বিদ্রোহ করতে বাধ্য

হয়েছিল আত্মরক্ষার জন্য। বিদ্রোহী সৈন্যরা কর্নেল লি ইউয়ান হুং-কে তাদের নেতা নির্বাচিত করল, ইনিই পরে সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। বিদ্রোহ অতি সত্বর দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়ল, উচ্যাং, হ্যানিয়াং ও হ্যানকৌ বিদ্রোহীরা দখল করবার পর সাধারণতন্ত্র ঘোষিত হল। বিপ্লবীদের এই অপ্রত্যাশিত দ্রুত সাফল্যে মাঞ্চু শাসকেরা অতিমাত্র বিচলিত হয়ে পড়ল, তখন তারা ইয়াং সি কাই-র সাহায্য প্রার্থনা করল। স্মরণ থাকতে পারে, ইয়াং সি-কাই ছিলেন একজন শক্তিমান রাজপুরুষ, সম্রাট কুয়াং সু যাঁর ওপর রাজমাতার প্রিয়পাত্র কুচক্রী জুং লু-কে হত্যা করবার ভার দিয়েছিলেন, আর যিনি সে কথা প্রকাশ করে দেবার ফলে রাজমাতার হস্তে সম্রাটকে বন্দী হতে হয়েছিল (১৮৯৮)। সম্রাট ও রাজমাতার মৃত্যুর পর নাবালক সম্রাটের অভিভাবক হয়েছিলেন মৃত সম্রাটের ভ্রাতা প্রিন্স চুন, তাঁর প্রথম কার্যই হয়েছিল বিশ্বাসঘাতক ইয়াং সি-কাই-কে রাজকর্ম থেকে অপসারণ। কিন্তু বিপ্লব যখন ভীষণ আকার ধারণ করল তখন রাজশক্তির পক্ষে মহাপরাক্রান্ত ইয়াং সি কাই-র শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর রইল না। বারবার অনুরুদ্ধ হয়ে ইয়াং সি-কাই মাঞ্চু সম্রাটের সাহায্যার্থে অগ্রসর হলেন আপন শর্তে, অনেক গড়িমসির পর। কিন্তু ইতিমধ্যে বিপ্লব বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল, যদিও ইয়াং সি-কাই হ্যানকৌ নগর পুনরুদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছিলেন। অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে নগরের পর নগর, প্রদেশের পর প্রদেশ ঘৃণিত মাঞ্চু শাসন ঝেড়ে ফেলে দিল। প্রজাবৃন্দের হরেকরকমের দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি পিকিং-এর রাজদরবার থেকে আসতে লাগল বটে, কিন্তু বিপ্লবের গতিরোধ হল না। বর্ষশেষের পূর্বেই ন্যানকিং নগরে একটি জাতীয় সংসদের (National Council) অধিবেশন হল, এবং সেই সংসদে বিপ্লবীদের প্রতিনিধিরা সান-ইয়াৎ-সেন-কে সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করল। বিপ্লবের প্রারম্ভে সান-ইয়াৎ-সেন ছিলেন ইউরোপে, সম্প্রতি চীনে এসে জনসাধারণের কাছে বিপুল সংবর্ধনা লাভ করেন।

সান ইয়াৎ-সেন

বিপ্লবের আদিগুরু সান-ইয়াৎ সেন, বিপ্লবের ইতিহাসে এই পুরুষসিংহের কাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। তিনি ছিলেন ক্যানটনের নিকটবর্তী কোন

স্থানের সাধারণ চাষী গৃহস্থের সন্তান। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাউই দ্বীপে বাস করতেন, তের বছর বয়সে বালক সান-ইয়াৎ-সেন হাউই দ্বীপে ভ্রাতার কাছে যান এবং সেখানে তিন বৎসর একটি খৃস্টান স্কুলে শিক্ষা লাভ করেন। দেশে ফিরে এসে তিনি খৃস্টধর্মে বিশ্বাসের কথা প্রচার করেন, এবং সেই বিশ্বাস প্রতিপন্ন করলেন নিজ গ্রামের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেব মূর্তি ধ্বংস করে। এই ব্যাপারে গ্রামের লোকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, এবং সেজন্য তাঁকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে হয়। তাবপর তিনি হংকং ও ক্যানটনে প্রোটেস্টাণ্ট মিশনারীদের নিকট অধ্যয়ন করেন এবং যথাকালে একটি মেডিক্যাল ডিপ্লোমাও লাভ করেন। কিন্তু চিকিৎসা-ব্যবসায়ের চেয়ে চীনের রাজনৈতিক পরিবর্তনেব দিকেই দৃষ্টি ছিল তাব বেশি, তিনি মাঞ্চু রাজত্বের উচ্ছেদকল্পে গোপনে বিপ্লবের সংগঠন-কার্য শুরু কবলেন। তাঁর এইসব কার্য যখন কর্তৃপক্ষেব জ্ঞানগোচর হল, তখন তিনি গ্রেপ্তার ও মৃত্যুদণ্ড এডাবাব জন্য বিদেশে প্রস্থান করলেন, এবং সেই সময থেকে সাগবপাবেব দেশগুলিতে পর্যটন করে বিদেশী রাষ্ট্র ও প্রবাসী চীনাদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করতে লাগলেন।

সান-ইয়াৎ সেন-এর আদর্শ ছিল চীনকে বিদেশী শক্তিপুঞ্জের ঔপনিবেশিক ভুজপাশ থেকে মুক্ত কবে সেখানে আমেরিকান রাষ্ট্রেব প্রতিরূপ একটি সাধাবণ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু আদর্শ যেমন হোক, বিদেশীর কাছে তাঁর সেই আদর্শ ছিল উন্মাদের স্বপ্ন, তাই চেষ্টা করেও তিনি কোন বিদেশী রাষ্ট্রেব সমর্থন লাভে সক্ষম হন নি। প্রবাসী চীনারা ছিল দেশপ্রেমিক, সান-ইয়াৎ-সেন-এর এই উদ্যমে তারা অকাতরে সাহায্য করেছিল তাঁর মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে। সান-ইয়াৎ-সেন তখন আমেবিকায়, এমন সময় তাঁরই অনুগত সহকর্মী বিপ্লবীরা অধৈর্য হয়ে উঠে তাঁর প্রত্যাগমনের অপেক্ষা না করেই অস্ত্র ধারণ করল, কিয়াংসি প্রদেশে মাঞ্চু বংশের প্রতিনিধিদের অপসারিত করে সান-ইয়াৎ-সেন-কে চীনের প্রথম রাষ্ট্রপতি বলে ঘোষণা করা হল। তখন আরম্ভ হল চীনের মহাবিপ্লব। আমেরিকায় রেলপথে ভ্রমণকালে সংবাদপত্রে সান-ইয়াৎ-সেন এই সংবাদটি পড়লেন, এবং আর কালবিলম্ব না করে স্বদেশে প্রত্যাগমন করলেন। কিন্তু তাঁর আগমনের পূর্বেই ইউয়ান সি-কাই বিপ্লবীদের সঙ্গে যুদ্ধ-বিবতির আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করেছিলেন। বস্তুত এই অন্তর্বিরোধ কোন দেশহিতৈষী প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরই কাম্য ছিল না। অনেক চেষ্টায়

এমন কি ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা ইউযান রাজদরবারকে বোঝাতে সমর্থ হযেছিলেন যে সম্রাট সিংহাসন ত্যাগ না করলে বিপুল অনর্থের সম্ভাবনা। অগত্যা ১৯১২ খৃস্টাব্দের ১২ই ফেব্রুযারি তারিখে শিশু সম্রাটের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হল যে সম্রাট স্যুযাং তুং স্বেচ্ছায সিংহাসন পরিত্যাগ করলেন, আর ইউযান সি-কাই-র ওপর ন্যস্ত করলেন একটি সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের ভার। সম্রাটের জীবনকালে তাঁর 'সম্রাট' উপাধিটি বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতি দিল বিপ্লবীরা, বার্ষিক বরাদ্দ করা হল প্রচুর অর্থ, রাজপ্রাসাদ ও ব্যক্তিগত বিষয-সম্পদ থেকেও সম্রাটকে বঞ্চিত করা হল না। এই আপস মীমাংসার পথ সুগম করবার জন্য সান-ইযাৎ-সেন যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করতে ত্রুটি করেন নি। ইতিপূর্বে জাতীয পরিষদ তাঁকেই রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করেছিল, তিনি এখন সেই পদ পরিত্যাগ করে ইউযান সি-কাই-কে রাষ্ট্রপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য অনুগত লোকদের উপদেশ দিলেন। সেই উপদেশমত বিপ্লব প্রতিষ্ঠান ইউযান কেই রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করল। বিপ্লবী সৈন্যদলের নেতারূপে লি ইউযান-হুং যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছিলেন, তিনি হলেন উপরাষ্টপতি। প্রভূত স্বার্থত্যাগ সত্ত্বেও সান-ইযাৎ-কে অচিরেই ইউযান সি কাই-র স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হযেছিল। ১৯২১ সালে সান ইয়াৎ সেন আবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

এইরূপে বিলুপ্ত হযেছিল চীনের অতি প্রাচীন রাজতন্ত্র যার কাঠামো প্রস্তুত করেছিলেন চিন বংশী সি হুয়াং তি খৃস্ট পর্ব তৃতীয শতাব্দে যার পুনর্গঠন হযেছিল হ্যান যুগে এবং যুগে যুগে যার ঈষৎ রদবদল হলেও মৌলিক পরিবর্তন কিছুমাত্র ঘটে নি। চীন দেশের ঐক্যের ভিত্তি যে আমলাতন্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেই আমলাতান্ত্রিক শাসন অন্তর্হিত হল। শাসন বিষযে বিপ্লবীদের এমন কোন সুস্পষ্ট পরিকল্পনা ছিল না যা সেই প্রাচীন পদ্ধতির স্থান অধিকার করতে পারে। ফলে প্রশাসন ব্যাপারে দীর্ঘকালব্যাপী বিশৃঙ্খলা দেখা দিযেছিল।

প্রথম রাষ্ট্রপতি ইউযান সি-কাই

ইউযান সি-কাই উত্তরাঞ্চলের মানুষ, তাঁর কর্মস্থানও ছিল উত্তর অঞ্চলে, রাজধানী তিনি পিকিং থেকে স্থানান্তরিত করেন নি। তাঁর রাজ্যশাসন ভাল-

ভাবেই শুরু হয়েছিল। সাধারণতান্ত্রিক দল বাহ্যত তাঁকে মেনে চলত, মাঞ্চুরাও তাঁকে সমর্থন করত, কিন্তু তা সত্ত্বেও অনতিবিলম্বে গোলযোগ বেধে গেল। ১৯১২ সালে ন্যানকিং নগরে বিপ্লবীরা যে সাময়িক সংবিধান প্রস্তুত করেছিল, সেই সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ছিল সীমাবদ্ধ, আর সেই ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত করবার ভার ছিল পার্লামেণ্ট বা লোকসভার ওপর। এই লোকসভার নির্বাচিত সদস্যদের অধিকাংশই ছিল বিপ্লবী, এবং লোক-সভার সেই প্রগতিশীল দল যে সংস্থা গঠন করেছিল, সেই সংস্থার নাম 'কুয়োমিনটাং' (Kuomintang)। ইউয়ান সি-কাই ছিলেন একজন দুর্দান্ত সামরিক নেতা, বিদেশীরা তাঁর নাম দিয়েছিল 'চীনের বলবান মানুষ' ("Strong man of China")। এরূপ পরাক্রান্ত স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তির পক্ষে গণতান্ত্রিক নিয়মে প্রতি পদে পার্লামেণ্টের অনুশাসন মেনে নেওয়া কঠিন, তাই লোকসভার সঙ্গে তাঁর বিরোধ বাধতে বিলম্ব হল না। কুয়োমিনটাং-এর মতের বিরুদ্ধে তিনি বিদেশীদের ব্যাঙ্ক থেকে প্রভূত পরিমাণ অর্থ ঋণস্বরূপ গ্রহণ করলেন প্রধানত নিজের শক্তিবৃদ্ধির জন্য, তারপর ইয়াংসি উপত্যকা ও দক্ষিণাঞ্চলের কয়েকজন সামরিক অধিনেতাকে অপসারিত করে তাদের স্থানে আপন মনোনীত ব্যক্তিদের প্রতিষ্ঠিত করলেন। বিরুদ্ধপক্ষীয়রা ইউয়ানের এইসব গণতন্ত্র-বিরোধী ক্রিয়াকলাপের প্রতিবাদ করেই ক্ষান্ত হল না, সান-ইয়াৎ-সেন-এর অনুমতিক্রমে অচিরে তারা বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে যুদ্ধাভিযানে যাত্রা করল। বিদ্রোহ দমন করতে ইউয়ান সি-কাই-এর বিশেষ বেগ পেতে হয় নি। সান-ইয়াৎ-সেন জাপানে চলে গেলেন। ইউয়ান তখন কুয়োমিনটাং সদস্যদের পার্লামেণ্ট থেকে বিতাড়িত করলেন (১৯১৩), এবং তার অব্যবহিত পরেই পার্লামেণ্ট ভেঙে দিলেন।

ইউয়ানের স্বৈরাচারী একনায়কত্ব সত্ত্বেও বছরখানেক ধরে রাষ্ট্রের সাধারণতান্ত্রিক রূপ বজায় রাখা হয়েছিল। ১৯১৫ সালে একটি সাজানো ব্যবস্থা অনুযায়ী 'রেফারেণ্ডাম' বা জনমত গ্রহণ করা হল, এবং সেই নির্দেশমত ইউয়ান সি-কাই সাধারণতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবার উদ্যোগ করলেন। তিনি নিজেকেই সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন, কিন্তু এই ব্যাপারে দেশবাসীর প্রতিক্রিয়া এমন ভয়ংকররূপে দেখা দিল যে তিনি ভীত হয়ে অভিষেক অনুষ্ঠান সাময়িকভাবে বন্ধ রাখলেন। সুদূর ইউনান প্রদেশে

বিদ্রোহ জেগে উঠল এবং সেখান থেকে সেই আগুন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ল, তখন রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশা ছেড়ে দিলেন ইউয়ান সি-কাই, 'সম্রাট' ঘোষণাও নাকচ করলেন। কিন্তু গণ-বিক্ষোভ শান্ত হল না, বিদ্রোহীরা দাবি করল রাষ্ট্রপতি-পদ থেকে ইউয়ানের অপসারণ। অনতি-বিলম্বে তিনি অপসৃত হলেন বটে, কিন্তু বিদ্রোহীদের দ্বারা নয়, ভগ্নস্বাস্থ্য ইউয়ান সি-কাই পরম দুশ্চিন্তার মধ্যে প্রাণত্যাগ করলেন (১৯১৬)। তখন যেসব প্রদেশপালের ওপর শাসন-ভার অর্পিত ছিল, অনেকেই তারা স্বাধীন হয়ে পড়ল এবং সেই সমরকর্তাদের অভ্যুত্থানের সঙ্গে বিপ্লবকালীন বিশৃঙ্খল অবস্থার সূচনা দেখা গেল। পরস্পর দ্বন্দ্ববিরোধ হানাহানি করে তারা তাদের পূর্ববর্তীদের ঐতিহাসিক ভূমিকার পুনরাবৃত্তি করতে বিলম্ব করে নি।

উপরাষ্ট্রপতি লি ইউয়ান হুং বিদ্রোহকালে ইউয়ান সি-কাই-র বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, বিদ্রোহীরা ক্যানটনে যে রাষ্ট্র স্থাপন করেছিল, সেই রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনিই। ইউয়ানের মৃত্যুর পর তিনি সমগ্র রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে তার যোগ্যতার ছিল একান্ত অভাব, তাই দেশের অবস্থা আপাতত শান্ত হলেও অচিরেই বিশৃঙ্খলা আবার মাথা তুলেছিল। তিনি ১৯১২ সালের অবলুপ্ত সংবিধানটির পুনঃপ্রবর্তন করলেন, এবং সেই সংবিধান অনুসারে একটি পার্লামেণ্ট গঠন করলেন। ফেং কুয়ো চ্যাং নামে জনৈক সমরকুশলী ব্যক্তি হলেন উপরাষ্ট্রপতি। ইউয়ান সি-কাই-র প্রধান মন্ত্রী ও সমর্থক তুয়ান চি-জুই পূর্ববৎ প্রধান মন্ত্রীর পদেই প্রতিষ্ঠিত রইলেন। এইরূপে লি ইউয়ান-হুং প্রশাসন-ক্ষেত্রে সকল পক্ষের প্রতিনিধিকেই স্থান দিয়েছিলেন, কিন্তু অভাব ছিল একজন নেতৃত্ব-গুণবিশিষ্ট অধিনায়কের যিনি বিরুদ্ধ পক্ষগুলির চিন্তা ও কর্ম নিয়ন্ত্রিত করে সুনির্দিষ্ট পথে সকলকে পরিচালনা করবার ক্ষমতা রাখেন।

২. প্রথম মহাযুদ্ধ ও পরবর্তী কাল

জাপানের 'একুশ দফা দাবি'

১৯১৪ সালে ইউরোপে যে মহাযুদ্ধ বেধে গিয়েছিল সেই যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল সমগ্র এশিয়া খণ্ডে। যুধ্যমান পক্ষদ্বয়ের এক দিকে ইংরেজ, ফরাসী

ও রুশ, এবং অপর দিকে জার্মানি ও অষ্ট্রিয়া,* এই শেষোক্ত দেশ ভিন্ন বাকি প্রত্যেকটির স্বার্থ সন্ধিসূত্রে চীনে অধিকৃত কোন-না-কোন ভূখণ্ড বা বন্দরের সঙ্গে জড়িত ছিল। তাই পাছে ইউরোপের সংগ্রাম চীন দেশেও বিস্তৃত হয়ে পড়ে সেজন্য ইউয়ান সি-কাই কোন পক্ষে যোগদান না করে নিরপেক্ষতা অবলম্বনের চেষ্টা করলেন, এবং চীনের ভূমিতে কোনরূপ সামরিক অভিযানের উদ্যোগ থেকে বিরত থাকবার জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষদের অনুরোধ জানালেন। আমেরিকা তখনো ছিল নিরপেক্ষ, ইউয়ান আমেবিকাকে চীনের নিরপেক্ষতায় সাহায্য কববার জন্য প্রার্থনা করলেন। ইতিমধ্যে জাপান মিত্রশক্তি অর্থাৎ ইংরেজ, ফ্রান্স ও রুশেব পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করল, এবং ইউয়ান সি-কাই র প্রতিবাদ সত্ত্বেও চীন দেশে জার্মান-অধিকৃত কিয়াচৌ বন্দর ও সংলগ্ন অন্যান্য স্থানগুলি দখল করে বসল। তাবপর জাপান গৃহবিরোধে বিপন্ন অসহায় চীনের কাছে অত্যন্ত অসংগতভাবে কুখ্যাত 'একুশ দফা দাবি' ("Twenty-one Demands") উপস্থাপিত করল (১৯১৫) স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে চীনকে জাপানের তাঁবেদার রাষ্ট্র হয়ে থাকতে বাধ্য করাই ছিল এই 'একুশ দফা দাবি'র উদ্দেশ্য। দাবির কথা গোপন বাখতে বলা হয়েছিল, কিন্তু সেই দাবি মানতে অসম্মত হয়ে ইউয়ান সি-কাই ইস্তাহারটি প্রকাশ কবে দিয়েছিলেন। এই 'একুশ দফা দাবি' ছিল পাঁচ

* ১৯১৪ সালেব ২৮শে জুন তারিখে পূর্ব ইউরোপেব সেবাজেভো শহরে ভ্রমণকালে অস্ট্রিয়ান আর্কডিউক ফার্ডিনেণ্ড একজন সন্ত্রাসবাদীব বোমা বিস্ফোরণে নিহত হন। সার্বিয়া রাষ্ট্রই এই সন্ত্রাস-বাদকে প্রশ্রয় দিয়েছে, এই ওজুহাতে অস্ট্রিয়া সার্বিয়াব ওপব চরমপত্র দেয় এবং জার্মানি অস্ট্রিয়াকে সমর্থন করে। এদিকে রাশিয়াও সার্বিয়াকে রক্ষা করবার জন্য যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করে। তখন দুই পক্ষে যুদ্ধ বেধে গেল, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকেও রাশিয়ার পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। পরে ইতালিও মিত্রপক্ষে যোগদান করল। বেলজিয়াম অধিকার করে জার্মানি প্যারিসের উপকণ্ঠ পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছিল, পরে কিন্তু সরে আসতে হয়েছিল। যুদ্ধকালীন একটি বিশেষ ঘটনা, চরম অব্যবস্থার মধ্যে রাশিয়ার চূড়ান্ত পরাজয়, রুশ জারের সম্রাট পদ ত্যাগ এবং জার্মানির সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধবিরতি চুক্তি (১৯১৭)। কিন্তু রাশিয়ার পতন জার্মানিকে মিত্র-শক্তির হাতে পরাজয় থেকে রক্ষা করতে পারে নি। এই মহাযুদ্ধের অবসান ঘটে ১৯১৮ সালের ১১ই নভেম্বর। এদিকে রাশিয়ায়ও তখন বলশেভিকরা কম্যুনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত করেছিল লেনিনের নেতৃত্বাধীনে।

ভাগে বিভক্ত: প্রথম ভাগে ছিল এই প্রস্তাব, সানটাং ও জার্মান-অধিকৃত স্থানগুলি জাপানের প্রভাবাধীন থাকবে, এবং ঐসব ভূখণ্ড সম্বন্ধে জার্মানির ওপর জাপান কর্তৃক আরোপিত শর্তগুলি চীন মেনে নেবে আর সেই প্রদেশে রেলপথ প্রস্তুতের অধিকার জাপানকে দেওয়া হবে। দ্বিতীয় ভাগে ছিল দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া ও পূর্ব অন্তর্মো ,লিয়ার কথা। পোর্ট আর্থার ও ডায়রন দখলের যে ইজারা জাপান পেয়েছিল পঁচিশ বছরের জন্য, ইজারা শেষ হবার কথা ১৯২৩ সালে, সেই ইজারা-স্বত্বের মেযাদ বর্ধিত করে নিবানব্ব,ই বছর করা হবে এই ছিল প্রস্তাব। তৃতীয় ভাগে ছিল মধ্য চীনে হ্যানিয়েপিং নগরের সুবৃহৎ লৌহ-কারখানাটিকে চীন ও জাপানেব যৌথ পরিচালনাধীনে স্থাপন কববাব প্রস্তাব। চতুর্থ ভাগে কোন বন্দর বা দ্বীপ তৃতীয় শক্তিকে বিক্রি বা হস্তান্তর কবা নিষিদ্ধ হয়েছিল। এই শর্তের উদ্দেশ্য, সমগ্র চীনে জাপানী একাবিপত্যের প্রভাব কায়েম করে রাখা। পঞ্চম ভাগে চীন দেশে জাপানের স্বার্থ ও প্রভুত্বকে দৃঢভাবে প্রতিষ্ঠিত করবার ব্যবস্থা ছিল। শর্তগুলি এইরূপ: চীনকে জাপানী উপদেষ্টা নিযুক্ত করতে হবে, যুদ্ধোপকরণের অন্তত অর্ধেক পরিমাণ জাপান থেকে ক্রয় কবতে হবে, ইয়াংসি উপত্যকায় জাপানীদের বেলপথ প্রস্তুতের অধিকার দিতে হবে, এবং প্রধান স্থানসমূহে শান্তিরক্ষাব ভার সম্মিলিত চীনা ও জাপানী পুলিশবাহিনীর হস্তে ন্যস্ত থাকবে। প্রচণ্ড প্রতিবাদ সত্ত্বেও এই একুশ দফা দাবি গ্রহণ না কবে ইউয়ানের গত্যন্তর ছিল না, তবে শক্তিপুঞ্জেব হস্তক্ষেপের ফলে দাবিগুলিব আকার পরিবর্তিত কবে কঠোরতা অনেকটা হ্রাস কবা হযেছিল। পঞ্চম ভাগটি ইউযান গ্রহণ কবলেন না, এবং চতুর্থ ভাগে সন্নিবিষ্ট হল এই শর্ত যে চীন কোন বিদেশী শক্তিকেই (জাপানও একটি বিদেশী শক্তি) ভূখণ্ড ও বন্দর বিক্রি কববে না বা ইজাবা দেবে না। বলা বাহুল্য এই শেষোক্ত শর্তটি মূল প্রস্তাবের জাপানী একাধিপত্য স্থাপনের অসাধু উদ্দেশ্যকে ভণ্ডুল করে দিয়েছিল।

সমবনেতাদের ক্রিয়াকলাপ

১৯১৭ সালে আমেরিকা জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। তখন চীনের মহাযুদ্ধে যোগদানের একটি প্রস্তাবকে ঘিরে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ববিরোধ আবার মাথা তুলল। চীন জার্মানির সঙ্গে কূটনৈতিক সম্বন্ধ ছিন্ন করল,

কিন্তু প্রধান মন্ত্রী তুয়ান চি-জুই যখন পার্লামেণ্টের সম্মুখীন হলেন মিত্র-শক্তির পক্ষে যুদ্ধে যোগদান প্রস্তাব গ্রহণের জন্য, পার্লামেণ্ট তখন সেই প্রস্তাবে সম্মতি না দিয়ে প্রধান মন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করল। রাষ্ট্রপতি লি ইউয়ান-হুং পার্লামেণ্টের দাবি মেনে নিয়ে প্রধান মন্ত্রী তুয়ান-কে অপসারিত করলেন। তুয়ান টিয়েনসিনে প্রস্থান করলেন, এবং তারপরই বিষম গোলযোগ শুরু হয়ে গেল। পরলোকগত ইউয়ান সি-কাই-র সমর্থক সমরনেতারা একজোট হয়ে উত্তরাঞ্চলের প্রদেশগুলির স্বাধীনতা ঘোষণা করল। রাষ্ট্রের এই বিষম আপদকালে রাষ্ট্রপতি লি ইউয়ান-হুং যে সমরনেতার শরণাপন্ন হলেন তিনি আনহুই প্রদেশের রাজ্যপাল চ্যাং সুন, ১৯১১ সালের বিপ্লবে মাঞ্চু সম্রাটের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। রাষ্ট্রপতি তাঁর পরামর্শমত পার্লামেণ্ট ভেঙে দিলেন। পরক্ষণেই চ্যাং সুন জগৎকে চমৎকৃত করলেন চিং বংশাবতংসের সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘোষণা করে। এই রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তন পরিকল্পনায় সুবিখ্যাত জননেতা ক্যাং ইউ ওয়েই-র সমর্থন ছিল। চ্যাং সুন ছিলেন গোঁড়া কনফুসীয় পন্থী, রাজবংশের প্রতি আনুগত্যই শ্রেষ্ঠ নীতিধর্ম, সম্ভবত এই বিবেচনা করেই তিনি রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু সমরনেতারা তাঁর এই নীতি বরদাস্ত করল না, তিয়েনসিন থেকে মিলিতভাবে সসৈন্য অগ্রসর হয়ে তারা পিকিং অধিকার করল। পরাজিত হয়ে চ্যাং সুন ওলন্দাজদের আশ্রয় নিলেন, আর নির্দোষ বালক সম্রাট যিনি কোন ব্যাপারেই স্বেচ্ছায় লিপ্ত হন নি, তাঁকে পিকিং ছেড়ে জাপানীদের শরণ নিতে হল। রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এই দ্বিতীয় চেষ্টা ব্যর্থ হবার ফলে চীন দেশে সাধারণতন্ত্রের আসন কায়েম হয়ে রইল।

লি ইউয়ান-হুং আর রাষ্ট্রপতি পদ গ্রহণ করলেন না। তেমন কোন শক্তিমান সমর্থক তাঁর ছিল না, মর্যাদাও তাঁর যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। রাষ্ট্রপতি হলেন ফেং কুয়ো চ্যাং যিনি ছিলেন উপরাষ্ট্রপতি, আর তুয়ান চি-জুই হলেন প্রধান মন্ত্রী। ১৯১৭ সালের ১৪ই আগস্ট তুয়ান মিত্রশক্তির পক্ষে চীনের মহাযুদ্ধে যোগদান ঘোষণা করলেন। সমরনেতাদের বাহুবলেই নূতন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তারাই এখন প্রধান হয়ে উঠল, এবং তাদের উদ্যোগে ও কর্তৃত্বাধীনে একটি সংসদ গঠিত হল। এই সংসদের নাম হয়েছিল 'তুচুন-দের (সমরনেতাদের) পার্লামেণ্ট'। এই সংসদ ফেং-কে রাষ্ট্রপতি-পদ থেকে

অপসারিত করল, আর সেই পদে প্রতিষ্ঠিত করল পুরনো আমলের একজন পণ্ডিত কর্মচারীকে, তাঁর নাম স্যু সি-চ্যাং। এইরূপে তুয়ান চি-জুই-র দলই সর্বেসর্বা হয়ে উঠল, এই দলের নাম দেওয়া হয়েছিল 'আনফু সংঘ'। কিন্তু সমগ্র দেশ এই নূতন দলের প্রাধান্যকে মাথা পেতে গ্রহণ করে নি। সাংঘাই ও ক্যানটনে ১৯১৩ সালের পুরনো পার্লামেন্টের প্রগতিশীল কুয়োমিনটাং সদস্যরা মিলিত হয়ে ঘোষণা করল যে ১৯১২ সালের সংবিধান অনুসারে গঠিত পুরনো পার্লামেন্টের অস্তিত্ব এখনো বিদ্যমান, সুতরাং পিকিং-এর পার্লামেন্ট অবৈধ। এই সম্মেলন রাষ্ট্রের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করল ক্যানটন নগরে। প্রকৃতপক্ষে পিকিং এর তুলনায় ক্যানটনে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের ক্ষমতা ছিল অল্পই দক্ষিণের প্রদেশগুলিও রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করত নামমাত্র। ১৯২১ সালে ক্যানটনের রাষ্ট্র-সদস্যগণ সান ইয়াৎ-সেন-কে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করল।

এই সময় চীনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নানান কারণে জটিল হয়ে উঠেছিল। জাতীয় ঐক্য ও সংহতি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। দেশ খণ্ড বিখণ্ড হয়ে পড়েছিল, সমরনেতারা স্ব স্ব প্রধান হয়ে উঠেছিল, তারা পরস্পর বিবাদ বিসংবাদ এমন কি যুদ্ধবিগ্রহও শুরু করে দিল। ১৯২০ সালে মাঞ্চুরিয়ার শাসক চ্যাং সো-লিন পিকিং-এর আনফু দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তুয়ান চি-জুই কে বিতাড়িত করেন। এই অভিযানে চ্যাং-কে সাহায্য করেছিল দুজন সেনাপতি শাও কুন ও উ পেই ফু। কিন্তু মাঞ্চুরিয়া-পতি চ্যাং সো লিন-এর সঙ্গে সেনাপতি উ পেই ফু-র মৈত্রীবন্ধন স্থায়ী হয় নি। ১৯২২ সালে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। উ পেই ফু-র সঙ্গে যোগদান করেছিলেন খৃস্টান সেনাপতি ফেং ইউ-সিয়াং। চ্যাং পরাজিত হয়ে সসৈন্য মাঞ্চুরিয়ায় প্রস্থান করেন। যুদ্ধবিজয়ী উ পেই ফু রাষ্ট্রপতিরূপে লি ইউয়ান-হুং-কে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করলেন, কিন্তু বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি চীনের ঐক্য স্থাপন করতে পারেন নি, তার কারণ উ-র প্রতি সান-ইয়াৎ-সেন ছিলেন বিরূপ, তার ওপর চ্যাং সো লিন ও অন্যান্য সমরনায়কদের বিরোধিতা রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের বিঘ্নস্বরূপ হয়ে উঠেছিল। লি ইউয়ান-হুং আবার তিয়েনসিনে প্রস্থান করলেন, এবং তাঁর স্থলে রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচিত হলেন সাও কুন। এই নির্বাচনটি হয়েছিল একটি প্রহসন-বিশেষ, ১৯১৩ সালের পার্লামেন্টের অবশিষ্ট ভগ্নাংশের সভ্যদের প্রচুর উৎকোচদানে বশীভূত করা হয়েছিল।

১৯২৪ সালে পিকিং সরকারের ভাগ্যচক্রের আবর্তন ঘটল, বস্তুত গৃহ-যুদ্ধ তখন সমরনায়কদের একটি নৈষ্ঠিক অনুষ্ঠানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। উ পে'ই ফু-র সঙ্গে যুদ্ধে চ্যাং সো-লিন-এর জয় হল, কারণ খৃস্টান সেনাপতি ফেং উ-র পক্ষ ত্যাগ করেছিলেন। সা'ও কুন-কে পদচ্যুত করে বন্দী করা হল, তুযান চি-জুই-কে আবার পিকিং সরকারের চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত করা হল, প্রেসিডেন্ট-রূপে নয়, প্রধান কর্মকর্তা-রূপে। সেনাপতি ফেং ও চ্যাং সো-লিন উভয়ে মিলিত হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনায় মন দিয়েছিলেন, কিন্তু ১৯২৫ সালে উভয়ের মধ্যে বিবাদ বাধল, ফলে চ্যাং-কে পিকিং ছেড়ে মাঞ্চুরিয়ায় প্রস্থান করতে হল। ১৯২৬ সালে উ পে'ই ফু ও চ্যাং সো-লিন হাত মেলালেন এবং মিলিতভাবে পিকিং আক্রমণ করে ফেং ইউ-সিয়াং-কে তাঁর বাহিনী সহ বিতাড়িত করলেন। সেই সঙ্গে তুযান চি-জুই ও তিয়েনসিনে প্রস্থান করলেন। তখন পিকিং-এ আর কোন প্রেসিডেন্ট বা কর্মকর্তা রইল না। সমরনায়কদের সম্মতিক্রমে একটি মন্ত্রিসভাব নামমাত্র অস্তিত্ব বজায় রাখা হয়েছিল, বিদেশী শক্তিপুঞ্জের রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়েছিল এই সভারই সঙ্গে।

সান-ইয়াৎ-সেন-এর পুনর্নির্বাচন : 'নয় শক্তি সম্মেলন'

১৯২১ সালে ক্যানটনে সান-ইয়াৎ-সেন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু দেশের ঐক্যসাধনে তাঁর সকল উদ্যম ব্যর্থ হযেছিল। উত্তরাঞ্চলে দূরে থাক, দক্ষিণাঞ্চলের প্রদেশগুলির ওপরও ক্যানটনের আধিপত্য স্থাপিত হয় নি। সান-ইয়াৎ-সেন ছিলেন একজন মস্ত আদর্শবাদী, প্রচারকাযে নিপুণ হলেও কার্যক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় দেন নি। দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি যেসব পরিকল্পনা কবেছিলেন তার অনেকগুলিই ছিল অবাস্তব, যদিও কযেকটির মধ্যে দূরদর্শিতার আভাস পাওয়া যায় না, এমন নয়। বৈপ্লবিক সংগঠনে পারদর্শী ছিলেন তিনি, কিন্তু প্রশাসন ব্যাপারে কুয়োমিন-টাং-কে পরিচালিত করতে পারেন নি, এই অনেকের ধারণা। ১৯২৫ সালে চ্যাং সো-লিন ও ফেং ইউ-সিয়াং কর্তৃক দেশের ঐক্যবিধান সম্বন্ধে আলোচনার জন্য আহূত হয়ে তিনি উত্তরাভিমুখে যাত্রা করেন, কিন্তু কোনরূপ আলোচনার পূর্বেই অসুস্থাবস্থায় পিকিং নগরে অস্ত্রোপচারের পরে তাঁর মৃত্যু হয়।

মহাযুদ্ধ শেষ হয় ১৯১৮ সালে, তার পূর্বেই রাশিয়ায় রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটেছিল, এবং সেখানে বলশেভিক দল কর্তৃক সাম্যবাদী (কম্যুনিস্ট) রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। চীনের যুদ্ধে যোগদানের ফলে কতগুলি সুবিধা যে ঘটে নি তা নয়। 'বক্সার হাঙ্গামা'র দায়স্বরূপ যে অর্থ প্রতি বছর জার্মানিকে দিতে হত সেই অর্থদানের অপচয় থেকে চীন মুক্তি পেল, আবার মিত্রশক্তিরাও নির্ধারিত কিস্তির আদায় বন্ধ করে চীনের দুর্দশার ভার অনেকখানি লাঘব করেছিল। কিন্তু এসব সুবিধা সত্ত্বেও জাপানের ওপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা অচিরেই চীনকে তার প্রতিবেশী দ্বীপ-রাষ্ট্রের মুষ্টি-মধ্যে ঠেলে নিয়ে চলেছিল। পিকিং-এর দৈন্যগ্রস্ত শাসক সম্প্রদায় ক্রমাগত জাপানের কাছে ঋণ গ্রহণ করতে লাগল, আর সেই সঙ্গে চীনের বনজ ও খনিজ সম্পদ, রেল, টেলিগ্রাফ ও নানারূপ ট্যাক্সের ওপর জাপানের অধিকার বিস্তৃত হয়ে পড়ল। তা ছাড়া যুদ্ধোপকরণ সরবরাহের ভার জাপানকে অর্পণ করবার একটি চুক্তিও করা হয়েছিল। যুদ্ধান্তে প্যারিসে যে শান্তি-বৈঠক বসেছিল সেখানে চীনকে একটি আসন দেওয়া হয়েছিল। পিকিং ও ক্যান্টন দুই অঞ্চলেরই প্রতিনিধি সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিল, কিন্তু সেখানে চীনের একান্ত চেষ্টা সত্ত্বেও জাপানের সঙ্গে 'অসমান সন্ধিপত্রগুলি' (unequal treaties) নাকচ করা গেল না। চীন তখন মিত্রশক্তিদের প্রস্তাবিত সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর না করে জার্মানির সঙ্গে স্বতন্ত্র সন্ধি করল। এই সন্ধিমত জার্মানি চীনা ভূখণ্ডে 'এক্স্‌ট্রাটেরি-টোরিয়ালিটি'র সুবিধাগুলি পরিত্যাগ করল, সেই সঙ্গে 'বক্সার হাঙ্গামা'র দরুন পাওনা অর্থের দাবিও ছেড়ে দিল। ইতিপূর্বেই কম্যুনিস্ট রাশিয়া চীনের সখ্যতা কামনা করে উপরোক্ত সুবিধা ও দাবিগুলি স্বেচ্ছায় পরিহার করেছিল, এবং উত্তর মাঞ্চুরিয়ায় রেলপথ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা চীনকে প্রত্যর্পণ করেছিল। এই উপলক্ষে রুশ রাষ্ট্রদূত আডল্‌ফ্ জফে পিকিং-এ এসে যখন চীনকে সম-পঙ্‌ক্তির সম্মানিত শক্তিরূপে ঘোষণা করলেন, বিদেশী রাষ্ট্রদূতেরা তাঁকে সেদিন ঘৃণাভরে উপেক্ষা করেছি[illegible]ট, কিন্তু চীনের শিক্ষিত সম্প্রদায় ও জনসাধারণের কাছে তিনি [illegible]ল সংবর্ধনা লাভ করেছিলেন। পাশ্চাত্ত্য শক্তিপুঞ্জের কাছে চীনারা চিরদিন প্রত্যাশা করে এসেছিল অপাঙ্‌ক্তেয়ত্বের লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি, শোষণের শেষ ও দেশের সম্পদ গঠনে শ্রীবর্ধনে সহায়তা, কিন্তু বহুবার প্রার্থনা সত্ত্বেও যখন তারা বিফলকাম হল তখন স্বভাবতই তারা

কম্যুনিস্ট রাশিয়ার উদার বন্ধুভাবে সাড়া দিয়েছিল। ১৯২১ সালে চীনে একটি কম্যুনিস্ট পার্টি স্থাপিত হল, এবং ঐ বছরেই নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতি সান-ইয়াৎ-সেন সাংঘাই নগরে রাষ্ট্রদূত জফের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রুশ সাহায্য গ্রহণ করতে স্বীকার করেন।

১৯২১-২২ সালে ওয়াশিংটনে নয়-শক্তির একটি সম্মেলনের অধিবেশন হয়, সেই সম্মেলনে বৃটেন, ফ্রান্স, জাপান প্রভৃতির সঙ্গে চীনও আমন্ত্রিত হয়েছিল। সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল দূরপ্রাচ্যের বিষয় আলোচনা, বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নৌ-বহর গঠনে জাপানের যে প্রতিযোগিতার উদ্যোগ দেখা দিয়েছিল, তারই মীমাংসা। নয়-শক্তি একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করেছিল, তার মধ্যে চীনের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা স্বীকৃতির মর্মে এবং সে দেশের প্রশাসনিক মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য বিশেষ কয়েকটি ধারা সন্নিবিষ্ট হয়েছিল।

মাইকেল বোরোডিন : 'স্যান মিন চু আই'

মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে সান-ইয়াৎ-সেন চীনে কয়েকজন কম্যুনিস্ট পরামর্শ-দাতা প্রেরণের জন্য রুশকে অনুরোধ করেছিলেন (১৯২৩)। রাশিয়ায় কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা একটি চমকপ্রদ অভিনবত্বের ধ্বজা তুলে দিয়েছিল বটে, কিন্তু সান-ইয়াৎ-সেন প্রমুখ চীনা বিপ্লবীরা যে সোভিয়েত শ্রেণী-সংগ্রামের আদর্শে গণ-রাষ্ট্র গঠন ও শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন, এরূপ মনে করবার কারণ নেই। সান-ইয়াৎ-সেন কম্যুনিস্ট ছিলেন না, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য শক্তিপুঞ্জের ওপর বিশ্বাস হারিয়েছিলেন বলে কুয়োমিনটাং পুনর্গঠনের জন্য কম্যুনিস্টদের সাহায্য গ্রহণই শ্রেয় মনে করেছিলেন। তাঁর অনুরোধে রাশিয়া থেকে কম্যুনিস্টের দল প্রেরিত হয়েছিল, তাঁদের নেতা মাইকেল বোরোডিন ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ বলশেভিক বিপ্লবী। যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষালাভ করেছিলেন তিনি, তুরস্ক, মেক্সিকো প্রভৃতি স্থানের বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা তাঁর যথেষ্ট ছিল। রুশ কম্যুনিস্টদের পরামর্শে কুয়োমিনটাং [illegible] বলশেভিক দলের ধাঁচে গড়ে উঠল, যে কর্মসূচি বলশেভিক দলকে [illegible] করে তুলেছিল কুয়োমিনটাংও সেই কর্মসূচির অনেকখানি গ্রহণ করল। মৃত্যুর পর সান-ইয়াৎ-সেন জাতীয় মহাপুরুষের সম্মান লাভ করেছিলেন, তাঁর ছবির সামনে প্রতি সপ্তাহে স্তব-কীর্তন করা হত। তিনি কয়েকখানা বই লিখেছিলেন জাতির কর্মসূচি বর্ণনা

করে, এবং একটি 'শেষ উইল'ও রেখে গিয়েছিলেন। গ্রন্থগুলি ও উইলের মর্ম কুয়োমিনটাং সর্বতোভাবে গ্রহণ করল। উইলটি নিয়মিতভাবে সর্বজন-সমক্ষে পঠিত হত, এবং 'স্যান মিন চু আই' বা 'তিনটি গণনীতি' ("Three Peoples' Principles") নামক গ্রন্থটি পার্টির নীতিশাস্ত্র রূপে গৃহীত হয়েছিল। এই তিনটি নীতি: (১) সর্বসাধারণ কর্তৃক পরিচালিত এবং সর্বসাধারণের কল্যাণের জন্য প্রশাসন (অর্থাৎ 'ডিমক্রেসি' বা গণতন্ত্র), (২) সর্বসাধারণের জীবনধারণের উপযোগী ব্যবস্থাকরণ (অর্থাৎ 'সোসিয়ালিজম্' বা সমাজতন্ত্র); (৩) বিদেশী নিয়ন্ত্রণের হাত থেকে মুক্তি (অর্থাৎ 'ন্যাশানালিজম্' বা জাতীয়তা)। চীনের অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে পরিবর্তিত আকারে কম্যুনিজম্ প্রবর্তনের চেষ্টা করা হয়েছিল বটে, কিন্তু সান-ইয়াৎ-সেন রুশ কম্যুনিজমের মার্কসীয় শ্রেণী-সংগ্রামের কর্মসূচি গ্রহণ করেন নি। গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তনের জন্য তিনি তিন পর্যায়ের একটি কর্মসূচি প্রস্তুত করেছিলেন: প্রথম পর্যায়ে সামরিক শাসনের ব্যবস্থা, দ্বিতীয় পর্যায়ে পার্টির নেতৃত্বাধীনে শাসন পরিচালনা ও জনসাধারণের স্বায়ত্তশাসনে শিক্ষালাভ, তৃতীয় পর্যায়ে সংবিধান রচনার পর পার্লামেণ্ট ও প্রেসিডেন্টের গণতান্ত্রিক শাসন।

চিয়াং কাই-সেক

১৯২৬ সালে কুয়োমিনটাং বা জাতীয়তাবাদী বাহিনী উত্তরাভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করল। সেনাপতি হলেন যুবক চিয়াং কাই-সেক, অন্য নাম চিয়াং চিয়ে-সি। যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষালাভ করেছিলেন তিনি প্রথমে পাও টিং ফু-র সামরিক বিদ্যালয়ে, পরে সেই শিক্ষা টোকিও সামরিক কলেজে সম্পূর্ণ করেন। বিপ্লবের সমর্থকরূপে তিনি সান-ইয়াৎ-সেন-এর সহকর্মী হয়েছিলেন। ১৯২৩ সালে সান-ইয়াৎ-সেন তাঁকে রাশিয়ায় প্রেরণ করেন নানান সামরিক বিষয় আয়ত্ত করবার জন্য। ক্যানটনে ফিরে এসে সান-ইয়াৎ-সেন-এর অনুমতিক্রমে চিয়াং হোয়াম-পোয়া সামরিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করলেন, এবং সেই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হয়ে বসলেন। কুয়োমিনটাং বাহিনীর অনেক অফিসারই এই বিদ্যালয়ে সমরশিক্ষা লাভ করেছিলেন।

চিয়াং-এর অভিযানের প্রথম অবস্থায় লক্ষণ ভালই দেখা গিয়েছিল। জাতীয় বাহিনীর অগ্রগতি অব্যাহতভাবেই চলেছিল। মনে হল এবার বুঝি

দুর্ভাগা দেশের অন্তহীন গৃহযুদ্ধ, স্বার্থান্ধ পাকচক্র ও অর্থনৈতিক দুর্গতির অবসান ঘটবে। ১৯২৭ সালে ইয়াংসি নদীর তীরে জাতীয় বাহিনী এসে উপস্থিত হল। উ পে'ই ফু ও সাংঘাইর সমরনেতা পবাজিত হল, উচ্যাং, হ্যানকৌ ও সাংঘাই নগরসমূহ জাতীয় বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত হল।

পিকিং অধিকারের সঙ্গে হয়তো গৃহযুদ্ধের অবসান এবং সমগ্র দেশে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হত, কিন্তু আবার একটি নূতন বাধা এসে দেখা দিল, কম্যুনিস্টদের সঙ্গে চিয়াং কাই-সেকের বিবাদই সেই বাধা। বোরোডিন প্রভৃতি রুশ উপদেষ্টাগণেব আগমনের পর থেকে দেশে কম্যুনিস্ট প্রভাব দ্রুত বর্ধিত হয়ে চলেছিল, সমগ্র ছাত্রসমাজ কম্যুনিস্ট ভাবাপন্ন হযে পড়েছিল, কৃষক-শ্রমিকদের সংঘ গঠিত হয়েছিল। পুঁজিপতি ও সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হল, এবং এই সূত্রে অনেক ধনী জমিদারের বিষয়-আশয় বাজেয়াপ্ত হল। হ্যানকৌ নগরে একটি বামপন্থী সবকার প্রতিষ্ঠিত হল, বাশিয়া-প্রত্যাগত চীনা ছাত্রবা কম্যুনিজমের শক্তিবৃদ্ধি কবল। চীনাদের কম্যুনিজমের আদর্শে অনুপ্রাণিত করবার জন্য রুশ রাজধানী মস্কোতে সান-ইয়াৎ-সেন-এব নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (১৯২৫), সেখানে ছয় শ' ছাত্রকে শিক্ষাদান করা হত।

চীনে কম্যুনিজমের আবির্ভাব ও সংবৃদ্ধি নানান অসংগত সুবিধাভোগী বিদেশী শক্তিপুঞ্জের উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠেছিল। ঘরোয়া ব্যাপাবে কম্যুনিস্টদের লক্ষ্য ছিল সমরনায়কদের উচ্ছেদ এবং জমিদারি প্রথার বিলুপ্তি। শিল্প বিষয়ে চীন ছিল অনুন্নত, শিল্পপতিদের অনেকেই ছিলেন বিদেশী, বেশির ভাগ শিল্প-প্রতিষ্ঠান চীনের অধিকার-বহির্ভূত বন্দরগুলিতে অবস্থিত। কম্যুনিস্টদের আন্দোলন বিদেশীগণ ও তাদের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল অনেকটা জাতীয়তাবাদের আদর্শে। আন্দোলনের বিষয় প্রধানত দুইটি: একটি 'একস্‌ট্রাটেরিটোরিয়ালিটি', অর্থাৎ চীনা ভূখণ্ডে বিদেশীর স্বায়ত্তশাসন, এবং দ্বিতীয়টি 'ট্যারিফ' অর্থাৎ শুল্ক ধার্য ও আদায় ব্যাপারে বিদেশীর হস্তক্ষেপ। এখানে বলা প্রয়োজন যে তা'ই পিং' বিদ্রোহের বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে বিদেশী শক্তিপুঞ্জ বন্দরসমূহে শুল্ক (maritime custom) আদায়ের ভার গ্রহণ করেছিল, সেই থেকে শুল্ক আদায়ের কার্য তারাই করে আসছিল। এখন আন্দোলন শুরু হল সেই বিদেশী কর্তৃক শুল্ক

আদায় ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, ফলে নিতান্ত অনিবার্যভাবেই দাঙ্গা বাধল। ১৯২৫ সালের ৩০শে জুন সাংঘাই উপনিবেশে একটি জাপানী ফ্যাক্টরিতে দাঙ্গার পর আন্দোলনকারীরা লাউজা থানা আক্রমণ করল, তখন বৃটিশ পুলিশ কর্তৃক গুলিবর্ষণের ফলে নয়জন ছাত্র নিহত হয়। বৃটিশ পুলিশের এই কার্য আইনসংগত হোক বা না হোক, চীন দেশের বুকের ওপর বসে বিদেশীদের লাঞ্ছনাকর ক্রিয়াকলাপ, বিশেষত নবীন সমাজের আশা-ভরসা ছাত্রদের নির্মম-ভাবে হত্যা চীনাদের ভয়ানক উত্তেজিত করে তুলেছিল। গুলিবর্ষণের প্রতিবাদস্বরূপ বৃটিশ দ্রব্য 'বয়কট'-এর আন্দোলন শুরু হল, বৃটিশ ব্যবসা-বাণিজ্য একরকম বন্ধ হয়ে গেল। দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও গুলিবর্ষণ আরও চলতে লাগল।

চিয়াং-এর কম্যুনিস্ট-দলন ও পরবর্তী ঘটনাবলী

এইরূপ অশান্ত অবস্থার মধ্যেই চিয়াং কাই-সেক তাঁর উত্তরাভিযান শুরু করেছিলেন। ১৯২৭ সালে সাংঘাই নগরে কম্যুনিস্ট-প্ররোচিত ধর্মঘট বিলক্ষণ সাফল্য লাভ করেছিল, এবং সেই সময়েই কম্যুনিস্ট ভাবাপন্ন একদল সৈন্য ন্যানকিং অধিকার করে বিদেশীদের হত্যা ও নির্যাতন আরম্ভ করল। হ্যাংকৌ ও কিউকিয়াং নগরেও ইংরেজদের আক্রমণ করা হয়েছিল। চিয়াং কাই-সেক ছিলেন নরমপন্থী, কম্যুনিস্টদের হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। হ্যাংকৌ নগরের কম্যুনিস্ট শাসনের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে তিনি ন্যানকিং-এ শাসন-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করলেন। তারপর তিনি কুয়োমিনটাং-এর নরমপন্থী সদস্য ও রক্ষণশীল ব্যক্তিদের সমবেত সাহায্যে কম্যুনিস্ট দলনে প্রবৃত্ত হলেন।

কম্যুনিস্ট ও কুয়োমিনটাং-এর মধ্যে সংঘর্ষ-পর্বের প্রথম দিকে মনে হয়েছিল উভয় দলেরই ধ্বংস বুঝি আসন্ন, কিন্তু চিয়াং-সমর্থক কুয়োমিনটাং দলই পরিশেষে জয়লাভ করল। ১৯২৭ সালের ১২ই এপ্রিল কুয়োমিনটাং বাহিনীর হঠাৎ আক্রমণে হ্যাংকৌ নগরের কম্যুনিস্ট দল বিধ্বস্ত হয়। হ্যাংকৌ সরকার ভেঙে পড়ল, লিংপো, আময়, সোয়াংটৌ ও ক্যানটনেও কম্যুনিস্টদের উৎসাদন করা হয়েছিল। বোরোডিন রাশিয়ায় প্রত্যাবর্তন করলেন, চীনে তাঁর উদ্যম সফল হয় নি বলে তাঁকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল। সান-ইয়াৎ-সেন বিবাহ করেছিলেন সুবিখ্যাত সুং পরিবারে, এই মহিলা ছিলেন

কম্যুনিস্ট। মাদাম সান-ইয়াৎ-সেন ও অন্যান্য অনেক কম্যুনিস্ট রাশিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করলেন। এইরূপে যখন কম্যুনিস্ট উৎসাদন সম্পন্ন হল তখন উত্তরাভিমুখের অভিযাত্রীদের পিকিং অধিকারের পথ পরিষ্কার হল। ১৯২৮ সালে ন্যাশনালিস্ট বা জাতীয়তাবাদী সৈন্যরা সানসি প্রদেশের শাসক ইয়েন সি-সান-এর সাহায্যে পিকিং দখল করল। পিকিং ছিল তখন মাঞ্চুরিয়ার শাসক সমরনেতা চ্যাং সো-লিন এর শাসনাধীনে, চিয়াং-এর জাতীয় বাহিনী যখন পিকিং-এ উপস্থিত হল, চ্যাং সো লিন তখন শত্রুহস্তে পড়বার আশঙ্কায় পিকিং ছেড়ে রেলপথে মাঞ্চুরিয়া যাত্রা করেন। পথিমধ্যে ট্রেনের ওপর বোমা নিক্ষেপের ফলে চ্যাং-এর মৃত্যু হয়। জাপানী-অধিকৃত কোয়ানটাং এর জাপানী সৈন্যবাহিনীর কয়েকজন অফিসারের ষড়যন্ত্রে এই বোমা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবসর অল্পই। চ্যাং সো-লিন ছিলেন একজন জবরদস্ত মানুষ, সাহসী যোদ্ধা, তার অপসারণ মাঞ্চুরিয়ায় জাপানী প্রভাব বিস্তারে সাহায্য করবে, ষড়যন্ত্রকারীদের এই ছিল বিশ্বাস, কিন্তু তাদের সে আশা পূর্ণ হয় নি। চ্যাং সো-লিন-এর মৃত্যুর পর মাঞ্চুরিয়ার শাসক হলেন তাঁর পুত্র চ্যাং সিউ-লিয়াং। তিনি পিতার মত শক্তিমান পুরুষ না হলেও জাপানীদের বিরুদ্ধতাকেই তার পররাষ্ট্রনীতির মূলমন্ত্র করেছিলেন। জাপানী প্রভাব থেকে মাঞ্চুরিয়াকে মুক্ত করবার জন্য তিনি ন্যানকিং সরকারের সঙ্গে চুক্তি দ্বারা চীন ও মাঞ্চুরিয়াকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করবার চেষ্টা করেছিলেন।

চিয়াং কাই-সেকের অধিনায়কত্বে ও জাতীয় বাহিনীর উদ্যোগে চীনের একীকরণ-কায সম্পন্ন হল, ইউয়ান সি কাই-র শাসনের পর চীন দেশে এরূপ ঐক্য দেখা যায় নি। ১৯২৭ সালে চিয়াং বিবাহ করেন একটি সুং দুহিতা, মাদাম সান ইয়াৎ-সেন-এর ভগ্নী। এই বিবাহে বেশ একটু রোমান্স ছিল। প্রাচীনপন্থীদের মত চিয়াং ছিলেন বহুপত্নীক, তাঁর বিবাহের সংখ্যা ছিল তিনটি। আর মাদাম সুং মে-লিং ছিলেন পুরোপুরি আমেরিকান মহিলা, শৈশব থেকেই আমেরিকায় লালিতা, চীনের ইতিহাস ছিল তাঁর অজ্ঞাত, এমন কি তিনি চীনা ভাষায় কথাও ভাল বলতে পারতেন না। তিনি ছিলেন খৃস্টান, বিবাহের শর্ত করলেন, চিয়াং কর্তৃক পত্নী-ত্রয়ের 'ডাইভোর্স'। অনিচ্ছা সত্ত্বেও চিয়াংকে অবশেষে রাজি হতে হল, তিনি পত্নীদের ত্যাগ করে খৃষ্টীয় বিধানমতে সুং মে-লিং-এর পাণিগ্রহণ করলেন। মাদাম সুশিক্ষিতা সুচতুর,

আমেরিকার কংগ্রেসে বক্তৃতাও দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে চীনবাসীদের নাড়ীর সংযোগ কোনদিন ঘটে নি, আর তাদের ঘনিষ্ঠভাবে বুঝবার কোন চেষ্টাই তিনি করেন নি। তাই চীনের রাজনীতি-ক্ষেত্রে মাদামের এবং তাঁর আত্মীয়বর্গের আবির্ভাবের ফল বিশেষ শুভ হয় নি। মাদাম চিয়াং এর ভ্রাতা টি. ভি. সুং আমেরিকায় শিক্ষালাভ করেন, তিনি ছিলেন ন্যানকিং গভর্নমেণ্টের অর্থমন্ত্রী, মাদামের আর একটি ভগ্নী ছিলেন শ্রমমন্ত্রী এইচ. এইচ. কুং-এর পত্নী। শাসন-প্রতিষ্ঠানে সুং পরিবারের অত্যধিক প্রভাবের জন্য লোকে 'সুং বংশ' প্রতিষ্ঠার কথা বলাবলি শুরু করেছিল। কুয়োমিনটাং-এ কম্যুনিস্টদের স্থান ছিল না, তাদের সেই প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছিল। ন্যানকিং-এ জাতীয়তাবাদী সরকারের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে চীনে দীর্ঘকালব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু চীনের পরম দুর্ভাগ্য এবারও দেশের শান্তি অচিরে অন্তর্হিত হয়েছিল, তার কারণ দুইটি: জাপানের আগ্রাসী কার্যকলাপের ফলে ব্যাপক ধ্বংস, এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে গৃহযুদ্ধ। পরিণামে দেখা দিল, কম্যুনিস্টদের প্রতিষ্ঠা। পরাভূত কুয়োমিনটাং বাহিনী নিয়ে চিয়াং কাই-সেক ফরমোসা দ্বীপে প্রস্থান করলেন, এবং সেখানে প্রধানত আমেরিকার সমর্থনে একটি চীনা 'জাতীয় সরকার' প্রতিষ্ঠিত করলেন। গ্রন্থের শেষ পর্বে আমরা এই বৃত্তান্তগুলির বর্ণনা দেব।

৩ বিপ্লবোত্তর কালের নানান পরিবর্তন

ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে, বিশেষত চীন-জাপান যুদ্ধের পর রাজনৈতিক ভাগ্যবিপর্যয়ের দরুন, এমন কি বিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর কালের নানারূপ বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যেও চীনের সাংস্কৃতিক কর্মতৎপরতার অভাব ঘটে নি। বিশাল ভূখণ্ডের সর্বত্র অশান্তি কিছু একই কালে মাথা তোলে নি, এক অংশে যখন অশান্ত আলোড়নের ঢেউ উঠেছে, অন্যান্য অংশে তখন শান্তি বিরাজমান, এবং সেই শান্ত পরিবেশ সেখানকার প্রগতিমূলক কার্যের পক্ষে বিশেষ অনুকূল হয়েছিল। দর্শন-চিন্তা, সাহিত্যরচনা ও গণশিক্ষার একটি প্রকাণ্ড অন্তরায় ছিল অন্তর্দ্বন্দ্ব ও গৃহযুদ্ধ, কিন্তু তা সত্ত্বেও সাংস্কৃতিক বিষয়সমূহের চর্চা ও অনুশীলন একেবারে বন্ধ হয়ে যায় নি। প্রাক-বিপ্লবকালীন দর্শন-তত্ত্বের ধারক

ও বাহক ছিলেন ক্যাং ইউ-ওয়েই (১৮৫৮-১৯২৭), তাঁর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে আমাদের ইতিপূর্বে পরিচয় হয়েছে। প্রাচীন কনফুসীয় ধারামত শিক্ষালাভ করলেও তিনি ছিলেন একজন বিপ্লবী, সান-ইয়াৎ-সেন-এর সহকর্মী। স্মরণ থাকতে পারে, এই জননেতার উপদেশমতই সম্রাট কুয়াং স্থ তাঁর সুবিখ্যাত 'শত দিবসের সংস্কার' প্রবর্তন করেছিলেন, বিধবা সম্রাজ্ঞী জু সি কর্তৃক সেই সংস্কারেব বিলোপসাধনের পর ক্যাং ইউ-ওয়েই জাপানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ক্যাং-এর সর্বশেষ বাজনৈতিক কর্ম, বাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্যোগে চ্যাং স্থন-কে সাহায্যদান (১৯১৭)। এই প্রতিক্রিয়াশীল উদ্যম বিফল হবার সঙ্গে ক্যাং-এর রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের ওপর যবনিকা টেনে দেওয়া হয়েছিল।

ক্যাং ইউ-ওয়েই-র দর্শনতত্ত্ব : নব্যসমাজের প্রতিক্রিয়া

ক্যাং ইউ-ওয়েই নিজেকে কনফুসিয়াসের উত্তরসাধক বলেই প্রচার করতেন, তাঁর চেলাচামুণ্ডরা তাঁকে 'ঋষি' নামে অভিহিত কবেছিলেন। যে যুগে কনফুসীয় নীতিধর্মে লোকের বিশ্বাস শিথিল হয়ে এসেছিল, আব সেই নীতিসম্মত চিরাগত রাজতন্ত্রেরও অবসান যখন আসন্নপ্রায়, সে যুগেও এই বিপ্লবী মানুষটি তাঁব নিজেব মতবাদকে প্রভু কুং-এর দর্শন-তত্ত্ব বলে চালিয়ে সেই মহাপুরুষকে জনগণের ভক্তি-শ্রদ্ধার মঞ্চে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নি। নূতন পরিবেশের মধ্যে প্রভু কুং-এব জন্য একটি আসন নির্মাণ করতে গিয়ে তিনি এমন একটি অবাস্তব কল্পনার (utopia) আশ্রয় নিয়েছিলেন, কনফুসীয় নীতিশিক্ষার ত্রিসীমানার মধ্যে যার একটুখানি অস্পষ্ট ছায়াপাতও দেখা যায় না। তিনি কল্পনা করেছিলেন একটি বিশ্বসমাজের, সার্বভৌম বিশ্বরাষ্ট্র যার মূল ভিত্তি। সর্বমানবেব এই সমাজে জাতীয় রাষ্ট্রের বা জাতীয় বিভেদের স্থান নেই, বিভিন্ন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সমন্বয়ে সেখানে একটি মাত্র শান্তিময় জগৎ ('One World') গডে উঠবে। এই তত্ত্বকেই ক্যাং ইউ-ওয়েই কনফুসিয়াসের ভবিষ্যদ্বাণী বলে প্রচার করলেন, বললেন, "প্রভু কুং এমনি একটি আদর্শ বিশ্বরাষ্ট্রের কথাই বলেছিলেন।"

তখন পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও অনুশীলন প্রাচীন শিক্ষা-পদ্ধতির স্থান অধিকার করতে নিশ্চিত পদে এগিয়ে চলেছিল, নবশিক্ষিত সম্প্রদায়

'ঋষি' ক্যাং-এর নূতন বোতলে পুরনো মদ্য ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করল। বিপ্লবোত্তর কালে ক্যাং-এর রাজনীতি, যার পরাকাষ্ঠা দেখা গিয়েছিল মাঞ্চু রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্যম প্রয়াসে, সেই প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতি তাঁর পরিকল্পিত দর্শন-তত্ত্বকেও ঘৃণিত করে তুলেছিল। ক্ষুব্ধ নব্যসমাজ ধ্বনি তুলল, 'নিপাত যাক কুং অ্যাণ্ড সন্স্'। তারা বলল, কনফুসীয় নীতিধর্মই না চীনকে প্রতিক্রিয়াশীল দুর্নীতিমূলক সামন্ততান্ত্রিক সমাজের শবালিঙ্গনে বেঁধে রেখে সর্ববিধ প্রগতির পথ বন্ধ করেছে! পুরনো ঘুণে-ধরা সামাজিক রীতি-নীতি, আদব-কায়দার বাহ্যানুষ্ঠান প্রভৃতির চাপে ব্যষ্টি ও সমষ্টির চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা লুপ্ত হয়েছে, আনুগত্য ও নিয়মানুবর্তিতার দোহাই দিয়ে সামন্ততান্ত্রিক কুশাসন কায়েম রাখা হয়েছে, সমাজব্যবস্থায় যোগ্য স্থান থেকে বঞ্চিত করে নারীজাতির অমর্যাদা করা হয়েছে। অতীতের আচারনিষ্ঠ নীরন্ধ্র জীবনের নাগপাশ থেকে মুক্তিলাভের দুদমনীয় আকাঙ্ক্ষা নব্যসমাজকে একটি নূতন দিগ্‌দর্শনের সন্ধান দিয়েছিল, কিন্তু এই নূতন যাত্রাপথে দিগ্‌ভ্রমের সম্ভাবনাও ছিল যথেষ্ট। বদ্ধ দুষ্ট জলাশয়ের মত কনফুসীয় নীতিধর্ম চিরদিনই কিছু পঙ্ক-কর্দমে পরিপূর্ণ ছিল না। ট্যাং যুগের গ্রহিষ্ণু মনোবৃত্তির অবসানের পর থেকে চীনা সভ্যতা ও সংস্কৃতি এক প্রকার অপরিবর্তনীয় ফসিলে রূপান্তরিত হতে চলেছিল বটে, কিন্তু সুং ও মিং যুগেও সেই নীতিদর্শনের নব নব রূপের বিকাশ ঘটেছিল। কনফুসীয় নীতির কৃত্রিম কাঠামোটির অন্তরালে চরিত্র-গঠনের উপযোগী অনেক উপাদান হয়তো আছে, সংস্কারমুক্ত বিচারে যা ধরা পড়বার কথা, সেইসব সদ্‌গুণের দিকে নব্য চীন তখন ফিরেও চাইল না। পাশ্চাত্ত্যের উদ্ধত আধিপত্য ঝেড়ে ফেলবার জন্য যে চীন অধীর হয়ে উঠেছিল, সেই চীনই এখন পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানকে পরম শ্রদ্ধাভরে মাথায় তুলে নিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করল না। এই ব্যাপারটি বিস্ময়কর মনে হবে এই কারণে, বিপ্লবোত্তর কালে চীনাদের অগ্রগতির আগ্রহ এক পুরুষে সমাজের যে অভাবনীয় পরিবর্তন সাধন করেছিল, বৈচিত্র্যে ও গুরুত্বে সেরূপ পরিবর্তনের ধারণা করা চলে ইউরোপের চারটি যুগ-পরম্পরাকে একত্র গ্রথিত করে, রেনাসাঁ, প্রোটেস্টাণ্ট সংস্কার, ফরাসী বিপ্লব ও শিল্প-বিপ্লবই সেই বিভিন্ন পর্যায়ের যুগ-চতুষ্টয়।

কনফুসীয় সমাজ-নীতির ওপর আক্রমণ প্রাচীন কালে করা হয় নি এমন

নয়। স্মরণ করা যেতে পারে, হান ফেই ও তাঁর আইন-সেবী সম্প্রদায় চেয়েছিল সেই সনাতন ঐতিহ্যের সমূল উচ্ছেদ, এবং সেই কর্মটি অচিরে সম্পন্ন করেছিলেন চি'ন সম্রাট সি হুয়াং তি তৃতীয় খৃস্ট পূর্বাব্দে। কিন্তু সে-কালের মত নিছক ধ্বংস-প্রবৃত্তির তাড়নায় বিংশ শতকের এই উৎসাদন-পর্বের উদ্যোগ করা হয় নি, উদ্যোগ-আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য ছিল চীন দেশে পাশ্চাত্ত্য জাতিগুলির দীর্ঘকালের অন্যায় আধিপত্য নির্মূল করবার জন্য তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী-রূপে একটি শক্তিশালী নূতন সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করা। নানান প্রবন্ধ ও অন্যান্য রচনায় এই কাযে যাঁরা সহায়তা করেছিলেন, চীনা যুবকদের যাঁরা পাশ্চাত্ত্য জাতির আদর্শমত শক্তি অর্জনে উৎসাহিত করে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তাঁদের অগ্রণীদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য লিয়াং চি চাও। রচনা শুরু করেছিলেন তিনি অনেক আগেই ১৯০২ খৃস্টাব্দে, তাঁর প্রবন্ধগুলি ছিল চীনা ঐতিহ্য ও প্রাচীন বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিরোধী। মানুষ হিংসার পথ গ্রহণ করবে না, আর আততায়ীকে বাধাদান করতে তার সক্রিয় হয়ে উঠবার প্রয়োজন হবে না, চীনের এই প্রাচীন শিক্ষা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, এই ছিল তাঁর মতবাদ। 'যে সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত সে-ই টিঁকে থাকবে' (survival of the fittest) ডারউইনের এই জীবন-তত্ত্বের নীতিটি উদ্ধৃত করে তিনি প্রচার করলেন, পাশ্চাত্ত্য জাতিরা জয়ী হয়েছে বাহুশক্তির বলে, চীনারাও তাদের যুগ-যুগান্তের ক্লৈব্য ঝেড়ে ফেলুক, নবশক্তি অর্জন করে পরাক্রান্ত হয়ে উঠুক। দেখা যায়, পাশ্চাত্ত্য শক্তিপুঞ্জ দীর্ঘকাল ধরে ঔদ্ধত্যভরে চীনের ভূমিতে যে বায়ুর বীজ বপন করেছিল, সেখানে ঘূর্ণি বাতাসের অঙ্কুর তো পূর্বেই ভুঁই ফুঁড়ে উঠেছিল, এখন ধরেছে তার ফসল, বিদেশী জাতির সেই ঘূর্ণিবায়ুর ফসল কাটবার দিন আসন্ন !

শিক্ষা-সংস্কার ও সাহিত্য : 'পাই হুয়া'

জাতির জীবনে এক পুরুষ অতি অল্প কালই বলতে হয়। এই অল্প সময়-মধ্যে শুধু যে দু হাজার বছরের রাষ্ট্রীয় কাঠামোটি ভেঙে ফেলা হয়েছিল তা নয়, সামাজিক, নৈতিক, ধর্মীয় জীবনেরও আমূল সংস্কার করা হয়েছিল। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায়তনের স্থাপনা দিন দিন বেড়ে চলল, পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা দেশময় ছড়িয়ে পড়ল, সেই সঙ্গে গণ-শিক্ষার ব্যবস্থাও করা হল।

বিদ্যার্থী ছাত্ররা দলে দলে বিদেশে যেতে লাগল, অনেকেই গিয়েছিল আমেরিকা ও ফ্রান্সে। বিদেশ থেকে প্রত্যাগত ছাত্ররা নূতন ভাব ও চিন্তা-ধারা আমদানি করতে লাগল, সেইসব চিন্তা সমাজ-সংস্কারের পথ সহজ করে তুলেছিল। ইংরেজি ভাষাকেই ব্যাপকভাবে শিক্ষার বাহন করা হয়েছিল, কারণ চীনের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল প্রধানত ইংরেজের সঙ্গে, তা ছাড়া দেশে যেসব মিশনারি স্কুল ছিল, তার অধিকাংশই ইংরেজ ও আমেরিকান কর্তৃক পরিচালিত। আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈপ্লবিক পরিবর্তন হল এই যে সমগ্র চীন দেশে বিশেষ একটি কথ্যভাষার প্রচলন ও বিস্তার ঘটেছিল, এই কথ্য-ভাষার চীনা নাম 'পাই হুয়া'। আমরা পূর্বে দেখেছি, পণ্ডিতকুলের ঐতিহ্য-গত বিদ্বেষ ছিল কথ্যভাষার প্রতি, পাণ্ডিত্যপূর্ণ যাবতীয় গ্রন্থই তাঁরা 'ওয়েন লি' বা বিশুদ্ধ পণ্ডিতী ভাষায় রচনা করতেন। 'পাই হুয়া' এখন জাতীয় ভাষায় পরিণত হল, এবং তরুণ পণ্ডিতবর্গের উদ্যোগে জনসাধারণের বোধগম্য এই চলিত ভাষায় গ্রন্থ রচনা শুরু হল। চীন দেশে বিশেষত সাংঘাই-এর দক্ষিণ ভাগে বিভিন্ন কথ্যভাষার প্রচলন এতকাল জাতীয় ঐক্য ও সংহতির একটা প্রকাণ্ড অন্তরায়স্বরূপ ছিল, 'পাই হুয়া'র প্রসার সমগ্র জাতিকে ভাষাগত ঐক্যের সূত্রে আবদ্ধ করল।

বিংশ শতাব্দের দ্বিতীয় দশকের প্রারম্ভে 'পাই হুয়া' যুগোপযোগী ভাষা-রূপে সর্বত্র গৃহীত হয়েছিল। এই নব-ভাষা প্রবর্তনের উদ্যোক্তাদের নেতা ছিলেন হু সি। তিনি 'চীনা দর্শনের ইতিহাস' নামে একটি সুবৃহৎ রচনা আরম্ভ করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রন্থটি শেষ হয় নি। গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল, এবং তাই থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়েছিল যে মাধুর্য ও প্রসাদগুণে কথ্যভাষায় রচনা শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করবার যোগ্য, আর 'পাই হুয়া'য় গভীর চিন্তা ও ভাবার্থের ব্যঞ্জনা সুষ্ঠুভাবেই করা যায়। তখন হু সি-র দৃষ্টান্তের অনুসরণে কথ্যভাষায় রচিত চীনা যুবকদের বহু সাহিত্য-গ্রন্থ ছাপা হতে লাগল। অবশ্য সেগুলির অধিকাংশই ছিল বৃথা পদার্থ, কেননা সেসব ছিল স্বীকৃতি বিনা পাশ্চাত্ত্য বই-এর হুবহু নকল। এই অনুকরণ প্রবৃত্তির কারণ বোঝা শক্ত নয়, এরূপ প্রবৃত্তি আমাদের দেশেও দেখা দিয়েছিল ইংরেজি শিক্ষার প্রথম যুগে। চীনা সাহিত্যিকরা তাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের নোঙ্গর ছিঁড়ে পাশ্চাত্ত্যের দরিয়ায় ভেসে পড়েছিল, কিন্তু তাদের পরিচয়

ঘটেছিল শুধু পাশ্চাত্যের বহিবাবরণের সঙ্গে, অন্তঃস্রোতটি ছিল অপরিজ্ঞাত। তাই কিছুকাল চলেছিল পাশ্চাত্য তরঙ্গের কৃত্রিমতার মধ্যে চীনা সাহিত্যের হাবুডুবু খাওয়া, কিন্তু অচিরেই সাহিত্য আবার স্ব-প্রতিষ্ঠ হয়ে আপন জন, আপন সমাজকে কেন্দ্র করে বিচিত্র মাধুর্যে ফুটে উঠল। সাহিত্যের এই পুনর্জন্মেব পৌরোহিত্যে একজন বিশিষ্ট অগ্রণী ছিলেন চৌ স্থ-জেন, যিনি নিজেকে 'লু স্থন' বলে অভিহিত করতেন। তিনি যে পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রতি বিমুখ ছিলেন তা নয়, বরঞ্চ অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকেই, তিনি শুধু অনুকরণ এড়িয়ে গিয়ে উদ্বেলিত উচ্ছ্বাসের অভিনব তুলি দিয়ে সত্যকার সমাজ চিত্রিত করতে চেষ্টা করেছিলেন। সাধারণ দৈনন্দিন জীবন নিয়ে গল্প-উপন্যাস রচনা করেছিলেন তিনি। আরও কয়েক-জন নূতন লেখক তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন দুজন নারী, নাম তিং লিং ও পিং সিন। এ-কালের বইগুলি, এমন কি উপন্যাসও ছিল অত্যন্ত ছোট। বোধ কবি নূতন ভাবের আবেগ যেমন দেখা দিত, লেখক আর কালবিলম্ব না করে অমনি তাই নিয়ে বই লিখতে বসতেন, বিশেষ পরিকল্পনামত দীর্ঘ রচনার অবসর পেতেন না।

এই সাহিত্য-বিপ্লবে সংবাদপত্র একটি বিশেষ স্থান অধিকার কবেছিল। পূর্বে 'চাইনিজ ইম্পিরিয়াল গেজেট' নামে একটি সংবাদপত্র ছিল, তাতে শুধু সম্রাটের দরবারী খবর মাত্র প্রকাশ করা হত। তা ছাড়া ছিল, 'প্রাচীর সংবাদপত্র' ('wall newspapers'), দৈনন্দিন সংবাদ লিপিবদ্ধ করেই এই পত্রগুলিকে নগরের ফটকের কাছে সেঁটে দেওয়া হত। এখন প্রত্যেক শহরে পাশ্চাত্য ধরনে ছাপানো সংবাদপত্রের আবির্ভাব হল, এবং সেগুলি কথ্য ভাষায় লেখা বলে লিখিত বিষয় সহজেই বোঝা যেত। পঠনক্ষম ব্যক্তিরা সংবাদপত্র পড়ে নিবক্ষরদের কাছে খবর বলত। এইরূপে লিখনপঠন যা পূর্বে ছিল ব্যক্তিবিশেষের বিলাস, এখন তা জনপ্রিয় হয়ে উঠল, এবং সেজন্য অনেকখানি কৃতিত্ব সংবাদপত্রের প্রাপ্য।

'নূতন জোয়ার'

'পাই হুয়া' বা জাতীয় ভাষা প্রবর্তনের সঙ্গে চিন্তা-জগতেও 'নূতন জোয়ার' ("New Tide") অর্থাৎ রেনাসাঁর যুগ উপস্থিত হয়েছিল। চীনা মন তখন

সনাতনী কনফুসীয় চিন্তার বাঁধা-ধরা রীতিনীতির হাত থেকে অব্যাহতি পেয়ে নানান দিকে বিভিন্ন প্রণালী ধরে ধেয়ে ছুটেছিল, কতগুলি চীনের প্রাচীন প্রণালী, কতগুলি বা প্রতীচী থেকে গৃহীত সম্পূর্ণ নূতন উদ্ভাবন। প্রাচীন দর্শন-তত্ত্বগুলির পুনরুদ্ধার করা হল। মো-তি-র দর্শন বহুকাল ছিল অবজ্ঞার বস্তু, এখন সেই দর্শন পাঠের আগ্রহ জেগে উঠল। আবার পাশ্চাত্ত্য দর্শন-চিন্তাব সমর্থকেরও অভাব ছিল না। ধর্মক্ষেত্রে শুধু কনফুসীয় নীতিতত্ত্বের নয়, তাও ও বৌদ্ধধর্মেরও অধোগতি ঘটেছিল, যদিও স্থানে স্থানে বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণের লক্ষণ দেখা যায় নি এমন নয়। চীনা খৃস্টানদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধিলাভ করে ১৯২৪ সালে ত্রিশ লক্ষে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সামাজিক প্রথা ও নৈতিক আচরণ বিষয়ে নবজাগ্রত চীনের দৃষ্টিভঙ্গির প্রভূত পরিবর্তন হয়েছিল। নব-নারীর মধ্যে চিবকালের ব্যবধান ঘুচে গিয়ে বালক-বালিকা ও যুবক-যুবতীর পরস্পব মেলা-মেশা ও যৌথ শিক্ষালাভের পথ মুক্ত হল। বিবাহ ব্যাপারেও তরুণ-তরুণীরা নির্বাচনেব ভাব পিতা-মাতার ওপর ছেড়ে না দিয়ে স্বাধীনভাবে নিজেরাই সেই দায়িত্ব গ্রহণ কববার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে উঠল। এইরূপে পিতার প্রভাব নষ্ট হবার ফলে যৌথ পরিবারে ভাঙন ধরল, অনেক প্রাচীন সামাজিক আদব-কায়দা লোপ পেল। বিপ্লবের প্রারম্ভেই চুলের বেণী রাখা বন্ধ হয়েছিল।

নূতন রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা

ন্যানকিং-এ কুয়োমিনটাং-এব শাসনকালে নানান বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে চীন দেশের ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বটে, কিন্তু এই সংহতি কুয়োমিনটাং-বিরোধী প্রতিদ্বন্দ্বী দলের প্রচণ্ড আঘাত কাটিয়ে উঠতে পারে নি, আমরা তা শীঘ্রই দেখতে পাব। চিয়াং কাই-সেক ছিলেন প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তি, সান-ইয়াৎ-সেন-এর আদর্শ অনুসাবে কর্মসূচি প্রস্তুত করেছিলেন। কিন্তু চীনের প্রাচীন ঐতিহ্বেব ধারামত নূতন রাজবংশ প্রতিষ্ঠার পূর্বকালীন বিশৃঙ্খলার সময়ে অতীতে যেমন বিপ্লবান্তেও তেমনি সমরকর্তাদের অভ্যুত্থান ঘটেছিল, আমরা তা ইতিপূর্বে বলেছি। ইউয়ান সি কাই-র মৃত্যুর পর তারা স্বাধীন হয়ে পড়েছিল। এই সমরকর্তাদের অধিকাংশই ছিল অশিক্ষিত

গোঁয়ার প্রকৃতির মানুষ, লড়াই যেমন পছন্দ করত তেমনি ছিল ভোগাসক্ত, আফিং খেয়ে ঝিমোত আর গণিকা নিয়ে রসরঙ্গে মত্ত থাকত। কিন্তু তাদের সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাধি ছিল অর্থাভাব, প্রজা-শোষণ সত্ত্বেও সে অভাব তাদের দূর হত না, তখন তারা দেশের ছোট ছোট অংশ জাপানকে বিক্রি করতে বা ইজারা দিতে কিছুমাত্র ইতস্তত কবত না। এইরূপে যখন তারা দেশের বৃহৎ স্বার্থহানি ব্যাপারে রত ছিল, তখনও চিয়াং কাই-সেক তাদের উচ্ছেদ সাধনের কোন চেষ্টা করেন নি। সমর-কর্তারা কুয়োমিনটাং-এর আনুগত্য মুখে স্বীকার করলেও তারা ছিল স্ব স্ব প্রধান, নিজেদের এলাকার মধ্যে সর্বেসর্বা, সাময়িকভাবে চিয়াং-এর সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল মাত্র। কিন্তু চিয়াং এই অবস্থাকে সান-ইয়াৎ-সেন-এর কর্মসূচির প্রথম পর্যায়, অর্থাৎ সামরিক শাসন বলেই গ্রহণ কবেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্ধারিত পার্টির নেতৃত্বাধীনে শাসন পরিচালনাব কাল আগতপ্রায়, তাই স্বায়ত্তশাসন ব্যাপাবে জন-সাধারণকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে সারা দেশ জুড়ে কুয়োমিনটাং প্রতিষ্ঠান প্রসারিত করা হল। অধিকাংশ স্থানীয় শাসন-কেন্দ্রে 'ট্যাং পু' নামক পার্টি-সদস্যদের একটি 'কার্যনির্বাহক সমিতি' (Executive Committee) গঠিত হল। সর্বোপরি প্রতিষ্ঠিত হল 'জাতীয় কংগ্রেস' (National Congress)। এই জনসভার অধিবেশন হত কদাচিৎ, 'কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক পরিষদ' (Central Executive Committee) জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধিরূপে শাসন পরিচালনা করত। প্রশাসনের এই কাঠামোটির মধ্যে সোভিয়েত রাশিয়ার একদলীয় শাসন-পদ্ধতির ছাপ স্পষ্টই দেখা যায়। প্রশাসনের মূল বিভাগ ছিল পাঁচটি, এই বিভাগগুলিকে বলা হত 'ইউয়ান'। যেমন 'কার্যনির্বাহক ইউয়ান' (Executive Yuan), 'আইন প্রণয়ন ইউয়ান' (Legislative Yuan), 'বিচার ইউয়ান' (Judicial Yuan), 'পরীক্ষা ইউয়ান' (Examining Yuan), 'নিয়ন্ত্রণ ইউয়ান' (Control Yuan)। এই পাঁচটি ইউয়ানের কার্যাবলী সুসম্বদ্ধভাবে সুষ্ঠু পরিচালনার ভার ছিল একজন প্রেসিডেণ্ট ও একটি রাষ্ট্র-সংসদের (Council of State) ওপর। রাষ্ট্র-সংসদে বারো থেকে ষোল জন সদস্য ছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন ছিল প্রাদেশিক প্রশাসন, সকল প্রশাসনকে একত্র করে সরকারী

নাম দেওয়া হয়েছিল 'চীনের সাধারণতন্ত্রের জাতীয় সরকার' (National Government of the Republic of China)। সান-ইয়াৎ-সেন-এর অভিপ্রায় অনুসারে রাষ্ট্রের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ন্যানকিং নগরে। এই শহরটি ছিল চীনা অর্থনীতির স্নায়ুকেন্দ্রস্বরূপ, শিল্প-বাণিজ্যের স্থানগুলি ন্যানকিং-এর নিকটেই অবস্থিত। তা ছাড়া আরও একটি কারণে পিকিং থেকে রাজধানী অপসারণ বাঞ্ছনীয় মনে হয়েছিল, সে কারণ হল এই যে পিকিং-এ পাশ্চাত্ত্য শক্তিপুঞ্জের দূতাবাসগুলিকে দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করা হয়েছিল। পিকিং-এর নাম পরিবর্তন করে নূতন নাম দেওয়া হয়েছিল 'পেইপিং' অর্থাৎ 'উত্তরাঞ্চলের শান্তি-নগর' ('Northern Peace')।

চীনের ওপর বিদেশীদের চাপ লঘু হয়েছিল বটে, কিন্তু দেশের প্রকৃত মুক্তি তখনো আসে নি। বৃহৎ শক্তিপুঞ্জের 'এক্‌স্‌ট্রাটেরিটোরিয়ালিটি'র সুবিধাগুলি পূর্ববৎ বহাল ছিল, সাংঘাই বন্দর ছিল আন্তর্জাতিক অর্থনীতির কেন্দ্রস্বরূপ। কামানবাহী বিদেশী জাহাজ ইয়াংসি ও অন্যান্য নদী দিয়ে অবাধে যাতায়াত করত। চীনা জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি হলেও, উপকূলের বাণিজ্য-জাহাজগুলির অধিকাংশের মালিক ছিল বিদেশী কোম্পানী, জাহাজ পরিচালনাও তারাই করত। দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ায় জাপান তার স্বার্থ কায়েম করবার চেষ্টায় ইজারা-লব্ধ ভূমি, রেলপথ, খনি, কলকারখানা কিছুই পরিত্যাগ করে নি। উত্তর মাঞ্চুরিয়ায় উদার নীতির অনুসরণের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও রুশরা 'চীনা পূর্ব রেলপথে'র কর্তৃত্ব তখনো ছাড়ে নি। এইসব বিদেশী প্রভাবের দরুন চীনের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হয়েছিল বটে, কিন্তু দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির পথ বন্ধ হয় নি। নূতন রেলপথ নির্মিত হল, মোটর গাড়ির প্রচলন ও সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পরিবহণ-ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হল। এরোপ্লেনে যাতায়াতের জন্য 'এয়ার লাইন' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কলকারখানার সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে গেল, আর সেই সঙ্গে হল যান্ত্রিক শিল্পের প্রতিষ্ঠা। অনেক কাপড়ের কল স্থাপিত হয়েছিল, ফলে বিদেশী সুতার আমদানি অনেকখানি হ্রাস পেল। কেরোসিন তৈল অধিক পরিমাণে আমদানি হতে লাগল, অন্যান্য আমদানির পণ্য-মধ্যে ছিল তামাক, ধাতুনির্মিত জিনিসপত্র ও যন্ত্রপাতি। আফিং-এর প্রকাশ্য আমদানি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু

বেআইনীভাবে আমদানি বিলক্ষণ চলেছিল, বিশেষত মরফাইন ও হিরোইন নামে আফিং-জাতীয় দ্রব্যের। কলের জন্য কাঁচা তুলা আর আহারের জন্য খাদ্যবস্তু আমদানি করা হত। চীন কৃষিপ্রধান দেশ, কিন্তু উৎপন্ন ফসল ক্রমবর্ধমান বিপুল জনসংখ্যার জীবনধারণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না, তাই বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানির প্রয়োজন ছিল। চা ও রেশম এখনো রপ্তানি হত, কিন্তু এই দুটি সামগ্রী এক শতাব্দ পূর্বের প্রাধান্য হারিয়েছিল। অন্যান্য রপ্তানির পণ্য ছিল ভেষজ তেল, বিন বা কড়াইদানার পিষ্টক (bean cakes), চুল, ফার, অ্যানটিমনি, তুলাজাত দ্রব্যাদি ও সুতা।

একাদশ পর্ব

১৯২৮ থেকে তিন দশক

১. কুয়োমিনটাং ও কম্যুনিজম্‌

১৯২৮ সালে পিকিং অধিকারের পূর্বেই কুয়োমিনটাং-এর বৈপ্লবিক আদর্শের একটি বিশেষ পরিবর্তন ঘটেছিল। কুয়োমিনটাং বাহিনী যখন উত্তরাভিমুখে অভিযান শুরু করে, কম্যুনিস্টরা তখনো পরাক্রান্ত হয়ে ওঠে নি। তারা কুয়োমিনটাং-এর সঙ্গে সহযোগিতা করত, আর কুয়োমিনটাং-ও রুশ উপদেষ্টাদের পরামর্শ গ্রহণে ইতস্তত করত না। সে সময়ে কুয়োমিনটাং-এর প্রয়োজন ছিল কম্যুনিস্ট সহযোগিতার, কারণ কুয়োমিনটাং দল গঠিত হয়েছিল বুর্জোয়া ও শিক্ষিত সম্প্রদায় নিয়ে, কিন্তু চাষী ও শ্রমিকদের ওপর এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের তেমন প্রভাব ছিল না যেমন ছিল কম্যুনিস্টদের। কুয়োমিনটাং ও কম্যুনিস্টদের মধ্যে মূল প্রভেদ ছিল আদর্শগত, এই প্রভেদ সত্ত্বেও দুই পক্ষের একযোগে কাজ করা সম্ভব হয়েছিল, তার কারণ উভয় দলেরই লক্ষ্য ছিল সমরকর্তাদের নির্মূল করে দেশের ঐক্যবিধান। পিকিং অধিকারের সঙ্গে দেশের উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চল যখন একই রাষ্ট্রে পরিণত হল তখন উভয় দলের মধ্যকার সাময়িক যোগসূত্রটিও নিতান্ত অনিবার্যভাবে ছিন্ন হয়ে গেল, এবং এক পক্ষ অন্য পক্ষের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হল। কুয়োমিনটাং-এর চরম লক্ষ্য ছিল প্রাথমিক একদলীয় শাসনের অবসানে আমেরিকার ধাঁচে পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা, আর কম্যুনিস্টরা রুশের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চীনের রাষ্ট্রকে সাম্যবাদী সমাজতন্ত্রের আদর্শে রূপায়িত করতে চেয়েছিল। জাতীয়তাবাদী কুয়োমিনটাং ছিল রুশ আন্তর্জাতিকতার বিরোধী, আর সেই আন্তর্জাতিকতাই কম্যুনিস্টদের কর্মোদ্যমের বিশেষ প্রেরণা যুগিয়ে এসেছে।* ১৯২১ সালে চীনের নবগঠিত কম্যুনিস্টপার্টির

* আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী সমাজের (International Communism) সংপ্রতিষ্ঠা সে সময়কার রুশ কম্যুনিস্টদের ছিল একটি প্রধান লক্ষ্য। মার্কস-তন্ত্রমত এই লক্ষ্যের নির্দেশ দিয়েছিলেন লেনিন। আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আদর্শকে রূপায়ণের জন্য পথ-প্রদর্শনের ভার ছিল মস্কোর 'কোমিনটার্ন' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের ওপর। সকল দেশের কম্যুনিস্টদের জিগির ছিল,

প্রথম সভাপতি হয়েছিলেন চে'ন তু সিউ, তিনি ১৯২২ সালে মস্কোতে কোমিনটার্নের (Comintern) চতুর্থ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। ১৯২৭ সালে চে'ন-কে অপসারিত করে পার্টির সভাপতি হয়েছিলেন লি লি-সান। তিনি প্যারিসে শিক্ষালাভ করেন, সম্ভবত সেখানেই আন্তর্জাতিক কম্যুনিজমে দীক্ষিত হয়েছিলেন। লি লি-সান মধ্যচীনে হ্যানিয়াং লৌহ-কারখানায় একটি কম্যুনিস্ট শ্রমিকসংঘ গঠন করেছিলেন। পরবর্তী কালে মাও সি তুং-এর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁর পতন ঘটে।

মাও সি তুং

কম্যুনিস্টদের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের অন্যতম মাও সি তুং, তিনিই হয়েছিলেন চীনের 'গণ-সরকারে'র (People's Government of China) প্রেসিডেন্ট। ১৮৯৩ সালে হুনান প্রদেশে একটি সমৃদ্ধ কৃষককুলে তাঁর জন্ম। প্রথম অবস্থায় তাঁর শিক্ষা প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে চলেছিল বটে, কিন্তু পরে তিনি আধুনিক শিক্ষায়তনসমূহে বিদ্যালাভ করে চাংসার একটি কলেজ থেকে স্নাতক হয়ে বেরিয়েছিলেন (১৯১৬)। তারপর তিনি পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সহকারী লাইব্রেরীয়ান-রূপে নিযুক্ত হন। ১৯১৯ সালে হুনান-এ ফিরে এসে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন এবং শ্রমিক সংগঠনে মন দেন। তিনি ছিলেন তখন সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী একজন উদারনৈতিক সংস্কারক, গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী আদর্শবাদী পুরুষ। ১৯২০ সালে পিকিং-এ প্রত্যাবর্তনের পর তিনি কম্যুনিস্ট সাহিত্য অধ্যয়ন করে মার্কস্‌বাদী হয়ে উঠেছিলেন, এবং সেই থেকে কম্যুনিস্ট দলে তাঁর প্রতিপত্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগল। কম্যুনিস্ট নেতা লি লি-সানের সঙ্গে তাঁর মতান্তর ঘটেছিল, এবং সেই মতবাদের দ্বন্দ্বে পরিণামে মাও সি তুং-ই জয়লাভ করেছিলেন। লি লি-সান ছিলেন রুশ কম্যুনিজমের হুবহু অনুকরণের

'বিশ্বের শ্রমিকগণ ঐক্যবদ্ধ হও' (' Workers of the world, unite")। শ্রমিকদের এই ঐক্যবিধান এবং মার্কস-বর্ণিত উপায়ে শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের উচ্ছেদ-সাধনের জন্য কোমিনটার্নের নির্দেশ মেনে চলাই ছিল প্রতিটি দেশের কম্যুনিস্টদের পবিত্র কর্তব্য। অবশ্য কোমিনটার্নে সম্ভবমত সকল দেশের কম্যুনিস্ট প্রতিনিধিদের উপস্থিত থাকতে বাধা ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর কোমিনটার্ন প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব লোপ পেয়েছিল।

পক্ষপাতী নিষ্ঠাবান মার্কস্‌পন্থী, তাঁর মতে দেশে কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় রেল-কর্মী, শহুরে শ্রমিক ও আধুনিক কলকারখানার মজুরদের নিয়ে সংঘ গঠন। মাও সি তুং কিন্তু আধুনিক শিল্পে অনগ্রসর কৃষিপ্রধান চীন দেশের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখেই কম্যুনিজমের মামুলি পদ্ধতি অনুসরণের পরিবর্তে কৃষক সংগঠন ও জমিদার উৎসাদন-কার্যকেই অবস্থার অনুরূপ ব্যবস্থা বলে মনে করতেন। দীর্ঘকাল ধরে জমিদার, মহাজন ও ফড়িয়াদের শোষণে চীনের চাষীরা জর্জরিত হয়ে উঠেছিল, চিরদিন তারা তাদের শত্রু বলেই মনে করত, তাই তাদের বিরুদ্ধে মাও সি তুং-এর আন্দোলন কৃষক-প্রজাদের যথেষ্ট সমর্থন লাভ করেছিল। ১৯২৬ ও ১৯২৮ সালে মাও সি তুং তাঁর বাসভূমি হুনান প্রদেশে নিজের পরিকল্পনামত কাজ শুরু করলেন কম্যুনিস্ট পার্টির মতের বিরুদ্ধে, অর্থাৎ বড় জমিদারদের দখলি জমি বাজেয়াপ্ত করলেন আর সেই জমি ভূমিশূন্য চাষীদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। তার এই কার্যে সহায় হয়েছিল একজন শক্তিশালী সমর-কুশলী ব্যক্তি, তাঁর নাম চু তে।

চু তে

জেচুয়ান প্রদেশের একটি সমৃদ্ধ ভদ্র গৃহস্থ পরিবারের লোক চু তে, তিনিও প্রাচীন পদ্ধতিমতই শিক্ষালাভ করেছিলেন। পরে তিনি আধুনিক সামরিক বিদ্যা শিক্ষা করে সাধারণতন্ত্রের একটি সৈন্যবাহিনী পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। ইয়াং সি-কাই যখন নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন, চু তে তখন তাকে পদচ্যুত করবার জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ১৯২৩ সালে তিনি কুয়োমিনটাং এ যোগদান করেন, পরে শিক্ষার্থে বার্লিন গিয়ে ১৯২৫ সালে কম্যুনিস্ট দলের সদস্য হন। চীনে প্রত্যাগমনের পর ১৯২৭-২৮ সালে কোয়ানটাং, হুনান ও কোয়াংসি প্রদেশে কম্যুনিস্টবাহিনী গঠনে ব্রতী হয়েছিলেন। এদিকে চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির একটি অধিবেশন হয় মস্কো নগরে, সেখানে মাও সি তুং প্রবর্তিত প্রজা আন্দোলন ও জমিদারি বাজেয়াপ্তির ব্যবস্থা অনুমোদিত হলেও শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলির শ্রমিকদের নেতৃত্বকেই কার্যক্রমে প্রধান স্থান দেওয়া হয়েছিল। মস্কো থেকে ফিরে এসে লি লি-সান পার্টির সেই কার্যক্রমটি অনুসরণ করবার চেষ্টা করেন, এবং এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেন চৌ এন-লাই। ১৯৩০

সালে চু তে-পরিচালিত কম্যুনিস্ট বাহিনীর অল্প কিছুদিনের জন্য হুনানের প্রধান নগর চাংসা অধিকার সত্ত্বেও শিল্প-শ্রমিকদের ঐকান্তিক নিষ্ঠার অভাবে লি লি-সানের কার্যক্রম ব্যর্থ হয়েছিল।

এদিকে চাংসা, ক্যানটন ও আময় আক্রমণে চু তে-র সৈন্যবাহিনী সমর-কর্তাদের কাছে ভীষণভাবে পরাজিত হয়। বিপর্যস্ত সেনাদল পর্বতাঞ্চলে আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছিল। এই সময় চিংকাংসান নামক স্থানে বিধ্বস্ত বাহিনীর নায়ক চু তে মিলিত হন মাও সি তুং-এর সঙ্গে, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উভয়ের এই মিলন। কারণ তাঁদের মিলিত উদ্যমে কম্যুনিস্ট পার্টি নূতনভাবে গড়ে উঠল রুশের পরামর্শ ও সাহায্য ব্যতিরেকে, আর সেই পার্টি শিল্পে অনুন্নত চীনের অল্পসংখ্যক শহুরে শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করবার কার্যে সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ না করে বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলের অগণিত কৃষক প্রজা সংগঠনে ব্রতী হল। চু তে-র একটি কথা কম্যুনিস্টদের শাস্ত্র-বাক্যের মত শোনায়। তিনি বলেছেন, "প্রজারা সমুদ্র আর আমরা মাছ। আমরা বেঁচে থাকব, যতদিন সেই সমুদ্রে সাঁতার কাটতে পারব।"

চৌ এন-লাই

চৌ এন-লাই এখন কম্যুনিস্ট চীনের প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। পুরনো আমলের একজন রাজকর্মচারীর পুত্র তিনি, কনফুসীয় ঐতিহ্যই তাঁর শিক্ষার ভিত্তি, কিন্তু তিনি ফ্রান্স, ইংলণ্ড ও জার্মানিতে গিয়ে আধুনিক বিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন। ১৯২১ সালে প্যারিসে তিনি চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির একটি শাখা স্থাপন করেন। ১৯২৪ সালে 'হোয়ামপোয়া সামরিক বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হল, সেই বিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট ও রাজনৈতিক বিভাগের কর্তা হয়েছিলেন যথাক্রমে চিয়াং কাই-সেক ও চৌ এন-লাই। ছাত্রদের বৈপ্লবিক ভাবাপন্ন করে তোলাই ছিল চৌ এন-লাই-র বিভাগীয় কাজ। তাঁর পত্নী ছিলেন একজন কম্যুনিস্ট, নিষ্ঠাবতী বিপ্লবী মহিলাদের অন্যতম। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, ১৯২৬ সালে যখন চিয়াং কাই-সেকের বাহিনী উত্তরাভিমুখে অভিযান শুরু করেছিল, তখন তার পিছনে ছিল কোমিনটার্ন ও বোরোডিনের সমর্থন, সমরোপকরণ সরবরাহ করেছিল রাশিয়া ব্লাডিভস্টক থেকে, কিন্তু দুই বছরের মধ্যে কুয়োমিনটাং ও কম্যুনিস্টদের গাঁটছড়ার

সাময়িক বন্ধন ছিঁড়ে গেল, সেই সঙ্গে বোরোডিন প্রভৃতি রুশ কম্যুনিস্টরা চীন থেকে বহিষ্কৃত হল। ১৯২৮ খৃস্টাব্দে মস্কোতে চীনা কম্যুনিস্ট পার্টির ষষ্ঠ অধিবেশনের পর লি লি-সান ও চৌ এন-লাই দলের মুখ্য স্থান অধিকার করলেন এবং তার অব্যবহিত পরেই চে'ন তু সিউ-কে সভাপতির পদ থেকে অপসৃত করা হল। পূর্বে বলা হয়েছে, চে'ন তু সিউ-ই হয়েছিলেন পার্টির প্রথম সভাপতি। চৌ এন-লাই র সাহায্যে লি লি-সান তাঁর শিল্প-শ্রমিক সংগঠন পরিকল্পনা কার্যকরী করবার চেষ্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু সে উদ্যম ব্যর্থ হয়েছিল।

'নবজীবন আন্দোলন'

কুয়োমিনটাং-এর সঙ্গে সংঘর্ষে কম্যুনিস্টদের পরাজয় ঘটলেও কম্যুনিজম ধ্বংস পায় নি, কিংবা তার প্রসারের সম্ভাবনাও লুপ্ত হয় নি। কুয়োমিনটাং সরকার জমিদারি প্রথার প্রাচীন দুর্নীতির উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টা মাত্র করে নি, প্রজাদের ওপর ট্যাক্সের পরিমাণও উত্তরোত্তর বৃদ্ধির পথে চলেছিল। এদিকে চিয়াং কাই-সেক তখন জার্মানির উদীয়মান সূর্য হিটলারের আদর্শে ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচারী নীতির অনুসরণ করছিলেন, নিষ্করুণ নির্যাতন, হত্যা শুরু হয়েছিল কম্যুনিজমকে নির্মূল করবার জন্য, কিন্তু করভার-পীড়িত কৃষক ও প্রজা-সাধারণের মধ্যে গভীর অসন্তোষ জেগে উঠেছিল, এবং এই অবস্থাটি ছিল কম্যুনিজমের অভ্যুত্থানের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। এখন 'গণতন্ত্র' 'জনগণের অধিকার' প্রভৃতি উচ্চকণ্ঠের জিগির আর বৈপ্লবিক চিন্তাধারা থেকে অশান্ত জনগণের দৃষ্টি অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেবার প্রয়োজন হয়েছিল। এই উদ্দেশ্য নিয়েই ১৯৩৪ সালে চিয়াং কাই-সেক তাঁর 'নবজীবন আন্দোলন' ("New Life Movement") আরম্ভ করেন। কনফুসীয় নীতিধর্ম তখন পতনোন্মুখ, সেই নীতিধর্মকে পুনরুদ্ধার করে নৈতিক জীবনের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই ছিল আন্দোলনের উদ্দেশ্য। জনকল্যাণ, পরিচ্ছন্নতা, সম্মানের মর্যাদাবোধ, সৌজন্য ও মন্দের প্রতি ঘৃণা, চীনা সমাজনীতির এইসব অধুনালুপ্ত গুণরাশি জাতীয় চরিত্রে আবার বিকশিত হবে নব আন্দোলনের ফলশ্রুতিরূপে, এই ছিল চিয়াং-এর আন্তরিক বাসনা, কিন্তু তাঁর সে আশা ফলবতী হয় নি। আন্দোলনটি জনসমাজে শিকড়

গাড়তে পারে নি। এখানে-সেখানে বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রের চর্চা শুরু হয়েছিল বটে, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম তখন মৃতকল্প, তাওধর্মের অধোগতি দেখা গিয়েছিল আরও সুস্পষ্ট। রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্ট, খৃস্টধর্মের উভয় শাখার বিস্তার সত্ত্বেও জনগণের ওপর প্রভাব ছিল সামান্যই, সমগ্র দেশের জন-সংখ্যার অনুপাতে খৃস্টানদের সংখ্যা ছিল শতকরা মাত্র একজন। দেশের এই সাংস্কৃতিক দুর্গতি সত্ত্বেও হয়তো বা 'নবজীবন আন্দোলনে'র গতি অব্যাহতই থাকতে পারত, কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃতির নৈতিক পুনর্গঠনের প্রধান প্রতিবন্ধক ছিল শুধু কম্যুনিজম নয়, জাপানের দুর্দমনীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষা চীনের একটি জীবনমরণ সমস্যা হয়ে উঠেছিল। চিয়াং কাই-সেক আপাতত কম্যুনিজমকে দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন বটে, কিন্তু জাপানের চীনে অনুপ্রবেশ এবং পরিশেষে দস্তুরমত আক্রমণ (১৯৩৭) জাতীয়তাবাদী কুয়োমিনটাং সরকারের সবখানি শক্তি এমনি নিঃশেষ করে দিয়েছিল যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে পরাজিত জাপান যখন চীন ত্যাগ করতে বাধ্য হল (১৯৪৫), কুয়োমিনটাং বাহিনীর তখন এমন শক্তি ছিল না যে গৃহযুদ্ধে কম্যুনিস্টদের পরাজিত করে দেশের শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। পরিণামে গৃহযুদ্ধে কম্যুনিস্টরাই জয়লাভ করল, তখন অবশিষ্ট জাতীয় বাহিনী সহ চিয়াং কাই-সেক চীনের মূল ভূখণ্ড ছেড়ে ফরমোসা দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করলেন (১৯৪৯)।

'দীর্ঘ পদযাত্রা' ('Long March')

জাপানীরা চীন আক্রমণ করেছিল ১৯৩৭ সালে, কিন্তু তার আগে একটি স্মরণীয় ব্যাপার ঘটেছিল, কম্যুনিস্টদের পশ্চাদপসরণই সেই ঘটনা। মাও সি তুং-এর নেতৃত্বাধীনে কম্যুনিস্টরা কিয়াংসি প্রদেশে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল, কিন্তু কুয়োমিনটাং বাহিনীর ক্রমাগত আক্রমণের জন্য ১৯৩৪ সালে তারা কিয়াংসি ছেড়ে ছয় হাজার মাইল দূরবর্তী পীত নদীর বাঁকে অবস্থিত সেনসি প্রদেশে সরে আসতে বাধ্য হয়। কম্যুনিস্টদের ছয় হাজার মাইলের ওই 'দীর্ঘ পদযাত্রা' ইতিহাসের একটি বিস্ময়কর কাহিনী। অনেক পাহাড় পর্বত জলপ্রপাত অতিক্রম করে উপত্যকা অধিত্যকা অরণ্যানীর মধ্য দিয়ে চলেছিল কম্যুনিস্টরা জাতীয় বাহিনীর আক্রমণ এড়াবার জন্য, বহু সহস্র

কম্যুনিস্ট পথের ধারে ভূমিশয্যায় প্রাণ ত্যাগ করেছিল। লক্ষ লক্ষ লোকের পদযাত্রা, বিশ সহস্রেরও অল্পসংখ্যক অভিযাত্রী জীবন নিয়ে গন্তব্য স্থানে পৌছতে পেরেছিল। কিন্তু এই নিদারুণ পরিশ্রম, কায়িক ক্লেশ কম্যুনিস্ট দলকে শিখিয়েছিল নিয়মানুবর্তিতা, ধৈর্য ও কষ্টসহিষ্ণুতা, এবং এইসব গুণগ্রামই হয়েছিল তাদের পরম সহায়, যা দিয়ে তারা পরবর্তী কালে কুয়োমিনটাং শক্তির উৎসাদনে সমর্থ হয়েছিল।

২. জাপানের সঙ্গে সংগ্রাম

১৯০৫ সালে পোর্টসমাউথ সন্ধির শর্ত অনুসারে লিয়াং তুং উপদ্বীপের পোর্ট আর্থার ও ডায়রেনে এবং দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ার রেলপথসমূহে রাশিয়ার ইজারা স্বত্ব জাপানকে অর্পণ করা হয়েছিল, সে কথা আমরা পূর্বে বলেছি। তা ছাড়া সেখানে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অনেক সুবিধাও জাপানের করায়ত্ত হয়েছিল। মাঞ্চুরিয়া বিশাল দেশ, প্রভূত বনজ ও খনিজ প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ দেশটির ওপর জাপানের লুব্ধ দৃষ্টি পড়েছিল। এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের আইনসংগত মালিক ছিল চীন, কিন্তু ১৯১১ সালের বিপ্লবের পর থেকে মাঞ্চুরিয়ায় শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে চীনের কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের কোন হাতই ছিল না। ১৯১৫ সালে 'একুশ দফা দাবি'র বলে জাপান পোর্ট আর্থার ও ডায়রেন এবং মাঞ্চুরিয়ার রেলপথসমূহের ইজারা-স্বত্বের মেয়াদ পঁচিশ বছরের স্থলে নিরানব্বুই বছরে বর্ধিত করতে চীনকে বাধ্য করেছিল। এইরূপে জাপান মাঞ্চুরিয়ার নিম্নভাগে প্রভুত্ব কায়েম করবার সুবর্ণ সুযোগ লাভ করেছিল।

মাঞ্চুরিয়ার শাসক ছিলেন চ্যাং সো লিন। তাঁর পিকিং অভিযান এবং পরবর্তী ঘটনাবলী, পরিশেষে চীনা জাতীয় বাহিনীর আক্রমণের ফলে চ্যাং-এর পিকিং ত্যাগ এবং মাঞ্চুরিয়ার রেলপথে বোমা বিস্ফোরণে চ্যাং-এর মৃত্যু, এসব বৃত্তান্ত পূর্বের একটি অধ্যায়ে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। চ্যাং-এর হত্যাকাণ্ডের মূলে ছিল জাপানী ষড়যন্ত্র। জাপানীরা মনে করেছিল চ্যাং-এর অপসারণ মাঞ্চুরিয়ায় জাপানী প্রভাব বর্ধিত করতে সাহায্য করবে। কিন্তু মাঞ্চুরিয়ার নূতন শাসক মৃত চ্যাং-এর পুত্র চ্যাং সিউ-লিয়াং পিতার

মত পরাক্রান্ত না হলেও জাপানীদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন না, দেশকে জাপানী প্রভাব থেকে মুক্ত করাই ছিল তাঁর পররাষ্ট্রনীতির মূলমন্ত্র, এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি জাতীযতাবাদী চীনের সঙ্গে হাত মেলাতে উদ্যত হলেন। এই সময়ে চীনের সঙ্গে জাপানের বিবাদ বেধেছিল ১৯১৫ সালের সন্ধিমত পোর্ট আর্থার ও ডায়রনের ইজারা-স্বত্বের মেয়াদ বৃদ্ধি নিয়ে, অর্থাৎ চীন দাবি করল ১৯১৫ সালের সন্ধি অসিদ্ধ, এবং পূর্বকার পঁচিশ বছর মেয়াদের চুক্তিমত ইজারার পরিসমাপ্তি ১৯২৩ সালেই ঘটেছে, কিন্তু জাপান তার নিরানব্বই বছরের দাবি কোনমতে পরিত্যাগ করল না। চীনারা মাঞ্চুরিয়ায় নূতন রেলপথ নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিল, জাপানীরা চীনের এই কার্যের প্রতিবাদ জানাল। তা ছাড়া আরও কয়েকটি বিষয় নিয়ে উভয় দেশের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়েছিল, যেমন দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলপথে কর ধার্যের অধিকার, রেলপথে জাপানীদের পাহারার ব্যবস্থা, মাঞ্চুরিযায জাপানী ও কোরীয়দের বাড়ি ক্রয় ও ভাড়া।

মুকডেন বিস্ফোরণ ও পরবর্তী ঘটনাবলী

১৯৩১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর মুকডেন শহরের উপকণ্ঠে একটি বিস্ফোরণ-শব্দ শোনা গেল। জাপানীরা অভিযোগ করল চীনারা রেলপথ উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছে, প্রকৃতপক্ষে রেলপথের কোনরূপ ক্ষতির চিহ্ন দেখা যায় নি। কিন্তু সেই ওজুহাতে জাপানের কোয়ানটাং বাহিনী 'চীনের তিনটি পূর্ব প্রদেশ' দখল করতে কালবিলম্ব করল না, মাঞ্চুরিয়াই এই 'তিনটি পূর্ব প্রদেশ'। শাসনকর্তা চ্যাং সিউ-লিযাং-এর বাধা দেবার কোন সামর্থ্যই তখন ছিল না, কেননা তাঁর সৈন্যদল মহাপ্রাচীরের দক্ষিণ দিকে শিবিরে অবস্থান করছিল। উপায়ান্তর না দেখে চ্যাং সিউ-লিযাং জাতীয়তাবাদী চীনের অধিনায়ক চিয়াং কাই-সেক-এর শরণাপন্ন হলেন জাপানী কবল থেকে মাঞ্চুরিয়া উদ্ধার করবার উদ্দেশ্যে। ১৯৩২ সালে জাপানীরা মাঞ্চুরিয়ায় 'মাঞ্চুকুয়ো' বা 'মাঞ্চু-রাজ্য' নামে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এই নবরাষ্ট্রের শাসকরূপে চিং বংশের শেষ অবতংসকে অধিষ্ঠিত করে জাপানীরা প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করল যে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যম-আকাঙ্ক্ষার ফলেই মাঞ্চু রাজ্য স্থাপিত হয়েছে। এই সর্বশেষ মাঞ্চু অবতংসের নাম পু-ই, প্রাক্-বিপ্লবকালে

ইনিই ছিলেন চীনের শিশুসম্রাট। ১৯২৪ সালে সেনাপতি ফেং ইউ-সিয়ান কর্তৃক পিকিং থেকে বহিষ্কৃত হবার পর থেকে তিনি টিয়েনসিনে জাপানীদেব আশ্রয়ে বাস করছিলেন। ১৯৩২ সালে জাপানীরা জিহোল নামে অন্তর্মোঙ্গলিযার একটি অংশ অধিকার করে মাঞ্চুকুয়োর অন্তর্ভুক্ত করল এবং ঐ সালেরই সেপ্টেম্বর মাসে মাঞ্চুকুযোর স্বাধীনতাকে ভিত্তি কবে ঐ নূতন রাষ্ট্র ও জাপানের মধ্যে একটি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হল। ১৯৩৪ সালে পু-ই-কে মাঞ্চুকুযোব 'সম্রাট' বলে ঘোষণা করা হল, কিন্তু এই 'সম্রাট' যে জাপানীদেব করপুত্তলি সে কথা বুঝতে কারু বাকি রইল না।

জাপানের এইসব জবরদস্তিমূলক ক্রিযাকলাপ চীনে ভীষণ বিক্ষোভের সঞ্চাব কবেছিল, প্রতিবাদস্বরূপে চীনারা জাপানী দ্রব্য, ব্যাঙ্ক ও জাহাজ 'বযকট' কবল। এই ব্যাপার নিয়ে অচিরেই জাপানীদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বাধল, এবং হাঙ্গামার ফলে সাংঘাই নগবের নানান স্থান ধ্বংসপ্রাপ্ত হল। ১৯৩২ সালেব ফেব্রুযারি মাসে জাপানী যুদ্ধ-জাহাজ ন্যানকিং-এর ওপর গোলাবর্ষণ করে প্রমাণ করল, পাশ্চাত্ত্য গুরুব বলপ্রযোগ কৌশল জাপানীরা বিলক্ষণ আযত্ত করেছে। ইতিমধ্যে জেনেভাব 'লীগ অফ নেশনস্'* নামে সর্বজাতি সম্মেলনের দববারে চীন মুকডেনের বিস্ফোরণ সংক্রান্ত ব্যাপারটি পেশ করেছিল। আমেরিকাব যুক্তরাষ্ট্র লীগের সদস্য ছিল না, কিন্তু চীন আমেরিকার কাছেও জাপানী অপকর্মেব বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিযে আবেদন করল। লীগ প্রতিষ্ঠান ও যুক্তরাষ্ট্র উভযেই তখন কাযক্ষেত্রে অবতীর্ণ হল বটে, কিন্তু নানান কাবণে তারা অত্যন্ত নরম পন্থা অবলম্বন করেছিল, সেজন্য

* প্রথম মহাযুদ্ধেব শেষে League of Nations' নামে একটি বিশ্বজাতি সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভা নগব ছিল এই সংঘেব অধিবেশন ক্ষেত্র। আপসেব মনোবৃত্তি নিযে শক্তিপুঞ্জেব মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিবোধেব অবসান ঘটানোই ছিল এই সংঘেব উদ্দেশ্য। মহৎ উদ্দেশ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু কার্যত দেখা গেল, সংঘটি সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের লীলাক্ষেত্র হযে উঠেছে। ইংবেজ ফরাসী দক্ষিণ আফ্রিকা, ভূতপূর্ব তুর্কী ও জার্মান সাম্রাজ্যেব অন্তর্ভুক্ত মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার বিশাল ভূখণ্ডগুলিকে গ্রাস কবে বসল। এইসব অধিকৃত দেশগুলিকে বলা হত mandated territories যেহেতু অধিকারের আদেশ দিযেছিল লীগ। এই লুটের ব্যাপাবে আমেরিকার শুভবুদ্ধি তাকে দূরে সরিযে বেখেছিল, আমেরিকা লীগের সদস্য হয় নি। মুসোলিনি ও হিটলারের পদাঘাতে লীগের কলঙ্কমলিন জীবনেব অবসান ঘটল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যখন আরম্ভ হল তখনই (১৯৩৯)।

তাদের প্রতিরোধাত্মক ব্যবস্থাগুলি আদৌ কার্যকরী হয় নি। চীনের স্বাধীনতা খর্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন এবং চীনে আমেরিকার স্বত্ব রক্ষার অধিকার ঘোষণা করে একটি হুঁশিয়াবিপত্র ব্যবহার দ্বারাই আমেরিকা তার কর্তব্য আপাতত শেষ করল। অবশ্য আমেরিকা জাপানের তাঁবেদার রাজ্য মাঞ্চুকুয়োকে স্বীকার করে নেয় নি। 'লীগ' একটি কমিশন নিযুক্ত করে মাঞ্চুরিয়ায পাঠালো, সেই কমিশনের নেতা ছিলেন বাংলা দেশেব ভূতপূর্ব গভর্নর লর্ড লিটন। ১৯৩২ সালের শেষভাগে লিটন কমিশন মাঞ্চুরিয়ায় চীনের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য সুপারিশ করল। ১৯৩৩ সালে অনেক তর্ক-বিতর্কের পব লীগ লিটন কমিশনেব সুপারিশ গ্রহণ করল। মাঞ্চুকুয়োব স্বীকৃতি অগ্রাহ্য করা হল, জাপানকে বলা হল চীনে সামরিক কার্যকলাপ বন্ধ করবার জন্য। কিন্তু জাপান ঔদ্ধত্য-ভবে সেই আদেশ অমান্য করে লীগ ছেড়ে বেরিয়ে গেল (১৯৩৩)। লীগের আদেশ অমান্যেব এই জাপানী দৃষ্টান্ত মুসোলিনি অনুসরণ করেছিলেন কয়েক বছর পর আবিসিনিয়া আক্রমণ করে, এবং উভয় ক্ষেত্রে কোনরূপ প্রতিবিধান করবার অক্ষমতার জন্যেই লীগের অকালমৃত্যু ঘটেছিল। সুতরাং ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দেবে যে লীগেব ওপর প্রথম মারাত্মক আঘাত হেনেছিল 'মুকডেন বিস্ফোরণ'।

মাঞ্চুরিয়া গ্রাস করে জাপান সে দেশের অর্থনীতি আপন স্বার্থের গাঁটছড়ায় বেঁধে দিল, সেখানে রেলপথের রুশ স্বত্ব ক্রয় করে রাশিয়াকে বহিষ্কৃত করল। শিল্পীকরণ ব্যাপারে জাপানের উদ্যম সত্ত্বেও দেখা গেল জাপানী কৃষকেরা দেশত্যাগ কবে মাঞ্চুরিয়ায় আসতে বিশেষ উৎসাহী নয়, জাপানী অপেক্ষা চীনা ও কোরীয় নব-আগন্তুকের সংখ্যা অনেক বেশি। মোদ্দা কথা, মাঞ্চুরিয়ার অর্থনীতি করায়ত্ত করেও জাপানী সাম্রাজ্যবাদের বুভুক্ষা নিবৃত্ত হয় নি। পররাজ্যেব ওপর আধিপত্য বিস্তারের যেসব নির্লজ্জ দৃষ্টান্ত দূরপ্রাচ্যে পাশ্চাত্ত্য জাতিরা এতকাল দেখিয়ে এসেছিল সেই পদ্ধতির অনুকরণে জাপান এখন সমগ্র চীন দেশকে মাঞ্চুরিয়ার দশায় পরিণত করতে কৃতসংকল্প হল। খাঁটি জঙ্গী পদ্ধতিমতই জাপান এখন পাশ্চাত্ত্য শক্তিপুঞ্জকে হুঁশিয়ার কবে দিল, চীনের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ অথবা চীনকে কোনরূপ সামরিক সাহায্যদান থেকে তারা যেন বিরত থাকে। আবার চীনকেও হুমকি দেওয়া হল এই বলে

যে, সে যেন জাপানকে প্রতিরোধ করবার উদ্দেশ্যে অন্য কোন শক্তির নিকট সামরিক উপকরণ বা অর্থ গ্রহণ না করে।

জাপানের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ চীনের ছাত্রসমাজকে উত্তেজিত করে তুলেছিল, সংঘবদ্ধভাবে তারা রাজধানী ন্যানকিং এ গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিল (১৯৩১)। কিন্তু প্রবল পরাক্রান্ত জাপানের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করলে দুর্বল চীনের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী এইরূপ বিবেচনা করে চিয়াং কাই-সেক ও কুয়োমিনটাং কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন নি। সম্ভবত দেশে রাজনৈতিক বিভেদ দূর করে ঐক্য স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা চিয়াং সর্বাগ্রে অনুভব করেছিলেন, এবং কম্যুনিস্টরা দেশের সম্ভাবিত ঐক্যের অন্তরায়স্বরূপ, সত্য হোক বা মিথ্যা হোক এই ধারণাটি তাঁর অন্তরে বদ্ধমূল ছিল বলেই তিনি কম্যুনিস্ট উৎসাদনে সর্বশক্তি প্রয়োগ করলেন। চীন দেশে জাপানী অগ্রগতির দিকে যথাসময়ে দৃষ্টিপাত না করে, কম্যুনিস্ট বিভীষিকার কুহেলী সৃষ্টি প্রচুর অনর্থের কারণ হয়েছিল, আমরা তা এখনি দেখতে পাব।

একটি সুপরিকল্পিত প্রহসন

মাঞ্চুরিয়া থেকে বিতাড়িত চ্যাং সিউ-লিয়াং সসৈন্য এসে কুয়োমিনটাং-এর আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন এই ভরসায় যে চীন তাকে মাঞ্চুরিয়া পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করবে। কিন্তু চিয়াং কাই-সেক বাহিনী সহ তাঁকে পাঠালেন জাপানীদের বিরুদ্ধে নয়, চ্যাং সিউ-লিয়াং-কে যুদ্ধযাত্রা করতে হল উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে চিয়াং-পরিকল্পিত কম্যুনিস্ট উৎসাদনের জন্য। ছয় হাজার মাইল 'দীর্ঘ পদযাত্রা'-র পর মাও সি তুং-এর অধিনায়কত্বে কম্যুনিস্টরা সেনসি প্রদেশে একটি সাম্যবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করেছিল (১৯৩৪), সেই রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল সিয়ান নগর। চ্যাং সিউ-লিয়াং যখন তার বাহিনী নিয়ে সিয়ানে উপস্থিত হলেন, কম্যুনিস্টরা তখন যুদ্ধ না করে তাঁর সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হল। আততায়ী জাপানীদের প্রতিরোধের পরিবর্তে আত্মঘাতী গৃহযুদ্ধ পরিচালনা যে একটি অত্যন্ত গর্হিত কর্ম, এই কথাটি চ্যাং সিউ-লিয়াং-কে বোঝানো এমন কিছু কষ্টসাধ্য ছিল না, কেননা জাপানী কবল থেকে মাঞ্চুরিয়া উদ্ধারই ছিল তাঁর পরম স্বার্থ। তিনি আর অগ্রসর

হলেন না, সেখানেই শিবির স্থাপন কবলেন। কম্যুনিস্টদের সঙ্গে চ্যাং-এর আলাপ-আলোচনার বিষয় চিয়াং কাই-সেক অবগত ছিলেন না, তিনি সৈন্য পরিচালনায় চ্যাং-কে পরামর্শ দানের জন্য বিমানযোগে সিয়ানে এসে উপস্থিত হলেন। অচিরে তাঁর বাসস্থানটি চ্যাং-এর সৈন্যগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হল এবং চিযাং হলেন তাঁদের হাতে বন্দী। তারপর যে কাণ্ডটি অনুষ্ঠিত হল ইতিহাসে নানান বিস্ময়কর নাটকীয় কাহিনীর মধ্যেও তার তুলনা মেলা ভার। চিযাং কাই-সেক মুক্ত হলেন, তিনি চ্যাং-কে সঙ্গে নিয়ে ন্যানকিং-এ ফিরলেন। সেখানে চ্যাং অপরাধ স্বীকার করলেন এবং বিচারালয়ে তাঁর শাস্তি হল। সেই সঙ্গে চিযাং-ও কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে অভিযান প্রত্যাহাব করলেন, এবং তাঁদের সঙ্গে মিলিতভাবে জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করবার সংকল্প ঘোষণা করলেন (১৯৩৬)। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই বুঝতে বাকি রইল না যে চ্যাং-এর বিচার, চিয়াং-এর মুক্তি ও জাপানীদের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধাভিযান সংকল্পের ঘোষণা, সবই একটি সুপরিকল্পিত প্রহসন, অর্থাৎ যোগসাজস ব্যাপাব, কম্যুনিস্টদেব সঙ্গে গোপন চুক্তির ফল। চিযাং-এব মুখরক্ষার জন্যেই চ্যাং-এর বিচারের অভিনয কবা হযেছিল।

১৯৩৭ সালে পেইপিং-এর সন্নিকটে একটি সেতু-মুখে চীনা ও জাপানী সৈন্যদের মধ্যে গুলিবিনিময় চলল, এবং যদিও ব্যাপারটির গুরুত্ব তেমন ছিল না, তবুও এই সামান্য কারণ থেকেই একটি পুরাদস্তুর যুদ্ধ বেধে গিয়েছিল। চীনা কর্তৃপক্ষ জাপান-বিরোধী সংস্থাগুলিকে যথাসাধ্য দমন করেছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও উপরোক্ত সংঘর্ষটিকে উপলক্ষ করে জাপানী বাহিনী পেইপিং অধিকার কবল। সেই সঙ্গে জাপানের অধিকার-সীমা অন্তর্মোঙ্গলিযা ও সানসি প্রদেশে সম্প্রসারণ করা হল। এদিকে কিন্তু চীনের জনসাধারণ জাপানী নীতির বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হযে উঠেছিল, ফলে ১৯৩১ সালের মুকডেন ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। সাংঘাই ও ইযাংসি উপত্যকার অন্যান্য নগরে জাপানীরা জনতা কর্তৃক আক্রান্ত হল, আত্মরক্ষার্থ তারা দূতাবাসগুলি বন্ধ করে দিল। বিপন্ন জাপানীদের নিরাপদ স্থানে অপসারিত করা হল, এবং সৈন্য ও জাহাজ প্রেরণ করা হল তাদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য। এইরূপ অবস্থায় উপায় ছিল মাত্র দুইটি, এবং তার একটি গ্রহণ ছাড়া

জাপানের গত্যন্তর ছিল না। প্রথম উপায়, জাপানী বাহিনীর চীন পরিত্যাগ, দ্বিতীয় উপায় সমগ্র দেশটি বলপূর্বক অধিকার। জাপান যে প্রথম উপায়টি গ্রহণ করে নি, দ্বিতীয় পথেই অগ্রসর হবার উদ্যোগ করেছিল, তাতে বিস্ময়ের কারণ নেই। জাপানে এমন একটি জঙ্গীদলের অভ্যুদয় হয়েছিল, কর্তৃপক্ষের আপসমূলক মনোভাবকে সমূলে বিনষ্ট করাই ছিল যে দলের দৃঢ় সংকল্প, এবং এই উদ্দেশ্যে নরমপন্থীদের ওপর নানারূপ টেররিস্ট জুলুমবাজি চালাতেও তারা ত্রুটি করে নি। ১৯৩২ সালে জাপানের প্রধান মন্ত্রী এবং ১৯৩৫ সালে একজন মেজর জেনারেল এই দলভুক্ত গুপ্তঘাতকের হস্তে নিহত হয়েছিল, আর ১৯৩৬ সালে কয়েক শত সৈন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে উচ্চ রাজকর্মচারীদের হত্যা করেছিল। প্রকৃতপক্ষে জাপান সে সময়ে এমন জঙ্গী ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিল যে চীন থেকে সৈন্য অপসারণের কোনরূপ প্রস্তাবেই তারা কর্ণপাত করত না। এদিকে চীনও জাপানের অভিপ্রায়মত তাঁবেদার রাষ্ট্র হয়ে থাকতে রাজি ছিল না। চীনা বাহিনী ও বিমানবহর জাপানী সৈন্যদের আক্রমণ করল কিন্তু প্রথম সংঘর্ষেই চীনাদের ক্ষুদ্র বিমানবহর বিধ্বস্ত হল। চীনের নৌ-বহর ছিল অত্যন্ত দুর্বল, এমন শক্তি ছিল না যে জাপানী জাহাজ থেকে সৈন্যবাহিনীর চীনের উপকূলে ক্রমাগত অবতরণ বন্ধ করতে পারে। চীনের শহরগুলির ওপর জাপানী বিমান থেকে বোমাবর্ষণ অবাধে চলতে লাগল। ১৯৩৭ সালে জাপানীরা সাংঘাই অধিকার করল, অব্যবহিত পরেই রাজধানী ন্যানকিং অধিকৃত হল। চিয়াং সরকার প্রথমে হ্যানকৌ, পরে জাপানী উপদ্রবের ভয়ে চুংকিং শহরে রাজধানী স্থানান্তরিত করল। চুংকিং সুদূর পশ্চিমে জেচুয়ান প্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত, গিরি-কন্দর ও খরবাহিনী স্রোতস্বিনী সে অঞ্চলে সামরিক অভিযানের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক বাধা সৃষ্টি করে রেখেছে। চীনের মূল বাহিনীর পরাজয় ঘটেছিল বটে, কিন্তু জয়ের আশা চীন কখনো ত্যাগ করে নি। জাপানীদের সঙ্গে সংগ্রামের জন্যে গেরিলা বাহিনী গঠিত হয়েছিল। চীনের ভরসা ছিল, সুদীর্ঘ কাল ধরে এই বাহিনীর গেরিলা-যুদ্ধ চালিয়ে যাবার ফলে ক্ষতবিক্ষত জাপান চীন দেশ ছেড়ে গিয়ে সুবুদ্ধির পরিচয় দিতে বাধ্য হবে।

এই যুদ্ধের সময় চীনের জনসাধারণের মধ্যে যেমন দেশপ্রেম জেগে উঠেছিল, এমনটি বিগত এক শতকের মধ্যে দেখা গিয়েছে কি না সন্দেহ।

লক্ষ লক্ষ নরনারী জাপানী-অধিকৃত স্থানগুলি স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে পশ্চিমাঞ্চলে এসেছিল উদ্বাস্তু হয়ে। উদ্বাস্তুদের মধ্যে ছিল ছাত্র, শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিরা। স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় তুলে আনা হয়েছিল, কারখানা প্রভৃতির নানান উপকরণ ও যন্ত্রপাতি নৌকা বা মোটর যোগে অথবা অন্য উপায়ে স্থানান্তরিত কবা হয়েছিল। গন্তব্য স্থানে পৌছবার পব উদ্বাস্তুরা নিজেদের বাসস্থান নির্মাণ এবং জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা করেছিল।

জাপানী আক্রমণ পুরাদমেই চলতে লাগল। ১৯৩৮ সালে হ্যানকৌ ও ক্যানটন অধিকৃত হল, পরে কিয়াংসি প্রদেশের রাজধানী ন্যানচাং জাপানীবা দখল করল। ১৯৪০ সালে তারা ইযাংসিব গিরিকন্দরে আই-চিং নামে স্থান অধিকার করে চুংকিং-এর অনেকটা কাছাকাছি গিয়ে পড়েছিল। এই সময়েব মধ্যে মধ্য ও দক্ষিণ চীনের প্রায় সব শহর এবং সমগ্র সমুদ্রকূল জাপান করায়ত্ত করেছিল। রেলপথ, নদীপথ ও বন্দরগুলিও জাপানের অধিকাবে এসেছিল। এইরূপে বহির্জগতেব সঙ্গে চীনা সরকাবেব সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে জাপান চীনের অবশিষ্ট প্রতিবোধ-শক্তিটুকুও নির্মূল কবতে উদ্যত হল।

চীনের বিরুদ্ধে জাপান যথাবিধি যুদ্ধ ঘোষণা কবে নি, উদ্দেশ্য ছিল সেখানে মাঞ্চুরিয়ার মত একটি তাঁবেদার রাজ্য স্থাপন। জাপানের এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল, যখন ন্যানকিং-এ প্রতিষ্ঠিত একটি তাঁবেদারী রাষ্ট্রের পরিচালনা-ভাব গ্রহণ করতে সম্মত হলেন ওয়াং চিং ওয়েই। এই ব্যক্তিটি ছিলেন একজন ভূতপূর্ব বিপ্লবী, সান-ইয়াৎ-সেন-এর বিশিষ্ট বন্ধু ও সমর্থক, জাতীয় সবকারে একটি উচ্চপদের প্রাক্তন অধিকাবী, কিন্তু চিয়াং-বিদ্বেষী। ১৯৪০ সালে ন্যানকিং শহরে জাপানী-সমর্থিত নূতন সরকার গঠন করলেন তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষাব বশবর্তী হয়ে, তবে এ ভরসা তাঁব ছিল যে বুদ্ধি খাটিয়ে জাপানীদের চালমাৎ করে দেশকে তিনি রক্ষা করতে পারবেন। কিন্তু অচিরেই তাঁকে নিরাশ হতে হয়েছিল। তিনি জাপানীদের সঙ্গে সন্ধির পত্রে স্বাক্ষর করলেন, কম্যুনিস্ট প্রতিরোধের জন্য উত্তরাঞ্চলে ও অন্তর্মোঙ্গলিয়ায় জাপানী বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করতে সম্মত হলেন, এমন কি 'মাঞ্চুকুয়ো' রাষ্ট্রকেও স্বীকার করে নিলেন, কিন্তু তাঁর বুঝতে বাকি রইল না, মর্যাদায় তিনি জাপানীদের সমকক্ষ নন, আর সন্ধিপত্রটিও সমান দুই পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত হয় নি। ১৯৪৪ সালে ভগ্নহৃদয়ে তিনি মারা গেলেন।

'সম-সমৃদ্ধ অঞ্চল'

মাঞ্চুরিয়া অধিকারের পর থেকে জাপান সে দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ উদ্ধার ও শিল্প-বিস্তার-কাযে উদ্যোগী হয়েছিল। অনেক রেলপথ নির্মিত হয়েছিল, খনিজ ও বনজ বস্তু সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, বস্তুত শিল্পোন্নতির ফলে মাঞ্চুরিয়া বিলক্ষণ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। চীন দেশেও জাপান কলকারখানা খুলেছিল, রেলপথ নির্মাণ, শিল্পায়ন ও খনির কাজ শুরু করেছিল। বাহ্যত এই কাযগুলি ছিল চীন-জাপানের যৌথ উদ্যম প্রচেষ্টা, আসলে প্রাধান্য ছিল সর্বতোভাবে জাপানের একচেটিয়া বস্তু। ছাত্রদের শিক্ষা-পুস্তকগুলি পর্যন্ত জাপানী নির্দেশমত প্রস্তুত হত, 'সম-সমৃদ্ধ অঞ্চলে'র (Co-prosperity Sphere) নীতিকেই ছাত্রদের সমুখে পরম আদর্শ বলে ধরা হত। দূর-প্রাচ্যের সকল দেশে জাপানী সহযোগিতায় অর্থনৈতিক উন্নতি-প্রচেষ্টাই ছিল 'সম-সমৃদ্ধ অঞ্চলে'র লক্ষ্য। কিন্তু সত্য বা কল্পিত কোন উন্নয়নের আদর্শই চীনাদের প্রতিরোধ প্রবৃত্তিকে শিথিল করতে পারে নি। তার একটি কারণ বোধ করি, চীনবাসীর প্রতি জাপানীদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার, তারা ভুলে গিয়েছিল জাতির লাঞ্ছনা জাতির সহযোগিতার পক্ষে একটি প্রধান অন্তরায়। গেরিলাদের গোপন আক্রমণ চলতে লাগল। এরূপ সংগ্রাম চীন আর কতকাল ধরে চালাতে পারত বলা কঠিন, পরিণামে জাপানীরা হয়তো বা চীনে কায়েম হয়েই বসত, কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জাপানের অবতরণের ফলে চীন আত্মরক্ষার একটি বিধিদত্ত সুযোগ লাভ করেছিল।

৩. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘাত-প্রতিঘাত

১৯৩৯ সালে ইউরোপে জার্মানি কর্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রমণের ফলে জার্মানির সঙ্গে বৃটেন ও ফ্রান্সের যুদ্ধ বাধে, এবং সেই থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাত।* কিন্তু তার পূর্বেই জাপান নাৎসি-ফ্যাসিস্ট অক্ষচক্রে যোগদান

* প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে ইউরোপের অভিনব অবস্থাচক্রে আবর্তিত ঘটনাবলী নিতান্ত অনিবার্যভাবেই জগৎকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিরাট ধ্বংসের মুখে ঠেলে নিয়ে চলেছিল। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদী মতিগতি দেখে আমেরিকা ইউরোপের পুনর্গঠন-ক্ষেত্র থেকে বিদায় গ্রহণ

করেছিল। কম্যুনিস্ট-বিরোধী একটি প্যাক্টে জাপান জার্মানির সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। ১৯৪০ সালে জার্মানি কর্তৃক সমগ্র পশ্চিম ইউরোপ অধিকারের পর দূরপ্রাচ্যে ফরাসী ও ওলন্দাজ সাম্রাজ্যভুক্ত দেশসমূহে শাসকদের সামরিক শক্তি অনেকখানি হ্রাস পেয়েছিল, এবং ইংরেজকে কিছুকাল জার্মানির সঙ্গে একাকী যুদ্ধ চালাতে হয়েছিল বলে এ অঞ্চলের প্রতিরক্ষা বিধানের উপযুক্ত সামর্থ্য বৃটেনেরও ছিল না। পাশ্চাত্ত্য শক্তিসমূহের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে জাপান একটি নূতন পরিকল্পনার রূপায়ণে মনোনিবেশ করেছিল, সেই পরিকল্পনাটি হল 'সম-সমৃদ্ধ অঞ্চল' ('Co-prosperity Sphere') গঠন, 'পূর্ব এশিয়ায় নব-ব্যবস্থা'র ('New order in East Asia') প্রবর্তন। জাপানীদের উদ্যোগে ও আঞ্চলিক রাষ্ট্রগুলির সহযোগিতায় পূর্ব এশিয়ার অর্থনীতির সামগ্রিক উন্নতি বিধানই ছিল এই পরিকল্পনার বহুঘোষিত উদ্দেশ্য, কিন্তু তার মূলে ছিল সাম্রাজ্যবাদী জাপানের অদম্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়, এমন কি ব্রহ্ম, ভারত ও সিংহলের প্রতি ভক্ষকের আগ্রাসী লোলুপ দৃষ্টি। ১৯৪১ সালে জার্মানি কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণের অব্যবহিত পূর্বে জাপান রাশিয়ার সঙ্গে একটি অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত করেছিল। অভিপ্রায় ছিল এই যে রাশিয়ার আক্রমণের শঙ্কা থেকে মুক্তি লাভ করে জাপান সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে পারবে দূরপ্রাচ্য অঞ্চলে অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য জাতির প্রভুত্ব নাশের জন্য।

করেছিল, ফলে রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত কম্যুনিজমকে প্রতিরোধ করবার জন্যই জার্মানিকে সামরিক বলে শক্তিমান করে তুলবার প্রয়োজন হয়েছিল। ইতালিতে মুসোলিনি ফ্যাসিজমের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন বিগত কালের রোমান সাম্রাজ্যকে পুনরুজ্জীবিত করবার স্বপ্নকে ফলিয়ে তুলবার জন্য। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে হিটলার প্রবর্তিত করেছিলেন নাৎসিবাদ যার মূলমন্ত্র ছিল জার্মানির পরাজয়ের গ্লানি অপনোদন ও হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার। কম্যুনিজম-বিরোধী এই দ্বিবিধ একনায়কত্বের সংযোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইউরোপে ফ্যাসিস্ট-নাৎসি অক্ষচক্র (Axis)। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে জাপানও এই অক্ষচক্রে যোগদান করেছিল। অদৃষ্টের পরিহাস এমনি যে নাৎসি ও ফ্যাসিস্ট অক্ষচক্রটি কম্যুনিজমের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য প্রাচীররূপে খাড়া থাকা সত্ত্বেও জার্মানির বিরুদ্ধে বাধ্য হয়েই ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হয়েছিল যখন মদদর্পিত হিটলার রাজ্য সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে চেকোস্লোভাকিয়া দখল করে পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলেন।

ইতিপূর্বেই জাপানী বাহিনী ফরাসী ইন্দোচীনে প্রবেশ করে উপকূল থেকে রেলপথ ধরে ইউনানে বহিঃশক্তির সাহায্য প্রেরণ বন্ধ করে দিয়েছিল। তখন ব্রহ্ম থেকে চীনের কুনমিং (ইউনান-ফু) নগর পর্যন্ত একটি রাস্তা তৈরি হল সাহায্য প্রেরণের জন্য, সে সময়ে ব্রহ্ম ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। অনেক কারণে প্রা-ন বন্ধু বৃটেনের প্রতি জাপানের ঘৃণাপূর্ণ তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের মনোভাব দেখা দিয়েছিল, এ অঞ্চলে বৃটেনের পূর্ব-গৌরব ও আধিপত্য তার একটি কারণ। জাপানীদের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করে ইংরেজের মর্যাদা প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছিল, এবং অর্থনৈতিক চাপের ফলে নব-নির্মিত 'বর্মা রাস্তা'টিকে তারা অচিরেই বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছিল। জাপানকে তুষ্ট করবার জন্য চীন থেকে বৃটিশ বাহিনী অপসারিত করা হল।

জাপানের উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতিবন্ধক ছিল তখন একমাত্র আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, পরিণামে এই রাষ্ট্রই জাপানের পতনের নৈমিত্তিক কারণ হয়ে উঠেছিল। রুশ-জাপান যুদ্ধের পর থেকে জাপান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মনোমালিন্য দেখা দিয়েছিল, কিন্তু চীনে জাপানের আগ্রাসী ক্রিয়াকলাপ শুরু হবার পূর্ব পর্যন্ত উভয়ের মধ্যবর্তী ফাটলটি তেমন স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় নি। জাপানের চীন আক্রমণের বিরুদ্ধে মার্কিন জনমত বিষম উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, আমেরিকা থেকে জাপানে লোহা ও পেট্রোল রপ্তানি বন্ধ করবার দাবি করা হল। ১৯৩৬ সালে জাপানের অভিপ্রায়মত ওয়াশিংটন চুক্তি বাতিল করে দেওয়া হল। স্মরণ থাকতে পারে ১৯২০-২১ সালে ওয়াশিংটনের নয়-শক্তি সম্মেলনে এই চুক্তিপত্র সম্পাদিত হয়েছিল, এবং চুক্তি-মত বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের নৌ-বহর নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল এই অনুপাতে : ৫-৫-৩। চুক্তিটি বাতিল করে জাপান বেপরোয়া-ভাবে তার নৌ-শক্তি বৃদ্ধি করতে মন দিল। আমেরিকাও উপায়ান্তর না দেখে আলাস্কা, হাওয়াই ও এলিউসিয়ান দ্বীপের নৌ-ঘাঁটিগুলি সুদৃঢ় করল, আর প্রশান্ত মহাসাগরের অন্যান্য দ্বীপে নূতন বিমান ও সাবমেরিনের ঘাঁটি নির্মাণ করে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় উদ্যোগী হল। যুক্তরাষ্ট্র ন্যানকিং নগরে জাপান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ওয়াং চিং ওয়েই-র তাঁবেদার চীনা রাজ্যকে স্বীকার করল না, পক্ষান্তরে জাতীয় সরকারের সাহায্যার্থ অর্থ মঞ্জুর করল। তা ছাড়া

আমেরিকা থেকে জাপানে বিমান, লৌহ ও ইস্পাত, পেট্রোল প্রভৃতি রপ্তানি বন্ধ করবারও ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

দূরপ্রাচ্যে সংগ্রামের বিস্তৃতি ও পরিণাম

১৯৪১ সালের শীতের প্রারম্ভেই আমেরিকা ও জাপানের পারস্পরিক সম্বন্ধ একটি সঙ্গিন পর্যায়ে গিয়ে পৌছল। জাপান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অগ্রগতি বন্ধ কবতে রাজি হল এই শর্তে যে আমেরিকা জাতীয় চীনকে সাহায্যদানে বিরত থাকবে। কয়েক দিনের মধ্যেই আমেরিকা একটি পাণ্টা প্রস্তাব উত্থাপন করল, এই প্রস্তাবে ছিল একটি অনাক্রমণ চুক্তির কথা, জাপান, বৃটেন, চীন, সোভিয়েট রাশিয়া, থাইল্যাণ্ড (শ্যাম), হল্যাণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি অনাক্রমণ চুক্তি। চীন ও ইন্দোচীন থেকে জাপানী সৈন্য অপসারণ এবং জাপান ও আমেরিকা কর্তৃক 'এক্স্‌ট্রাটেরিটোরিয়ালিটি'র প্রত্যাহার ছিল চুক্তি প্রস্তাবের অন্যতম শর্ত। এই প্রস্তাব গ্রহণ করলে চীনে প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘকাল ধরে জাপানের বিরামহীন প্রচেষ্টা একেবারেই অর্থহীন হয়ে পড়ে, তার ভাগ্যে পুনর্মূষিকত্ব প্রাপ্তিই সার হয়। জাপান প্রস্তাবটিকে অগ্রাহ্য করল এই বলে যে যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন এ অঞ্চলে শান্তি স্থাপনেব বিরোধী, তারা চায় চীনে তাদের আধিপত্য আগেব মত বজায় রাখতে। জাপানী রাষ্ট্রদূত যেমন মার্কিন রাষ্ট্র-সচিবের হাতে উক্ত মর্মে সরকারী জবাবটি তুলে দিল, সেই সঙ্গেই অমনি কোনরূপ চরমপত্র না দিয়ে জাপানী নৌ-বহর হাওয়াই দ্বীপের পার্ল হারবার আক্রমণ করল এবং সেই অতর্কিত আক্রমণের ফলে মার্কিন নৌ-ঘাটিব রণতরীগুলি বিনষ্ট হল (৭ই ডিসেম্বর ১৯৪১)। জাপানের বিশ্বাস ছিল, নৌ-বহরের ওপর এই প্রচণ্ড আঘাত সামলে নিতে আমেরিকার দীর্ঘ সময় লাগবে এবং সেই অবসরে জাপান পূর্ব এশিয়ার প্রভুরূপে আত্মরক্ষার জন্য প্রভূত শক্তি অর্জন করতে পারবে। পার্ল বন্দর আক্রমণের সঙ্গে-সঙ্গেই সিঙ্গাপুর, গুয়াম দ্বীপ ও ফিলিপাইনে জাপানী বিমান থেকে বোমা বর্ষিত হল। তারপর আমেরিকা ও বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে জাপান উত্তর মালয়ে অভিযান প্রেরণ করল এবং সাংঘাই নগরের আন্তর্জাতিক এলাকা দখল করল। পর দিন (৮ই ডিসেম্বর ১৯৪১) বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও নেদারল্যাণ্ড ইষ্ট ইণ্ডিস্ জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

ঘোষণা করল। অস্ট্রেলিয়া ও ছয়টি ল্যাটিন আমেরিকার দেশও জাপানের বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষে যোগদান করতে বিলম্ব করল না।

দূরপ্রাচ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিস্তার-কাহিনী বিশদভাবে বর্ণনার প্রয়োজন নেই। শুধু এইটুকু বললেই বোধ করি যথেষ্ট যে জাপান অতি দ্রুত ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, হংকং, মালয়, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া ও ব্রহ্মদেশ জয় করল, ইন্দোচীন ও শ্যামের ওপর প্রভুত্ব স্থাপন করল, এবং ভারত, সিংহল ও অস্ট্রেলিয়া আক্রমণের উদ্যোগ করল। ঝঞ্ঝার মত এই সামরিক বেগবত্তার সাফল্য জাপানের অসামান্য কৃতিত্বের পরিচায়ক, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভাগ্যচক্রের আবর্তনের লক্ষণ প্রথম প্রকাশ পেল যুক্তরাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান নৌ-বাহিনী ও বিমানবহর যখন জাপানের অগ্রগতি বন্ধ করে তাকে পিছু হটতে বাধ্য করেছিল। তারপর যখন জাপানী-অধিকৃত উত্তর ব্রহ্মে বিপর্যয় সৃষ্টি করে আমেরিকান, ইংরেজ ও চীনা বাহিনী জাপানীদের বিতাড়িত করবার উদ্যোগ করল, যখন স্থলপথে ভারতের সঙ্গে চীনের সংযোগ স্থাপিত হল, যখন রুশরা জার্মান আক্রমণ ব্যাহত করে জার্মানদের রাশিয়া থেকে বিতাড়িত করল, এবং সর্বোপরি যখন মুসোলিনি ও হিটলারের পতন ঘটল, জাপানের পরাজয় সম্ভাবনা তখন সুনিশ্চিতভাবে দেখা দিল। নিয়তির অপরিহার্য ফলশ্রুতিরূপেই তখন আমেরিকার বোমা-বর্ষণে বিধ্বস্ত জাপান আত্মসমর্পণ করেছিল (১৯৪৫)।

আমেরিকা কর্তৃক জাপান অধিকৃত হবার পর জাপানকে চীন ও অন্যান্য দেশ ত্যাগ করে চলে আসতে হল। কিন্তু চরম পরাজয় ও চীন ত্যাগের পূর্বেই জাপান চীনা জাতীয় সরকারের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে তার প্রতিরোধ-শক্তির মূলোচ্ছেদ করেছিল। ফলকথা, ১৯৪৪ সালে জাতীয় চীনের পতন একরকম অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। মূল ভূখণ্ডের অধিকাংশ রেলপথ জাপানের আয়ত্তে এসেছিল। জাপানী নৌ-বাহিনীর শক্তি হ্রাস এবং মার্কিন রণ-তরীর আক্রমণের দরুন জলপথে চীনে জাপানী সৈন্য আগমনের বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও স্থলপথে মাঞ্চুরিয়া থেকে ক্যানটন পর্যন্ত রেলে সৈন্যদের যাতায়াত নিয়মিত-ভাবেই চলেছিল।

এখানে বলা আবশ্যক, বিদেশী প্রভুত্বের কতগুলি আনুষঙ্গিক উপসর্গ থেকে চীনকে মুক্ত করেছিল জাপানীরা। ১৯৪৩ সালে পাঁচটি নগরের

জাপানী 'কনসেসন' বা সুবিধাগুলি চীনকে প্রত্যর্পণ করা হল। ক্যানটন ও টিয়েনসিনে বৃটিশ 'কনসেসন', আময ও সাংঘাই-র আন্তর্জাতিক ঘাঁটির 'কনসেসন'ও আর রইল না। এদিকে অক্ষশক্তিপুঞ্জের অন্যতম ইতালি এবং ভিসি ফ্রান্সও টিয়েনসিন, ক্যানটন ও হ্যানকৌ থেকে নিজ নিজ অধিকার প্রত্যাহার করল। তা ছাড়া চীনে জাপানীদের ওপর ট্যাক্স্ ধার্য করবার ক্ষমতা ন্যানকিং সরকারকে অর্পণ করা হল, এবং ইয়াংসি উপত্যকায় জাপানী অধিকৃত কারখানাগুলি মালিকদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফলকথা, 'একস্‌ট্রাটেরিটোরিযালিটি' প্রভৃতি যেসব স্বত্বের কনসেসন বিদেশী শক্তিপুঞ্জ দুর্বল চীনের নিকট থেকে জবরদস্তি করে আদায় করেছিল, জঙ্গী জাপান সেই জগদ্দল পাথরের চাপ চীনের ওপর থেকে সরিয়ে দিয়েছিল, আর সেই সঙ্গে জাপান তার নিজের সুবিধাগুলিকেও স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়েছিল, জাপানের পূর্বাপর স্বার্থান্ধ আচরণ বিবেচনা করে কথাটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য।

ইয়ালটা চুক্তি

১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ক্রিমিয়ার ইয়ালটা নামক স্থানে যুদ্ধান্তের নীতি নির্ধারণের জন্য মিত্রশক্তিপুঞ্জের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক বসে। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট, বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চিল ও মার্শাল স্টালিন বৈঠকে যোগদান করেন। তাঁরা একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করেন, চুক্তির শর্তগুলি মোটামুটি এইরূপ: (১) বহির্মোঙ্গলিয়ায় স্থিতাবস্থা (রাশিয়ার যুক্তিমত স্বাধীনতা) রক্ষা, (২) ১৯০৫ সালের পোর্টসমাউথ সন্ধিসূত্রে জাপান কর্তৃক অধিকৃত সাখালিন দ্বীপের দক্ষিণাংশ রাশিয়াকে প্রত্যর্পণ, (৩) ডায়রনে আন্তর্জাতিক অধিকার স্থাপন, এবং সেখানে রাশিয়ার বিশেষ অধিকারসমূহের স্বীকৃতি, (৪) ১৮৯৮ সালে চীন রাশিয়াকে পোর্ট আর্থারের যে ইজারা-স্বত্ব দান করেছিল, রাশিয়া যে স্বত্ব জাপানকে হস্তান্তরিত করেছিল ১৯০৫ সালে, সেই জাপানী ইজারা বাতিল করে রাশিয়াকে প্রদত্ত পূর্ব-ইজারার পুনঃপ্রবর্তন, (৫) চীনা পূর্ব রেলপথ ও দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়া রেলপথ, এই দুটি রেলপথের পরিচালনার ভার একটি চীন-সোভিয়েট যৌথ কোম্পানীর ওপর স্থাপন এবং রাশিয়ার বিশেষ স্বার্থ বজায় রাখবার ব্যবস্থা, (৬) কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ

রাশিযাকে সমর্পণ। এই তো গেল চুক্তির শর্ত, কিন্তু ইয়ালটার বৈঠকে চীন উপস্থিত ছিল না, সেজন্য চুক্তিব শর্তগুলি চীনের অনুমোদনসাপেক্ষভাবেই লিপিবদ্ধ হয়েছিল। মাঞ্চুরিয়ার ওপর চীনের সার্বভৌমত্ব মিত্রশক্তিপুঞ্জের প্রধান-ত্রয় স্বীকার করেছিলেন। আর সোভিয়েট রাশিয়া চীনা জাতীয় সরকারের সঙ্গে মৈত্রী ও সখ্যতার একটি চুক্তি সম্পাদন করে চীনকে জাপানেব প্রভাবমুক্ত করবার জন্য সাহায্য দানেব অভিপ্রায় প্রকাশ করেছিল। এই সংকল্প কাজে পরিণত হয়েছিল কযেক মাস পরে, আমরা তা এখনি দেখতে পাব।

৪. যুদ্ধান্তে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার কথা

১৯৩৭ সালে কুযোমিনটাং ও কম্যুনিস্টদেব মধ্যে আপসসূত্রে স্থির হয়েছিল যে উত্তর-পশ্চিমেব কম্যুনিস্ট অঞ্চলের প্রশাসনিক স্বাতন্ত্র্য বক্ষা সত্ত্বেও কম্যুনিস্ট সেনাদল জাতীয় বাহিনীর অঙ্গস্বরূপে চিযাং কাই-সেকেব পরিচালনায় জাপানী বিতাডনের জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে। কম্যুনিস্ট দল ঘোষণা করল যে কম্যুনিস্ট-অধিকৃত অংশ 'চীনের সাধারণতন্ত্রে'রই (Republic of China) অন্তর্গত, কুযোমিনটাংকে বলপূর্বক অপসারণের কোন চেষ্টা-উদ্যম কম্যুনিস্টরা করবে না, আর সান-ইযাৎ-সেন নির্দেশিত 'স্যান মিন চু আই' বা 'তিনটি গণ-নীতি'র আদর্শ গ্রহণ করে যথাকালে তারা নিজেদের স্বতন্ত্র রাজ্য ও বাহিনীর বিলোপ সাধন করবে। চিযাং কাই-সেক কম্যুনিস্টদের সিদ্ধান্তকে 'জাতীযতা-বাদের জয়' বলেই অভিনন্দিত করলেন। ১৯৩৮ সালে কুযোমিনটাং 'রাজনৈতিক গণ-সংসদ' (People's Political Council) নামে একটি সংসদ গঠন করল, রাষ্ট্র পরিচালনা বিষয়ে উপদেশ দান ছিল এই সংসদের কার্য। সংসদে কুয়োমিনটাং, কম্যুনিস্ট ও অন্যান্য ক্ষুদ্র দলেব প্রতিনিধি ছিল।

কুয়োমিনটাং-কম্যুনিস্ট বিরোধ

এই ব্যবস্থা কার্যকবী হযেছিল সাময়িকভাবে, কুয়োমিনটাং ও কম্যুনিস্টদের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ অচিরেই তিক্ত বিষাক্ত হযে উঠেছিল। কম্যুনিস্টরা এই অভিযোগ করল যে কুয়োমিনটাং জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সর্বশক্তি প্রয়োগ না করে সুদক্ষ সৈন্যদল কম্যুনিস্ট অঞ্চলের সীমান্ত সমীপে

স্থাপন করেছে সে অঞ্চলে কম্যুনিস্টদের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবার জন্য। বিবাদ-বিসংবাদের দরুন কম্যুনিস্টরা তাদের অধিকৃত অঞ্চলের স্বাতন্ত্র্যকে ঘুচিয়ে না দিয়ে বরঞ্চ তার উগ্র রূপ ফুটিয়ে তুলল নিজস্ব মুদ্রার প্রচলন ও ডাক বিভাগের সৃষ্টি করে, আর এই ব্যবস্থার পাল্টা চালরূপে জাতীয় সরকার কম্যুনিস্ট অঞ্চল অবরোধ (blockade) করল (১৯৩৯)। ১৯৪১ সালে কুয়োমিনটাং বাহিনী কিয়াংসি ও ফুকিয়েন প্রদেশে অবস্থিত কম্যুনিস্ট সৈন্যদের সহসা আক্রমণ করল, যদিও কম্যুনিস্ট সৈন্যরা ছিল যুক্ত ফ্রণ্টের অন্তর্গত 'নব চতুর্থ বাহিনী'। এই অতর্কিত আক্রমণে কম্যুনিস্টরা ভীষণভাবে বিধ্বস্ত হল, বাহিনীর অবশিষ্ট অংশ সানটাং-এ ও কিয়াংসি প্রদেশের উত্তরভাগে পলায়ন করে প্রাণরক্ষা করেছিল। এই ব্যাপার থেকে নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হয় যে কুয়োমিনটাং-এর কাছে কম্যুনিস্ট-দলন জাপানী বিতাড়নের চেয়েও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য বলে মনে হয়েছিল।

জাপানের বিরুদ্ধে চিয়াং কাই-সেক সর্বশক্তি নিয়োগ করেন নি, এই বিষয়টি আমেরিকানদেরও অগোচর ছিল না। জাপানী আক্রমণের প্রথম ভাগে আমেরিকা ছিল জাতীয় চীনের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিসম্পন্ন, মার্কিনের চোখে চিয়াং কাই-সেক একজন আদর্শ বীরপুরুষ, দেশপ্রেমিক ও গণতন্ত্রের প্রকৃষ্ট সেবকরূপেই প্রতিভাত হয়েছিলেন। কিন্তু ১৯৪০ সাল থেকে এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন শুরু হল। জাতীয় সরকারের ঘোর দুর্নীতির বিশদ বিবরণ উচ্চকণ্ঠে প্রচারিত হতে লাগল। নানান বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও আমেরিকা নানারূপ আর্থিক ও সামরিক সাহায্য জাতীয় চীনকে প্রেরণ করেছিল, কিন্তু দেখা গেল সেগুলি ভস্মে ঘৃতাহুতি, সবই অর্থগৃধ্নু স্বার্থান্বেষীদের পকেটে প্রবেশ করেছে। মার্কিন পরিদর্শকেরা বুঝতে পারল, কুয়োমিনটাং প্রতিষ্ঠান প্রতিক্রিয়াশীল গণতন্ত্রবিরোধী ব্যক্তিদের পীঠস্থান হয়ে উঠেছে, আর জাতীয় সরকার নাৎসিদের অনুকরণে বন্দী-শিবির ও পুলিশী রাষ্ট্রের ব্যবস্থা দ্বারা গণতন্ত্রের সমর্থক উদারনৈতিকদের দলনে প্রবৃত্ত হয়েছে। জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পর যুক্তরাষ্ট্রের অনেক সেনানায়ক ও সৈন্যদল জাতীয় সরকারকে সাহায্যের জন্য চীনে প্রেরিত হয়েছিল, তাদের অধিনায়ক ছিলেন জেনারেল স্টিলওয়েল। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট তাঁর ওপর চীনা বাহিনী পরিচালনার ভার সমর্পণ করবার জন্য চিয়াং কাই-সেককে উপদেশ দিয়েছিলেন,

কিন্তু চিয়াং সে কথায় কর্ণপাত করেন নি। ফলে, জাতীয় চীনের সঙ্গে আমেরিকার সদ্ভাব অনেকটা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। জেনারেল ষ্টিলওয়েল চিয়াং-কে তাচ্ছিল্যভরে উপেক্ষা করেই চলতেন। এ সময়ে মার্কিন জঙ্গীদের হাতে চীনা জনসাধারণের লাঞ্ছনাভোগের অনেক ঘটনা দেখা গিয়েছিল।

আপস-মীমাংসা প্রস্তাব

১৯৪৪ সালে চীনের পূর্বাংশে যখন জাপানী প্রভুত্ব সম্পূর্ণ কায়েম হতে চলেছে, আর পশ্চিম অংশেরও বিপদ আসন্ন, সেই সময় কুয়োমিনটাং ও কম্যুনিস্ট পার্টির মধ্যে আপস-মীমাংসার প্রস্তাবে কিছু আশার সঞ্চার হয়েছিল। জাপানের বিরুদ্ধে উভয় দলের মিলিত উদ্যম সুদৃঢ় করবার উদ্দেশ্যে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের পক্ষ থেকে মার্কিন ভাইস-প্রেসিডেণ্ট ওয়ালেস এবং পরে জেনারেল হারলে এসে চীন দেশে উপস্থিত হয়েছিলেন, আপস-মীমাংসা প্রচেষ্টায় সাহায্য করবার জন্য। এই প্রসঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গেও আলোচনা হয়েছিল। রাশিয়ার পক্ষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মলোটভ বলেছিলেন, চীনে যাদের কম্যুনিস্ট বলা হয় প্রকৃতপক্ষে তারা কম্যুনিস্ট নয়, তাদের কোন প্রকার সাহায্য রাশিয়া করে নি। তিনি উভয় দলের মিলন ঘটানোর চেষ্টা-উদ্যোগে যুক্তরাষ্ট্রকে পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। চীন দেশের মার্কিন দূত জেনারেল হারলে জাতীয় সরকার ও কম্যুনিস্টদের এক বৈঠকে মিলিত হবার জন্য সচেষ্ট হলেন। তিনি বিমানযোগে ইনানে গিয়ে কম্যুনিস্টদের নিকট থেকে একটি চুক্তি প্রস্তাব নিয়ে চুংকিং-এ ফিরলেন। সে প্রস্তাব কুয়োমিনটাং অগ্রাহ্য করল। কিন্তু ১৯৪৫ সালে চুংকিং-এ একটি সভার অধিবেশন হয়েছিল, সেই সভায় কম্যুনিস্টদের প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত ছিলেন চৌ এন-লাই আর ছিল জাতীয় সরকারের তিনজন প্রতিনিধি। উভয় পক্ষের আমন্ত্রণে হারলেও উপস্থিত ছিলেন। সম্মেলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। দেখা গেল, চিয়াং কাই-সেক কোনমতেই কম্যুনিস্টদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছেন না, তারা রাষ্ট্রকে করায়ত্ত করবার জন্য যে কোন অপকৌশলের আশ্রয় নিতে পারে, এই ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। পক্ষান্তরে কম্যুনিস্টদেরও দুর্নীতিপরায়ণ স্বার্থান্ধ কুয়োমিনটাং-এর ওপর বিন্দুমাত্রও আস্থা ছিল না। হারলে মনে করতেন, চীনা কম্যুনিস্টরা প্রকৃতপক্ষে সোভিয়েত-মার্কা কম্যুনিস্ট

নয়, তারা গণতান্ত্রিক নীতি-পদ্ধতি গ্রহণ করতে উৎসুক, আর কুয়োমিনটাং-ও কিছু স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট প্রতিষ্ঠান নয়, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে পক্ষদ্বয়ের মধ্যে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে ধৈর্য ধারণে উপদেশ দিলেন। পক্ষ-নির্বিশেষে কুয়োমিনটাং ও কম্যুনিস্ট দুই দলকেই সাহায্য দান করবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে সুপারিশ করা হয়েছিল।

'দীর্ঘ পদযাত্রা'র শেষে ইনান (সিয়ান) অঞ্চলে এসে কম্যুনিস্টরা ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় করেছিল, এবং সেই শক্তিকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করবার সুযোগও তাদের ঘটেছিল। জাপানীদের বিরুদ্ধে কম্যুনিস্টরা গেরিলা-যুদ্ধ চালিয়ে গেল বটে, কিন্তু দলবদ্ধভাবে রীতিমত সংগ্রাম তারা করেছে কদাচিৎ, তা সত্ত্বেও সেই গেরিলা-যুদ্ধে শত্রুপক্ষের বিপুল ক্ষতিসাধন করতে পেরেছিল। পক্ষান্তরে জাতীয় সরকার বাহিনীর প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হয়ে উপায় ছিল না, তাই তাদের সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলে ক্লান্তিকর সংগ্রামে রত থাকতে হয়েছিল। কম্যুনিস্টরা তাদের অধিকৃত স্থানসমূহে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ করেছিল, কৃষক প্রজার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনের ফলে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। তারা ছিল কষ্টসহিষ্ণু, আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবান, দলপতি ও কৃষক বা শ্রমিকের মধ্যে জীবনযাত্রার মানের কোন প্রভেদ ছিল না। আর, জাতীয়তাবাদীরা ছিল দুর্নীতিপরায়ণ ও স্বার্থপর, গণসংযোগ তারা ভয় করত, জনসাধারণ থেকে নিজেদের যথাসম্ভব পৃথক করে রেখেছিল। কম্যুনিস্ট দলের সদস্য-সংখ্যা প্রতিদিনই বেড়ে চলেছিল। ১৯৩৭ সালে সদস্য-সংখ্যা ছিল মাত্র এক লক্ষ, সেই সংখ্যা স্ফীত হয়ে ১৯৪৫ সালে বারো লক্ষে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, সদস্য-সংখ্যার অধিকাংশই ছিল কৃষকশ্রেণীর মানুষ। কম্যুনিস্টরা কৃষকদের যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিয়ে সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলেছিল, তারা ছিল গেরিলা-যুদ্ধে সুদক্ষ, কিন্তু প্রয়োজন হলে দস্তুরমত যুদ্ধ চালানো এবং গ্রাম ও নগর রক্ষা করবার মত সামর্থ্য ও যোগ্যতাও তাদের ছিল।

মাও-র 'চেং-ফেং আন্দোলন' ও 'নূতন গণতন্ত্র'

কম্যুনিস্ট সংস্থার নিয়ন্ত্রণ ও সম্প্রসারণের ভার পড়েছিল মাও সি-তুং-এর ওপর, কিন্তু তাঁর এই কর্তৃত্ব লাভ নির্বিঘ্নে ঘটে নি। এ ক্ষেত্রে তাঁর প্রধান

প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন চ্যাং কুয়ো তা'ও, 'দীর্ঘ পদযাত্রা'য় মাও-র সহযাত্রী, কিন্তু উভয়ের মধ্যে ছিল লক্ষ্যগত প্রভেদ। চ্যাং-এর লক্ষ্য ছিল কুয়োমিনটাং ও অ-কম্যুনিস্টদের সহযোগে জাপানী বিতাড়ন, আর মাও জাপানী ও কুয়োমিনটাং উভয়েরই পরাজয় কামনা করতেন। দু'জনের মধ্যে আবার আদর্শগত প্রভেদও ছিল যথেষ্ট। চ্যাং ছিলেন সোভিয়েত প্রণালীমত রাষ্ট্র গঠনের বিরোধী, যেহেতু ঐরূপ রাষ্ট্রের সঙ্গে চীনা ঐতিহ্যের সমন্বয় কঠিন। পক্ষান্তরে মাও সি-তুং সোভিয়েত পদ্ধতি অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন, এবং উভয়ের মধ্যে এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা কবল মস্কো মাও-কে সমর্থন করে। চ্যাং কুয়ো তা'ও পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হলেন। তারপর ১৯৪২ সালে মাও একটি নূতন আন্দোলন শুরু করলেন, এই আন্দোলনের নাম 'চে°-ফেং আন্দোলন'। উদ্দেশ্য, নিয়মানুবর্তিতার অনুসরণ দ্বারা পার্টির সংহতি দৃঢতর ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা। মাও পার্টির সদস্যদের দোষত্রুটি নিয়ে আলোচনা করলেন, তাদের অন্তর্বদ্ধ দৃষ্টির (subjectivism), গোষ্ঠীকেন্দ্রিক চিন্তার (secterianism) এবং বাহ্য আচার-নিষ্ঠার (formalism) নিন্দা করলেন, এবং প্রকৃত কর্মকে উপেক্ষা করে মুখস্থ-করা মার্কস-লেনিনের বচনগুলির আবৃত্তির জন্য অর্ধশিক্ষিত সম্প্রদায়কে তীব্র কষাঘাত করলেন।

মাও সি-তুং-এর কর্তৃত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল তাঁর অতুলনীয় কর্মশক্তি। কর্মযোগের সাধক হলেও মার্কস-লেনিন চিন্তার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান আছে। ১৯৪০ সালে 'নূতন গণতন্ত্র' নামে তিনি একটি নূতন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, সেই গ্রন্থে কম্যুনিস্ট-প্রবর্তিত নয়া ব্যবস্থার আদর্শ ও কর্মসূচি বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। যে 'ঔপনিবেশিক দশা'র মধ্যে চীন সুদীর্ঘ কাল অবস্থান করেছে সেই অবস্থা এবং প্রকৃত 'সমাজতন্ত্রে'র মধ্যবর্তী পর্যায়ই এই 'নূতন গণতন্ত্র'। এই গণতন্ত্রের কর্মসূচি, জমিদারি বাজেয়াপ্ত করণ এবং বাজেয়াপ্ত জমি ভূমিশূন্য কৃষকদের মধ্যে বণ্টন, ভূমির অধিকতর সদ্ব্যবহারের জন্য গ্রাম্য সমবায় সমিতির গঠন, কম্যুনিস্ট পদ্ধতিমত শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষাদান, সমাজজীবনে নারীজাতিকে পূর্ণতর অধিকার দানের নির্দেশ। এই কর্মসূচির সুষ্ঠু সম্পাদনে ব্রতী হয়েছিলেন মাও সি-তুং, আর একজন সুদক্ষ কর্মী করেছিলেন তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা, এই ব্যক্তির নাম সাও-চি'। তিনি বয়সে মাও-র চেয়ে ছোট, হুনানের জনৈক বর্ধিষ্ণু কৃষকের পুত্র, শিক্ষালাভ

করেছিলেন চাংসায়, কয়লার খনিতে ও সাংঘাই শহরে শ্রমিক আন্দোলন সংগঠন করেছিলেন, কিছুকাল মস্কোতে ছিলেন এবং পরিশেষে 'দীর্ঘ পদযাত্রা'য় যোগদান করেছিলেন। কম্যুনিজমের ভাষ্যকাররূপে তাঁর বিশেষ খ্যাতি। ১৯৪৩ সালে তিনি পার্টির কেন্দ্রীয় দপ্তরের সচিব নিযুক্ত হয়েছিলেন।

সমস্যা সমাধানে অসমর্থ জাতীয় সরকার

১৯৪৫ সালের মধ্যভাগে জাপানের অকস্মাৎ আত্মসমর্পণ ছিল যেমন চমকপ্রদ তেমনি চীনা ভূখণ্ডে নির্বিরোধে জাপানী আধিপত্যের অবসান ছিল এমন একটি আশাতীত ব্যাপার যা মিত্রপক্ষ বা চীনের চিয়াং সরকার কল্পনাও করে নি। তাই জাপানী কর্তৃত্বের আচম্বিতে তিরোধানের সঙ্গে চীনা জাতীয় সরকারের ওপর অপরিমিত দায়িত্বের গুরুভার এসে চাপল। মাঞ্চুরিয়া এবং পূর্ব ও মধ্য চীনের বিশাল ভূখণ্ড ছিল জাপানী-অধিকৃত, জাপানী সৈন্যের অপসারণ সেইসব অঞ্চলের প্রশাসন ব্যাপার ও শৃঙ্খলারক্ষা বিঘ্নিত করেছিল। তা ছাড়া যুদ্ধকালে বিস্তীর্ণ অঞ্চল জাপানীরা বিধ্বস্ত করেছিল, পরিবহণ-ব্যবস্থাও বিপর্যস্ত হয়েছিল। পথ, বিশেষত রেলপথ পুনর্নির্মাণ, দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ, জীবনের মান উন্নয়ন, স্বাস্থ্যোন্নতি, অর্থনীতির সুব্যবস্থা, গণতন্ত্রের প্রবর্তন, জাতীয় ঐক্যের প্রতিষ্ঠা, হঠাৎ এমনি সব গুরুতর সমস্যার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল জাতীয় চীন সরকার, যেসব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান এই অর্বাচীন সরকারের ছিল সম্পূর্ণ সাধ্যাতীত। জাপানের সঙ্গে দীর্ঘকাল লড়াইয়ের ফলে সরকার স্বভাবতই দুর্বল হয়ে পড়েছিল, তার ওপর আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ববিরোধ ও দুর্নীতি অবস্থাকে আরও সঙ্গিন করে তুলেছিল। দলগত গলিজ ব্যাপারগুলির কথা ছেড়ে দিলেও বিভক্ত দেশে সংহতির অভাব ছিল দুর্বলতার একটি বিশেষ কারণ। বস্তুত চিং বংশের পতনের পর থেকে চীনের সামগ্রিক ঐক্য বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা দেয় নি। চ্যাং সো-লিন-এর আমল থেকেই মাঞ্চুরিয়ায় আর চীনা প্রভুত্বের চিহ্নমাত্র ছিল না। এদিকে কম্যুনিস্টরাও ইনান অঞ্চলে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র স্থাপন করেছিল। এই বিচ্ছিন্ন অংশগুলির একীকরণ একটি দুঃসাধ্য ব্যাপার, কিন্তু এইটেই আবার একমাত্র সমস্যা ছিল না। যুদ্ধ-জনিত মুদ্রাস্ফীতির দরুন জনগণের অর্থনৈতিক দুর্গতি চরম সীমায় পৌঁছেছিল, তাদের পীড়িত দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল সেই দিনটির প্রতি

যেদিন পরাজিত জাপানের চীন ত্যাগের সঙ্গে সমৃদ্ধির অভাবনীয় প্রাচুর্য দেখা দেবে। তখন আর দৈন্য-দুর্দশা থাকবে না, এই ছিল তাদের আশা। সে দিন এখন আগত, আশা-ভরসা সবই যেন ফাঁকি-ফক্কিকার হয়ে উঠল, দুর্ভোগের অন্ত হল কই? দীর্ঘকাল দুর্গতি ভোগের পর লোকের ধৈর্য ফুরিয়ে গিয়েছিল, এমন অবস্থায় যাদুমন্ত্রে ভোগান্তির শেষ করতে না পারলে যে কোন সরকারের পক্ষে জনপ্রিয়তা রক্ষা কঠিন, কিন্তু তার ওপর যখন কুয়োমিনটাং সরকার নানারকম ভ্রম প্রমাদ অবিবেচনার কায করে অযোগ্যতার প্রমাণ দিতে লাগল তখন আর তাদের ওপর জনসাধারণের বিন্দুমাত্র আস্থাও অবশিষ্ট রইল না।

১৯৪৬ সালের মধ্যে ত্রিশ লক্ষ সামরিক ও অসামরিক জাপানী দেশে প্রত্যাবর্তন করেছিল। তারা যেমন চীন ছেড়ে চলে যেতে লাগল, তাদের স্থান জাতীয়তাবাদীরা গ্রহণ করল। সে অঞ্চলের স্থানীয় অধিবাসীরা জাপানীদের সহকর্মী (Collaborator) এই অভিযোগে তাদের ওপর কুয়োমিনটাং কর্মচারীরা নানারকম যথেচ্ছাচার ও জুলুমবাজি আরম্ভ করল। ১৮৯৫ সাল থেকে ফরমোসা দ্বীপ ছিল জাপানী সাম্রাজ্যভুক্ত, চীনা জাতীয়তা-বাদীরা সেখানে এখন যে শাসন প্রতিষ্ঠিত করল, এমন দুর্নীতিপূর্ণ সে শাসন যে জাপানীদের কবলমুক্ত হয়েও অধিবাসীদের দুর্ভোগের অবসান ঘটে নি। নানারূপে শোষিত হয়ে তারা চীনা শাসকদের বিষদৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেছিল, যদিও এই নব-আগন্তুকদের সঙ্গে ছিল তাদের জাতিগত রক্তমাংসের সম্বন্ধ, সাংস্কৃতিক সংযোগ।

জাপানী আত্মসমর্পণের কিছুকাল পূর্বে রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। উভয়ের মধ্যে যে অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল সেই চুক্তি বাতিল করেছিল রাশিয়া শত্রু জার্মানিকে জাপান সাহায্যদান করেছে এই অভিযোগে। সেই সঙ্গে রাশিয়া চীনের সঙ্গে একটি সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিল (১৯৪৫)। নানান বন্ধুত্বপূর্ণ ঘোষণা ছাড়াও সন্ধির শর্ত ছিল এই যে জাপান আত্মসমর্পণ না করা পযন্ত উভয় শক্তি সংগ্রাম চালিয়ে যাবে, স্বতন্ত্রভাবে কোন শক্তি জাপানের সঙ্গে সন্ধি করবে না, যুদ্ধশেষে উভয় শক্তি মিলিতভাবে শান্তি স্থাপনের উদ্যোগ করবে, আর পরস্পরের সার্বভৌমত্ব

মেনে নিয়ে একে অন্যের স্বাধীনতা ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। সন্ধির মেয়াদ ছিল ত্রিশ বছর। রাশিয়া 'তিনটি পূর্ব প্রদেশে'র অর্থাৎ মাঞ্চুরিয়ার ওপর চীনের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করল, আর চীনও স্বীকার করল বহির্মোঙ্গলিয়ার স্বাধীনতা, যদি সেই স্বাধীনতা সেখানকার গণভোটে সমর্থিত হয়। চীন ডায়রনকে একটি 'মুক্ত বন্দর' ঘোষণা করে সকল জাতিকে বাণিজ্যের সুযোগদানে প্রতিশ্রুতি দিল। তা ছাড়া রাশিয়াকে স্বতন্ত্রভাবে শুল্ক সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা ছিল চুক্তির একটি শর্ত। পোর্ট আর্থারে উভয় শক্তির যৌথ কর্তৃত্ব আর রাশিয়া কর্তৃক নৌ-ঘাঁটি স্থাপনের প্রস্তাবে চীন সম্মত হল। মাঞ্চুরিয়ার রেলপথগুলির পরিচালনা বিষয়েও যৌথ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার চুক্তি করা হল। স্মরণ থাকতে পারে উপরোক্ত সন্ধিশর্তের অনেকগুলিই ইয়ালটা চুক্তির অন্তর্ভুক্ত। ইয়ালটা চুক্তির ব্যাপারে চীনকে পক্ষভুক্ত করা হয় নি, যদিও মোঙ্গলিয়া ও মাঞ্চুরিয়া বিষয়ে রাশিয়ার কতগুলি প্রস্তাব চীনের সম্মতিসাপেক্ষে গৃহীত হয়েছিল। চীনের সঙ্গে রাশিয়ার বর্তমান সন্ধি ইয়ালটা চুক্তির পূর্ণ পরিণতি ও রূপায়ণ। এখানে লক্ষ্যের বিষয় এই যে, ইতিপূর্বে মাঞ্চুরিয়ায় যেসব অধিকার রাশিয়া চীনের কাছ থেকে আদায় করেছিল, এবং রুশ-জাপান যুদ্ধের ফলে যেসব অধিকার জাপানকে হস্তান্তরিত করতে হয়েছিল, সেই অধিকারগুলিরই রকমফের শর্তরূপে সন্ধিপত্রটিতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পর সোভিয়েত রাশিয়া মাঞ্চুরিয়ায় অসংখ্য সৈন্য প্রেরণ করেছিল জাপানী বিতাড়নের জন্য। তারা সেখানে জাপানী-প্রতিষ্ঠিত কারখানাগুলির কলকব্জা খুলে নিয়ে নিজেদের দেশে চালান দিয়েছিল, ফলে রাষ্ট্রের এই সর্বপ্রধান শিল্পায়িত অঞ্চলটি পঙ্গু হয়ে পড়েছিল, এবং সেজন্য যুদ্ধান্তে জাতীয় পুনর্গঠন প্রচেষ্টা একটি কঠিন ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। জাপানী আত্মসমর্পণের পর রুশ সৈন্যরা জাপানীদের বন্দী করে সঙ্গে নিয়ে গেল, যাবার সময় তারা শাসন-ভার জাতীয় সরকারের হাতেই তুলে দিয়েছিল। এ বিষয়ে চুক্তির কোন খেলাপই সোভিয়েত করে নি। চীনা জাতীয় সরকারের অনুরোধে সোভিয়েত বাহিনী মুকডেন ছেড়ে চলে যেতে কয়েক মাস বিলম্ব করেছিল এবং তারপর মুকডেন ও অন্যান্য শহরের দখল-কার্যে জাতীয় বাহিনীকে সাহায্য করেছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও চীনা কম্যুনিস্টদের মাঞ্চুরিয়ায়

প্রবেশ এবং গ্রামাঞ্চল অধিকার করবার পক্ষে কোন বাধা ঘটে নি, সেখানে জাপানীদের পরিত্যক্ত প্রভূত পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র তাদের হাতে পড়েছিল আর সেগুলি তারা গৃহযুদ্ধে জাতীয় বাহিনীব বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিল।

কুয়োমিনটাং-কম্যুনিস্ট বিবোধে মার্শালেব আপস মীমাংসার চেষ্টা · ওয়েডেমেয়াব মিশন

কম্যুনিস্ট ও জাতীয় সরকারের মধ্যে আপস-মীমাংসার দ্বারা দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আমেরিকাব যুক্তরাষ্ট্র করেছিল এবং সেই উদ্যোগ বিষযে রাশিযারও সমর্থন ছিল আমরা তা দেখেছি। বস্তুত চিযাং কাই-সেককে স্টালিন একদা 'নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক' বলে অভিহিত করেছিলেন এবং দুইটি বিরুদ্ধ দলীয বাহিনীব ঐক্যসাধন প্রচেষ্টায় সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি দিযেছিলেন। যুদ্ধ বিজযের পবও উভয দলেব মধ্যে আপসেব উদ্যম বন্ধ হয় নি, যদিও আমেরিকান বাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষ জেনারেল ওয়েডেমেয়াব মীমাংসার কোন সম্ভাবনা দেখেন নি। ১৯৪৫ সালের নভেম্বর মাসে প্রেসিডেণ্ট টুম্যান (রুজভেল্ট তখন গতাসু হযেছেন) তাঁব নিজস্ব প্রতিনিধি জেনারেল মার্শালকে চীনে পাঠালেন, শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিমত চীনের ঐক্যবিধানকল্পে যুক্তরাষ্ট্রেব প্রভাব প্রযোগ করবার জন্য, এবং প্রথম দিকে দেখা গেল কায কিছু অগ্রসরও হয়েছে। ১৯৪৬ সালের জানুযারি মাসে জেনারেল মার্শাল জাতীয সরকার ও কম্যুনিস্টদের মধ্যে যুদ্ধবিবতি চুক্তির ব্যবস্থা করলেন, এবং পেইপিং নগরে উভয পক্ষ ও যুক্তরাষ্ট্রেব প্রতিনিধিদের মধ্যে চুক্তিমত কায সম্পাদন বিষযে নিয়মিতভাবে আলোচনাও চলতে লাগল। চীনের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য মাঞ্চুরিযায প্রবেশ করতে জাতীয় বাহিনীকে কোন বাধা দেওযা হবে না, কম্যুনিস্টরা স্বীকার কবল। চুংকিং-এ একটি সর্বদলীয সম্মেলনের অধিবেশন হল, সেই সম্মেলনে চিযাং কাই-সেক ঘোষণা কবলেন যে জাতীয সরকার প্রজাদের অবিলম্বে কয়েকটি গণতান্ত্রিক অধিকার দান করবে, এবং অন্যান্য গৃহীত প্রস্তাবও কার্যে পরিণত করা হবে। ১৯৪৬ সালে জাতীয সরকার ও কম্যুনিস্ট পার্টি উভযেই সৈন্যবাহিনী হ্রাস করতে সম্মত হল, এবং সেই সঙ্গে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত একটিমাত্র মিলিত বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা করা হল।

এই আশাপ্রদ সূচনা সত্ত্বেও মার্শালের সকল চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল, তার কারণ পক্ষ দুটির অভ্যন্তরে আপসবিরোধী মনোভাব ছিল অত্যন্ত প্রবল। জাতীয় সরকারের প্রকৃতি বা গঠন-সংস্থার কোন পরিবর্তনই দেখা যায় নি ১৯২০ সাল থেকে। কুয়োমিনটাং-এর সর্বাধিনায়ক চিয়াং কাই-সেক ছিলেন ফ্যাসিস্ট ভাবাপন্ন, আর দলটি ছিল অত্যন্ত স্বৈরাচারী। এরূপ স্বৈরাচারী রাজনৈতিক দলের আদর্শ যে প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা কখনো হতে পারে, এমন কথা কম্যুনিস্টদের কাছে ছিল একান্ত অবিশ্বাস্য। আবার কম্যুনিস্টদের প্রতি অনাস্থাবশত চিয়াং-পক্ষ আপস মীমাংসার প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করে নি। এইরূপ মন কষাকষির অবশ্যম্ভাবী ফল দেখা দিল ১৯৪৬ সালের এপ্রিল মাসে, তখন উভয় পক্ষের মধ্যে আবার যুদ্ধ বেধে গেল। জুন মাসে মার্শালের মধ্যস্থতায় যুদ্ধ-বিরতি ঘটেছিল বটে, কিন্তু শান্তি দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। চীনা জাতীয় সরকারের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করে কম্যুনিস্টরা জোর প্রচারকার্য চালাতে লাগল, আর আমেরিকান রণতরীর চীনে উপস্থিতির ঘোর প্রতিবাদ করল। মার্শালের শান্তি-প্রচেষ্টায় যোগ দিলেন নবাগত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ডক্টর লেটন স্টুয়ার্ট, মিশনারী শিক্ষকরূপে চীন দেশের সঙ্গে তাঁর ছিল দীর্ঘকালের পরিচয়। কিন্তু কুয়োমিনটাং-কম্যুনিস্ট আলোচনা অচিরেই ব্যর্থ হল, যুদ্ধবিগ্রহ আবার শুরু হল। ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসে জেনারেল মার্শাল দেশে প্রত্যাবর্তন করেন, এবং তার কয়েক মাস পরেই প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান জেনারেল ওয়েডেমেয়ারকে চীনে পাঠালেন প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ের জন্য (fact-finding mission)। ওয়েডেমেয়ার বেশ খোলাখুলিভাবেই জাতীয় সরকারের সামরিক নীতি, দুর্নীতি ও কার্যে অক্ষমতার নিন্দা করলেন, এবং মাঞ্চুরিয়ায় গৃহযুদ্ধ বন্ধের জন্য চীন, রাশিয়া, বৃটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগে একটি যৌথ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রস্তাব করলেন। অন্যথায় কম্যুনিস্ট আধিপত্য শুধু মাঞ্চুরিয়ায় নয়, সমগ্র চীন দেশে বিস্তৃত হয়ে পড়বে এরূপ আশঙ্কাও তিনি প্রকাশ করেছিলেন।

জাপানের পরাজয়ের পরেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতীয় সরকারকে চীনে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সাহায্যদানের কোন ত্রুটি করে নি। জাপানীদের

পরিত্যক্ত স্থানগুলিতে জাতীয় সৈন্যদের পরিবহণ করেছে মার্কিন বিমানবহর, জাতীয় বাহিনীকে আমেরিকা সামরিক দ্রব্যাদি ও অস্ত্রোপকরণ সরবরাহ করেছে, ঋণ ও রিলিফ দিয়েছে। সুদীর্ঘ কাল ধরে বিপুল সাহায্যদান কিন্তু কম্যুনিস্টদের হাতে জাতীয় সরকারের চরম পরাজয়কে রোধ করতে পারে নি, আমেরিকায় এই বিষয়টি নিয়ে নানান জল্পনা-কল্পনা উপস্থিত হয়েছিল। কেউ ইয়ালটা চুক্তিকে দোষ দিলেন, কেউ মার্শালের ওপর দোষারোপ করলেন যুদ্ধবিবতির দ্বারা কম্যুনিস্টদের নিশ্বাস নেবার সময় দানের জন্যে, আর কেউ বা বললেন জাতীয় বাহিনীকে যথোচিত সাহায্য করা হয় নি এবং সে সাহায্য অসময়ে বন্ধ করা হয়েছিল। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রকৃত শক্তি দেশের সুস্থ সবল জনমত, সরকারের চরম নির্ভর প্রকৃতিপুঞ্জের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার ওপর, এ সত্য চীনের সুদীর্ঘ ইতিহাসে অনেকবার প্রমাণিত হয়েছে। 'স্বর্গের পরোয়ানা' (Mandate of Heaven) কতবার প্রত্যাহৃত হয়েছে আর সেই সঙ্গে হয়েছে রাজবংশের পতন। জাতীয় সরকারের পতন সেই অতীত ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি মাত্র, এরূপ ক্ষেত্রে জনমতকে উপেক্ষা করে একটি দুর্নীতিপরায়ণ স্বার্থান্ধ শাসক-গোষ্ঠীকে সামরিক ও আর্থিক সাহায্যদানে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখবার প্রয়াস পরম শক্তিমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষেও যে সাফল্যমণ্ডিত হয় নি তাতে বিস্ময়ের কারণ নেই।

পতনের পূর্বে জাতীয় সরকার জনমতের সমর্থন লাভের চেষ্টা করেছিল নূতন একটি সংবিধান প্রস্তুত করে, এবং সেই উদ্দেশ্যে ন্যানকিং শহরে একটি জাতীয় সম্মেলনের অধিবেশন হয়েছিল (১৯৪৬)। কিন্তু এই অধিবেশনে কম্যুনিস্ট ও অন্যান্য ক্ষুদ্র দলগুলি যোগদান করতে রাজি হয় নি, উপস্থিত ব্যক্তিগণের অধিকাংশই ছিল কুয়োমিনটাং দলভুক্ত। একদলীয় শাসনের অবসান ঘটিয়ে সান-ইয়াৎ-সেন-এর কর্মসূচিমত গণতান্ত্রিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত একাধিক দলের একটি নূতন রাষ্ট্র গঠনের ব্যবস্থা অভীপ্সিত হলেও কার্যত সেই পরিকল্পনার রূপায়ণ ছিল অত্যন্ত কঠিন। ১৯৪৮ সালে ন্যানকিং-এ নূতন সংবিধানের কানুনমত জাতীয় সংসদের অধিবেশন হল, এবং সেই অধিবেশনের প্রধান কার্যই হয়েছিল চীনা সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। চিয়াং কাই-সেক রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন। এই পদটি গ্রহণ করতে প্রথমে তিনি আপত্তি করেছিলেন, পরে রাজি হন। চিয়াং-এর

ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোয়াংসির ভূতপূর্ব সমরনেতা লি সুং-জেন উপরাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হলেন। অবশ্য ইনি দীর্ঘকাল জাতীয় সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন।

উটের পিঠে শেষ তৃণখণ্ড মুদ্রাস্ফীতি : জাতীয় সরকারের পতন

কিন্তু জাতীয় সরকার জনপ্রিয় হল না, অন্তর্দ্বন্দ্ব ও দুর্নীতিরও অবসান ঘটল না। সরকার-বিরোধী ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিদের প্রতি পুলিশী রাষ্ট্রের দমননীতির প্রয়োগ করা হল। তা ছাড়া, সদ্য-পরিকল্পিত মুদ্রানীতির ব্যর্থতা জাতিকে একটি চরম দুর্গতির মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল, এই অর্থ নৈতিক বিপর্যয়ই হয়েছিল প্রজারূপী উটের পিঠে শেষ তৃণখণ্ড। দীর্ঘকাল জাপানের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে মুদ্রাস্ফীতি পর্বতপ্রমাণ বিরাট আকার ধারণ করেছিল। মুদ্রাস্ফীতি-জনিত অনর্থ নিবারণের জন্য স্বর্ণ-ভিত্তিক নূতন মুদ্রার প্রবর্তন করা হল, এবং সেই মুদ্রার সমর্থনে তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সকলকে স্বর্ণ-রৌপ্যাদি সরকারী তোশাখানায় জমা দিতে আদেশ করা হল। এইরূপে জনসাধারণের সঞ্চিত ধনরত্ন করায়ত্ত করেও প্রয়োজনীয় ব্যয়ের অনুপাতে অর্থের অপ্রাচুর্যের দরুন সরকারের পক্ষে মুদ্রাস্ফীতি বন্ধ করা অসম্ভব হয়ে উঠল। ফলে, পুরাতন নোটের মত নূতন নোটগুলিও কতগুলি বাজে কাগজে পরিণত হল। লোকে উঠল বেপরোয়া হয়ে, এমন সরকারের চেয়ে কম্যুনিস্ট শাসনকেও তারা শ্রেয় মনে করল। কম্যুনিস্টদের আদর্শবাদ, আদর্শের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা, কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, শ্রমসহিষ্ণুতা, এইসব গুণগ্রাম এবং কম্যুনিস্ট সরকারী মহলে দুর্নীতিব একান্ত অভাব জনগণের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল।

ঘটনাস্রোত এখন চরম পরিণতির দিকে দ্রুত ছুটে চলেছিল। ১৯৪৬ সালে চীন দেশের প্রধান নগর ও রেলপথসমূহ ছিল জাতীয় বাহিনীর কর্তৃত্বাধীন, তারা মাঞ্চুরিয়ায়ও অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিল, তারপর থেকেই অবস্থার অবনতি ঘটতে লাগল। কম্যুনিস্টদের সঙ্গে তুলনায় জাতীয় বাহিনীর আকার ছিল অনেক বৃহৎ, অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধের উপকরণাদি ছিল অনেক বেশি পরিমাণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রতি পদে জাতীয় সরকার পরাজিত হতে

লাগল, তার কারণ অসন্তোষ জাতীয় বাহিনীর মধ্যেও প্রবেশ করেছিল। যুদ্ধে আর তাদের প্রবৃত্তি ছিল না, দলে দলে জাতীয় সৈন্যরা দল ছেড়ে অস্ত্র-শস্ত্র সমেত কম্যুনিস্ট বাহিনীতে যোগদান করল। জাতীয় সরকারকে রক্ষা করবার জন্য আমেরিকা-দত্ত অস্ত্রোপকরণগুলি এখন কম্যুনিস্টরা ব্যবহার করল জাতীয় সরকারের বিরুদ্ধে। কম্যুনিস্টদের শক্তিমান সুদক্ষ সৈন্যদলের সামনে দাঁড়াবার মত সামর্থ্য ভগ্নাবশিষ্ট জাতীয় বাহিনীর আর রইল না। ১৯৪৮ সালে কম্যুনিস্টরা মুকডেন দখল করল, সেই সঙ্গে মাঞ্চুরিয়ার চাবিকাঠি তাদের করায়ত্ত হল। পেইপিং ও টিয়েনসিন অধিকৃত হল, তারপর কম্যুনিস্ট বাহিনী ন্যানকিং-এর দিকে অগ্রসর হয়ে সাংঘাই দখল করল। হ্যানকৌ, উচ্যাং ও হ্যান-ইয়াং-এর পতন হল (১৯৪৯), ইয়াংসি উপত্যকা কম্যুনিস্টদের করতলগত হল। ক্যানটন, উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ও সিংকিয়াং থেকে বিতাড়িত হয়ে জাতীয় সবকার চুংকিং নগরে রাজধানী স্থানান্তরিত করল, কিন্তু সে স্থানও তাদের অনতিবিলম্বে পরিত্যাগ করতে হল (১৯৫০)। চীনের মূল ভূখণ্ড, এমন কি হেইনান দ্বীপ ত্যাগ করে জাতীয়তাবাদীরা এবার ফরমোসায় আশ্রয় গ্রহণ করল, সেখানে তাদের কম্যুনিস্ট প্রতিরোধের উদ্যোগপর্ব শুরু হল সর্বাধিনায়ক চিয়াং কাই-সেকের কর্তৃত্বাধীনে। চিয়াং কাই-সেক ১৯৪৯ সালে জাতীয় সরকারের প্রেসিডেণ্টের পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন, সে-পদ আবাব তিনি গ্রহণ করলেন।

'চীনের জনগণের প্রজাতন্ত্র' : রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি

১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবব তারিখে 'চীনের জনগণের প্রজাতন্ত্র' ('The People's Republic of China') প্রতিষ্ঠিত হল। প্রজাতন্ত্রের সভাপতি হলেন মাও সি-তুং, উপ-সভাপতি হলেন চু তে, লিউ সাও-চি, লি চি-সেন, মাদাম সান-ইয়াৎ-সেন (সান-ইয়াৎ-সেন-এর পত্নী) প্রভৃতি ছয়জন। রাষ্ট্রশাসন-পরিষদের প্রধান মন্ত্রী হলেন চৌ এন-লাই। এই নূতন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গেই সোভিয়েত রাশিয়া রাষ্ট্রটিকে স্বীকার করে নিল। রাশিয়ার এই স্বীকৃতির বিরুদ্ধে পশ্চিমী শক্তিপুঞ্জের দিক থেকে তীব্র সমালোচনা করা হল এই মর্মে যে ১৯৪৫ সালে স্টালিন চীনা জাতীয় সরকারকে সমর্থন করবার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন নূতন রাষ্ট্রের স্বীকৃতির দ্বারা সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হয়েছে।

অভিযোগটি রাষ্ট্রপুঞ্জে* উত্থাপন করে রাশিয়াকে নিন্দিত করবার চেষ্টা করেছিল চীনা জাতীয় সরকারের প্রতিনিধি, কিন্তু সে উদ্যম সফল হয় নি। তবে রাষ্ট্রপুঞ্জ কম্যুনিস্ট চীনকে সদস্যরূপে গ্রহণ করে নি, ফরমোসায় নির্বাসিত কুয়োমিনটাং-প্রেরিত ব্যক্তিকেই চীনের প্রতিনিধিত্ব করতে দেওয়া হয়। এখানে বলা আবশ্যক, চীনের কম্যুনিস্ট সরকার এখন বিশ্বের অনেকগুলি রাষ্ট্রকর্তৃক স্বীকৃত, ভারত, পাকিস্তান, এমন কি বৃটেন প্রভৃতি কয়েকটি ইউরোপীয় দেশও চীনের প্রজাতন্ত্রকে স্বীকার করে নিয়েছে। জাতীয় সরকারের বিরুদ্ধে রাশিয়া চীনা কম্যুনিস্টদের সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে কখনো কোনরূপ সাহায্য করেছে এমন প্রমাণ নেই, বরঞ্চ জাপানী পরিত্যক্ত স্থানগুলির দখলকার্যে জাতীয়তাবাদীরা রাশিয়ার বিলক্ষণ সহায়তা ও সহযোগিতা লাভ করেছিল। এরূপ ক্ষেত্রে চার বছর পর অবস্থান্তর ঘটার পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তবের স্বীকৃতি রাশিয়ার পক্ষে অন্যায় বলে মনে করা বোধ করি নিরপেক্ষ বিচারে সংগত হবে না।

১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সোভিয়েত রাশিয়া ও চীনের প্রজাতন্ত্রের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্যের একটি সন্ধি স্থাপিত হল। সন্ধির শর্তগুলি এইরূপ : জাপান নিজে বা অন্য শক্তির সহযোগে রাশিয়াকে বা চীনকে আক্রমণ করলে আক্রান্ত পক্ষের সাহায্যার্থ অপর পক্ষ অগ্রসর হবে। উভয় পক্ষের স্বার্থ-সম্পৃক্ত আন্তর্জাতিক ব্যাপারসমূহে পরস্পর সহযোগিতা করা হবে, এবং একে অন্যের

* দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বেই 'জাতিসংঘ' (League of Nations) বিলুপ্ত হয়েছিল, সেই সংঘে যুক্তরাষ্ট্র সদস্য ছিল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আমেরিকার লেক সাকসেস্-এ 'রাষ্ট্রপুঞ্জ সংস্থা' (United Nations' Organization) নামে একটি বিশ্ব প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হল। কম্যুনিস্ট চীন ছাড়া পৃথিবীর সকল স্বাধীন রাষ্ট্রই এই সংস্থার সাধারণ সমিতির (General Assembly) সদস্য। ভারতের বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও কম্যুনিস্ট চীনকে রাষ্ট্রপুঞ্জে স্থান দেওয়া হয় নি। এই সংস্থায় আছে একটি 'নিরাপত্তা পরিষদ' (Security Council) যার কাজ হল মূলত আপস-সূত্রে জাতির সঙ্গে জাতির বিবাদ মীমাংসার দ্বারা শান্তি স্থাপন, কিন্তু প্রয়োজন হলে এই পরিষদ কর্তৃক অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ এমন কি বল-প্রয়োগেও বাধা নেই, যেমন করা হয়েছে কোরিয়ার বেলায়। ভূতপূর্ব 'লীগ অফ্ নেশানস'-এ বল-প্রয়োগের এমন কোন বিধান ছিল না, এখানেই ঐ সংঘের সঙ্গে 'রাষ্ট্রপুঞ্জ সংস্থা'র পার্থক্য। 'নিরাপত্তা পরিষদে'র স্থায়ী সদস্যের সংখ্যা পাঁচটি নেশন, যথা যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও কুয়োমিনটাং চীন (ফরমোসা)। রাষ্ট্রপুঞ্জের অধিবেশন-ক্ষেত্র নিউ ইয়র্ক।

রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের মর্যাদা স্বীকার করে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকবে। এই সন্ধির মেয়াদ ত্রিশ বছর, কোন পক্ষ এক বছর পূর্বে নোটিশ দিয়ে বাতিল না করলে আরও পাঁচ বছর চলবে। আর একটি চুক্তি অনুসারে রাশিয়া পোর্ট আর্থার থেকে সৈন্য অপসারণ এবং বিনা ক্ষতিপূরণে মাঞ্চুরিয়ার চ্যাং চুন রেলপথ চীনকে প্রত্যর্পণ করতে রাজি হল। রাশিয়া স্বীকার করল ডায়রন চীনা প্রজাতন্ত্রের নিজস্ব শাসন-ক্ষেত্র, ঋণস্বরূপ ছয় কোটি ডলার চীনকে দিতে রাজি হল নানান উপকরণ ক্রয়ের জন্যে, এবং চীন ঐ ঋণ কাঁচা মাল, চা, সোনা ও আমেরিকান ডলারে পরিশোধ করবে স্থির হল। ১৯৫২ সালে যখন দেখা গেল কম্যুনিস্ট চীন ও জাপানের মধ্যে কোন সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হবার সম্ভাবনা নেই তখন চীনের অনুরোধে পোর্ট আর্থার থেকে রুশ সৈন্য অপসারণের কার্য আপাতত স্থগিত রাখা হল। ১৯৫৩ সালে সন্ধি-শর্তমত কম্যুনিস্ট চীন চ্যাং চুন রেলপথ পরিচালনার ভার গ্রহণ করল। ঐ সালে একটি বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল, শর্ত ছিল এই যে চীনের কয়েকটি ধাতু ও কৃষিদ্রব্যের পরিবর্তে খনি ও শিল্পোন্নয়ন-কার্যে রাশিয়া চীনকে সাহায্য করবে।

কোরিয়ায় যুদ্ধের কথা

১৯৫০ সালের জুলাই মাসে রাশিয়ার অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত উত্তর কোরিয়ার সৈন্যবাহিনী দক্ষিণ কোরিয়া আক্রমণ করে। উত্তর কোরিয়ার অভিযোগ ছিল এই যে আক্রমণকারীর ভূমিকায় দক্ষিণ কোরিয়াই প্রথমে অবতীর্ণ হয়েছিল। আমেরিকার উদ্যোগে জাতিপুঞ্জের নানান জাতি এই যুদ্ধে দক্ষিণ কোরিয়ার সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করে। যুদ্ধটির গতি-প্রকৃতি বর্ণনা করবার পূর্বে কোরিয়া বিভাগ সম্বন্ধে কয়েকটি বৃত্তান্তের আলোচনা প্রয়োজন। ১৯১০ সাল থেকে কোরিয়া ছিল জাপানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পরাজয়ের পর জাপানী বাহিনীর অপসারণের সঙ্গে দেশটির উত্তরাংশ রুশ সৈন্য আর দক্ষিণাংশ আমেরিকান সেনাদল কর্তৃক অধিকৃত হল, উভয় পক্ষের মধ্যকার বিভাগ-রেখা ছিল আটত্রিশ অক্ষরেখা (38th parallel)। ১৯৪৫ সালে মস্কো নগরে বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া পক্ষত্রয়ের একটি বৈঠকে এই মর্মে এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হল যে সম্মেলনের তিন শক্তি ও

চীন নিয়ে গঠিত একটি ট্রাষ্টি-বোর্ডের পরিচালনায় কোরিয়া শাসিত হবে পাঁচ বছরের জন্য, এবং এই সময়ের মধ্যে কোরিয়ায় গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রণয়নের উদ্যোগ-আয়োজন করা হবে। এই পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্য আমেরিকা ও সোভিয়েতের প্রতিনিধি নিয়ে একটি কমিশন নিযুক্ত হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কমিশন কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে নি। তখন উত্তর কোরিয়ার কম্যুনিস্ট অধিবাসীরা সেখানে একটি 'প্রজাতন্ত্র' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করল, আর দক্ষিণাঞ্চলে আমেরিকা-প্রভাবিত দল স্থাপন করল অন্য একটি রাষ্ট্র। ১৯৪৭ সালে রাশিয়ার প্রতিবাদ সত্ত্বেও আমেরিকার বিশেষ উদ্যোগে রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিষদ কোরিয়ায় একটি কমিশন প্রেরণ করল সমগ্র দেশের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে, কিন্তু উত্তর কোরিয়া কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতা করতে অসম্মত হল। উত্তর কোরিয়ার এই প্রতিকূল মনোভাবের প্রতি দৃকপাত না করে কমিশন সংবিধান-সভা গঠনের জন্য নির্বাচনের আয়োজন করল, এবং এইরূপ বেপরোয়াভাবে নির্বাচিত সভাটি একটি সংবিধান প্রস্তুত করে সিংম্যান রী-কে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করল। এই ভদ্রলোক বহু বৎসর আমেরিকায় কাটিয়েছিলেন এবং তাঁর শিক্ষাদীক্ষা সবই মার্কিন মুলুকে। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিষদ সিংম্যান রী-র সরকারকেই সমগ্র কোরিয়ার আইনমত প্রতিষ্ঠিত সরকার বলে স্বীকার করল, যদিও তার মাসখানেক পূর্বে উত্তরাঞ্চলে 'গণতান্ত্রিক জনগণের সাধারণতন্ত্র' ('Democratic People's Republic') প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এবং সেই রাষ্ট্র সমগ্র কোরিয়ার ওপরই কর্তৃত্বের দাবি করেছিল। এই রাষ্ট্রকে রাশিয়া, পোল্যাণ্ড ও মোঙ্গলিয়া স্বীকার করে নিল। এইরূপে কোরিয়ার দুই অংশে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন দুটি রাষ্ট্রের স্বতন্ত্রভাবে সমগ্র দেশের ওপর কর্তৃত্বের দাবি এবং এক অংশকে রাশিয়ার পোষকতা, অপর অংশকে আমেরিকার উদ্যোগে রাষ্ট্র-পুঞ্জের সমর্থন কোরিয়ার শান্তিকে অতিমাত্র বিঘ্নিত করে তুলেছিল। শুধু তাই নয়, সেদিন কোরিয়াকে কেন্দ্র করে কম্যুনিস্ট ও 'স্বাধীন জগৎ' নামে মার্কিন-পরিচালিত অ-কম্যুনিস্ট দেশসমূহ, এই দুটি ব্লকের মধ্যে যে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সূত্রপাত হয়েছিল, তার জের আজও মেটে নি!

কোরিয়ার দুই অংশের দাবি সম্পর্কিত কলহের প্রথম ভাগে পাছে আমেরিকার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে সামরিক সংঘর্ষে জড়িত হয়ে পড়ে সেজন্য

রাশিয়া তার কোরিয়াস্থিত সৈন্যবাহিনী অপসারিত করল, আমেরিকাও মার্কিন সৈন্য দক্ষিণ কোরিয়া থেকে জাপানে নিয়ে গেল। এমন সময় কোরিয়ার উভয় অংশের মধ্যে যুদ্ধ বেধে গেল। উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়াকে আততায়ী বলে অভিযুক্ত করে আটত্রিশ অক্ষরেখার অপর দিকে সৈন্য প্রেরণ করল, সেই বাহিনী অচিরেই দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিওল নগর অধিকার করে দ্রুত অগ্রসর হতে লাগল। যুদ্ধারম্ভের সঙ্গেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপান থেকে সৈন্য প্রেরণ করল দক্ষিণ কোরিয়াকে সাহায্য করবার জন্য, এবং তার অব্যবহিত পরেই রাষ্ট্রপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে উত্তর কোরিয়াকে আটত্রিশ অক্ষরেখার উত্তরে সরে যাবার নির্দেশ দেওয়া হল। নিরাপত্তা পরিষদের এই অধিবেশন রাশিয়া বর্জন করেছিল, এবং প্রস্তাবটি তার অনুপস্থিতিতে গৃহীত হয়েছিল। সে যেমন হোক, রাশিয়া-সমর্থিত উত্তর কোরিয়াকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে রাষ্ট্রপুঞ্জ মার্কিন-সমর্থিত সিংম্যান রী সরকারকে পূর্বাপর যে সমর্থন দান করে এসেছিল, সকল অনর্থের মূল এই পক্ষপাতদুষ্ট সমর্থন, এমনিভাবে কোরিয়ার অভ্যন্তরে সঙ্গিন অবস্থার সৃষ্টি এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিই যে উভয় অংশের পরস্পর সংঘর্ষ, আজ তা স্বীকার না করে উপায় নেই।

জেনারেল ম্যাক আর্থারের অধিনায়কত্বে আমেরিকান সৈন্যদল কোরিয়ায় প্রেরিত হয়েছিল, কিন্তু প্রথমে তারা এসে কম্যুনিস্টদের অগ্রগতি রোধ করতে পারে নি। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রপুঞ্জের নির্দেশমত বৃটেন ও অন্যান্য দেশ সৈন্য প্রেরণ করেছিল যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সৈন্যসংখ্যা ছিল নগণ্য। শক্তিশালী নূতন একদল মার্কিন বাহিনী সিওলের নিকটবর্তী একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রণতরী থেকে অবতরণ করল। এই বাহিনী সিওল পুনরধিকার করল, উত্তর কোরীয় কম্যুনিস্ট বাহিনীও তখন পিছু হটতে আরম্ভ করল। রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনী যে পর্যন্ত না কোরিয়া ও চীনের সীমান্তে ইয়ালু নদীর তীরে এসে উপস্থিত হয়েছিল, পশ্চাদপসরণ চলতে লাগল কম্যুনিস্ট সৈন্যদের, তারপর হঠাৎ এসে দেখা দিল নানান যুদ্ধোপকরণ সমেত কাতারে কাতারে চীনা সেনাদল, চীন তাদের 'স্বেচ্ছাসেবক' বলেই অভিহিত করেছিল। এই প্রবল পরাক্রান্ত চীনা সৈন্যদল রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীকে আক্রমণ করে আটত্রিশ অক্ষরেখার কাছাকাছি পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে গেল।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে: রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীর বিরুদ্ধে চীনা সৈন্যদলের এই অভিযান কি ন্যায়বিগর্হিত হয় নি? বিশ্ব-প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যদি অস্ত্রধারণ করা হয় তবে জগতে শান্তিপর্বের অবসান অবশ্যম্ভাবী নয় কি? জবাবে প্রতিপক্ষ পাল্টা প্রশ্ন করতে পারেন: রাষ্ট্রপুঞ্জ কি সত্যই একটি বিশ্ব প্রতিষ্ঠান? তা যদি হয় তা হলে ষাট কোটি লোকের বাসভূমি মূল চীনকে বাদ দিয়ে ফরমোসায় নির্বাসিত আমেরিকার আশ্রিত চিয়াং দলের প্রতিনিধিকে রাষ্ট্রপুঞ্জের সভাকক্ষে আসন দেওয়া হল যে ন্যায় বা নীতির বিধানমত সেই নীতির স্বরূপ কি? চীনকে রাষ্ট্রপুঞ্জ স্বীকার করে না, অথচ চীন আপন স্বার্থের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপুঞ্জের অভিরুচি অনুসারে উত্তর কোরিযাকে সাহায্যদানে বিরত থাকবে, তাকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা চীনের আছে কি? এ ছাড়া আরও কয়েকটি বিবেচনার বিষয় আছে। চীন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয নি যে পর্যন্ত না দক্ষিণ কোরিয়ার স্বপক্ষীযেরা ইযালু নদীর তীরে চীনের সীমান্তে এসে উপস্থিত হয়েছিল। চীন দেশেব সর্বাপেক্ষা শিল্পায়িত অঞ্চল মাঞ্চুরিযায, সে অঞ্চলের নিকটবর্তী ইযালু তীবস্থ স্থানসমূহে রাষ্ট্রপুঞ্জের নামে চীন বিদ্বেষী আমেরিকার সামরিক ঘাঁটি স্থাপন চীনা রাষ্ট্রের নিরাপত্তার পরিপন্থী, এরূপ আশঙ্কা চীনের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। স্মরণ রাখা প্রযোজন, আমেরিকার সাহায্যপুষ্ট জাতীয় বাহিনীর ভগ্নাবশেষ ফবমোসা দ্বীপ থেকে বিমানবহর ও নৌ-বাহিনীব হামলা চালিযে যাচ্ছিল চীনের মূল ভূখণ্ডের ওপর, সেই আক্রমণ চিযাং কাই-সেক কোরিয়া যুদ্ধের প্রারম্ভ পর্যন্ত বন্ধ করেন নি। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান সম্ভবত রাষ্ট্রপুঞ্জের কোরিযা অভিযানের বিরুদ্ধে চীনের প্রতিক্রিয়া আশঙ্কা করেই চিয়াং বাহিনীকে মূল ভূখণ্ডের ওপর আক্রমণ বন্ধ করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন, আর সেই সঙ্গে মার্কিন নৌ-বহরকে চীনের আক্রমণ থেকে ফরমোসাকে রক্ষা করতে আদেশ করলেন। প্রশান্ত মহাসাগব অঞ্চলের নিরাপত্তার সঙ্গে ফরমোসা জড়িত, এই কথা বলে ফরমোসার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত রাখা হল। ইন্দোচীনে কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ফ্রান্সকে সাহায্যদানের হুকুম দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান, ফিলিপাইনেও সেই ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

চিয়াং-সমর্থক শক্তিপুঞ্জ মাঞ্চুরিয়ার মধ্য দিয়ে চীন আক্রমণ করে জনগণের

সাধারণতন্ত্রকে বিনষ্ট করতে পারে, এই আশঙ্কা করেই চীন কোরিয়ার যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেছিল, অবস্থার বিচার করে এরূপ ধারণা করা অসংগত নয়। রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনী যদি আটত্রিশ অক্ষরেখা অতিক্রম না করত, তা হলে চীনের যুদ্ধে নামবার কোন প্রয়োজন হত না। কিন্তু এই সুযোগে রাষ্ট্রপুঞ্জ চেয়েছিল তার পূর্বে গৃহীত প্রস্তাবমত সমগ্র কোরিয়ায় সিংম্যান সরকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে। রাষ্ট্রপুঞ্জের এই প্রচেষ্টার ফলে যুদ্ধক্ষেত্রের পরিধি আরও বিস্তৃত হয়ে পরিস্থিতিকে বিলক্ষণ জটিল করে তুলতে পারে, ভারতের প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরু সে কথা উপলব্ধি করেছিলেন, এবং সেজন্যেই তিনি রাষ্ট্রপুঞ্জ বাহিনীর আটত্রিশ অক্ষরেখা অতিক্রমের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ার-বাণী বারবার ঘোষণা করেছিলেন। পরিশেষে অনেক জল ঘোলা করবার পর যুদ্ধবিরতি ঘটল কিন্তু সেই আটত্রিশ অক্ষরেখার কাছাকাছি স্থানে (১৯৫২)। যুদ্ধবিরতির পূর্বে স্বদেশ প্রত্যাগমনে অনিচ্ছুক চীনা বন্দীদের উপলক্ষ করে অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা হয়েছিল, রাষ্ট্রপুঞ্জ তাদের চীনের হাতে সমর্পণ করতে সম্মত হয় নি এই আশঙ্কায় যে তাদের ওপর সেখানে কম্যুনিস্টদের নির্যাতন চলতে পারে, যদিও চিরাগত আন্তর্জাতিক প্রথামত যুদ্ধান্তে যুদ্ধবন্দীদের আপন-আপন সরকারের হাতে প্রত্যর্পণই নিয়ম। বিতর্কের মীমাংসা হল যখন উভয় পক্ষের সম্মতি ক্রমে ভারতের হস্তে বন্দীদের সমর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, বৃটেন প্রভৃতি দেশের মত ভারত কোরিয়ায় যুদ্ধার্থে কোন সৈন্যবাহিনী পাঠায় নি, সে পাঠিয়েছিল একটি অ্যাম্বুলেন্স বাহিনী আহত সৈন্যদের সেবা-শুশ্রূষার জন্য।

চীনের তিব্বত অভিযান

১৯৫০ সালের অক্টোবর মাসে কম্যুনিস্ট চীনের তিব্বত অভিযান আর একটি বিশেষ ঘটনা যার জন্য চীন কোন কোন দেশের তিরস্কারভাজন হয়েছে। মাঞ্চু চুয়েন লুং-এর আমল থেকে তিব্বতে চীনের সার্বভৌমত্ব বিরাজমান, এ সত্য অবিসংবাদিত। বর্তমান শতাব্দের প্রারম্ভে ভারত থেকে ইংরেজেরা তিব্বতে অভিযান প্রেরণ করেও চীনের সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করে নি, যদিও সেই সার্বভৌমত্ব তখন নামমাত্র। ১৯১০ সালে সার্বভৌমত্বের

দাবি প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তিব্বত আক্রমণ করেছিল চীনারা, তিব্বতের শাসক দালাই লামা তখন ভারতে পলায়ন করেন। অবশ্য বিপ্লবোত্তর কালে তিব্বতে চীনা প্রভাব লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছিল, তার কারণ চীন তখন গৃহ-বিবাদ ও জাপানী যুদ্ধ নিয়ে বিব্রত। যুদ্ধোত্তর কালের গৃহযুদ্ধে কম্যুনিস্টদের বিজয় লাসা কর্তৃপক্ষের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিল, তারা চৈনিক প্রভাবের অবশেষটুকুও ঝেড়ে ফেলতে চাইল। এই সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করল তারা একটি অদ্ভুত উপায়ে। পিকিং-এ নব-প্রতিষ্ঠিত কম্যুনিস্ট সরকারের সঙ্গে কোন কথাবার্তা না চালিয়ে লাসাস্থ চীনা রাষ্ট্রমন্ত্রী ও তাঁর এক শ' অনুচরকে তারা অবিলম্বে তিব্বত ত্যাগের আদেশ দিল, এবং পাছে এই আদেশের কথা বেতারযোগে চীন জানতে পারে সেই ভয়ে লাসায় চীনাদের যে বেতার-যন্ত্র ছিল, সেটি হস্তগত করল। শহরের ডাকঘর ও টেলিগ্রাফ আপিসগুলি পক্ষকালের জন্য বন্ধ রাখা হল যাতে এ সংবাদ তিব্বতের বাইরে না পৌঁছায়।

চীনা রাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বহিষ্করণকে রাষ্ট্রের অবমাননা বলেই মনে করল কম্যুনিস্ট চীন, যদিও তিব্বতের বোধ করি সেরূপ কোন উদ্দেশ্য ছিল না। তিব্বতীরা চেয়েছিল চীনের সার্বভৌমত্বের সমূল উচ্ছেদ, আর সেই সঙ্গে তিব্বতে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু সেখানে চীনের সার্বভৌমত্বের অবসান ঘটলেই যে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হবে এমন কোন কথা নেই। বরঞ্চ এই কথাই সত্য যে, বর্তমান জগতে এমন কতগুলি অনগ্রসর জাতি আছে, অর্থনীতি বা পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ে যাদের পক্ষে স্বাবলম্বন আদৌ সম্ভব নয়, এবং তিব্বত তেমনি একটি স্বাবলম্বনে অসমর্থ জাতি। এইরূপ জাতি অনেক ক্ষেত্রেই কোন-না-কোন জাতির হাতের ক্রীড়নক হয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে বিব্রত, এমন কি বিপন্নও করে তুলতে পারে। চীনের নিজের স্বার্থ বিশেষত নিরাপত্তার প্রয়োজনে তিব্বতকে পরাক্রান্ত শক্তিসমূহের লীলাক্ষেত্রে পরিণত না করে দীর্ঘকালের চীনা সার্বভৌমত্বের আওতায় ফিরিয়ে আনবার শান্তিপূর্ণ উদ্যোগ অস্বাভাবিক নয়, বোধ করি অসংগতও নয়। তিব্বতে লামাদের মধ্যে প্রাধান্য দু'জনের, তাঁরা দালাই লামা ও পাঞ্চ-আন লামা। এই শেষোক্ত লামা চীনের আশ্রয় গ্রহণ করে অভিযোগ করলেন যে তাঁকে অধিকারচ্যুত করা হয়েছে, এবং তখনি চীনের পক্ষে সার্বভৌম শক্তি

প্রয়োগের সুযোগ উপস্থিত হল। চীনা আক্রমণের প্রথম হিড়িকে দালাই লামা লাসা পরিত্যাগ করেন। আসল অবস্থা বুঝে পরে তিনি চীনের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিয়ে পাঞ্চ-আন লামার সঙ্গে মিলিত হলেন একটি রফা-মীমাংসার জন্য। স্থির হল, ধর্ম ও আভ্যন্তরীণ প্রশাসন বিষয়ে তিব্বতের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে, পররাষ্ট্র সম্পর্কিত কার্য চীন সম্পন্ন করবে, এবং প্রতিরক্ষার জন্য তিব্বতে চীনা বাহিনী রাখা হবে। এই গোলযোগের প্রথম ভাগে সার্বভৌম অধিকার প্রয়োগের উদ্দেশ্যে চীনের নগ্ন বাহুবলের আশ্রয় গ্রহণ ভারতকে কিঞ্চিৎ বিচলিত না করে পারে নি, কিন্তু অচিরেই তাকে বাস্তব অবস্থা মেনে নিতে হয়েছিল। তখন ভারত সরকার চীনের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে তিব্বতের ওপর চীনের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করল (এরূপ স্বীকৃতিদান পূর্বেও করা হয়েছিল), এবং বণিক ও তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য তিব্বতে যে কয়টি ভারতীয় সৈন্যঘাঁটি ছিল সেগুলিকে স্বেচ্ছায় তুলে আনা হল। পক্ষান্তরে চীন তিব্বতে ভারতীয়দের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচলিত সুযোগ-সুবিধা বজায় রাখতে এবং বণিক ও তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা রক্ষা কবতে প্রতিশ্রুতি দিল। ১৯৫৬ সালের শেষ ভাগে বুদ্ধ-জয়ন্তী উপলক্ষে দালাই লামা ও পাঞ্চ-আন লামা ভারতে এসে কয়েক মাস অবস্থান করেছিলেন, নানান স্থান পরিদর্শন করেছিলেন।

বান্দুং সম্মেলন ও 'পঞ্চশীল'

১৯৫৪ সালে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং নগরে একটি সম্মেলনের অধিবেশনে এশিয়ার অনেক দেশের প্রধান মন্ত্রীরা যোগদান করেন। সে সময়ে 'কাশ্মীর প্রিনসেস্' নামে ভারত সরকারের একটি বিমানের দুর্ঘটনার কাহিনী অনেকের স্মরণ থাকতে পারে। বিমানটি হংকং পাঠানো হয়েছিল সেখান থেকে চীনা প্রতিনিধিদের সম্মেলন উপলক্ষে বান্দুং নিয়ে যাবার জন্য। জাভার কাছে বিমানটি সাগরজলে পতিত হয়। যাত্রী ও বিমান-কর্মচারীদের মধ্যে অল্প কয়েকজন রক্ষা পেয়েছিল। হংকং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদন্তে প্রকাশ পেল, জাতীয়তাবাদীদের পক্ষের কোন ব্যক্তি বিমানটি হংকং ছাড়বার পূর্বে তার মধ্যে গোপনে একটি অন্তর্ঘাতী যন্ত্র স্থাপন করেছিল এই উদ্দেশ্যে যে অগ্নি-সংযোগে বিমান ধ্বংসের সঙ্গে চীনা প্রতিনিধিদলেরও প্রাণহানি ঘটবে। এই অপরাধে

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ফরমোসায় পলায়ন করল, তাদের হংকং-এ ফিরিয়ে এনে বিচার করা সম্ভব হয় নি। সৌভাগ্যক্রমে চৌ এন-লাই এই বিমানটিতে ছিলেন না, তিনি অন্য একটি প্লেনে বান্দুং যাত্রা করেছিলেন।

বান্দুং সম্মেলনে চীনের প্রধান মন্ত্রী চৌ এন-লাই-র উপস্থিতি চীনের প্রতি অ-কম্যুনিস্ট দেশগুলির আড়ষ্ট মনোভাবকে সংকোচমুক্ত করে তুলেছিল, এবং সেই সঙ্গে চীনের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের পথও পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। ভারত-পরিকল্পিত 'পঞ্চশীল' নীতির সঙ্গে কয়েকটি অনুশাসন জুড়ে দিয়ে একটি মূল নীতির ঘোষণা করা হল, অন্যান্য প্রধান মন্ত্রীদের মত চৌ এন-লাই-ও এই নীতির সমর্থনে স্বাক্ষর করলেন। এই নীতির বিশেষ দুটি বিধান এই: পররাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক কার্য থেকে বিরত থাকা, আর পররাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা। পরে মিস্টার চৌ এন-লাই ভারতে এসে 'পঞ্চশীল' নীতির সমর্থনে প্রধান মন্ত্রী নেহরুর সঙ্গে একটি যৌথ ঘোষণা করেছিলেন।

'পঞ্চশীল' নীতি মেনে নিয়ে চীন ও ভারতের এই যৌথ ঘোষণার পর প্রতিবেশী রাষ্ট্রদ্বয়ের মধ্যে কোন বিবাদ-বিসংবাদের কথা উঠতেই পারে না, এই ছিল ভারতের দৃঢ় বিশ্বাস, কিন্তু ১৯৫৯ সালের কয়েকটি ঘটনা সেই বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করেছে। মহাযুদ্ধের অবসানের পর এক দশকেরও অধিক কাল ধরে পাশ্চাত্ত্য ব্লকের অর্থাৎ আমেরিকা-বৃটেন গঠিত ব্লকের সঙ্গে কম্যুনিস্ট ব্লকের দ্বন্দ্ব-কলহ অবিরাম চলে এসেছে, ভারত কোন পক্ষে যোগদান করে নি, নিরপেক্ষভাবেই উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার কামনা করেছে। চীনের বিরুদ্ধাচরণ ভারত কখনো করে নি, বরঞ্চ রাষ্ট্রসংঘ কম্যুনিস্ট চীনকে স্বীকার না করে তার প্রতি অবিচার করেছে, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই কথা বলে সংঘ-মধ্যে চীনের আসন দাবি করেছে। ভারতের নিরপেক্ষতার আন্তরিকতা সম্বন্ধে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রগুলিতে কোন সংশয় ছিল না, তার প্রমাণ কোরিয়া যুদ্ধের পর সর্বসম্মতিক্রমে ভারতের জিম্মায় চীনা বন্দীদের সমর্পণ, আর ইন্দোচীনে যুদ্ধবিরতির পর ভারতকে শান্তিরক্ষা কমিটির সভাপতি-পদে নিয়োগ। আশ্চর্যের বিষয় এই যে ভারতের নিষ্কলঙ্ক আচরণ সত্ত্বেও সম্প্রতিকালে হঠাৎ চীন হয়ে উঠল ভারতের প্রতি বিরূপ, দীর্ঘকালের

আচার ও ঐতিহ্যগত ভারতীয় সীমান্ত পার হয়ে এসে চীনা বাহিনী ভারত-ভূমির লাডক অঞ্চলের (অবশ্য ভারতের মতে) বিস্তৃত অংশ এবং পূর্বাঞ্চলে কয়েকটি ঘাঁটি অধিকার করে বসল। প্রহেলিকা হলেও চীনের এই আগ্রাসী প্রবৃত্তির কারণ বোঝা কঠিন নয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে বৃটেন, চীন ও তিব্বত এই তিন দেশের প্রতিনিধি-ত্রয়ের সম্মেলনে ভারতের পূর্বাঞ্চলে ভারত-তিব্বত সীমান্ত নির্ধারিত হয়েছিল, সেই সীমান্তের নাম ম্যাকম্যাহোন লাইন। চীন নৈষ্ঠিকভাবে এই লাইনটি স্বীকার না করলেও বহু যুগ ধরে বিদ্যমান এই প্রাকৃতিক সীমান্তের বাস্তবতাকে অস্বীকার করা যায় না। মাঝে মাঝে কম্যুনিস্ট চীনের সরকার যখন মানচিত্র বের করেছে, আর সেই মানচিত্রে পশ্চিমে লাডক অঞ্চলের আর পূর্বে ম্যাকম্যাহোন লাইনের দক্ষিণে ভারতের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড চীনের অন্তর্গতরূপে দেখানো হয়েছে, ভারত তখনই সেই চিত্রের প্রতি চীন সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সীমান্তরেখা সংশোধনের দাবি জানিয়েছে। কিন্তু চীন বলে এসেছে, তারা পূর্বকালের মানচিত্রই পুনর্মুদ্রিত করেছে, তারা নানান কর্ম নিয়ে ব্যস্ত, সময় হলে মানচিত্র সংশোধন করবে। এদিকে দালাই লামা কর্তৃক তিব্বতের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেবার পরও পূর্বাঞ্চলে খাম্পা নামে একদল উপজাতির বিদ্রোহ বন্ধ হয় নি। তা ছাড়া তিব্বতে সামন্তপ্রথার উচ্ছেদকল্পে চীনের উদ্যোগ-উৎসাহ লামা ও ধর্মান্ধ তিব্বতীদের ঘোরতর চীনা-বিরোধী করে তুলেছিল, সেজন্য তারা তিব্বতে অবস্থিত চীনা সৈন্যবাহিনীকে ঘন ঘন আক্রমণ শুরু করল। চীন তখন বিপুল সামরিক বাহিনী তিব্বতে পাঠাল বিদ্রোহ দমন করবার জন্য। ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে দালাই লামা কয়েক সহস্র তিব্বতী সঙ্গে নিয়ে ভারতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করলেন, পূর্বের মত এবারও পাঞ্চ-আন লামা চীনকেই সমর্থন করলেন। আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে ভারত দালাই লামা ও অন্যান্য আশ্রয়প্রার্থী তিব্বতীদের আশ্রয় দান করল। তারপরই দেখা গেল চীনা বাহিনী ম্যাকম্যাহোন লাইনের দক্ষিণে ভারতের অন্তর্গত লংজু নামক শহরটি দখল করেছে। ভারত যথারীতি প্রতিবাদ জানাল, কিন্তু ফল হল বিপরীত, লাডক সীমান্তে চীনা সৈন্যের আক্রমণে ভারতীয় সশস্ত্র পুলিশবাহিনীর ১০ জন রক্ষী নিহত হল, আরও কয়েকজন বন্দী হল। এইসকল ব্যাপারে ভারতীয় প্রতিবাদের উত্তরে চীনা প্রধান মন্ত্রী চৌ এন-লাই একটি শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত

হবার জন্য প্রধান মন্ত্রী নেহরুকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে ম্যাকম্যাহোন লাইনকে সম্পূর্ণ অস্বীকার ও চীনা মানচিত্রে অঙ্কিত ভারতের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের ওপর চীনের দাবির কথা জানাতে বিস্মৃত হন নি। চীন ও ভারত, এই দুই ভূতপূর্ব মিত্ররাষ্ট্রের মধ্যে মনোমালিন্য দূর হবার সম্ভাবনা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা না করে প্রসঙ্গটি এখানেই শেষ করা যাক, কেননা সমস্ত ব্যাপারই এখন পক্ষদ্বয়ের আলোচনার বিষয়।

৫. উপসংহার

আমরা এখন ইতিহাসের উচ্চ গৌরব-মঞ্চ ছেড়ে চলতি পথের ক্লেদ-কর্দমে নেমে এসেছি, সে পথের দৈনন্দিন খবর পাওয়া যায় সংবাদপত্রের স্তম্ভে, কিন্তু সেই বৃত্তান্তগুলিকে ইতিবৃত্তের পৃষ্ঠায় সন্নিবিষ্ট করবার সময় এখনো আসে নি। বিগত ও অনাগত কালের মধ্যবর্তী বর্তমান সময়টি যখন ক্রমে অতীতে পরিণত হবে, ভাবীকালের ঐতিহাসিক তখন সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে এ-কালের ঘটনাগুলিকে নিরপেক্ষভাবে বিচার করবার সুযোগ পাবেন।

সুদূর অতীতে 'পঞ্চ শাসকে'র রাজত্বকাল থেকে চীনের ইতিহাস স্রোতস্বিনীর মত বয়ে চলেছে, গতির ছন্দ কোথাও দ্রুত চঞ্চল, কোথাও ধীর মন্থর, ছেদ নেই, বিরতি নেই। মহাকালের এই যুগ-যুগান্তের শোভাযাত্রায় আমরা দেখেছি কত বিচিত্র সংস্কৃতির অপরূপ বিকাশ, ধর্মের নানান আদর্শ, কনফুসীয় নীতির বিবর্তন, দর্শন-চিন্তার মুক্তধারা, কাব্য ও সাহিত্যের পরিস্রুত প্রস্রবণ, সংগীত ও কলা-বিদ্যার নিপুণ রূপায়ণ, তুলির স্পর্শে লিপি-লেখার অনবদ্য সৌষ্ঠব আর চিত্রলেখার নয়নাভিরাম মায়াজাল সৃষ্টি। আমরা দেখেছি, ট্যাং যুগের গ্রহিষ্ণু মনোবৃত্তি, যে যুগের সুসভ্য সমৃদ্ধ চীন বৌদ্ধধর্মকে পরম সম্মানের আসন দান করেছিল, বিদেশীর ধর্ম বলে উপেক্ষাভরে বর্জন করে নি। আর দেখেছি, মাঞ্চু যুগের প্রতিক্রিয়াশীলতা, বিদেশী বিদ্যা-শিক্ষা যখন ছিল বর্জনীয়, মাঞ্চুদের সেই প্রাণান্তকর পরিবর্তনবিমুখতা, মজ্জমান সমাজের প্রাচীন শাস্ত্র-বাক্য রীতি-পদ্ধতিকে আঁকড়ে ধরবার উন্মত্ত প্রয়াস। কত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা 'স্বর্গের পরোয়ানা' পেয়েছিল রাজ্য শাসনের জন্য, সে পরোয়ানা বাতিল হয়েছে যখন দেখা দিয়েছে প্রজা-বিদ্রোহ। এমনি বংশের পর বংশের

উত্থান-পতন, রাজারা গেছেন, কিন্তু রাজতন্ত্র যায় নি, এই তো চিরকালের চীন। এরূপ দেশে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদসাধন একটি বিস্ময়কর ব্যাপার সন্দেহ নেই, কিন্তু এমন অসম্ভব কাণ্ডও সম্ভব হয়েছিল পাশ্চাত্ত্যের সঙ্গে অপরিহার্য সংযোগ এবং কয়েকজন লোকের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষার ফলে। বিপ্লবোত্তর কালে আমরা দেখেছি ইয়াং সি-কাই চেয়েছিলেন রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে, সমরকর্তা চ্যাং স্যুং-ও সেই চেষ্টাই করেছিলেন, কিন্তু পরাক্রমশালী হলেও উত্তেজিত জনমতের কাছে তাঁদের মাথা নত করতে হয়েছিল। এইসব ঘটনার সূত্র ধরে বিবেচনা করলে চীনের রাজনৈতিক মানসিকতার কত গভীর পরিবর্তন ঘটেছে অতি অল্পকালের মধ্যে সে কথা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু সেই সঙ্গে এই পরিপ্রশ্ন জেগে ওঠে: কনফুসীয় নীতিকে বর্জন করে ঐতিহ্যের মূল্য পুনর্নির্ধারণের স্বরূপ কি? জগতের অন্যতম প্রাচীন দেশের নিজস্ব ঐতিহ্যকে জঞ্জালে নিক্ষেপ করে সেখানে একটি বিজাতীয় জীবনাদর্শের পতাকা তুলে ধরা হয়েছে কি? না, জাতির এই যুগ-সন্ধিক্ষণে ঐতিহ্যের কালোপযোগী নব রূপায়ণের প্রয়োজন হয়েছে বলেই সম্মার্জনীর এমন বিপুল কর্মচঞ্চলতা দেখা দিয়েছে?

ইতিহাস ভবিষ্যদ্বাণী নয়, ঐতিহাসিকও দৈবজ্ঞ নন। কোনরূপ ভবিষ্যদ্বাণীর দাবি না করেও বলা যায়, বৈদেশিক শক্তির সংস্পর্শ যে জাতির ইতিহাসকে রক্তাক্ত করে রেখেছে, সে জাতি নিজের স্বাধীন শুভবুদ্ধি বিসর্জন দিয়ে সোভিয়েত রাশিয়ার ক্রীড়নকে পরিণত হবে, এমন কল্পনা একান্ত অবাস্তব। ভারতের মত স্বপ্নালু দর্শন-তত্ত্বের চর্চা চীন কখনো করে নি, রাজনীতি ছিল সকল দর্শনের ভিত্তিমূল, সকল দার্শনিক সম্প্রদায়েরই বিশেষ কোন রাজনৈতিক মতবাদ ছিল। সামন্ততন্ত্রের প্রতীক কনফুসীয় নীতি-দর্শনকে বাতিল করে দিয়ে চীনের প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র যে প্রাচীন ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেছে, এমন নয়। প্রাচীন কালে আইন-সেবীরা কনফুসীয় আদর্শ প্রত্যাখ্যান করেছিল যে সব যুক্তির বলে, আজ তার ধার যদি শতগুণ বর্ধিত হয়ে নূতন জীবনদর্শনের প্রতিষ্ঠা করে থাকে তাতে কারু চমকে উঠবার কারণ নেই। 'মহাচীন' গঠন করেছিল চীন দ্বিতীয় খৃস্ট পূর্বাব্দে সামন্তরাজ্যগুলির উচ্ছেদ করে, সুবিশাল দেশের বিভিন্ন অংশ একই সংস্কৃতির সূত্রে বেঁধে দিয়েছিল তার ম্যানডারিন-পরিচালিত শাসনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য, ভাষা, লিখন, জন-শিক্ষা সবই সেই

মহাচীনকে কেন্দ্র করে মহান ঐক্যের মন্ত্র উদাত্ত স্বরে প্রচার করেছিল। এমনিভাবে সারা দেশ জুড়ে যে গভীর দেশাত্মবোধ জাগরিত হয়েছিল, তা-ই জাতীয় ঐতিহ্যের একটি পরম সম্পদ হয়ে উঠেছিল, যার প্রভাব জাতিকে কখনো বর্জন করে নি, মোঙ্গল বিজেতার শাসনকালে নয়, মাঞ্চুদের রাজত্বকালেও নয়। কত গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রাজার দুঃশাসন, বিদেশীদের জুলুমবাজি বন্ধ করবার জন্য, আমরা তা দেখেছি। এমন জাতির পক্ষে স্বকীয়তা বিসর্জন ইতিহাসকে আবর্জনা-স্তূপে ছুঁড়ে ফেলবারই নামান্তর। কিন্তু সে কথা ছেড়ে দিয়েও মাও সি-তুং-এর কর্মসূচির প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই বোঝা যায় যে তিনি রাশিয়ার সোভিয়েত পদ্ধতির অন্ধ অনুকরণ করেন নি, বরঞ্চ তিনি সুং যুগের বিপ্লবী রাজনৈতিক ওয়াং আন-সি-র পদাঙ্ক অনুসরণ করে সম্পূর্ণ একটি নূতন পথে অগ্রসর হয়েছেন। চীন কৃষিপ্রধান দেশ, আধুনিক শিল্পে অনগ্রসর, সেজন্য তিনি শিল্প-শ্রমিকদের নেতৃত্বকে প্রাধান্য না দিয়ে কৃষক সংগঠন ও জমিদারি প্রথার উৎসাদনে মনোনিবেশ করেছিলেন বলে নিষ্ঠাবান গোঁড়া কম্যুনিস্টদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। এই দৃষ্টান্তে আমরা চীনের স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাই। ১৯৫৩ সালে স্টালিনের মৃত্যুর পর রাশিয়ায় 'ব্যক্তিপূজা' (personality cult) বর্জন ও অন্যান্য আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন যে অবস্থার সৃষ্টি করেছে, উন্নতির পথে চীনের স্বাধীনভাবে চলবার পক্ষে সেই অবস্থাটি যে বিশেষ অনুকূল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

চীনে যখন কোন বিপ্লব বা অরাজকতা দেখা দিয়েছে তখন সেই অবস্থা চলেছে দীর্ঘকাল পর্যন্ত এমন নজিরের অভাব নেই। সেই মাৎস্যন্যায়ের সময় যত দীর্ঘই হোক, শান্তির রাজ্য যখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন সেই শান্তিও চলেছে দীর্ঘ কয়েক শতাব্দ ধরে। ১৯১১ সালে যে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটেছিল তারপর পঁয়ত্রিশ বছরেরও ঊর্ধ্বকাল ধরে চলেছিল প্রাদেশিক সমরনেতাদের পরস্পর বিরোধ, কুয়োমিনটাং-কম্যুনিস্ট লড়াই, জাপানী আক্রমণ, গৃহযুদ্ধ। ফলকথা, রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় থেকে অবিরাম অশান্তি চলে এসেছিল, কম্যুনিস্ট শাসন আমলেই সেই অশান্তির আগুন সম্পূর্ণ নিবে গিয়ে রাষ্ট্র-মধ্যে সুচারুরূপে শৃঙ্খলা স্থাপিত হয়েছিল। এমন সুদৃঢ় ঐক্যসূত্রে বদ্ধ শক্তিমান প্রশাসন মাঞ্চু যুগে তো নয়ই, অতীত কোন যুগেই বোধ করি দেখা যায় নি। ১৯৪৯ সালে

মহাচীনকে ছয়টি রাজনৈতিক খণ্ডে বিভক্ত করা হয়েছিল : উত্তর-পূর্ব চীন বা মাঞ্চুরিয়া, উত্তর চীন, উত্তর-পশ্চিম চীন, দক্ষিণ কেন্দ্রীয় চীন, দক্ষিণ-পশ্চিম চীন, এবং পিকিং-এর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে অন্তর্মোঙ্গলিয়ার স্বয়ংশাসিত অঞ্চল। তা ছাড়া তিব্বতও রাষ্ট্রের একটি অংশ। চীনের বিশাল ভূখণ্ডের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সর্বত্রই পিকিং-এর আদেশ নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিপালিত হয়ে থাকে, সবত্রই সুশৃঙ্খল কর্মপ্রেরণার তাগিদ দেখা দিয়েছে, মানুষ সচেতনভাবে বিরাট নির্মাণকার্যসমূহে আত্মনিয়োগ করেছে। আজকের এই দেশব্যাপী শান্তি ও কর্মোদ্যম দেখে মনেও করা যায় না যে অদূর ভবিষ্যতে কোন অন্তর্বিপ্লব ঘটবে এবং তার ফলে 'স্বর্গের পরোয়ানা' আবার বাতিল হয়ে যাবে।

নানান রকম নির্মাণ ও উন্নয়ন-কার্যের অনুষ্ঠানে হাত দিয়েছে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র, সেসব কাজের বিস্তৃত তালিকা দেবার স্থান নেই। সংক্ষেপে এই বলা যায়, বিধ্বস্ত বিপর্যস্ত রেলপথগুলির সংস্কার হয়েছে, কয়েকটি নূতন লাইনও খোলা হয়েছে। সেনসি, কানসু, সিনকিয়াং প্রভৃতি অঞ্চলে বৃহৎ নির্মাণ-পরিকল্পনাসমূহের কাজ আরম্ভ হয়েছে। প্লাবন নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, বিশেষত পীত নদী অঞ্চলে, ভূমি উদ্ধার ও জলসেচের নানান রকমের প্ল্যান-মত কাজ করবার চেষ্টা চলছে। অধিকাংশ কাজই স্বেচ্ছাসেবকদের অথাৎ গ্রামবাসীদের বাধ্যতামূলক মেহনতে সম্পন্ন হয়েছে, তবে জনসাধারণের মধ্যে কর্মোদ্যমের প্রেরণা জেগেছে সন্দেহ নেই। সব ক্ষেত্রেই কল্যাণমূলক উন্নয়ন-কার্য অব্যাহতভাবে অগ্রসর হচ্ছে। মুদ্রাস্ফীতিকে সীমার মধ্যে আবদ্ধ করা হয়েছে, দ্রব্যমূল্যের গতিকে স্থিরতা দান করা হয়েছে। কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব না করে নিয়মিতভাবে ট্যাক্স আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দুর্ভিক্ষ ছিল চীনের একটি নিয়মিত অভিশাপ, কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র স্থাপনের পর আর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় নি, যদিও নগরে খাদ্যশস্য সরবরাহের ভার গ্রামাঞ্চলের ওপরই, আর এই সময়ে খাদ্যশস্য রাশিয়ায়ও প্রেরিত হয়েছে। দুর্নীতি বন্ধ হয়েছে, শান্তি-শৃঙ্খলা ভালরূপেই রক্ষিত হয়ে থাকে, দস্যুতা বন্ধ হয়েছে, গণিকালয়ের উচ্ছেদ করা হয়েছে। নিয়মানুবর্তিতায় সৈন্যদের বিশেষভাবে শিক্ষাদান করা হয়েছে, নির্মাণকার্যে তারা জনসাধারণকে সাহায্য করে। শিক্ষার বিস্তার দ্রুত চলেছে, কারিগরি শিক্ষার দিকেই জোর দেওয়া হয়

বেশি। গণশিক্ষার ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে করা হয়েছে, সৈন্যদের মধ্যেও শিক্ষা-দান চলেছে। কম্যুনিস্ট ভাবধারায় শিক্ষা ব্যাপকভাবেই দেওয়া হয়, আত্মসন্ধান ও ভ্রমের স্বীকৃতিকে উৎসাহ-দান এই শিক্ষা-পদ্ধতির একটি বিশেষত্ব। খেলাধূলার ব্যবস্থা করা হয়েছে, স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে উদ্যমের অভাব নেই, ব্যাধির প্রতিষেধক-ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়। নগরগুলি এখন অধিকতর পরিচ্ছন্ন, পরিবহণ ও অন্যান্য ব্যবস্থারও উন্নতি হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করা হয়েছে। পল্লীদেশে জমিদারি প্রথার উচ্ছেদ করে ভূমিশূন্যদের মধ্যে জমি বণ্টন করা হয়েছে। রাশিয়ার পদ্ধতিমত 'সামষ্টিক অধিকার' (collectivism) প্রথার এবং 'সামষ্টিক কর্ষণ' (collective farming) ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছিল, বিশেষত মাঞ্চুরিয়ায়। ব্যক্তিগত ব্যবসার ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাধানিষেধ স্থাপিত হয়েছিল। ব্যক্তির মূলধন সঞ্চয় নিষিদ্ধ হয় নি, বণিক সম্প্রদায়ের কারবার চালাতেও বাধা নেই তবে কাজ-কারবার সবই কম্যুনিস্ট দলের নেতৃত্বাধীনে রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। নানারূপ দুর্নীতি বন্ধ করবার জন্য ১৯৫৩ সালে বণিক সম্প্রদায়, শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে যে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল তার ফলে তাদের মধ্যে অনেকে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছিল।

কম্যুনিস্ট কার্যক্রমের এই বিরাট সাফল্যের জন্য ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতাকে চরম মূল্য দিতে হয়েছিল। সমাজ-মধ্যে ব্যক্তির স্বাধীনতা কতখানি থাকা উচিত, কোন সীমারেখা ছাড়িয়ে গেলে স্বাধীনতা তার রূপ বদলে উচ্ছৃঙ্খলতা হয়ে ওঠে, এসব বিষয়ে তর্ক-বিতর্কের অবকাশ আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কি শিক্ষা-ব্যবস্থায়, কি অন্যান্য জনহিত-কার্যে চীনে কম্যুনিস্ট দল তাদের কঠোর একাধিপত্যবলে সমষ্টির যূপকাষ্ঠে ব্যক্তিকে নির্মমভাবে বলি দিয়ে মনুষ্যত্বেরই অবমাননা করেছে, এই অভিযোগ যদি কেউ করেন তবে তা অলীক বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। একই ছাঁচে ঢালা কম্যুনিস্ট শিক্ষার মধ্যে অর্থনীতি বা সমাজ-সংস্থা নিয়ে কোন মৌলিক চিন্তার স্থান নেই, এই সত্যের সারবত্তা উপলব্ধি করেই বোধ করি মাও সি-তুং সেদিন 'শত শত কুসুমের বিচিত্র রূপ-সজ্জা' দ্বারা সমাজকে ভূষিত করবার ব্যর্থ ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। কৃতকর্মে ভ্রমত্রুটি স্বীকার, 'পাপোঽহম্ পাপকর্মাঽহমং' এমনি স্বীকারোক্তি দ্বারা চিত্তশুদ্ধির বিধান ধর্মশাস্ত্রে আছে, ধর্মবিরোধী হলেও

কম্যুনিস্টরা এই চমৎকার শাস্ত্রবাক্যটিকে কার্যে পরিণত করেছিল 'তৃতীয় ডিগ্রি' পদ্ধতি অবলম্বন করে, অর্থাৎ দুষ্কৃতিকারীর অনুতাপোক্তি আদায় করা হত তার ওপর অসহ্য চাপ দিয়ে অথবা তাকে 'কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে' আটক রেখে। পূর্ব-দুষ্কৃতির অপরাধে লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির বিচার হয়েছে 'জনসাধারণের বিচারালয়ে', বিচার-পদ্ধতি ছিল অভিযোগ স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগ খণ্ডনের প্রমাণ দিতে বলা। এই অদ্ভুত গণ-বিচারে দণ্ডিত ব্যক্তিকে জনতার সামনে গুলি করে মারা হত, মৃত্যুদণ্ডের মর্মান্তিক দৃশ্য জনগণকে দেখতে উৎসাহিত করা হত। এমনি মানসিক বিকৃতি ঘটেছিল তাদের যে সে দৃশ্য তারা দিব্যি উপভোগ করত। ভূতপূর্ব 'অত্যাচারী' জমিদার ও শোষক বলে অভিযুক্ত কত ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।* জমিদারদের ভূমি বাজেয়াপ্ত করে ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে, অবশ্য এই ব্যবস্থা এবং তার আনুষঙ্গিক সমবায় ও যৌথ প্রণালীমত কৃষির প্রবর্তন উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি করেছে। সেই সঙ্গে গ্রামবাসীর বাধ্যতামূলক শ্রমদানের বিধান অতীত যুগের দাসত্ব-প্রথাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়, যদিও এ ক্ষেত্রে বাচোয়া এই যে সে শ্রমদান কোন মুনিবের জন্য করা হয় নি, শ্রম দ্বারা উপকৃত হয়েছে সমাজ ও শ্রমদাতা উভয়েই।

প্রাক্-বিপ্লবকাল থেকেই চীন দেশে বৌদ্ধ ও তাওধর্মের প্রভাব শিথিল হয়ে এসেছিল। ধর্মাচরণ ব্যাপারে কম্যুনিস্টরা ব্যক্তিস্বাধীনতা ঘোষণা করলেও তাদের নব-বিধান ধর্মের প্রতি দাক্ষিণ্যের উদার হস্ত প্রসারিত করে নি। ধর্মকে তারা দেখেছে একটা 'নেশার বস্তু'রূপে ('the opiate of the people'), কেননা ধর্ম সংসারের অনাচার ও অত্যাচারকে মানুষের সহ্যের সীমার মধ্যে এনে দিয়ে তার প্রতিকারের পথ, অর্থাৎ তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার প্রবৃত্তিকে নষ্ট করে। বৌদ্ধ ও তাও মন্দিরের ধনরত্ন ও বিষয়-সম্পত্তির

* "At a conservative estimate from 3,000,000 to 5,000,000 had been executed in the first two years of Communist mastery. Most of this was done by shootings in large groups which the public were encouraged or required to attend." (*A History of Modern China* by K. S. Latourette—p. 213)

বাজেয়াপ্তি ছিল কম্যুনিস্টদের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত, তার কারণ মঠের অর্থে জীবনযাপন না করে পরিশ্রমলব্ধ অর্থ দ্বারা জীবিকা অর্জনে সন্ন্যাসীদের উৎসাহ দান। বৌদ্ধ ভিক্ষুদেব সংসার-বৈরাগ্য আর তাওধর্মের কুসংস্কার পণ্ডিতসমাজ কর্তৃক একাধিকবার নিন্দিত হয়েছে, অতীত কালে সমাজ রক্ষার জন্য অসংখ্য বৌদ্ধ মন্দির ধ্বংস আর ভিক্ষু-ভিক্ষুনীদের গার্হস্থ্য জীবনে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য করা হয়েছিল, চীনের ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্তও দেখা গেছে। ধর্ম যেখানে ব্যক্তির গণ্ডী অতিক্রম করে সমাজের ঘাড়ে চড়ে বসবার চেষ্টা করে, ধর্মের সেই উদ্যম তখন হয় কম্যুনিস্ট বিধানের পরিপন্থী, এমন অবস্থায় হস্তক্ষেপ কম্যুনিস্টরা সংগতই মনে করে। চীনে বিদেশী মিশনারী সম্প্রদায় খৃস্টধর্ম প্রচারের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রসার এবং অন্যান্য অনেক জনহিত-কার্য করেছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁদের অনুষ্ঠান ব্যাপারের আর একটা দিক যে নেই তা নয়। বরঞ্চ সেই দিক দিয়ে বিবেচনা করলে তাঁদের অপকীর্তির অপযশ কীর্তির যশকে অনেকখানি ছাড়িয়ে যায়। বিদেশী মিশনারীরা ছিল সাম্রাজ্যবাদের বাহন, দেশীয় খৃস্টানদের তাদের দলে টেনে নিয়ে পাশ্চাত্ত্য শক্তিপুঞ্জের অন্যায় অধিকারগুলিকে কায়েম করাই ছিল তাঁদের ব্রত। স্মরণ থাকতে পারে, এই মিশনারী সম্প্রদায়ের প্ররোচনায় দেশীয় খৃস্টানদের একটা স্বাতন্ত্র্যবোধ জেগেছিল যার জন্য তারা বিদেশীদের মত 'একস্ট্রাটেরিটোরিয়া-লিটি'র দাবি তুলতে লজ্জা বোধ করে নি। কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র চীনা খৃস্টানদের বিদেশী মিশনারীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে বাধ্য করেছে, অল্পসংখ্যক মিশনারীকে কম্যুনিস্ট-বিরোধী প্রচার-কাযের জন্য কারারুদ্ধ করা হয়েছে। অনেক বিদেশী মিশনারী স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছেন, বস্তুত এত অল্প মিশনারীর সংখ্যা গত এক শ' বছরের মধ্যে দেখা যায় নি। অতীত কালের কথা স্মরণ করলে বিদেশী মিশনারীদের প্রতি কম্যুনিস্টদের অবিশ্বাসের কারণ বুঝতে কষ্ট হয় না। চীন দেশে সংখ্যালঘু ধর্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে মুসলমানের পরই খৃস্টানদের প্রভাব, সে প্রভাব তাদের এখনো ক্ষুণ্ণ হয় নি।

কম্যুনিজমের প্রধান অন্তরায় ছিল কনফুসীয় নীতিধর্ম। আড়াই হাজার বছর ধরে এই নীতির অবিসংবাদী প্রাধান্য সমাজকে এমন একটি ফসিলে পরিণত করেছিল, যার মধ্যে নূতন জীবনের সঞ্চার প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। যুগে যুগে কনফুসীয় দর্শনের পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু নীতিধর্মের

'সম্বন্ধ পঞ্চকে'র অর্থাৎ রাজা-প্রজা ও পারিবারিক সম্বন্ধের কোন রূপান্তর ঘটে নি। আমরা দেখেছি, 'হ্যান স্যুয়ে' আন্দোলন বৌদ্ধ ও তাওধর্মের প্রভাব নষ্ট করে কনফুসীয় নীতিধর্মের জয়ধ্বজা সকল ধর্মের উপরে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কিন্তু রাজতন্ত্রের বিলুপ্তির সঙ্গে কনফুসীয় নীতির রাজা-প্রজা সম্বন্ধের প্রধান মঞ্চটি ভেঙে পড়ল। কম্যুনিস্টদের কাছে পারিবারিক সম্বন্ধেব মূল্য রাষ্ট্রের কল্যাণের তুলনায় স্বভাবতই অল্প, রাষ্ট্রের স্থিতিস্থাপকতার প্রয়োজনে শুধু পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন নয়, পিতার বিরুদ্ধাচারী হওয়াই বিধান। এমন কি পিতা যদি প্রতিক্রিয়াশীল হয় তবে সর্বজন সমক্ষে তাকে অভিযুক্ত করা পুত্রের কর্তব্য, কম্যুনিস্টদের এই নির্দেশটিও কনফুসীয় নীতিবিরুদ্ধ। স্ত্রীজাতিকে যেরূপ অবনমিত করে রেখেছিল কনফুসীয় নীতিধর্ম, কম্যুনিস্টরা তাদের সেই অবস্থা থেকে উদ্ধার করে সমাজে উপযুক্ত স্থান দান করেছে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, কনফুসীয় 'সম্বন্ধ পঞ্চকে'র মূলেও কুঠারাঘাত পড়েছে, কিন্তু কনফুসীয় নীতিশিক্ষা শুধু সামন্ততান্ত্রিক সমাজের পঞ্চ-সম্বন্ধের মধ্যেই নিঃশেষ হয়ে যায় নি। সেই নীতিশিক্ষায় আছে অনেক সারগর্ভ ধ্যান-ধারণা, যেমন 'চুং' (বিশ্বস্ত চিত্তবৃত্তি), 'স্যু' (পরার্থপরতা), 'জেন' (মানবতাবোধ), 'ই' (সত্যনিষ্ঠা), 'লি' (শালীনতা), 'চি' (প্রজ্ঞা), 'সিন' (আন্তরিকতা)। এই নীতিশিক্ষা সর্ব মানবের, মানসিক উৎকর্ষ ও নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্যেই এই গুণগ্রামের অনুশীলন প্রয়োজন। কম্যুনিস্টরা এই নীতিশিক্ষা প্রত্যাখ্যান করেছে, এরূপ মনে করা ভুল। অবশ্য অবস্থাবিশেষে কম্যুনিস্ট ব্যবস্থায় এই নীতির প্রয়োগ নিয়ে বিপক্ষীয়দের সঙ্গে মতভেদ থাকতে পারে।

কিন্তু কনফুসীয় সামন্ত-নীতির বিরুদ্ধে কম্যুনিস্টদের অভিযান যতই বিপর্যয়কর হোক না কেন, জাতীয়তা তারা পরিহার করে নি। প্রাচীন ঐতিহ্যের অনেক জিনিসকেই তারা নিজেদের মতানুযায়ী ব্যাখ্যা করে গৌরব-মণ্ডিত করতে চেষ্টা করেছে। এখানেই রুশ সোভিয়েতের সঙ্গে কম্যুনিস্ট চীনের প্রভেদ, গর্ব করবার মত কোন জিনিসই অতীত রুশের নেই, আর চীনের প্রাচীন মহিমার তুঙ্গ শৃঙ্গ হিমালয়ের মতই জগতের মানদণ্ডরূপে অবস্থিত। এমন কীর্তি-সমুজ্জ্বল অতীত স্মৃতিকে চীন কখনো বিস্মরণীর জলে বিসর্জন দিতে পারে না। তাই আমরা দেখতে পাই, তুন হুয়াং ও ইউনকাং

গুহাশিল্পের দিকে, ট্যাং ও সুং চিত্রকলার দিকে, মিং পর্সিলেনের দিকে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়াস করছে কম্যুনিস্টরা নানান শিল্প-প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। 'সি চিং', 'প্রাচীন কাব্য' প্রভৃতি গ্রন্থের 'পাই হুয়া' বা সর্বসাধারণের বোধগম্য কথ্যভাষায় লিখিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, জাতীয় সাহিত্যের মুকুটমণি এই গ্রন্থরাজি। ট্যাং যুগের বিখ্যাত কবি লি পো ও চু-ই-র কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে সাধারণের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাঁদের গণ-কবি বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। মিং যুগে লিখিত 'সুই হু চুয়ান' নামে একটি উপন্যাসকে বিশেষ সম্মানের আসন দান করা হয়েছে। এই গ্রন্থে সুং বংশের পতনকালে দুর্নীতিপূর্ণ সামাজিক অবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বর্ণনা রয়েছে। তেমনি তা'ই পি'ং বিদ্রোহকেও ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট স্থান দান করা হয়েছে সেই বিদ্রোহকে শাসকদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে জাতীয় অভ্যুত্থান বলে অভিহিত করে, ভারতে যেমন সিপাহীযুদ্ধকে বর্ণনা করা হয়েছে স্বাধীনতা-সংগ্রাম রূপে। ফলকথা, কম্যুনিস্টদের বিরামহীন উদ্যোগ-আয়োজন চীনা ভাষাকে করে তুলেছে বেগবান, আর সেই সঙ্গে ঐতিহ্য হয়ে উঠেছে এমন ঐশ্বর্যশালী যে আধুনিক সকল রকম সংস্কার-কার্যকে, এমন কি ভূমি সংস্কারকেও ঐতিহ্যের তোশাখানা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, ইতিহাসের নজির দেখানো বাণিজ্যের রাষ্ট্রীকরণ, জমিদারি বাজেয়াপ্তি ও ভূমি-বণ্টন ব্যবস্থার বেলায়ও বাদ যায় নি।

বর্ষপঞ্জী *

রাজবংশ, রাজা ও রাজত্বকাল

পৌরাণিক যুগ

পা'ন কু	পৃথ্বী-রাজগণ (১১ ভ্রাতা)
স্বর্গ-রাজগণ (১২ ভ্রাতা)	মনুষ্য-রাজগণ (৯ ভ্রাতা)

'পঞ্চ শাসকে'র যুগ (২৮৫২-২২০৫ খৃঃ পূঃ)

ফু সি	২৮৫২ খৃঃ পূঃ	তি কু	২৪৩৫ খৃঃ পূঃ
সেন নুং	২৭৩৭ ,,	তি চি	২৩৬৫ ,,
হুয়াং তি	২৬৯৭ ,,	ইয়াও	২৩৫৬ ,,
সাও হাও	২৫৯৭ ,,	সুন	২২৫৫ ,,
চুয়ান সু	২৫১৩ ,,	ইউ	২২০৫ ,,

সিয়া বংশ (২২০৫-১৭৬৬ খৃঃ পূঃ)

ইউ	২২০৫ খৃঃ পূঃ	মং	২০১৪ খৃঃ পূঃ
চি'	২১৯৭ ,,	সিয়ে	১৯৯০ ,,
তা'ই কা'ং	২১৮৮ ,,	পু চিয়াং	১৯৮০ ,,
চু' কা'ং	২১৫৯ ,,	চি উং	১৯২১ ,,
সিয়াং	২১৪৬ ,,	কু'ং চিয়া	১৮৭৯ ,,
সাও কা'ং	২০৭৯ ,,	কাও	১৮৪৮ ,,
চু'	২০৫৭ ,,	ফা	১৮৩৭ ,,
হুয়াই	২০৪০ ,,	চিয়ে কুয়েই	১৮১৮ ,,

স্যাং (এবং ইন) বংশ (১৭৬৬-১১২২ খৃঃ পূঃ)

টা'ং	১৭৬৬ খৃঃ পূঃ	তাই ক্যাং	১৬৯১ খৃঃ পূঃ
তা'ই চিয়ে	১৭৫৩ ,,	সিয়াও চিয়া	১৬৬৬ ,,
উ তিং	১৭২০ ,,	ইয়াং চি	১৬৪৯ ,,

* Gowen & Hall এর *Outline History of China* গ্রন্থের বিবরণী অবলম্বনে।

তা'ই মাউ	১৬৩৭ খৃঃ পূঃ
চুং তিং	১৫৬২ ,,
ওয়াই জেন	১৫৪৯ ,,
হো তান চিয়া	১৫৩৪ ,,
স্থ ই	১৫২৫ ,,
স্থ সিন	১৫০৬ ,,
উ চিয়া	১৪৯০ ,,
স্থ তিং	১৪৬৫ ,,
ন্যান কেং	১৪৩৩ ,,
ইয়াং চিয়া	১৪০৮ ,,
পা'ন কেং	১৪০১ ,,

(ইন বংশ)

সিয়াও সিন	১৩৭৩ খৃঃ পূঃ
সিয়াও ই	১৩৫২ ,,
উ তিং	১৩২৪ ,,
স্থ কেং	১২৬৫ ,,
স্থ চিয়া	১২৫৮ ,,
লিউ সিন	১২২৫ ,,
কেং তিং	১২১৯ ,,
উ ই	১১৯৮ ,,
তাই তিং	১১৯৪ ,,
তি ই	১১৯১ ,,
চৌ সিন	১১৫৪ ,,

চৌ বংশ (১১২২ ২৫৫ খৃঃ পূঃ)

প্রথমার্ধ যুগেব

উ ওয়াং	১১২২ খৃঃ পূঃ	ই ওয়াং	৯৩৪ খৃঃ পূঃ
চেং ওয়াং	১১১৫ ,,	সিয়াও ওয়াং	৯০৯ ,,
কা'ং ওয়াং	১০৭৮ ,,	ই ওয়াং	৮৯৪ ,,
চাও ওয়াং	১০৫২ ,,	লি ওয়াং	৮৭৮ ,,
মু ওয়াং	১০০১ ,,	স্থয়ান ওয়াং	৮২৭ ,,
কুং ওয়াং	৯৪৬ ,,	ইউ ওয়াং	৭৮১ ,,

দ্বিতীয়ার্ধ যুগেব

পিং ওয়াং	৭৭০ খৃঃ পূঃ	চি'ং ওয়াং	৬১৮ খৃঃ পূঃ
হুয়ান ওয়াং	৭১৯ ,,	কু'য়াং ওয়াং	৬১২ ,,
চুয়াং ওয়াং	৬৯৬ ,,	টিং ওয়াং	৬০৬ ,,
সি ওয়াং	৬৮১ ,,	চিয়েন ওয়াং	৫৮৫ ,,
হুই ওয়াং	৬৭৬ ,,	লিং ওয়াং	৫৭১ ,,
সিয়াং ওয়াং	৬৫১ ,,	চিং ওয়াং	৫৪৪ ,,

চিং ওয়াং	৫১৯ খৃঃ পূঃ	লিয়ে ওয়াং	৩৭৫ খৃঃ পূঃ
ইউয়ান ওয়াং	৪৭৫ ,,	সিয়েন ওয়াং	৩৬৮ ,,
চেং টিং ওয়াং	৪৬৮ ,,	সেন সিং ওয়াং	৩২০ ,,
কা'ও ওয়াং	৪৪০ ,,	ন্যান ওয়াং	২৫৫ ,,
ওয়েই লিয়ে ওয়াং	৪২৫ ,,	তু' চৌ চুন	২৫৫ ,,
আন ওয়াং	৪০১ ,,		

চি'ন বংশ (২৫৫-২০৬ খৃঃ পূঃ)

চাও সিয়াং ওয়াং	২৫৫ খৃঃ পূঃ	সি হুয়াং তি	২২১ খৃঃ পূঃ
সিয়াও ওয়েন ওয়াং	২৫০ ,,	(চেং ওয়াং	২৪৬) ,,
চুং সিয়াং ওয়াং	২৪৯ ,,	উর সি হুয়াং তি	২০৯ ,,

হ্যান বংশ (২০৬ খৃঃ পূঃ-২২১ খৃস্টাব্দ)

কাও সু	২০৬ খৃঃ পূঃ	ওয়াং মেং	৯ খৃস্টাব্দ
হুই তি	১৯৪ ,,	হুয়াই ইয়াং ওয়াং	২৩ ,,
লু হৌ	১৮৭ ,,	কুয়াং উ তি	২৫ ,,
ওয়েন তি	১৭৯ ,,	মিং তি	৫৮ ,,
চিং তি	১৫৬ ,,	চ্যাং তি	৭৬ ,,
উ তি	১৪০ ,,	হো তি	৮৯ ,,
চাও তি	৮৬ ,,	সু' তি	১০৬ ,,
সুয়ান তি	৭৩ ,,	আন তি	১০৭ ,,
ইউয়ান তি	৪৮ ,,	সুন তি	১২৬ ,,
চিং তি	৩২ ,,	চু'ং তি	১৪৬ ,,
আই তি	৬ ,,	হুয়ান তি	১৪৭ ,,
পিং তি	১ খৃস্টাব্দ	লিং তি	১৬৮ ,,
জু সু ইং	৬ ,,	সিয়েন তি	১৯০ ,,

'তিন রাজ্য' ও 'ছয় রাজবংশ' (২২১-৬১৮ খৃস্টাব্দ)

১. ছোট হ্যান (সু) রাজ্য

চাও লিয়ে তি	২২১ খৃস্টাব্দ	হাও চু	২২৩ খৃস্টাব্দ

২. ওয়েই রাজ্য

ওয়েন তি	২২০ খৃস্টাব্দ	সাও তি	২৫৪ খৃস্টাব্দ
মিং তি	২২৭ "	ইউয়ান তি	২৬০ "
ফেই তি	২৪০ "		

৩. উ রাজ্য

তা তি	২২০ খৃস্টাব্দ	চিং তি	২৫৯ খৃস্টাব্দ
ফেই তি	২৫২ "	মো তি	২৬৪ "

সিন বংশ (১)

পশ্চিম

উ তি	২৬৫ খৃস্টাব্দ	হুয়াই তি	৩০৭ খৃস্টাব্দ
হুই তি	২৯০ "	মিন তি	৩১৩ "

পূর্ব

ইউয়ান তি	৩১৭ খৃস্টাব্দ	তি ই	৩৬৬ খৃস্টাব্দ
মিং তি	৩২৩ "	তিয়েন ওয়েন তি	৩৭১ "
চে'ং তি	৩২৬ "	সিয়াও উ তি	৩৭৩ "
কা'ং তি	৩৪৩ "	আন তি	৩৯৭ "
মু তি	৩৪৫ "	কু' তি	৪১৯ "
আই তি	৩৬২ "		

পূর্বকালের সুং বংশ (২)

উ তি (বা সাও তি)	৪২০ খৃস্টাব্দ	মিং তি	৪৬৫ খৃস্টাব্দ
ই' ইয়াং ওয়াং	৪২৩ "	সা'ং উ ওয়া'	৪৭৩ "
ওয়েন তি	৪২৪ "	চু ইউ	৪৭৭ "
সিয়ান উ তি	৪৫৪ "	সুন তি	৪৭৭ "
ফেই তি	৪৬৫ "		

চি’ বংশ (৩)

কাও তি	৪৭৯ খৃস্টাব্দ	মিং তি	৪৯৪ খৃস্টাব্দ
উ তি	৪৮৩ ”	তুং হুই হাউ	৪৯৯ ”
উ লিন ওয়াং	৪৯৪ ”	হো তি	৫০১ খৃঃ পূঃ
হাই লিং ওয়াং	৪৯৪ ”		

লিয়াং বংশ (৪)

উ তি	৫০২ খৃস্টাব্দ	ইউ চ্যাং ওয়াং	৫৫১ খৃস্টাব্দ
ইউয়ান তি	৫২২ ”	চেং ইয়াং হৌ	৫৫৫ ”
চিয়েন ওয়েন তি	৫৫০ ”	চি’ তি	৫৫৫ ”

চে’ন বংশ (৫)

উ তি	৫৫৭ খৃস্টাব্দ	সুয়াং তি	৫৬৯ খৃস্টাব্দ
ওয়েন তি	৫৬০ ”	হৌ চু	৫৮৩ ”
লি হাই ওয়াং	৫৬৭ ”		

সুই বংশ (৬)

কাও সু	৫৮৯ খৃস্টাব্দ	কুং তি ইউ	৬১৭ খৃস্টাব্দ
ইয়াং তি	৬০৫ ”	কুং তি তুং	৬১৮ ”

ট্যাং বংশ (৬১৮-৯০৭ খৃস্টাব্দ)

কাও সু	৬১৮ খৃস্টাব্দ	সু সুং	৭৫৬ খৃস্টাব্দ
তাই সুং	৬২৭ ”	তাই সুং	৭৬৩ ”
কাও সুং	৬৫০ ”	তে সুং	৭৮০ ”
চুং সুং	৬৮৪ ”	সুন সুং	৮০৫ ”
জুই সুং	৬৮৪ ”	সিয়েন সুং	৮০৬ ”
উ হৌ	৬৮৪ ”	মু সুং	৮২১ ”
চুং সুং (পুনরধিষ্ঠিত)	৭০৫ ”	চিং সুং	৮২৫ ”
জুই সুং	৭১০ ”	ওয়েন সুং	৮২৭ ”
সুয়ান সুং	৭১৩ ”	উ সুং	৮৪১ ”

সুয়ান সুং	৮৪৭ খৃস্টাব্দ	চাও সুং	৮৮৯ খৃস্টাব্দ
আই সুং	৮৬০ „	চাও সুয়ান তি	৯০৫ „
সি সুং	৮৭৪ „		

'পঞ্চ রাজ-বংশে'র যুগ (৯০৭-৯৬০ খৃস্টাব্দ)

পরবর্তী লিয়াং বংশ (১)

তা'ই সু	৯০৭ খৃস্টাব্দ	মো তি	৯১৫ খৃস্টাব্দ

পরবর্তী ট্যা'ং বংশ (২)

চুয়ান সুং	৯২৩ খৃস্টাব্দ	মিন তি	৯৩৪ খৃস্টাব্দ
মিং সুং	৯২৬ „	ফেই তি	৯৩৪ „

পরবর্তী সিন বংশ (৩)

কাও সু	৯৩৬ খৃস্টাব্দ	সি' ওয়াং	৯৪৩ খৃস্টাব্দ

পরবর্তী হ্যান বংশ (৪)

কাও সু	৯৪৭ খৃস্টাব্দ	ইন তি	৯৪৮ খৃস্টাব্দ

পরবর্তী চৌ বংশ (৫)

তা'ই সুং	৯৫১ খৃস্টাব্দ	কুং তি	৯৬০ খৃস্টাব্দ
সি সুং	৯৫৪ „		

সুং বংশ (৯৬০-১২৭৯ খৃস্টাব্দ)

তা'ই সু	৯৬০ খৃস্টাব্দ	সেন সুং	১০৬৮ খৃস্টাব্দ
তা'ই সুং	৯৭৩ „	চে সুং	১০৮৬ „
চেন সুং	৯৯৮ „	হুই সুং	১১০ „
জেন সুং	১০২৩ „	চি'ন সুং	১১২৬ „
ইং সুং	১০৬৪ „		

দক্ষিণাঞ্চলের সুং

কাও সুং	১১২৭ খৃস্টাব্দ	কুয়াং সুং	১১৯০ খৃস্টাব্দ
সিয়াও সুং	১১৬৩ „	নিং সুং	১১৯৫ „

লি সুং	১২২৫ খৃস্টাব্দ	তুয়ান সুং	১২৭৬ খৃস্টাব্দ
তু সুং	১২৬৫ „	তি পিং	১২৭৮ „
কুং তি	১২৭৫ „		

ইউয়ান বা মোঙ্গল বংশ (১২৭৯-১৩৬৮ খৃস্টাব্দ)

সি সু (কুবিলাস খাঁ)	১২৭৯ খৃস্টাব্দ	তাই তিং তি	১৩২৪ খৃস্টাব্দ
চেং সুং	১২৯৫ „	মিং সুং	১৩২৯ „
উ সুং	১৩০৮ „	ওয়েন তি	১৩৩১ „
জেন সুং	১৩১২ „	সুন তি	১৩৩৩ „
ইং সুং	১৩২১ „		

মিং বা উজ্জ্বল বংশ (১৩৬৮-১৬৪৪ খৃস্টাব্দ)

তাই সু (হুং উ)	১৩৬৮ খৃস্টাব্দ	সিয়েন সুং	১৪৬৫ খৃস্টাব্দ
হুই তি	১৩৯৯ „	সিয়াও সুং	১৪৮৮ „
চেং সু (ইয়াং লো)	১৪০৩ „	উ সুং	১৫০৬ „
জেন সুং	১৪২৫ „	সি সুং	১৫২২ „
সুয়ান সুং	১৪২৬ „	মু সুং	১৫৬৭ „
ইং সুং	১৪৩৬ „	সেন সুং (ওয়ান লি)	১৫৭৩ „
তাই সুং	১৪৫০ „	কুয়াং সুং	১৬২০ „
চিং তি	১৪৫০ „	সি সুং	১৬২১ „
ইং সুং (পুনর্বাধিষ্ঠিত)	১৪৫৭ „	চুয়াং লিয়ে তি	১৬২৮ „

চিং বা মাঞ্চু বংশ (১৬৪৪-১৯১১ খৃস্টাব্দ)

সুন চি	১৬৪৪ খৃস্টাব্দ	তাও কুয়াং	১৮২১ খৃস্টাব্দ
কাং সি	১৬৬২ „	সিয়েন ফেং	১৮৫১ „
ইয়াং চেং	১৭২২ „	তুং চি	১৮৬২ „
চিয়েন লুং	১৭৩৬ „	কুয়াং সু	১৮৭৫ „
চিয়া চিং	১৭৯৬ „	সুয়ান তুং	১৯০৮ „

রাষ্ট্রবিপ্লব ও সাধারণ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা (১৯১২)

সাধারণ-তন্ত্রের প্রধান কর্মকর্তাগণ :

সান-ইয়াৎ-সেন (সাময়িকভাবে প্রেসিডেণ্ট)

—জানুয়ারি-জুন ১৯১২

ইউয়ান সি-কাই (সাময়িকভাবে প্রেসিডেণ্ট)

—১৯১২

(নির্বাচিত—১৯১৩)

ইউয়ান সি-কাই-র মৃত্যুর পর প্রেসিডেণ্টরূপে কর্ম করেন লি ইউয়ান হুং

—১৯১৬

লি-র পদত্যাগের পর প্রেসিডেণ্টরূপে কাজ করেন ফেং কুয়ো চ্যাং

—১৯১৭

তুচুন (সমরনেতা)-দের পার্লামেণ্ট গঠন

—১৯১৭

সু সি-চ্যাং—অবৈধভাবে নির্বাচিত

—১৯১৮

সান-ইয়াৎ-সেন (ক্যানটনের রাষ্ট্র-সংসদ কর্তৃক পুনর্নির্বাচিত)

—১৯২১

লি ইউয়ান-হুং (পুনরায় প্রতিষ্ঠিত)

—১৯২২

সা'ও কুন

—১৯২৩

সান-ইয়াৎ-সেন-এর মৃত্যু

—১৯২৫

কুয়োমিনটাং গঠন (১৯১২)

ইউয়ান সি-কাই কর্তৃক কুয়োমিনটাং সদস্যদের বিতাড়ন

—১৯১৩

কম্যুনিস্ট ধাঁচে কুয়োমিনটাং পুনর্গঠন (সান-ইয়াৎ-সেন কর্তৃক)

—১৯২৩

কুয়োমিনটাং বাহিনীর উত্তরাভিমুখে যুদ্ধযাত্রা—সেনাপতি চিয়াং কাই-সেকের নেতৃত্ব

—১৯২৬

কম্যুনিস্ট পার্টির আবির্ভাব (১৯২১)

কম্যুনিস্ট পার্টির প্রথম সভাপতি চে'ন তু সিউ

—১৯২১

মাইকেল বোরোডিনের আগমন

—১৯২৩

কুয়োমিনটাং-কম্যুনিস্ট প্রথম বিরোধ

—১৯২৭

কম্যুনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় সভাপতি লি লি-সান

—১৯২৭

কম্যুনিস্টদের পশ্চাদপসরণ (দীর্ঘ পদযাত্রা)

—১৯৩৪

জাপানের সঙ্গে সংগ্রাম (১৯৩৭-১৯৪৫)

চীনের জনগণের সাধারণ-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ও সভাপতি মাও সে-তুং (১৯৪৯)

কুয়োমিনটাং সরকারের পতন ঃ বাহিনী সহ চিয়াং কাই-সেকের ফরমোসা গমন (১৯৫০)

নির্ঘণ্ট

গ্রন্থপঞ্জী

Chrismas Humphreys—*Buddhism*
C. P. Fitzgerald—*China · A Short Cultural History*
Dorothy Hogg—*Challenge of the East*
Edgar Snow—*Red Star over China*
Gowen & Hall—*An Outline History of China*
Harold Lamb—*Genghis Khan*
H. A. Gibs—*Gems of Chinese Literature*
A History of the Chinese Literature
An Introduction to the History of Chinese Pictorial Art
Civilization of China
Heinrich Harrer—*Seven Years in Tibet*
H. G. Wells—*An Outline of World History*
Jawaharlal Nehru—*Glimpses of World History*
K. S. Latourette—*The Chinese : Their History and Culture*
A History of Modern China
L. Carrington Goodrich—*A Short History of the Chinese People*
Dr. Leo Wieger S. J.—*A History of the Religious Beliefs and Philosophical Opinions in China* (Translated by Edward Chalmers Warner)
Lin Yu Tung – *Famous Chinese Short Stories*
Wisdom of China :
(a) Tao-teh-Chi or Book of Tao
(b) Shu Chi or Book of History
(c) Mencius
(d) Chuangtze
(e) Motze
(f) Aphorisms of Confucius
Liu-Wi-Chi—*A Short History of the Confucian Philosophy*
Pearl S. Buck—*My Several Worlds (An Autobiography)*
R. L. Hobson—*Chinese Pottery and Porcelain*
The Book of Ser. Marco Polo—
(3rd Edn. revised by M. Cordier)

Tsui Chi—*A Short History of Chinese Civilization*
W. E. Soothill—*A History of China*
William Cohn—*Chinese Painting*
Will Durant—*Our Oriental Heritage*
